নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন

চতুর্থ খণ্ড—১২৯৩

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২১০/[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

[illegible]১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

চতুর্থ খণ্ড নব্যভারতের সূচিপত্র।

নূতনত্ব বা সৃষ্টিরহস্য।

"In nature every moment is new; the past is always swallowed and forgotten; the coming only is sacred. Nothing is secure but life, transition, the energizing spirit. No love can be bound by oath or covenant to secure it against a higher love. No truth so sublime but it may be trivial to-morrow in the light of new thoughts."—*Emerson.*

"Novelty, surprise, change of scene, refresh the artist,—break up the tiresome old roof of heaven into new forms."—*Hafiz.*

"Within every man's thought is a higher thought,—within the character he exhibits to-day, a higher character. * * * He is rising to greater heights, but also rising to realities; the outer relations and circumstances dying out, he entering deeper into God, God into him, until the last garment of egotism falls, and he is with God,—shares the will and the immensity of the First Cause."—*Emerson.*

মানুষ চিরকাল নূতনের উপাসক। নূতন স্থানে গমন, নূতন বায়ু সেবন, নূতন দ্রব্য ভক্ষণ, নূতন কথা শ্রবণ এবং নূতন সহবাস লাভে চিরকাল মানুষের দারুণ পিপাসা। এই জন্য প্রকৃতি, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, জগতের সমস্ত পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে। মানুষ, নূতনের পিপাসায়, পুরাতনকে পরিত্যাগ করিতেছে। এমনই করিয়া মানুষ উন্নতির দিকে চলিতেছে। পুরাতন কিছুই প্রকৃতির লক্ষ্য নহে। কি এক অনন্ত পরিবর্ত্তনের চক্র ঘুরিতেছে যে, তাহা ক্রমাগত প্রকৃতিকে নব বেশে সজ্জিত করিয়া তুলিতেছে। নূতনের নেশায় ভোর হইয়া, মানুষ প্রকৃতির কোলে ডুবিয়া, অনন্তচক্রের অনন্ত পাকে ঘুরিতে ঘুরিতে, নূতন হইতে নূতন রাজ্যে যাইয়া নূতনের সেবা করিয়া, নূতন শিক্ষা পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে। সে চক্রের কোথায় আরম্ভ, কোথায় শেষ, কেহই জানে না। সে চক্রই—অনন্ত সৃষ্টিরহস্য। সে চক্র বিধাতার প্রেম-প্রসাদ বা কৃপা-কণা।

প্রকৃতির নব বেশে কে মোহিত নয়? নূতনত্বের জন্য কে পিপাসিত নয়? শিশুকে কতকগুলি ক্রীড়ার সামগ্রী দেও,—একদিন, দুদিন, তিন দিন পরে সে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। শিশুর মন এক জিনিস অধিকক্ষণ ভুলাইতে পারে

না। নূতনের প্রতি অবোধেরও প্রগাঢ় আসক্তি। বালকই বল, যুবকই বল, বা বৃদ্ধই বল, এক বস্তু সে অধিকক্ষণ দেখিতে বা ভোগ করিতে ভালবাসে না। একটী দেখিতে দেখিতেই তাহার চক্ষু অন্যটীতে পড়ে। একটী ভোগ করিতে করিতেই তাহার মন অন্যটীতে ধায়। কেবল নীলিমাময় আকাশের দিকে চাহিয়া কেহই সুখী নয়, কেবল প্রশান্ত সাগরের গম্ভীরতার পানে চাহিয়া সকলের মন তৃপ্ত হয় না। কেবল প্রখর দীপ্তিময় সূর্য্যের উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, কঠোর রশ্মিতে মানুষ ভুলে না, কেবল রজনীর গভীর নীরব আঁধার লইয়া থাকিতে মানুষ চায় না। এই জন্যই দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবস। এই জন্যই ফুলের ধারে ফল; পুরুষের ধারে স্ত্রী, পাহাড়ের গায়ে ঝরণা। গ্রীষ্মের কোলে শীত, শীতের কোলে গ্রীষ্ম। আঁধারের কোলে জ্যোতি, জ্যোতির কোলে আঁধার। লালের ধারে নীল, নীলের ধারে সবুজ। ঋতুর কোলে ঋতু, বৎসরের কোলে বৎসর, যুগের কোলে যুগ। পৃথিবীতে কতই বৈচিত্র্য,—কতই বিভিন্ন প্রকার শোভা, কতই রকম রকম রূপ,—কতই নূতনের লীলা। মানুষকে ভুলাইবার জন্য প্রকৃতি অবিরত কত চেষ্টাই করিতেছে! ভিন্ন ভিন্ন পাখীর কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন শোভা; ভিন্ন ভিন্ন সাগরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন পাহাড় পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যখন যে দিকে চাও—অতুল শোভা। সকলই আপন ভাবে বিভোর। একবার দেখ, আবার দেখ, আবার দেখ; যতবার দেখিবে—ততবারই নূতন। তুমি যাহা দেখ, আমি তাহা দেখি না, আমি যাহা দেখি, তুমি তাহা দেখিতে পাও না। তোমার নিকট যাহা পুরাতন হইয়াছে, আমার নিকট তাহাই নূতন। তোমার নিকট এক সময়ে যাহা পুরাতন হইতেছে, অন্য সময়ে তাহাই আবার নূতন সাজ ধরিয়া উপস্থিত হইতেছে। দারুণ শীতের মর্ম্মদাহ চলিয়া গিয়াছে, বসন্তের সুস্নিগ্ধ আলিঙ্গনে প্রকৃতির কোলে কোলে কতই শোভা ফুটিয়া পড়িতেছে। শুষ্ক মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বৃক্ষে কচি কচি পাতা, কচি কচি ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। মৃত পৃথিবী জাগিয়া উঠিতেছে। কাহার ইঙ্গিতে, কে জানে, যে চিত্র দেখিতে প্রাণ বেদনা পাইত, তাহার নূতন রূপ দেখিতেই প্রাণ আজ ব্যাকুল হইতেছে। বসন্ত কাল ত কতবার দেখিয়াছ, কিন্তু আবার কি দেখিবার জন্য তুমি তৃষিত নও? সকলেই তৃষিত। যতবার দেখিবে, ততবার নূতন হইবে, ততবার দেখার সাধ বাড়িবে। সে সাধ—অনন্ত। কেন বলত? কারণ, পরিবর্ত্তনের চক্র চিরকাল বসন্তকে নূতন করিয়া উপস্থিত করিতেছে; কারণ, দেখিতে দেখিতে তোমার নয়নও নূতনত্ব পাইতেছে। যেটী যায়, ঠিক সেটী আর ফেরে না। যে বসন্ত গিয়াছে, সে বসন্ত আর ফিরে না। গত বৎসর তুমি যে বসন্ত দেখিয়াছ, এবার তুমি আর সে বসন্ত দেখিতে পাইবে না। গত বৎসর যে তুমি ছিলে, এ বৎসর আর সে তুমি নাই, তোমার চক্ষু পরিবর্ত্তিত, তোমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত, তোমার মন পরিবর্ত্তিত। বাল্যকালে তুমি যে চিত্র দেখিয়াছ, বড় হইয়া সেই চিত্রের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, দেখিবে, সে চিত্র আর নাই

যাহা একবার দেখ, আর তাহা দেখা যায় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সে চক্ষুই নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, প্রকৃতি, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, শরীরে নূতন শক্তি, নূতন রক্ত সঞ্চার করিতেছে। প্রাতে যে তুমি ছিলে, মধ্যাহ্নে সে তুমির মৃত্যু হইয়াছে,—প্রাতের উপর মধ্যাহ্ন রাজত্ব করিতেছে। আজ যে আমি বসিয়া লিখিতেছি, কাল আর সে আমি থাকিব না;—থাকিতে পারি না। মহাত্মা এমারসন বলিয়াছেন;—"What I write, whilest I write it, seems the most natural thing in the world: but yesterday I saw a dreary vacuity in this direction in which now I see so much: and a month hence, I doubt not, I shall wonder who he was that wrote so many continuous pages." বালকের মুখের হাসি, সে নিত্য নূতন; ফুলের সৌরভ, সে নিত্য নূতন; কোকিলার ঝঙ্কার, সে নিত্য নূতন মধু ঢালে। নিত্য নূতন—আমার নিকট আমি—তোমার নিকট তুমি। এই জন্যই মানুষের দেখার সাধ আর ফুরায় না—অনন্তকাল অনন্ত চক্ষে দেখিলেও আরো দেখিতে ইচ্ছা হয়। "New light is added to the mind in proportion as it uses that which it has." আমি প্রেমিকের কথাই বলিতেছি। প্রেমিক ভিন্ন কিছু দেখিতে পারে, এমন কোন জীব পৃথিবীতে নাই। প্রেমের চক্ষে নবীন প্রণয়ীর রূপ দেখিয়াছ,—সেই সুধা বিনিন্দিত মুখের অমৃত-বাক্য শুনিয়াছ, সেই প্রেম-মাখা মুখের উপরে চাহিয়া চাহিয়া নয়নের জ্যোতি, সেই স্বর্গীয় অপূর্ব্ব কান্তির সকলই দেখিয়াছ, কিন্তু দেখার সাধ তোমার কি মিটিয়াছে? প্রেম, সকলকে নিত্য নূতন করিয়া যদি প্রেমিককে না ভুলাইতে পারিত, তবে প্রেমের মাহাত্ম্য জগতে থাকিত না;—স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাকে ভার মনে করিত, স্ত্রী স্বামীর সহবাসকে নরকের পাপের সহিত তুলনা করিত। কবিরা বলিয়াছেন—"লাখ লাখ যুগ ধরিয়া তোমাকে দেখিলেও আমার নয়নের সাধ মিটে না।" "তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া আজন্ম দেখিলেও সাধ পূরে না।" দেখিতে দেখিতে তুমিও নূতন হইতেছ, সেও নূতন হইতেছে, নূতনে নূতনে মিলন, কত চোক দিয়া কতবার দেখা গেল, তবুও সে দেখার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি আর নাই, সে সৌন্দর্য্যের আর শেষ নাই, যত দেখা হইতেছে, ততই নূতনত্ব বাড়িতেছে। আজন্ম দেখিয়াও দেখার সাধ মিটে না। পুত্রের সৌন্দর্য্য মাতার নিকট নিত্য নূতন; স্ত্রীর অঙ্গ সৌষ্ঠব, হৃদয়ের ভালবাসা স্বামীর নিকট নিত্য নূতন। প্রেমের নিকট কিছুই পুরাতন নাই—সকলই নূতন। প্রেমেরই বৃষ্টি, প্রেমেরই বন্যা নিয়ত এই জগতে বহিতেছে, সুতরাং কোটী কোটী বৎসর চলিয়া যাইল, তবুও পৃথিবী পুরাতন হইল না। আমি যখন প্রেমের চক্ষে জগতের পানে তাকাইয়া দেখি, তখন প্রতিনিমেষে যেন সকল নূতন হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়। পুরাতন বৃক্ষ নাই, পুরাতন ফুল নাই, পুরাতন চন্দ্র নাই, পুরাতন সূর্য্য নাই,—এজগতে প্রেমিকের নিকট পুরাতন নাই;—থাকিতে পারে না। প্রেমের আহার—নিত্য নূতন; পশু পক্ষী মানুষ নিত্য নূতন, আকাশের নক্ষত্র, চাঁদের আলো নিত্য নূতন, ফুলের সৌরভ নিত্য নূতন, পাহাড় পর্ব্বত নিত্য নূতন, নদী সাগর নিত্য নূতন—পশুপক্ষী নিত্য নূতন।

নিত্য নূতন, অথবা নিত্য মধুর! কিন্তু প্রেম যেখানে নাই—সেস্থান পুরাতন, সেখানে আর দেখাও নাই, আর সাধও নাই। দেশ কাল পাত্র—সম্প্রদায় গত বিভিন্নতার জাল ছিন্ন কর দেখিবে—খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, শ্রীগৌরাঙ্গ, মনু, কনফিউসস্, নানক, কবির, তুকারাম, রামপ্রসাদ, নিউটন, বেদব্যাস, ম্যাটসিনি আর এমারসন নিত্য নবভাব জগতে ঢালিতেছেন! তোমার নিকট যিনি একভাব ঢালিতেছেন, আমার নিকট তিনিই আর একভাব ঢালিতেছেন। সকলেই সকলের গুরু, সকলেই সকলের শিক্ষক। নিরন্ন, রোগক্লিষ্ট নিরাশ্রয় কৃষকপত্নীও শিক্ষয়িত্রী, আর অট্টালিকাবাসী রাজাধিরাজ, সেও শিক্ষক। সকলেই সকলের উপকারী। কেহ দয়া করিয়া উপকার করেন, কেহ দয়া করাইয়া উপকার করেন। কেহ দান করিয়া উপকারী, কেন দান গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ দয়া-বৃত্তিপরিচালনার সহায়তা করিয়া উপকারী। সকলেই সকলের জন্য। প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর। ঈশ্বরের কৃপাকণা সকলের ভিতরে, সুতরাং সকলই সুন্দর, কুৎসিৎ কিছুই নাই। চক্ষের দোষে বা ধারণা শক্তির অভাবে সুন্দর পদার্থকে কুৎসিৎ বলিয়া মনে হয়। ধারণা শক্তির তারতম্যানুসারে—একজনের নিকট যাহা সুন্দর, অপরের নিকট তাহাই কুৎসিৎ। তুমি যাহাকে পুরাতন আখ্যা প্রদান করিয়া কুৎসিৎ বলিতেছে, তাহাই অপরের নিকট সৌন্দর্য্যের প্রস্রবন বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন যাহার নিকট যাহা পুরাতন হইতেছে, তখনই তাহার নিকট তাহার আদর নিবিতেছে। বিধান সকলেরই জন্য—কিন্তু সকলের জন্য একরূপ নয়। তুমি ও আমি যেমন পৃথক; তোমার দেখা ও আমার দেখাও তেমনি পৃথক। তুমি যাহাকে ভাল বলিতেছ, আমি তাহাকে ভাল বলিতে পারিতেছি না। দুই জনের দেখা একরূপ হইলে জগতে আর নূতনত্ব থাকে না;—অনন্তের অনন্তত্ব শেষ হইয়া যায়। তোমার সন্তান তোমার নিকট যেমন সুন্দর, আমার নিকট তেমন নয়। সৌন্দর্য্যের আদর্শ জগতের নরনারীর একরূপ নয়। সৌন্দর্য্য নামে কিছুই নাই,—কবিত্ব কেবল শূন্যময় জড়তা মাত্র,—সৌন্দর্য্য এবং কবিত্ব প্রেমেরই নামান্তর। প্রেমের চক্ষে দেখিতেছ বলিয়া, তোমার কুৎসিৎ স্ত্রী পুত্র তোমার নিকট সুন্দর; আমার কুৎসিৎ স্ত্রী পুত্র আমার নিকট সুন্দর। সঙ্গীতে একজনের মন মুগ্ধ হয়, একজন হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। পাহাড়ে উঠিয়া একজন কিছুই দেখেনা, এক জন অনন্ত সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যায়। একজন কোকিলের মধুর ঝঙ্কারে কত মধুর ভাব পায়, একজন কিছুই পায় না। অতএব—সুন্দর সকলই, আবার সুন্দর কিছুই নয়। এক হিসাবে সৌন্দর্য্য নামে কোন পদার্থ নাই। প্রেমই, সকলকে সুন্দর করিয়া উপস্থিত করে। প্রেম ভিন্ন সৌন্দর্য্য-বোধ মানুষের হয় না;—হইতে পারে না। প্রেম কি? না বিধাতার কৃপা কণা। প্রেম কি? না উন্নতির পথে লইয়া যাইবার একমাত্র অবলম্বন। প্রেম কি?—না—অনন্ত তত্ত্ব-সাগরে ডুবাইবার একমাত্র আশা-বায়ু। প্রেম কি?—না প্রাণে প্রাণ বাঁধিবার বিধাতার এক অমোঘ রজ্জু। প্রেম কি?—না—পৃথিবীর শক্তি, ধর্ম্মের জীবন্ত বেদ, একতার শাস্ত্র। প্রেম পায় নাই, এমন লোক পৃথিবীতে নাই, তা অল্পই হউক, আর

অধিক হউক। প্রেম পায় নাই, এমন পদার্থ নাই। প্রেম না থাকিলে কিছুরই নূতনত্ব থাকিত না। অনন্তকে লক্ষ্য করে নাই, এমন মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রেমশূন্য জীব শ্মশানের জীব,—মৃত,—গলিত, পচিত। তাহার তত্ত্ব কেহ লয় না, তাহার তত্ত্ব কেহ জানে না। একজনকেও কখন ভালবাসে নাই, এমন লোক নাই। যাহাকে তুমি আমি সকলেই ঘৃণা করিতেছি, রোগ শোকে তাহার মুখের পানে চাহিতেও লোক আছে। প্রেমের দাস সকলেই—সকলেরই হৃদয়ে প্রেম আছে। প্রেম নরনারীকে ক্রমাগত স্বীয় স্বীয় লক্ষ্য-পথে লইয়া যাইতেছে;—কাহাকে জ্ঞানী করিতেছে, কাহাকে ভক্ত করিতেছে, কাহাকে দার্শনিক, কাহাকে কবি, কাহাকে রাজা, কাহাকে প্রজা—সকলকে পৃথক পৃথক করিয়া, নূতন নূতন পথে লইয়া যাইয়া, নূতন তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে। সকল একরূপ হইলে প্রেমের মহিমা থাকিত না—অনন্ত লক্ষ্য, অনন্ত রূপ মানুষের নিকট হইতে উড়িয়া যাইত। প্রেম জগৎকে নিত্য নূতন করিতেছে! তুমি স্বীকার কর আর না কর, ঐ সর্ব্বনাশিনী, সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তি অনন্ত চক্রে ডুবাইবার জন্য তোমাকে ক্রমাগত লইয়া যাইতেছে। একটু একটু করিয়া তোমার হৃদয়কে বিশ্ব-বিস্তৃতির পথে লইয়া যাইবে। তোমার সাধ্য কি, তুমি প্রেমের হাত হইতে রক্ষা পাইবে! তোমার সাধ্য কি, তুমি নূতনের আদর বিস্মৃত হইবে? সাধ্য কি, তুমি নূতনের তীরে পৌঁছিয়া ফিরিয়া পুরাতন রাজ্যে পলায়ন করিবে? যাহা অতীত হইয়াছে, তাহাতে তুমি আর ফিরিতে পার না। তোমাকে যাইতে হইবে। ঐ প্রেম অনন্ত উন্নতির রাজ্যে অনন্ত নূতনত্বের মধ্যে তোমাকে নিমগ্ন করিবে। প্রেম, চির নূতন—আর চির নূতন প্রেমের আদর্শ স্বয়ং মা, মা ই সুন্দর, মায়ের রূপই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, মায়ের অনন্ত রূপই অনন্ত প্রকৃতিতে প্রতিফলিত। মা ই স্ত্রীর হৃদয়ে, সন্তানের মুখে জ্বলিতেছেন। তোমার আমার সাধ্য কি, মায়ের রাজ্যের মমতা ছিঁড়ি। সর্ব্বত্রই মা বিকশিত। প্রকৃতির অতুল শোভার ভাণ্ডার—মায়েরই কৃপাকণা। পাখীর কলকণ্ঠে, ফুলের সৌরভে, আকাশের চাঁদে, নদীর তরঙ্গে, বালকের হাসিতে, নারীর কান্তিতে—সর্ব্বত্রই মায়ের হাসি ফুটিতেছে। প্রেমের আর এক নাম—মায়ের করুণা; অথবা স্বয়ং মা।

এমনই করিয়া মায়ের অনন্ত স্বরূপ আবিষ্কৃত হইতেছে। অনন্তরূপিণী অনন্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়া বাহির হইতেছেন। অনন্ত প্রকৃতির মূলে এক অদ্বিতীয়। তাঁহাতেই সকলে স্থিত, জীবিত। তিনি তাঁহার শাস্ত্র পরিষ্কার ভাষায় অবিরত মানুষের চরিত্রে লিখিয়া দিতেছেন। শাস্ত্রে, তন্ত্রে, বাইবেলে, কোরাণে যে সকল সত্য আছে, তাহাও তাঁহারই প্রদত্ত, আর তোমার আমার ভিতর দিয়া যে সকল সত্য বাহির হইতেছে, তাহাও তাঁহার প্রদত্ত। অনন্তের অনন্ত বেদ, অনন্ত বেদান্ত। অনন্ত বেদান্ত অনন্ত কালে রচিত হইবে। অনন্ত সত্য—অনন্ত কালে আবিষ্কৃত হইবে। বেদরচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, যে বলে, সে সৃষ্টির অনন্ত রহস্য আজও বুঝে নাই। আমি সেই Revelationই মানি, যাহা অনন্তকালে অনন্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত

হইবে। এক যুগকে মানিতে যাইয়া অন্য যুগকে ঘৃণা করিতে পারি না। এক মহাত্মাকে মান্য করিতে যাইয়া অন্যান্য সকলকে উপেক্ষা করিতে পারি না—একটী পরমাণুকেও পারি না; সত্য ভগবানের হাতের জিনিস। সকলের ভিতর হইতে সত্যক .. বা মায়ের স্বরূপ ফুটিতেছে। কণা কণা মিশিয়াই অনন্ত উৎপন্ন হইতেছে। উইলিয়ম্ ব্লেক্ বলিয়াছেন;—"I never know a bad man in whom there was not something very good". এমারসন বলিয়াছেন:—"Every man I meet is my master in some point, and in that I learn of him". আমি বলি কেবল মানুষে নহে, প্রকৃতির সকলের ভিতরই শিক্ষার বস্তু রহিয়াছে। এমন কিছুই এই পৃথিবীতে সৃষ্ট হয় নাই, যাহার কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি এমন বিনয়কে পাপ বলি, যাহাতে মানুষের self-respect (আত্মমর্য্যাদা) কে ডুবাইয়া দেয়। আত্মমর্য্যাদা—সে ভগবানেরই মর্য্যাদা। সকলেরই ভিতরে শিক্ষার জিনিষ—ভগবানের Revealed truths রহিয়াছে। উপেক্ষার কথা, অপ্রেমের কথা; ঘৃণার কথা,অপ্রণয়ের শাস্ত্র। ও শাস্ত্র আমি মানি না। বেদে সত্য আছে বলিয়া, যে বলে, বাইবেলে সত্য নাই, সে মিথ্যা বলে। সত্য অবস্থা বা সময়ের দান। সকলের পক্ষে চিরকাল এক সত্য উপকারী নহে। যাহার জন্য যে সত্য বিধাতা প্রেরণ করেন, তাহাই সে মানুক। প্রতি মুহূর্ত্তে বিধাতা সকলের উপযুক্ত সত্য প্রেরণ করিতেছেন। আবার বাইবেলেই সকল ধর্ম্মকথা লুক্কায়িত, যে মনে করে, সেও ভগবানের ব্যক্তিগত বিধানের মূলে কুঠারাঘাত করে, সে বিধাতার বিধান মানে না; আর Revelation মোটেই মানে না। সে সৃষ্টিতত্ত্ব বা প্রকৃতিকেই অস্বীকার করে। ফুলে কথা কয়, ফলে গান গায়, আকাশ ইঙ্গিত করে, তৃণদল মানুষ স্বর্গে উঠে, এ সকল সে দেখে নাই। বাইবেলও যাঁহার, বেদও তাঁহারই প্রদত্ত। অনন্তস্বরে অনন্ত কণ্ঠে প্রকৃতির ভিতর দিয়া তালে তালে প্রতি মুহূর্ত্তে কে যেন কথা বলিতেছে। শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে, ভ্রমণে সে স্বর শুনা যায়। যে কথা যে শুনে না, সে মানুষই নয়। মানুষ কে? মানুষ কেবল তাঁহার হাতের পুতুল মাত্র। মানুষকে এবং প্রকৃতিকে যে ব্যক্তি ভগবানের হাতের জিনিষ মনে করিতে পারে নাই, সে আজও প্রেমের অভ্রান্ত বেদ বেদান্তে দীক্ষা লাভ করে নাই শ্রীগৌরাঙ্গ যাহাঁর হাতের পুতুল, মহাত্মা খ্রীষ্টও তাঁহারই হাতের; মহম্মদও তাঁহার, শাক্যও তাঁহার, মনুও তাঁহার, যোগী ঋষী, সাধু অসাধু, আমি তুমি সকলই তাঁহার। যোগী ঋষিদের জন্য যেমন সত্য প্রেরিত হইয়াছিল, আমাদের জন্যও সেইরূপ সত্য প্রেরিত হইতেছে। ধর্ম্ম, এই জন্য, যুগে যুগে বিভিন্ন হইয়াছে। পাপী পুণ্যাত্মার ভেদাভেদ অবস্থাগত পার্থক্য মাত্র। সকলের জন্য একরূপ বিধান নহে। সকল কালের জন্য একই বিধান হইতে পারে না। বিধাতার বিধান অনন্ত। কাহাকেও দোষ দেওয়া উচিত নহে। পাপী পুণ্যাত্মা সকলের ভিতরেই অবস্থানুরূপ সত্য প্রেরিত হইতেছে। পাপ পুণ্য অবস্থার সীমারেখা মাত্র,—অপূর্ণতার কোলে পূর্ণতার চিত্র মাত্র, সীমার পার্শ্বে অসীম রেখা মাত্র। "There is no virtue which is final; all are initial. The virtues of society are vices of the saint."—এমারসন এ কথা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন। প্রেমের

অভাবই পাপ। প্রেমের অভাবই অবনতি; কারণ প্রেম ভিন্ন উন্নতির পথের নেতা নাই। অবনতিই পাপ, উন্নত ব্যক্তির নিকটে, উন্নত ব্যক্তি আরো উন্নত ব্যক্তির নিকট অবনত। সুতরাং পাপী সকলেই। পূর্ণতা মানুষে নাই। অবনত যে, সেও উন্নতিতে যাইবে। উন্নতি হইতে উন্নতিতে—আরো উন্নতিতে, আরো উন্নতিতে। পূর্ণতা লাভ কখনই ঘটিবে না। পথ পৃথক পৃথক, এই মাত্র প্রভেদ। কেহ এ পথে যায়, কেহ ও পথে যায়। কেহ এ সত্য ধরে, কেহ অন্য সত্য অবলম্বন করে। কেহ ভাত খায়, কেহ রুটী খায়। কেহ বেদ মানে, কেহ কোরাণ মানে, কেহ আপনার বিবেক মানে। সকলেরই লক্ষ্য জীবন লাভ। পরস্পরকে যে ঘৃণা করে, সে মায়ের বিধান বুঝে না। ভেদাভেদ যে গণে, সে পূর্ণ প্রেমময়ী অনন্তরূপিণী ভগবতীকে বুঝে নাই। সকলের ভিতরেই তাঁহার মহিমা, তাঁহারই গৌরব, তাঁহারই লীলা তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। বেদ পড়, বাইবেল পড়, কোরাণ পড়—শাস্ত্র তন্ত্র সব পড়, —কিন্তু দেখিবে তবুও তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তোমার মন আরো যেন কি চায়। Montesquieu said :—"The love of study is in us the only eternal passion." পাও, আরো পাইতে ইচ্ছা হইবে। শিখ, আরো শিখিতে ইচ্ছা হইবে। সকল বেদ বেদান্ত তন্ন তন্ন করিলেও তোমার তৃষ্ণা মিটিবে না। তোমার জন্য যে অনন্ত ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত, তাহাতে তোমাকে ডুবিতেই হইবে। বৎসরের উপর বৎসর, যুগের উপর যুগ, কোটী যুগেও তোমার শিক্ষা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে না। অনন্ত বিধান, অনন্ত শাস্ত্র, ভগবানের প্রত্যক্ষ অনন্ত সত্য;—তাহা শেষ হয় নাই, শেষ হইবে না। জীবন্ত, অনন্ত নূতনত্ব যে না মানিল, সে বড়ই ভ্রান্ত। বেদ বেদান্তের সত্য আদরের, গৌরবের, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সকল সে সময়ের লোকের জন্য। এখনকার বিধান, এখনকার জন্য। বুদ্ধের পরে শঙ্কর, শঙ্করের পরে শ্রীচৈতন্য। মুশার পরে ঈশার জন্ম। বেদের পরে বেদান্ত। Old Testament এর পরে New Testament. নূতন কালে নূতন লোকের জন্য নূতন সত্য চাই। চিরকাল বিধাতার রাজ্যে তাহাই হইয়া আসিতেছে। যুগে যুগে নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। পুরাতন বাইবেল, পুরাতন কোরাণ লইয়া মানুষ চিরকাল উন্নতিকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। নূতনত্ব যদি তাহাতে মানুষ না পায়, তবে মানুষ তাহার আদর করিবে না। সে সময়ের যোগী ঋষীদিগের পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে—তাঁহাদের মহত্বের উপর কত শত যুগ যুগান্তের মহত্ব রাশীকৃত হইয়া পড়িয়াছে, সে সকলকে উপেক্ষা করিয়া কে কেবল উঁহাদিগকে লইয়াই থাকিবে? সকলকেই মানুষ চায়। সকলের ভিতরেই নূতনত্ব—অনন্তভাব; অনন্ত শিক্ষা;—অনন্ত তৃষ্ণা। খ্রীষ্টের উন্নত ভাবকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া মহম্মদের জীবনকে তুচ্ছ করিতে পারি না। তাঁহারা বড় হউন, মহাত্মা হউন, কিন্তু অতি ক্ষুদ্রের ভিতরেও নূতনত্ব আছে; তাঁহাকেই বা কে ভুলিয়া থাকিবে? পৃথিবী তাহা পারে নাই, পৃথিবী তাহা পারিবে না। আবার পৃথিবীর সকল সাধুদিগকে মানিতে যাইয়া নিজের জন্য ভগবানের যে বিধান আসিতেছে, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারি না।—ঘৃণা

বিদ্বেষ, প্রেমের শাস্ত্রে নাই। ভাগ মন্দ, সুন্দর কুৎসিৎ—প্রেমিকের নিকট সমান। আজ হউক, কাল হউক, পৃথিবী এ সত্য বুঝিবেই বুঝিবে, যে,—পরস্পরের ভিতরেই তাঁহার মঙ্গল সত্য সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে। উষ্ণ বালুকাময় মরুভূমিতেও স্বর্গের কুসুম মুকুলিত হইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগে যুগে তাঁহার সত্য সকল নানা বেশে, নানাভাবে Revealed হইতেছে। তিনি স্পষ্ট কথা বলেন—এই বিশাল-বিস্তৃত প্রকৃতির কাণে কাণে! তোমার প্রাণে তাঁহারই ভাষা, আমার প্রাণে তাঁহারই ভাষা। ফুলে তাঁহারই সৌরভ, ফলে তাঁহারই মিষ্টতা। বায়ু তাঁহারই কথা বলে, নদীতে তাঁহারই কথা প্রচার করে। চন্দ্র সূর্য্য তাঁহারই মহিমা ঢালে। শুষ্কত্ব কোথায়? প্রাচীনত্ব কোথায়? কেবল সরল ভাব, কেবল নবীন প্রেমের কাহিনী। সকলের ভিতর দিয়াই সেই অনন্ত মহানের গভীর প্রেমের শাস্ত্র ফুটিয়া পড়িতেছে। একজন কর্ত্তব্য শেষ করিয়া, মায়ের কথা প্রচার করিয়া, শরীর দিতেছে, আর এক জনের উপকার হইতেছে। একের শরীরের যেমন পতন অনিবার্য্য, অন্যের উত্থান তেমনই অনিবার্য্য। শরীর ভোজের বাজি, উহা কিছুই নয়, উহা প্রেমেরই খেলার ভাণ্ড। শরীর কিছুই নয়, উহা অবস্থার দাস মাত্র। শরীর কিছুই নয়, কেবল সত্য গ্রহণের অবলম্বন মাত্র। এক সত্য গ্রহণের সহিত উহা রূপান্তরিত হইয়া অন্য সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। আরো হয়, আরো হয়। হইতে হইতে ক্রম-উন্নতিতে ধায়। ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। পৃথিবী যে, দিন ২ কত উন্নত হইতেছে, তাহার পরিমাণও হয় না। যে পৃথিবীর উন্নতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কেবল প্রাচীনত্ব লইয়া পড়িয়া থাকিল, তাহার পরিণাম কে বলিতে পারে? আর যে কেবল বর্ত্তমান যুগের চিন্তায় মজিয়া, প্রাচীন কাহিনীর নূতনত্বের ভিতর নিমগ্ন হইয়া, রত্ন বাহির করিতে পারিল না, তাঁহার পরিণামই বা কে বলিতে পারে? সময়ের ভাব বুঝিয়া যে এদিক, ওদিক, একাল, সেকাল—সকলের ভিতরেই নূতনত্ব দেখিল, সেই প্রেমের শাস্ত্র বুঝিল। সেই উন্নতির পথে চলিল। আবার বলি, পাপ যদি থাকে, তবে যাহা মানুষকে বিশাল বিস্তৃত প্রেম হইতে বঞ্চিত করে, তাহাই পাপ। পাপ যদি কিছু থাকে, তবে যাহাতে পরস্পরকে ঘৃণা করিতে শিখাইয়া অবনতির পথে মানুষকে লইয়া যায়, তাহাই পাপ। কিন্তু অবনতিই উন্নতির সোপান; পাপই পুণ্যলাভের সিঁড়ি। এ হিসাবে পাপ অপরিহার্য্য। অপরিহার্য্য বলিয়াই পাপ পূজিত নহে। পাপ প্রেমের রূপান্তর—কিছু। সে কিছুতে মজিলে মানুষ অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়,—দিবস, রজনী, লাল, কাল, সকলের বিশেষত্ব-মূলক আদর তাহার নিকট লোপ পায়। এমন অন্ধের চক্ষুতে যখন আবার প্রেম চস্‌মা সংযুক্ত হইবে, তখনই আবার বৈচিত্র্য মধুময় হইবে। যে প্রেমের চস্‌মা পরিল, সে সকল বস্তুতেই ভগবানের অভ্রান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া যাইল। যে মোহিত হইল, সেই অনন্তের একসিঁড়ি উপরে উঠিল। প্রেমের চস্‌মা চথে পরিয়া দেখ, সকলই তোমার নিকট মধুময় বলিয়া বোধ হইবে। প্রেম-চক্ষে দেখ, সকলই সুন্দর, সকলই নূতন দেখিবে। নচেৎ এই

ধনধান্য পূর্ণ ধরা তোমার নিকট মৃতের ন্যায়। প্রেমের শাস্ত্রেই সৃষ্টির গভীর রহস্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রেম যে কাহাকেও পুরাণ করে না, কুৎসিৎ করে না, সে এই জন্য যে, মানুষ সকলের ভিতরেই প্রবেশ করিবে, সকলের ভিতরের লুক্কায়িত বিশেষত্বের অধিকারী হইবে। কিসের জন্য সৃষ্টি, যদি এ সকলে আমার উপকারের কিছু না থাকিবে? কিসের জন্য সকলেই আমাকে আপন আপন রূপ দেখাইতে আহ্বান করে, যদি তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমার উপকারের জন্য কিছু না থাকিবে? কিসের জন্য স্মৃতি—যদি প্রাচীন তত্ত্বে আমি নূতনত্ব না পাইব? কিসের জন্য চক্ষু, যদি এই কান্তিময়ী প্রকৃতিকে দেখিয়া আমার উন্নতির কিছু না পাইব? সৃষ্টির গভীর রহস্য এই—এক বস্তু অন্য বস্তুর জন্য সৃষ্ট। এক, অন্যের গুরু—শিক্ষক; এক, অন্যের উপকারী। বেদ বেদান্ত—সে আমারই জন্য; ঈশা মুশা—আমারই জন্য; বাইবেল কোরাণ—আমারই জন্য; চন্দ্র সূর্য্য আমারই জন্য;—পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখের, যাহা কিছু উপভোগের, সে সকলই যেন আমার জন্য। আমি ভাবিতেছি, সকলই আমার জন্য; তুমি ভাবিতেছ,—প্রকৃতির সকলই তোমার জন্য। অতএব সকলের জন্যই সকল সৃষ্ট। প্রকৃতির ভাণ্ডার সকলের জন্য অবারিতদ্বার। আমার জন্য তুমি, তোমার জন্য আমি। তুমি কেবল তোমার জন্য নও, আমিও কেবল আমার জন্য নই। আমাকে ধরিয়া তুমি চলিবে, তোমাকে ধরিয়া আমি চলিব। যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে—সে সকলই সকলের জন্য। কেহ দেয়, কেহ নেয়। কেহ দিয়া উপকার করে, কেহ গ্রহণ করিয়া উপকার করে। পাখীর কণ্ঠে স্বর আছে, কিন্তু আমার কর্ণ না থাকিলে, তাহা আমি শুনিতাম না; ফুলে সৌরভ আছে, কিন্তু আমার ঘ্রাণ শক্তি বা নাসিকা না থাকিলে আমি তাহা পাইতাম না। এই জন্য, ঐ স্বর এবং ঐ সৌরভের সৃষ্টির সহিত আমার কর্ণ এবং নাসিকার সৃষ্টি হইয়াছে। আমার হৃদয়ে দয়া আছে, কিন্তু সে দয়াবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইত না—যদি পৃথিবীর কাঙ্গাল দরিদ্র না থাকিত। একের সহিত অপরের কেমন যোগ, দেখ। সকলের সহিত সকলের যোগ। অণু অণুতে, মানুষে মানুষে, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রে সেই যোগ বিস্তৃত; সেই যোগ—মাধ্যাকর্ষণ-মহাযোগ। একের ক্ষুধা আছে, অপরের ক্ষুধা নিবারণের শক্তি আছে, এক অপরকে উদরস্থ করিয়া উন্নতির পথে হাটিতেছে। পাকস্থলী দিয়াছেন, ক্ষুধা দিয়াছেন—ক্ষুধা নিবারণের আয়োজনও রহিয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্য দিয়াছেন, তাহা পরিচালনার ক্ষেত্রও দিয়াছেন। কেমন অপরূপ প্রেমের যোগ শাস্ত্র। যাহা কিছু দেখা যায় বা দেখা যাইবে, সে সকলই পরস্পরের জন্য সৃষ্ট। গভীর যোগ—সকলের সহিত সকলের। তণ্ডুল আমারই জন্যই সৃষ্ট, আমি তণ্ডুলের জন্য সৃষ্ট। তণ্ডুল আমার উন্নতির কারণ, আমি তণ্ডুলের উন্নতির কারণ। আমি তুমি না থাকিলে তণ্ডুলের যাহা পরিণাম, তাহা ঘটিত না, আবার তণ্ডুল না থাকিলে, আমার ও তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত না, সুতরাং আমরা পরিণামের পথে হাটিতে পারিতাম না। ভাবের দাস স্থূলদর্শী মানুষেরা বৃথা তর্ক করে,—আহারের জিনিস,

মাছ, মাংস, চাউল; গম কি তোমার আমার জন্য? প্রেমের শাস্ত্রে অদীক্ষিত মানুষ মনে করে, মৃত্যুই বুঝি সৃষ্ট বস্তু বা জীবের শেষ পরিণতি! অহো, কি দুর্ভাগ্য! মৃত্যুর পর পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তু, আরো যে কত লীলা খেলিবে, তাহা কে বুঝিবে? সৃষ্টির অনন্ত চক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে। বীজ মরিতেছে, গাছ উঠিতেছে; গাছ মরিতেছে, বীজ রহিয়া যাইতেছে। বীজ ও গাছ আবার সন্তান সন্ততি রাখিয়া মাটীতে মিশাইয়া রূপান্তর ধরিতেছে। পরমাণুর রাজ্য—অনন্ত বিস্তৃত, অবিনশ্বর, ধ্বংশ রহিত। যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, রূপ-পরিবর্ত্তনেই তাহার ধ্বংশ হয় না। বিজ্ঞান, এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে। কিছুরই ধ্বংশ নাই। এমারসন সত্যই বলিয়াছেন—"There is no end in nature but every end is a beginning" ধ্বংশ এবং মৃত্যু নামে যে একটা কথা আছে, তাহা রূপ বা অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। অবিশ্বাসীর কথা আমি মানিব না। মায়েরও ধ্বংশ নাই—তাহার সৃষ্ট পদার্থেরও ধ্বংশ নাই। প্রেমের পথ ধরিবার জন্যই এক জনের ধারে আর একজনের সৃষ্টি। উপকার পাই বলিয়া, আমি এটা ওটা ধরি। উপকার পায় বলিয়া, স্বামী স্ত্রীর সেবা করে, স্ত্রী স্বামীর সেবা করে। বৃদ্ধের জন্য যুবক, যুবকের জন্য বালক। পুরুষের জন্য স্ত্রী, স্ত্রীর জন্য পুরুষ। রাজার জন্য প্রজা, প্রজার জন্য রাজা, ধনীর জন্য দরিদ্র, দরিদ্রের জন্য ধনী। একের অস্তিত্ব—অপরের জন্য। দর্শনের জন্য কাব্য, বাক্যের জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের জন্য কাব্য;—সকলই সকলের জন্য। পরস্পরকে ধরিতেই হইবে। ভাল না থাকিলে, মন্দ ভাল হয় না; মন্দ না থাকিলে ভাল আরো ভাল হয় না। অপরের জন্যই আমাকে মরিতে হইবে, আমার জন্যই অপরকে দেহ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। শিশুর কর্ত্তব্য শেষ হইলে, শিশুত্বের স্থানে অমনি বালকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দেহ বিসর্জ্জন না দিলে প্রেমের জয় ঘোষিত হয় না। সকলের জন্য মৃত্যু সকলের উন্নতির জন্য। খ্রীষ্টকে আমাদের জন্যই খাটিয়া খাটিয়া ডুবিতে হইয়াছে; এমারসনকে আজীবন চিন্তা করিয়া তোমার আমার জন্যই মরিতে বা রূপান্তর ধরিতে হইয়াছে। রবার্ট এমেটের ন্যায় শত শত বীরের রক্ত মাটীতে পড়িয়াছে, তবে সেই মাটীর উর্ব্বরতা হইতে আজ পার্ণেলমহাশক্তি উত্থিত হইয়া আয়রল্যাণ্ডে নবযুগ উপস্থিত করিতে পারিতেছে। ম্যাটসিনি যদি শরীরের মমতা করিতেন, তবে ইটালি আজ স্বাধীনতার মুখ দেখিত না। খ্রীষ্ট শরীরের মমতা না ছাড়িলে বুঝি বা পৃথিবী আজ আঁধার থাকিত। কি গভীর প্রেমে ইহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একবার ভাব। প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই বেদ, প্রেমই বেদান্ত। প্রেমের আকর্ষণে, একজন, অপরের জন্য দেহবিসর্জ্জনে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। প্রেমই শক্তি, প্রেমই স্বাধীনতা, প্রেমই জীবন। আজও পৃথিবীতে প্রেম আছে বলিয়া, পৃথিবী এত মধুর। এই জন্যই নিত্য নূতনে—মানুষ মজে। পরের জন্য দেহ বিসর্জ্জনে যে কুণ্ঠিত, সে মূর্খ। স্বার্থত্যাগেই স্বার্থ সিদ্ধি। দেহবিসর্জ্জনেই দেহ লাভ। এক অবস্থা পরিত্যাগ করিলেই অপর অবস্থা প্রাপ্তি। এক কর্ত্তব্য শেষ হইলেই অপর কর্ত্তব্য আরম্ভ। অবস্থা অনন্ত, কর্ত্তব্য অনন্ত। অবস্থার পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হয়। নূতনত্ব লাভ

নিমিষেং হয়। পুরাতনের উপরেই নূতনের বীজ উত্থিত। পুরাতন মাতার উদরেই নবসন্তানের উত্থান। পুরাতন বৃক্ষেই নব পত্র ও নবফুল অঙ্কুরিত। শিশুর পরিণতিই বৃদ্ধত্ব। পুরাতন পত্র না পড়িলে নূতন পত্রের স্থান হয় না, নূতন পত্র উদ্ভূত না হইলে পুরাতন পত্রের পরিণাম-সুখ ঘটে না। সন্তানের জন্য জীবন ক্ষয় না করিলে মাতার নবজীবন বা স্বর্গ লাভ ঘটে না। যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, ভাই, অপরের জন্য বাঁচিয়া থাক। যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, এক কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অপর কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হও। বর্ত্তমান সময়ের কর্ত্তব্য ভাবী জীবনে সম্পন্ন হইবার নহে। যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে ভাই, অপরের জন্য দেহ বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হইও না। ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে যদি বাসনা থাকে, তবে গভীর প্রেমে ডুবিয়া যাও। কিন্তু সাবধান। সোণার চাঁদ শ্রীগৌরঙ্গের গভীর প্রেম—রিপু সেবার উপকরণ রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মত্ততা প্রেমের অপকৃষ্ট অঙ্গ। মাতামাতিতে প্রকৃত প্রেমের কোন চিহ্নই নাই। যে মাতামাতিতে জ্ঞান চৈতন্য লোপ করে,—তাহা কখনও প্রকৃত প্রেমের পরিচয় হইতে পারে না। প্রেমের পরিচয়—হৃদয়ে। যাঁহার হৃদয় অপরের জন্য না কাঁদিল, তাঁহার প্রেম, প্রেমই নয়। যে অপরের চক্ষে জল দেখিয়াও তাহা মোচনের জন্য শরীরের মমতা ছাড়িতে পারিল না, মৃতের ন্যায় মোহে পড়িয়া রহিল, সে বিধাতার সৃষ্টিতত্ত্ব বা প্রেম রহস্য কিছুই বুঝে নাই। তাঁহাকে প্রেমিক বলিয়া ভুল করিও না। ভারতের অভাবের আর বাকী কি আছে? হায়, তবুও ভারতের নরনারী উদাসীন। দুঃখীর দুঃখ কে মোচন করিবে? বিধবার অশ্রু কে মুছাইবে? প্রলোভন ও পাপদগ্ধ বা রোগক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয়কে কে স্বর্গের দিকে টানিয়া আনিবে? ভাই, প্রেমে যদি মজিতে চাও, খাঁটি প্রেমের সাধনা কর। প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই ঈশ্বর। প্রেমেরই বিকাশ—অনন্ত প্রকৃতি। প্রেমের চাকুরিই সকলের লক্ষ্য। দেও, দেও, দেও, কেবল দেও। যাহা দিবার, দেও। শরীর দেও, মন প্রাণ দেও, সর্ব্বস্ব অপরের জন্য ঢালিয়া দেও। দেহ বিসর্জ্জন না হইলে এত ভূতের ব্যাগার খাটিয়া মরিতেছ কেন? কিসের আশায়? অতএব জীবন চাও ত জীবন দেও। কাহারও পথের কণ্টক হইও না—আপনাকে উদারতার রাজ্যে ছাড়িয়া দেও। যাহা লইবার লও, তাহা দিবার দেও। অন্যের জন্য মরিলেই স্বর্গ লাভ। সকল পণ্ডিতেরাই একথা বলিয়াছেন। অন্যের জন্যই মরিতে হইবে। ইচ্ছা করিয়া মরণের হাত এড়ান যায় না তুমি বুঝ বা না বুঝ, তোমার সৃষ্টি অন্যের জন্য। সকলের জন্মই সকলের জন্য। এক অবস্থা অপর অবস্থার জন্য, এক প্রাণী অপর প্রাণীর জন্য। উন্নতির পথ ভিন্ন মানুষের আর পথ নাই, এই জন্য মরিতে ভয় করিলেও মৃত্যু ছাড়ে না। জন্ম ও মৃত্যু—এ দুইই মঙ্গলের জন্য,—আমার এবং জগতের আর আর সকলের। তুমি আমি জন্মিয়াছি—আমাদের উন্নতির পথে যাইবার জন্য, এবং আমার তোমার উন্নতির সহায়তার জন্য; এবং আমরা মরিব আবার নবজীবন লাভের জন্য এবং পরস্পরের উন্নতির জন্য। প্রেমের কি গভীর শাস্ত্র! যোগেশ্বরের কি গভীর যোগশাস্ত্র! সৃষ্টির কি গভীর রহস্য!

এই জন্যই প্রেম—সকলকেই নূতন দেখায়। যাহা একজনের ভিতরে দেখায়, অন্যের ভিতরে তাহা দেখায় না। এককে অপরের সহিত মিলাইতে মিলাইতে—গভীর অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যায়। সে উন্নতি—পূর্ণতা। প্রেম অপূর্ণতা হইতে ক্রমাগত মানুষকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। উন্নতি হইতে উন্নতি, আরো উন্নতি, আরো উন্নতি, আরো পূর্ণতা, আরো পূর্ণতা—ইহাই সৃষ্টির লক্ষ্য। জন্ম মৃত্যু ভ্রম কথা—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই—অপরিবর্ত্তনীয় শক্তির আঘাতে আঘাতে মানুষ এবং সমস্ত অণু পরমাণু এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতেছে। এক অবস্থার রূপান্তর হওয়াকে—একস্থানে মৃত্যু বলে, অপর স্থানে জীবন লাভ বলে। জন্মমৃত্যু আর কিছুই নহে। যাহা অনন্ত কাল ছিল, তাহাই অনন্তকালের পথে চলিয়াছে। আসে যায়, জন্মে মরে, এসকল কথার কোনই অর্থ নাই; কেবল এক অর্থ এই, নূতনত্ব লাভ করে। সকল পদার্থই, সকল জীবই এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় যাইতেছে। এক অবস্থার কর্ত্তব্য শেষ হইলে, অপর অবস্থা প্রাপ্তি বিধির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। সকলেরই অনন্ত কর্ত্তব্য, সকলেরই অনন্ত অবস্থান্তর প্রাপ্তি। কোন অবস্থাই স্থায়ী নহে। অনন্ত মরণ, অনন্ত জীবনলাভ সকলেরই—লক্ষ্য। একেরই অনন্তরূপ এমনই করিয়া বিকশিত হইতেছে। অদ্বৈতবাদ যুক্তিসিদ্ধ এইজন্য যে, সকলই অস্থায়ী, সকলই অপূর্ণ, কেবল তিনিই স্থায়ী, তিনিই পূর্ণ;—তিনিই মূলাধার, তিনিই কায়া। দ্বৈতবাদ আরো যুক্তিসিদ্ধ এইজন্য যে—অপূর্ণ যাহা, অস্থায়ী যাহা, ছায়া যাহা, তাহাই পূর্ণ হইতে পারে না। বিন্দুই সিন্ধু নয়,—ছায়াই কায়া নয়। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ—দুয়েই সত্য আছে। আমি কিছুই নই—তিনিই সর্ব্বস্ব; এ অতি সুন্দর বিনয়ের কথা, খুব সত্য কথা। কিন্তু আমিই তিনি,—অপূর্ণই পূর্ণ, এ বড় অহঙ্কারের কথা, এ বড় মিথ্যা কথা; এই জন্যই অদ্বৈতবাদের পার্শ্বে দ্বৈতবাদ চাই। আমার অপূর্ণতা, আমার পাপ কখনই তাঁহার নহে। সকলই অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে [illegible]তেছে। ইহাকে বিকাশ বল, বা [illegible] বল, জন্ম বল, বা মৃত্যু বল, তাহাতে [illegible] আসে যায় না। সে পূর্ণতা স্বয়ং অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষ্য। তিনিই প্রেম রূপে, চিদানন্দ রূপে সকল ঘটে বিদ্যমান। যেখানে প্রেম, সেই খানেই তিনি। যাহাকে নূতন দেখিবে, তিনিই প্রেমিক। প্রেমিক মাত্রেই পূজ্য। চন্দ্র সূর্য্য, বৃক্ষ লতা, নদী সাগর, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ—প্রকৃতির যাহার ভিতরে প্রেমের তত্ত্ব দেখিবে, তাহাকেই আর্য্যঋষিদিগের ন্যায় ভক্তির সহিত প্রণাম করিবে। স্বামী স্ত্রীর গভীর ভালবাসা, ভ্রাতাভগ্নীর অকৃত্রিম স্নেহ, পিতামাতার প্রগাঢ় বাৎসল্য, এ সকলই পূজার জিনিস, এ সকলের ভিতরেই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ভগবান। প্রেমের পরিচয়—স্বার্থত্যাগে। প্রেমিক মাত্রেই স্বার্থশূন্য। শরীরের মমতা নির্ব্বাণ না হইলে, প্রেমিক হওয়া যায় না। একের জন্য অপরের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনেও একটু উৎকণ্ঠা নাই যেখানে, সেখানেই প্রেম! বটগাছের প্রেম দেখ—সে আপনাকে রৌদ্রে দগ্ধ করিয়া পথিককে রক্ষা করে। শরীর বিসর্জ্জনই প্রেমের—পণ। যেখানে এরূপ প্রেম উদিত, সেই খানেই ভগবান বিদ্যমান। বর্ষের প্রথম মাসে এস

সকলে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করি। বিবাদ, বিসম্বাদ, ঘৃণা বিদ্বেষ দূর হউক—এস, জীবন্ত দেবতাকে জীবন্ত প্রকৃতির নব নব ভাবে দেখি, আর তাঁহাতে ডুবি, ডুবি আর মজি, মজি আর আত্মহারা হইয়া জগতের সহিত মিলাইয়া একাত্মক হইয়া যাই। ২৫ কে ভারত সন্তান যদি একপ্রাণ একহৃদয় না হইতে পারে, তবে আর ভারতের মঙ্গল নাই। মায়ের সন্তান মায়ের নামে মাত। মা—চির নূতন। প্রকৃতিতে তিনিই বিকশিত। আর চিরনূতন—প্রেম। প্রেমই সৃষ্টির রহস্য। • এই রহস্যময় প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া সকলে একবার মায়ের নাম কর। পুণ্য, পবিত্রতা, একতা এবং স্বাধীনতা ভারতে আবার অবতীর্ণ হইবে।

চৈতন্য চরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪ র্থ প্রস্তাব)

চৈতন্যের অবতার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার ও পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে সাধু ভক্ত ভিন্ন ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনই গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য চৈতন্যের তিরোভাবের পর হইতে এ পর্য্যন্ত দেশ মধ্যে এই বিষয়টী লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকের মনের কুসংস্কার ও জড়তা দূর হইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় চৈতন্যাবতার কেন, অবতারবাদের মূল সূত্রেই আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন না; সুতরাং এই আন্দোলনে তাঁহাদের কোনই সহানুভূতি নাই। কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন; তাঁহারা ইহাতে অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া আসিতেছেন।

চৈতন্যের দেহত্যাগ হইতে এপর্য্যন্ত চারিশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যেও এই তর্কাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও প্রাচীনদিগের মধ্যে এই বিবাদ অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই বিবাদের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, এক দিকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিতে গিয়া গোঁড়ামীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; অপরদিকে শাক্তগণ তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্গুণাবলী বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও তিরস্কার করিতে ক্রটী করেন নাই। এক্ষণে শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ দেশ মধ্যে একটী সাধারণ প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এতই বিদ্বেষ ভাব প্রজ্জলিত হইয়াছিল যে, উভয়ে উভয়ের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি মনে করিতেন। শাক্তের ব্যবহৃত পূজা সামগ্রী ব্যবহার করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না। বিল্পপত্র ও জবার ফুল শাক্তের আদরের জিনিষ। সুতরাং বৈষ্ণব তাহাদিগকে বিদ্বেষভাবে তেকাড়কার পাতা ও ওড়ফুল বলিয়া থাকেন। আবার নিম্বকাষ্ঠের দ্বারায় গৌরাঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় বলিয়া, ও বৈষ্ণবগণ মাং-

সাদি আহার করেন না বলিয়া, শাক্তগণ সে সকল লইয়া কতই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে দেশ মধ্যে এতই রহস্য-জনক গল্প প্রচলিত আছে যে, তাহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে গেলে, এক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ইহার উপরে আবার কবিগণ শাক্ত বৈষ্ণবের কাহিনী সকল কাব্যাকারে প্রকাশ করত সাধারণের কৌতুক বর্দ্ধন ও স্ব স্ব মত প্রতিপন্ন করিতে ছাড়িতেন না। ভক্তবর রামপ্রসাদ সেন ও অচ্যুদানন্দ গোস্বামীর বিবাদ ও উত্তর প্রতি উত্তর বোধ হয় সকলেই ত শুনিয়াছেন এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে শাক্ত বৈষ্ণবের লড়াই আপামর সাধারণ সকলেই বিদিত আছেন। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই বিবাদ এতই প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য তাহার মীমাংসা করা এতই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রবাদ আছে এক সময়ে ইহার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে করলিপি করাইতে হইয়াছিল। করলিপি বা হস্ত লিপির অভ্রান্ততায় প্রায় তখনকার সকল লোকেরই বিশ্বাস ছিল। সংক্ষেপে তাহার প্রক্রিয়া এই:—কোন গুণীব্যক্তি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, এবং তাহার নিকটে বসিয়া একটী অশিক্ষিত বালক ভূমিতে হস্ত সঞ্চালন করিবে। ঐ বালকের হস্তে দিয়া যে লেখা বাহির হইবে, তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়ের সৎ মীমাংসা মনে করিয়া লইতে হইবে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কি প্রকারে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমারা কিছুই জানিতে পারি না। তবে ঐ লিপিতে যে উত্তর পাওয়া গিয়াছিল তাহা অতীব কৌতুক জনক। নবদ্বীপের রাজবংশ চিরকালই প্রসিদ্ধ বামাচারী শাক্ত; সুতরাং তাহারা গৌরাঙ্গ দেবকে কোন প্রকারেই ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হস্তলিপিতে যে উত্তর পাওয়া গেল, তাহাতে তাহাদের মতই দৃঢ়ীভূত হইল। সে উত্তর এই:—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ।"

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণও নহেন ও অংশাবতারও নহেন। যখন করলিপিতে এই উত্তর উত্থিত হইল, তখন শাক্তগণের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তাঁহারা নানা প্রকারে বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করিয়া এই মত সর্ব্বত্র ঘোষিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের বাধা জন্মিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈত বংশোদ্ভব জনৈক শাস্ত্রবিশারদ গোস্বামী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আসিয়া এই জানাইলেন যে, করলিপিতে যে উত্তর পাওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারায় চৈতন্যের অংশত্ব ও ভক্তত্ব দূরীভূত হইয়া তাহার পূর্ণত্বই স্থাপিত হইতেছে। এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের এই ব্যাখ্যা করিলেন যে, "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তোন, অংশকোন, সএব পূর্ণ ইতি।" এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। এদিকে শাক্তগণেরও মস্তক অবনত হইল, এবং বৈষ্ণবেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সকল বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চৈতন্যের প্রকৃত মহিমা দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল; এবং বাঙ্গালী জাতির প্রধান

গৌরব পাত্র অবথা তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে নীচ ও অন্ত্যজ শ্রেণী লোকের উপাস্য হইয়া থাকিলেন; ভদ্র সমাজে আর তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান থাকিল না। ইহার জন্য তাঁহার শত্রু পক্ষ অপেক্ষা তাঁহার মতাবলম্বীদিগেরই দোষ অধিক। তাঁহারা যদি গোঁড়ামী ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও শান্তভাবে তাঁহার প্রণোদিত মত সকল প্রচারে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অভিনেতাকে আজ আর এ তিরস্কার ও নিন্দাভার বহন করিতে হইত না। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া লোকে গ্রহণ না করুক, একজন অসাধারণ সাধুভক্ত বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে কোন সম্প্রদায়ই পশ্চাদ্‌পদ হইত না।

অবতারবাদের মত সকল হিন্দুজাতির অস্থিমাংসের সহিত জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে; এমন হিন্দু নাই, যিনি পরমেশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করেন না। নিরাকার ও নির্গুণ ঈশ্বরকে মানুষ জানিতে পারে না ও তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না; তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সময়ে সময়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, প্রভৃতি মত হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যে নিঃশঙ্ক ভাবে রাজত্ব করিতেছে। আজকাল এই মতের বিরুদ্ধে কখন কখন কথা শুনা যাইতেছে বটে; কিন্তু পূর্ব্ব কালে কাহার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করে? সুতরাং চৈতন্যাবতার সংস্থাপন জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতে হয় নাই। অবতারবাদের দুর্গ তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাঁহারা কেবল তাহার মধ্যে চৈতন্যকে প্রবেশ করাইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহাদের মতে অন্য অন্য সকল অবতারই ঈশ্বরের অংশাবতার, কেবল কৃষ্ণই স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সেই কৃষ্ণই আবার গৌরাঙ্গ হইয়া প্রকাশ হইয়া ছিলেন। সুতরাং গৌরাঙ্গের পূর্ণত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণেরও পূর্ণত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, তখন কৃষ্ণের পূর্ণাবতার সম্বন্ধে লোকের মনের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ ব্যতীত কোন প্রাচীন শাস্ত্রে কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করা হয় নাই। বিষ্ণু পুরাণের তো কথাই নাই, মহাভারতেও তিনি একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও যোগনিদ্রা পরায়ণ আদর্শ চরিত্র বৈ আর কিছুই নহেন। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতেরও স্থানে স্থানে তাঁহাকে ভগবান্ হরির অংশাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথাঃ—

"তাবিমৌ বৈভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।"
ভারব্যয়ায়চভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ।"

ভা। ৪ স্ক। ১ অ। ৪৫ শ্লোক।

ভগবান্ হরির সেই অংশ ভূভার হরণ নিমিত্ত সম্প্রতি এই দুই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে একজন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, অন্যজন কুরুপ্রবীর অর্জ্জুন।

ইহার উপর আবার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমগ্র হিন্দু সমাজে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হয় নাই। প্রাচীনকালের কথা থাকুক, সে দিন আমাদের চক্ষের সমক্ষে মুরসিদাবাদের খ্যাত নামা পণ্ডিত স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ

মহাশয় এই গ্রন্থ যে ব্যাস প্রণীত নহে,তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহুবিধ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গম্ভীরতর বিচার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রথমে কৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপন জন্য চেষ্টা করিয়া,তৎপরে চৈতন্যের পূর্ণাবতারত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। জীব গোস্বামি-প্রণীত কৃষ্ণ সন্দর্ভ গ্রন্থে ও চৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বিচারের অবতারণা হইয়াছে। যদি কখন অবকাশ হয়, তাহা হইলে এসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনে পড়িয়া অবতারবাদ মতের মূলে যে সত্যটুকু নিহিত রহিয়াছে, তাহাও লোপ পাইতে চলিয়াছে। সেজন্য আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমে অবতারবাদের মূল সূত্র কি, কোন্ সত্যকে অবলম্বন করিয়া তাহার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার কোন্ অংশই বা ভ্রম প্রমাদের সহিত জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে,তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। সৃষ্ট বস্তুতে পরমেশ্বরের অবতারত্ব আরোপ করার মত, সকল দেশে ও সকল সময়ে একই উপাদান লইয়া সংগঠিত হইয়াছে। যে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টীয়ান্‌গণ ঈশার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, হিন্দুগণের কৃষ্ণাদির অবতারত্বও ঠিক সেই সংস্কারমূলক। সুতরাং তাহার মূলান্বেষণ করিতে পারিলে, চৈতন্যের কেন, সকল অবতারেরই ভাব আপনা হইতেই বুঝা যাইতে পারিবে।

বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃত স্বরূপ মানব জ্ঞানের অতীত। তবে বিশ্ব সৃষ্টিতে তিনি যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছেন, মানুষ কেবল তাহাই বুঝিতে পারে। এই সৃষ্টি প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জীব সৃষ্টি ও ভূত সৃষ্টি। জড় জগতেও তিনি যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছেন, জীবগণের জীবনেও তিনি তদ্রূপ লীলা বিহার করিতেছেন। বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, চারি দিক অবলোকন করিতে থাকেন, তখন তিনি কি জড় জগতে, কি মানব জাতির জীবনে, এবং কি নিজ আত্মায়, তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। তখন তাহার হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া, চতুর্দ্দিকেই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ভক্ত তখন সৃষ্টি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া সকলই তন্ময় দেখিতে থাকেন। তখনই পরমেশ্বর তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হয়েন। 'অব' পূর্ব্বক তৃ ধাতুর অর্থ অবতরণ করা অর্থাৎ উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন করা। ঈশ্বর পদার্থ মহোচ্চ ও স্বর্গের জিনিষ, তিনি যখন মর্ত্ত্য ধামে অবতরণ করেন বা প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহার অবতার হইয়া থাকে। এই ভাবে বিশ্বাসী ভক্তের নিকট চরাচর বিশ্বরাজ্য সমস্তই তাঁহার অবতার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথারই পোষকতা পাওয়া যাইতেছে। নানাবিধ অবতারের কথা বলিয়া ভাগবতকার বলিতেছেন ;—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়াহরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ
যথা বিদাশিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ
ভা। ১স্ক। ৩অ। ২৬ শ্লোক।

হে দ্বিজগণ! সত্ত্ব নিধি হরির অবতার

অসংখ্য; যেমন উপক্ষর শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হইতে অসংখ্য অবতার হইয়াছে।

এই সকল অবতীর্ণ পদার্থের মধ্যে কাহাতে ও ঈশ্বরের প্রকাশ অধিক, কাহাতে ও বা তদপেক্ষা ন্যূন লক্ষিত হইয়া থাকে। একটি সামান্য মানবজীবনে তাঁহার যে প্রকাশ বা লীলা দেখিতে পাওয়া যায়, সাধু জীবনে তদপেক্ষা অনেক অধিকমাত্রায় উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেতেই যে তাঁহার গুণাংশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং
যস্যাংশাংসেন সৃজ্যন্তে দেবতার্য্যঙ্ নরাদয়ঃ।
ভা। ১স্ক। ৩অ। ৫ শ্লোক।

ভগবানের অবিনাশী বিরাটরূপ, সকল অবতারের বীজ স্বরূপ ও সকলের আশ্রয় স্থান। ইহারই অংশ হইতে দেবজাতি, তীর্য্যক্‌জাতি ও নরজাতি সকলেই সৃষ্ট হইতেছে।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আমূল আলোচনা করিতে পারিলে এবিষয়ের অতি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতে উপনিষদ্‌যুগের শেষ পর্য্যন্ত আমরা আর্য্যদিগের মধ্যে কোন অবতারের কথা শুনিতে পাই না। কারণ এই সময় তত ঈশ্বর সম্ভোগের কাল নহে, যত ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ের কাল। তখন আর্য্য ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, ব্রহ্ম আবিষ্কারে যত্নশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গুণ ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিবার অবসর পাইয়া উঠেন নাই। যখন ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণীত হইল, তখনই আর্য্য হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়া উঠিল। এবং ভক্তি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয় হইল। এই যুগেই আমরা নানাবিধ অবতারের কথা শুনিতে পাই। অবতারবাদ সমর্থনকারীগণ অবতারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে একটা এই যে, মানব জাতির মধ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য পরমেশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহা যদি সত্য হইত, তবে আর্য্যজাতির আদিম সময়ে যখন ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় নাই, তখনই অনেক অবতারের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রথম কালে কোন অবতারের কথাই ত শুনা যায় না। সে যাহা হউক যখন ভক্তির প্রবল তরঙ্গ ভারত ভূমিতে বহিয়া চলিতে লাগিল, তখনই মৎস্য কূর্ম্মাদি ইতর জন্তুতে, নদীপর্ব্বতাদি জড় জগতে, এবং রামকৃষ্ণাদি মানবে অসংখ্য অবতার সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটি সংখ্যা পরিপূর্ণ হইয়া বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়া গেল। সে দিনে মহানগরীর কোন পল্লীতে শীতলা পূজা হইয়াছিল। দ্বিভূজা জগধাত্রী প্রতিমার ন্যায় শীতলার প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু জগধাত্রীর বাহন সিংহের পরিবর্ত্তে একটী গর্দ্দভকে তাঁহার বাহন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শীতলার ধ্যানও মূর্ত্তি কোন্ শাস্ত্রে আছে জানি না। কিন্তু এটী যে মানব মনের ভয় যুক্ত ভক্তির ভাবহইতে সম্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেরূপ সৃষ্ট বস্তুতে ভগবানের প্রকাশ ও বিলাসই তাঁহার অবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই রূপ আবার তাঁহার গুণের রূঢ় ভাব ও (abstract quality)

অবতারে আকার ও আখ্যা প্রাপ্ত হইল। জ্ঞানপিপাসু ভক্ত, জ্ঞানপথে বিচরণ করিতে করিতে জ্ঞানরত্নাকর মধ্যে যতই নিমগ্ন হইতে লাগিলেন, সৌন্দর্য্য মুগ্ধ প্রেমিক ভক্ত, সৃষ্টি রাজ্যের সৌন্দর্য্য ও শোভা যতই সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, ততই তিনি তাঁহাকে স্বরস্বতী ও লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল দেবতা গণের ধ্যান ও মূর্ত্তি, সাধকের মনের প্রত্যক্ষীভূত ভাব, বাহিরে কথায় ও প্রতিমায় প্রকাশ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যে জীবন্ত ভাব অনুভাবিত হইয়া, এই সকল ধ্যান ও মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে ; এক্ষণে কেবল তাহার মৃত কঙ্কাল-মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে যে, মনুষ্য বিশ্বাস ও ভক্তি যোগে পরমেশ্বরের জীবন্ত আবির্ভাব যে যে বস্তুতে, পদার্থে বা মনুষ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে সেই সেই বস্তু, পদার্থ ও মনুষ্যকে অবতার বোধে উপাসনা করিয়াছে। যদি তাহা না করিয়া, সেই সেই বস্তুতে ভগবানের যে গুণের বা ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকেই পূজা করিত, এবং সেই সেই গুণ বা ভাব যে আধারকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে ঐ গুণ বা ভাব হইতে পৃথক রাখিতে পারিত, তাহা হইলে অবতারবাদ মতের মধ্যে কোনই দোষ বা ভ্রম পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীমদীশার মধ্য দিয়া ভগবানের যে যে প্রেমভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, মানুষ যদি চৈতন্য ও ঈশার জীবন্ত হইতে ঐ সকল স্বর্গীয় ভাবকে পৃথক বলিয়া, সেই সেই ভাবকে পূজা করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে * পৃথিবীতে আর নরপূজা স্থান পাইত না। কিন্তু মানুষ দুর্ব্বল, সে সাধুজীবনের জীবত্বের সহিত তন্মধ্যস্থ ঈশ্বরত্ব এবং জড়ের জড়ত্বের সহিত তদুপহিত ভগবত্তা মিশাইয়া ফেলিয়াই মহাভ্রমে পড়িয়া গিয়াছে।* ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তিকে এই বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে, যেন তিনি একদিকে জড়পূজা ও নরপূজা ভ্রমে পতিত না হয়েন, এবং অপর দিকে ভগবানের গুণাবতার সকলকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মাকে কলুষিত না করেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যকে স্বয়ং পরমেশ্বর পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং যুক্তি ও শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের দ্বারা ঐ মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরমেশ্বর অচিন্ত্য ক্ষমতাশালী, সুতরাং ইচ্ছা কারণে মানবরূপে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে, এই পুরাতন যুক্তিটীই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বনীয়। ইহার অযৌক্তিকতা দেখাইবার আবশ্যক নাই। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, এই যুক্তির মূলে কোন সার নাই। সর্ব্বশক্তিমত্তার এইরূপ অর্থ করিতে গেলে

* জীবের মধ্যেই দেবতা দেখাই অবতারবাদের মূল সত্য ; আবার জীবত্বে দেবত্ব আরোপ করাই তাহার ব্যভিচার। এই সূত্রানুসারে ভগবত-গুণের আংশিক প্রকাশ বা অংশাবতার সম্ভব ; কিন্তু পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণাবতার একেবারে অসম্ভব। কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না।

যে পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকেনা, তাঁহার স্বরূপ সকল যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং তিনি যে জন্মমরণাদি মানবধর্ম্মের আয়ত্ত হইয়া প্রকৃত মানবরূপে পরিণত হইয়া যান, ইহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবেনা। পরন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহার স্বরূপ সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হইতে পারিত, তবে তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ও লোপ হইতে পারিত। একি ভয়ানক মীমাংসা! অবতারত্ব রাখিতে গিয়া শেষে নাস্তিকতার সিদ্ধান্তে উপস্থিত। ইহাকেই বলে দেব গড়িতে বানর গড়া। যাহাহউক শাস্ত্রকারদিগের চক্ষে এ যুক্তির অসৌসাদৃশ্য লুক্কায়িত ছিলনা। নতুবা অষ্টাদশ পুরাণপ্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কেন এই কথা বলিয়া নিজ দোষ ক্ষালন করিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবেন।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বার্ণতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বঞ্চবিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ মদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।

হে জগদীশ! তুমি রূপহীন, অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্বব্যাপী; আমি বিকল চিত্ত হইয়া ধ্যানাদির দ্বারা তোমার রূপকল্পনা করিয়াছি, স্তুতি আদি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয়তা নিরাকৃত করিয়াছি, এবং তীর্থাদিতে তোমার ব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তুমি তাহা ক্ষমা কর।

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব স্থাপনের জন্য যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এপ্রস্তাবের আলোচ্য নহে। চৈতন্য সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিব। এই সকল প্রমাণের মধ্যে আবার কতকগুলি বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে ও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদিগেরই নির্দ্দেশ তত উপযুক্ত প্রমাণ হইতে পারে না। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। সমস্ত মহাভারতের মধ্যে চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। শান্তিপর্ব্বের অনুশাসনপর্ব্বাধ্যায়ের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া রূপ গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, উহা গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্লোকটি এই--

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।

বিষ্ণুর সহস্র নাম প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, অন্যান্য নামের মধ্যে তাঁহার এই সকল নামও নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা, তাঁহার সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ ও সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; তিনি চন্দন তিলকধারী, সন্ন্যাসকারী ও নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ।

মহাভারত গ্রন্থে দেখা যায় যে, ঐ শ্লোকটি কোন একটি শ্লোকের উদ্ধৃতাংশ নহে। অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৯ অধ্যায়ের দান ধর্ম্মের ৯২ শ্লোকের প্রথম পাদ, ও ৭৫ শ্লোকের দ্বিতীয়পাদ লইয়া উহা সংগঠিত হইয়াছে ঐ শ্লোক দুইটি এইঃ--

সুবর্ণ বর্ণোহেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
বীরহা বিষমঃ শূন্যো ধৃতাশীব চলশ্চলঃ।

তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তিনি হেমাঙ্গ চন্দনের অঙ্গদ ধারী, অসুরনাশকারী তাঁহার সমান কেহ নাই, তিনি শূন্য অর্থাৎ নিরাকার, এবং অগ্নির ন্যায় চঞ্চল। ৯২।

ত্রিসামাসামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্
সন্ন্যাসকৃচ্ছসশান্তোনিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ।

তিনি ত্রিবেদী, সামবেদ গায়ক, সামস্বরূপ, নির্ব্বাণস্বরূপ, ঔষধস্বরূপ, এবং ভিষক; এবং সন্ন্যাসকারী শমগুণ বিশিষ্ট, শান্ত এবং নিষ্ঠাপরায়ণ। ৭৫।

এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন যে যে মহাভারত প্রণেতা চৈতন্যাবতার লক্ষ্য করিয়া, এই সকল নামাবলী বলিয়াছিলেন কিনা? এবং বিভিন্ন শ্লোকের বিভিন্ন স্থান লইয়া ঐরূপ শ্লোক সংগঠন পূর্ব্বক তাহা উদ্ধার করা সঙ্গত হইয়াছিল কিনা?

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া চৈতন্যাবতার সংস্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্লোক দুইটি এইঃ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ।

ইহার প্রথমটী ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায়ের নবম শ্লোক। নন্দভবনে গর্গাচার্য্য যাইয়া কৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে নন্দকে বলিতেছেন যে, "হে নন্দ, তোমার এই পুত্রটী প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ইহার শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ইহার নাম শ্রীকৃষ্ণ হইবে।" বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, অতীতকালের প্রয়োগ, আসন্" ক্রিয়ার ভবিষ্যতের ন্যায় অর্থ হইবে, এই অর্থ ধরিয়া শ্লোকস্থ পীতবর্ণ শব্দ গৌরাঙ্গাবতারে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা মহামান্য শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যার বিপরীত ও কষ্টার্থ কল্পনামাত্র।

দ্বিতীয়টি একাদশ স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের ২৯ শ্লোক। কলিযুগের ধর্ম্ম বর্ণনায় চমস ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুযায়ী ইহার অনুবাদ এইঃ—"কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতি বিশিষ্ট এবং সাঙ্গ উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ (অর্থাৎ কৌস্তুভ, সুদর্শন, সুনন্দাদি) সহিত অবতীর্ণ হয়েন। তখন বিবেকী মনুষ্যগণ সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারায় তাঁহার অর্চ্চনা করেন।" স্বামী স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা কলিযুগে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য দর্শিত হইয়াছে। অধিকন্তু যে সকল নামোল্লেখ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তাহাতেও চৈতন্যাবতারের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। অথচ বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের সংকীর্ত্তন ও সাঙ্গোপাঙ্গাদি শব্দ দেখিয়া এবং কৃষ্ণবর্ণ ও "ত্বিষা কৃষ্ণ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া চৈতন্যোদ্দেশে ঐ শ্লোক প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কাল রং যার কিন্তু "ত্বিষা কৃষ্ণ" অর্থাৎ কান্তি ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়। বৈষ্ণবগণ বলেন যে 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইবর্ণ যাহার মুখে উচ্চারিত হয় এবং যাহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত। কোন্ পক্ষের অর্থসরল ও স্বাভাবিক তাহা পাঠকেরাই বিচার করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে এই কবিতাটী দেখিতে পাওয়া যায়।

ধ্যায়ন্‌কৃতেযজন্‌ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে হর্চ্চয়ন্‌
যদাপ্নোতিতদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং।

সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি করিয়া এবং দ্বাপরযুগে পূজা করিয়া, অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, কলিযুগে কেবল মাত্র কেশবকে সংকীর্ত্তন করিলে সেই ফল পাইতে পারে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কেহ যদি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অবতারত্ব সংস্থাপন পক্ষে প্রয়োগ করেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ হয়, বৈষ্ণবদিগের উদ্ধৃত উপরি উক্ত প্রমাণ গুলিও কি সেইরূপ হইতেছে না।

প্রকৃত কথা এই যে, যদি ভাগবতকার চৈতন্যাবতার লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেন, তাহা হইলে এরূপ অস্পষ্ট ও পরোক্ষ ভাবে কোন কথার নির্দ্দেশ থাকিত না। কলিযুগের শাক্য সিংহ কোন্‌ স্থানে কাহার গর্ভে জন্মিবেন, এপর্য্যন্ত যিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন, তখন চৈতন্য সম্বন্ধে কি তিনি কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না *? ইহা কখনই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইতে পারেনা।

যদি কোন বচন প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল তন্ত্রে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে প্রথম কালীন মহামহোপাধ্যায় অশেষ শাস্ত্রদর্শী গোস্বামীপাদ মহোদয় তাহা উদ্ধৃত করিতে ক্রটী করিবেন না। তাঁহারা যে ঐ সকল তন্ত্র ও পুরাণ পাঠ করেন নাই, তাহা ও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাঁহাদের যেরূপ শাস্ত্রানুসন্ধিৎসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের নিকট যে ঐ সকল শাস্ত্র অবিদিত থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত বচন গুলি যে নিতান্ত আধুনিক, ও স্বকপোলকল্পিত তাহা বুঝা যাইতেছে। শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

নববর্ষ উপলক্ষে বন্ধুদিগকে তাম্বুলোপহার।

(১)

সংসারের ভীষণ প্রকৃতি, পেয়াদা স্বরূপ ঈশ্বরের নিকট আমাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া যায়; ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য মনোমোহন গায়কের ন্যায় আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে।

(২)

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অবিহিতাচারী হইলে তাহাদিগকে রিপু বলা যায়। রিপু-সকল মনের রোগ। কি কি রিপু মনের কি কি রোগ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কাম—কুষ্ঠ।

ক্রোধ—সাময়িক উন্মাদ।

লোভ—জঠরাগ্নি।

---

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ নিবাসী পর লোকস্থ ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় কোন কোন উপপুরাণ ও উর্দ্ধাম্নতন্ত্র নামক অপরিচিত তন্ত্রের নামকরণে আরও কতকগুলি প্রামাণ উদ্ধার করিয়া চৈতন্যের পূর্ণত্ব স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

মোহ—মূর্চ্ছা।

মদ—শোথ (অহঙ্কার আত্মাকে ফুলায়)।

মাৎসর্য্য—মৃদু আত্মক্ষয়কারী জ্বর।

(৩)

রিপুগণ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হইলে, তাহারা আত্মার অতি স্বাস্থ্যবিধায়ক বৃত্তি হয়।

রিপু—প্রকৃত বিষয়।

কাম অথবা কামনা—ঈশ্বর

ক্রোধ—রিপুসকল যেমন অন্যান্য রিপুর উপর ক্রোধ করিবে, তেমনি ক্রোধের উপর ক্রোধ করা কর্তব্য, তাহা হইলে ক্রোধ দমন হয়।

লোভ—মুক্তি

মোহ—ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য।
(তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হও)

মদ—ধর্ম্মের জন্য কে কত অপমান সহ্য করিতে পারে, এই বিষয়ে অহঙ্কার।

মাৎসর্য্য—আত্মাতে পাপের উন্নতির প্রতি ঈর্ষা।

(৪)

যেরূপ রিপুদিগের প্রতি ক্রোধ করিবে তেমনি পীড়ার প্রতি ও ক্রোধ করিবে। কি! পীড়া ব্যাটা আমাকে পরাভূত করিবে, তাহার এম্‌নি সাধ্যি? এইরূপে পীড়ার উপর ক্রোধ করিবে। পীড়াকে তুচ্ছ করিলে পীড়া কাবু হইয়া আইসে, আর পীড়ার দ্বারা কাবু হইলে পীড়া আমাদিগকে আরো চাপিয়া ধরে। যো পাইলে কেহই ছাড়ে না।

(৫)

দুঃখকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, যে সুখী হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়, সে সুখী হয় যেহেতু আনন্দই আত্মার প্রকৃতি। যেমন প্রস্তর দ্বারা প্রস্রবণের মুখ রুদ্ধ থাকিলে তাহার জল নিঃসৃত হয় না, তেমনি আত্মাস্থিত আনন্দের প্রস্রবণ, স্বাভাবিক সাংসারিক দুঃখ দ্বারা রুদ্ধ থাকিলে, তাহা হইতে আনন্দ নিঃসৃত হয় না। জ্ঞান দ্বারা দুঃখরূপ প্রস্তর উঠাইয়া লও, তাহা হইলে তাহা হইতে আনন্দ আপনা হইতে ফুর্ ফুর্ করিয়া নির্গত হইবে।

(৬)

মন বড় বিশ্রী জানোয়ার। মনকে ভোগা দিয়া কাজ করিবে। যখন কোন কার্য্য করিতে অনিচ্ছা হয়, তখন মনকে চাপ্‌ড়ে চুপ্‌ড়ে বলিবে, "হে মন! তোমাকে বেশীক্ষণ এই কাজ করিতে হইবে না। আপাততঃ দশ মিনিট কর দেখি, তাহা হইলে হইবে।" দেখা যায়, দশ মিনিট করিলে আরো করিতে ইচ্ছা হয়। যখন কোন কঠিন নীরস বিষয় অধ্যয়ন করিতে অনিচ্ছা হয়, তখন মনকে বলিবে "হে মন! তুমি দুই ঘণ্টা এই বিষয় অধ্যয়ন কর, তাহার পর আদ ঘণ্টা নয় তোমাকে ডিকেন্সের নবেল পড়িতে দিব", এইরূপে মনকে ক্রমে ক্রমে লওয়াইবে।

(৭)

কিছু কর তাহাহইলেই তুমি ব্রাহ্ম। কিছু করিবে না, অথচ ব্রাহ্ম! মজার লোক দেখ্‌চি।

(৮)

বিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক স্থলে উত্তর না দিয়া কেবল চুপ করিয়া থাকিয়া স্বীয়কার্য্য সাধন করিয়া লন। বিজ্ঞ ব্যক্তির নীরবতা অর্থপূর্ণ।

(৯)

বিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক স্থলে মৌনাবলম্বন শ্রেয়স্কর মনে করেন; কাঁহাতক তিনি লোকের সহিত মারামারি করিবেন? কেবল চুপ দ্বারা অন্য পক্ষকে কার্য্য করিতে বাধ্য করাতে বিলক্ষণ মজা আছে।

(১০)

মুখস্য চোটাং আমরা অনেক কথা বলি যাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয়। এই বিষয় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। বাক্য চাঁদি; নীরবতা সোনা।

(১১)

কলমস্য চোটাং আমারা অনেক কথা লিখি, যাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয়। এবিষয়েও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

(১২)

চিড়ে কাঁচকলা স্বরূপ বিশ্বজনীনতা এবং স্বদেশপ্রেম অথবা অসাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা এই দুয়ের মিল সাধন করা বড়ই কঠিন। মানুষ সাম্প্রদায়িক না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু আবার সাম্প্রদায়িক থাকিয়া অসাম্প্রদায়িক হইতে হইবে। বড় কঠিন কার্য্য কিন্তু ইহাই মনুষের কর্ত্তব্য।

(১৩)

ভালোর বেলাটি তুমি ঈশ্বরের হস্ত হইতে লইবে, আর মন্দের বেলাটি লইবে না! কি ঈশ্বরপ্রেম, গো!

১৪

ঈশ্বর সাধককে কি গুণ করেন যে সে এক মুহূর্ত্তও তাঁহা ছাড়া থাকিতে পারে না।

(১৫)

পৃথিবীর যত মজা ধার্ম্মিকেরা লুটিয়া লয়েন

(১৬)

ইহা আমাদিগের অল্প সৌভাগ্য নহে যে আমরা যখন খুসি তক্ষণাৎ এই সাপ ব্যাঙ, ডাঁস মশা এবং বিষ্ঠামূত্রের জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া তথাকার অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা, শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতে পারি।

(১৭)

মত বিরোধ জন্য কাহারো প্রতি ক্রোধ করিবার আমাদিগের অধিকার নাই। সে ব্যক্তি যাহা সত্য মনে করিতেছে, তাহা আমি সত্য মনে না করিতে পারি। কিন্তু সে তাহা সত্য মনে করিয়া বাধ্য হইয়া তাহা বিশ্বাস করিতেছে। তাহার কি দোষ যে, তাহাকে আমি ফাঁসি দিতে প্রস্তুত হই?

(১৮)

ঈশ্বর-গত প্রাণ ব্যক্তির ফুর্সৎ কোথায়, যে তিনি পাপচিন্তা অথবা পাপকার্য্য করিবেন?

(১৯)

ধর্ম্মের অর্থ আর কিছু নয়, আমরা ঈশ্বরের জিনিষ, ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা।

(২০)

একে দুঃখময় পৃথিবীতে অবস্থিতি, তাহার উপর পাপ করিলে গোদের উপর বিষফোড়া উঠে।

(২১)

দোকানদারীর হিসাবে দেখিতে গেলেও ইন্দ্রিয়সুখ সাধন অপেক্ষা ধর্ম্মসাধন লাভের।

(২২)

জগতে নিরানন্দের কোন কারণ নাই। মায়া বেটি, মোহ বেটা ও অজ্ঞান জানোয়ার সকল দুঃখেরই কারণ।

(২৩)

আত্মার আনোন্দোদ্ভাবনী শক্তি আছে। সে দুঃখের মধ্যেতে অবস্থিত হইয়াও ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির বর্ত্তমান শোভা এবং মানব স্বভাবে বিদ্যমান উত্তম গুণ চিন্তা করিয়া, এবং শেষোক্ত বিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত কোন সাধু ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া, আপনাতে আনন্দ উদ্ভাবন করিতে পারে। যখন নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মনকে বলি 'লোক্‌সান হচ্চে, লোক্‌সান হচ্চে, আনন্দোদ্ভাবন।'' আনন্দ ভোগের উদ্দেশ্যেই জীব সৃষ্ট হইয়াছে এই জন্য বল লোক্‌সান হচ্চে।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

প্রার্থনাতত্ত্ব।

(প্রথম প্রস্তাব।)
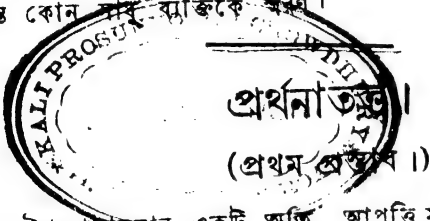
প্রার্থনা ঈশ্বরোপাসনার একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দেশে দেশে, যুগে যুগে, সাধকগণের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পরমেশ্বরের সিংহাসনতলে প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে। প্রার্থনাবলে দুর্ব্বল বল লাভ করিয়াছে, পাপাসক্ত পবিত্র হইয়াছে, ভীরু অভয় হইয়াছে, শোকার্ত্ত সান্ত্বনা পাইয়াছে। প্রার্থনা বলে দুরতিক্রমনীয় বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া কোটি কোটি নর নারী মুক্তি পথে অগ্রসর হইহইয়াছে। তথাচ বর্ত্তমান্ সময়ে, অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে, প্রার্থনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায়। প্রার্থনাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, প্রার্থনার বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল যুক্তি শ্রুত হওয়া যায়, তাহার বিচার করা, এবং প্রার্থনাতত্ত্বে বিশ্বাস করিবার প্রকৃত কারণ কি, প্রার্থনার ভিত্তিমূল কোথায়,—নিরূপণ করা আবশ্যক।

পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্,
তবে প্রার্থনা কেন?

প্রথমতঃ। প্রার্থনা সম্বন্ধে এই একটি আপত্তি সর্ব্বদাই শুনা যায় যে, পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তবে প্রার্থনা কেন? তিনি যখন জানেন যে, আমার কি কি অভাব আছে, এবং সেই সকল অভাব পূর্ণ করিবার ক্ষমতাও যখন তাঁহার আছে, তখন আমার প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি?

কৃষক বলিতে পারে যে, পরমেশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তখন আমি কৃষিকার্য্য করিব কেন? তিনি জানেন আমার কি অভাব আছে, এবং সেই সকল পূরণ করিয়া দিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে, তবে কেন আমি হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া থাকি না? ছাত্র বলিতে পারে যে, পরমেশ্বর জানেন যে, আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছামাত্রে আমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি উহার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিব কেন?

কৃষক ও ছাত্রের কথায় সকলেই বলিবেন যে, পরমেশ্বরের নিয়ম এই কৃষিকার্য্য করিলে শস্যোৎপত্তি হয়, তাহা না করিয়া আলস্য পরবশ হইয়া বসিয়া থাকিলে

কি তিনি আকাশ হইতে শস্য ফেলিয়া দিবেন? বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য মানসিক পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা না করিলে কি কেহ বিদ্বান্ হইতে পারে? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে পারে?

যথার্থ কথা। যেমন চাষ করিলে শস্যোৎপত্তি হয়, গ্রন্থাধ্যয়ন করিলে বিদ্যা লাভ হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের জন্য প্রার্থনায় যে, সে অভাব দূর হয় না,—আধ্যাত্মিক মঙ্গল লাভ হয় না,—কে বলিল?

প্রার্থনার ফল আছে কিনা, তাহাই কেবল দেখ। যেমন কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্য পাই, গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা বিদ্যা লাভ করি, সেইরূপ যদি প্রার্থনা দ্বারা আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তবে কেন বলিব না যে, শস্যলাভ সম্বন্ধে কৃষিকার্য্য যেমন, বিদ্যালাভ সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ যেমন, আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রার্থনাও সেইরূপ?* সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যেমন বলিয়া দিয়াছেন, চাষ করিয়া শস্য লাভ কর, মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বিদ্যালাভ কর, সেইরূপ কি তিনি বলিয়া দিতে পারেন না, প্রার্থনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন কর? তিনি যে বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহাই স্বীকার করিব, ও তদনুসারে কার্য্য করিব। ঘাড়ের দিকে চক্ষু নাই বলিয়া কি বাস্তব চক্ষুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিব? অথবা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিব?

* ভৌতিক ও সংসারিক বিষয়ে প্রার্থনা যুক্তিসিদ্ধ কি না, এস্থলে তাহার বিচার করিব না। আধ্যাত্মিক অভাব মোচনের জন্য প্রার্থনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

পরমেশ্বর কি মানুষের কথা শুনিয়া কাজ করেন?

দ্বিতীয়তঃ। পরমেশ্বর কি আমার কথা শুনিয়া কাজ করেন? যে ধর্ম্ম এমন কথা বলে, তাহা উপধর্ম্ম। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভব নহে। ভক্তকে ব্রহ্মা বর দিলেন যে, সে যাহার যাহার মাথায় হাত দিবে, সেই মরিবে। ভক্ত যখন বর পরিক্ষা করিবার জন্য বরদাতার মস্তকে হাত দিতে গেলেন, ব্রহ্মা প্রাণভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিলেন! ত্রিভুবন ঘুরিয়াও কোথাও রক্ষা পাইবার স্থান পান না! অশ্বত্থামার নিকট বিল্বপত্র পাইয়া আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া মহাদেব শিবির দ্বার ছাড়িয়া দিলেন, পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্রগণের প্রাণ গেল! স্বর্ণময় গোবৎস পূজায় অনুরক্ত দেখিয়া ক্রোধান্ধ যিহোবা ইস্রায়েলগণকে সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন; মুসা আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহা করিলে মিশরবাসিরা অখ্যাতি করিবে, এবং তিনি (যিহোবা) ইব্রাহিমের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশ আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় ও সমুদ্রের বালির ন্যায় বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত করিয়া দিবেন, তাহা ভঙ্গ করা হইবে। যিহোবা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মুসা তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিলেন। *

* And the Lord said unto Moses, Go, get thee down; for thy people which thou broughtest out of the

এ সকল পৌরাণিক উপন্যাস মাত্র, কল্পিত দেবতার পক্ষে উহা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু যিনি অনন্ত, অসীম, তিনি কি কীটস্য কীট মানুষের কথায় ভুলিয়া যাইতে পারেন? মানুষের পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করেন? তাঁহার ইচ্ছার উপরে হস্তক্ষেপ করে কাহার সাধ্য! তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হয়, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলাই আমাদের কার্য্য। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, তবে প্রার্থনা কেন? আমরা বলি কেমন করিয়া জানিলে প্রার্থনা তাঁহার ইচ্ছানুগত নহে?

প্রার্থনা ব্যতীত কি উন্নতি হয় না?

প্রার্থনাহীন কি উন্নতি করিতে পারেন না? প্রতিজ্ঞাবলে কি উন্নতি হয় না? প্রতিজ্ঞার বল কে না স্বীকার করিবে? সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রবল ইচ্ছা শক্তিদ্বারা যে ধর্ম্ম-জীবনের অনেক বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা যায়, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবলে উন্নতি হয়, স্বীকার করিলে কি প্রার্থনার আবশ্যকতা উড়িয়া যায়? কোন বিশেষ কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে একটি উপায় স্বীকার করিলে কি আর একটির আবশ্যকতা অস্বীকার করা হয়? ঠেলা গাড়ী আছে বলিয়া, কি গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায় না? গরুর গাড়ী আছে বলিয়া, কি ঘোড়ার গাড়ীর প্রয়োজন নাই? ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া যায় বলিয়া, কি রেল গাড়ীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে? কিন্তু এস্থলে ইহাও বলি যে, প্রতিজ্ঞা বলে ধর্ম্মজীবনের প্রতিবন্ধক নিচয় কতক পরিমাণে বিদূরিত হয় বলিয়া যে, তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। জীবনের পরীক্ষায় সাধক বুঝিতে পারেন যে, হৃদগত গভীর প্রার্থনাব্যতীত, কেবল প্রতিজ্ঞাবলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ করা যায় না। জীবনের পরীক্ষায় যাহা বুঝা যায়, শুষ্ক তর্কে তাহা

---

land of Egypt, have corrupted *themselves*:

They have turned aside quickly out of the way which I commanded them: they have made them a molten calf, and have worshiped it, and have sacrificed thereunto, and said, these be thy gods O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt.

And the Lord said unto Moses, I have seen the people, and, behold, it is a stiff-necked people:

Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them: and I will make of thee a great nation.

And Moses besought the Lord his God, and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with great power, and with a mighty hand?

Wherefore should the Egyptians speak, and say, for mischief did he bring them out, to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce wrath, and repent of this evil against thy people.

Remember Abraham, Isaac and Israel, thy servants to whom thou swearest by thine own self, and saidst unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it for ever.

And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people.—*Exodus. Chapter* XXXII.

কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? কিন্তু প্রতিজ্ঞার বল স্বীকার করিলেও যে, প্রার্থনার আবশ্যকতা উড়িয়া যায় না, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

প্রার্থনা ও নিয়ম।

সন্দেহবাদীরা বলেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিভাগই অখণ্ডনীয় নিয়মে চলিতেছে, তখন প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? যে বিষয়ের যে নিয়ম তাহাই প্রতিপালন করিতে হইবে। নিয়মানুসারে চলিলেই ফললাভ হয়। প্রার্থনার প্রয়োজন কি?

এই আপত্তিটির মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমত দেখা আবশ্যক, নিয়ম কাহাকে বলে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। সূর্য্য কিরণ সমুদ্রজলে পতিত হইল; বায়ু অপেক্ষা বাষ্প লঘু, সুতরাং বাষ্প উর্দ্ধগামী হইয়া আকাশে উঠিয়া মেঘ হইল। শীতল বায়ুর সহিত মেঘরূপী বাষ্পের সংস্পর্শ হওয়াতে উহা পুনর্ব্বার জল হইয়া মাধ্যাকর্ষণগুণে ভূমিতলে পতিত হইল। লোকে বলিল বৃষ্টি হইতেছে। যখনই জলের সহিত উত্তাপের যোগ হয়, তখনই জল বাষ্প হয়; যখনই জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখনই উহা উর্দ্ধগামী হয়; যখনই উর্দ্ধগত মেঘরূপী বাষ্পে শীতল বায়ু সংলগ্ন হয়, তখনই উহা আবার জলের আকার ধারণ করে; এবং যখনই উহা জলরূপে পরিণত হয়, তখনই মাধ্যাকর্ষণ গুণে ভূমিতলে পতিত হয়। ভগবানের জলের কল এইরূপে চলিতেছে। নিয়মানুসারে নিরন্তর এই প্রকার ঘটিতেছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত। শুষ্কতৃণ অগ্নিতে দিলে দগ্ধ হয়। যখনই শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে দেও, তখনই উহা দগ্ধ হয়। ইহা নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে।

বহির্জ্জগতে যেমন, মনোজগতেও সেইরূপ। ভাবসঙ্গ (Associatian of ideas) একটি মানসিক নিয়ম। বিপরীত পদার্থ পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্ফীতোদর স্থূলদেহ লোক দেখিলে, কৃশব্যক্তিকে স্মরণ হয়; বড় দুঃখের সময়, সুখের অবস্থা স্মরণ হয়; সদৃশ পদার্থ পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি স্থূলদেহ দেখিলে আর একটি স্থূলদেহ স্মরণ হয়; একটি দুঃখ আর একটি দুঃখকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কারণ ও কার্য্য পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দগ্ধ পদার্থ ও অগ্নি পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সংযুক্ত পদার্থের একটি মনে হইলে আর একটি মনে হইতে পারে। একটি বাড়ী মনে হইলে তাহার পার্শ্বের বাড়ী মনে হয়। যে কোন প্রকারে হউক, পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলে একটি আর একটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কোন পরিবারের একটি লোক দেখিলে, সেই পরিবারের অন্য লোককে মনে হইতে পারে। এই ভাবসঙ্গ একটি নিয়ম।

অনেক স্থলে একটি নিয়ম দ্বারা আর একটি নিয়ম অতিক্রান্ত বা প্রতিরুদ্ধ হয়। পৃথিবী তোমাকে আপনার দিকে টানিতেছে; অথচ তুমি উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া উঠিতে পার। শুষ্ক তৃণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়; কিন্তু আর্দ্রতৃণ দগ্ধ হয় না। এক খানা রুমাল অগ্নিতে ফেলিয়া দিলে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সুরাসারে ভিজাইয়া দিলে যেমন রুমাল তেমনি থাকে। অনেক বাজিওয়ালা এইরূপে দর্শকগণকে আশ্চর্য্য করিয়া থাকে। বাজিওয়ালাদিগের অদ্ভুত ক্রিয়া

সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুঝিনা বলিয়াই আশ্চর্য্য হই।

তবে নিয়ম কি? বৈজ্ঞানিকেরা কাহাকে নিয়ম বলেন? আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির কার্য্য কখন বিশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয় না। আজ এক প্রকারে, কল্য অন্য প্রকারে; এখন এক প্রকারে, তখন অন্য প্রকারে হয় না। অদ্য সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদয় হইল, কল্য পশ্চিমে উঠিতে পারে, অদ্য শীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে, কল্য তপ্তাঙ্গার তৃষ্ণা দূর করিতে পারে; চূর্ণ ও হরিদ্রায় এখন লোহিতবর্ণ হইতেছে, তখন হয় তো কৃষ্ণ বর্ণ হইতে পারে; সংসার এরূপ বিশৃঙ্খল স্থান নহে। সমান কারণের সমান কার্য্য, সকল সময়ে হইবেই হইবে। এই যে অপরিবর্ত্তনীয় সমান ভাবে প্রকৃতির কার্য্য চলিতে দেখা যাইতেছে, (uniformity observed in the cause of nature,) ইহারই নাম নিয়ম।

প্রকৃতির কার্য্য ও পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

প্রকৃতির কার্য্য প্রণালীর নামই যদি নিয়ম হইল, তবে জিজ্ঞাসা করি, এই কার্য্যপ্রণালী বাস্তবিক কাহার? যে প্রকারে প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে,—প্রাকৃতিক ব্যাপারের যে প্রণালী,—উহা কাহার কার্য্য প্রণালী? আস্তিক মাত্রেই বলিবেন, উহা পরমেশ্বরের কার্য্য প্রণালী,—প্রকৃতির কার্য্য মাত্রই পুরুষের কার্য্য। প্রকৃতির স্বাধীন সত্বা নাই, পুরুষের সত্বাতেই প্রকৃতির সত্বা, পুরুষের কর্ত্তৃত্বেই প্রকৃতির কার্য্য।

তবে যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহাই পরমেশ্বরের নিয়ম। তাঁহার ইচ্ছা শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ড সেই প্রকারে বা সেই নিয়মে চলিতেছে। তবে জগতের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার নিয়ম স্বতন্ত্র নহে; তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার নিয়ম একই। প্রাকৃতিক নিয়ম ও ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে ভিন্নতা কোথায়?

যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন যে, প্রার্থনা নিয়মবিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রার্থনা কোন নিয়মের বিরুদ্ধ? শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক, যত প্রকার নিয়ম আছে, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তন্মধ্যে কোন নিয়মটি অতিক্রম করা হয়? পর্য্যন্ত কোন প্রার্থনা বিরোধী তাহা প্রতিপন্ন করেন নাই

পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে প্রার্থনা বিরোধীকে জিজ্ঞাসা করি, কেমন করিয়া জানিলে যে, প্রার্থনাই তাঁহার একটি আধ্যাত্মিক নিয়ম নহে? জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়; বাষ্প শীতল হইলে জল হয়; ক্ষুধার সময় অন্ন গ্রহণ করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া শীতল জল পান করিলে তৃষ্ণা দূর হয়, সেইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রেম ও পবিত্রতা লাভ হয়। কেন বলিব না, যে এই সকল গুলিই পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়? জল বাষ্প হওয়াতে যেমন নিয়ম, প্রার্থনা দ্বারা আধ্যাত্মিক মঙ্গল লাভেও সেই রূপ নিয়ম। একটি স্থলে নিয়ম স্বীকার করিবে, আর একটি স্থলে করিবে না কেন?

প্রার্থনা, অনুগ্রহ ও নিয়ম।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর যখন বিনা প্রার্থনায় সহস্র সহস্র বিষয় আমাদিগকে দান করিতেছেন,—তিনি

যখন করুণাময়,—তখন আবার প্রার্থনা কেন ?

যথার্থ কথা। তিনি আমাদিগের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াই আমাদিগকে প্রতিনিয়ত অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছেন। সেই জন্যই সাধক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে বলেন, "না চাহিতে দিয়াছ সকল" কিন্তু এই যে প্রার্থনা করিবার শক্তি ও অধিকার, ইহা কি তাঁহার একটি নিরুপম অনুগ্রহ নহে ?

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আমি নিয়ম করিলাম যে, আমার পুত্র অযাচিত রূপে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইবে, কেবল কোন কোন বিশেষ বিষয়, (মনে করুন, তাহার পড়িবার পুস্তক, লিখিবার কাগজ ইত্যাদি) আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে হইবে। যদি আমি এরূপ নিয়ম করি, অন্যায় করা হয় কি না ? স্থূলদর্শী লোকে মনে করিতে পারে যে, উহা অন্যায়। কিন্তু উহার মধ্যে বাস্তবিক কি আমার কোন গূঢ় শুভাভিপ্রায় থাকিতে পারেনা ?

নিশ্চয়ই পারে। পিতার অযাচিত কৃপা লাভ করিলেই যে, পিতা পুত্রে সদ্ভাবসঞ্চার হয়, সংসারে সর্ব্বদা এরূপ দৃষ্ট হয় না। অনেক পরিবারে দৃষ্ট হয় যে, পিতা পুত্রে যেন আলাপ নাই, অনেক স্থলে পিতার অযাচিত অনুগ্রহে ডুবিয়া থাকিয়াও, পুত্র তাহা অনুভব করিতে পারেনা। পিতার লক্ষ টাকার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াও কৃতজ্ঞ হইতে পারেনা। কিন্তু যে পুত্র পিতার নিকট গিয়া আপনার অভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহে তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারে, সে অধিকতর কৃতজ্ঞ হয়, অথবা হইবার সম্ভাবনা। অন্তত পিতার সঙ্গে তাহার আলাপ হয় ; পিতার সহিত সম্বন্ধ সে অধিকতর রূপে অনুভব করে।

বিশ্বপিতার অযাচিত কৃপায় আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি। কিন্তু কয় জন লোক তাহা অনুভব করে ? যখন বিপদে পড়ি, চারিদিক্ অন্ধকার দেখি, অনন্যগতি হইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করি, যখন তাঁহার করুণাহস্তে বিপদজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তখন কাহার না হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয় ? কে চক্ষের জল নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে ?

আমি যদি নিয়ম করি যে, আমার পুত্র কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবে, তাহাতে কি আমার কোন গূঢ় অভিপ্রায় থাকিতে পারেনা ? ঐ প্রকার চাহিয়া লওয়াতে আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ সে অধিকতর অনুভব করিবে, পিতাপুত্রে আলাপ হইবে, এই গূঢ় শুভাভিপ্রায় কি উহাতে থাকিতে পারেনা ? জগৎপিতাও কি এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনার নিয়ম করিতে পারেন না, যে, তাহা হইলে তাঁহার মানব সন্তানগণ তাঁহার নিকট আসিবে, তাঁহার সঙ্গে তাহাদের আলাপ পরিচয় হইবে ? আত্মপ্রভাব অনেক সময় মানুষকে অহঙ্কারী করে, কিন্তু ভগবানের দ্বারের ভিখারী হইলে, তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় বিনয় ও কৃতজ্ঞতা আসিয়া অবতীর্ণ হয়।

এস্থলে একটি কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে প্রার্থনা পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়মের বিরোধী নহে। আমি যদি নিয়ম করি যে, আমার পুত্র কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ আমার নিকট চাহিয়া লইবে, এবং

আমার পুত্র যদি তদনুসারে তাহা চাহিয়া লয়, তাহাতে কি আমার নিয়ম বা ইচ্ছার প্রতিরোধ করা হয়, না, আমার নিয়ম বা ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করা হয়? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উহাতে আমার পুত্র আমার নিয়মানুসারেই কার্য্য করে, আমার ইচ্ছার অনুগত হইয়াই চলে। উহাতে পিতা ও সন্তানের ইচ্ছার সম্মিলন হয়, পরমেশ্বরের ও মানুষের ইচ্ছা বিপরীত পথে চলে। তিনি বলিতেছেন, পশু প্রকৃতির উপরে উঠিয়া দেবত্ব লাভ কর; মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া অনেকস্থলে পশুর অধম হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া জীবের হিতসাধনে প্রাণ মন সমর্পণ কর, মানুষ আপনার ক্ষুদ্র সুখ, আপনার ক্ষুদ্রদুঃখে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মসন্তানের সেবারূপ পরম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। এই ইচ্ছার অসম্মিলনই অধর্ম্ম। এই ইচ্ছার অসম্মিলন পিতাপুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করে। প্রার্থনা ইচ্ছার সম্মিলন সাধন করে; প্রার্থনা পুত্রকে পিতার নিকট লইয়া যায়।

সেইরূপ যদি পরমেশ্বর নিয়ম করিয়া থাকেন যে, তাঁহার সন্তান তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া লইবে, তাহা হইলে, যখন মানুষ আপনার দুর্গতি দূর করিবার জন্য, প্রেম পুণ্য লাভ করিবার জন্য, তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তাঁহার নিকট প্রার্থী হয়, তখন তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, মানুষ তাঁহারই নিয়মানুগত হইয়া কার্য্য করে। পিতা পুত্রের সম্মিলন সাধিত হয়।

আমার পুত্র যখন আমার নিকট আসিয়া তাহার জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনোপযোগী পুস্তক প্রভৃতি চাহিয়া লয়, তখন তাহার ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছার মিলন হয়। সেইরূপ মানুষ যখন জগতের পিতার নিকট প্রেম ও পুণ্য প্রার্থনা করে, তখনও মানুষের ইচ্ছা ও তাঁহার ইচ্ছার মিলন হয়। কি পার্থিব পিতা, কি স্বর্গীয় পিতা, উভয় স্থলেই পিতা পুত্রের ইচ্ছার মিলন।

ক্ষুধার্ত্ত শিশু যখন মাতার নিকট দুগ্ধ প্রার্থনা করে, তখন শিশুর ইচ্ছা ও মাতার ইচ্ছার মিলন হয়। জগতের মাতার ইচ্ছার সহিত তাঁহার সন্তানগণের ইচ্ছার বিরোধ যত নষ্ট হয়, তাঁহার ইচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছা যত একীভূত হয়, ততই আমাদের মঙ্গল, ততই আমরা মুক্তিপথে অগ্রসর। যে ভগবদ্ভক্ত সাধু আপনার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করেন যে, তাঁহার ইচ্ছা ও পরমেশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে বিরোধ নাই, নদী সমুদ্রের ন্যায় উভয় ইচ্ছা সম্মিলিত হইয়াছে, তিনিই বলিতে পারেন, "আমি এবং আমার পিতা এক" "I and my father are one"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার বর্ব্বর জাতি।

(২)

মণিপুর হইতে উভয় পার্শ্বে যে গিরিমালা বিস্তৃত হইয়া বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাতে নানা জাতীয় বর্ব্বরের বাস। ত্রৈপুর বা কিরাত

হইতে ত্রিপুরার নামকরণ হইয়াছে এবং মগেরা চট্টগ্রামের অধিবাসী। চট্টগ্রামবাসী বর্ব্বর দিগকে নদীপুত্র ও গিরিপুত্র দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে, যে নদীতটে বাস করে, সেই নদীর নামানুসারে তাহার নামকরণ হয়। সাধারণত নদীবাসীগণ জুমিয়াও চকমা মগ নামে খ্যাত। নদীবাসীগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত।

জুমিয়ারা বিভিন্ন গ্রামে বাস করে। প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন সর্দ্দার বা রোয়াজা আছে। রোয়াজা কর আদায় করিয়া রাজাকে দেয়। কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণদিকবাসী নদীপুত্রগণ ভোমোঙ্গ রাজার প্রজা, রাজধানী বন্দার বন। কর্ণফুলীর উত্তরদিক্‌বাসীগণ মোঙ্গ রাজার প্রজা। প্রত্যেক পরিবার বৎসরে চারি হইতে আট টাকা পর্যন্ত কর দেয়। ব্যাধ, পুরোহিত, অবিবাহিত, বিধবা ও স্ত্রী-শূন্য দিগকে কর দিতে হয় না। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক প্রজাকে বৎসরে তিন দিন রাজসংসারে বেগার দিতে হয় এবং চাসের প্রথম শস্য রাজার প্রাপ্য। রোয়াজার সম্মান যত, লাভ তত নাই। প্রজারা তাহাকে মনোনীত করে। ছোট ছোট মোকদ্দমা তাহাকে মিমাংসা করিতে হয়, তজ্জন্য উভয় পক্ষের নিকট তিনি কিছু পয়সা পান এবং কর আদায় জন্য রাজাও কিছু হিসাবানা দিয়া থাকেন।

জুমিয়ারা বৌদ্ধ, তথাপি গিরি ও নদী, দেবতা বা নাটের পূজা করিয়া থাকে। বিশেষ উপলক্ষ না হইলে ইহারা আপনারাই গৌতমকে ফুল দিয়া পূজা করে। প্রত্যেক গ্রামে একটী খিয়ং বা ঠাকুরঘর আছে। গাছের ছায়ায় মাচার উপরে ঠাকুর ঘর প্রস্তুত হয়। ঠাকুর ঘরের সম্মুখে বালকদিগের খেলিবার স্থান। প্রতি দিন সকালে কুমারীরা গৌতমের জন্য ফুল ফল, ও অতিথীর জন্য আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া ঠাকুর ঘরে রাখিয়া দেয়। ঠাকুর ঘরের প্রাচীরে কাষ্ঠ ফলক লম্বিত থাকে। গ্রাম্য বালকেরা তাহাতে লিখিতে শিখে। কৃষি-কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর আট নয় বৎসরের বালকদিগকে ঠাকুর ঘরে আনিয়া দীক্ষা দিতে হয়। মস্তক মুণ্ডন করিয়া পীত-বস্ত্র পরিয়া বালকেরা পুরোহিতের চারি পার্শ্বে গোল হইয়া বসে। যাহার যেমন সাধ্য প্রত্যেকের সম্মুখে পুরোহিত্‌বিদায় রাখিতে হয় এবং প্রত্যেকের সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলে। বালকেরা অঞ্জলি বাঁধিয়া বসে এবং পুরোহিতের উপদেশ মত মন্ত্র পাঠ করে। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে বালকেরা শিষ্যরূপে সাত দিন ঠাকুর ঘরে বাস করে। এই সাত দিন পুরোহিতের মত গম্ভীর হইয়া থাকিতে হয়। খেলিতে নাই ও লঘু আহার করিতে হয়। পুরুষেরা কেহ কেহ কোন মানস করিয়া বা ব্যাধি আরোগ্য হেতু জীবনে দুই তিন বার এইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের দীক্ষা নাই।

জুমিয়ারা কাপড়ের উপর একটি জ্যাকেট পরে এবং মাথায় পাগড়ী বাঁধে, জুতা পরে না। মেয়েরা পেটীকোট পরিয়া বুকের উপর আধহাত প্রশস্ত একখান কাপড় বাঁধিয়া রাখে। ইহারা উৎসব উপলক্ষে মাথায় একখান রঙ্গিন রুমাল বাঁধিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে হাতে বালা ও কাণে ইয়ারিং দেয়। কাণের পাতায় ছিদ্র করিয়া সকলে তাহাতে ফুল

গুঁজিয়া রাখে। কাঁচের মালা মেয়েদের বড় শোভনীয়।

যুবকেরা স্বয়ং কাহাকে মনোনীত না করিলে পিতা মাতা বিবাহের পাত্রী স্থির করিয়া দেয়। বিবাহ সুখের হইবে কি না, নানা দৈবলক্ষণ দখিয়া স্থির করিতে হয়। বিবাহ স্থির হইলে, পাত্রীকে একটা পেটীকোট ও একটা আঙ্গটী দিতে হয়। ওঝা লগ্ন করে। তখন একখানা চিঠি লিখিয়া এক একটা মুরগী পাঠাইয়া কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। দরিদ্র হইলে মুরগীর পরিবর্ত্তে এক একটা পয়সা দিলেও চলে। লগ্ন দিনে বরের আত্মীয় স্বজন স্ত্রীপুরুষ সুসজ্জিত হইয়া পাত্রীর গ্রামে উপস্থিত হয়। সেখানে বর কন্যা একত্র একটী আসনে বসে, গ্রামের সকলে আসিয়া দেখিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় বর পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হয়। একটী ঘটে আম্র পল্লব ও চাউল রাখিয়া নূতন সূতা দিয়া ঘেরিয়া দিতে হয়। বর কন্যা সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলে, সেই ঘট লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। ইহা তাহাদের স্ত্রী আচার। তখন পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পাঠ করে এবং এক মুঠা ভাত লইয়া একবার বরের, একবার কন্যার মুখে দেয়। তাহার পর বরের ডান হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি কন্যার বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির সহিত গ্রন্থি করিয়া দেয়। আর কয়েকটী মন্ত্র পড়িলে বিবাহ সমাপ্ত হয়। হিন্দুর সপ্তপদী গমনের মত অঙ্গুলিগ্রন্থি জুমিয়া ও চক্‌মা বিবাহের প্রধান ও সার অঙ্গ।

জুমিয়ারা মৃত দেহ দাহ করে। কাহারও মৃত্যু হইলে, এক জন আত্মীয় মাদোল বাজাইতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা চিৎকার করে। ধনী ও নারীর মৃত দেহ শকটে, ও দরিদ্রের শব আত্মীয়স্কন্ধে শ্মশানে লইয়া যায়। আত্মীয়স্বজন পুরোহিতের বিদায়ের জন্য খাদ্য ও বস্ত্র সঙ্গে দেয়। পুরোহিত সশিষ্য উপস্থিত থাকে। গ্রামের মেয়েরা বেশভূষা করিয়া সঙ্গে যায়। স্ত্রীলোকের চিতা চারিস্তরে ও পুরুষের চিতা তিনস্তরে সাজাইতে হয়। নিকটতম আত্মীয় মুখাগ্নি করে। চিতা ভস্ম সংগ্রহ করিয়া কবর দিতে হয়। কবরপার্শ্বে একটী বাঁশে নিশান বাঁধিয়া দেয়।

কোন জাতি কর স্পর্শ করিয়া, কেহ মস্তক ঘ্রাণ করিয়া, কেহ চুম্বন করিয়া অভিবাদন করে। জুমিয়া মগেরা গালের উপর নাক ও মুখ রাখিয়া নিশ্বাস টানিয়া লয়। গ্রাম শাসনের জন্য ইহারা যেমন রোয়াজ নিযুক্ত করে, তেমনি বালকদিগকে শাসন করিবার জন্য এক জন বালক নিযুক্ত করিয়া থাকে। তাহাকে গুং বলে।

চট্টগ্রাম বাসী পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে চকমা মগেরা সংখ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চকমাদের এক সম্প্রদায়ের নাম দৈগনাকি। চকমারা বলে, তাহারা হিন্দু বংশ সম্ভূত। চাম্পানগরের হিন্দু রাজ-কুমার মগধ অধিকার করিয়া তদ্দেশে বাস করেন। তাঁহার অনুচরেরা দেশীয় রমণী বিবাহ করে। এই রূপে চকমাদের উৎপত্তি হয়। মাগধেরা বৌদ্ধ ছিল। সেই জন্য চকমারা বৌদ্ধ হইয়াছে। চকমারা চল্লিশ গোত্রে বিভক্ত। গোত্রকে ইহারা গোজা বলে। গোত্রের সর্দ্দারের নাম দেওয়ান। দেওয়ান জ্ঞাতিদিগের নিকট মাচুট আদায় করিয়া, আপনার হিসাবানা কাটিয়া লইয়া, অবশিষ্ট অর্থ রাজাকে পাঠাইয়া দেয়। ছোট ছোট মোকর্দ্দমার বিচার দেওয়ান করে। গোত্র

অতি বৃহৎ হইলে দেওয়ান কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত করে। তাহাদের নাম খেজা। খেজাদের কোন খাজনা দিতে বা বেগার খাটিতে হয় না। কিন্তু বৎসরে একবার, চাউল, এক চোঙ্গা মদ ও একটা মুরগী দেওয়ানকে নজর দিতে হয়।

বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুদিগের সংসর্গে চকমারা দুর্গা ও লক্ষ্মী পূজা শিখিয়াছে। বৎসরে ইহাদের আটটী পর্ব্ব। বিষু, টুমুটং, হোইয়া, নবান্ন, মাগিরী, খের, সুমলাঙ্গ এবং সোংবরা। বৈশাখ মাসে বিষু। এই দিন নর নারী সকলে মহামুনির মন্দিরে গিয়া গৌতমের পূজা করে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র তিন মাসে চতুর্মাস্য সাধন করিতে হয়। পুরোহিতেরা একস্থানে তিন মাস থাকে। এবং গৌতমের গুণ গর্ব্ব ও ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে। চতুর্মাস্য অন্তে, টুমুটং উৎসব। ধান পাকিবার সময়, মাগিরী। শস্যের কোন হানি না হয়, এজন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। পৌষ মাসে হোইয়া ও নবান্ন উপলক্ষে বড় ঘটা। বন ও নদীদেবতা বা নাট পূজার নাম সোংবলা। বোধ হয়, এইটী চকমাদের প্রাচীনতম উৎসব। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বতন পুরোহিতেরা নাট পূজায় যোগ দেয় না, বরং নিন্দা করিয়া থাকে। ভক্ত স্বয়ং ওঝা দ্বারা নাটদিগের অর্চ্চনা করে।

সন্তান হইলে, প্রসূতীর এক মাস অশৌচ। ছেলে হইলে বাজী পোড়ায় ও আমোদ করা হয়, মেয়ে হইলে কিছুই হয় না। নামকরণে কোন উৎসব হয় না, পূর্ব্বপুরুষ কাহারও নামে সন্তানের নামকরণ হয়। চকমাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স হইলে, পুরুষের বিবাহ হয়। ছেলে ও কর্ত্তা মিলিয়া পাত্রী স্থির করে, তাহার পর এক বোতল মদ লইয়া পাত্রীর বাড়ী উপস্থিত হয়। দৈব লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বিবাহের শুভাশুভ নির্ণয় হয়। বিবাহ স্থির হইলে, পাত্রীকে একটী আংটী দিতে হয়। এক একটী কন্যার মূল্য একশত, দেড় শত টাকা। স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া বাজনা বাজাইয়া পাত্রী আনিতে যায়। বিবাহের কোন বিশেষ আচার নাই। বর পক্ষ পাত্রীর বাড়ীতে যাইয়াই পাত্রীকে লইয়া আসে। পাত্রের বাড়ী আসিয়া একটা পাত্রে চাউল, কলা, ডিম ও মিঠাই রাখিয়া, বর কন্যা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করে। বরের পার্শ্বে শ্যালক ও কন্যার পার্শ্বে শ্যালিকা বসে। সেই সময় সকলে বলে উহাদের দুই জনকে বাঁধিয়া ফেল। আদেশ পাইয়া শ্যালক ও শ্যালিকা রেশমী চাদর দিয়া বাঁধিয়া ফেলে। তখন বর কন্যাকে এবং কন্যা বরকে খাওয়াইয়া দেয়। অনন্তর প্রধান ওঝা আসিয়া নদী জলের ছিটা দিয়া ও একটী মন্ত্র পড়িয়া উভয়কে বিবাহিত বলিয়া ঘোষণা করে। পরদিন দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে সম্ভাষণ করে। এই সময় শ্বশুর জামাতাকে এইরূপ উপদেশ দেয় "আমার মেয়ে বালিকা, গৃহ কর্ম্ম জানে না, ইহাকে তোমার হাতে দিলাম। তুমি লও। যদি কোন খারাপ কর্ম্ম করে, শিখাইয়া দিও, মারিও না। কিন্তু তিন বছরেও যদি না শিখে, তখন প্রহার করিও, কিন্তু মারিয়া ফেলিও না।" যুবক যুবতী প্রণয়ে পড়িয়া যদি একবার পলায়ন করে, পিতা পাত্রের নিকট কন্যা দাবি করিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পলায়ন করিলে

তাহাদের বিবাহে আর কাহারও আপত্তি থাকে না। কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাকে অপহরণ করিলে, তাহার জরিমানা হয় ও কন্যার গ্রামের বালকেরা তাহাকে প্রহার করে। কাহারও বিবাহিতা পত্নীর সহিত ব্যভিচার করিলে, বিবাহের খরচ ও জরিমানা দিতে হয়। গ্রামের পঞ্চায়েতেরা বিবাহ ভঙ্গের মোকর্দ্দমার বিচার করে এবং অপরাধীর দণ্ড দেয়। সাধারণত ব্যভিচার অতি অল্প হয়। দৈগ্‌নাক জাতির অবিবাহিতেরা মণ্ডপে একত্র রাত্রী পাত করে। চকমাদের মধ্যে এ প্রথা নাই। চকমরা মৃতদেহ দেহ দাহ করে। পুরুষকে পূর্ব্বমুখ করিয়া পাঁচস্তরে চিতা সাজাইয়া ও নারীকে পশ্চিম মুখ করিয়া সাত স্তরে চিতা সাজাইয়া দাহ করিতে হয়। দেওয়ান কি পুরোহিতের মৃতদেহ রথে চড়াইয়া দুই দিকে দড়ি বাঁধিয়া দুই দল লোক বিপরীত মুখে টানিতে থাকে। একদল স্বর্গের, অন্য দল নরকের প্রতিনিধি। স্বর্গ পক্ষ বিজয় লাভ করে। দেহ ভস্ম হইলে বাজী পোড়ান হয়। মৃত ব্যক্তির ঘরের একটা খুঁটী মৃতদেহের সহিত দাহ করিতে হয়। চিতাভস্ম নদীজলে ফেলিয়া দেয়।

প্রণয় ঘটিত অপরাধ ভিন্ন অন্য অপরাধ ইহাদের মধ্যে বিরল। ঐ প্রকার অপরাধের দণ্ড বাঁধা আছে। জরিমানার টাকা রাজা ও পঞ্চায়েতের মধ্যে ভাগ হয়। চুরির কথা প্রায় শুনা যায় না। বড় বড় মোকর্দ্দমা মহা পরীক্ষায় নিষ্পত্তি হয়। গৌতমের মন্দিরে এক সের চাউল রাত্রীতে রাখিয়া প্রভাতে অপরাধীকে খাওয়াইতে হয়। নির্দ্দোষীর চাউল চিবাইতে কোন কষ্ট হয় না। দোষী হইলে মুখ দিয়া রক্ত উঠে। জরিমানা দিতে অক্ষম হইলে, গোলামী করিয়া ক্রমে দেনা শোধ করিতে হয়। গিরিপুত্রদিগের মধ্যে ত্রৈপুর বা কিরাত, কুমী এবং পুনাই সম্প্রদায় বিখ্যাত। পর্ব্বতের চূড়ায় ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। পুরুষের পরিধেয় অতি সামান্য এবং রমণীর পেটী কোট হাঁটুর নীচে নামে না। স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া নাচিতে ইহারা বড় ভালবাসে। নাগাদিগের মত ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সংসারের অধিকাংশ কর্ম্ম করে। ইহারা নাট পূজা করে। ইহারা বড় নিষ্ঠুর। ভক্তি শ্রদ্ধা জানে না। রাজা বা প্রধান কাহকে প্রণাম করে না। সম্ভাষণ, নমস্কার বা ধন্যবাদের প্রতিশব্দ ইহাদের ভাষায় নাই, দা, চাউল, জল, তুলা ছুঁইয়া ইহারা শপথ করে। শপথের উপর বড় বিশ্বাস। অবিবাহিত অবস্থায় যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বিবাহ হইলে সতীত্ব রক্ষা করিতে হয়! ব্যভিচারের দণ্ড, মৃত্যু। দুই পক্ষ রাজী হইলে পঞ্চায়তে বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। ইহারা গোলাম পোষে কিন্তু গোলামকে যত্ন করিয়া থাকে। ইহারা রাজাকে খাজনা দেয় না। এক এক বাড়ী হইতে এক সলি চাউল ও এক কলসী গুড় দিতে হয়। গ্রামের মধ্যে সর্দ্দার প্রধান। প্রত্যেক গ্রাম স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। গ্রামের মধ্যে মড়ক হইলে, নূতন সূতা দিয়া গ্রামটী ঘেরিয়া বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিয়া নাটের নিকট বলী দিতে হয়। এবং প্রসাদী পশুর রক্ত গ্রামের চারিদিকে ছড়ায়।

পুরান, নাবাতিয়া, অসুই ও রিয়াং, কিরাতেরা এই চারি দলে বিভক্ত। রিয়াঙেরা সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য। কিরাতেরা কৌপীন ও পাগড়ী পরে। কৌপীনের অগ্র-

ভাগ সম্মুখে অল্প পরিমাণে ঝুলিয়া থাকে, শীতকালে একটা জামাও পরিয়া থাকে। বিবাহ হইলে মেয়েরা কেবল একটী পেটীকোট পরে। কুমারীরা বুকে একখান রঙ্গিন কাপড় জড়াইয়া পরে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই লম্বা চুল পশ্চাৎ ভাগে খোঁপা বাঁধা এবং উভয়েই ইয়ারিং পরে। খোপা বড় করিবার জন্য মেয়েরা পরচুলও পরে। কৈরাতেরা নাট পূজা করে, নাটের নিকট শূকর, মহিষ, ছাগল ও মুরগী বলিদান দিতে হয়।

বিবাহের সময় নাটের উদ্দেশে একটী শূকর মারিতে হয়। মা এক গেলাস মদ মেয়েকে দেয়, মেয়ে বরের কোলে বসিয়া নিজে অর্দ্ধেক খায় ও বরকে অর্দ্ধেক দেয়। তারপর মগদের মত কড়ে অঙ্গুল দুটি জড়াইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। বিবাহের সময় নৃত্যগীতের বড় ঘটা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের মত লইয়া বিবাহ করিতে হইলে, পাত্রকে বিবাহের পূর্ব্বে তিন বৎসর শ্বশুর বাড়ী চাকরী করিতে হয়। এ তিন বৎসরে সে পাত্রীর প্রতি স্বামীরমত ব্যবহার করিতে পারে; কিন্তু বিবাহ রাত্রিতে চুপে চুপে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় এবং তার পর চারি দিন শ্বশুর বাড়ী যাইতে নাই। কিরাত রমণী বিবাহের পূর্ব্বে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু ভিন গোত্রে নহে। এবং কুমারী গর্ভবতী হইলে তাহাকে বিবাহ করিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ব্যভিচার জন্য পিতা মাতা বিরক্ত হয় না, বরং কন্যার প্রণয়ী বলিয়া যুবককে আদর করিয়া থাকে। বিবাহ ভঙ্গ করিতে হইলে পঞ্চায়তের সম্মতি লইতে হয়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কিরাতের মৃত দেহ বাড়ীর বাহির করিয়া প্রান্তরে রাখিতে হয় এবং একটা মুরগী মারিয়া কিছু চাউলের সহিত শবের পার নিকট রাখিতে হয়। তাহার পর নদীতটে যাইয়া মৃত দেহের সৎকার করা হয়। প্রান্তরে যেখানে মৃত দেহ রাখা হইয়াছিল, সৎকারান্তে সাত দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রেত দেবতার উদ্দেশে একটী মুরগী মারিয়া চাউলের সহিত সেখানে রাখিয়া দিতে হয়। অনন্তর একমাস পরে, এক বৎসর পর্য্যন্ত চিতাক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ঐ রূপ উপহার দিতে হয়। চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া পাহাড়ের উপরে একটা কুটীরে মৃত ব্যক্তির অস্ত্র শস্ত্র ও অলঙ্কারের সহিত রাখিয়া দিতে হয়। নদী পারে কাহারও মৃত্যু হইলে, প্রেত পুরুষ বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারে না। এজন্য এপার ওপার করিয়া একটা সূতা বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহার অবলম্বন করিয়া কিরাত প্রেত নদী উত্তীর্ণ হয়। ওঝারা কিরাতদিগের পুরোহিত।

পার্ব্বতীয় জাতিদিগের মধ্যে, কিরাতগণ মিথ্যাবাদিতার জন্য বিখ্যাত। চাউল, তুলা, জল, অস্ত্র ছুঁইয়া ইহারা শপথ করে। শপথ করিয়া কেহ কোন দ্রব্য দাবি করিলে, তাহা তাহারই বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিরাতেরা কাঠে কাঠে ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করে। রাত্রীতে গাছ তলায় থাকিতে হইলে, কিরাতেরা গাছের গুঁড়িতে কয়েকটা কোপ মারিয়া থাকে। ইহারা বলে, তাহা হইলে গাছে সমস্ত শিশির শুষিয়া লয়। মানুষের গায় লাগে না। কিন্তু প্রাতঃকালে বিপরিত দিকে আর কয়েকটা কোপ মরিতে হয়। নতুবা

গাছের নাট বিরক্ত হইয়া বিপত্তি ঘটাইতে পারে। গাছ, নদী ও পাহাড়ে নাটের ন্যায়, ইহারা আগুণেও নাট আছে বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহার পূজা করে।

কুমীর বোমং রাজাকে প্রতিগ্রহ হিসাবে বৎসরে তিন কাটা খাজানা দেয়। অন্যান্য পার্ব্বতীয় দিগের ন্যায় ইহাদেরও প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন প্রধান আছে। কুমীরা বড় সমরপ্রিয়। ইহারা পর্ব্বতের উচ্চ স্থলে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কাঠের বেড়া দিয়া সমস্ত গ্রামটী ঘেরিয়া ফেলে। গ্রামে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার, দুর্ভেদ্য কবাট সংযুক্ত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিবার পথেও শত্রুর জন্য অনেক বিঘ্ন বাধা ব্যবস্থিত থাকে এবং মাঝে মাঝে প্রহর গৃহে এক এক জন প্রহরী দিবা নিশি অবস্থান করে। গ্রামটী বাঁশের জঙ্গলে বেষ্টিত এবং নদী, বর্শ্ম কণ্টক বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কখন কখন উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় ইহারা এক একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করে। তাহার মধ্যে থাকিয়া পঁচিশ ত্রিশ জন লোক তলার ফুটা দিয়া শত্রুর প্রতি তীর বা গুলি-চালাইতে পারে।

বাঁশের বেড়া দিয়া ও তাল পাতার মত এক প্রকার বন পাতায় ছাইয়া কুমীরা ঘর তৈয়ার করে। মাচার মেজে মাটী হইতে ছয় হাত উচ্চ। এক একটী ত্রিশ হাত লম্বা ও পনের হাত প্রশস্ত সেই একটী ঘরে সমস্ত পরিবার বাস করে। ঘরের ভিতরে এবং বাহিরে দ্বারের উপর মৃগয়াহত হরিণের শৃঙ্গ, বরাহের দন্ত, বণ্ডধেনু বা ভল্লুকের চর্ম্মলম্বিত থাকে।

কুমীরা নাটের পূজা করে। কাপ্তেন লুইনের সহিত কুমী সর্দ্দারদিগের সন্ধি স্থাপন সময় সর্দ্দারেরা একটী ছাগল আনিয়া তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া দড়িটা সাহেবের হাতে দিল এবং পিছনের পায় আর এক গাছা দড়ি বাঁধিয়া সর্দ্দারেরা ধরিল। দুই দিক হইতে দড়ি টানিতে লাগিল। এমন সময় প্রধান সর্দ্দার মুখে মদ লইয়া খানিকটা সাহেবের গায় খানিকটা সর্দ্দারদের গায় এবং খানিকটা ছাগলের গায় থু থু করিয়া ফেলিয়া দিল; তাহার পর নাটের উদ্দেশে একটা মন্ত্র পড়িয়া একমুঠা ছাগলের লোম ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া, এক কোপে ছাগলের মাথাটা কাটিয়া ফেলিল এবং সকলের মাথায় ও পায় রক্ত লেপিয়া দিল।

কুমীদের বিবাহে কোন বিশেষ আচার নাই, বিবাহসময় সকলে একত্র আমোদ করে। নাড়ী কাটিলেই সন্তানের নাম-করণ হয়। নামটা কোন পূর্ব্ব পুরুষের নাম হওয়া চাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিকারী কন্যার কোন অধিকার নাই। ইহারা মৃত দেহ দাহ করিয়া চিতা ক্ষেত্রের নিকট একটী কুটীরে চিতাভস্ম ও মৃত ব্যক্তির বস্ত্র, ভোজন পাত্র ও শয্যা রাখিয়া দেয়। ইহারাও গোলাম পুষে, ইহাদের ও ভাষায় নমস্কার ও সম্ভাষণ সূচক কোন শব্দ নাই। ইহারা পশ্চাৎ ভাগে কৌপীনের কিয়দংশ লাঙ্গুলের মত ঝুলাইয়া রাখে, এজন্য ব্রহ্মবাসীরা ইহাদিগকে "খেমী" বা কুকুর বলে। মেয়েরা মাথার মধ্যস্থলে খোঁপা বাঁধে এবং কাণের মাঝ খানে ফুটা করিয়া এক টুকুরা কাপড় বা কাট দিয়া রাখে।

ম্রোস জাতি বড় নিরীহ। কাহারও সহিত মনান্তর হইলে ইহারা ঝগড়া না

করিয়া ওঝাকে ডাকিয়া আনে। এবং ওঝা দ্বারা দেবতারা যেরূপ উপদেশ দেয়. সেইরূপ করে। ইহারা তিনটী দেবতায় বিশ্বাস করে। (১) তুরাই বা বুড়বাবা (২) সাংটুং বা গিরিনাট। (৩) ওরেং বা নদী নাট। কোথায়ও যাইতে হইলে মাস দিয়া নদী নাটের পূজা করিয়া বাহির হইতে হয়। পর্ব্বত পার হইবার সময় গিরিনাটকে এক মুঠা ঘাস দেয়। ইহারা বন্দুক ও দা ছুঁইয়া এবং বাঘের নাম করিয়া শপথ করে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পীড়া, দুর্দৈব বা মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বিবাহের পূর্ব্বে শ্বশুর বাড়ী তিন বৎসর বেগার খাটিতে হয়। নতুবা দুই তিন শত টাকা পণ দিতে হয়। অবিবাহিত অবস্থায় যুবতী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। বিবাহের কোন আচার নাই, কেবল জ্ঞাতি বন্ধুকে ভোজ দিতে হয়। জন্মের পর দিন সন্তানের নাম করণ হয়। বিবাহ ভঙ্গে স্বামী বিবাহের পণ ও স্ত্রীর অলঙ্কার লাভ করে। বিবাহ ভঙ্গের পর মেয়েদের বিবাহ হয় না। কিন্তু বিধবার বিবাহ আছে। অপরিণতবয়স্কা বিধবা নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি। পুত্র কণ্যার বিবাহ হইয়া গেলে, পিতা মাতা কনিষ্ঠ সন্তানের নিকট বাস করে। কনিষ্ঠ সন্তান পিতার উত্তরাধিকারী। যুদ্ধলব্ধ ও ঋণগ্রস্ত, ইহাদের দুই প্রকার কৃতদাস, উভয়ের অবস্থার কোন তারতম্য নাই।

স্বপ্নানুসারে ইহারা বাসস্থান নির্ব্বাচন করে। স্বপ্নে মাছ দেখিলে নূতন স্থানে অর্থলাভ ও নদী দেখিলে প্রচুর শস্য লাভ হইবে। কিন্তু সাপ কি কুকুর দেখিলে বিপদের সম্ভাবনা। সেস্থানে গৃহ নির্ম্মান করে না।

পুরুষেরা কৌপীন ও মেয়েরা অনতিলম্বিত পেটীকোট পরে।

বাঙ্গোগী ও পাংখো, জাতি আপনাদিগকে দুই ভায়ের সন্তান বলে। আচার ব্যবহারে উভয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। কেবল পাংখোরা মাথার পিছনে এবং বাঙ্গোগীরা সম্মুখে খোঁপা বাঁধে। ইহারা পাটায়েন ও খোজিং এই দুই দেবতায় বিশ্বাস করে। পাটায়েন বিশ্বসংসারস্থ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি পশ্চিম দিকে বাস করেন এবং রাত্রীকালে সূর্য্যকে রক্ষা করেন। খোজিং এই জাতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এজন্য ইহাকে তাহারা বিশেষ সম্মান করে। পাটায়েনের পূজা করে না। বাঘ খোজিঙের কুকুর; প্রভুর সন্তান বলিয়া সে ইহাদিগকে স্নেহ করে। পূর্ব্বে পশু, পক্ষী, মনুষ্য সকলে এক ভাষায় কথা কহিত, তাহাতে আহারের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। মারিবার সময় তাহাদের আর্ত্তনাদ সকলে বুঝিত ও কাতর হইত। এজন্য ভাষা ভিন্ন হইয়াছে। যাহার কথা বুঝে না, তাহাই ইহাদের খাদ্য। প্রতিগ্রামে কোবং নামে এক এক জন ওঝা আছে। খোজিং তাহার দ্বারা আপন ইচ্ছা সন্তান গণের নিকট প্রকাশ করে। খোজিঙের গৃহ পাহাড়ে কিন্তু সেখানে কেহ যাইতে পারে না। নরবলি দিলে প্রচুর শস্য জন্মে। এই বিশ্বাসে পূর্ব্বে ইহারা নরবলি দিত। এখন ইংরাজের ভয়ে উহা পরিত্যাগ করিয়াছে।

নদীর ধারে, দাঁড়াইয়া বন্দুক বা রক্ত ছুঁইয়া ইহারা শপথ করে। মিথ্যাশপথ করিলে দৈব দুর্ব্বিপাকে সবংশে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। গ্রামে কিছু চুরি যাইলে সর্দ্দারের

বর্শা গ্রামের দ্বারে পুতিয়া দেয়। যে সে পথে যায়, তাহাকেই বর্শা ছুইয়া শপথ করিতে হয়। যে না শপথ করে, সেই অপরাধী। ইহারা মৃত দেহের কবর দেয়। প্রধানের দেহ উপবিষ্ট ভাবে কবর দিতে হয়।

কাছাড় চট্টগ্রাম ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালায় লুসাই দিগের বাস। ইহারা নানা দলে বিভক্ত, প্রত্যেক দলের সর্দ্দার স্বতন্ত্র কিন্তু সকলেরই ভাষা ও আচার ব্যবহার এক। বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী লুসাই-দিগের মধ্যে হাউলং, সাইলু এবং রতন-পুরা বিখ্যাত। লুসাই সর্দ্দারকে লাল বলে। গ্রামের মধ্যে লালের প্রধান্য অদ্বিতীয়। গ্রামে যাহা আছে সকলই তাহার, যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাই তাহাকে দিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাহারও নাই। রাজকুমারের বয়স হইলেই তিনি পিতার রাজ্য ছাড়িয়া স্বতন্ত্র গ্রাম স্থাপন করেন। সকল রাজা একবংশসম্ভূত সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন এক জন লুসাই রাজা আর এক জনকে বধ করিতে পারে না। যে রাজার ক্ষমতা অধিক, তাহার প্রজাও অধিক পরাজিত রাজার প্রজাগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবলতর লালের গ্রামে উঠিয়া যায়। লালের গৃহে আশ্রয় লইলে ঘোর অপরাধী হইলেও নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু লালের দাসত্ব করিতে হয়। প্রত্যেক প্রজাকে বৎসরে তিন দিন লালের বেগার খাটিতে হয়। এবং লালের অতিথীসেবার ব্যয় প্রজাদিগকে মাছট করিয়া দিতে হয়। প্রজারা তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। দাসের মৃত্যু হইলে, তাহার স্ত্রীপুত্র লালের সম্পত্তি হয়। সৈন্য সংগ্রহ করিতে কি কোন হুকুম জারি করিতে হইলে, এক জন গোলাম লালের বর্শা লইয়া বাহির হয়। ক্রীত দাসেরা লালের দূত ও পত্র বাহকের কার্য্য করে। যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে, দূত রাঙ্গা কাপড় জড়াইয়া এক খান দা হস্তে করিয়া বাহির হয়।

লুসাই রমণী উত্তরাধিকারে বঞ্চিত। সম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে ভাগ হয়, কনিষ্ঠ সকলের অপেক্ষা অধিক পায়, আর সকলের অংশ সমান। বিধবাবিবাহ অনুমোদিত কিন্তু পুত্রবতী বিধবা ক্বচিৎ বিবাহ করে। পুত্রের সংসারে তাহার একাধিপত্য। ইহারা জাতিভেদ মানে না। সকলে এক সঙ্গে আহারাদি করে। বিবাহের সময় একটা উৎসব হয়, আর কোন আচার নাই দুই পক্ষের মত হইলেই বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে। ব্যভিচার ক্বচিৎ ঘটে, ব্যভিচারী-দ্বয়ের প্রাণ দণ্ড হয়। কেবল লালের গৃহে আশ্রয় লইয়া আজীবন দাসত্ব স্বীকার করিলেই নিষ্কৃতি। অন্য পাহাড়ীয়াদের অপেক্ষা লুসাই রমণীর প্রাধান্য কিছু অধিক, সকল কর্ম্মেই তাহার সহিত পরামর্শ করিতে হয়। কিন্তু সংসারের সকল কার্য্যই—রান্না, কাপড় বোনা, জলআনা, কাঠ কাটা, তাহাকেই করিতে হয়। কৃষিকার্য্যেও সে সাহায্য করে। গৃহ নির্ম্মাণে ও কৃষি কার্য্যে সাহায্য ভিন্ন পুরুষের সকল সময়, শীকার ও দুর্ব্বলতর প্রতিবাসীর উপর অত্যাচারে কাটিয়া যায়। পুরুষোচিত কার্য্যে যে ভীত বা অক্ষম, তাহাকে রমণীর বেশ পরিয়া রমণীর কার্য্য করিতে ও রমণীর সঙ্গে দিনপাত করিতে হয়। পুরুষসমাজে তাহার স্থান নাই।

ইহারা মৃতদেহ পুতিয়া ফেলে। কাহা-

রও মৃত্যু হইলে তাহাকে বেশভূষায় সাজা-ইয়া ঘরের মধ্যে বসাইয়া তাহার অস্ত্রশস্ত্র ডান হাতের কাছে রাখে। বাম পার্শ্বে স্ত্রী বসিয়া কাঁদিতে থাকে। আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া চারি পার্শ্বে পান ভোজনের ঘটা লাগাইয়া দেয়। মধ্যে মৃত দেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কুটুম্বেরা তামাক সাজিয়া নলটী মৃতের মুখে গুঁজিয়া দেয়, এবং সম্মুখে আহার্য্য রাখিয়া বলে "খাও খাও অনেক দূর যাইতে হইবে।" এক দিন এইরূপ করিয়া, দ্বিতীয় দিনে কবর দেয়। ধুন ও ফুন জাতি একটা মাচার উপর মৃতদেহ রাখিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুখাইয়া লয়। তাহার পর দেহটা কবরসাৎ করে। মাথাটা কাটিয়া ঘরে রাখিয়া দেয়। হাউলঙেরা ঘরের কড়িকাঠে মৃতদেহ সাতদিন ঝুলা-ইয়া রাখে। মৃতদেহের নীচে বসিয়া স্ত্রীকে কাটনা কাটিতে হয়। লুসাইরা নাটের উপাসক।

নিজের গ্রামে কেহ চুরি করে না। অন্যের গ্রামে চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, জিনিষ ফিরাইয়া দণ্ড সহ্য করিতে হয়। প্রাণের মূল্য প্রাণ। লালের গৃহে আশ্রয় লইলেও হত্যাকারীর নিষ্কৃতি নাই। কুটু-ম্বেরা সেখানেও তাহাকে হত্যা করিতে পারে। কেবল লালের স্ত্রী তাহাকে পোষ্য-পুত্র করিয়া লইলেই সে নিষ্কৃতি পায়।

পুরুষেরা ডুরে কাপড় পরিতে ভাল-বাসে, কাণে পালক গুজিয়া রাখে, এবং ঘাড়ের উপর খোঁপা বাধে। মেয়েরা এক হাত প্রশস্ত নীলাম্বরী পরে এবং কাণের ছিদ্রে কাঠ বা হাতী দাঁতের টুকরা গুঁজিয়া রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই দীর্ঘায়তন দৃঢ়কায়।

পাহাড়ের শিখরে লুসাইরা গ্রাম স্থাপন করে এবং যুদ্ধের সময় কাটের বেড়া দেয়। ইহারা কোন স্থানে চারি পাঁচ বৎসরের অধিক বাস করে না। ভূমির উর্ব্বরতার হ্রাস হইলেই স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ইহারা কাঠ দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে। প্রত্যেক বাড়ীতে গয়েল, (পাহাড়ীয়া গরু) ছাগল ও শূকর পোষে। গৃহস্বামী স্বহস্তে গোরুকে লবণ খাওয়ায়, তাহারা মাঠে চরিয়া আসে। ইহারা দুধ খায় না, মাংস খাইবার জন্য গোরু পোষে এবং ঠাকুরের নিকট বলিদান দেয়। লুসাই ছাগলের শ্বেত লোম এত দীর্ঘ হয় যে, মাটী স্পর্শ করে।

যুদ্ধ যাত্রা কালে গ্রামের নরনারী সকলে আহার্য্য লইয়া কিছু দূর সঙ্গে আসে এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দেয়। ইহারা প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। বাধা পাইবার সম্ভাবনা বুঝিলে পাঁচ ছয় দিনের পথ যাইয়াও ফিরিয়া আসে।

ইংরাজদের সহিত লুসাইদের সন্ধি হই-য়াছে। ইংরাজেরা উহাদিগকে বৎসরে বৎসরে কিছু টাকা দেয়। কিন্তু দশ বৎসর না দিলেও উহারা টাকা চাহিয়া লোক পাঠায় না। বৎসরে বৎসরে ইহাদিগের জন্য কাসালঙে দরবার হয় কিন্তু প্রধান সর্দ্দারেরা কখন আসে না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।
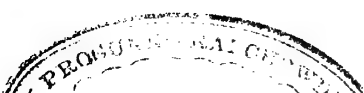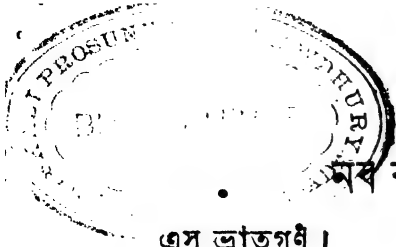
নববর্ষোপহার।

এস ভ্রাতৃগণ।

এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে
এ দগ্ধ হৃদয়ে আজ করিহে গ্রহণ !
এস এক শোকে দুখে, এস এক ভাঙ্গা বুকে
একই বিষণ্ণ প্রাণে করি আলিঙ্গন !
এস এক হাহাকারে, ভাসি এক অশ্রুধারে
মিশাই হে উভয়ের রোদনে রোদন !
এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে
এসহে কাঁদিতে ভাই করি নিমন্ত্রণ !
এ দগ্ধ হৃদয়ে এস করিহে গ্রহণ !

১

এস ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার,
শুধু এই মহা পাপে, জননীর অভিশাপে
নয়নের অশ্রুজল ঘোচেনা কাহার !
শুধু এই ভ্রাতৃ ভেদে, দুখিনী জননী খেদে
জীবনে পড়িয়া আছে মৃতের আকার !
শুধু এ পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য
বীরজাতি বীরভুমি রাজপুতনার !
শুধু এ পাপের জন্য দুর্দ্দশা সবার !

২

এস ভাই ভিন্নভাব করি পরিহার,
এস ভাই এক প্রাণে, এক ধ্যানে এক জ্ঞানে
অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার !
রাখি এ অনন্ত হস্ত, সে কার্য্য সাধনে ন্যস্ত
পবিত্র মহান্ সত্য করিতে উদ্ধার !
অথবা করিতে ব্যয়, যদি আবশ্যক হয়
রাখি এই রক্তপূর্ণ কোটি রক্তাধার !
(এস) অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার !

৩

ভাই !

এক হস্তে মুছিবেনা এত অশ্রুজল !
এক হস্তে ছিঁড়িবেনা এ পাপ শৃঙ্খল !
রক্তের সাগর চাই, এত রক্ত কোথা পাই
এক বক্ষে নাহি তত শোণিত তরল,
অগস্ত্য আগ্রেয় আশা, সীমা শূন্য সে পিপাসা
ব্যাদিত গগনময় গ্রাসে গ্রহ দল !
রক্তের সাগর চাই—কোটি ভুজবল !

৪

তবে সে সুদিন ভাই হইবে উদয়,
দেখিবে সে জননীরে, কিরণ কিরীট শিরে
স্বর্গীয় শরীরে কিবা জ্যোতি মণিময়।
উড়িছে মঙ্গল হেতু, রজত কাঞ্চন কেতু
ধবল কাঞ্চন জঙ্ঘা—উচ্চ হিমালয় !
তবে ত দেখিবে সেই সুদিন উদয় !

৫

এস ভ্রাতৃগণ !

এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে
এ দগ্ধ হৃদয়ে আজ করিহে গ্রহণ !
এস এক শোকে দুখে, এস এক ভাঙ্গা বুকে
একই বিষণ্ণ প্রাণে করি আলিঙ্গন !
এস এক হাহাকারে, ভাসি এক অশ্রুধারে
মিশাই হে উভয়ের রোদনে রোদন !
এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে
এসহে কাঁদিতে ভাই করি নিমন্ত্রণ !
এ দগ্ধ হৃদয়ে এস করি হে গ্রহণ।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বিবিধ।

১
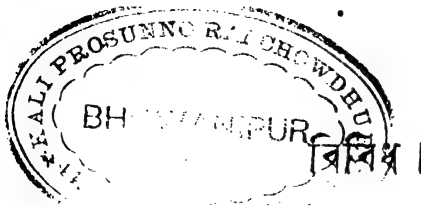
মাতৃ-জঠর হইতে পড়িয়াই যে ছবি দেখিতে পাইলাম, তাহা এ জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। এই বিজন স্মৃতির কুঞ্জবনে সেই মোহিনী প্রতিমার চির-জ্যোৎস্নাময় হাসি ও অনুরাগ আমার একমাত্র আনন্দ। সেই প্রতিমাইত অনন্তময়ের সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার।

ছবিখানি সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে, তথাপি আজও ত তাহার একটা ঠিক প্রতিকৃতি ও সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য মনে ধারণা করিতে পারিলাম না। কত কত বৎসর, কত শত সহস্র চোক দিয়ে, সেই ছবিখানি দেখিতেছি, তবুও ত তাহাকে আমার এই প্রাণের ডোরে বাঁধিতে পারিতেছি না! এ জগতে অনেক সুন্দর ছবি দেখিয়াছি। নাটক ও কাব্যাদিতে তদপেক্ষাও স্ফুটন্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছবি দেখিয়াছি। দেখিয়াছি,—সেই হৃদয়ময়ী সাধ্বী সীতা; "দিগন্ত [illegible]বিকীর্ণকারিণী" প্রেমময়ী—সেই শকুন্তলা; প্রেম-ভক্তির আদর্শ প্রতিমা—সেই রাধা, লোক মনোমোহিনী—সেই দেস্‌দিমোনা, "সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা" —সেই নিষ্কলঙ্ক মিরান্দা; জীবন্ত সরলতা রূপিণী—সেই কুন্দ; স্নেহ-জ্যোৎস্না-রূপিণী সেই কমলমণি, চির-উদাসিনী সেই কপালকুণ্ডলা, গীতগানের মধুর স্মৃতি-রূপিণী সেই গিরিজায়া, কল্পনা-বিহারিণী শক্তিময়ী সেই শান্তি, ধর্ম্ম ও শান্তি স্বরূপিণী সেই প্রফুল্লমুখী, আর আত্মবিসর্জ্জনাকাশের সুখের নীহারিকা স্বরূপিণী রবীন্দ্র বাবুর সেই সুরমা—সকলগুলিই সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় গিয়াছে। কিন্তু জগতে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াই, যে ছবিখানি আমাকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়াছে, সেই ছবিখানিতে আমি ইহাদের প্রত্যেককেই দেখিতেছি। এরূপ বিশাল সৌন্দর্য্য ও অনন্ত কবিত্বপূর্ণ পূর্ণ-ছবি কেহ কখন দেখিয়াছে কি? তাই বলি, এ ছবিখানি জগতে অতুলনীয়। অথবা ইহার তুলনা সেই ছবিখানি নিজে। তুমি ছবি,—

"জনম জনম মম প্রাণ পূর্ণ করি
থাক হৃদয় ভরি আশা
তুঁহুক পাশরহি হাসয়ি হাসয়ি
সহব সকল দুখজ্বালা।"

সৌন্দর্য্য কি? অথবা সুন্দর কি নয়? জগতের সমস্ত পদার্থই ত সুন্দর। তবে "অবস্থা, শিক্ষা, সংসর্গ প্রভৃতির গুণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই কথারও মূল কথা, জগতে কিছুই অসুন্দর নাই। নারায়ণ বিশ্বব্যাপী এবং লক্ষ্মী শোভাদেবী তাঁহার বক্ষস্থলোপরি বিরাজিতা।" আমি বলি মানুষ, সৌন্দর্য্য ভিন্ন কখন বাঁচিতে পারে না। সৌন্দর্য্যই জীবন—সৌন্দর্য্যই জীবনের প্রধান কার্য্যকরী শক্তি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

যাহা দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারি না, চিরকাল পুরাতন হইয়াও নূতন, অথবা যাহা না থাকিলে বা না পাইলে জীবন থাকেনা, আমি তাহাকেই সৌন্দর্য্য বা জীবন বলি। যেখানে জীবন নাই, সেখানে সৌন্দর্য্য

থাকিতে পারে না। আবার সৌন্দর্য্য না থাকিলে জীবনও থাকিতে পারে না। একের অস্তিত্বে,অপরের অস্তিত্ব! এ অতি অপূর্ব্ব মিলন। চমৎকার একত্ব! এরূপ মিলনের আদর্শ এ জগতে কেহ দেখিয়াছে কি? আর এরূপ একত্বের সঙ্গীতও কোথাও শোনা যায় নাই! এ গান প্রকাণ্ড পৃথিবী-সাম্রাজ্য হইতে উঠিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে শান্তি ও প্রেমের একতানে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। আবার সৌন্দর্য্যেরও ক্ষয় নাই, জীবনেরও ধ্বংশ নাই। অনন্ত বিশ্ব-উদ্যানে এই প্রস্ফুটিত জীবন-সৌন্দর্য্য-ফুলের মৃত্যু নাই।

অনন্ত-জীবন ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্র অংশ আমাদের এই জগৎ। এই প্রকৃতিজগৎ একখানি জীবন্ত সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। একখানি ছবিতে এত প্রাণ ও এত সৌন্দর্য্য আর কে কোথায় দেখিয়াছে? প্রকৃতিরাণীই আমাদের আদর্শ ছবি। ইহার অপেক্ষা জীবন্ত আদর্শ ছবি আর কোথায় পাইব? এ ছবি প্রত্যেক মানুষের চক্ষুর অগ্রে দিবানিশি হাসিতেছে। আইস, আমরা এই বিশাল, জীবন্ত, সুন্দরী, প্রকৃতি ছবিতে মজিয়া থাকি, এই বিশাল জীবন্ত-সুন্দরী-প্রকৃতি ছবিতে মাতালের ন্যায় মাতিয়া থাকি, এই বিশাল জীবন্ত সুন্দরী-প্রকৃতি-ছবিতে প্রেমিকের ন্যায় মরিয়া থাকি। সেই মৃত্যুতেই তুমিও অমর ও সুন্দর এবং আমিও অমর ও সুন্দর।

২

সৌন্দর্য্যের কথা হইলেই প্রেমের কথা মনে হয়। প্রেম কি? প্রেম, সৌন্দর্য্য-বৃক্ষের প্রস্ফুটিত ফুল। বিশ্বের বিশালবক্ষের উপর সৌন্দর্য্য বৃক্ষ শোভিতেছে। সেই ধরি-ধরি-ধরিতে-পারি-না বৃক্ষে একটী সুখস্বপ্ন-জাত কুঁড়ি দেখিলাম। কুঁড়ি প্রেমের। প্রেমের কুঁড়ির জন্ম স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য ও মিলন-হাসিতে। প্রেমের কুঁড়ি বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মিলন-হাসির উচ্ছ্বাস—বিশ্বের সৌন্দর্য্যও মিলন-হাসির ভাবময় মূর্ত্তি। ইহার পূর্ণ-বিকাশের সময় আসে নাই। জগৎ আজও অসম্পূর্ণ। জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই প্রেমও এখন অপূর্ণ। জগৎ, জগৎ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রেমে আসিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রেম ফুলই জগতের পূর্ণ বিকাশ! যখন তোমাতে-আমাতে, মানুষে মানুষে ও স্বর্গে-মর্ত্ত্যে কোন বিষয়ের এক পরমাণুরও অমিল থাকিবেনা, তখনই প্রেম-কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হইবে। বিশ্বের উন্নতি ও সভ্যতার শেষ সীমা,—প্রেম। এই প্রেমেই ব্রহ্মাণ্ড মিলন।

৩

ইহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। সেই রাধাইত সৌন্দর্য্য ও প্রেম-ধর্ম্মের পূর্ণ ও জীবন্ত বিকাশ। অনন্ত সৌন্দর্য্য-রূপিণী প্রেম-ময়ী রাধা-হৃদয় হইতে গান উঠিতেছে "এসো এসো বঁধু এসো।" এমন এমন করিয়া কি, এই প্রাণের সহিত প্রাণ মিশাইয়া, দেহের সহিত দেহ মিশাইয়া, প্রতি পরমাণুর সহিত প্রতি পরমাণু মিশাইয়া, আর কোন ধর্ম্মে ডাকে? এরূপ বিশ্বব্যাপী সুন্দর ধর্ম্ম আর হয় না। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী প্রেম-ধর্ম্মের মূল তিনটী অক্ষর—শ্রী—কৃ—ষ্ণ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

কি দিবে শান্ত্বনা ও কেমনে ভুলিব ?

১

কি দিবে শান্ত্বনা ?
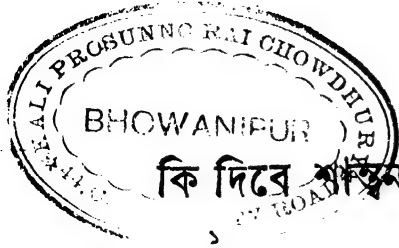
"সখাহে, বল কি দুখে, রয়েছ মলিন মুখে,
কি যেন কি কথা মুখে ফুটিয়া ফোটেনা ?
কেন আঁখি ছল ছল, মাথা খাও বল বল ;
প্রাণের যাতনা তব লুকাবে, সহে না।"

"মহিমার দীপ্ত ছবি—বসন্ত সন্ধ্যার রবি—;
সখাহে, পড়িল যবে পশ্চিমে ঢলিয়া,
মৃদুল মলয় শ্বাসে, কোকিলের কুহু ভাষে,
নির্ব্বাণের শেষ গীতি এলাম শুনিয়া।

আজি এ বিমল সাঁঝে, ফুলময় কুঞ্জমাঝে,
প্রেমের কুসুম তব, ঝরেছে জান না ?
শান্ত্বনা করিতে তাই এসেছি; কি কব ছাই ?
আপনি আকুল সখে ; কি দিব শান্ত্বনা ?"

"আহা সখা কেঁদোনাকো, মোর বুকে বুক রাখ,
নিঃশব্দে নিবিবে নিশি, নিবিবে জ্যোছনা ;
নিবিবে এ মধুমাস, নিবিবেরে বার মাস ;
নিঃশব্দে নিবিব মোরা ;—কি দিবে শান্ত্বনা ?"

২

কেমনে ভুলিব ?

"ভুলোনা ভুলোনা তারে ;"—"কেমনে ভুলিব ?
পাষাণ পরাণে মম, সুকোমল, অনুপম,
যা কিছু সকলি তার ;—কেমনে ভুলিব ?
নীলাচলে মাথা রাখি, যবে রবি মুদে আঁখি,
ভুলে কি সে দীপ্তস্মৃতি গগন কখন ?
শেষ চিহ্ন করুণার, অঙ্গে মেখে রাখে তার ;
ভুলিলে সে স্মৃতিতার, ফুরায় জীবন।
সে যে শশী কোলে করে,তারকার হার পরে,
জান কি রহস্য তার, সখাহে আমার ?
তারা, শশী, অনুরাগে, লুপ্ত-রবি-স্নেহরাগে
রঞ্জিয়ে মুরতি মরি রাখে আপনার ;
তাই সে উদাস কোলে,রবি গেলে ছবি দোলে
প্রত্যক্ষ ফুরালে রহে স্বপ্ন মধুময়।
ফুরালে সে স্বপ্ন হয় অনন্ত প্রলয়।"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মধুমালতী।—শ্রীসূর্য্যকুমার সোম কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার পুস্তকের প্রথমে লিখিয়াছেন—"আপন গৃহই নিষ্কামব্রতোদ্যাপন ও ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমের প্রশস্ত ক্ষেত্র। এই গ্রন্থে সে কথাটী বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে।" আমরা গ্রন্থখানি অতি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। আজ কাল নিষ্কাম ধর্ম্মের আলোচনা লইয়া কিছু বেশি ধূমধাম চলিতেছে। সে ভালই। কিন্তু নিষ্কাম-ব্রত কি, ইহা বুঝিতে অনেকেই ভুল করেন। আমাদের এই গ্রন্থকারও সে ভুল করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আত্মহত্যা করিলে নিষ্কাম ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, ইহা আমরা মানি না। মালতীর চিতারোহণ—গ্রন্থকারের নিষ্কাম ব্রত উদ্‌যাপন। আমরা দেখিলাম, যে সময়ে মালতী চিতারোহণ করিলেন, সে সময়টী বড়ই

অনুপযুক্ত সময়। বিধবার আত্মহত্যাই যদি পরম ধর্ম হয়, তবে তাহা পূর্ব্বে করিলেই হইত। প্রভার সহিত কুমারের বিবাহ হইল- আর অমনি মালতী চিতায় উঠিলেন, ইহাতে যেন গুপ্ত প্রণয়ের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, গ্রন্থকার বড়ই অনুকরণপ্রিয়। সেই মন্দিরে দুর্গেশনন্দিনীর সহিত জগৎসিংহের ক্ষণদেখায় প্রণয়ের উদয়, ওসমানের লীলা, আয়েসার নিষ্কামব্রত, আমাদের মনে নূতন ভাবে এ গ্রন্থপাঠে জাগিয়া উঠিল। এ গ্রন্থের দুর্গেশনন্দিনী—প্রভা, জগৎসিংহ—ভূপেন্দ্র, আয়েসা—মালতী (কিছু রূপান্তরিত) ওসমান—বুন্দিরাজ বলদেব রাও, অভিরামস্বামী—ভৈরবানন্দ, আর "ভ্রাতায় ভ্রাতায় বাঁধরে হৃদয়" এ সকল ভাব আনন্দ মঠের। নূতন ভাষায়, নূতন সাজে বঙ্কিম বাবুর উপকরণ গুলি আবার নব্যবঙ্গসমাজে নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা দিতে উপস্থিত। অধিকন্তু জাতীয় ধর্ম্মের অনেক কথা ইহাতে আছে। সে সকল অনেক স্থলে আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু ভাষার জড়তায়—আস্ফালনে, শব্দাড়ম্বরে, সমাসঘটায়, বিশেষণবাহুল্যে, তন্মধ্যে গ্রাম্য শব্দের যোজনায় আমাদের প্রাণ অস্থির হইয়াছে। গ্রন্থকারের বর্ণনা, গ্রন্থের নায়ক নায়িকার কথাবার্ত্তার সর্ব্বত্রই একই দরের ভাষা;—পাঠক শুনুন—কমলা (স্ত্রীলোক)—বলিতেছেন "* * নিখিলখ্যাত ক্ষত্র সাহস বীর্য্য যদি যথার্থই ভোগ বিলাসিতার পাপচ্ছায়ায় অন্তঃসারশূন্য হইয়া থাকে, বীরপ্রসবিনী বীর মাতার বীরোৎসনিসৃত নির্ম্মল স্তনে সন্তান না পোষিয়া যদি সুধু সাগর জলে দুগ্ধপোষ্যের পরিপোষণ করিতে শিখিয়া থাকেন", ইত্যাদি। কমলা রাজমহিষী, খুব শিক্ষিতা বলিয়া গ্রন্থকার পরিচয় দেন নাই; তাঁরই ভাষা এরূপ। আর রাজকুমারী প্রভা, পণ্ডিতের কন্যা মালতী, রাজকুমার, ইহারা ত শিক্ষিত, ইহাদের কথায় যে "অবলা-করে-বীর-ভুজশোভার লাঞ্ছনা কেন?" পদের ন্যায় পদবাহুল্য দৃষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ইচ্ছা করিয়াই যেন গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা, হিন্দুর জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র। রাজকুমারী গণনা করিয়া পরে যাহা ঘটিবে, তাহা বুঝিলেন। ভৈরবানন্দও পরে যাহা ঘটিবে তাহা জানিয়াছিলেন। জানিয়াও প্রাণ দিলেন। এসকল গ্রন্থকারেরই রচনা। ইহাতে যে গ্রন্থের কি সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে, আমরা বুঝিলাম না। তবে গ্রন্থকারের "হিন্দুর জাগ্রত জ্যোতিষের" মহিমা কীর্ত্তন খুব হইল বটে। এ প্রকার ভবিষ্যৎ গণনা, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) মানিতে গেলে, কখনই মানা যায় না। যাহা হউক, গ্রন্থকার সেই কূট প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা করেন নাই, অথচ দুই এক জনের মুখে ভবিষ্যতের কথা বলাইয়া, হিন্দু জ্যোতিষ বড়ই শ্রেষ্ঠ, ইহা লিখিতে একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। তারপর আয়ুর্ব্বেদের কথা। "ভূপেন্দ্র ক্ষতমুখে শোণিত স্রাবে ক্রমশ ক্ষীণবল হইতেছিলেন" এমন সময়ে গ্রন্থকার আচার্য্যের দ্বারা বন হইতে কি ঔষধ আনাইয়া দিলেন। কুমার এক রাত্রির মধ্যে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। গ্রন্থকার অমনি গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—"তবুও কি কেহ বিশ্বাস করিবেন, আয়ুর্ব্বেদে মৃতসঞ্জীবনীর সদ্যব্যবস্থা আছে" ইত্যাদি। ভৈরবানন্দ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে পণ্ডিত ছিলেন, একথা গ্রন্থকার

কোথাও বলেন নাই, তবুও আয়ুর্ব্বেদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। বিজ্ঞানের এই-প্রকার অকাট্য প্রমাণের পর, কে আর ইহাতে অবিশ্বাসী থাকিবে?

আর এক কথা আছে--সূর্য্য বাবু ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। মামুদের সোমনাথ আক্রমণের সময়কার কাহিনী এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে--সে সময়ের বর্ণনা শুনুন—"সে কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সম্মতিসূচক ঘন ঘন করতালির রোল পড়িয়া গেল।" "কুলকুমারীরা স্তপে স্তপে বন ফুলের মালা উপহার পাঠাইলেন" কেমন লাগিল?

আমরা ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ দোষের কথা বলিয়াছি, আর বলিতে চাইনা। গ্রন্থখানি যদি বিশেষ মনোযোগের বিষয় না হইত, তবে এত দোষের উল্লেখ করিতাম না। গ্রন্থের গুণও যথেষ্ট আছে। দোষ বহুল বলিয়া গ্রন্থ খানি উপেক্ষার যোগ্য নহে। স্বভাবের বর্ণনা স্থানে২ অতি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দ মঠ' রচিত না হইতে 'আচার্য্যের ভক্তিমঠের' রচনা হইলে, বড়ই ভাল লাগিত। গ্রন্থের রুচি অতি পরিমার্জ্জিত। গ্রন্থকার যে একজন মায়ের হিতৈষী সন্তান, তাঁহার পুস্তক পাঠে আমরা সে পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি। ভাষার সমতা যদি থাকিত, অর্থাৎ উচ্চ ভাষার সহিত "নিছা, মিঠা, কেউ" প্রভৃতি কথার সমাবেশ যদি না থাকিত, অনুকরণের ভাগ যদি অধিক না হইত, তবে এই পুস্তক খানি বিশেষ আদৃত হইত। তাহা হয় নাই বলিয়া, আমরা দুঃখিত হইয়াছি। যাহা-হউক, গ্রন্থকার যে সকলের উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। কারণ তিনি কালে একজন ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

২। কণকাঞ্জলি।--(গীতিকাব্য)। শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল প্রণীত; মূল্য ৷৷০ আনা। বাঙ্গালীর গৌরব—হেমচন্দ্র এবং নবীন চন্দ্রের লেখনীর তেজ, যে কারণেই হউক, দিন দিন নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। এই সময়ে যে কয়েকজন কবি বাঙ্গালা কবিতার সম্মান রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর অগ্রণী। রবীন্দ্র বাবু গীতিকাব্যেই বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আর গীতি কাব্যে পারদর্শিতা দেখাইতেছেন—কণকাঞ্জলি-প্রণেতা, এই অক্ষয় বাবু। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দাসও খণ্ডকবিতা লিখিয়া বড়ই সম্মান পাইতেছেন। অক্ষয় বাবুর 'প্রদীপ' পড়িয়া আমরা যতদূর সুখী হইয়াছিলাম, কণকাঞ্জলি পড়িয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছি। পুস্তক খানি মধুর ভাণ্ডার—কবিতার খণি। স্থানে স্থানে গোবিন্দ বাবু ও রবীন্দ্র নাথের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পাঠক তুলনা করিয়া দেখুন—

গোবিন্দ বাবুর প্রমদা নামক প্রবন্ধে আছে,—

"কি ছিলি?
চাঁদের অমিয়া ছিলি? ফুলের সুবাস ছিলি?
ঊষার আলোক ছিলি? কমলের হাসি ছিলি?
কি ছিলি?
আকাশের তারা গেলি আকাশে মিশা'য়ে?
(১)

অক্ষয় বাবুর—

মেয়ে কি? নামক কবিতায় দেখা যায়ঃ—
মায়ের তুই, স্ত্রীর তুই, বুকের কি উছলান ধন,
ফুলের কি তুই মধুটুকু [illegible] কি তুই সুখ-স্বপন।

চাঁদের কি তুই জ্যোৎস্না টুকু, নদীর কি
তুই ভাঙ্গা ঢেউ।
মেঘের কি তুই শোভাটুকু, আমার গানের
কি তুই বুঝি কেউ।"
স্থানান্তরে অক্ষয় বাবুর—
"তরণী বহিয়া যায়, দাঁড়ি মাঝি সারি গায়,
উড়িছে নিশান—বাজিছে বাজনি
বহিছে মৃদুল বায়।

(২)

গ্রামের লোকেরা নদীর কিনারে
দাঁড়াইয়া গান গায়।
সবারি নয়ন, জলে ছল ছল
বিভা আমাদের যায়।"
গোবিন্দ বাবুর বরষার বিল—
"গ্রাম অভিমুখে যায় অই ক্ষুদ্রতরী,
ছৈয়ের ভিতর থেকে, শরীর লুকায়ে রেখে,
চুপি দিয়ে চেয়ে আছে সরলা সুন্দরী।
* * * *
এমনি মধুর হেসে, দাঁড়াইয়া তীরদেশে,
কি দেখিছে গ্রামের ও 'ঝিয়ারী বহুরী।'
আজি বহুদিন পরে, আসিছে বাপের ঘরে,
শৈশবের সহচরী, নূতন নায়রী,
সারি দিয়ে দেখে তাই সরলা সুন্দরী।"

তুলনার প্রয়োজন নাই। অক্ষয় বাবুকে আমারা কাহারও উপরে বসাইতে চাই না। সে তুলনা অসম্ভব। কেহ গোলাপ, কেহ যূঁই, কেহ বেল;—সাহিত্য-বাগানের সকলেই গৌরব। অক্ষয় বাবু স্বাধীন লেখক, স্বাধীন ভাবে গাইতেছেন—

"দাঁড়াও অভেদ আত্মা! পরলোক বেলা
ভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যু কুহেলিকা ধূমে
তোমাতে মিলিয়া যাই, দেখ তুমি চেয়ে চেয়ে,
সৌন্দর্য্যে মিলিয়া যায় কবিত্ব কেমন ধেয়ে।
শিখেছি তোমার কাছে সৌন্দর্য্যের মৃত্যুনেই
বুঝিয়াছি এ ব্রহ্মাণ্ডে মত্ত ব্রহ্মানন্দ সে—ই
নক্ষত্রে নক্ষত্রে, দেখি, হাহা করে তোমা তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার জনম পরে।
এই মৃত্যু শেষ মৃত্যু—হ'লো কি দেবতা
মোর।
ধর ধর গীত-উৎস ছিঁড়েছি জগত-ডোর।"

গাইতে ২ ক্লান্ত হইয়া কবি গাইতেছেন,
"ধীরে ধীরে, নেমে নেমে, থামিয়া গিয়েছে
গান।
বুকে ঘোরে পথ-হারা এখনো একটু তান।
কবিতা গিয়াছি ভুলে,
ছুটা ছন্দ মনে দুলে।
মুছিয়া ফেলেছি অশ্রু, এখনো আকুল আঁখি
অজানা-নিশ্বাস পড়ে, শূন্যে চাই থাকি থাকি
শুকায়েছে ফুল হার
একটু সুবাসি তার,
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে এখনো উঠিছে
বায়ে।
যে যাহার গেছে চ'লে,
আমি পড়ে তরুতলে॥
নিবিয়ে গিয়েছে জ্যোস্না, আমি আঁধারের
ছায়ে।"

আমরা বলি জ্যোস্না এখনও নিবিয়া যায় নাই, আরো আছে, আরো ফুটিবে। নবীন কবির প্রথম গাথা এত মধুর, না জানি পরে আরো কত মধুর হইবে।

কিন্তু একটি কথা। কবির রুচি বড় ভাল নয়। এক শ্রেণীর কবি আছেন, যাঁহারা প্রেমের অতি মলিন অংশ আঁকিতে বড়ই পুলকিত। আমরা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, অক্ষয় বাবুও এই শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভে যত্নশীল। কবি

রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিতে করিতে স্থানে স্থানে বড়ই কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ সমাজে দেবতা বলিয়া পূজিত। তাঁহাদের পঙ্কিলময় প্রেমের দৃষ্টান্তে বৈষ্ণবসমাজ কত হীনাবস্থায় আজ উপনীত হইয়াছে। চখের সম্মুখে সে চিত্র দেখিয়াও কবি এক সিড়ি নিম্নে পদনিক্ষেপ করিলেন, ইহাই আমাদের ক্ষোভ। প্রেমের স্বর্গীয় চিত্র কি বাঙ্গালার কোন কবি পবিত্র ভাবায় আঁকিয়া দেখাইতে পারিবেন না? না পারিলে, এই পতিত সমাজের কথনই মঙ্গল নাই।

৩। দেবতত্ত্ব।—শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত, মূল্য আট আনা। দেবতত্ত্বের অধিকাংশ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং এ পুস্তক সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠিত। কিশোরী বাবু একজন দার্শনিক পণ্ডিত; তাঁহার লেখা পড়িলে পাঠকেরা কথনই প্রতারিত হইবেন না। আর্য্যধর্ম্মের আন্দোলনের সময় এ পুস্তকের বিশেষ আদর হওয়া আবশ্যক।

৪। পারজোয়ার সমিতির প্রথম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।—এই কার্য্য বিবরণ থানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। সভা অনেকগুলি কার্য্য হাতে লইয়াও সুন্দর রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ এই সভার প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার চেষ্টায় সভার দিন দিন উন্নতি হইলে ঐ অঞ্চলের অনেক উপকার হইবে। আমাদের মতে সভা একেবারে এত গুলি বিষয় যদি হাতে না লইতেন, তবে ভাল হইত। যাহা হউক, সভার উৎসাহী সভ্যগণ যে সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫। কবিতা-কনিকা।—শ্রীভিথারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ৵০। পুস্তকথানি বালকের রচনা বলিয়া প্রকাশক সানন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশক নিজেও বালক; নচেৎ তিনি টাকা থরচ করিয়া কথনই এ পুস্তক প্রকাশ করিতেন না। দুই একটী কবিতা বাদে প্রায় সমস্ত গুলিই অসার। পুস্তক লিথিলেই যে শীঘ্র শীঘ্র ছাপাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, ওয়ার্ডসোয়ার্থের ন্যায় কবিও বলেন—"He never was in haste to publish; partly, because he corrected a good deal, and every alteration is ungraciously received after printing" অভিভাবকহীন বালক কবিদিগের এ কথা বড়ই তিক্ত লাগিবে।

৬। সারধর্ম্ম।—শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত, মূল্য ⁄১০। যাঁহাদিগের জীবন লীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের বহুদর্শিতার ফল হাতে পাইতে কাহার না সাধ হয়? পবিত্র ঋষীতুল্য শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর জীবনের শেষ কথা এই সারধর্ম্মে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবনের আসক্তি নিবিয়াছে, সংসারের যশোমানের বা দলাদলির আগুণ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময় সন্নিকট হইয়াছে। আহা, কতই মধুর কোমলতা এথন জগৎকে স্নিগ্ধ করিতেছে! সাম্প্রদায়িক কঠোরতা তিরোহিত হইয়াছে—গভীর সার্ব্বভৌমিক প্রেম রাজনারায়ণ বাবুকে আক্রমণ করিয়াছে—তিনি স্বাধীন ভাবে বলিতেছেন, "যথন মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি ধর্ম্মমত ও ভিন্ন ভিন্ন, ধর্ম্মবিষয়ে মতবিভেদ কথন পৃথিবী হইতে উঠাইবার সম্ভাবনা নাই এবং যথন আমাদিগের

নিজের ধর্ম্মমতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ** ** তখন মত লইয়া এত মারামারি কেন ?" আরো বলিতেছেন, "ধর্ম্মনিন্দা ব্রাহ্মের পক্ষে বড় বিগর্হিত কার্য্য।" কি উদার কথা, কি গভীর প্রেমের কথা। আমরা সারধর্ম্মের উদারতা দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। বঙ্গপ্রদেশ বিশেষত ব্রাহ্মসমাজ যদি শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর জীবনের শেষ কথা প্রতিপালন করিয়া চলেন, তবে সাম্প্রদায়িকতার স্থানে শান্তি এবং পবিত্রতা-মূলক প্রেমের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, জগতের কল্যাণ হইবে। রাজনারায়ণ বাবু সে চিত্র যদি দেখিয়া যাইতে পারেন, তবে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিবে না। জগজ্জননী তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

৭। বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ। শ্রী নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য /৫। এখানি, অতি সুন্দর পুস্তক। আবিয়ারের উপদেশ গুলি বড়ই ভাল। পাঠ করিয়া দেখিলে সকলেই সুখী হইবেন।

৮। সোনায় সোহাগা।—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। সোণার কাটী রুপার কাটীতে ও যে কথা, ইহাতেও তাহাই, কিছু সংক্ষিপ্ত, কিছু রূপান্তরিত। একই যুক্তি, একই কথা বারম্বার ভাল লাগিল না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ন্যায় লোকের নিকট আরো চিন্তাপূর্ণ রচনা চাই। তাঁহার ন্যায় লেখকের হাত হইতে "সোণায় সোহাগার" ন্যায় পুস্তক প্রকাশিত হইতে দেখিলে বাস্তবিকই আমরা দুঃখিত হই।

৯। পদ্যসার—দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৶১০। বালকদিগের জন্য এই কবিতা লিখিত। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে দুটী স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে। ভুবনবাবুর কবিতা লিখিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু কার্য্যদোষে মনোযোগের সহিত এ পথ অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া, স্থানে স্থানে বিফল-মনোরথ হইতেছেন, এ পুস্তকের মধ্যে "সন্ধ্যা" নামক কবিতাটী আমাদের বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে

১০। রত্নগাথা।—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত, মূল্য ।০। এ খানিও পদ্যময় গ্রন্থ, উদ্দেশ্য মহৎ, রুচি মার্জ্জিত, ভাষা প্রাঞ্জল। সীতা, সম্পা, লীলাবতী, শৈব্যা এবং ভগিনীডোরার, কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পদ্যাংশে পুস্তকখানিতে প্রশংসার বড় কিছু না থাকিলেও পুস্তকখানিতে সাধু দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, সর্ব্বত্র, বিশেষত স্ত্রীলোক দিগের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য।

১১। সতী বিলাপ।—শ্রীমাধব চন্দ্র মিত্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য ৷৶০। ৯২ পৃষ্ঠায় সতীবিলাপ নামক পদ্য শেষ হইয়াছে। পাঠকের ধৈর্য্য থাকে পুস্তক খানি পড়িবেন;—আমাদের ধৈর্য্য থাকিল না, পুস্তক খানি শেষ করিতে পারিলাম না। যতটুক পড়িয়াছি তাহা নির্ব্বাসিতের বিলাপের অনুকরণে লিখিত বলিয়া মনে হইল।

১২। রচনা-শিক্ষা।—শ্রীতারিণী কান্ত মজুমদার প্রণীত, মূল্য।৶০; ছাত্রদিগের রচনা শিক্ষার জন্য লিখিত। আমরা মনোযোগ করিয়া পড়িলাম। ইহা পড়িয়া যদি কেহ রচনায় পটু হন, সে ভালই। আমাদের কিন্তু সে বিশ্বাস নাই; ব্যাকরণ সম্মুখে রাখিয়া রচনা শিক্ষা করা যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

চৈতন্যচরিত্র ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (৫ম)

চৈতন্য অবতার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে চৈতন্য অবতার সম্বন্ধে যে সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে, এক্ষণে পাঠকদিগের নিকটে তাহাই উপস্থিত করিতেছি। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের নানা স্থানে তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে সত্য এবং তিনিও কোন কোন সময়ে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ, ও তাঁহার দশাবতারগণের সহিত অভিন্নাত্মক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও সত্য, কিন্তু তাহা কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় ও কি প্রকারে কথিত হইয়াছে, তাহার সম্যক আলোচনা না করিতে পারিলে, এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। কেননা, যেমন কোন কোন সময়ে তিনি আপনাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া ছিলেন, তেমনি অন্যান্য বহু স্থলে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, একজন পাপী ও সামান্য ব্যক্তি বলিয়া প্রকাশ করিতেন; এবং যদি কেহ তাঁহাকে পরমেশ্বর বোধে স্তুতি করিত, তবে তাহাদিগের উপর রাগান্বিত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে যে সকল মহাত্মাগণ তাঁহার মতাবলম্বী ও প্রধান সঙ্গোপাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে স্বয়ং পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন, প্রথম কালে তাঁহারাইবা তাঁহাকে কি ভাবে দেখিতেন, কি কি সূত্র ধরিয়া তাঁহার অবতারবাদে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশায় এই মত কত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহাই আমরা এই প্রস্তাবে আলোচনা করিব।

বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রেম ভক্তিশূন্য হইয়া কতকগুলি উপধর্ম্ম ও বাহ্যানুষ্ঠান লইয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিল। তদ্দর্শনে অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অচিরকাল মধ্যে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ ও সদ্ধর্ম্মের পুনস্থাপন করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় লিখিত আছে যে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, ভগবান সেই সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্য-ধর্ম্ম পুনরুদ্ধার করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মনে ঐরূপ ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, চৈতন্যাবতার সংস্থাপন পক্ষে উত্তর কালে এই ভাবই মূল কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালে শ্রীচৈতন্য দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পিতৃকৃত্য করিবার নিমিত্ত গয়া ক্ষেত্রে গমন করিয়া ছিলেন। সেই স্থানে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পুরীর অলোকিক ভক্তিভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চৈতন্য দেব তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন; তদবধি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রেম, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দেখা দিতে

লাগিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে কখন, ধর্ম্ম বিষয়ে বড় একটা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিত পাঠে জানা যায় না। বরং অশেষ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদাই বহুল ছাত্র সমভিব্যাহারে অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নানা প্রকারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন, ইহাই দেখা যায়। লোকে তাঁহার অহঙ্কারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিমাই "ঢাঙ্গাতি" বলিয়া ডাকিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, উত্তর কালে যাঁহারা তাঁহার প্রধান অনুচর হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তখন ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ভবিষ্যতে ইনি একজন পরম ভাগবত হইয়া উঠিবেন। অবতারবাদের ত কথাই নাই। তাঁহার বাল্য জীবনের যে সকল অলৌকিক ঘটনা চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, দেখা যায়, তাহা উত্তর কালীন তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মজীবনের আদর্শে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই প্রস্তাবের উপক্রমনিকায় কথিত হইয়াছে যে, চৈতন্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপে একটী ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গোষ্ঠী ছিল; শ্রীবাস, অদ্বৈত, মুরারী, মুকুন্দ প্রভৃতি সকলে এই গোষ্ঠী ভুক্ত ছিলেন। গয়া গমনের পূর্ব্বে গর্ব্বিত নিমাই পণ্ডিত কত প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন, ও তাঁহাদের ভাবুকতা লইয়া উপহাস করিতেন, এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া নিরুত্তর করিতেন। ইহাতে সকলে তাঁহার উপর এত বিরক্ত হইত যে, পথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। চৈতন্য-ভাগবতে এ সম্বন্ধে লিখিত আছে :

"শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন,
মিথ্যা বাক্য বায় ভয়ে সবে পলায়েন।
যদি কেহ দেখে তাঁরে আইসেন দূরে,
সবে পলায়েন ফাঁকি জিজ্ঞাসার তরে।"

স্থানান্তরে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিতেছেন।

"এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র,
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র।
আমা সম্ভাষণ নাহি কৃষ্ণের কথন,
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন।" চৈঃ ভাঃ

একদিন ভাগীরথী তীরে শিষ্য বৃন্দের মধ্যে বসিয়া নিমাইপণ্ডিত শাস্ত্রের বিচারে মগ্ন। দূর হইতে শ্রীবাস, মুরারি ও মুকুন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছেন ;—

"কেহ বলে হেন রূপ, হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ, কিছু নহে উপকার।
মনুষ্যে এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই,
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই।
দণ্ডবৎ হই সবে পড়িলা গঙ্গারে,
সব ভাগবত মিলি আশীর্ব্বাদ করে।
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন,
তবরসে মত্ত হই ছেড়ে অন্য ধন।" চৈঃ ভাঃ

পুনশ্চ--"কেহ কেহ সাক্ষাতেই প্রভু দেখি বলে,
কি কার্য্যে গোঁঙাও কাল তুমি বিদ্যাভোলে।
কেহ বলে হের শোন নিমাই পণ্ডিত,
বিদ্যায় কি কায কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত।" চৈঃ ভাঃ

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তখন অবতারের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারই ভাবী শিষ্যগণ তাঁহাকে একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াও জানিতেন না ; বরং যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মে মতি হয়, সে জন্য সর্ব্বদা

প্রার্থনা করিতেন। ইহার পরে গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপন মনের পরিবর্ত্তিত ভাব দুই চারিটী বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে ঐ সব বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন;—

"মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার,
এমন ইহানে কভু না দেখি যে আর।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে,
কি বিভাব পথে বা হইল দরশনে।" চৈঃ ভাঃ

পরদিন প্রত্যুষে বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে লইয়া শ্রীবাস প্রাঙ্গনে কুন্দ পুষ্প তুলিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীবাসের সহোদর শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট গৌরাঙ্গের ভাব পরিবর্ত্তনের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

"পরম অদ্ভুত কথা বড় অসম্ভব,
নিমাই পণ্ডিত হইল পরম বৈষ্ণব;
পরম বিরক্ত রূপ নাহিক সম্ভাষ,
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ।
শেষে কৃষ্ণ বলিয়া যে কান্দিতে লাগিলা,
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা।
যে ভক্তি দেখিনু আমি তাঁহার নয়নে,
তাঁহারে মনুষ্য বুদ্ধি নহে আর মনে।
শ্রীমান বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ
হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখন।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার
গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।"
চৈঃ ভাঃ

ইহার পর দিন দিন চৈতন্য-দেহে প্রেম ভক্তি প্রকাশ হইতে লাগিল, ধর্ম্ম জীবন লাভের জন্য মহা ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং অশেষ প্রকারে সাধুসঙ্গ ও সাধু সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীবাস আদি ভক্তগণকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন ও নানা প্রকারে তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহারাও কৃষ্ণ লাভ হউক বলিয়া প্রাণ মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তখন পর্য্যন্তও কিন্তু অবতারের কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

"শ্রীবাস আদি দেখিলে প্রভু নমস্কারে,
প্রীত হয়ে ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে।
তোমার হউক ভক্তি শ্রীহরি চরণে,
মুখে হরি বল, হরি শুনহ শ্রবণে।
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ,
সবারে চাহে প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ।
তোমরা সে পার কৃষ্ণ ভজন দিবারে,
দাসে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।
তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণ ভক্তি পাই,
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঁই।
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে,
ধূতি বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে।
কুশা গঙ্গা মৃত্তিকা দেন কারো করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে।"
চৈঃ ভাঃ

এইরূপে চৈতন্য দেব যতই ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার অলৌকিক ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মহাভাবের যাবতীয় লক্ষণ সকল তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। মহাভাবে মগ্ন হইয়া কখন নাচিতেন, কখন কাঁদিতেন, হাসিতেন এবং কত সময়ে নীরবে বসিয়া থাকিতেন। আবার কখন ভাবে উন্মত্ত হইয়া মহাযোগে আপনাকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্নাত্মা বোধে কত কথা কহিতেন। এই সময়ে নিত্য নিত্য নূতন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে নৃসিংহাবেশ হইত, কখন

বলরামের ভাব প্রকাশ পাইত, কখন বা, আপনাকে রামচন্দ্র মনে করিতেন এবং আরং নানা ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কত প্রকারে নৃত্য করিতেন। তাঁহার সঙ্গীগণও তখন প্রেম ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া, ঐসকল প্রকাশকে ঐশ্বরিক প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই সকল ভাবের প্রকাশ হইতেই যে তাঁহার অবতারত্বের মত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগাবসানে যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত, তখন ঐ সকল ভাবের কিছুমাত্র লক্ষিত হইত না। বরং মহা দৈন্য ও ব্যাকুলতা সহকারে আপনাকে অতি হীন ও সামান্য জ্ঞান করিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যেক মহাপুরুষেই এই সকল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দেবনন্দন ঈশা মহাযোগে মগ্ন হইয়া আপনাকে ও ঈশ্বরকে এক বলিয়া ছিলেন। 'I and my father are one'. যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুনকে সমস্ত ভগবতগীতার উপদেশ বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মহাত্মাগণ যোগ হইতে বিযুক্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া পরিচিত করিতে কখনই সঙ্কুচিত হইতেন না।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে, অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন "হে ভগবান্, আপনি পূর্ব্বে যে ধর্ম্মতত্ত্ব আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, অতএব পুনরায় সেই সমস্ত তত্ত্ব কথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।" ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে, অতি সুস্পষ্টরূপে আমাদের কথা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি বলিলেন, তখন আমি যোগযুক্ত হইয়া যে তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলাম, এইক্ষণে আর তাহা পুনরাবৃত্তি করিবার সাধ্য নাই।

"ন শক্যং তন্ময়া ভূয় স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগ যুক্তেন তন্ময়া॥"
অনুগীতা। ১৬ অ। ১২। ১৩।

শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের মধ্য দিয়া প্রাগুক্তরূপে যে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেলেন, এবং তাঁহার জীবত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব পৃথক্ কবিতে না পারিয়া, তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া ফেলিলেন। অবতার বাদের মত তখন এদেশে অক্ষুণ্ণভাবে রাজত্ব করিতেছিল; সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের উপর বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। এদেশে যখনি প্রাকৃতিক পদার্থে বা মানব জীবনে ভগবল্লীলা লক্ষিত হইয়াছে, ভারতের দুর্ভাগ্য ক্রমে তখনি অবতার বাদ আসিয়া ভগবানের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মবীর চৈতন্যের মহত্ত্ব ও গৌরব রক্ষার জন্য ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মহাভাবের দশা ভিন্ন আপনাকে কখনই ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত করেন নাই।

ঈশ্বরাভিমান করা দূরে থাকুক, তিনি আপনাকে ভক্ত বা ধার্ম্মিক বলিতেও লজ্জাবোধ করিতেন; এবং অন্যে যদি তাঁহার প্রশংসা করিত, অমনি 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিতেন, ও ঐরূপ প্রশংসাকারীদিগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। না হইবেনইবা কেন? যাঁহার মতে তৃণ হইতে আপনাকে নীচ মনে না করিলে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া যায় না,

তাঁহার মুখ হইতে কি কখন অভিমানের কথা উচ্চারিত হইতে পারে? কাশীতে যখন তিনি মায়াবাদী ও অদ্বৈতবাদী পরমহংসগণকে অলৌকিক পাণ্ডিত্যবলে পরাস্ত করিয়া, দাস্য প্রেমের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তখন পরমহংসগণের মুখপাত্র প্রকাশানন্দ স্বামী তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও প্রেম ভক্তির ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে নিরভিমানী চৈতন্যদেব মহাবিরক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেনঃ—

"প্রভু কহে 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন।
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মসম,
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন।" চৈঃচঃ।

পুরুষোত্তমে অবস্থিতি কালই চৈতন্যজীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠার সময়। তখন তাঁহার ধর্ম্ম জীবন ষোল কলা পূর্ণ পূর্ণিমার শশধরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। প্রথম যৌবনে প্রেম ভক্তির যে জোয়ার আসিয়াছিল, তাহা অসামান্যরূপে পূরিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বে মণিপুর, ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যেখানকার যত সাধুভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সম্মান করিবার নিমিত্ত লালায়িত। তাঁহার ধর্ম্মে সহস্র সহস্র লোক দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিপুষ্ট করিতেছিল এবং চারি দিক হইতে তাঁহার জয় বিঘোষিত হইতেছিল। এ সময়ে কিন্তু তাঁহার নিজ ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। তখনও কোন শিষ্যের সাহস হইত না যে, তাঁহার সমক্ষে বা জ্ঞাতসারে তাঁহার স্তুতি করিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে, কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। এক দিন শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, মত্ততা সহকারে তাঁহার নাম দিয়া একটী নূতন গান রচনা করত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ গান কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না; বোধ হয় তাঁহার নামরচিত সঙ্কীর্ত্তনের এই প্রথম সূত্রপাত। যাহাহউক, ইহা শুনিতে পাইয়া চৈতন্য প্রভু অশেষ প্রকারে গায়কদিগকে তিরস্কার করিয়া ছিলেন।

"এক দিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ,
মহাপ্রভুর গুণ গাইয়া করেন কীর্ত্তন।
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন?
ঔদ্ধত্য করিতে হইল সবাকার মন,
স্বতন্ত্র হইয়া সবে শাসিবে ভুবন?" চৈঃ চঃ

চৈতন্যের তিরোভাবের পর রূপ ও সনাতন গোস্বামীই তাঁহার অবতারত্ব স্থাপন বিষয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যাবতার যে একরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফলে। কিন্তু তাঁহার জীবনসময়ে ইহাঁরাও কোন কথা বলিয়া উঠিতে পারিতেন না। রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ঐ দুই নাটকের নান্দীতে আপন অভীষ্ট দেবের বন্দনা উপলক্ষে দুইটী শ্লোকে চৈতন্যাবতারের কিঞ্চিত আভাস দেওয়া ছিল; এক দিন হরিদাসের বাসায় চৈতন্য দেব, রামানন্দ রায়, ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ সমাগত ছিলেন,

হরিদাস প্রমুখাৎ ঐ দুই নাটক রচনার বিষয় অবগত হইয়া রামানন্দ রায় তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন রূপগোঁসাই মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া গ্রন্থের অংশ স্থানে স্থানে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রায় রামানন্দ নান্দী ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া প্রথমত তাহাতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

"রায় কহে কহ ইষ্ট দেবের বর্ণন,
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন।
প্রভু কহে কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে,
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে। চৈঃচঃ

তখন রূপ গোস্বামী ঐ দুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শ্লোক দুইটীর বাঙ্গালানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"পূর্ব্বে আর কখন যে উজ্জ্বল মধুর রস জগতে প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ ভক্তি সম্পদ প্রদান করিবার জন্য, যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও উজ্জ্বল, সেই শচী নন্দন হরি (সিংহ) তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত থাকুন।

বিদগ্ধমাধব।

"যিনি জগতে উদিত হইয়া স্বর্গীয় প্রেমসুধা অপর্য্যাপ্তরূপে বিতরণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ করত সকলের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেমে সকল জগতবাসী বশীভূত হইয়াছে, সেই শচীনন্দন শশী আমাকে অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করুন।"

ললিতমাধব।

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্য দেব রাগান্বিত হওত রূপকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ও রামানন্দ রায় রূপের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহার উপরও মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু বলিতেছেন ;—

"কাঁহা তোমার কৃষ্ণ রস কাব্য সুধা সিন্ধু,
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষার বিন্দু।
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পুর,
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস,
শুনিতেইলজ্জা লোকে করে উপহাস।" চৈঃচ

অবশেষে রায়রামানন্দ এই বলিয়া মহাপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, গ্রন্থ মধ্যে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারদিগের ইষ্টদেবের বন্দনা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। রূপ ঐ প্রথানুসারে আপন ইষ্ট দেবতাকে হরি (সিংহ) ও শশীর সহিত উপমা দিয়া স্তব করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।

এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিলে, কি কারণে চৈতন্যাবতারের মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা একরূপ বুঝা যাইতে পারে। ধর্ম্ম জগতে ইহা নূতন কথা নহে; সমস্ত মানব জাতির ধর্ম্ম ইতিহাসে এইরূপ ঘটনাই দেখা যায়। তবে এই প্রস্তাবে আমরা ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, যে মত অবলম্বন করিয়া এক্ষণে বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া ঘরে ঘরে পূজা করিতেছেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্ম মতের নিতান্ত বিরুদ্ধ। তিনি জীবিত থাকিলে, এই পাপানুষ্ঠান কখনই অনুমোদন করিতেন না।

চৈতন্যের ধর্ম্মের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্পর্ক।

কোন্ সময়ে ও কিরূপে বাঙ্গালা

ভাষার প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, প্রাকৃত ভাষা বাঙ্গালার আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও দেশবাসীদিগের প্রকৃতির প্রভাবে কাল সহকারে বাঙ্গলা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে ইহা ঠিক বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। যদিও ইহাতে ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রাকৃত ভাষার মধ্যে দিয়া পরোক্ষ ভাবে উপনীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, চৈতন্য দেবের বহু পূর্ব্ব হইতে যে বাঙ্গলা ভাষাই এ দেশীয়দিগের ভাষা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন ভাষার সুমার্জ্জিত গঠন, লালিত্য বা অঙ্গ সৌষ্টব আদি কিছুই ছিলনা। যেমন একটী বিস্তীর্ণ জঙ্গলে কণ্টকাকীর্ণ আগাছার মধ্যে সুন্দর সুন্দর কুসুম স্তবক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ফুটিয়া থাকে, তখন বাঙ্গলা ভাষারও সেই অবস্থা। কালক্রমে ঐ ভাষারূপ জঙ্গলে আগাছা কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যেখানে যে গাছটী সাজে, সেই খানে তাহাকে রাখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে এখন একটী সুন্দর প্রমোদকানন করিয়া তুলিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল দেশে ভাষাটী প্রথমে চলিত কথা বার্ত্তায় আবদ্ধ থাকে, তখন তাহাকে মৌখিক ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কাল সহকারে সুখ দুঃখাদি ভাবব্যঞ্জক মনের নানাবিধ অবস্থা কবিতাকারে প্রকাশিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইলে লিখিত ভাষার জন্ম হয়। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, বেদাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল মনুষ্যজাতি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বিধাতা ছন্দ বন্ধে রচনা করত, ব্যক্তি বিশেষ, কি জাতি বিশেষকে অর্পণ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাঁহাদের কথায় সায় দেয় না। বাঙ্গলা ভাষাও যে এইরূপ কথা বার্ত্তার মৌখিক ভাষা হইতে লিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, কোন্ সময়ে কেমন করিয়া বাঙ্গলা বর্ণ মালার সৃষ্টি হইল?

এ বিষয়েরও ঠিক তত্ত্ব কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। দেবনাগর অক্ষরই সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা; বাঙ্গলা অক্ষর তাহারই রূপান্তরিত অবস্থা বই আর কিছুই নহে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রাদিতে বাঙ্গলা বর্ণমালার উল্লেখ আছে। তাহা সত্য, কারণ অধিকাংশ তন্ত্রই অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তবে ন্যায়রত্ন মহাশয় যে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলা অক্ষর ও বাঙ্গলা ভাষা একদা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

চৈতন্যের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, এবং বাল্মীকি ও চসরের ন্যায় তাঁহারা ও বাঙ্গলার আদি কবি ছিলেন সত্য, কিন্তু বাল্মীকি ও চসর যেরূপ সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় আনুপূর্ব্বিক

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহারা সেইরূপ করেন নাই। ইহাদের রচিত অনেকানেক পদাবলী ও গীতিকবিতা আছে বটে, কিন্তু তাহা রামায়ণ ও Canterbury Tales এর ন্যায় পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সূত্রে গ্রথিত গ্রন্থ বিশেষ নহে। ঐ সকল কবিতার অধিকাংশই রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক নানা ভাবের ও নানা অবস্থার খণ্ড খণ্ড কবিতাবলী মাত্র। চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গ ভাষায় আনুপূর্ব্বিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতকেই বাঙ্গলার আদি গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও কড়চা গ্রন্থ গুলি এই দুই গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তত্তাবতে কোন ঘটনাবিশেষ আনুপূর্ব্বিক বিবৃত না হওয়ায়, সে গুলিকে গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত করা কর্ত্তব্য নয়।

যেরূপ পিতা মাতার নিকট সন্তানগণ, সেইরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিকট বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে এ বিষয়ে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন ও অশেষ প্রকারে বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ ঘৃণা সহকারে মাতৃ ভাষাকে উপেক্ষা করত, ইহাতে গ্রন্থাদি রচনা করিতেন না। তখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক গ্রন্থাদি রচিত হইত, কিন্তু সে সকলই সংস্কৃত ভাষায়। এমন কি বৈষ্ণব কবিগণ ও উত্তরকালে সমুদ্ভূত রায় গুণাকর প্রভৃতি বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ কবি সকলও সম্পূর্ণরূপে এই প্রথাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকেও সংস্কৃতে গ্রন্থ সকল রচনা করিতে হইত। রূপ গোস্বামী প্রভৃতির সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, চৈতন্য চরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃত গোবিন্দলীলামৃত ও ভারত চন্দ্র রায়ের চৌরপঞ্চাশত্, নাগাষ্টক প্রভৃতি কাব্য এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

চৈতন্যদেব ভারতীয় ধর্ম্ম জগতে যে যে সংস্কার আনিয়া দিয়া যান, তাহার মধ্যে দেশের চলিত ভাষায় ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল প্রচার করা একটী প্রধান। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণাচার্য্যদিগের মত, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দুধর্ম্মের অনেক সংস্কার করিয়াছিলেন সত্য বটে, এ বিষয়ে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহারা উদারচেতা ও সমদর্শী চৈতন্য দেবের অনেক পশ্চাতে ছিলেন বলিতে হইবে। যিনি জাতি ও পাত্র নির্ব্বিশেষে আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত যে ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সকল সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষার অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা কখনই অনুমোদন করিতে পারে না। তাই তিনি ঐ সকল তত্ত্ব প্রচলিত গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তদবধি কড়চা গ্রন্থ সকল, সুমধুর পদাবলী ও বিবিধ ভাব পূর্ণ সঙ্গীত মালা বিরচিত হইয়া মাতৃ ভাষার অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিল। ভাষার উন্নতি সাধন করা বৈষ্ণবগণের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও গৌণরূপে যে তাহা সংসাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবীর গ্রন্থের মধ্যে কড়চা গ্রন্থগুলি চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, ভক্তমাল ও নানাবিধ মহাজনী পয়ার ও পদাবলী এবং নরোত্তম দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনা, প্রেমভক্তি ও পাষণ্ড দলন সচরাচর দেখা যায়। কড়চা গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য। প্রথমোক্ত তিন খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রস্তাবের উপক্রমণিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পাঠক মহাশয় তাহাদের বিষয় ও প্রকার ভেদের বিবরণ অনেকটা জানিতে পারিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে গ্রন্থকারগণ ভাষার লালিত্য ও কবিতার সৌন্দর্য্যের দিকে তত দৃষ্টিপাত করেন নাই, যত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতেই এই সকল গ্রন্থ এক্ষণকার মার্জ্জিত-বুদ্ধি পাঠকের নিকট তত প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। নতুবা ইহাদের মধ্যে যে, অপূর্ব্ব ভাব ও মাধুর্য্য-সম্পন্ন কবিতা নাই, তাহা নহে। বরং ভাব ও রস মাধুর্য্যে বৈষ্ণব কবিগণ যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে এবং স্থানে স্থানে ভাষা-মাধুর্য্যেরও এরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে তাহা অতি কম কবিতেই দেখা যায়। আমাদের কথা সপ্রমাণার্থে এখানে একটী মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম,
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে মোর নাম।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনী
কোন্ রন্ধ্রে কেকাঁরবে নাচে ময়ূরিণী।
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত,
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ।
কোন্ রন্ধ্রে ষড়্ঋতু হয় এককালে,
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফলফুলে।
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়,
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।"

জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্রজবুলি ও "যাঞা," "খাইঞা" প্রভৃতি রাঢ়-দেশীয় চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন অধিকাংশ গ্রন্থকারের বাসস্থান রাঢ় ভূমিতে ছিল, তখন তাঁহারা যে তাঁহাদের দেশ-প্রচলিত শব্দ সকল স্ব স্ব গ্রন্থ মধ্যে প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে ব্রজ ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহা অনুমান করা ঠিক নহে যে, তৎকালে ঐ প্রকার ভাষা এ দেশে প্রচলিত ছিল। বাস্তবিক ঘটনা তদ্রূপ নহে। জীব গোস্বামী প্রভৃতি অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাগণ বৃন্দাবনে বাস করিতেন; তাঁহাদের বর্ণিত বিষয়গুলিও প্রায় রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে থাকিত; এবং ব্রজবুলি গুলি শুনিতেও অতি সুমধুর, তারই জন্য বোধ হয় গ্রন্থ মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্রজবলি ব্যবহৃত হইত।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।
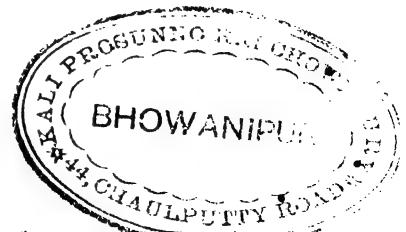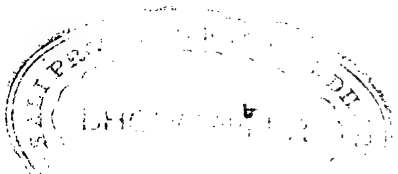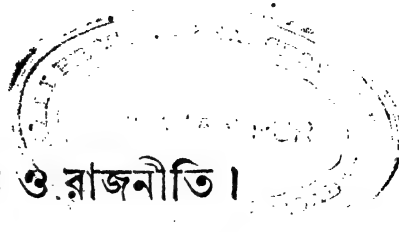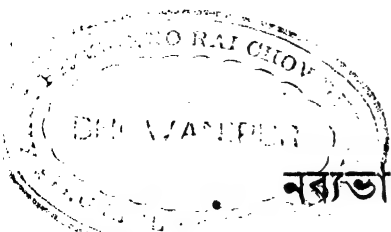
নব্যভারত ও রাজনীতি।

"We protest, then, against all inequality, against all oppression, wheresoever it is practised; for we acknowledge no foreigners; we recognise only the just and the unjust; the friends and enemies of the law of God."

"All inequality brings after it a proportional amount of tyranny; wherever there has been a slave, there has also been a master; both distorting and corrupting in all those who see them, the idea of life."

Mazzini.

"মাথা নাই তার মাথা ব্যথা"—আমাদের দেশের একটী প্রাচীন কথা। নব্যভারতের রাজনীতির কথা যখনই মনে হয়, তখনই এই প্রাচীন কথাটী আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। যে দেশে রাজা নাই; প্রজা নাই, সে দেশের রাজনীতি কল্পনা বই আর কিছুই নহে। ভারতে প্রকৃত রাজার অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে, প্রকৃত রাজনীতি কি,আমরা তাহা বুঝিতেও অক্ষম। রাজা কি? না—প্রজাশক্তির সমবেত বল, প্রজাশক্তির হৃদয়ের দেবতা। ভারতের ইংরাজ রাজা—আপনি উত্থিত, নিজ বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহাকে আমরা প্রকৃত রাজা বলি না। যে রাজা, প্রজার ভালবাসা বা ইষ্টানিষ্টের মুখাপেক্ষা করে না, কেবল পাশব-অস্ত্র বলে রাজ্য শাসন করিতে চায়, সে রাজা রাজাই নহে। প্রকৃত রাজভক্তিশূন্য ভারতে রাজনীতি—কবিত্ব,—কল্পনা,—বৃথা আড়ম্বর—বৃথা, হই-চই। এ দেশে প্রকৃত রাজনীতি সমালোচনার দিন আজও অভ্যুদয় হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমরা যাহা ভাবিয়াছি, সরল প্রাণে খুলিয়া লিখিতেছি।

সকল কথা লিখিবার পূর্ব্বে, দুই একটী অবান্তরিক কথার প্রসঙ্গ করিতে চাই। আমাদের দেশে অনেকগুলি সংবাদ পত্র আছে, যাহাতে 'ইংরাজনীতির' আলোচনা সময়ে সময়ে দেখা যায়। অনেকগুলি সভা আছে, যাহাদের উদ্দেশ্য ইংরাজনীতির আন্দোলন করা। ভারতের সর্ব্বস্থানেই অসংখ্য২ ইংরাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতায় তিনটী বড় সভা পূর্ব্বেই ছিল, সম্প্রতি আবার একটী নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক প্রকার,লক্ষ্য সকলেরই এক রকম। সকলেরই উদ্দেশ্য—'ইংরাজনীতির আন্দোলন করা।' এক স্থানে এক উদ্দেশ্য লইয়া এত গুলি সভা কেন?—এক সভা থাকিতে আর এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কেন?—ইহার দুটী কারণ দেখা যায়। একটী কারণ এই,—কোন সভাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না; দ্বিতীয় কারণ, পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিল নাই। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, জমিদার প্রজা, শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদাভেদ দুর্জ্জয় পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছে! এক দলের লোকের সহিত অন্য দলের মিল নাই—এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত। যে কারণে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন থাকিতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সৃষ্টি, সেই কারণেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন থাকিতে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সৃষ্টি, আবার সেই কারণেই এই তিনটী সভা বিদ্যমান থাকিতেই আবার "নেসন্যাল

লিগের" অভ্যুত্থান হইয়াছে। ইহাকে যাঁহারা মঙ্গলের চিহ্ন বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন। আমরা কিন্তু এই অমিল-বাদ এবং এই বৈষম্য-বাদ প্রচারের মধ্যে বড়ই অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি। নেসন্যাল-লিগ যদি তিনটীকে মিলাইয়া একটী করিতে পারেন, তবে সুখের পরিসীমা থাকিবে না। যতদিন তাহা না পারিবেন, ততদিন আমরা ইহার মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্নই দেখিব।

পূর্ব্বে যে তিনটী সভা ছিল, সে তিনটী সভারই উদ্দেশ্য, ইংরাজ-নীতির সমালোচনা করা। গৃহের বিবাদ সমভাবেই রহিয়াছে,—দেশের প্রকৃত অভাব যাহা তাহা বরং দিন দিন বাড়িতেছে। এই দুর্দ্দশার দিনে আমাদের কার্য্য হইল কি? না—কেবল-ইংরাজের নিকট আবেদন করা। দেশের প্রকৃত বল যাহারা, তাহাদের উদরে অন্ন নাই, রোগের ঔষধ নাই, মনুষ্যত্বের বীজ-রূপিণী শিক্ষার উপায় নাই—একতা নাই, শান্তি নাই, ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই—সে দিকে ভ্রমেও চাহিব না, পকেট খুলিয়া একটী পয়সাও সে দিকে ব্যয় করিব না, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া একবারও তাহাদের অভাব স্মরণ করিব না,—কেবল অভাবের জন্য আবেদন করিব। আবেদনের উপর ক্রমাগত আবেদনই চলিতেছে। অন্যের দয়া উত্তেজিত করিতে কত চেষ্টাই হইতেছে! এই শোচনীয় অবস্থা যে আমরা কতকাল নব্যভারতের অস্থি মজ্জাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে দেখিব, কে বলিতে পারে? সম্প্রদায়গত ঘৃণা বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়িতেছে, চরিত্রহীনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, উদাসীনতা ক্রমেই সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে, অনাত্মীয়তা ক্রমেই দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে!! আশা কোথায়, কে বলিতে পারে? আশা-শূন্য, উদ্দেশ্য-শূন্য; তবুও সভার কার্য্য চলিতেছে! হায় হায়, কেবল সাহেবের সম্মান বাড়ান ভিন্ন, সাহেবের নিকট পত্র লেখা ভিন্ন আর এমন কোন মহৎ কার্য্য পাওয়া গেল না, যাহা লইয়া এই সভাগুলি কার্য্য করিতে পারেন! রিপনের গুণগানেই মত্ত হও, বা কটনের যশ ঘোষণাতেই বদ্ধ পরিকর হও, যত দিন ভারতের শক্তি জাগ্রত না হইবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। ভারতের কোটী কোটী নরনারী মরণের কোলে যতদিন শয়ন করিয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না।

কথায় শুনি, এই সভাগুলির উদ্দেশ্য, দেশের উন্নতি সাধন করা; কিন্তু কাজে দেখি, ইংরাজের উন্নতির জন্যই যেন সকলে ব্যস্ত। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। দেশের কোটী কোটী লোক যে ভাষায় অনভিজ্ঞ, সেই ভাষাতে সমস্ত সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। নেসন্যাল-লিগের প্রাণে একটু উদ্দীপনার বেগ উঠিয়াছে, তিনি দুই খানি আবেগপূর্ণ, সুন্দর পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। কত আশার কথা আমরা তাহাতে শুনিলাম। কিন্তু তাহারও ভাষা, ইংরাজি। ভারত সন্তানের নিকট যে ভাষা মৃতের ন্যায়, সেই ভাষায় "Awake" নামক পদ্যটী লিখিত। কত জন লোকে পড়িবে, বলত? কজন লোকের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে, বলত? মুখে বলি ইংরাজি ভাষা, পত্রে লিখি ইংরাজি ভাষা, পুস্তকে লিখি ইংরাজি ভাষা; এদিকে কাজ করি, দেশের! এ কেমন কথা, বলত?

এ সকল কথা এখন থাকুক। আমাদের বিবেচনায়, মূলেই কিছু ভুল রহিয়া

গিয়াছে। যে ইংরাজ-নীতি সংশোধন করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যে দারুণ ভ্রম রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা বলি, ইংরাজের সকল আইন গুলি যদি ভাল হয়, ইংরাজের সকল অত্যাচার যদি স্থগিত হইয়া যায়, ইংরাজ যদি প্রেমের শাসন আরম্ভ করেন, তবু প্রাণের পিপাসা অতৃপ্ত থাকিবে। জাতীয়-শক্তি গঠনই—আমাদের লক্ষ্য। ইংরাজের অত্যাচার স্থগিত হইলে বরং আমাদের জাতীয়ত্ব গঠনের উপায় আরো দূরে সরিয়া পড়িবে। অত্যাচার, আরো অত্যাচার, আরো অত্যাচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই চাই। অত্যাচার প্রচারিত হয়, ইহা চাই; কিন্তু সংশোধিত হয়, ইহা চাই না। আরো অত্যাচার বৃদ্ধি হয়, ইহাই চাই। এখনও হৃদয়-স্পর্শী অত্যাচারের ভীষণ তাড়না উঠে নাই। উঠিলে—সকল সম্প্রদায় মিলিয়া এক হইয়া যাইত, সকল জাতি জাতিত্ব ভুলিত, সকল ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া এক সার্ব্বভৌম একতার ক্ষেত্রে প্রাণে প্রাণে মিলিত! যে যাতনায় প্রাণ ছটফট করে, হৃদয় ব্যাকুল হয়, সে যাতনা আজও উঠে নাই, এই বিষম দুঃখ। পাড়ায় আগুন ধরিলে, কে স্থির মনে, জাতিত্ব বা ব্যক্তিত্ব লইয়া স্থির মনে বসিয়া থাকিতে পারে? সে সময় সকলকে মিলিতেই হয়। দেশে সেইরূপ আগুন না লাগিলে ভারতে মিলন অসম্ভব। অতএব যে সে আগুন লাগাইয়া দেয়, তাহাকে ঘৃণা করিও না। এ হিসাবে লীটন ভারতের উপকারী কি রিপণ উপকারী, তাহা জানি না। রিপণ অতি উচ্চদরের লোক, ধার্ম্মিক, স্বজাতি-প্রিয়, পরদুঃখকাতর, সহৃদয় ব্যক্তি, সন্দেহ নাই, কিন্তু এক হিসাবে ভারতের বন্ধু, রিপণ অপেক্ষা স্বাধীনতা-নাশক লীটন! কারণ, লীটন যেমন আগুন লাগাইতে মজবুত, রিপণ তেমন নহেন। এ কথাটা অনেকেরই ভাল লাগিবে না, তাহা জানি। কিন্তু স্বদেশের উন্নতির জন্য, যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না লিখিয়া পারি না; তা ভালই বল, আর মন্দই বল। আমাদের স্থির বিশ্বাস—আয়রলণ্ডের অমূল্য-রত্ন রবার্ট এমেটের ন্যায় শত শত লোকের শোণিত পাত যদি ইংরাজেরা না করিত, তবে ঐ হতভাগ্য দেশ আজ এমন করিয়া জাগিতে পারিত না। ম্যাটসিনির প্রচারিত সংবাদ পত্র যাঁহারা পাঠ করিত, তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইত!—এরূপ ভীষণ অত্যাচার না হইলে ইটালি আজ স্বাধীনতার মুখ দেখিত না। অত্যাচার যত বাড়ে, ততই লোকের চক্ষু ফুটে। যতই অভাব বোধ জন্মে, ততই অভাব দূর করিবার চেষ্টা হয়। এই ভারতবর্ষে একটু জীবন্ত ভাব দেখিয়াছি—যখন বঙ্গের সুসন্তান সুরেন্দ্রনাথ হরিণ-বাড়ীর ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আর জীবন্ত ভাব দেখিয়াছি—যখন মহলার রাও গুইকোমরকে বন্দী করা হইয়াছিল। অতএব একথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, ভারতের মৃত জাতিকে—নানাদিকে বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক সূত্রে বাঁধিবার প্রধান রজ্জু, ইংরাজ-অত্যাচার। যাঁহারা তাহা সংশোধন করিতে বদ্ধ-পরিকর, আমাদের মতে তাঁহারা ভ্রান্ত! তাঁহাদিগকে হিতৈষী বলিয়া শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভারতের বন্ধু বলিয়া কখনই তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা

করিতে পারিনা। বিদেশের রাজা—কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। দুই চারি দিনের জন্য বাঞ্ছনীয় হয়, হউক, কখনই চিরকালের জন্য জাতির লক্ষ্য তাহা হইতে পারে না। এই জন্য, জাতির লক্ষ্য, ইংরাজ নীতি সংশোধন হইতে পারে না। পুণ্য-প্রসূ ভারতের সর্ব্বস্ব—নীতি আর ধর্ম্ম, একতা আর সাম্য—সব গিয়াছে কেবল অধীনতার তাড়নায়। কিন্তু হায় আবারও অধীনতার সময় বৃদ্ধির জন্যই চেষ্টা হইতেছে! ভারতের পরিণাম কি, কে বলিতে পারে?

দেখিয়া শুনিয়া আমরা কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছি। ১২৮৩ সালে দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনের পূর্ব্বে তীব্র সমালোচনা করিয়াও সম্পাদকগণ যজ্ঞে আহুতি দিতেই নিমন্ত্রণ পাইয়া, উল্লাসে সেই প্রাণ-স্পর্শী মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষের সময়ে দিল্লীতে গিয়াছিলেন। আর এখনও ইংরেজ-নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াও দেশের বড় বড় হিতৈষীগণ একটু আদর পাইলে,একটু মর্য্যাদা পাইলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ইংরাজ সহবাসের জন্য লালায়িত হন! এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছি। কথায় এবং কাজে মিল বড়ই কম। সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশ হয়, ইংরাজেরা তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, কারণ তাহারা জানে, একটু খোসামুদী পাইলেই সকলে আপন আপন মত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, কারণ তাহারা জানে, সংবাদ পত্রের মতের দ্বারা বড় একটা এ দেশীয় লোকেরা চালিত হয় না। আমাদের এক স্বার্থ, টাকা; আর এক স্বার্থ, যশ। এই দুই স্বার্থই আমাদের অনেক কাজের পরিচালক। যেখানে অপমান, যেখানে নির্যাতন, যেখানে তীব্র সমালোচন, সেখানে যাইতেও আমরা কুণ্ঠিত। এমন কয়জন হিতৈষী আমাদের দেশে আছেন, যাঁহারা, মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, দীন হীন, অন্নক্লিষ্ট, কুলভ্রষ্ট, বস্ত্রহীন অর্দ্ধ উলঙ্গবৎ ঐ মাঠের কৃষকের সহিত একাত্মক হইয়া যাইতে একটুও সঙ্কুচিত নন? কয়জন শিক্ষিত লোক, অশিক্ষিতের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত নন্? —কয়জন ধনী—দরিদ্রের মাদুরে উপবেশন করিতে একটুও লজ্জিত নন্! মহত্ত্ব কোথায়? তাহা হৃদয়ে। প্রকৃত হৃদয়ের পরিচয় দেখিতে চাও, ঐ জাগ্রত ইটালির পানে একবার তাকাও। যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অসংখ্য যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, রাজ্যের পর রাজ্য লাভ করিয়া জয়ী বীর গ্যারিবল্ডি সমস্ত রাজ্য, ভিক্টর-ইমানিউএলের নামে উৎসর্গ করিয়া, ঐ দেখ, দরিদ্রের বেশে কাপ্রেরায় (Caprera) ফিরিয়া যাইয়া হলচালনা করিয়া দিনপাত করিতেছেন! মহত্ত্বের পর মহত্ত্ব! চতুর্দ্দিক হইতে উপহার আসিতেছে, গ্যারিবল্ডি তাহা মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া অম্লান বদনে অস্ট্রিয়ার আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার জন্য পাঠাইয়া দিতে বলিতেছেন। যে অস্ট্রিয়ার অত্যাচারে এক দিন তাঁহার সর্ব্বশরীরে রুধির প্লাবন বহিয়াছিল—যাহাদের পাশব অত্যাচারে প্রাণপ্রিয়া, যুদ্ধ-সঙ্গিনী এনিটার অকাল মৃত্যু-যন্ত্রনার তীব্র যাতনায় তাঁহাকে মুহ্যমান হইতে হইয়াছিল, তাহাদের জন্যই সমস্ত উপহার পাঠাইতে বলিতেছেন। বীরত্ব কি গ্যারিবল্ডির বাহুতে? না, বীরত্ব—গ্যারিবল্ডির হৃদয়ে। হায়, হায়, সে দৃষ্টান্ত হতভাগ্য ভারতে কোথায়?

বীরের বীরত্ব—হৃদয়ীর হৃদয়ত্ব—সব শ্মশানে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। স্বার্থান্ধ হতভাগ্য ভারতের দল, একতা ভুলিয়া, সাম্য ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া, নীতি ভুলিয়া পশুর অভিনয় দেখাইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে! পরের কুৎসায় সংবাদ পত্র পূর্ণ,—ঘৃণা বিদ্বেষের আগুন ঘরে ঘরে জ্বলিতেছে। রাজা নাই, প্রজা নাই, সমাজ নাই, ধর্ম্ম নাই। কিছুই নাই। রাজনীতির কথা মনে হইলে, আমাদের প্রাণ অস্থির হয়। কিসের আলোচনা করিব? কার কথা বলিব? কিছুই নাই। হৃদয় নাই যে হৃদয়ের কথা বলি, প্রকৃত সমাজ নাই যে সমাজের কথা লিখি। সব শ্মশান, সব ভস্মময়! ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া উল্লাস বা আনন্দ কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে। তাই গৃহে বসিয়া কাঁদিতেছি; আর বিধাতাকে ডাকিতেছি। যাঁহার কৃপা ভিন্ন ভারতের গতি নাই, তাঁহারই চরণে পড়িয়া রহিয়াছি। তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম আর রাজনীতিকে জগতের লোকেরা দুই ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ম্যাটসিনি একথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—এই দুয়ে ঘনীভূত যোগ—ঘেসাঘেসি ভাব। ধর্ম্ম ভিন্ন রাজনীতি—স্বেচ্ছাচার-নীতি। ধর্ম্ম কি? না মানবীয় সকল শক্তির বিকাশ। ধর্ম্ম কি?—না জ্ঞান, প্রেম আর ইচ্ছার মিলন-বিকাশ। প্রেম ভিন্ন একতা নাই, জ্ঞান ভিন্ন সাম্য অসম্ভব—ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্য ঘটে না। আর এই তিনের মিলন ভিন্ন, মানব, পবিত্রতা পায় না—চরিত্রবান হইতে পারে না। এই তিন মিলিয়া যে হৃদয়ে এক হইয়া গিয়াছে—সেই হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি অবতীর্ণ। সে দুর্দ্দম্য তেজের স্ফুলিঙ্গের নিকট জগৎ তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে। জ্ঞান ভিন্ন প্রেমের উদয় অসম্ভব, আর প্রেম ভিন্নও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না; আবার জ্ঞান ও প্রেম—কেবল কল্পনায় থাকিয়া যায়, যতক্ষণ না তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। ভারতের উদ্ধারের জন্য এই তিনের মিলন, সামঞ্জস্য-সাধন বড়ই প্রয়োজনীয়। ভেদাভেদ নাশ করিতে, বৈষম্য ডুবাইতে,—একতা আনিতে, ঐ জ্ঞান, প্রেম, আর ইচ্ছা ভিন্ন আর গতি নাই। এদেশে যে সভার প্রয়োজন নাই, সংবাদ পত্রের প্রয়োজন নাই, এ কথা আমরা বলি না। এ সকলেরই প্রয়োজন আছে—কেবল জ্ঞান আর প্রেম প্রচারের জন্য। ইংরাজ-অত্যাচার নিবারণের জন্য এ কিছুরই প্রয়োজন নাই। সভা করিয়াছ যদি, তবে যাও, গ্রামে গ্রামে স্কুল বসাও, সাধারণ শিক্ষার জন্য যত উপায় আছে, অবলম্বন কর। দরিদ্রের ঔষধ যোগাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে ডিসপেন্সারি বসাও,—পবিত্রতার জন্য নীতি-রক্ষিনী সভা কর। জ্ঞান ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন, প্রেম ভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। ফরাশী বিপ্লবের শোচনীয় ফল দেখিয়া একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। জাতীয় ধর্ম্ম, এবং জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে তারপর বদ্ধ-পরিকর হও; কারণ ধর্ম্মের মিল এবং ভাষার মিল, জাতীয় একতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এদুয়ের প্রতি উপেক্ষার ভাব যতদিন, ততদিন প্রকৃত কার্য্য কিছুই আরম্ভ হইবে না। ইংরাজের সহিত যে যুদ্ধ বাধিবে, তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, এখন নিজের,

পরিবারে, নিজের দেশের সহিত অগ্রে যুদ্ধ বাধাও। প্রজা-শিক্ষার পূর্ব্বে ঐ প্রজা-সভাব কোনই মূল্য নাই, কোনই অর্থ নাই। উহার স্থায়ী উপকারিতা অতি অল্প। তাহারা কি বুঝে, কি জানে? হই-চই করাইয়া বাহাদুরি দেখাইলেই দেশ উদ্ধার হয় না। খাটি জিনিস চাই। খাটি জিনিসের জন্য সকলকেই চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গলার ন্যাসনেল-লিগের অভ্যুত্থান দেখিয়া আমাদের প্রাণে একটু আশার শিখা জ্বলিয়াছে, তাই এত গুলি প্রাণের কথা বলিলাম। প্রাণের মৃত আশা-গুলি একটু জাগিয়াছে, তাই উচ্ছ্বাসে এত কথা লিখিলাম। অনুকরণ ছাড়িয়া, জাতীয় শক্তি গঠনে সভা চেষ্টিত হউন। জাতিত্ব গঠনের মূলে বৈষম্যকে ছিন্ন করিতে হইবে। প্রকৃত প্রেম ও জ্ঞানের সাধন ভিন্ন তাহা অসম্ভব। জ্ঞান ও প্রেমের মূলে পবিত্রতা চাই। এই সকলকে লক্ষ্য করিয়া, সভা, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রেমের আদর্শ বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া অগ্রসর হউন; নিশ্চয় সুফল ফলিবে। দেশ উদ্ধার রূপ মহামন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া, কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হউন। এক দিনে নহে, দুদিনে নহে, শত বৎসর পরে তবে সাধনায় সুফল ফলিবে। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়কে সম্বল করিয়া, স্বার্থ ও যশ মানকে ডুবাইয়া, এই কঠোর ব্রতে ব্রতী হইলে, অবশ্য সুফল ফলিবে। নচেৎ যেমন অন্যান্য সভার দশা হইয়াছে, ইহার দশাও তাহাই হইবে। সম্প্রদায় ভাঙ্গিতে যাইয়া ইহাই আর একটী সম্প্রদায় হইবেন,—বৈষম্য নাশ করিতে যাইয়া আরো বৈষম্য সৃষ্টি করিবেন। বাহিরের হুজুগের দিকে—প্রশংসার দিকে, ইংরাজ নীতির দিকে দৃষ্টিকে না ফিরাইয়া সভা জাতীয় শক্তির মূলে জলসেচনে প্রবৃত্ত হউন। বিলাতে আন্দোলনে কি হইবে, গৃহ যদি শ্মশানই রহিয়া যাইল। ভারত-শ্মশানকে পুণ্য ও পবিত্রতা বলে নবজাতির বাসস্থান করিয়া না তুলিতে পারিলে আর মঙ্গল নাই। এই নব সভাতে অনেক হৃদয়বান লোক আছেন বলিয়া এত কথা লিখিলাম। একটুও যদি কথা গুলি কাজে লাগে, দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। বিধাতা বাঙ্গলার-নেসন্যাল লিগের কাণে এই শুভ বার্ত্তা প্রচার করিয়া মৃতসঞ্জীবনী শক্তিমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করুন। ভারতে শুভ দিনের অভ্যুদয় দেখিয়া আমরা আনন্দে নৃত্য করি। কিন্তু হায়, সে দিন কি আসিবে? প্রতিধ্বনিও নিরাশার সঙ্গীত গাইয়া বলে— হায়, সে দিন কি আসিবে?

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

নিশীথে।

নিশীথে! কি পত্র লিখিস্ তুই, তারকা-অক্ষরে,
আকাশের পরে!
সারা-রাত চেয়ে থাকি ওই শূন্যপানে,
অবাক্ নয়নে!

যেই আশা, যে পিপাসা, যেই ভাষা, ভালবাসা
বুঝেছি—ছুঁয়েছি প্রাণে; স্বপনে সঙ্গীতে
বুঝাইতে গেলে যায়, বুঝিতে পারিনা, হায়!
—চাই চারি ভিতে!
সেই কথা, সেই ব্যথা, সে আকুল নীরবতা,

সেই ফুল, সেই ভুল, বায়ু ঢুলু ঢুলু,
নদী কুলু কুলু,
সে ভাঙ্গা অজানা ঘর, সেই পরিজন-পর,
সেই সুখ, সেই মুখ, বিরহ, মিলন,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, কল্পনা, স্বপন,
সেই চোখে ঘোর ঘোর, সেই প্রাণে ভোর২—
অক্ষরে অক্ষরে তোর কেমনে উছলে ?
এ আকাশ তলে !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

স্বপ্ন-সঙ্গীত।

প্রিয়ে ! কি তুমি এসেছিলে ?
নহিলে অমৃত হেন প্রাণে কে পশিলে ?
কাল্ রেতে দু'পহরে, দেখিনু ঘুমের ঘোরে
গভীর নিশীথে সেই সবে ঘুমাইলে,
কে যেন আসিয়া হায়, বসি মোর বিছানায়
কাণে কাণে কি কহিয়া ঘুম ভেঙ্গে দিলে !
ঠিক্ তব রূপরাশি, তোমারি মতন হাসি
চকোর চঞ্চল হয়, সেও লো হাসিলে !
ধবল বসন পরা, বেলি বাস গায় ভরা
আঁধারে আলোক হয় সেও দেখা দিলে !
সরলা তোমারি মত, লাজে আঁখি অবনত,
পরাণ কাড়িয়া নেয় একটু চাহিলে !
সুন্দর গোলাপী গাল, তোমারি মতন লাল
জানিনা বিধাতা জানি কিসে বানাইলে !
হাসিয়া সে সোণামুখে, ঢলিয়া পড়িল বুকে,
গলিয়া অমৃত ধারা পরাণে পশিলে !
সরলা ! সত্যই কাল্ তুমি এসেছিলে ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শাক্যসিংহের মূর্ত্তি ও অঙ্গ লক্ষণ

শাক্যসিংহের আকার, প্রকার ও শরীরের গঠন কিরূপ ছিল, তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বোধিচর্য্যাবতার, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু অবদান ও ধর্ম্ম সংগ্রহ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনা বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা পাঠে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও অঙ্গ গঠন কিরূপ ছিল, তাহা উত্তম রূপে বোধগম্য করা যায় এবং তাহা দেখিয়া বুদ্ধের চিত্র ও চিত্রের পরিমাপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

দ্বাত্রিংশত মহালক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন-চিহ্ন যথা ক্রমে লিখিত হইতেছে, দৃষ্টি করুন।

"চক্রাঙ্কিত পাণিপাদতলতা (১) সুপ্রতিষ্ঠিত পাণিপাদতলতা (২) জালা বল বদ্ধাঙ্গুলি পাণিপাদলতা (৩), মৃদু তরুণ হস্ত পাদতলতা (৪) সপ্তোৎসেধতা (৫), দীর্ঘাঙ্গুলিতা (৬), আয়ত পার্ষির্ততা (৭) ঋজুগাত্রতা (৮), উৎসঙ্গ পাদতা (৯) ঊর্দ্ধাগ্রয়োমতা (১০), ঐণেয় জঙ্ঘতা (১১) প্রলম্ববাহুতা (১২) কোষগত বস্তিগুহ্যতা (১৩) সুবর্ণ বর্ণতা (১৪), শুক্লচ্ছবিতা (১৫) প্রদক্ষিণাবর্তৈকয়োমতা (১৬), ঊর্ণালঙ্কৃত মুখতা (১৭), সিংহ পূর্ব্বার্দ্ধকায়তা (১৮) সুসংবৃত স্কন্ধতা (১৯) চিতান্তরাংশতা (২০) রসরসাগ্রতা (২১) ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলতা (২২), উষ্ণীষ শিরস্কতা (২৩), প্রভূতজিহ্বতা (২৪), সিংহহনুতা (২৫) শুক্লহনুতা (২৬) সমদন্ততা (২৭) হংসবিক্রান্ত গামিতা (২৮) অবিরল দন্ততা (২৯) সমচত্বারিংশদ্দন্ততা (৩০) অভিনীলনেত্রতা (৩১) গোপনেত্রতা চেতি (৩২)।"

[ধর্ম্ম সংগ্রহ।]

ললিতবিস্তর গ্রন্থে এই লক্ষণ সকল বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারিণী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এইরূপ—

১। কুমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধের পদতলে রেখাময় চক্র চিহ্ন ছিল। তাহা ভাস্বর, তেজস্বী ও শুভ্রবর্ণ এবং সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত।

২। সুপ্রতিষ্ঠিত সমপাদো মহারাজ! সর্ব্বার্থ সিদ্ধঃ কুমারঃ। (ল, বি)

৩। কুমারের পদতল সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সমতল। হস্ততলও সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উচ্চ নীচ রহিত। হস্তে ও পদে শিরাজাল ও শিরা গ্রন্থি ছিল না।

৪। হস্ততল ও পদকোমলও অয়ণ বর্ণ ছিল।

৫। অংশদ্বয় ও নাসা প্রভৃতি সপ্ত স্থান উন্নত ছিল।

৬। কুমারের অঙ্গুলি দীর্ঘ বৃত্ত ছিল।

৭। পার্ষ্ণি অর্থাৎ পদ পশ্চাদ্ভাগ কিছু আয়ত বা বিস্তৃত ছিল।

৮। দেহযষ্টি বা মধ্যকায় ঋজু অর্থাৎ অবক্র বা অভুগ্ন ছিল।

৯। উপবেশন কালে তাঁহার পদদ্বয় উৎসঙ্গে অর্থাৎ ক্রোড়ে নিহিত হইত।

১০। তাঁহার গাত্র রোম ঊর্দ্ধাগ্র ছিল।

১১। জঙ্ঘাদ্বয় হরিণ রাজের জঙ্ঘার ন্যায় ছিল।

১২। তাঁহার দুই বাহু জানু পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

১৩। তাঁহার বস্তি ও গুহ্য কোষো-পগত ছিল।

১৪। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের সদৃশ।

১৫। তাঁহার ছবি অর্থাৎ লাবণ্য শুক্ল ভাস্বর।

১৬। তাঁহার প্রতি রোম কূপে এক একটী লোম, এবং তাহা প্রদক্ষিণ ক্রমে শোভিত ছিল।

১৭। তাঁহার ভ্রূমধ্যে তুষার ভাস্বর ঊর্ণা (জড়ুল চিহ্ন) ছিল।

১৮। তাঁহার মধ্যদেশ বা পূর্ব্বকায় সিংহের সদৃশ।

১৯। স্কন্ধদেশ মাংসল।

২০। তাঁহার অংশ যুগল পৃথু ও উন্নত।

২১। তাঁহার রসনা সরস ও রক্ত বর্ণ।

২২। তাঁহার মস্তক পরিমণ্ডলাকার।

২৩। শীর্ষদেশ উষ্ণিষ তুল্য ছিল।

২৪। তাঁহার জিহ্বা তনু (পাতলা) ও আয়ত (লম্বা)।

২৫। তাঁহার হনুদ্বয় সিংহের হনুর ন্যায়।

২৬। তাঁহার হনুদ্বয় শুভ্রকান্তি বিশিষ্ট

২৭। দণ্ড সমস্তই সমান।

২৮। হংসের অথবা সিংহের ন্যায়গতি।

২৯। দন্ত পঙ্‌ক্তি অবিরল অর্থাৎ পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অথচ সংলগ্ন।

৩০। তাঁহার দন্ত সংখ্যা ৪০

৩১। তাঁহার নেত্রতারা মনোহর নীল বর্ণ ছিল।

৩২। তাঁহার চক্ষু বৃষ চক্ষুর সদৃশ মনোহর ছিল।

ললিতবিস্তর গ্রন্থেও দ্বাত্রিংশৎ মহা-লক্ষণ গণিত হইয়াছে। পরন্তু সে সকলের সহিত ইহার প্রায় তুল্যতা আছে।

"উষ্ণীষ শীর্ষ মহারাজ! সর্ব্বার্থ সিদ্ধঃ কুমার অনেন মহারাজ! প্রথমেন মহা-

পুরুষ লক্ষণেন সমন্বাগতঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধঃ কুমারঃ। প্রভিন্নাঞ্জন ময়ূর কলাপাভিনীল চেল্লিত প্রদক্ষিণাবর্ত্ত কেশঃ। সমবিপুল ললাটঃ। উর্ন্না মহারাজ! সর্ব্বার্থ সিদ্ধস্য ভ্রুবোর্মধ্যে জাতা হিমরজত প্রকাশা গোপ নেত্রাভি নীল নেত্রঃ। ব্রহ্মস্বরো মহারাজ! সর্ব্বার্থ সিদ্ধ কুমারয়ঃ। রস রসাগ্রবান্। প্রভূত তনু জিহ্বঃ। সিংহ হনু। সুসংবৃত স্কন্ধঃ। সপ্তচ্ছদোচ্ছ্রিতাংশ। সুবর্ণ বর্ণ ছবিঃ। স্থিরঃ। অবনত প্রলম্ব বাহুঃ। সিংহ পূর্ব্বার্দ্ধ কায়। ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলো মহারাজ! সর্ব্বার্থ সিদ্ধঃ কমারঃ একৈ কায়া মউর্দ্ধগ্রাহি প্রদক্ষিণম। কোশোপ গত বস্তি গুহ্যঃ। সুচিবর্ত্তি তোরুঃ। ঐণেয় মৃগরাজ জঙ্ঘঃ। দীর্ঘাঙ্গুলিঃ। আয়ত পাণিপাদঃ। মৃদুতরুণ হস্তপদঃ। জাঙ্গলিক হস্তপাদঃ। দীর্ঘাঙ্গুলিধরঃ। পাদতলয়োর্মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধস্য কুমারস্য চক্রেজাতে চিত্রে হর্বিষ্যতা প্রভাস্বরে সিতে সহস্রার নেমিকে সনাভিকে। শুপ্রতিষ্ঠিতো সম পাদো মহারাজ! সর্ব্বার্থ সিদ্ধঃ কুমারঃ। অনেন মহারাজ। দ্বাত্রিংশন্মহাপুরুষ লক্ষণেন * সমন্বাগতঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধঃ কুমারঃ। নচ মহারাজ! চক্রবর্ত্তিনা মেবং বিধানি লক্ষণানি ভবন্তি † বোধিসত্ত্বানাঞ্চ তাদৃশানি লক্ষণানি ভবন্তি।" [ললিত বিস্তর।

হিমালয়বাসী অসিত মুনি যখন নরদত্ত ভাগিনেয়ের সহিত শুদ্ধোদন রাজার গৃহে বুদ্ধদেবকে দেখিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই সকল মহাপুরুষ লক্ষণ রাজা শুদ্ধোদনের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মহারাজ! এসকল লক্ষণ রাজলক্ষণ নহে, ইহা বোধিসত্ত্বের লক্ষণ। বোধিসত্ত্ব মহা পুরুষেরাই এই রূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকেন। অতএব, হে মহারাজ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে ইনি রাজ ছত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জনা আছে (ইহাও লক্ষণ বিশেষ) তাহা দেখিয়াও বুঝিলাম, ইনি গৃহবাসী হইবেন না, প্রব্রজ্যার্থ নির্গত হইবেন।

অশীতি অনুব্যঞ্জনা।

অনুব্যঞ্জনা অর্থাৎ শরীরের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক বিশেষ গুণ। চিত্রকরের রেখা চিত্রে অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে বর্ণ পূরণ দ্বারা সজীবতা ধর্ম্ম আনয়ন করে—সেই বর্ণ পূরণকে তাহারা অনুব্যঞ্জনা বলে। অতএব বুদ্ধমূর্ত্তি বুঝিতে হইলে, বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রোক্ত মহালক্ষণের পর অনুব্যঞ্জক লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনুব্যঞ্জক লক্ষণ ব্যতীত অবৈকল্য অর্থাৎ ঠিক মূর্ত্তি হইবে না।

বুদ্ধদেবের শরীরাশ্রিত অনুব্যঞ্জক লক্ষণ সকল ললিতবিস্তর গ্রন্থে উত্তম রূপ বর্ণিত আছে এবং ধর্ম্ম সংগ্রহ গ্রন্থেও আছে। মহাবস্তু অবদান ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ঐ সকল লক্ষণের উল্লেখ আছে মাত্র, বুঝিবার উপযুক্ত বর্ণনা নাই। অতএব প্রথমে ধর্ম্ম সংগ্রহ গ্রন্থের বর্ণনা ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ ললিতবিস্তরের লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিব।

তাম্রনখ্যতা (১), স্নিগ্ধ নখ্যতা (২) তুঙ্গ নখ্যতা (৩) ছত্রাঙ্গুলিতা (৪) চিত্রাঙ্গুলিতা (৫) অনুপূর্ব্বাঙ্গুলিতা (৮) গূঢ় শিরতা (৭)

* গণনা করিলে ৩২শের অধিক হয়। সুতরাং বিবেচনা হইতেছে, এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ঠিক নহে।

† ইহার অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

নির্গ্রন্থি শিরতা (৮) গূঢ় গুল্‌ফতা (৯) অতিষম পাদতা (১০) সিংহ বিক্রান্ত গামিতা (১১) নাগ বিক্রান্ত গামিতা (১২) হংস বিক্রান্ত গামিতা (১৩) বৃষভ বিক্রান্ত গামিতা (১৪) প্রদক্ষিণ গামিতা (১৫) চারু গামিতা (১৬) অবক্র গামিতা (১৭) বৃত্ত গাত্রতা (১৮) মৃষ্ট গাত্রতা (১৯) অনুপূর্ব্ব গাত্রতা (২০) শুচি গাত্রতা (২১) মৃদু গাত্রতা (২২) বিশুদ্ধ গাত্রতা (২৩) পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনতা (২৪) পৃথুচারু মণ্ডল গাত্রতা (২৫) সম ক্রমতা (২৬) বিশুদ্ধ নেত্রতা (২৭) সুকুমার গাত্রতা (২৮) অদীন গাত্রতা (২৯) সোৎসাহ গাত্র (৩০) গম্ভীর কুক্ষিতা (৩১) প্রসন্ন গাত্রতা (৩২) সুবিভক্তঙ্গ প্রত্যঙ্গতা (৩৩) চিতিমির শুদ্ধালোকতা (৩৪) বৃত্তকুক্ষিতা (৩৫) মৃষ্ট কুক্ষিতা (৩৬) অভুগ্ন কুক্ষিতা, (৩৭) ক্ষম কুক্ষিতা (৩৮) গম্ভীর নাভিতা (৩৯) প্রদক্ষিণাবর্ত্ত নাভিতা (৪০) সমন্ত প্রাসাদিকতা (৪১) শুচিসমুচায়তা (৪২) বপগতা তিলক গাত্রতা (৪৩) তুল সদৃশ সুকুমার গণিতা (৪৪) স্নিগ্ধ পাণি লেখতা (৪৫) গম্ভীর পাণি লেখতা (৪৬) আয়ত পাণি লেখতা (৪৭) নাত্যায়ত বচনতা (৪৮ বিম্ব প্রতিবিম্বোষ্ঠতা (৪৯) মৃদু জিহ্বতা (৫০) তনুজিহ্বতা (৫২) রক্তজিহ্বতা (৫২) মেঘগার্জি ঘোষতা (৫৩) মধুর চারু মধুস্বরতা (৫৪) বৃত্তদংষ্ট্রতা (৫৫) তীক্ষ্ণদংষ্ট্রতা (৫৬) শুক্ল দংষ্ট্রতা (৫৭) সমদংষ্ট্রতা (৫৮) অনুপূর্ব্বদংষ্ট্রতা (৫৯) তুঙ্গ নাসতা (৬০) শুচি নাসতা (৬১) বিশালনেত্রতা (৬২) চিত্রপদ্মতা (৬৩) সিতাসিত কমলদল নয়নতা (৬৪) আয়ত ভ্রূকতা (৬৫) শুক্ল ভ্রূকতা (৬৬) সুস্নিগ্ধভ্রূকতা (৬৭) পীনায়ত ভুজতা (৬৮) সমকর্ণতা (৬৯) অনুপহত কর্ণেন্দ্রিয়তা (৭০) অবিম্লানললাটতা (৭১) পৃথুললাটতা (৭২) সুপরিপূর্ণোত্তমাঙ্গতা (৭৩) ভ্রমর সদৃশ কেশতা (৭৪) চিত্রকেশতা (৭৫) গুড়ো কেশতা (৭৬) অসম্মুনিতকেশতা (৭৭) অপরুষকেশতা (৭৮) সুরভিকেশতা (৭৯) শ্রীবৎসস্বস্তিক নন্দ্যাবর্ত্তলক্ষিত পাণি পাদ তলতা চেতি।"

(ধর্ম্ম সংগ্রহ)।

এই অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জনার বাঙ্গালা অর্থ এইরূপ :—

১। নখ তাম্রবর্ণ অর্থাৎ আরক্ত।

২। নখ স্নিগ্ধ অর্থাৎ আর্দ্রবৎ।

৩। নখ উচ্চ অর্থাৎ মধ্যভাগ উচ্ছ্রিত।

৪। অঙ্গুলি ছত্রচিহ্ন বিশিষ্ট।

৫। অঙ্গুলি চিত্র অর্থাৎ প্রকৃত লোকের অঙ্গুলির ন্যায় নহে।

৬। অঙ্গুলি পূর্ব্বাপর ক্রমে সুবিভক্ত।

৭। শিরা দেখা যায় না।

৮। শিরা গ্রন্থি দৃষ্ট হয় না।

৯। গুল্ফ গূঢ়।

১০। দুই পা সমান অর্থাৎ ছোটবড় নহে।

১১। সিংহের ন্যায় গতি। (পদক্ষেপ)

১২। নাগের ন্যায় গতি। (পদচালনা)

১৩। হংসের ন্যায় পদবিন্যাস।

১৪। মত্ত বৃষভের ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতি।

১৫। দক্ষিণ ক্রমে গমন (দক্ষিণ চরণ প্রথমে বিন্যাস)

১৬। মনোহর অর্থাৎ লীলাযুক্ত গতি।

১৭। সরলগতি।

১৮। গাত্র বৃত্ত অর্থাৎ গোল ও মাংসল (সকল স্থান নহে, উরু প্রভৃতি স্থান)

১৯। গাত্র পরিমৃষ্ট (যেন কেহ মাজিয়া দিয়াছে)।

২০। অঙ্গ সকল পূর্ব্বাপর ক্রমে সবিভক্ত।

২১। গাত্রকান্তি উজ্জ্বল।

২২। অঙ্গ কোমল।

২৩। সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র।

২৪। সকল অঙ্গও সকল লক্ষণ পূর্ণ। (খণ্ডিত নহে)

২৫। শরীর স্থূল, মনোহর ও সুবৃত্ত।

২৬। ক্রম অর্থাৎ পদ বিক্ষেপ সমান।

২৭। চক্ষু বিশুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র বা পরিষ্কার।

২৮। শরীর কোমল।

২৯। দেহে দৈন্য ও খেদ লক্ষিত হয় না।

৩০। শরীরে উৎসাহযুক্ত।

৩১। কুক্ষি গম্ভীর। (ভুড়ী ছিল না)

৩২। অঙ্গ সকল প্রসন্ন। (যেন হাঁস্‌চে)

৩৩। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত। (যেখানে যেমন হওয়া উচিত সে স্থানে সেইরূপ)।

৩৪। শরীরের জ্যোতি বা কান্তি নিস্তিমির আলোকের ন্যায়।

৩৫। কুক্ষি বৃত্ত অর্থাৎ চ্যাপটা নহে।

৩৬। কুক্ষি মার্জ্জিত অর্থাৎ পরিষ্কার।

৩৭। কুক্ষি অভুগ্ন অর্থাৎ কোলকুজো নহে।

৩৮। কুক্ষি ক্ষীণ অর্থাৎ কৃশ (স্থূল নহে)।

৩৯। নাভি গম্ভীর।

৪০। নাভির আয়ত্ত দক্ষিণ দিকে।

৪১। অঙ্গসকলদর্শকের আনন্দজনক।

৪২। আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধাচারের দ্বারা অঙ্গের এক প্রকার অসাধারণ সৌষ্টব জন্মে)

৪৩। গাত্রে তিল ছিল না।

৪৪। হস্ততল তূল সদৃশ কোমল।

৪৫। হস্তের রেখা স্নিগ্ধ।

৪৬। হস্তের রেখা গম্ভীর।

৪৭। হস্তের রেখা দীর্ঘ।

৪৮। বচন ও স্বর অতি উচ্চ নহে।

৪৯। ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায়। (বিম্ব=এক প্রকার ফল)।

৫০। জিহ্বা কোমল।

৫১। জিহ্বাতনু (মোটা নহে)।

৫২। জিহ্বা রক্ত বর্ণ।

৫৩। গলার স্বর মেঘ গুলিতের ন্যায় গম্ভীর।

৫৪। স্বর মিষ্ট ও মনোহর।

৫৫। দাঁত সুবৃত্ত।

৫৬। দাঁত তীক্ষ্ণ।

৫৭। দাত শুভ্র বর্ণ।

৫৮। দন্ত পঙ্‌ক্তি সমান।

৫৯। দন্ত সকল পূর্ব্বাপর ক্রমে বিভক্ত।

৬০। নাসিকা উন্নত।

৬১। নাসা উজ্জ্বল।

৬২। নেত্র বিশাল।

৬৩। নেত্রের পদ্ম। (চোকের ভয়া) অদ্ভুত।

৬৪। চোকের খেত ও মণি শ্বেতপদ্মের ও নীল পদ্মের পাবরির ন্যায়।

৬৫। ভ্রু যুগল আয়ত।

৬৬। ভ্রু উজ্জ্বল।

৬৭। ভ্রু সুস্নিগ্ধ।

৬৮। বাহু পীন ও আয়ত।

৬৯। কর্ণদ্বয় সমান।

৭০। কর্ণেন্দ্রিয় তেজস্বী।

৭১। ললাট সুপ্রসন্ন। (ম্লান নহে)।

৭২। ললাট পৃথু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ।

৭৩। উত্তমাঙ্গ বা মস্তক পরিপূর্ণ অর্থাৎ কোন স্থানে উচ্চ নীচ নাই।

৭৪। কেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ।

৭৫। কেশ আশ্চর্য্য।

৭৬। নিদ্রা স্বাধীন।

৭৭। কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত।

৭৮। কেশ স্নিগ্ধ (রূক্ষ নহে)।

৭৯। কেশ সুগন্ধ।

৮০। হস্ততলে ও পদতলে শ্রীবৎস, স্বস্তিক ও নন্দ্যাবর্ত্ত, এই তিন প্রকার চিহ্ন আছে।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে বুদ্ধ শরীরের অশীতি অনুব্যঞ্জনা এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"তদ্ যথা—তুঙ্গনখস্ত মহারাজ! সর্ব্বার্থ সিদ্ধঃ কুমারঃ। তাম্র নখশ্চ স্নিগ্ধ নখস্ত বৃত্তা-ঙ্গুলিশ্চ অনুপূর্ব্ব চিত্রাঙ্গুলিশ্চ গূঢ় গুল্ফশ্চ ঘন সন্ধিশ্চ অবিষম সমপাদশ্চায়তপাদ পার্ষিতশ্চ মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। সিগ্ধপাণিলেখশ্চ তুল্যপাণি লেখশ্চ গম্ভীর প্রাণিলেখশ্চাজিহ্ম পাণিলেখশ্চ। আনুপূর্ব্ব-পাণি লেখশ্চ বিম্বোষ্ঠশ্চানুচ্চশব্দবচনশ্চ মৃদু তরুণ তাম্র জিহ্বশ্চ গজ্যাজিতাতি শুনিত মেঘস্বর মধুর মঞ্জুঘোষশ্চ পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনশ্চ মহারাজ! সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ। ———"ইত্যাদি। *

অসিত মুনি রাজা শুদ্ধোদনকে বলিয়া-ছিলেন, মহারাজ! এই সকল অনুব্যঞ্জন চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি নিশ্চিত প্রব্রজ্যা লইবে, গৃহবাসী হইবে না। এ সকল চিহ্ন বোধিসত্ত্ব ভিন্ন প্রাকৃত মনুষ্যের থাকে না।

শ্রীরামদাস সেন।

নব্যবঙ্গ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বঙ্গের ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, শতাব্দিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালীর যে অবস্থা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। তখন বঙ্গগৃহ ঐশ্বর্য্য বীর্য্যের রঙ্গভূমি ছিল। বাঙ্গালী জমিদার ও বড় মানুষেরা সোণার থালায় ভাত খাইতেন। তাঁহাদের ক্ষমতাবলে বঙ্গেশ্বরের সিংহাসন কম্পিত হইত। তাঁহাদেরই চক্রান্তে দুর্দ্দান্ত সিরাজ রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া দীন হীন ভিখারীর বেশে নিহত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় মধ্যবিধ ভদ্র লোক এবং কৃষকদিগের অবস্থাও বর্ত্তমান সময় হইতে অনেক উন্নত ছিল। তখন সকলেই মোটা ভাত খাইয়া মোটা কাপড় পরিয়া সুখ সচ্ছন্দে এবং সম্মানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বক্তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপাধিকারের পরে প্রায় তিনশতবর্ষেও দুর্দ্দান্ত পাঠানগণ বাঙ্গালী জাতির দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ খর্ব্ব করিতে সমর্থ হয় নাই। বলিতে গেলে সমস্ত মুসলমান রাজত্বের সময়েই বঙ্গবাসীগণ গৌরবে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু আজ তাহাদের দুঃখের অবস্থা দেখিয়া বনের পশু পক্ষীও কাঁদিতেছে। কি ঘোর পরিবর্ত্তন!

আজ বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালী ভদ্র লোকেরই অতি কষ্টে দিনপাত হইতেছে। সর্ব্বত্রই হা অন্ন! যো অন্ন! উচ্চ বংশাভিমানী বাঙ্গালীর সন্তানগণও আজ অক্লান্ত চিত্তে সামান্য পয়সার জন্য কেরাণী সাজিয়া ম্লেচ্ছের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন। অপমান, তিরস্কার, প্রহার কিছুতেই লজ্জা বা অপমান নাই।

* সমস্ত উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। প্রবন্ধের বৃথ কার্কশ্যে পাঠক মাত্রেই বিরক্ত হইতে পারেন।

বাঙ্গালার তাঁতি তাঁত বেচিয়া ইংরাজের কলে ও কারখানায় মজুরি করিতেছে। দোকানদার দোকান পশারী ঠেলিয়া রাখিয়া হাল চাষ করিতেছে। সূত্রধর হাতুরি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া পরের চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়াছে। কৃষকও রেলওয়ের ষ্টেসনে ষ্টেসনে মজুর সাজিয়াছে। দুর্গতি আর কাহাকে বলে?

দুর্ভিক্ষ্য এখন বাঙ্গালার প্রাত্যহিক ব্যাপার। বিদেশীয়দের নিকট অপমান, নির্য্যাতন বাঙ্গালীর চিরকণ্ঠ ভূষণ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী সর্ব্বত্র ঘৃণিত। ইউরোপের সভ্য জাতি বাঙ্গালীকে ঘৃণা করে। আসামী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয় সকলেই বাঙ্গালীকে ঘৃণার চোখে দেখে। সকলেই বাঙ্গালীর নামে ঘৃণা প্রকাশ করে। কে বল, বাঙ্গালীকে ভালবাসে?

বাঙ্গালীর একতা নাই। বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালীর সহানুভূতি নাই। বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে ভালবাসে না। বাঙ্গালী স্বার্থান্ধ। বাঙ্গালী ভীরু। দুই পয়সা বেশী দিলে যেমন বাঙ্গালীকে সাত সমুদ্রের পারে লইয়া যাওয়া যায়, তেমনই ইচ্ছা করিলে কেহ বাঙ্গালীর দ্বারা পাদপ্রক্ষালন পর্য্যন্তও করাইয়া নিতে পারে। বাঙ্গালীর জাতীয়তা নাই। বাঙ্গালী বহুরূপী। যে অনুগ্রহ করে, বাঙ্গালী তাহারই দাস সাজে। পয়সার দায়ে আজ বাঙ্গালী সকল কাজ করিতেই স্বীকৃত। ষ্টিমারে চাকুরি পাইলে বাঙ্গালী যুবক নির্ব্বিঘ্নে মুসলমান খালাসীর ভাত খায়। উইলসনের হোটেলের কেরাণী হইলে হিন্দুর অখাদ্য গোমাংসাদি ক্রয় করিতেও বাঙ্গালী ভদ্র লোকের লজ্জা হয় না। বড় লাটের বাড়ী "বল" হইলে বাঙ্গালীর উপাধিধারী জমিদারগণ প্রকাশ্য রূপে ভোজে যোগ দিয়া থাকেন। বাঙ্গালী বড় মানুষেরা সাহেব সেবা করিতে গিয়া কিনা করিতেছেন? বাঙ্গালীর সমাজপতির পাচক ব্রাহ্মণ যুগপৎ মুসলমান এবং হাড়ী। বাঙ্গালার জমিদার, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গালার মধ্যবিধ ভদ্র লোক এবং চাকুরে বাবুগণ কে না এই বহুরূপীর মত স্বার্থানুসারে সাজ বদলাইতেছেন? একদিকে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ ম্লেচ্ছ ব্যবহার, আর এক দিকে গোঁড়া হিন্দুয়ানির জয়পতাকা! বাঙ্গালীর এক হাতে হিন্দুর অখাদ্য গোমাংস, আর এক হাতে অভ্রান্ত বেদমন্ত্র। বাঙ্গালীর ভদ্র নামধারী লোকেরাও রাত্রিযোগে বারাঙ্গনাসেবনে, সুরাপানে, অখাদ্য ভক্ষণে সমস্ত রাত জাগরণ করিয়া প্রাতে ফোঁটা কাটিয়া, নামাবলী গায়ে দিয়া আহ্নিক করিতে লজ্জিত নয়। বাঙ্গালার হাট, বাজার, বিচারালয়ের ত কথাই নাই; বাঙ্গালীর পত্রিকা-সম্পাদক পর্য্যন্ত প্রকাশ্য মিথ্যা কথা লিখিতে লজ্জিত হন্ না। এই সকল দেখিয়াও যদি কেহ বলে বাঙ্গালী তুমি চরিত্রহীন, তখন আমরা কি উত্তর দিব? সুধু কি মেকলে সাহেবকেই আমরা গালি দিব, না আত্মানুসন্ধানও করিব? বস্তুত কোন প্রাচীন সুসভ্য জাতির যত দূর অবনতি হইতে পারে, এক দিকে নব্যবঙ্গ তাহার চরম সাক্ষ্যদানে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান, ইহা অতি সত্য কথা।

নব্যবঙ্গ একদিকে যেমন পূর্ব্বাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে চরম অবনতির সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর একদিকে দেখিতে গেলে, পুরাতন বঙ্গ

হইতে নব্যবঙ্গে অনেক উন্নতির অঙ্কুরও দেখা দিয়াছে। আমরা জীবনের প্রথম ভাগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের যে নমুনা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছে, এক সময়ে এ বঙ্গদেশে ভদ্র সন্তানের পক্ষেও উৎকোচ গ্রহণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হওয়া, প্রকাশ্য রূপে বারাঙ্গনা-গমন, এমন কি, স্থলবিশেষে সুরাপান, বামাচারাদি পর্য্যন্ত বিশেষ লজ্জা বা অপমানের ব্যাপার ছিল না। এ সকল বিষয়ে যেন পাপ বোধ একেবারেই দেশ হইতে তিরোহিত হইতেছিল। অনেক বৃদ্ধের এখনও ভ্রম ঘুচে নাই যে, উৎকোচ বা উপরি লাভ ব্যতীতও চাকুরি হইতে পারে। পরীক্ষার জলপানিতে পর্য্যন্ত উপরি লাভ আছে, ইহাও অনেকে অভ্রান্ত রূপে বুঝেন। আবার বৃদ্ধদের মুখে কখন কখন ইহাও শুনিয়াছি, ক্ষমতাবান্ পুরুষের পক্ষে বারাঙ্গনা গমন বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া পুরুষত্বের পরিচয় ভিন্ন বিশেষ কিছু অপযশের বিষয় নয়। নব্যবঙ্গ, মতে অন্তত, এই সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধাচারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। আজ ভদ্রসন্তান মাত্রই পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত দোষ গুলিকে বিচার স্থানে অন্তত ভয়ঙ্কর দোষ ও অপযশস্কর বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, মতের অনুযায়ী অনেক জীবনও গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গবাসীরা সরলচিত্ত ও দানশীল ছিলেন। তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ অথবা অন্য যে কোন দূষনীয় কাজই করিতেন, তাহা সচরাচর অস্বীকার বা গোপন করিয়া কখনও তদ্বিপরীত সাধুতার ভান দেখাইতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন উপার্জ্জন করিলে সম্পর্কহীন শত শত ব্যক্তি যাবজ্জীবন প্রতিপালিত হইতেন। ইহাতে গৃহস্বামী কখনও দ্বিরুক্তি করিতেন না। বস্তুত এ সকল মন প্রাণের সঙ্গেই কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তখন বাঙ্গালার ঘরে২ এই ব্যাপার লক্ষিত হইত। অর্থীব্যক্তি মাত্রকেই অকাতরে দান করা, নানাবিধ ক্রিয়া কর্ম্মে অজস্র অর্থব্যয় করা, এই সকল কাজ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেরই প্রকৃত সম্মানের কারণ ছিল। আতিথ্য, এবং সদাব্রত তৎকালীন সঙ্গতিপন্নের নিত্য কর্ত্তব্য ছিল। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও তৎকালে অতিথিকে বিমুখ করিয়া সম্মুখের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিয়া সুখ বোধ করিত না। আজ কাল আর অভাব ও দারিদ্র্যপীড়িত স্বার্থান্ধ বঙ্গভূমে সে দেবভাব প্রায়ই দেখা যায় না। তখন যে সকল প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা জেলা বা প্রধান নগরাদিতে কাজ কর্ম্ম করিতেন, তাঁহাদের বাসায় নিত্য আনন্দবাজার খোলা থাকিত। পরিচিত অপরিচিত যে আসিত, সেই আশ্রয় এবং আহার পাইত। অনেকে ধার করিয়া পৈত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম সমাধা করিতেন, তবুও বাসার সেই আনন্দবাজার বা নিত্য সদাব্রত বন্ধ করিতেন না। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোতে এই সকল সৎকার্য্যের মধ্য হইতে যিনিই যত অন্ধকার বাছিয়া বাহির করুন না কেন, এ সকল যে বাঙ্গালী জাতির অসাধারণ মহত্ত্বের জলন্ত নিদর্শন ছিল, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। জ্ঞান ও বিচারের রাজ্যে এ সকল কাজের

উজ্জ্বলতা খুব বেশী না হইলেও হৃদয়ের রাজ্যে এ অতি সমুচ্চ মহৎ স্বর্গীয় ব্যাপার। শুষ্ক জ্ঞানীগণ অনেক সময়ই এই সকল সুমধুর ভাব হস্তে ধারণ করিতে না পারিয়া আঙ্গুর ফল লাভে ভগ্ন মনোরথ শৃগালের মত শুধুই গালি বর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ-পদ হন। বাঙ্গালার সেই দিনে, অতিথি, গৃহস্থের ঘরে দেবতা বলিয়া পূজিত ও অর্চ্চিত হইতেন। অতিথি যতই অপরিচিত হউন না কেন, তিনি অন্তঃপুরে গৃহাভ্যন্তরে আহারাদি করিতে স্থান পাইতেন। গৃহের গৃহিণী ও বধূগণ অসঙ্কোচে তাঁহাকে পরিবেশনাদি করিতেন। আমরা নিজেরা অনেক সময় পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচীন গৃহস্থের গৃহে অতিথি হইয়া এই সরলতা-মাখা অপূর্ব্ব দেব সম্মান সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু নব্য বাঙ্গালীর যে সকল পরিচালক পর্য্যন্ত সভ্য ভব্য জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া মস্তক উন্নত করিয়া, বক্ষ স্ফীত করিয়া, বিরাট্ সভা মধ্যে দাঁড়াইয়া উদারতা, সাম্য, দেশোদ্ধার, জাতীয় ভাব, আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যশাস্ত্রের বা উজ্জ্বল স্বাধীন ধর্ম্ম মতের বক্তৃতা করিয়া অজস্র করতালি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদের ত্রিসীমানায়ও এ সকল সহৃদয়তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় শুষ্ককণ্ঠে কোন নব্যবাঙ্গালীর গৃহে উপস্থিত হইলে জল ফোঁটা মিলা দূরে থাক, অনেক সময় সুধু বসিবার যায়গা পাওয়াই কঠিন হয়। তবে এখনও অনেক প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক অনেক গৃহ উজ্জ্বল করিয়া পূর্ব্ব গৌরবের ধ্বজা স্বরূপে আছেন বলিয়া সর্ব্বদাই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না। নতুবা বিপন্ন পথিকের পক্ষে বুঝিবা বহুতর সময়েই সাহারা-মরু এবং আপনার মাতৃভূমি বঙ্গদেশ সমানই বোধ হইত। কোন পল্লীতে দশ বিশ বাড়ী ঘুরিয়া যদিও এখনও অতিথি হওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে লাঞ্ছনার এক শেষ হয়; অপমানে সেখানে সত্য সত্যই জল গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না। কেহ বলিতে থাকে, "এমন হাত পা আছে, শরীরে এমন বল আছে, কাণা নয়, খোঁড়া নয়, একে আবার খেতে দেওয়া কেন?" কেহ বলিবে "আর মাইল পাঁচেক হাটিলেইত বেশ দোকান পাওয়া যাইত? সম্মুখে নদীও ছিল। তবে অতিথি হওয়া কেন?" কেহ বলিবে "মানুষটাকে বড় বিশ্বাস কো'রনা। একটুকু চোক্ রাখিও। জানি কি, বাহির হইতে ঘটী বা কাপড় নিয়া পাছে বা পালায় কিম্বা কোন স্ত্রীলোকের দিকে বক্র কটাক্ষে চায়। সাবধান!" এই সকল অনাদর ও অপমানের পরেও হয়ত অতিথিকে অন্দর মহল হইতে এক পোয়া দূরে বাহিরবাড়ীর কোন আবর্জ্জনা পূর্ণ পারাবত ও চর্ম্মচটিকার পুরিষে দুর্গন্ধময় ঘরে বসিয়া গোগ্রাসে চারিটী ভাত মুখে দিয়াই "পালাই পালাই" রবে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করিয়া ছুটিতে হয়। এই জন্য কোন ভদ্র লোক আর এখন প্রাণান্তেও কোথায়ও আতিথ্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন্ না। অবশ্যই পরিচিত কুটম্ব সাক্ষাৎ বা বন্ধুবান্ধবের প্রতি এখনও কেহই এইরূপ ব্যবহার করেনা। কিন্তু বোধ হয়, এমন স্থলেও মানুষের ভিতরে নানা রকম গোলমাল ঘটিয়াছে।

আবার সহর বা জেলায় যাঁহারা চাকুরি প্রভৃতির উপলক্ষে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই শুষ্কভাব যেন দিন দিনই সংক্রামক রো-

গের মত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইঁহারা অনেকেই প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত এখন আর বিদ্যার্থী বা চাকুরি-প্রার্থী উমেদারদিগকে বাসায় স্থান দেননা। ভিখারী বৈষ্ণব বা অর্থপ্রার্থী ব্রাহ্মণাদির ভাত এখন নানা কারণেই মারা পড়িয়াছে। কিন্তু এদিকে ইংরেজি শিক্ষার উপদেশানুযায়ী দেশের হিতকর কার্য্যে বা অন্ধ আতুর অসমর্থকেও যে কেহ বিশেষ অন্তরের সহিত দানাদি করিতেছেন, তাহাও বলা যায়না। চাঁদার খাতা এবং চাঁদা-আদায়কারী দিন দিনই মানুষের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর জিনিষ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ দুই বস্তুর দর্শনই নাকি অনেকের পক্ষে কুইনাইনের বিপরীত গুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ দর্শন মাত্রই ভাল মানুষেরও গায়ে জ্বর আসে। স্থূল কথা, পূর্ব্বের মানুষের কাজ যতই কুসংস্কারমূলক এবং জ্ঞানবিরোধী হউক্ না কেন, হৃদয় যে বদান্যতা পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু নব্যবঙ্গ হইতে যেন এই বদান্যভাব দিন দিনই অন্তর্হিত হইতেছে। দিন দিনই যেন মানুষের জীবনের মূলমন্ত্র নিজের সুখ-সাধন এবং স্বার্থসিদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, বুকের রক্ত শোষণ করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি,ইহাদ্বারা আবার পরের সুখ সাধনের, অপরের কষ্ট নিবারণের উপায় করা হইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। রে'খে দেও তোমার সমাজ, রে'খে দেও তোমার দেশ, রেখে দেও সৎকাজ, রে'খে দেও ধর্ম্ম। আগে নিজের প্রাণ বাঁচাই। আপনি বাঁচিলে ত বাপের নাম?" প্রণয় সকল মানুষেরই যেন মনের নিগূঢ় কাহিনী এই ধরণের হইয়া উঠিতেছে। নব্যবাঙ্গালীর মুখে আজ কাল বড়ই মেল্‌থাসের সুখ্যাতি, স্মাইলের প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই সন্তান উৎপাদনে এবং অবান্তর খরচে পরিমিত হইয়া কি করিবেন? উত্তর বোধ হয় ইহার বেশী কেহই দিবেন না, "আপনি সুখে এবং শান্তিতে থাকিব। গতিকে সমাজের উপকার হয় হউক্।" প্রায় সকলেরই আন্তরিক উত্তর এই প্রকার হইবে।

এখানে আপত্তি হইতে পারে, পূর্ব্বের বঙ্গবাসীরা বৃথা যশোলাভ এবং নাম করিবার জন্যই অনেক সময় বিচারশূন্য হইয়া দানাদি করিতেন। কথাটীর মধ্যে প্রচুর সত্য নিহিত আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের স্বর্গলাভাদি এবং পুণ্য সঞ্চয়ের মতও বড় উজ্জ্বল এবং প্রশস্ত ছিল না। তাহাও প্রকারান্তরে স্বার্থসিদ্ধি মাত্র। কিন্তু এখনকার মত নীরস হৃদয়-শূন্যতার অপেক্ষা এই সকলেও মনের উচ্চ বদান্য ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের সাক্ষাৎ সুখভোগ ত্যাগ করিয়া কয় জনই বা পরের নিকট সুখ্যাতি লাভ এবং পরকালের সুখের জন্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে পারেন্? তদ্ভিন্ন তৎকালে অনেকেরই প্রকৃত নিঃস্বার্থ বদন্যতা ছিল। সময় সময় বন্ধু বান্ধব এবং প্রাচীন কছমের লোকদের মুখে পূর্ব্বকালের এক২ জন সাধু-হৃদয় ব্যক্তির নিরাড়ম্বর ও নিঃস্বার্থ বদান্যতার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। রাজা রামকৃষ্ণ এবং রাণী ভবানী প্রভৃতির মত প্রাচীন বঙ্গের শত শত নর নারীর অপূর্ব্ব কাহিনী উদাহরণ স্থলে বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করা যায়। কিন্তু অনেকেই সে সকল

অবগত আছেন। সুতরাং নিরর্থক উদাহরণের ছড়াছড়ি কাহারও নিকট ভাল লাগিবে না। নব্যবঙ্গে কি একটীও বদান্য ব্যক্তি নাই? থাকিলে অধিকাংশই প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক নাম ও উদাহরণ স্থলে উল্লেখ করিতে পারা যায় কি না, তদ্বিষয়ে অত্যন্ত গাঢ় সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এখনকার অর্দ্ধ পয়সা দানও সংবাদ পত্রের স্তম্ভে না উঠিলে দাতার মন উঠে না।

আর একটী কথা বলিয়াই নব্য বঙ্গের ভাল দিকটা দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রাচীন বঙ্গের লোকদের জীবন যাত্রা বর্ত্তমান বঙ্গবাসীদের অপেক্ষা অনেক পরিমাণেই নিরাড়ম্বর এবং সহজ ছিল। তৎকালীন লোকদের পরিচ্ছদাদির আড়ম্বর মোটেই ছিল না। যদিও তৎকালেও অল্প সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকেরা দরবার প্রভৃতিতে যাইতে হইলে মুসলমানী বা মোগ্‌লাই রকমের চোকা চাপ্‌কান ও পাগড়ি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু সাধারণত এবিষয়ে কিছুমাত্রও বাড়া বাড়ি ছিল না। দরবার হইতে ফিরিলে সম্ভ্রান্ত লোকেরাও সচরাচর নগ্ন দেহে শুধুমাত্র উত্তরীয় এবং ধূতী ব্যবহার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। সর্ব্ব সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। সামান্য চঁটী আর এক খানি মোটা চাদর হইলেই পোষাকের সমস্ত আপত্তি চুকিয়া যাইত। চাষারা সামান্য কপ্নী মাত্র ব্যবহার করিত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। যাহার খাবার যোটে না, সেও এখন নয়ান সুখের থানের ধূতী পরে, পিরাণ গায়ে দেয় এবং উড়নী মাথায় বাঁধে। তাহার পরে জুতা লইয়াও টানাটানি পড়ে। এখনকার মুটে মজুরেরা পর্য্যন্ত জুতা পায়ে, পীরাণ গায়ে দিয়া মোট বহিয়া থাকে। চাষারা পীরাণ গায়ে দিয়া, লম্বা ধূতী পরিয়া মাঠে হাল চাষ করে। নিমন্ত্রন বা উৎসবাদির উপলক্ষে ত আর কথাই নাই। এখন নিতান্ত গরিব সম্প্রদায়ের লোকেরাও মোজা, জুতা এবং ভাল পারদার ধূতী ও উড়নী ব্যবহার করে, ভাল ছিটের বা সাদা পীরাণ গায়ে দেয়। চাকুরে বাবুদের ত পোষাকই পেণ্টুলেন্ চোকা চাপকান ও পাগড়ি হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্যই স্থল বিশেষে তাঁহারা আফিষাদি যাইতে এইরূপ পোষাক ব্যবহার করিতে বাধ্যই হন। কিন্তু তদ্ভিন্নও নানা রকমে কোট, পেণ্টুলেন, চোকা, চাপ্‌কান্, টুপি, পাগড়ি অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারও উপরে আবার হ্যাট্‌কোটও চলিতেছে। ভদ্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধূতী, চাদর, মোজা, জুতা, পীরাণাদির ত আর কথাই নাই। শীতবস্ত্রইবা কত রকমের হইয়াছে। রাজা, জমিদার ও ধনীদের পোষাকে বোধ হয় এখন এক একটী ছোট খাট কুবেরের সম্পত্তি লইয়া টানাটানি পড়ে। তবে কথা এই, পূর্ব্বকালে এই সকলের তত অভাব ছিল বলিয়াই তৎকালীন মানুষেরা নিরাড়ম্বরে জীবন কাটাইতে পারিয়াছেন। এ কথা বস্তুতই অতি সত্য। তবুও কি এ সম্বন্ধে আমাদের সংযত হওয়া উচিত হইতেছে না? শীত-প্রধান ইউরোপের বিলাসিতা ও প্রয়োজন, এই উভয়ই আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সংক্রামক রোগ বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। বিলাসিতা ত ঘৃণার সঙ্গেই

পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ইউরোপের অনেক প্রয়োজনীয় পোষাকাদিও আমাদের এখানে অনাবশ্যক বোধে যত্নত-পরিত্যজ্য। সামান্য ধূতী এবং উড়নীতেই আমাদের দেশের সভ্যতা, জাতীয় সভ্যতা রক্ষা হয়। আর কুলাইলে পাদুকাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন কিম্বা বাধ্যতার স্থলে সময়েং পোষাক বিশেষের দরকার হইলেই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু সচরাচর আমাদের সাধারণ বা জাতীয় পোষাক, ধূতী চাদর হইলেই যখন সুন্দর চলিতে পারে, তখন শুধু অন্য লোকদের রুচি ও সভ্যতার অনুরোধে আমরা এই ব্যয় বাহুল্যে যাইব কেন? এই সকল বাহিরের সভ্যতা মানুষের মনগড়া ও অভ্যাস সম্ভূত। ইহাতে প্রকৃত সভ্যতার হানি হয় না। মানুষকে কেবল শরীর মনের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির দিকে চাহিয়াই কাজ করা উচিত। অধিক গরম কাপড়াদি ব্যবহারে এক দিকে যেমনই আপাতত আমাদের শারীরিক গ্লানি অত্যন্ত হয়, তেমনই ভবিষ্যতের অনেক পীড়ার অঙ্কুর দেহ মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকিলেও সচরাচর প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি, এই রূপ বস্ত্রাদি ব্যবহারের জন্যই অনেক সময় অনেককে ভয়ানক সর্দ্দি কাশিতে বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়। এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে আরও যে বিবিধ রোগে দেশের মানুষ আক্রান্ত হইতেছে না, কে বলিবে? সকলেই স্বীকার করিতেছেন, পূর্ব্বকালের অপেক্ষা আমাদের দেশে দিন দিনই নানা প্রকার নূতন নূতন রোগ দেখা দিতেছে; অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে পোষাকাদির পরিবর্ত্তনও যে একটী কারণ নয়, ইহা বোধ হয় না। কারণ, পূর্ব্বকালের লোকেরা আজ কালিকার লোকের অপেক্ষা বলবান্ ও সুস্থ শরীর ছিলেন। এখনও কৃষক সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত ভদ্র লোকদের অপেক্ষা সুস্থ ও বলবান্। ইহার মধ্যে অন্যান্য নানা কারণ আছে, এ কথা সত্য। এবং রেলওয়ে প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী মেলেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত স্থানে কৃষক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তথাপি এটা যে পূর্ব্ব যুক্তির একটী প্রমাণ, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গদেশের নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করিলেই এ সমস্ত সন্দেহ দূর হয়। অনেক স্থলেই সমান জল বায়ুর মধ্যেও ভদ্র লোকের অপেক্ষা কৃষকদিগকে সুস্থ ও বলবান দেখা যায়। অবশ্যই সর্ব্বদা শারীরিক পরিশ্রমও ইহার দ্বিতীয় কারণ। কিন্তু তাহাদের পোষাকাদির আড়ম্বর-শূন্যতাও যে একটী কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সাংসারিক কাজ কর্ম্ম ও পরিশ্রমাদি সম্বন্ধেও প্রাচীন বঙ্গে ও নব্য বঙ্গে অনেক প্রভেদ ঘটিয়াছে। এখন ঘরের কাজ কর্ম্ম নিজ হাতে করিতে অনেকেই লজ্জা বোধ করেন। বাজার হইতে এক মুঠা শাক হাতে করিয়া আনিতে কতই অপমান বোধ করেন? কিন্তু পূর্ব্বের লোকেরা ভদ্রাভদ্র সকলেই অসঙ্কোচে হাট বাজার ও ঘরের নানাপ্রকার আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্ম নিজ হাতে নির্ব্বাহ করিতেন। এসম্বন্ধে অনেকে বলিতে পারেন, এখন আমরা লিখা পড়ার চর্চ্চায় মন দিয়াছি, এই জন্যে সময় হয় না বলিয়াই গৃহ কার্য্যে আর মন দিতে পারিতেছি না। এই কি

কারণ? তবে ঐরূপ কাজ করিতে অপমান বোধ হয় কেন? এবং সময় থাকিলেই বা কেহ করেন না কেন? অনেকেরই কি এমন সময় থাকে না যে, কিছুই গৃহ কার্য্য করিতে পারেন না? বস্তুত কি যেন এক প্রকার জড়তা ও বিলাসিতা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। শুধু তাহারই ফলে আমরা দিন দিন অলস হইয়া পড়িতেছি এবং এই কদভ্যাসের ফলেই গৃহ কার্য্য করিতে আমাদের লজ্জা হয়। কিন্তু পোষাকের বাহুল্যের ন্যায় শারীরিক শ্রমশীলতার অভাবেও দেশীয় ভদ্র সন্তানদের শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। অপরদিকে বোধ হয়, এই সকলের দ্বারা মানসিক অপকারও যথেষ্ট হইতেছে। প্রথমত শারীরিক অপকারের সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক অপকার এক সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং শরীরের অপকার যাহাতে হইতেছে, তাহাতে মনের অপকারও হইতেছে। পরন্তু বিলাসিতা এবং আলস্য উভয়ই মনের আত্যন্তিক নীচতা উৎপাদনের মূলীভূত কারণ। কিন্তু পূর্ব্বে কৃষক ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকদের পোষাকাদির আড়ম্বর-শূন্যতার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহার কিছুতেই শারীরিকের মত মানসিক কোন অপকারের সম্ভাবনা দেখা যায় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, মানসিক নানা রকম বৃত্তির উত্তেজনা নিবারণার্থই বস্ত্রাদি ব্যবহারের প্রথা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। মানবচরিত্রের ও সমাজের পরমোপকারী লজ্জাশীলতাও বস্ত্রাদি ব্যবহারের উপরে অনেকটা নির্ভর করে; সুতরাং মানুষের শরীর যত সুপরিচ্ছন্ন হইবে, ততই এই উদ্দেশ্য সফল হইবে। নতুবা বিবিধ মানসিক অবনতি ঘটিতে পারে। এই সকল কথা অবশ্যই নিতান্ত উড়াইয়া দিবার কথা নয়। কিন্তু অভ্যাসই সকলের উপরে। তৈলঙ্গ স্বামী বা উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেখিয়া হিন্দু নরনারী মাত্রেরই মনে কোন্ বিকৃত ভাব হয় না। তবে বলিতে পার, তাঁহাদের ধর্ম্মবল, চরিত্র ও সাধুতায় বিশ্বাস থাকাতেই এইরূপ ঘটে। কিন্তু বাঙ্গালার কপ্নী-ধারী কৃষকদিগকে দেখিয়াও কি কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষের মন বিকৃত হয়? কৈ এপর্য্যন্ত ত ইহার কোন আভাসই আমরা টের পাই নাই। বরং আষাঢ় মাসাদিতে সবুজ ধান্য ক্ষেত্র মধ্যে সেই যে নগ্ন-কায় কৃষ্ণবর্ণ বলবান্ কৃষকমূর্ত্তি কবে দেখিয়াছিলাম, আজও কিন্তু সেই ছবি প্রাণে লাগিয়া আছে। অতি পবিত্র ভাবরাশি উচ্ছ্বাসিত করিয়া লাগিয়া আছে। তবে আমি পুরুষ। জানি না রমণী হইলে কি হইত। কিন্তু অনুমানে বলিতে পারি, নিশ্চয়ই বেশী কিছু হইত না। সমস্ত বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি পুরুষগণ যে নগ্ন শরীরে গ্রামে গ্রামে ও পরিবারে পরিবারে বাস করিতেছেন, এতেও কি বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতেছে? তবে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আমাদের অভ্যাস বহুকালাবধি অন্য রকম হইয়া আসিয়াছে। সময় সময় বরং বাঙ্গালী রমণীদিগকে আর একটু সুপরিচ্ছন্ন দেখিতে সাধ যায়। যাহাই হউক, নব্যবঙ্গ যে ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে নিরর্থক বিলাসিতার মধ্যে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন, তাহারই কোন প্রতিবিধান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। আবশ্যক

মত এক আধখানা কাপড় চোপড় কেহ বাড়াইতে ইচ্ছা করেন ত করুন। এত সূক্ষ্ম কথা লইয়া তর্ক করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। স্থূল স্থূল মনের ভাব প্রকাশ করাই প্রধান লক্ষ্য। কেহ কেহ বলেন, প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় উন্নতি হয়। এ কথা অতি খাটী। কিন্তু তাই বলিয়া, আলস্য ও বিলাসিতা বাড়ান উচিত নয়। মানব জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সমূহের দিকে প্রয়োজন বৃদ্ধি হওয়াই কামনীয়। নানা কল কৌশল দ্বারা বাহ্য শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া গতায়াতাদি ও জীবনোপায়ের পথ সকল সহজ ও সরল করাতেও এই উচ্চ লক্ষ্যেরই সাহায্য হইতেছে। পৃথিবীর বৃথা আমোদ, ধূলাখেলা, ভোগ বিলাস কিছুই জনসমাজের প্রকৃত উপকারী পদার্থ নয়। এসকল বিষয়ে মানুষ ও মানবজাতি যত নিরাড়ম্বর হইবে, ততই মঙ্গলের বিষয়।

প্রাচীন বঙ্গ বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে যেন দিন দিনই মরিয়া যাইতেছিল। প্রায় ভদ্র সন্তানের ভাগ্যেই সামান্য কেতাবতি বাঙ্গালা লিখিতে পারা ভিন্ন বিদ্যা চর্চ্চা ঘটিত না। অল্প লোকেই পার্সী এবং টোলের শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। টোলের শিক্ষা শুধুই ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বদ্ধ ছিল। এখনও তদ্রূপই আছে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বৈদ্যের সন্তানেরাও কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। কিন্তু টোলের শিক্ষা দিন দিনই যেন অসম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। এখন টোলের দশা আরও শোচনীয়। বস্তুত শিক্ষার চর্চ্চা না থাকাতে, সাধারণ লোক, জ্ঞান ও চিন্তাহীন হইয়াই দিন কাটাইতেছিল। তৎকালে নবদ্বীপাদি বিশেষ বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ স্থানে দুই একটী সুপণ্ডিত ব্যতীত উচ্চ শিক্ষিত লোক প্রায়ই দেখা যাইত না। আবার সংস্কৃত শিক্ষারও একটী প্রধান দোষ এই যে, এ শিক্ষায় মানুষের মনে নূতন নূতন চিন্তার স্রোত আনিয়া দেয় না। এই জন্য বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ এবং গদাধরের মত প্রতিভাশালী লোকেরাও সীমাবদ্ধ—পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত পুরাতন চিন্তা, পুরাতন জ্ঞান, পুরাতন ভাবকেই নাড়াচাড়া করিয়া নূতনত্বের সামান্য পরিচ্ছদ মাত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত নূতন সৃষ্টির অধিকার অল্প লোকেরই জন্মাইত। মুকুন্দ নারায়ণ এবং ভারতচন্দ্রাদির মত লোকও তৎকালে জন্মিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও অনেকেই সংস্কৃত এবং পার্সী উভয় ভাষাতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত মৃত ভাষা বলিয়াই তাহার এই দশা। আরবী, পারসীও পাশ্চাত্য জ্ঞানের মত উজ্জ্বল চিন্তার খনি বলিয়া বোধ হয় না।

নব্যবঙ্গেও যে আশানুরূপ প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে, কিছুতেই বলা যায় না। তবে যে কিছু শিক্ষা হইতেছে, পাশ্চাত্য জীবন্ত ভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া তাহাই যেন মানুষের প্রাণে কত সহস্র ধারায় চিন্তার স্রোত ঢালিয়া দিতেছে। এই উদার চিন্তার আভাসে মানুষের মুখশ্রী যেন দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সর্ব্ব বিষয়েই বঙ্গদেশ আজ শনৈঃ শনৈঃ আন্দোলিত হইতেছে। অবশ্য কিছুই যে যথেষ্ঠ আশার অনুযায়ী হইতেছে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু প্রথম দিনেই ত অঙ্কুর

গেরুয়া বসন পরিধান, জটা ধারণ প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বর সম্বন্ধে তুকারাম তাঁহার মনের ভাব এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"অন্তর পবিত্র যার মিষ্ট ভাষী যেই,
প্রকৃত ধার্ম্মিক বলে গণ্য হয় সেই।
পরুক বা না পরুক গলদেশে হার,
তার পক্ষে নাহি চাই এরূপ বিচার।
ভাল রূপে আত্ম জ্ঞান হইয়াছে যার,
থাকুক বা না থাকুক শিরে জটা ভার।
পর যোষা প্রতি যার মন্দ ভাব নাই,
মাখুক বা না মাখুক সর্ব্ব অঙ্গে ছাই।
অন্ধ যে পরের ধনে, পর দোষে মূক,
তুকা বলে সাধু সেই সদা তার সুখ॥"

রামপ্রসাদও বাহ্য অনুষ্ঠানের অনাবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। যথা—

"কাজ কিরে মন গিয়ে কাশী,
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।

আর এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও তার মর্ম্ম কেবা জানে॥"

আবার বলিতেছেন :—

"মন ভেবেছো তীর্থে যাবে।
কালী পাদ পদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে॥"

বাহ্যিক অনুষ্ঠান সকল অনাবশ্যক হইলেও, একটী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের উপাসনা করা যে আবশ্যক, তাহা উভয়েই প্রকাশ করিয়াছেন। বিঠোবার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তুকারাম এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"করিতে তোমায় তুষ্ট ওহে ভগবান,
এই মূর্ত্তি যোগে করি তোমায় পূজন।
কিন্তু দেব স্থির ভাবে করিলে ঈক্ষণ,
তোমার ভিতরে পাই চৌদ্দটী ভুবন।
নাচাই তোমায়, দেব, আমরা কখন,
নানা স্থানে তব মূর্ত্তি করাই দর্শন।
অথচ তোমার নাই কোন অবয়ব,
নাহিক তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সব।
তোমার নিমিত্ত করি ভজন কীর্ত্তন।
বাক্যের অতীত কিন্তু তুমি নারায়ণ।
পুষ্প মালা ঝুলায়েছি তোমার কারণ,
অথচ নির্লিপ্ত তুমি জগৎ কারণ।
তুকা বলে তব কাছে এই নিবেদন—
মূর্ত্তি মোরে কর দেব মঙ্গল সাধন।"

তুকারাম আর এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"মন্দিরের পবিত্রতা যাঁ হতে উদ্ভব,
ব্রত আর নিয়মের যিনি হন ফল,
এসেছেন সেই হরি এই পাণ্ডারিতে,
আমরা দেখেছি তাহা আপন চক্ষেতে।
তাঁহার এ চারু রূপ করি দরশন,
দরশন তৃষ্ণা মন হ'লো নিবারণ।
তিনিই পরম দেব, দেব মুনি সেব্য,
নিরাকার দেব তিনি, তিনিই সাকার।
তুকা বলে, বেদ যাঁরে বুঝিতে না পারে,
গুণ গান করি মোরা পাইয়াছি তাঁরে॥"

রামপ্রসাদ যে প্রতিমা পূজা করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তিনি শব সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে কালী প্রতিমা ছিল। ভক্তগণ আসিয়া মূর্ত্তিকে প্রণাম করিত ও প্রণামী দিত। তাঁহার পদাবলীতেও রামপ্রসাদ কালী পূজার আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন :—

কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণ তলে।
যে করে উদর ভরে, সে করে সি সাধ করে,

ওরে না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্ব দলে।
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,
ওরে কালী মূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি
চলে ॥

রামপ্রসাদ আর এক স্থলে বলিয়াছেন ঃ—

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করাল বদনা।
নীলকাদম্বিনীরূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক
বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ
বল না॥

কিন্তু এই সাধুদ্বয় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া যখন ভগবানের নিরাকার ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন, তখন আর মূর্ত্তি পূজার আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন না। তুকারাম তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন যে, সর্ব্বত্রই তিনি ব্রহ্ম দর্শন করিতেন, তাঁহার এই সময়ের রচিত একটী অভঙ্গতে, তিনি তাঁহার মনের ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

মানবেরে কুপ্রবৃত্তি করে অধিকার।
হ'য়েছি পবিত্র কিন্তু, লয়ে নাম তাঁর।
পবিত্র হ'য়েছে বিশ্ব আমাদের কাছে,
ভেদাভেদ জ্ঞান সব দূর হইয়াছে।
বাস করি সর্ব্বদাই ব্রহ্ম নিকেতনে।
হয় নাকো পাপ মূর্ত্তি হেরিতে নয়নে।
তুকা বলে সততই নির্জ্জনে থাকিব।
ব্রহ্ম লাভ ফল-ভোগ ব্রহ্মেতে করিব॥

তুকারাম আর এক স্থলে বলিয়াছেন ঃ—

উত্তীর্ণ হইল তুকা পরীক্ষা হইতে,
ত্রিভুবন দেখে ইহা হ'লো চমকিত।
প্রতি দিন ঈশ্বরের গুণ বিঘোষণ,
কর্ম্মের মধ্যেতে তার ইহাই এখন॥

রামপ্রসাদও দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই পদটী গাইয়াছিলেনঃ—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি
তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তার
উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত
রত্ন সোণা।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য
নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওইতে চাস তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাও
কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি, মেষ মহিষ
আর ছাগল ছানা।
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল সে তার
উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে করবে পূজা, মা ত
আমার ঘুষ খাবে না॥

রামপ্রসাদ আর এক স্থলে বলিয়াছেন ঃ—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, দুনয়নে
পড়বে ধারা॥
হৃদি পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার
যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তারা বলে
হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে
মনের খেদ,

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার
নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি মেলি দেখ মাকে, তিমিরে
তিমির হরা ॥

পূর্ব্ব এবং পর জন্ম উভয়ই বিশ্বাস করিতেন। তুকরাম পৃথিবী হইতে অবসর লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিবার সময়ে যে কয়েকটী অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটীতে মনের ভাব এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

করিতেছি আমি এবে স্বধামে গমন,
লও লও লও মম শেষ সম্ভাষণ।
এখন হইতে আর আসা যাওয়া নাই ॥

ভব সংসারের যাতনায় অধীর হইয়া রামপ্রসাদ জগৎ মাতার নিকটে অভিমান করিতেছেন :—

মা মা বলে আর ডাকিবোনা,
ওমা দিয়েছো দিতেছো কতই যন্ত্রণা।
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি।
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা ॥

রামপ্রসাদ মায়ের কাছে দুঃখ জানাইয়া আবার বলিতেছেন :—

ওমা হর গো তারা মনের দুঃখ।
আর ত দুঃখ সহেনা ॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো, যে জন্মে নাই
সে জানে না।
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না
মরিলে না।
রামপ্রসাদে এই ভণে, ছন্দ হবে মায়ের নাম,
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না।

ভক্তি বিনা যে মুক্তি লাভ হয় না, এ ভাবটী উভয়েরই মনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল। [illegible]রাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে বলিয়াছেন :—

"ঘুচিল মনের মলা কিসে জানা যায় ?
তুকা বলে ভক্তি বিনা সকলি বৃথায়।"

রাম প্রসাদ বলিয়াছেন :—

ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী।

আমরা দেখিলাম যে, এই সাধু দ্বয় প্রথমে ভগবানকে প্রতিমায় উপাসনা করিলেন এবং তাহার পর ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্ব মধ্যে তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিলেন। অবশেষে আমরা কি দেখিতে পাই ? না, ঈশ্বরের সহিত তাঁহারা একভাবাপন্ন হইয়াছেন। তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে বলিয়াছেন :—

তুকা ছিল প্রথমেতে সাধুদের সঙ্গি,
একাত্মা হইল শেষে পাণ্ডুরঙ্ সহ।

রামপ্রসাদ তাঁহার মনের ভাব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে,
আছি কাঠের মুরাদ খাড়া মাত্র গণনাতে
সবে।
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি ও সে হবে,
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই
বিচারিবে ॥

এখন জিজ্ঞাস্য এই, ঈশ্বরের সহিত একাত্মা হওয়া কাহাকে বলে ? ইহার অর্থ কি এই বুঝিতে হইবে যে, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, জীবে আর শিবে ভেদাভেদ থাকিবে না ?

আজি কাল অনেক সন্ন্যাসী নয়ন গোচর হয়, যাহারা মুখে "নারায়ণ" "নারায়ণ" উচ্চারণ করেন এবং তাঁহারা যে সাক্ষাৎ ভগবান, তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়াছি, কাশীধামে যাত্রীগণ তাঁহাদিগকে পুষ্প দিয়া পূজা করিতেছে এবং ঈশ্বর স্থানীয় সন্ন্যাসী পরম আনন্দে এই পূজা

গ্রহণ করিতেছেন। অদ্বৈতবাদের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া লোকে এই প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ভ্রম পূর্ণ যাত্রীগণ যে সন্ন্যাসীদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু এক জন শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী যে এতদূর স্পর্দ্ধা দেখাইবে, ইহাই বিচিত্র। কোথায় সর্ব্ব শক্তিমান মহান ঈশ্বর, আর কোথায় এই রিপু-বিদলিত পাপ-পূরিত অক্ষয় ক্ষুদ্র জীব! যে সন্ন্যাসী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া গৃহে গৃহে গমন করত আহার-লোলুপ হয়েন, সেই সন্ন্যাসী আপনাকে ভগবানের স্থানে বসাইয়া লোকের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করেন, এ দৃশ্যটী নয়নগোচর করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, মনুষ্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। প্রকৃত অদ্বৈত-বাদী, "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণ করত আস্ফালন করে না। সে আপনার ভাবে আপনি নিমগ্ন থাকে। পৃথিবীর সুখ দুঃখ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, কুবৃত্তিচয় তাহার মনে স্থান পায় না এবং সকল ব্যক্তিকে সে সম-ভাবে দর্শন করে। ঈশ্বরের ভাবের সহিত যাহার যোগ হইবে, তাঁহার পবিত্রতার নিকট যে উপনীত হইতে পারিবে, সেই তাঁহার সহিত একাত্মা হইবে, সেই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী।

ভক্তগণের মধ্যে এরূপ ভাব নয়ন-গোচর হয় যে, এক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্ট দেবতার ভাবে বিভোর হইয়া রোদন করিতেছেন, ভক্তির উচ্ছ্বাসে দেশকে প্লাবিত করিতেছেন, আবার অন্য সময়ে নীতির পথ ত্যাগ করিয়া জঘন্য ব্যভিচারে লিপ্ত রহিয়াছেন। তুকারাম ও রামপ্রসাদের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হই, তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র আমাদের অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করে। তুকারাম একটী রূপবতী রমণীর প্রলোভনকে কেমন তেজের সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অভঙ্গ নিচয়ের মধ্যেও কত নীতিপূর্ণ কথা পাওয়া যায়। তুকারাম এক স্থলে বলিয়াছেন;—

অন্তর পবিত্র যার মিষ্টভাষী সেই।
প্রকৃত ধার্ম্মিক বলে গণ্য হয় সেই।

রামপ্রসাদ এক জন শাক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে পঞ্চ মকারের ভাব অতি প্রবল ছিল। ভৈরবী চক্রের চক্রে পড়িয়া শাক্তগণ সুরা ও অপ্সরা লইয়া উন্মত্ত মহাকালীর সমক্ষে অগণ্য মেষ, মহিষ ও অজা বলি স্বরূপ অর্পণ করিতেছে, আর ভক্তগণ সুরা পান করত রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া নৃত্য করিতেছেন, ঢাক ঢোলের বাদ্যে চারিদিক প্রকম্পিত হইতেছে এমন সময়ে রামপ্রসাদ বলিয়া উঠিলেন;—

ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
মেষ ছাগ মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে বলি দেও ষড় রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাদনে,
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

রামপ্রসাদ তাঁহার পদাবলীতে, কালীর নাম লওয়া ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করা

যে মানব মণ্ডলীর মুখ্য কর্ম্ম, তাহা প্রকৃষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু মনের কুবৃত্তি দমন যে আবশ্যক, তাহাও অনেক সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন;—

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ।
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥

রামপ্রসাদ আর একস্থলে প্রকাশ করিয়াছেন যে, চরিত্র পবিত্র না হইলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না,—তিনি বলিতেছেন ;—

ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম কি কখন ফলে॥

তুকারাম ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা বলিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা এই প্রস্তাবটী শেষ করিব। পৌত্তলিকতার প্রতি কাহার কাহার এ প্রকার বিদ্বেষ ভাব যে, হরি, কালী প্রভৃতির নাম লওয়া তাঁহারা পাপ জনক বিবেচনা করেন। কিন্তু এই সাধুদ্বয়ের জীবন আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম যে, এক জন হরিনাম লইয়া এবং আর এক জন কালী কালী বলিয়া তরিয়া গেলেন। আমরা আরো দেখিলাম যে, উভয়েই প্রথমে ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া, ক্রমে যত ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। এই সাধু দ্বয়ের সংগীত গুলির যে যে স্থলে হরি কিম্বা কালীর নাম আছে, তাহা উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ঈশ্বর, ভগবান, প্রভৃতি নাম বসাইয়া কোন কোন উপাসক তাঁহাদের উচ্চ ধর্ম্ম ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কি তাঁহাদের মনে একবারও উদয় হয় না যে, যে সাধুদ্বয়ের উন্নত ধর্ম্ম ভাব ব্যঞ্জক বাক্যাবলী তাঁহারা বিকৃত করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা কত দূর উন্নত ছিলেন। এই সাধুদ্বয়ের অবলম্বিত ধর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা যদি ভগবানকে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব।

ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা উন্নত হিন্দুগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এ জ্ঞান তাঁহাদের আছে। একটী আকার অবলম্বন না করিলে তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া ঈশ্বরের গুন-প্রকাশক এক একটী অবয়ব অবলম্বন করা হইয়াছে মাত্র। সাধক যখন ভগবানকে নিরাকার ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন, তখন আর তিনি কোন মূর্ত্তি অবলম্বন করেন না। এই প্রকার উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া কত কত সাধু উদ্ধার হইয়াছেন। তবে আর প্রণালী লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি। লক্ষ্য ত সকলেরই এক। সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

কোথায় এক তিল পৌত্তলিকতা আছে, কোথায় আদ তিল পৌত্তলিকতা আছে, এ প্রণালী ভাল নহে, ও প্রণালী ভাল, এ প্রকার কথা লইয়া আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। আমাদের শাস্ত্রে, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে প্রকার উচ্চ ভাব আছে, এমন উচ্চ ভাব অন্য কোন জাতির শাস্ত্রে দেখা যায় না। আর তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অধিকারী ভেদে, যে

প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও উত্তম বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া, তুকারাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কত শত সাধু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার, তাঁহার নিরাকার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কত ঋষি মুনি উদ্ধার হইয়াছেন। ভগবান ভাবগ্রাহী। তিনি অন্তরের একাগ্রতা ও ভক্তি দেখিয়া, আমাদিগকে শান্তি বিধান করিবেন ও চরমে তাঁহার অভয় ক্রোড়ে স্থান দিবেন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
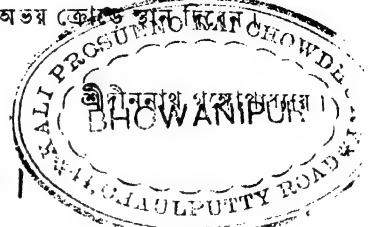
সংসার সঙ্গীত।

১

আবার গাইল, কে গাইছে অই?
বারণ করগো তায়,
সুখের সংসারে, বিষাদ সঙ্গীত
আর না সে যেন গায়।
শান্তির শরীরে, নির্ম্মিতা মেদিনী
পিযুষের স্রোত বহিছে তটিনী
জীবনে জীবনে প্রেমপূর্ণভাব
আজি এজগতে কিসের অভাব?
বারণ করগো তায়,
সুখের সংসারে, বিষাদ সঙ্গীত
আর না সে যেন গায়।

২

"মায়ার সংসার, সকলি অসার
সুখ আশা হেথা কিছুই নাই;
অনন্ত দহনে জ্বলিবে যাবত্
জ্বলন্ত চিতায় না হবে ছাই।"
একি কথা আজি কি শুনিরে ভাই,
সুখ আশা হেথা কিছুই কি নাই?
জীবিতে দহিতে অনন্ত-অগিনে,*
জগৎ কারণ সৃজিলা কি জীবে,
দয়াময় নাম তার কি তাই?
এমন সুন্দর মানব-জীবন,
এত ভালবাসা আশার সৃজন
সকলি কি বৃথা? সকল স্বপন?
সুখ আশা কিরে কিছুই নাই?
অনন্ত দহনে জ্বলিবে যাবৎ
জ্বলন্ত চিতায় না হবে ছাই?
না,
অনন্ত সুখের ভাণ্ডার অবনী
অনন্ত প্রেমের গোলা,
যে যেমন চায়, সে তেমন পায়
দিবা নিশি আছে খোলা।
বিপিন বিটপী দানে সুধাফল,
বারিদ বরষে সুধাময় জল,
রবিচন্দ্র তারা বিমল কিরণ
ছড়ায় জগতে, শীতল পবন
জীবন জুড়ায়ে যায়,
আনন্দময়ের আনন্দ বাজারে
হাসিতে ভাসিতে সৃজিলা সবারে;
এজগৎ মরি আনন্দ ভবন,
দুখের বারতা সকলি স্বপন!

৩

সুন্দর শোভন প্রকৃতি বদন
সুধাময় হাসি ভরা,
পরি চন্দ্র তারা হাসিছে যামিনী
আনন্দে হাসিছে ধরা।
ডাকে পাখী কুল, ফোটে ফোটে ফুল
কেমন সুন্দর সুবাস অতুল!
ফুটি ফুল হাসে কানন গায়,
সুললিত রবে পুলকে গায়
কেমন সুন্দর পাখীর দল!

তুমি কি মানব হারাইয়া জ্ঞান,
গাইবে কেবল বিষাদের গান,
এসংসারে কিরে নাহি সুখ লেশ ?
মানবের ভাগ্যে ঘটিল কি শেষ
অনন্ত বেদনা জ্ঞানের ফল ?
হায়রে মানবে, এই কি নিয়তি,
নিয়ত ঝরিবে নয়ন জল ?
ছি ছি এই কিরে জ্ঞানের গরিমা
এই কি সমাজে নীতির ফল ?
সুখের সংসারে, নিয়ত কাঁদিবে
এই কি মানব জ্ঞানের বল ?
উদিলে অরুণ পূরবাকাশে,
মুখ ভরা হাসি ধরণী হাসে,
ধীরি ধীরি ধীরি প্রভাত পবন
নীরবে জুড়ায় জীবের জীবন,
আনন্দে সকল ভুবন ভাসে।
শরতের চারু শশীর হাসি
ছড়ায় রজত জোছনা রাশি
বসন্তে মধুর মলয় বায়
কুসুম কানন হাসায়ে যায়
কেবল জগতে কাঁদাতে আসে ?
এত সুখ এত সৌভাগ্যের কোলে
মানবের মন কেননা হাসে ?

৪

আহা কি সুন্দর ভূধরের গায়
বিনোদ বিপিন মাঝে,
শাখায় শাখায় লতায় পাতায়
জড়ায়ে কেমন সাজে !
সুন্দর পাখীটী আনন্দে মাতিয়া
এডালে ওডালে নাচিয়া নাচিয়া
আপনি মগন আপনার গানে,
সংসারের ঘোর বিষাদের পানে
বারেক ফিরেও চায় না।
অই পাখীটীর মতন হায়

সংসার কানন ছায়ার গায়
মনোসুখে মরি করিয়ে ভ্রমণ
অই সাথে কেন মানবের মন
প্রাণমন খুলে গায় না ?
নর-হাহাকার বিহগের স্বরে
মধুরে কেন মিশায় না ?
কেমনে মিশাবে, পাখীটীর মত
নহে মানবের সরল প্রাণ,
বিপদে সম্পদে বিষাদ ভুলিয়া
কেমনে গাইবে মধুর গান ?
অবিশ্বাসী যেই প্রেমেতে তাঁহার ;
প্রেমের যে নাহি জানে ব্যবহার।
নাহি কৃতজ্ঞতা এ অশেষ দানে,
সামান্য বিয়োগে শেল বাজে প্রাণে,
বিধির বিধানে অবিধি ভাবে ;
বাসনার কীট, অতৃপ্ত বাসনা,
সুরস লভিতে বিরস-বাসনা,
ত্যজিয়া শীতল সরসী সুন্দর
অবগাহে যেই অনল ভিতর
সেইত অশেষ যাতনা পাবে।
তার সনে বল, সমকণ্ঠে নিশি
বিষাদের গান আর কে গাবে ?
সে প্রেমময়ের প্রেমে গড়া ধরা
এবিশ্বাস আছে যার,
সেকি রহে কভু নিরানন্দে ভবে
কিসের যাতনা তার ?
শোকের ভিতরে তাহার শান্ত্বনা,
বিপদে সম্পদে তাহার মন্ত্রণা,
বাসনা ত্যজিয়া বিষয়ের সুখ
দুখের ভিতরে তার প্রেম মুখ
দেখিতে যেজন পায়।
সে বলে সংসার সুখ পারাবার
প্রেমানন্দে সদা দাওরে সাঁতার,
জগৎময়ের জগৎ সৃজন,

সকলি আমার সুখের কারণ,
এজগৎ মাঝে যে দিকেতে চাই,
সে প্রেম মূরতি দেখিবারে পাই,
সুখময় এই মানব জীবন
দুখের বারতা সকলি স্বপন!

বারণ করগো তায়
সুখের সংসারে বিষাদ সঙ্গীত,
আর না সে যেন গায়।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।
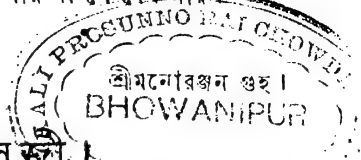
মহাম্মদ বখ্তিয়ার খিল্জী।

আফগানিস্থানের উত্তর প্রান্তভাগে গরসর প্রদেশ ছিল। তাহাই খিলজী বা ঘিলজী জাতির বসতী স্থান। সেই প্রদেশবাসী খিল্জী বংশে মহাম্মদ নামে এক বীরপুরুষ ছিলেন। তাহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ বখ্তিয়ার, কনিষ্ঠ মহাম্মদ। বখ্তিয়ারের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম মহাম্মদ। বখ্তিয়ারের পুত্র নিতান্ত কদাকার ছিলেন। কিন্তু কদাকার হইলেও তাঁহার ভাবী উন্নতির এমন একটী চিহ্ন ছিল, যাহা ভারতবাসীগণ দর্শন করিলেই বলিতে পারিতেন যে, এই মহাপুরুষের দ্বারা এমন কোন কার্য্য সম্পাদিত হইবে, যদ্দ্বারা তিনি ভূমণ্ডলে চিরস্মরণীয় হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতাগণ ইহা বুঝিত না, এজন্যই তাঁহারা তাহাকে কদাকারের চরম আদর্শ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। সেই চিহ্নটী এই যে, তিনি আজানুলম্বিত-বাহু ছিলেন।

আর্য্যাবর্ত্ত বিজয়ী সুলতান মহম্মদ যখন তাহার প্রিয়দাস কুতুবদ্দিনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ঘজনবের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় খিল্জি বংশোদ্ভব বখ্তিয়ারের পুত্র মহাম্মদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কোন কার্য্য প্রার্থনা করিলেন। সুলতান তাহার বিকৃত আকার দর্শনে তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। সুতরাং তিনি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য, বাধ্য হইয়া, জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যথা কালে যুবক মহাম্মদ দিল্লীতে উপনীত হইয়া স্বজাতির রাজপ্রতিনিধি কুতুবদ্দিনের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দুরবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিষয় কর্ম্মের প্রার্থনা করিলেন। কুৎসিতের আদর জগতে অতি অল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং কুতুবদ্দিনের দরবারে বখ্তিয়ার পুত্রেরও স্থান হইল না। দিল্লীর দরবারে স্থান লাভ করিতে অপারগ হইয়া তিনি বাদাউন (আধুনিক রোহিল খণ্ড) প্রদেশের শাসন কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার অদৃষ্টে একটী সামান্য বেতনের কার্য্য লাভ হইয়াছিল। মহাম্মদ বখ্তিয়ার কিছু কাল এই কার্য্যে থাকিয়া, তৎপর অযোধ্যা প্রদেশের শাসন কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া, সৈন্য বিভাগে একটী কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই স্থানেই তাঁহার গুণজ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। শাসনকর্ত্তা তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, বিহার প্রদেশের নিকটবর্ত্তী ভাগোয়াৎ ও ভোইলি নামক দুই পরগণা তাঁহাকে জায়গীর প্রদান করেন। মহাম্মদ বখ্তিয়ার এই সময় তাহার স্বদেশ হইতে, বহু সংখ্যক স্বজাতীয় লোক আনাইয়া, একদল সৈন্য প্রস্তুত করিলেন।

মহাম্মদ বখ্তিয়ার এই সৈন্য দলের সাহায্যে, তাহার জায়গীরের নিকটবর্ত্তী হিন্দু

রাজাদিগের অধিকার লুণ্ঠন করিয়া, ধন সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বিজয়াশা বলবতী হইল। হতভাগ্য বিহার ভূমি তাহার প্রথম লক্ষ্য হইয়াছিল। মহাম্মদ বখতিয়ার বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, হিন্দুদিগের প্রাণবধ, সম্পত্তি লুণ্ঠন, ও নগর গুলি অগ্নি সংযোগে ভস্ম করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন পূর্ব্ব ভারতের গৌরব নিকেতন, সরস্বতীর ক্রীড়া ক্ষেত্র জগদ্বিখ্যাত নালন্দা তাঁহার হস্তগত হইল, তখন প্রাচীন আর্য্যদিগের অমূল্য রত্নরাশি, রাশীকৃত গ্রন্থ তাহার হস্তগত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করাইবার জন্য, মহাম্মদ বখতিয়ার ব্রাহ্মণদিগের অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন খিল্‌জী সৈন্যের বাহুবলে বিহারের ব্রাহ্মণ বংশ প্রায় লোপ পাইয়াছিল। বোধ হয়, যে সকল ব্রাহ্মণ সেই মূর্খদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাও স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হন। এজন্যই সেই সকল অমূল্য গ্রন্থের পাঠোদ্ধার হইল না। বানরের হস্তে মুক্তার মালার যে দশা হইয়া থাকে, মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার ও তাহার অনুচরদিগের হস্তেও সেই সকল অমূল্য রত্নের সেই দশা ঘটিল। মহামূল্য গ্রন্থ নিচয়কে নষ্ট করিয়া মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার জাতীয় বর্ব্বরতার ও স্বীয় মূর্খতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বিহার প্রদেশ লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া, মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বিবিধ ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ক্রমে তাহার বীর্য্য খ্যাতি দিল্লীর দরবারে প্রকাশ হইল। মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বিবিধ প্রকারের বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া কুতুবদ্দিনের নিকট উপস্থিত হইলেন। আজ আর কুতুব, কদাকার বলিয়া মহাম্মদ বখ্‌তিয়ারকে বিমুখ করিতে পারিলেন না। উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া কুতুবদ্দিন তাহাকে মুক্ত হস্তে সম্মান ও উপাধী দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। কিন্তু হিংসাপরতন্ত্র রাজসভাসদগণ মহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের উপাধি ও সম্মানলাভ দর্শনে নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা কৌশল করিয়া মহাম্মদ বখ্‌তিয়ারকে সম্রাট সমক্ষে এক মত্ত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিলেন। খিল্‌জী বংশধর কিছুতেই পশ্চাৎ পদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি একখানি সুতীক্ষ্ণ কুঠার গ্রহণ করিয়া মদমত্ত ভীষণ মাতঙ্গের সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। গজরাজ রঙ্গভূমিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা করিতেছেন, একটি ক্ষীণকায় মানবের সহিত যে অদ্য তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, ইহা তাহার ধারণা ছিল না। মাহুতের উত্তেজনায় ঐরাবত মহাম্মদের প্রতি ধাবিত হইল। কিন্তু খিলজীনন্দন ক্ষিপ্রহস্তে হস্তি শুণ্ডে কুঠার দ্বারা এমন এক আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই গজরাজ চীৎকার করিয়া রঙ্গভূমি হইতে পলায়ন করিল। মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া, গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কুতুবদ্দিন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে মুদ্রা উপহার প্রদান করিলেন। এবং সভাসদবর্গকে ঐরূপ করিবার জন্য উপদেশ করিলেন। মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বহুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া তৎসমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। কুতবদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ারকে বিহারের শাসন কর্ত্তৃত্বে অভিষিক্ত করিয়া, তাহার রাজ্যসীমা বিস্তার

করিতে আদেশ করিলেন। খিল্‌জীনন্দন যশের মালা শিরে ধারণ করিয়া বিহারে গমন করিলেন।

মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার বিহারে উপস্থিত হইয়া তাহার রাজ্যের সীমা বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৌড় দেশের অবস্থা তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। এই নরপতির নাম লইয়া অনেকে অনেক রূপ তর্ক করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র ইহাকে লক্ষ্মণের পৌত্র লাক্ষ্মণেয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেবল মিনহাজ লিখিত "লছমনিয়া" শব্দই ঐরূপ অন্যায় সিদ্ধান্তের মূল কারণ। কিন্তু পাঠকগণ ইহা বিশেষ রূপে অবগত আছেন যে, পশ্চিম প্রদেশে লক্ষ্মণ কে সাধারণত "লছমন" বা "লছমনিয়া" বলা হইয়া থাকে। বিশেষত এই নরপতির সমসাময়িক, স্বদেশীয় গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব প্রণেতা হলায়ুধ ও সদুক্তিকর্ণামৃত প্রণেতা শ্রীধরদাস তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্মণসেন দেব লিখিয়াছেন। এমতাবস্থায় কোনরূপ নাম বৈচিত্র বা গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে না।

এই নরপতির জন্ম সম্বন্ধে মিনহাজ তাঁহার গ্রন্থে এক অদ্ভুত গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার বিজয় বৃত্তান্ত গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন দেবের কর্ণগোচর হইল। মুসলমানদিগের অবিশ্রান্ত বিজয় সংবাদ গৌড়ের রাজসভাসদদিগের হৃদয়ে বিশেষ ভয় উৎপাদন করিয়াছিল। মিনহাজ সিরাজ তাহার তবকত নেহারি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার অধিকৃত হইলে তাঁহার যশঃসৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রমে তাহা লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার অমাত্যবর্গের শ্রুতিগোচর হইল। বহুসংখ্যক জ্যোতির্বিদ, জ্ঞানী ও অমাত্য রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই দেশ তুরকীদিগের হস্তগত হইবে, এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ার সময় উপস্থিত। তুরকীয়েরা বিহার অধিকার করিয়াছে, পর-বৎসর তাহারা অবশ্যই এদেশে উপস্থিত হইবে। অতএব মহারাজ এ প্রদেশবাসীগণকে লইয়া অন্যত্র গমন করুন, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি এদেশ অধিকার করিবেন, এই গ্রন্থে তাহার কোন বর্ণনা আছে কিনা, তাহারা বলিলেন, আছে, তিনি আজানুলম্বিত বাহু। রাজা বলিলেন, তবে ইহার তথ্যানুসন্ধান জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করা হউক। তদনুসারে মহাম্মদ বখ্‌তিয়ারকে দর্শন করিবার জন্য গুপ্তচর প্রেরিত হইয়াছিল। সেই চর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রকাশিত বাক্যের সত্যতা পোষণ করিল।"

মিনহাজের লিখিত গল্প মধ্যে কোন রূপ সত্য লুকায়িত আছে কি না, তাহা ঈশ্বরই জানেন, আমরা আপাতত অনুমানের সাহায্যে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক, এই ঘটনার পর অধিকাংশ নদীয়াবাসী সমতট বঙ্গ ও কামরূপ প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। লক্ষ্মণসেন দেব রাজধানীতে অবস্থানপূর্ব্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে

লাগিলেন। অথচ শত্রু উপস্থিত হইলে যে কি করিতে হইবে, তাহার কোন্‌রূপ বন্দোবস্ত করিলেন না। মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার গুপ্ত চর দ্বারা এই সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

বিহার বিজয়ের দুই বৎসর পর মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া গোপনে গৌড় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইয়া মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার এরূপ বেগে অশ্ব চালাইতে লাগাইলেন যে, কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বারোহীই তাঁহার সঙ্গ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ঊনবিংশ অশ্বারোহী নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগকে অশ্ববিক্রেতা বলিয়া পরিচয় দিলেন। নগররক্ষকগণ তাহাদিগকে কিছুই বলিল না। ক্রমে ক্রমে ছদ্মবেশী ঊনবিংশ অশ্ববিক্রেতা রাজনিকেতনে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ দ্বার রক্ষককে আক্রমণ করিল। এই আকস্মিক ঘটনা দ্বারা একটী ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এদিকে মহাম্মদ বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, অপ্রস্তুত নদীয়া বাসীদিগকে আক্রমণ করিল। রাজা লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া কোন রূপ সদুপায় করিতে পারিলেন না। অগত্যা সপরিবারে খিড়কি দ্বারে বাহির হইয়া সমতট বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। ইহাই তিন নকলে আসল খাস্ত হইয়া ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের দ্বারা সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। মিনহাজের লেখা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয় উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক।

ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের দ্বারা আর একটী মিথ্যা বাক্য আমাদের দেশে প্রচার হইয়াছে; তাহা এই যে, "লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথ তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।" মহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ বিজয়ের ৪০ বৎসর পর মিনহাজ গৌড়ে আসিয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী সমতটে পলায়ন করেন। তথায় কিছুকাল রাজ্যশাসন করিয়া তিনি কাল কবলিত হন, তাঁহার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। এক্ষণ আমরা দেখাইব, কিরূপে এই মিথ্যাবাক্য ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। ২।৩ শত বৎসরের প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস "তবকত আকবরি" ও "তজ করত উল মুলুকে" লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণ সেন দেব জগন্নাথ তীর্থে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইংরাজ লেখকগণ তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধ মিনহাজের বাক্য এস্থলে সমধিক প্রামাণ্য। প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, মহাম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপ জয় করিয়া কেবল রাঢ়দেশের উত্তর ভাগ ও বরেন্দ্রের পশ্চিমভাগ মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ তখনও লক্ষ্মণসেন দেবের রাজচ্ছত্রের অধীন ছিল, তাঁহার উত্তর পুরুষগণ প্রায় এক শত বৎসর স্বাধীন ভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। যদি প্রকৃত পক্ষেই লক্ষ্মণসেন দেব জগন্নাথ তীর্থে সপরিবারে পলায়ন করিতেন, তাহা হইলে মহাম্মদ বখতিয়ার একেবারেই সমগ্র বাঙ্গালা অধিকার করিতে পারিতেন। যখন মহাম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ অধিকার

হইতে প্রায় এক শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা মুসলমানদিগকে পূর্ব্ববঙ্গে পদস্থাপন করিতে দেখিতে পাইতেছি না, তখন কি আমরা পরবর্ত্তী মুসলমান ইতিহাস লেখকের বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি না? অর্থাৎ লক্ষ্মণসেন দেব পলায়নপূর্ব্বক কখনই জগন্নাথ তীর্থে যান নাই।

মহাম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ অধিকারের অব্দ লইয়া একটী ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা "সেন রাজগণ" অধ্যায় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে বিস্তারিত রূপে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিজ্ঞবর টোমাস সাহেবের মতানুসরণ করিয়া বলিতেছি যে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে (৬০০ হিজির অব্দে, ১১২৭ শকাব্দে) এই ঘটনা হইয়াছিল। কারণ লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক বাঙ্গালী সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থকার শ্রীধর দাসের সাহায্য যখন আমরা তাহাকে ১১২৭ শকাব্দে নবদ্বীপের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে দেখিতে পাইতেছি, তখন আমরা কিরূপে বলিব যে, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ১১২৫ শকাব্দে) কিম্বা তাহার পূর্ব্বে মুসলমানেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন।*

* মৎপ্রণীত সেনরাজগণ পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর এই সকল বিষয় লইয়া শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত চিঠী পত্র দ্বারা আমার অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কোন রূপ মীমাংসা না হওয়ায় আমি এই সকল চিঠী পত্র, কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করি। মিত্র মহোদয় এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। সুতরাং চিঠীগুলি বাক্সেই আবদ্ধ রহিল। আমাদের বিশ্বাস এই, চিঠী পত্রগুলি প্রকাশ হইলে ইতিহাস পাঠকদিগের যথেষ্ট উপকার হইত এবং সাধারণে সহজেই সত্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইতেন।

মহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপে আগমনকালে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশই সেনবংশীয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল না। উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ কামরূপের রাজা ও কুঁচ, মেচ প্রভৃতি অসভ্যজাতির অধিকারে ছিল। আধুনিক বাঁকুড়া, মানভূম, বীরভূম এবং মেদনীপুর ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট রাজদণ্ডের অধীন ছিল। রাঢ় দেশের দক্ষিণাংশ সমস্তই উড়িষ্যার রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। উৎকল ইতিহাস লেখক বলেন যে, এই সময় ত্রিবেণীর ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয়দিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণদিকে সমুদ্র তটে কোন উল্লেখ যোগ্য স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কারণ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ইহার কিছুকাল পরে স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকে ত্রিপুরা নোয়াখালি সম্পূর্ণ এবং শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের কিয়দংশ ত্রিপুরার রাজসিংহাসনের অধীন ছিল। পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে জয়ন্তীয়ার রাজাদিগের অধিকার ছিল। তাহার পূর্ব্বদিকে কাছাড়ের স্বাধীন নরপতিদিগের রাজ্য ছিল। কেবল রাঢ়ের উত্তরাংশ, বরেন্দ্রর পশ্চিমাংশ ও বঙ্গদেশ সেন রাজগণের অধিকার ভুক্ত ছিল। ইহাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর পশ্চিম ভাগের রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। পূর্ব্বভাগ সুবর্ণ গ্রাম বা বঙ্গ, বিক্রমপুরের অধিকারভুক্ত ছিল। তাহার রাজধানী সমতট। মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিয়া কেবল গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিলে, মহাম্মদ বখতিয়ার তাহার সৈন্যগণকে নগর লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিলেন,

কেবল রাজ ভাণ্ডার ও হস্তীগুলি তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মিনহাজ বলেন, তৎপর মহাম্মদ বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে গমন করিয়া তথায় রাজপাঠ স্থাপন করিলেন। এবং মুসলমানদিগের প্রথানুসারে দেবমন্দির সকল চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাম্মদ বখ্তিয়ার তাহার অধিকৃত প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ভাগ "লক্ষ্মণাবতী দেবকোট" ও পশ্চিমাংশ "লক্ষ্মণাবতী লক্ষ্ণৌর"। দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর থানার অধীন দমদমা প্রাচীন কালে দেবকোট নামে পরিচিত ছিল। মহাম্মদ বখতিয়ার এই স্থানে একটী রাজধানী [illegible] তাঁহার অধিকৃত প্রদেশের সুশাসনের [illegible] প্রদান [illegible] ধীরে [illegible] রাজধানীর প্রাচীন নাম লক্ষ্ণৌর, উত্তর কালে ইহাই "নগর" নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন "নগর-লক্ষ্ণৌর" হইতেই পশ্চিমাংশ লক্ষ্মণাবতী "লক্ষ্ণৌর" নামে খ্যাত হইয়াছিল।

অবিশ্রান্ত জয়লাভে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অতি অল্প বীরই সক্ষম হইয়াছে। মহাম্মদ বখ্তিয়ার এরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই, এজন্যই তিনি চরমাবস্থায় যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার অতি অল্প অংশ মাত্র অধিকার করিয়া মহাম্মদ বখ্তিয়ার তিব্বত জয় করিতে যাত্রা করিলেন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক বাতুলতা যে কি হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মিনহাজ বলেন যে, বিজয়াভিলাষেই মহাম্মদ বখ্তিয়ারকে এরূপ অবিমৃষ্যকারিতায় প্রণোদিত করিয়াছিল, তিনি তিব্বত যাত্রার পূর্ব্বে মহাম্মদ সেরান খিল্জি কে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মহাম্মদ বখ্তিয়ার জনৈক মেচ সরদারকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আলিমেচ আখ্যা প্রদান করেন। এই আলিমেচ তাঁহার তিব্বত যাত্রার পথ প্রদর্শক হইয়াছিল। তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত দেবকোট হইতে বহির্গত হইয়া আলি মেচের সাহায্যে বর্দ্ধনকোট নগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগরের প্রান্তদেশ বিধৌত এক বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী করতোয়া, কিন্তু মুসলমান লেখক ইহাকে "বাগমতী" লিখিয়াছেন। নদী তীরে ক্রমাগত উত্তর দিকে নয় দিবস গমন করিয়া মহাম্মদ বখ্তিয়ার পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দশম দিবসে নদীর উপরে কাটা পাথরের বিংশতি খিলান যুক্ত এক সেতু দেখিতে পাইলেন। * এই স্থানে আলিমেচ মহাম্মদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। মহাম্মদ তাহার অধীনস্থ দুই জন সেনাপতিকে একদল সৈন্যের সহিত সেতু রক্ষা করিবার জন্য সেই স্থানে স্থাপন করিলেন। এই সময় কামরূপের রাজদূত আসিয়া মহাম্মদ বখ্তিয়ারকে কামরূপেশ্বরের বন্ধুত্ব সূচক সংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি মুসলমান সেনাপতি আর এক বৎসরের জন্য যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত রাখেন, তাহা হইলে আগামী বৎসর কামরূপেশ্বরও তাহার সহিত মিলিত হইয়া তিব্বত আক্রমণ করিবেন এবং এক সহজপথ দ্বারা

* কর্ণেল ডেল্টন এই স্থানকে বর্ত্তমান সিলহাকু (প্রস্তর সেতু) নির্ণয় করিয়াছেন। J. A. S. B. XX. p 291.)

তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবেন। কামরূপ রাজদূতের বাক্য সকল বিজয়াভিলাষে উন্মত্ত মহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের কর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইল না। দূত প্রস্থান করিল। মহাম্মদ উপত্যকা অধিত্যকা ও একের পর অন্য পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে উল্লঙ্ঘন করিয়া ষোড়শ দিবসে সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর গ্রাম ও নগর দেখা যাইতে লাগিল। অপরিণামদর্শী মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার লোভাক্রান্ত হইয়া সেই সকল গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী দুর্গ ও নগরের সন্নিকটে মুসলমানদিগের সহিত দেশবাসীদিগের একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য নষ্ট হয়। মহাম্মদ বখতিয়ার যে দুই একজন দেশবাসীকে ধৃত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট শ্রুত হইলেন যে, সেই স্থানের ১৫ মাইল দূরে করমপত্তন নামে এক নগর আছে, তথায় ব্রাহ্মণ ও ভুটীয়াগণ বাস করে। সেই স্থানে এক বৃহৎ বাজার আছে, ঐ বাজারে প্রতি দিবস কেবল টাঙ্গন ঘোড়াই দেড় হাজার বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু সংখ্যক তাতার জাতীয় সুশিক্ষিত সৈন্য ঐ নগরে নিযুক্ত আছে। মুসলমানদিগের আগমন সংবাদ ঐ নগরে প্রেরিত হইয়াছে। সম্ভবত আগামী কল্য প্রাতে ঐ সৈন্যের একদল আসিয়া উপস্থিত হইবে। মহাম্মদ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহার অধীনস্থ সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই দেশ হইতে পলায়ন করাই স্থির করিলেন। ঐ দিবস শেষ রাত্রেই মুসলমান সৈন্য গোপনে প্রস্থান করিল। কিন্তু দেশবাসীগণ অবিলম্বে এই সংবাদ অবগত হইয়া পথপার্শ্বস্থিত মনুষ্য ও অশ্ব খাদ্যোপযোগী দ্রব্য সকল নষ্ট করিয়া ফেলিল।

এদিকে যে সেতুর উপরে মহাম্মদ বখতিয়ার একদল রক্ষক স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, কামরূপের সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া সেতুর দুইটী খিলান ভাঙ্গিয়া দিল।

ক্রমে ১৫ দিবস নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া মহাম্মদ বখতিয়ার তাহার হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ [illegible] প্রস্তুত সেতুর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার সেতুর দুর্দ্দশা দর্শনে একটী দেবমন্দিরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসময়ে কামরূপেশ্বর তাহার [illegible] সৈন্য সহ সেতু সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল।

মহাম্মদ বখতিয়ার ও তাহার অল্প কয়েক জন অনুচর সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। অবশিষ্ট সৈন্য হিন্দুদিগের হস্তে ও নদী স্রোতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এই সময়েও মেচগন মহাম্মদ বখতিয়ারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তনে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের নেতা মহাম্মদ বখতিয়ার অবসন্ন হৃদয়ে ও দীন বেশে দেবকোট নগরে উপস্থিত হইলেন। হত সৈন্যের স্ত্রী পুত্রের ক্রন্দন ধ্বনিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। আলি মর্দ্দান নামক জনৈক সেনাপতি রুগ্ন শয্যায় শায়িত মহাম্মদ বখতিয়ারকে গোপনে বধ করিয়াছিলেন। (৬০২ হিঃ অঃ ১২০৭ খৃষ্টাব্দ।)

যদিচ মহাম্মদ বখ্‌তিয়ার নাম মাত্র দিল্লীর

শাসনকর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি স্বাধীনভাবে গৌড় জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, এই হতভাগ্য দেশের ভাগ্য চিরকালই একসূত্রে সঞ্চালিত হইতেছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে লেখার সৃষ্টি হয়?

অধ্যাপক মোক্ষমুলর উপরোক্ত বিষয়ে আসিয়াটিক রিসার্চ্চে এক প্রবন্ধ লিখেন; পরে তাহার রচিত পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে সেই প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। মোক্ষমূলরের মতে বৈদিক সময়ে লিখার সৃষ্টি হয় নাই, তিনি, পানিনির সময়েও লিখার চলন ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ, বেদের আরম্ভ অবধি, আশ্বায়ন প্রভৃতির সূত্র গ্রন্থ সকলের রচনা পর্য্যন্ত একটী বিস্তীর্ণ সময় ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদের ঋক সকল রচনা কাল ছন্দোযুগ। এই সকল ঋক্ সঙ্কলিত হইয়া যজ্ঞীয় মন্ত্ররূপে প্রচারিত হইবার কাল মন্ত্র যুগ। যে সময়ে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেদের টীকা স্বরূপ ব্রাহ্মণ ভাগ রচনা হয়, তাহা ব্রাহ্মণ যুগ। যখন কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ শ্রৌত সূত্র ও গৃহ্য সূত্র গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সূত্র যুগ। অধ্যাপকবর এই সুদীর্ঘ কালকে ন্যূনকল্পে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দুইশত হইতে দ্বাদশ শত বৎসর অনুমান করিতেছেন। তাঁহার মতে প্রথম তিন যুগে লেখার সৃষ্টি হয় নাই, সূত্র যুগে লেখার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রবল রূপে প্রচলিত হয় নাই।

প্রথম কালে যে লেখার সৃষ্টি হইয়াছিল না, ইহা লইয়া তর্ক নাই। স্বভাব আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। ক্রমে আবশ্যক হওয়াতেই লিখন সৃষ্টি হইয়াছে। বৃহস্পতি কহেন, যখন ছয়মাসে ভ্রম হইতে আরম্ভ হইল তখনই বিধাতা পত্রারূঢ় অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। (১) এই অক্ষর সৃষ্টি কোন্ সময়ে হয়, নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে যে লিখন প্রণালী চলিত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কোন্ সময়ে বাল্মীকি মুনি বর্ত্তমান ছিলেন ও কোন্ সময়ে রামায়ণ রচনা হইয়াছে, তাহা লইয়াও সম্প্রতি মতভেদ আছে। কেহ কেহ মহাভারতের পরে রামায়ণ রচনা হইয়াছে, কহেন, এজন্য রামায়ণ ছাড়িয়া দিয়া কেবল মহাভারত লইয়াই বর্ত্তমান বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বাইবল-উক্ত জলপ্লাবনের সময়ের পরে প্রাচীন ঘটনা সকলকে আনিতে চাহেন এবং সেই চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাচীন ঘটনা সমূহকে পরবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পান। এবং এই চেষ্টাই ভারতবর্ষের কাল নির্ণয়ের অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে; যা হউক মহাভারতের রচনা কাল স্থির হইলেই আমরা একরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি।

১। ষাণ্মাসিকেপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥
ব্যবহার এবং জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত বৃহস্পতি।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে—"সপ্তর্ষি মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে যে দুইটী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, (তাহাদের নাম পুলহ ও ক্রতু) এই দুই নক্ষত্রে অশ্বিনী প্রভৃতি যে কোন নক্ষত্র অবস্থান করিতে দেখা যায়, সেই নক্ষত্রেই সপ্তর্ষি মণ্ডল সৌর একশত বৎসর অবস্থান করেন। রাজা পরিক্ষীতের রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল।* বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্গত বরাহ মিহির স্বকৃত বরাহ সংহিতাতে এবং কালিদাস জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে এবং কহ্লন আপনকৃত রাজতরঙ্গিনী নামক সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সময়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল। পরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি মণ্ডল যে নক্ষত্রে গমন করে, তাহার গণনা হইয়া ২৫২৬ বৎসর নির্ণয় হয়।† অতএব বিক্রমাদিত্যের সম্বদাব্দ এখন (১৮০৭ শকে ১৯৪২ বৎসর হইতেছে। সুতরাং ৪৪৬৮ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। যুধিষ্ঠির এবং পরিক্ষিত একশত বৎসরের মধ্যে রাজত্ব করাতে বিষ্ণুপুরাণোক্ত এবং বরাহ সংহিতা ও কহ্লন রাজতরঙ্গিনী উক্ত প্রমাণের বিরোধ হইতেছে না। যুধিষ্ঠিরাব্দ নামে একটী অব্দ প্রচলন ছিল, সম্বৎ আরম্ভ হইলে যুধিষ্ঠিরাব্দ ক্রমে লোপ হয়। সম্বৎ আরম্ভ কালে যুধিষ্ঠিরের ২৫২৬ অব্দ ছিল। কহ্লন রাজ তরঙ্গিনীতে আরও লিখিত আছে, কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল।* এইক্ষণে কলির ৪৯৮৬ বৎসর, অর্থাৎ ৪৯৮৬ বৎস কলের্গতাব্দ। ৪৯৮৬ বৎসর হইতে ৬৫৩ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৩৩৩ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। ৪৪৬৮ ও ৪৩৩৩ বৎসর এই উভয়ের মধ্যে ১৩৫ বৎসরের বিভিন্নতা যে দেখা যায়, সন্ধিকাল নিরূপণে এমত বিভিন্ন মত প্রায়ই দেখা যায়। উভয় প্রমাণেই ৪৩০০ চারি হাজার তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীতে আরও লিখিত আছে, কলির ৭০০ বৎসর গত হইলে গোনর্দ্দ কাশ্মীরের অধিপতি হন। তাঁহার সহিত বলদেবের সংগ্রাম হইয়াছিল। দ্বারিকাতে বলদেব, ও কৃষ্ণ; হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠির, তপোবনে বেদব্যাস, এক সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। এই ব্যাসদেবই মহাভারত রচনা করেন। সহজেই ৪০০০ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে মহাভারতের রচনা হইয়াছিল। মহাভারতের অনুক্রমণিকাতে লেখার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতে বেদ লিখিতে নিবারণ করা হইয়াছে।† ইহাতেই অনুমান হইতেছে, মহাভারতের সময়ে বহুলরূপে লিখার প্রচলন ছিল। পাছে শূদ্রাদি বেদার্থ অবগত হয়, এই ভয়েতেই বেদ লেখক নরকগামী হইবেন ভয় দেখান হইয়াছে। কুমারিল ভট্ট কহেন, "যাহা ন্যায়ানুসারে

---

* সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি[illegible]
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাং।
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২৪ অধ্যায়।

† আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্ দ্বিক পঞ্চ দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য ॥

* শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥

† বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাঞ্চৈব লেখকাঃ।
বেদানাং দূষকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥

শিক্ষা করা হয় নাই, যাহা লিখিত, যাহা শূদ্র হইতে প্রাপ্ত, তাদৃশ বেদ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান প্রশস্ত নহে। * মনুসংহিতা অতি প্রাচীন, বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে তদ্রূপ কোন সংহিতা ছিল না। এবং মনু সত্যযুগের ধর্ম্ম কহিয়াছেন † সুতরাং উহা বহু প্রাচীন এবং মহাভারতের পূর্ব্বে মনু ঋষিগণকে ধর্ম্ম কহেন। বর্ত্তমান মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত, অতএব ইহা অধিক প্রাচীন কালের, তাহাতেও লেখন প্রথার উল্লেখ আছে। ‡

বৃহস্পতি কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার নির্ণয় হইতেছে না। কিন্তু তিনি অতি প্রাচীন কালের ইতিহাসই বলিয়া গিয়াছেন। বৃহস্পতি যাহা বলিয়াছেন, তদ্রূপ ঘটনা মনুর ধর্ম্মবলার পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয়।

মোক্ষমূলর নিজের মত বলবৎ রাখিতে গিয়া মনুকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছেন। মোক্ষমূলরের প্রধান যুক্তি এই, ঋগ্বেদ সংহিতাতে বৃক্ষত্বক, পশুচর্ম্ম, কাগজ কলম মসী প্রভৃতির উল্লেখ নাই। এই সকলের অভাব বশত লেখা চলিত থাকা সিদ্ধান্ত করা কঠিন ব্যাপার, যা হউক, বৃহস্পতির প্রমাণ স্মরণ করিয়া অতি প্রাচীন কালে লেখার চলন ছিল না, স্বীকার করিতে হয়। তাহা বলিয়া বৈদিক কালে লেখার চলন ছিলনা, এমত বলা যায় না। অধ্যাপক প্রবর ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যখন পুরাতন বাইবল সৃষ্টি হয়, তখন ইহুদিদিগের মধ্যে লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। ইহুদিদিগের বাসভূমিও ভারতবর্ষ, আসিয়াভুক্ত, ইহুদিদিগের মধ্যে লেখা প্রচলিত হইল, ভারতবর্ষবাসীরা লিখিতে শিখিল না, ইহা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ, ইহাদের সময়ে লিখা প্রচলন ছিল। ব্যাস সংহিতাতেও লেখন প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত প্রমাণ সকল নিম্নে লিখিত হইল।

প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতং।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতম মুচ্যতে॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২অধ্যায়।

অর্থ।

লিখিত পত্র, ভোগ, সাক্ষীগণ, এই তিনটী প্রমাণ, ইহার কোন একটীর অভাব হইলে শপথ করিয়া বলাও প্রমাণরূপ উক্ত হয়। ইহার টীকাতে নারদ প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য কোন্ সময়ের লোক, তাহা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, যাজ্ঞবল্ক্য নামা মুনি বেদব্যাসের অব্যবহিত পরেই অথবা তাহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বেদব্যাস বেদকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া ঋগ্বেদ পৈলকে অধ্যয়ন করান্। পৈল তাহা আবার দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্র প্রমতি, ও বাস্কলকে অধ্যয়ন করান। বাস্কলিও গুরুর নিকট অধীত ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম চারি শাখা করিয়া বৈর্য্য

* যথৈবাম্নায় বিজ্ঞাতাদ্বেদাল্লেখ্যাদি পূর্ব্বকাৎ।
শূদ্রেণাধিগতাদ্বাপি ধর্ম্মজ্ঞানং নসম্মতং।
[illegible] ঋষীকৃতং।

† কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ।
পরাশর সংহিতা প্রথম অধ্যায়।

‡ বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্যচ্চাপি লেখিতং।
সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থান্ কৃতান্ মনুরব্রবীৎ।
মনুসংহিতা অষ্টম অধ্যায়।

প্রভৃতি শিষ্যগণকে দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বৌধ্যের সতীর্থ অর্থাৎ সহ ছাত্র।(১) এই-এক যাজ্ঞবল্ক্য। ব্যাসদেব বিভক্ত যজুর্ব্বেদ বৈশম্পায়ন অধ্যয়ন করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়নের শিষ্য; (২) এই এক যাজ্ঞবল্ক্য। ইহারা এক ব্যক্তিও হইতে পারেন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিও হইতে পারেন। একই হউন আর দুই ব্যক্তিই হউন, এই যাজ্ঞবল্ক্যই সংহিতা করিয়া থাকিবেন। অতএব এসময়েও লেখার প্রচলন ছিল।

কাত্যায়ন ঋষিও আপন সংহিতাতে
লেখ্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

যত্র পঞ্চত্ব মাপন্নো লেখকঃসহ সাক্ষিভিঃ।

এই কাত্যায়ন শৌনকের শিষ্য। শৌনক সাকল প্রাতিশাখ্য রচনা করেন। বিশেষতঃ আরণ্যক উপনিষদে ছন্দের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে বিশেষ বিশেষ ছন্দের নাম দৃষ্ট হয়। সূত্র গ্রন্থেও প্রাচীন ছন্দঃ সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রাতিশাখ্যে ছন্দোধ্যায় * আছে। মাত্রা গণনা করিয়া ছন্দের নাম হয়, প্রাতিশাখ্যের ষোড়শ পটলে এইরূপ কথিত হইয়াছে, মতভেদে মাত্রা বৈষম্য ঘটিলেও, ষট্ সপ্ততি মাত্রা বিশিষ্ট ছন্দ অতিধৃত নামে অভিহিত হইবে। মাত্রা অঙ্কন লেখা ভিন্ন নহে। লেখা ও লিপি, লিখ্ ও লিপ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লিখ ধাতুর অর্থ, কোন বস্তুতে রেখা পাত করা। লিপ ধাতুর অর্থ লেপন করা।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে জানা যাইবে, মনুসংহিতা, মহাভারত, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, নারদসংহিতা, ব্যাসসংহিতা, এবং কাত্যায়নসংহিতায় লেখা প্রচলন থাকার প্রমাণ আছে। এবং মহাভারত রচনা ৪৩০০ বৎসরের সমকালে হইয়াছে, মনু তাহা হইতেও প্রাচীন, ইহাতেই পাণিনির সময়ে লেখা চলিত থাকা বুঝা যায়, কিন্তু মোক্ষমূলর দৃঢ়তা সহকারে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, পাণিনির সময়ে লিখার চলন ছিলনা, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া অনেকে ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; অতএব এতৎ সম্বন্ধে অধ্যাপকের মত এক এক করিয়া খণ্ডন করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, অধ্যাপকের মতে খৃষ্টীয় শকারম্ভের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হন। ইহা হইলে, পাণিনির সময়ে লিখন প্রথা চলন ছিল, কেননা ঐ সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে লেখা চলিত থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা অনুমান করি, পাণিনি ইহা হইতেও প্রাচীন। লিপি কার্য্য প্রচলিত না থাকিলে পাণিনি কখনও এত সূক্ষ্মরূপে ব্যাকরণের নিয়ম সকল একত্রে সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। যে সময়ে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ সভ্যতার উদয় হয়, সেই সময়ে লিপি কার্য্য চলন ছিলনা, ইহা কে স্বীকার করিবে? বুদ্ধদেবের জীবনচরিত রূপ ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত লিপিফলক দ্বারা, আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে অ আ ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করেন্। ললিতবিস্তরে যে বর্ণমালা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ঋ ৯ ও ল এই তিন বর্ণ নাই। মোক্ষমূলরের মতে খৃষ্টাব্দের ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। অতএব বুদ্ধের সময়ে ভারতে

১ বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৪ অধ্যায়
২ বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৫ অধ্যায়

লেখন প্রথা ছিল, এবং পাণিনির সময়ে ছিলনা, ইহা কে স্বীকার করিবে?

পাণিনির সময়ে অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই এবং লিখন প্রথা চলিত ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক। মোক্ষমুলর নিম্ন লিখিত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, যদি পাণিনির লিপি জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ অন্তঃস্থ উষ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ অবশ্যই, অক্ষরের আকৃতির কোন না কোন নাম প্রদর্শন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ অক্ষর সকলের নাম বর্ণ, কিন্তু শ্বেতরক্তাদি কোন বর্ণ দ্বারা লিখিত অক্ষর লক্ষ্য করিয়া বর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, কণ্ঠোচ্চারিত স্বরের বর্ণনানুসারে ক, খ, প্রভৃতির নাম বর্ণ হইয়াছে। অক্ষর শব্দ দ্বারাও লেখার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়না, কেন না উহার অর্থ, যাহার ক্ষয় নাই, যাহা আদি ও মূল। দাড়ি প্রভৃতি চ্ছেদ সূচক চিহ্ন দ্বারা লেখার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণে সেরূপ চিহ্ন নাই। তাহাতে বিরাম শব্দ আছে, বিরাম শব্দ, উচ্চার্য্যমাণ স্বরের বিচ্ছেদ বুঝায়, লেখার বিচ্ছেদ বুঝায় না। তৃতীয়তঃ পাণিনিতে রেফ শব্দ আছে, কাত্যায়ন রেফ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া উহা রকারের প্রতিপাদক বলিয়াছেন। প্রাতিশাখ্য গ্রন্থেও রেফ শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অক্ষরের আকৃতি অনুসারে কল্পিত হইয়াছে, অনুমান হয় না। চতুর্থতঃ, পাণিনি ব্যাকরণে লিপিকর, যবনানী, ও গ্রন্থ, এই তিনটী শব্দ পাওয়া যায়, অধ্যাপকের মতে, সূত্র গ্রন্থ রচনা কালে বিষয়কর্ম্মে লেখার রীতি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া পাণিনি লিপিকর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যবন জাতির বর্ণমালা লক্ষ্য করিয়া যবনানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থ শব্দে লিখিত পুস্তক নহে। মুখ পরম্পরায় প্রচলিত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া পাণিনি গ্রন্থ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অধস্তন বৈয়াকরণ বোপদেব কোন কোন অক্ষরের আকৃতি দিয়াছেন। পাণিনি তাহা দেন নাই বলিয়া, তাহার সময়ে লেখন প্রথা প্রচলিত ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। পাণিনি-ব্যাকরণে অক্ষর, অথবা বর্ণ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত অক্ষর অথবা বর্ণ বলিতে হইবে। পাণিনির ৭।৪। ৫৩সূত্রে বর্ণ শব্দের নির্দ্দেশ আছে; কাত্যায়ন ৩।৩।১০৮ সংখ্যক সূত্রের বার্ত্তিকে বর্ণের উত্তর "কার্" প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন। তদনুসারে অকার ইকার উকার, প্রভৃতি শব্দ চলিত আছে, লিখন প্রথা চলন না থাকিলে ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? দাড়ি প্রভৃতি বিচ্ছেদ লেখা সৃষ্ট না হইলে, হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতে বর্ত্তমান কালের বাঙ্গলায় ব্যবহৃত কামা, সেমিকোলন,প্রভৃতির ন্যায় চিহ্ন নাই,কেবল বিচ্ছেদই আছে। যখন অক্ষর সৃষ্টি হইয়া পত্রারূঢ় হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণের বিরামানুসারে দাড়ি ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইল। রেফ শব্দ দ্বারাই লিখিত অক্ষরের অস্তিত্ব অনুমান হয়, রকার এবং রেফ একই পদার্থ, কেবল লেখার প্রণালী ভেদে ভিন্ন নাম, এই আশঙ্কাতেই অধ্যাপক মূলর রেফ শব্দ লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লিখিবার শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া অধ্যাপক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই পাণিনির সময়ে

লেখা চলিত ছিল, প্রমাণ হয়। পাণিনির সময়ে লিপিকর থাকিলে, লিখন ক্রিয়াও ছিল। পাণিনির ৪।১।৪৯ সূত্রানুসারে যবন লিপি বুঝাইতে "যবনানী" পদ সিদ্ধ হয়। ইহা সেমেটিক জাতির বর্ণমালাই হউক, আর পারস্য জাতির বর্ণমালাই হউক, লিখন প্রথা পাণিনির অপরিজ্ঞাত না থাকাই উহা দ্বারা প্রমাণ হয়। পাণিনি ব্যাকরণোক্ত গ্রন্থ শব্দও লিখিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ৪।৩। ১১৬ সূত্রে "কৃতে গ্রন্থে" শব্দ প্রাপ্ত হয়, কৃত গ্রন্থ হইলে লিখিত বলিতে হইবে। অধ্যাপক আপন পক্ষ সমর্থন জন্য কহেন, কৈয়টের নির্দ্দেশানুসারে এই সূত্র পাণিনির কৃত নহে, কিন্তু কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই যখন এই সূত্র লইয়া বিচার করিয়াছেন, তখন উহা যে পাণিনি সূত্র, তৎপ্রতি সন্দেহ করা যাইতে পারে না। কাত্যায়ন পাণিনিকৃত ব্যাকরণের "বার্ত্তিক" প্রণয়ন করেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যকর্ত্তা এবং কাত্যায়নের পরবর্ত্তী। উভয়েই খৃষ্টাব্দারম্ভের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত, ব্যবহারতত্ত্ব, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, কহ্লন রাজ তরঙ্গিনী, মোক্ষমূলর কৃত পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ও বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি, এই সকল গ্রন্থে সমালোচনা করিয়া উপরি উক্ত প্রস্তাব লিখিত হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে অন্তরাত্মার সহিত ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। ভারতে লেখার সৃষ্টি কোন্ সময়ে হইল, এবং পাণিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ভারতবাসী কোন ব্যক্তিই ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি, বার্ত্তিক কর্ত্তা কাত্যায়ন, মহাভাষ্যকর্ত্তা পতঞ্জলি, ইহারা কেহই এ বিষয়ে বিচার করেন নাই। বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ নবরত্নেরাও ইহাতে মনোনিবেশ করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজের বুদ্ধি ও গবেষণা এ বিষয়ে পরিচালিত হয় নাই। অধস্তন বৈয়াকরণ বোপদেবও এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রথমে এই প্রস্তাবের অবতারণা হয়, এবং গোল্ডষ্টুকর কর্ত্তৃক ইহা সমালোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে, বঙ্গদেশীয় কেহ ইহার পক্ষে কি বিরুদ্ধে লিপি ধরেন নাই। ভারতবর্ষের অন্য স্থানের কোন মহাত্মা এই বিষয়টী আলোচনা করিয়াছেন কি না, তাহা জ্ঞাত নই। অল্প দিন হইল প্রসিদ্ধ লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত, পাণিনি নামা গ্রন্থে পাণিনির সময়ে লেখা পদ্ধতি চলন ছিল কি না, এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে বহুদূর ইউরোপ, বিশেষতঃ মোক্ষমূলর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতীয় শ্রৌত শাস্ত্র শিক্ষা করেন নাই। ইউরোপে বসিয়া ভারতীয় সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তাহার উপর নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ইহাতে সহজেই ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে। মৈত্র ব্রাহ্মণের উপাধি, মিত্র, কায়স্থের উপাধি, বাঙ্গলা দেশের ভদ্রমাত্রেই ইহা জ্ঞাত আছেন কিন্তু অধ্যাপক মূলর তাহা জ্ঞাত নহেন, মিত্র শব্দ হইতে মৈত্র শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব মৈত্র যখন ব্রাহ্মণ তখন মিত্রও ব্রাহ্মণ, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া, অধ্যাপক মূলর, ডাক্তার রাজেন্দ্র মিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহা কিছু বিদ্বেষ পরতন্ত্রতার ফল নহে, দেশের নিয়ম

না জানার ফল। অতএব অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার ভ্রম হইবে, ইহা বলিতে পারা যায়।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, ইচ্ছাপূর্ব্বক, জল প্লাবনের সময়ের পরে, ভারতীয় প্রসিদ্ধ ঘটনা যাহা, ৪২০০ বৎসরের পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহাও ইহার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়া বহু গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা অনবধানতা অথবা অনভিজ্ঞতাবশত কোন কথা কহিলেও তাহা বলবৎ রাখিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেন।

শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার।

বাল্য-বিবাহ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

উপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়ার নামই বাল্য বিবাহ। কিন্তু বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি? যাঁহারা সহজে সকল কথার উত্তর দিতে চান, তাঁহারা হয়ত বলিলেন "কেন? যখন স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সংসর্গ কামনা করে, তখনই তাহাদের বিবাহ করা উচিত। শৈশবে এ আসঙ্গলিপ্সা থাকে না—যখন এই আসঙ্গলিপ্সা মনে উদিত হয়, তখনই ত বিবাহের সময় প্রকৃতি এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।" এই আসঙ্গলিপ্সার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, ইহা শিক্ষা, অবস্থা ও বয়সের উপর নির্ভর করে এবং এই তিনের প্রভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই বাসনার উদয় হইয়া থাকে। এই যুক্তির মধ্যে কতকতটা সত্য আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা নিতান্ত অনির্দ্দিষ্ট বিধায় আমরা ত্যাগ করিলাম। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, ঋতুই (Puberty) বিবাহের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে, প্রকৃতি বিবাহের এই নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং Pubertyর সমকালে বা তৎ পূর্ব্বেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া বিহিত।' এই যুক্তির সমর্থনকারীরা, বিশেষতঃ আমাদের দেশীয়েরা স্ত্রী জাতির প্রতিই ইহার বিশিষ্ট রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাঁদের কথা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে বিচার করিব।

বাল্য বিবাহের শারীরিক দিক আমরা প্রথমে আলোচনা করিব। ঋতু উপস্থিত হইলেই স্ত্রীলোক সন্তান ধারণে সক্ষম, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এ কথা শারীর-তত্ত্ব বিদ্যা স্পষ্টই স্বীকার করেন এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ নিত্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋতুর প্রথম আবির্ভাবের সময় গর্ভাধান সম্ভবপর হইলেও, তাহা সুসময় কি না, তাহাই আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। "প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট সময়" বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহার অসারতা সহজেই দেখান যাইতে পারে। প্রকৃতি হইতেই একটী তুল্য রূপ ঘটনা তুলনার জন্য গ্রহণ করা যাউক। সকলেই জানেন ও ইহা অত্যন্ত সহজবোধ্য যে, কঠিন খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণের জন্যই দন্তের আবশ্যক এবং প্রকৃতিও সেই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে দন্ত দিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয়

যে, যে সময়ে শিশুর দন্তোদ্ভেদ হইবে, সেই সময়েই তাহাকে কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দিতে হইবে? না বরঞ্চ যাহাতে কঠিন দ্রব্য সংস্পর্শে তাহার সেই নবোদ্ভিন্ন কোমল দন্ত কোনরূপে নষ্ট বা আঘাত প্রাপ্ত না হয়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য? তদ্রূপ ঋতুর প্রথম বিকাশ সন্তান ধারণের সম্ভাবনার পরিচায়ক হইলেও তাহা যে সুসময় নহে, তৎকালে গর্ভাধান হইলে মাতাও সন্তান উভয়েরই যে মহা অমঙ্গলের সম্ভাবনা, উভয়েরই স্বাস্থ্য যে নষ্ট হইবে, তদ্বিষয়ে শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত সঙ্কলন করিয়া দিতে পারিলেই আমার কার্য্য শেষ হইবে।

Dr. J. Fayrer, M.D., বলেন "The fact of a girl having attained the period of puberty does not by any means imply that, though *capable* she is *fit* for marriage. Physiological science, common sense, and observation all teach that an immature mother is likely to produce weak and imperfect offspring." "Dr. Chevers M.D., বলেন "If safe childbearing and healthy offspring are to be regarded as being among the first objects of marriage, the rite ought seldom to be allowed before the 18th, the 16th year being the minimum age in exceptional cases." Dr. Charles, M.D., বলেন "The beginning of menstruation should not be taken to represent the marriageable age. It is true that taking generally this may be said to be sign that a girl has arrived at the age at which she *may* concieve. I believe that though this event may be taken to represent commencing puberty, a girl ought not to be taken as having arrived at puberty till various changes in her organisation, which take place gradually and occupy a considerable period, have been fully completed." "Dr. A. V. White, M.D., বলেন "Menstruation is no doubt the most important sign of puberty, but when it shows itself early it is the only sign of commencing puberty, and in the absense of other indications, by no means imply that a girl is fitted for marriage or child bearing. It is not until puberty has been fully established that the minimum marriageable age has been reached and this rarely occurs, in my opinion, among Native girls before the 15th or 16th year; but if marriage were delayed until the 18th year, the frame would be more thoroughly developed, the danger of child bearing would be lessened, and healtheir offspring would be secured". Dr. M. L. Sarkar, M.D, বলেন "The commencement of the menstrual function is no doubt an index to the *commencement* of puberty. But it is a grave mistake to suppose that the female who has began to menstruate is capable of giving birth to healthy children."

বোম্বের Dr. Atmaram Pandurung বলেন "Puberty is not the best criterion of marriageable age, for it is not the period at which development of parts concerned in gestation and delivery is completed; nor is the mind well adapted for the requirements of the mother in taking proper care of her delicate and tender offspring".

এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রথম ঋতুসন্দর্শনের সমকাল ও অব্যবহিত পরকালকেও গর্ভাধানের অনুপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তেমনই অপরদিক হিন্দু বিজ্ঞানবিদ্-মহর্ষি সুশ্রুত বলিতেছেন;—

"ঊনষোড়ষবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃপঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে

যে; ঋতুর প্রথম আবির্ভাব ও তাহার পরও নাত্যাল্পকাল পর্য্যন্ত গর্ভাধানের সুসময় নহে, পরন্তু উক্ত সময়ে গর্ভাধান হইলে মাতাকে যৌবনের প্রারম্ভেই জরা আসিয়া অধিকার করিবে ও সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইবে; যদিচ তাহা না হয়, তবে অকাল মৃত্যু তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, যদি বা অকাল-মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়, তবে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া চিররুগ্নের দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া তাহাকে দিনাতিপাত করিতে হইবে। জীবতত্ত্বের গুটি কয়েক মূল নিয়ম একটু অনুশীলন করিলেই ইহার কারণ আরও স্পষ্ট অনুভূত হইবে।

ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন অথবা পিতামাতার জীবন ও সন্তানের জীবন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাদের জীবন বিপরীত অনুপাতে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে থাকে। যে পরিমাণ জীবনীশক্তি সন্তান রূপে জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে, সেই পরিমাণে পিতা মাতার জীবনী শক্তি হ্রাস হইবে এবং যে পরিমাণ জীবনী শক্তি পিতা মাতার দেহ পুষ্টি ও দেহ রক্ষার জন্য তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, সেই পরিমাণে শক্তি নূতন জীব সৃষ্টির জন্য ব্যয়িত হইল না, সুতরাং সংখ্যা গণনায় মানবজাতি সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইল। সংখ্যা গণনায় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেও মানবজাতি এতদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হইয়া বরং লাভবানই হইয়া থাকে। সন্তান সংখ্যা কম হইলে পিতামাতার জীবন রক্ষার জন্য অধিক শক্তি থাকিয়া যায়। তাহার ফল পিতামাতার দীর্ঘ জীবন অথবা মানব জাতির পুষ্টি সাধন। অধিক সংখ্যক সন্তানের অপেক্ষা অল্প সংখ্যক সন্তানের লালন পালন অধিকতর সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়; সুতরাং সুচারুরূপে প্রতিপালিত অল্প সংখ্যক সন্তানের জীবন অযত্নে প্রতিপালিত অধিক সংখ্যকের জীবন অপেক্ষা অধিকতর সুনিশ্চিত ও তাহার অবান্তর ফল মানব জাতির পুষ্টতা। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে—আমরা বিষয়ান্তরে যাইয়া পড়িতেছি। সন্তানোৎপত্তি ও পিতা মাতার জীবনী শক্তির হ্রাস একই কথা—ইহাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একথা আর একটু বিচার করিয়া দেখিলে আরও সুস্পষ্ট হইবে। ব্যক্তি মাত্রেরই শক্তির সীমা আছে, পিতা মাতার শক্তিরও সীমা আছে। শিশু জন্ম কালে কিয়ৎ পরিমাণে শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, যাহার বলে সে বাহ্য পদার্থকে নিজ দেহ-পদার্থে পরিণত করিতে পারে ও বাহ্য প্রতিকূল শক্তি সমূহের প্রভাব অভিভূত করিয়া জীবন সংগ্রামে নিজ জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। শিশু এ শক্তি তাহার পিতা মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যে পরিমাণ শক্তি শিশুদেহে বর্ত্তমান, সেই পরিমাণ শক্তি পিতা মাতার সসীম শক্তি আধার হইতে হ্রাস হইয়াছে অর্থাৎ সেই পরিমাণে তাহাদের জীবন হ্রাস হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার "Principles of Biology" নামক গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"Genisis is a process of negative or positive disintegration; and is thus essentially opposed to that process of integration which is one element of individual evolution. * * It is a general physiological truth, however, that while the building up of the individual is going on rapidly, the reproductive organs remain im-

perfectly developed and inactive and that the commencement of reproduction at once indicates a declining rate of growth and becomes a cause of arresting growth. * * * The continued aggregation of materials into one organism, renders impossible the formation of other organism out of these materials. As much assimilated food as is united into a single whole is so much assimilated food withheld from plurality of wholes that might else have been produced."

কয়েকটী উদাহরণ দিলে ইহা আরও স্পষ্টতর হইবে। মালীরা কলমের চারাকে সবল ও সতেজ করিবার জন্য প্রথম প্রথম মুকুল গুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে, এতদ্বারা বৃক্ষের যে শক্তি নূতন বৃক্ষ সৃষ্টির জন্য ব্যয়িত হইত, তাহা তদ্রূপে ব্যয়িত না হইতে পারিয়া নিজেরই অঙ্গের পুষ্টি সাধন করিল। অত্যন্ত উর্ব্বর স্থানের বৃক্ষাদি অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল হয় এবং তাহারা বিলম্বে মুকুলিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই একই সত্য প্রকাশ পাইতেছে। পশু পক্ষী পালকেরা আহারীয় পশু ও পক্ষীকে হৃষ্ট পুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের জনন শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকে। হলাদি চালনের জন্য আমাদের দেশে ষাঁড়ের জনন শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়া বলদ করিয়া লওয়া হয়। কারণ ষাঁড় অপেক্ষা বলদগুলি অধিকতর শ্রমসহিষ্ণু, কার্য্যদক্ষ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী। এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সন্তানের জীবন পিতামাতার জীবনের প্রতিকূল। ফরাসী দেশে বিবাহিত ও অবিবাহিত রমণীর তালিকা তুলনা করিয়া করিয়া দেখা গিয়াছে যে,—"Twice as many wives under twenty die in the year as die out of the same number of the unmarried." এবং Dr Charles এই বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিতেছেন 'I may state my belief that probably the injurious effect of early child-bearing would be more apparent from Indian statistics."

ইহাও একই মতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জীবতত্ত্বের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, দৈহিক গঠন ও বিকাশের (growth and development) পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে জনন-ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া উচিত নহে। জনন ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই মাতার শারীরিক গঠন ও বিকাশ হ্রাস হইয়া পড়িবে। এই অপরিপক্ক বীজের সন্তানও ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে এবং ভাবী মানব-বংশের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। জননশক্তির প্রথম বিকাশ (puberty) দৈহিকপরিণতির চরম ফল নহে—ইহা যৌবনের প্রারম্ভ মাত্র। যৌবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি না হইলে জনন ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া কখনই উচিত নহে।

তৎপরে কোন্ বয়সে শারীরিক গঠন ও বিকাশ পূর্ণ হয়, যৌবনের পূর্ণ পরিণতি হয়, তাহা আমাদের বিবেচ্য। এ স্থলেও আমরা শারীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। এ পর্য্যন্ত যে পণ্ডিতগণের মত সঙ্কলন করা গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্যূন ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কখনই বিবাহ হওয়া উচিত নহে। এ বিষয়ে Dr. Smith M. D. সুস্পষ্ট রূপে বলিতেছেন ;—"Before the age of sixteen a female cannot be said to be fully developed either physiologically or mentally. Some arts of her osseous structure which

are essential to the reproductive function, are not yet consolidated". ইহাতে প্রমাণ হইল যে, ষোড়শ বৎসর বয়সেও স্ত্রীলোকের গঠন পূর্ণ হয় না। Dr. J. Ewart, M.D., বলেন—"I am of opinion, that the minimum age at which Hindu women should be encouraged to marry, would be after and not before the sixteenth year. But the race would be improved still more by postponing the marriage of women till the eighteenth or nineteenth years of age." Dr Fayrer বলেন—"I consider that the minimum age at which Native girls should be married is 16 years and I think it would be well, as a general rule, that marriage should be deferred to a later period, say to 18 or 20 years of age." ডাক্তার আমিজ খাঁ বলেন—"In considering the proper age for marriage for a native girl of India, *we should not look* to the time when the signs of puberty show themselves generally, but make it a point *that under no circumstances a girl is to be allowed to get married before she has attained the full age of sixteen at the least;* nor can there be entertained any doubt that were the consummation of marriage rites deferred somewhat longer, it will tend to the improvement of the individual and the progeny too." Dr. Atmaram Pandurung বলেন—"If the question had. been simply what is considered to be the proper age at which girls ought to marry the proper answer would be, without hesitation, 20 years and there are sound, anatomical and statistical reasons. When girls marry at that age all the end and aim of marriage are gained with the best of results. There is then less amount of sterility and also less number of deaths of mothers at their delivery &c. ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু বলেন—"Our girls should not be married before they have attained at least, the eighteenth year of their age. Before this period it would not bear with impunity the drain which maternity must establish in it".

ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী ২১ বৎসর বয়সই বিবাহের উপযুক্ত সময় মনে করেন। আমরা দেখিয়াছি যে, Dr. Chevers র মতে অন্যূন ১৮ বৎসর ও সুশ্রুতের মতে অন্যূন ১৬ বৎসর গর্ভাধানের কাল নিরূপিত হওয়া আবশ্যক।

এই সমস্ত মহাত্মা পণ্ডিতগণ এতদ্দ্বারা বিবাহের নিম্নতম বয়সই, যাহার ন্যূন হইলে মহানিষ্টপাতের সম্ভাবনা, স্থির করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু গর্ভাধানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বয়স কি, তাহা স্থির করেন নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর Herbert Spencer বলেন;—"It is shown by the tables of Dr. Duncen's works that the fecundity of women increases up to the age of about 25 years; and continuing high with but slight deminution to after the 30th and then gradually wanes. Infants born of women from 25 to 29 years of age are both longer and heavier than infants born of younger or older women * * There is the fact that a too early bearing of young produces on a woman the same injurious effects as on an inferior creature—an arrests of growth and enfeeblement of constitution."

আমরা শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছি যে, কোনও বালিকারই অন্যূন ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত নহে ও পঞ্চ বিংশতি হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত গর্ভাধানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। নারী দেহের পূর্ণ পরিণতির কাল নিরূপণ করিতে গেলে অপর একটী প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়—কোন্ সময়ে তাহাদের প্রথম ঋতু কাল উপস্থিত হয়? এই প্রথম ঋতু কালের উপর তাহা-

দের পরিণতি কাল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এখন আমরা এই বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঋতুর কোন দৃঢ়নিশ্চিত সময় নাই—শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত, তাহাদের ঋতু অপেক্ষাকৃত বিলম্বে প্রকাশ পায়, অপরপক্ষে যাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে না, তাহাদের ঋতু অপেক্ষাকৃত অগ্রে দেখা দেয়। পল্লিগ্রাম অপেক্ষা সহরে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বালিকাদিগের ঋতু উপস্থিত হয়। দেশের আবহাওয়াও ঋতুকাল পরিবর্ত্তনের কারণ। এবিষয়ে পণ্ডিতগণের মতামত ও তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখাইব, বালিকাদিগের ঋতু কোন্ কালে উপস্থিত হয় ও ঋতুর আবির্ভাবের নিয়ম কি।

Dr. Peters ২৩৬৬৫ গুলি নানা দেশীয় স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু কালের সময় নিরূপণ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত তালিকাটী প্রদান করিয়াছেন; তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, কোন্ দেশের স্ত্রীলোকের কোন্ বয়সে প্রথম ঋতু দর্শন দেয়।

প্রথম ঋতু কালের বয়স	গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মোটসং ৭৬৬	শীতপ্রধান দেশ মোটসং ৬৭৪৫	নাতিশীতোষ্ণ দেশ মোটসংখ্যা ১৬১৫৪
৫	০	০	১
৭	০	০	১
৮	০	০	২
৯	৩	০	১৬
১০	৯	০	৮৩
১১	২১	১	৪৪১
১২	৯৬	[illegible]	৯৮৩
১৩	১৫৯	১৯	১৩৬০
১৪	১৩৩	১১৩	২১০৫
১৫	১০৩	৩৭২	২৬৭৫
১৬	৫৫	৭৩৮	২৮৬৯
১৭	৩৯	৭৪১	১৭৯৫
১৮	২৬	৬১৫	১৪৯৭
১৯	১০	৫৪০	৭৯৯
২০	৮	৩৬০	৩৯৮
২১	২	২৭৮	১২৬
২২	২	১১৪	৪৩
২৩	১	৭৩	২২
২৪	২	২৭	১১
২৫	০	১২	৩
২৬	০	৪	২
২৭	০	৫	০
৩০	০	১	০

এই তালিকাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সর্ব্ব প্রথমে আমরা দেখিতে পাই যে, উষ্ণপ্রধান দেশে অন্যান্য দেশাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে, নাতিশীতোষ্ণদেশে তদপেক্ষা অধিকতর বয়সে ও শীতপ্রধানদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুকাল উপস্থিত হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই উষ্ণপ্রধান দেশে ১২ ও ১৫ বৎসরের মধ্যে, নাতিশীতোষ্ণ দেশে ১৩ ও ১৮ বৎসরের মধ্যে ও শীতপ্রধান দেশে ১৪ ও ২২ বৎসরের মধ্যে ঋতুকাল উপস্থিত হয়। ইহাতে হঠাৎ মনে করা যাইতে পারে যে, উষ্ণতার তারতম্যই ইহার একমাত্র কারণ, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

অবশ্য উষ্ণতার তারতম্য যে ইহার কারণ, তদ্বিষয়ে বিশেষ সংশয় নাই। তালিকা-দৃষ্টে দেখা যায়, শীতপ্রধান দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের ঋতুকাল ১৭ বৎসর ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে ১৬ বৎসর। এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, উষ্ণতার জন্য ঋতুকালের তারতম্য বড় অধিক নহে। কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশের তালিকাটী দেখিলে দেখিতে পাই যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের ঋতুকাল ১৩ বৎসর বয়সেই উপস্থিত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে ঋতুকালের ব্যবধান এক বৎসর মাত্র, কিন্তু উষ্ণপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণদেশে তিন বৎসর ব্যবধানের কারণ কি? কেবল উষ্ণতার তারতম্যই কি ইহার কারণ? না, অন্যকোন কারণ ইহার সহায়তা করিতেছে?

নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান দেশের (Europe) আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বিশেষত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইউরোপের কোন দেশেই নিতান্ত অপরিপক্ক বয়সে বিবাহ প্রচলিত নাই কিন্তু যে উষ্ণপ্রধান দেশের তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে তথায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বাল্য বিবাহ যে অস্বাভাবিক রূপে ঋতুকালকে অগ্রসর করিয়া দেয়, তাহা আমরা পণ্ডিতগণের মত সঙ্কলন করিয়া প্রমাণ করিব। উষ্ণপ্রধান দেশে (যথা ভারতবর্ষ) অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান দেশ (Europe) অপেক্ষা যে অল্প বয়সে ঋতু উপস্থিত হয়, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ উষ্ণতা নহে কিন্তু এই সামাজিক দুর্নীতি—বাল্য বিবাহ। উল্লিখিত তালিকাটী হইতেই আমরা তাহার একটী যুক্তি প্রদর্শন করিব। নাতিশীতোষ্ণ ও শীত প্রধান দেশের তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে ঋতুকাল উপস্থিতির সংখ্যা সেরূপ আবদ্ধ নহে, যেরূপ উষ্ণ প্রধানদেশে দেখা যায়। এ বিষয়ে Dr. Peters তাঁহার Diseases of Women নামক গ্রন্থের একস্থানে বলিতেছেন:—"Hindu women reach Puberty nearly two years earlier than in Europe, a far greater proportion menstruate at 12th, 13th and 14th years of age than in Europe where it has not been found that so large a proportion of cases cluster around any partieular age but are scattered equally over the 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and even 18th years."

তালিকাটী তুলনা করিলে আরও একটী বিষয় পরিলক্ষিত হইবে। নাতিশীতোষ্ণ দেশে উপস্থিত ঋতুকালের সংখ্যা দ্বাদশ বৎসর হইতে ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেখা যায়, ও তৎপরে ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকে কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না; শীত প্রধান দেশে চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেখা যায় ও তৎপর হ্রাস হইতে থাকে, হঠাৎ পরিবর্ত্তন নাই; উষ্ণ প্রধান দেশের তালিকায় এরূপ ধারাবাহিক ক্রম (continuity) দেখা যায় না। এখানে একাদশ বৎসরে যত সংখ্যকের ঋতু উপস্থিত হয়, দ্বাদশ বৎসরে সে সংখ্যার হঠাৎ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় এবং ত্রয়োদশ বৎসরেই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা প্রাপ্ত হয় ও তৎপর দুই বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ বালিকার ঋতুকাল উপস্থিত হইয়া হঠাৎ অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়ে। হঠাৎ

এরূপ ক্রম (continuity) ভঙ্গের কারণ কি? উষ্ণতার প্রাধান্য ইহার কারণ স্বরূপ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই নির্দ্দেশ করিবেন না। কারণ উষ্ণতার প্রভাব সকল বয়সের লোকের প্রতিই সমভাবে কার্য্য করে। বিষময় বাল্যবিবাহই ইহার একমাত্র কারণ। বাল্য বিবাহ বালিকাদিগকে হঠাৎ এক নূতন অবস্থায় ফেলিয়া অস্বাভাবিক রূপে তাহাদের ঋতুকাল উপস্থিত করিয়া দেয়। সুবিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মত একথার সমর্থন করিতেছে। বালিকাদের ঋতু কালের উপর বাল্যবিবাহের ফলাফল নির্ণয় করিতে গিয়া ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিভ্‌ চক্রবর্ত্তী বলেন:—"The best standard for comparison will be the Native Christian girls on the one hand and Europian girls on the other, for in respect of marriage they adopt the same rule. I am not aware that there is any practical difference between these two classes of girls as to the age of puberty. The Hindu and Mahomedan girls, from the custom of early marriage attain to *forced* puberty at an earlier age." Dr. Charles বলেন:—

"The great cause which induces early menstruation (in India) is undoubtedly early marriage. The girl is forced into menstruating prematurely by the abnormal conditions under which marriage places her. * * I believe, in the young widow and in the girl kept separate from her husband, menstruation occurs uniformly later than in those living in a state of marriage. I am also of opinion that the universality of early marriage has had a decided effect in determining the earlier appearance of menstruation." ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বলেন:—"The advocates of early marriage urge that the custom is nothing else than the expression of a stubborn necessity which has arisen from the fact of early pubescence in this country. I think, however, we are warranted * * in concluding that early marriages have been the cause of early pubescence." Dr. Atmaram Pandurung বলেন:—"The custom of premature marriage thereby acting injuriously upon the morals of the people among whom it prevails, has an undoubted tendency to bring on early puberty, and this strangely mistaken for climatic influence." Dr. A. V. White বলেন:—Early marriages as they obtain in this country (India) have the effect of prematurely rousing the ovaries into a state of activity and early menstruation is the result." ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু বলেন:—"When the practice (early marriage) becomes a marked one, it tends to perpetuate itself by producing precocious maturity among the children in accordance with the organic laws which govern the heriditary transmission of physical and mental qualities."

এতদ্দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, আমাদের দেশে অন্যান্য দেশাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ঋতু উপস্থিত হওয়ার যদি একমাত্র কারণ না হয়, অন্ততঃ সর্ব্বপ্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। এখন দেখা যাউক, উষ্ণতা কি পরিমাণে ঋতু উপস্থিতির সহায়তা করে। এ বিষয়ে Dr. Chevers বলেন:—"The general opinion among physiologists is that, all collateral circumstances except those of climate being equal, all women would reach puberty at about the same age." ইহার মর্ম্ম এই যে, উষ্ণতার তারতম্যে ঋতুকালকে অগ্রপশ্চাৎ করিবার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। Dr. Charles বলেন, "Two points, however, constituting grave and formidable impediments have come prominently before me

while making enquiries to enable me to offer an opinion on the question (of early marriage). One lies in a widespread belief that the climate leads to early menstruation, which points to early marriage, and the other a similarly extended opinion that the climate causes an early development of several passion. There is just sufficient truth in both these statements to render it impossible to give them a full and unreserved denial, yet so little truth in them as to render the arguments based on them entirely valueless." (আমাদের দেশে অসময়ে ঋতু আবির্ভাবের কারণ ইনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা উপরে দেখান গিয়াছে।) ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বলেন,—"A superficial view of available facts would seem to incline the mind to the belief that climate does influence the menstrual function, delaying its first appearance in the cold and hastening the period in tropical countries. After carefully weighing all the circumstances which might have a possible influence on the function I am led to believe that if climate has any influence, it is trifling, not to say infinitesimal. Dr. Atmaram Pandurung বলেন,—"Climate has no influence in the matter." Dr. White ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বালিকাগণের ঋতুকাল তুলনা করিয়া বলেন,—"The cause of this difference of two years is not so much in my opinion the effect of climate, as difference in the constitution of the two races" এবং বাল্য বিবাহকে ইহার কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। ইহার পরও বোধ হয় আর প্রমাণের আবশ্যক হইবে না যে, বাল্য বিবাহই আমাদের দেশের বালিকাগণের অত্যন্ত বাল্যকালেই ঋতুমতী হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ; এবং এ দেশের আবহাওয়া প্রধান কারণ নহে। বাল্য বিবাহ উঠিয়া গেলে বালিকাদিগের ঋতুকালও বিলম্বে দেখা দিবে এবং যে শক্তি অতি শৈশবে জনন-কার্য্যে ব্যয়িত হইত, তাহা বালিকার অঙ্গপুষ্ট করিয়া তুল্যরূপে বর্ত্তমান ও ভাবীবংশের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবে। অবস্থা, শিক্ষা ও জীবন যাপন প্রণালী পরিবর্ত্তন দ্বারা যে ঋতুকালকে পশ্চাৎ করা যায় এবং তাহা দ্বারা যে শরীরের কোনও প্রকার অনিষ্ট না হইয়া বরং অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা Dr. Petersএর পুস্তক হইতে তাঁহার মত সঙ্কলন করিয়া দেখাইব। তিনি বলিতেছেন,—

"It is satisfactorily established that in every country and climate the period of first menstruation may be retarded in very many cases much beyond the average age often without producing illness or the slight inconvenience. Tilt even goes so far, as to assume, the great art of managing girls so as to bring them to the full perfection ef womanhood, is to retard the period of puberty as much as possible." শরীর মনের পরিচালনা বৃদ্ধি সহকারে মানবের জননশক্তি হ্রাস হইয়া আইসে ও তাহার অবান্তর ফল ব্যক্তিগত উন্নতি। Herbert Spencer বলেন:—"In proportion as activities increase, in proportion as, by its more and more complex, rapid and vigorous actions an animal gains power to support itself and to cope with surrounding dangers it must lose power to propagate." ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বালিকাগণের অকালে বিবাহ না দিয়া যাহাতে তাহাদের শরীর মন পরিচালনা দ্বারা ঋতুকাল পশ্চাৎ করিয়া তাহাদের দেহ মনের পুষ্টি সাধন হয়, তাহা করা পিতা মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

আপত্তিকারীর অভাব নাই—এক

শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে ইংরাজি নবিসেরা ইংরাজদিগের রীতি-নীতির পক্ষপাতী, তাই তাঁহারা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তে বাল্য বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করেন। ইংরাজদের বিজ্ঞান ইংরাজদের দেশেই খাটিতে পারে—আমাদের দেশে তাহা খাটে না—নইলে আমাদের ঋষিরা বাল্যবিবাহ সমর্থন করিলেন কেন? সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত শ্লোক এরূপ আপত্তিকারীরও মুখ বন্ধ করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই—এখনও আপত্তি আছে। সুশ্রুতের সময়ে দেশের যেরূপ আবহাওয়া ছিল এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—কলির লোক অল্পেই পাকিয়া উঠে, অল্প বয়সেই তাহাদের জননশক্তি প্রকাশ পায়, ইত্যাদি।

দেখা যাউক, সুশ্রুতের সময়ে ঋতুর প্রথম আবির্ভাবের কাল কিরূপ ছিল। সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায়;—

"রসাদেবস্ত্রিয়ারক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাশাদুর্দ্ধে যাতিপঞ্চশতঃক্ষয়ং॥"

সুশ্রুত দ্বাদশ বর্ষের পরই ঋতু কাল গণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের তালিকা তুলনায় দেখা যায় যে, সাধারণতঃ দ্বাদশ বর্ষের কিঞ্চিৎ পরেই ঋতু কাল। তবেইত সুশ্রুতের সময়ে ও বর্ত্তমান সময়ে ঋতু কালের বিশেষ কোন তারতম্যই দেখা যায় না। তবে আর কলির লোকের অপরাধ কি? আর যদি সুশ্রুতের নির্দ্দিষ্ট ঋতুকাল গড়ে (average)না হইয়া নিম্নতম বয়স হয়, তাহা হইলে বাল্য বিবাহের পদ্ধতি যে এই কালকে কমাইতে পারে তাহাও ত দেখান গিয়াছে। বাল্য বিবাহের কুফল যে বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত হইয়া ক্রমে জাতীয় শারীরিক অবনতিতে পরিণত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যদি এখনও কুরীতি নিরাকৃত না হয়,যদি বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বাল্যবিবাহ অনুরূপভাবে প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই যে কলির ভাণ্ডার ষোল আনা পূর্ণ হইবে, আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যে বালখিল্য জাতিতে পরিণত হইবে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা যে সকল বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইল যে, ঋতুর প্রথম উপস্থিত কালে গর্ভাধান সম্ভবপর হইলেও তাহা গর্ভাধানের, সুতরাং বিবাহের সুসময় নহে, অপিচ তৎকালে গর্ভাধান হইলে মাতা ও সন্তানের মহা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী ও তাহার বিষময় ফল জাতীয় অধঃপতন। ঋতুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিবাহ হইলে অস্বাভাবিক রূপে ঋতু কালকে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং এই বৃত্তির বিকাশের (functional development) অবশ্যম্ভাবী ফল সঙ্কুচিত বর্দ্ধন (arrested growth)। বাল্যবিবাহ শারীরিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির মহাশত্রু—জাতীয় দুর্ব্বলতা ও খর্ব্বাকৃতি ইহার অনিবার্য্য ফল। যেমন এক দিকে বাল্যবিবাহ দ্বারা ঋতুকালকে অগ্রসর করা যায়, তেমনই অন্যদিকে শিক্ষা ও অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহাকে পশ্চাৎ করা যায় এবং যে পরিমাণে ইহাকে পশ্চাৎ করা যায় সেই পরিমাণে দৈহিক পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে সুবিধা হয় (Tilt)শরীর মনের কার্য্য পটুতা বৃদ্ধি সহকারেও ঋতুকাল বিলম্বে উপস্থিত হয় (Spencer) অপরিপক্ক বীজোৎপন্ন সন্তান দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং শারীরিক বিকাশ

পূর্ণ না হইলে ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন সুদৃঢ় হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে তাহার ফল বিষময়। এবং ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, অন্তত ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে সকল অঙ্গের সুন্দর রূপ বিকাশই হয় না ও তৎপর প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের গঠন দৃঢ় হইতে থাকে সুতরাং অতিন্যূন পক্ষে ষোড়শ বর্ষের পর যত বিলম্বে বিবাহ হয়, ততই তাহার ফল সুস্থ, সবল, সুদৃঢ় ও দীর্ঘজীবী সন্তান ও তাহার অবান্তর ফল জাতীয় উন্নতি।

আমরা এপর্য্যন্ত বাল্য বিবাহের ফলাফল কেবল স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি, তাহার কারণ, সন্তানের সহিত মাতার যত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, পিতার সহিত তত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। পিতা শুদ্ধ জন্মদাতা, কিন্তু মাতা স্বীয় শরীরের শোণিত দ্বারা সন্তানের শরীর পোষণ করিয়া থাকেন; সুতরাং একটী সন্তানের জন্য পিতার যত টুকু জীবনী শক্তি ব্যয়িত হয়, মাতার তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক শক্তি ব্যয়িত হইয়া থাকে। দুইটী বীজ হইতে ভ্রূণ দেহ গঠিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একটী পিতা ও অপরটী মাতা হইতে প্রাপ্ত। এই বীজদ্বয়ের জীবনীশক্তি ও পরিপক্কতার উপর ভাবী শিশুর শৌর্য্য বীর্য্য ইত্যাদি সমস্তই নির্ভর করিতেছে। যেমন মাতা হইতে প্রাপ্ত বীজের পরিপক্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক, তেমনই পিতা হইতে প্রাপ্ত বীজও পরিপক্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। জৈবিক তত্ত্বের নিয়মাবলী স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজ্য। জনন-শক্তির প্রথম বিকাশ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা যেমন বালিকাদিগের সম্বন্ধে সত্য, বালকদের সম্বন্ধে তেমনই সত্য। অধুনা কাহাকেও আর বালকদের বাল্য বিবাহ সমর্থন করিতে দেখা যায় না, সুতরাং আমরাও এ বিষয় লইয়া অধিক সময় নষ্ট করিব না। তবে একটী কথা বলিয়া রাখা মন্দ নহে। সুশ্রুত পুরুষের পক্ষে পঞ্চবিংশতি বৎসর নিম্নতম বিবাহোচিত বয়স নিরূপণ করিয়াছেন। যাহা হউক, পুরুষের কোন্ অবস্থায় বিবাহ করা উচিত বা উচিত নহে, তাহা আমরা জীবতত্ত্বের দিক হইতে বিচার না করিয়া সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিব।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

বাঙ্গালার বর্ব্বর জাতি।*

(৩)

লেপ্‌চা, নেপালী ও ভুটিয়া এই তিন প্রধান দলে হিমালয়বাসী পার্ব্বতীয়দিগকে বিভক্ত করা যায়। লেপ্‌চারা গৌরবর্ণ, চাপা নাক, শান্ত, ভীত, সরল হৃদয় ও ও প্রফুল্ল। ইহারা চীনদিগের মত চুল গুলিতে একটী বেণী বাঁধে, ইহারা বৌদ্ধ। নেপালীরা সাহসী ও সমরপ্রিয় হিন্দু, ভুটীয়ারা কাপুরুষ, নিষ্ঠুর ও কলহপ্রিয় বৌদ্ধ। লেপ্‌চারা ক্ষীণমধ্য, ক্ষুদ্র পদ, অদীর্ঘ হস্ত, বিস্তৃত বক্ষ, খর্ব্ব কায়। ইহাদের দাড়ী গোঁফ অতি সামান্য হয়। আকৃতি

* বাঙ্গালার বর্ব্বরজাতিদিগের যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছি, ইহাতে কোন ভুল দৃষ্ট হইলে পাঠকগণ দয়া করিয়া তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

পার্ব্বতীয়, প্রকৃতি নহে। যুবতীদের মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, কিন্তু প্রাচীনারা কদাকার, দেখিলে ঘৃণা হয়। লেপচা বড় অলস ও অস্থির, বাঁধা কাজ ভালবাসে না। একখানি দা সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকে কিন্তু ব্যবহার হয় না, পারিবারিক কি রাজনৈতিক বিবাদ নাই বলিলেই হয়। বিষাক্ত তীর ধনুকও সঙ্গে থাকে। ভুটিয়াদের মত ইহাদের মধ্যে বহুস্বামীকতা নাই, বহু পত্নীকতাও সামান্য। শীতপ্রধান দেশীয় য়ুরোপীয়েরা দার্জিলিঙে কত গরম কাপড় পরিয়া থাকে, কিন্তু তুলার একটা সাদা কাপড় লেপচার পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে আর একটা মাত্র গরম কাপড় ব্যবহার করে। ক্বচিৎ টুপি পরিতে দেখা যায়। টুপির উপর ময়ূরের পালক পরে। গলায় মালা, হাতে কবচ ও কানে ইয়ারিং পরে। কবচের ভিতর মন্ত্রঠাকুর ও লামার নখকেশ বা অস্থি খণ্ড থাকে। মেয়েদের মাথায় দুটী বেণী, পুরুষের একটী, অনেক সময় বেণী গণিয়া স্ত্রী পুরুষ নির্ণয় করিতে হয়। মেয়েরা পেটী কোট ও আঙ্গারাখা পরে ও তাহার উপর একটী এণ্ডি বা পশমী জামা দেয়। মেয়েদের পোষাক দেখিতে বড় সুন্দর। গলায় রূপার হার বা স্ফটিকমালা ও মাথায় মুকুট থাকে। লেপচারা ভাত খায়। শূকর মাংসের বড় প্রিয়। হাতী প্রভৃতি কোন জন্তুর মাংসই ইহাদের অখাদ্য নহে। ইহারা পান খায় না। গল্প করিতে, গান গাইতে বা বাঁশী বাজাইতে বড় ভালবাসে।

টাকা দিয়া বা শ্বশুরবাড়ী খাটিয়া দিয়া স্ত্রী সংগ্রহ করিতে হয়। বিবাহ বাল্যকালেই হইয়া থাকে। খাটুনি শেষ হইলে সকলকে জানাইয়া প্রকাশ্য বিবাহ হয়। প্রকাশ্য বিবাহের পূর্ব্বে, শ্বশুরবাড়ী থাকিবার সময় দম্পতী স্বামী স্ত্রীর মত থাকে। ব্যভিচার ক্বচিৎ ঘটে। ব্যভিচারীকে প্রহার বা দাসত্ব সহ্য করিতে হয়। ঘরের ও চাসের কার্য্য মেয়েরা ও বালকেরা সম্পন্ন করে। প্রভু সদয় ও প্রফুল্ল হইলে লেপ্‌চা তাহার জন্য সকল কষ্ট সহ্য করে। অপ্রসন্ন প্রভুকে ছাড়িয়া যায় ও নির্দ্দয়কে ঘৃণা করে। গ্রামের মধ্যে কাহারও ওলাউঠা হইলে বা বসন্ত হইলে গ্রাম ছাড়িয়া সকলে পলায়ন করে। জ্বর ও বাত ভিন্ন অন্য পীড়া ক্বচিৎ হয়। গলগণ্ড ভুটীয়াদের যত, ইহাদের তত নহে। ইহারা কখন কবর দেয়, কখন মৃতদেহ ভস্মসাৎ করে। কখন বা উভয়ই করিয়া থাকে। কুক্কুটের উদর বিদীর্ণ করিয়া দৈব লক্ষণ নির্ণয় হয়।

ইহারা নাট পূজা করে। নাট দুই প্রকার। ভাল নাটের পূজা করিবার আবশ্যক নাই, সে ত কোন ক্ষতি করে না। ওঝারা পুরোহিত। ওঝাকে ইহারা বিজুয়া বলে। পীড়া হইলে ওঝা ডাকিয়া নাটের পূজা করিতে হয়, অন্য চিকিৎসা নাই। ইহারা লামাকেও সম্মান করে। ভক্তেরা অন্য বৌদ্ধের মত মনি চক্র ও মালা ব্যবহার করে।

মগর নেপালীরা হিন্দু, পুরোহিতকে আচার বলে, গরু ভিন্ন আর সকল জন্তুর মাংস খায়। গুড়ুঙেরা বৌদ্ধ। ইহাদের একটী শাখা বুজলয়াত্তী হিন্দু। তাহারা সকল জন্তুর মাংস খাইয়া থাকে। কিন্তু দুধ খায় না, গুড়ুঙেরা মেষ পালক। হিন্দু জারিয়াদের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকে। নেওয়াবেরা নেপালের প্রধান

জাতি। ইহারা কৃষিজীবী; বাড়ী গুলি ত্রিতল। ইহারা কর্ম্মঠ ও অপেক্ষাকৃত সভ্য, তথাপি সতীত্বের আদর করে না। ইহাদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ও হিন্দু মিশ্রিত। পুরোহিতের নাম আচার, কবিরাজকে যোশী বলে। ইহারা মদ ও গোমাংস খায়। যাহারা শিব পূজা করে, তাহারাও গো মাংস খায়, * যাহারা বৌদ্ধ, তাহারা গো মাংস খায় কিন্তু গো-হত্যা করে না। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে। কীচকেরা হিন্দু কিন্তু গোমাংস খায়। লিম্বুরা ও চাঙেরা সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা কৃষিজীবী হিন্দু, কিন্তু জাতি-ভেদ মানে না। ইহারা পাজামা ও আঙ্গরাখা পরে, সর্ব্বদাই একখানা কুক্রী সঙ্গে রাখে, মাথায় টুপী দেয় ও কোমরে রেশমী দড়ী বাঁধে। ইহারা নিষ্ঠুর ও সাহসী, এক দিন ইহারা নেপালের পূর্ব্বখণ্ডে রাজত্ব করিত। ইহারা অনেকে নেপাল ও ইংরাজ রাজ্যে সিপাহী হইয়াছে। ইহারা সাহসী, লেপচারা কাপুরুষ, নতুবা আকৃতি প্রকৃতিতে উভয় সম্প্রদায় তুল্য। লেপচাদের সহিত ইহাদের আদান প্রদান চলে। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে ও কবর দেয় এবং কবরের উপর স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে। কবরের উপর ডিম ও পাথর ছড়ায়। এই সকল কার্য্যে ইহারা লেপচা বিজুয়া নিযুক্ত করে। ফেডাংবু নামে ইহাদের পুরোহিত আছে। তাহারা বিবাহাদি অন্য কর্ম্মে আহূত হয়। বিবাহ কালে বরের হাতে একটা কুক্কুট ও কন্যার হাতে একটা কুক্কুটী থাকে। ফেডাংবু তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলে। একটা কলাপাতে রক্ত ধরিয়া বিবাহের শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়। কাহারও মৃত্যু হইলে বোমা পোড়াইয়া প্রেতপুরুষের মহাপ্রস্থান দেবতাদিগকে বিদিত করিতে হয়। ইহারা পুনর্জ্জন্ম মানে না। একজন দেবতার অধীনে নানা ক্ষুদ্র দেবতায় বিশ্বাস করে।

* অশেষ ফলদানেন যৎফলং পরিকীর্ত্তিতং
তৎফলং প্রপ্নুয়াম্নিত্যাং সর্ব্বং মাংসং নিবেদনৎ

নেপালের মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ জঙ্গলে চিপিং হো এবং কামান্দাদিগের বাস। ইহারা কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। বন ফল ও মৃগয়া-লব্ধ পদার্থে উদর পূরণ করে। তীর ধনু ইহাদের একমাত্র অস্ত্র। গাছের ডাল কাটিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করে, এবং যখন ইচ্ছা বাস্তু পরিবর্ত্তন করে। পা সরু, পেট মোটা, মাথা লম্বা, খর্ব্ব কায়, ছোট চোখ ও কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে ইহারা কদাকার।

তিব্বত, সিকিম ও ভুটানে ভোটদিগের বাস। তিব্বতের নাম ভোট, ভুটান অর্থ ভোটদিগের প্রান্তভাগ। লেপচা গৌরবর্ণ, ভুটীয়া ঈষৎ তাম্রবর্ণ। লেপচাদিগের অপেক্ষা ভুটীয়ারা অধিক পরিশ্রমী ও কৃষি-পটু। একটা লোমশ জামা জড়াইয়া ইহারা কোমরের উপর সূতা দিয়া বাঁধে এবং এক খানি দা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে। ইহারা জুতা ও টুপী পরে, মাথায় একটা বেণী ঝুলিতে থাকে। মেয়েরা পেটীকোট ও জামা পরে এবং তামা বা রূপার শিকল দিয়া কোমর বাঁধে। মাথায় দুটা বেণী থাকে, গলায় পলা বা কাচের মালা থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আংটী ও ইয়ারিং পরে, লেপচাদের মত ইহাদেরও হাত বা গলায় কবচ থাকে। তিব্বতের ভুটীয়ারা জিহ্বা বাহির করিয়া দাঁত দেখাইয়া, মাথা নোয়াইয়া ও কাণ চুলকাইয়া অভিবাদন করে। ভুটীয়া কুকুর বিখ্যাত, ইহারা রাত্রে পাহারা দেয়, দিনের

বোঝা বয়। ভুটান ভূটীয়া তিব্বতী-ভুটীয়ার মত বলবান ও দীর্ঘকায় নহে। বোধ হয়, মাদক সেবন ও অসচ্চরিত্রতা হেতু তাহারা হীনতর হইয়াছে। ইহারা পান খাইতে বড় ভালবাসে। ভুটীয়া বড় অপরিষ্কার, ক্বচিৎ স্নান করে। বস্ত্র জীর্ণ হইলে মাত্র পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু ইহারাও লেপচাদিগের মত প্রফুল্ল-প্রকৃতি। চোখ টেরা, নাক চাপা ও মুখ বড় না হইলে ভুটীয়া রমণী সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইত।

ভূটীয়ারা বৌদ্ধ। ইহাদের পুরোহিতকে লামা বলে। দেব রাজাকে কিছু উপহার দিয়া তাহার অনুমতি লইয়া যে সে লামা হইতে পারে। লামারা পুরোহিত ও চিকিৎসক। ঔষধের বড় ব্যবস্থা নাই, স্বস্ত্যয়ন করিয়াই ইহারা ব্যাধি আরোগ্য করে। লামারা সর্ব্বদা জপমালা ধরিয়া থাকে। জপের একমাত্র মন্ত্র"ওঁ মণিপদ্মে ওঁ"। হাতের অপেক্ষা কলে জপ অধিক হয়, এজন্য সকলেই জপের কল ব্যবহার, করিয়া থাকে। জপই নিস্তারের একমাত্র উপায়। জড় প্রকৃতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া তন্মনে বুদ্ধের ধ্যান একমাত্র সার কার্য্য। অশিক্ষিত লোকেরা নাটেরও পূজা করে। ছেঁড়া নেক্ড়া ও ফুল নাটের মনোমত উপহার।

ভুটীয়া নারী বড় নির্লজ্জ। সতীত্বের কোন আদর নাই। প্রায় সকলেই ব্যভিচার করে। বহু পতিত্বেরও বহুল প্রচার। ভুটীয়াদের ঘর গুলি বড় সুন্দর। পাথর বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত। তিন চারি তল, কাঠের মেজে, কাটের ছাদ, দুপাশে বারাণ্ডা। ইহারা ঘর গুলি বেশ পরিষ্কার রাখে। ঘরের ন্যায় বাঁধ ও সেতু প্রস্তুত করিতেও ইহারা সুদক্ষ। ইহারা কাপড় বুনিতে ও কাগজ ও মদ প্রস্তুত করিতে জানে। ভুটীয়ারা হিন্দুদিগের মত মৃতদেহ দাহ করে। এবং ভস্ম গুলি নদী জলে ভাসাইয়া দেয়।

তরাই জঙ্গলে মেচ বা বোদো এবং ধিমল জাতির বাস। এই দুই জাতির আচার ব্যবহার একরূপ, কিন্তু ভাষা ভিন্ন, এবং উভয়ে একত্র বাস করে না বা আদান প্রদান করে না। মেচেরা শান্ত প্রকৃতি, কৃষীজীবী, ইহারা বহুদিন এক স্থানে বাস করে না, এক জমি দুবছরের অধিক চাস করে না বা এক গ্রামে পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক থাকে না। এক স্থানের উর্ব্বরতা নষ্ট হইলে স্থানান্তরে উঠিয়া যায়। ইহারা হাঁস, মুরগী, পায়রা,শূকর, ছাগল ও গোরু পোষে কিন্তু মেষ ও মহিষ পুষে না। গো মাংস খায় না, আর সব খায়। ইহারা কাহারও দাসত্ব করিতে ভালবাসে না, ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। মেচদের ঘর বাঁশ ও ঘাস দিয়া নির্ম্মিত, ঘরের সাজ সজ্জা কিছুই নাই। একটী গ্রামে ত্রিশ চল্লিশ ঘর বাস করে। গৃহ সামগ্রীর মধ্যে দুএকখান বাসন, দা, কুড়ুল, কোদালি, সুতা কাটিবার চরকা ও কাপড়ের তাত। পুরুষেরা সুতার ও মেয়েরা রেশমী কাপড় পরে। ধিমলদের স্ত্রী পুরুষেরা সুতার কাপড় পরে। কাপড় ঘরেই তৈয়ার হয়। পুরুষেরা ধুতী চাদর, মেয়েরা সাড়ী পরে। সুতী কাপড় সাদা ও রেশমী কাপড় রঙ্গ করিয়া পরে। ইহারা জুতা পরেনা, খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে। মেয়েরা খাড়ু, নথ ও ইয়ারিং পরে। লুন, লঙ্কা, তরকারী, ভাত ও মাছ কি মাংস এবং মদ ইহাদের নিত্য আহার। ঠাকুরের প্রসাদ না হইলে মাংস খায় না। দুধ ও তেল বড় ব্যবহার করে না, ঘির ব্যবহার

আদৌ নাই। ইহারা আফিম বা গাঁজা ব্যবহার করে না, কিন্তু তামাক খায়।

প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন মোড়ল আছে। মোড়ল গ্রামের শান্তি রক্ষা করে ও অপরাধী ধরিয়া দেয় এবং খাজানা আদায় করিয়া রাজার প্রতিনিধি বা চৌধুরীকে দেয়। পঞ্চায়েৎ সকল প্রকার মোকদ্দমার বিচার করে। মোড়ল তাহাদের মধ্যে এক জন। স্ত্রীপুরুষ কাহারও ইচ্ছা হইলেই বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে। স্ত্রীর ব্যভিচার হেতু বিবাহ ভঙ্গ হইলে পণের টাকা শ্বশুরকে দিতে হয়। ব্যভিচার ক্বচিৎ ঘটে। ব্যভিচারীকে ধরিতে পারিলে তাহাকে ও স্ত্রীকে, স্বামী প্রহার করিবে মাত্র। স্বামী পরিত্যাগ করিলে ব্যভিচারীরা বিনা বিবাহে একত্র বাস করে, ও স্বামী স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু সতীত্বের আদর আছে। বিবাহে যৌতুক দিতে নাই। মেয়েরা সম্পত্তির অধিকারিণী নহে। জারজ দত্তক ও ঔরস জাত সন্তান সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লয়। ইহারা সূর্য্যচন্দ্র ও নাটের পূজা করে। সর্ব্বাপেক্ষা নদী দেবতার প্রাধান্য অধিক। তাহারা একটী দম্পতী, বুড়াউ বেড়াউ বা পিতামাতা নামে বিখ্যাত। পুরুষটীর নাম পাটিমা, মেয়েটীর নাম তিমাই। পুরুষটী ধবলা, মেয়েটী ত্রিস্রোতা নদী। বোদোরা সকলে মিলিয়া বৎসরে একদিন বাথু বা বাস্থ নামে মনসাবৃক্ষের পূজা করে। হজসন বলেন, এইটী তাহাদের প্রাচীন দেবতা, ইহাদের কোন প্রতিমা বা মন্দির নাই। ইহারা ডাইনকে বড় ভয় করে। বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্যকর্ম্মে পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। ফুল ফল, সিঁদুর, চিড়া, মধু মদ ওষুধ দিয়া এবং শূকর ছাগল হাঁস পায়রা ও মুরগী কাটিয়া ইহারা ঠাকুরকে পূজা করে। ঠাকুর প্রসন্ন হইলে সম্পদ ও সৌভাগ্য ঘটে, অপ্রসন্ন হইলে পীড়া মৃত্যু শস্যক্ষয় প্রভৃতি দুর্দ্দৈব ঘটে। পীড়া হইলে ওঝা ডাকিয়া ঠাকুরকে শরীর হইতে তাড়াইতে হয়। ব্যাধ ও জেলেরা শীকার করিবার সময় ঠাকুরের উদ্দেশে একটী মুরগী বলিদান দেয়। ইহাদের চারিটী উৎসব। মনসা পূজা গ্রামেই হয়। অপর তিনটী নদীতটে গ্রামের বাহিরে হয়। (১) সুরথার বা হরিজাতা পৌষমাসে তুলা পাকিলে (২) বাগলেনো এটী একা মেচদের উৎসব (৩) ফুনথেপনো বা গবি পূজা ধানের শিষ হইলে মাঘমাসে হয়। ইহাদের তিন প্রকার পুরোহিত। (১) ওঝা (২) দেশী বা গ্রাম্য পুরোহিত এবং (৩) ধামী বা পরগণার পুরোহিত। ধামীরা দেশীদের তত্ত্বাবধারণ করে। যে কোন লোক দেশী হইতে পারে। চাষ ছাড়িয়া পুরোহিত হইতে ও পৌরহিত্য ছাড়িয়া চাষ করিতে—দেখা যায়। শিষ্যেরা পুরোহিতের জমী চাস করিয়া দেয় এবং মাংসের অংশ দেয়। একজন পুরোহিতের উপর বিরক্ত হইলে অন্যকে নিযুক্ত করিতে পারে। ওঝাকে নগদ পয়সা দিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে ধাত্রী নাই। মা আপনি নাড়ী কাটে। জন্ম ও মৃত্যুতে আশৌচ হয়। অশৌচান্তে কামাইতে ও স্নান করিতে হয়। জন্মের চারি পাঁচ দিন পরে নামকরণ হয়। বাল্য বিবাহ নাই, পুরুষের কুড়ী পঁচিশ ও মেয়েদের পনর ষোল বৎসর বয়স হইলে বিবাহ হয়। বাপ মা পছন্দ করিয়া বিবাহ দেয়। এক একটী মেচ কন্যার পণ ১৫৲ হইতে ৪৫৲ টাকা ও

এক একটী ধীমন কন্যার ১০।১৫ টাকা মাত্র। টাকা দিতে না পারিলে শ্বশুর-ঘরে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে হয়। বর আপন আত্মীয়-দিগকে ও দুটী স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া পাত্রীর বাড়ী উপস্থিত হয়। সেখানে স্ত্রীলোক দুটী কন্যাকে সিন্দুর পরাইলে সকলে বরের বাড়ী ফিরিয়া আসে। বিবাহের দেবতা দাত ও বেদাত, পান ও সিঁদুর দিয়া দেশী তাহাদের পূজা করে। তাহার পর বর কন্যা পাঁচ পাঁচটী পান লইয়া পাশাপাশি বসিয়া পরস্পরকে খাওয়ায়। এই সময় তাহাদের উপরে একখান চাদর ফেলিয়া দিয়া দেশী মন্ত্র পূত জল ছড়াইলে বিবাহ সম্পন্ন হয়। মেচদিগের বিবাহ অন্য প্রকার। বিবাহের সময় বর কন্যার নামে সূর্য্যের নিকট একটা কুক্কুট ও একটা কুক্কুটী বলিদান দিতে হয়। তাহার পর শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বিবাহ হয়।

ইহারা মৃতদেহ কবর দেয় এবং কবরের উপর প্রেতের জন্য আহার্য্য ও পানীয় রাখিয়া নদীতে স্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। মৃতাশৌচ তিন দিন স্থায়ী। শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঠাকুরের নিকট শূকর ও মুরগী বলি দিতে হয়। এবং কবরে আহার্য্য ও পানীয় দিতে হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী।

হিন্দু সমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা।

(সমাজ সংস্থাপন)

হিন্দুজাতি ভারতের আদিম অধিবাসী নয়, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। হিন্দুরা মধ্য আসিয়ার অন্তর্গত স্থান বিশেষ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় হিন্দুদিগের আদিম বাসভূমি 'প্রত্নৌক' অর্থাৎ পুরাতন বাসস্থান নামে উক্ত হইয়াছে। সেই প্রাচীন নিবাসক্ষেত্র মধ্য আসিয়ার কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া প্রত্নবিদ্ পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মতের প্রকটন করিয়াছেন, কেহ বলেন ইহা বাহ্লীক রাজ্য, কেহ বলেন ইহা আমু নদীর সন্নিহিত সমুন্নত মালভূমি, কেহ বা ইহাকে ককেশশ্ গিরির সমীপবর্ত্তী ভূভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত জনষ্টোন্ সাহেবের মানচিত্রে 'ইন্দ্রালয়' নামে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী এক স্থানের উল্লেখ আছে। অমরকোষ, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেও ইন্দ্রালয় নামে হিন্দুকুশ গিরির উত্তরস্থিত স্থল বিশেষের বিষয় বর্ণিত আছে। এই ইন্দ্রালয়ই বোধ হয় আর্য্যদিগের আদিম বাসভূমি, ঋগ্বেদ সংহিতায় এই স্থানই বোধ হয় 'প্রত্নৌক' নামে অভিহিত হইবে। ইন্দ্র আর্য্যদিগের পরমারাধ্য পুরাতন দেবতা এবং সকল বিষয়ের রক্ষক ও পরিচালক স্বরূপ; সেই হেতু বোধ হয় আর্য্যনিবাস ইন্দ্রালয় নামে বিখ্যাত হইবে। যাহা হউক, হিন্দুদিগের পুরাতন বাসস্থান যে হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমস্থিত কোন হিমানীময় সমুন্নত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড হইবে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুরা ভারতে অবস্থান কালে আপনাদিগের পূর্ব্ব-নিবাস উত্তরদিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এক

স্থানে বলিয়াছেন "The Hindus when dwelling in the valley of the five waters, pointed to the north as their heaven." অর্থাৎ হিন্দুরা পঞ্চনদে অবস্থানকালীন উত্তর দিককে তাহাদের স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। বলা বাহুল্য যে, আর্য্যেরা আপনাদের আদিম বাসস্থানকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ইন্দ্রালয় কেবল হিন্দুজাতির আদিম বাসভূমি নয়, কিন্তু সুদূরদেশবাসী বিভিন্নভাষা ও ধর্ম্মাবলম্বী গ্রীক্ কেল্টিক রোমক প্রভৃতি জাতি সমূহেরও প্রাচীন আবাস-ক্ষেত্র। এই সকল ভিন্নাচার ও ভিন্নদেশবাসী জাতি সকল এক দিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষস্বরূপ আর্য্যদিগের সহিত একত্রে অবস্থান করিতেন। অধিক কি, এই বিশাল ভূমিখণ্ড সমগ্র মানবজাতির জনয়িত্রীস্বরূপ, এই স্থান হইতেই জনস্রোত নিঃসৃত হইয়া নানা দেশকে পূর্ণ করিয়াছে। কি সুমহৎ কারণে, এই প্রকাণ্ড মানবরাজ্য বিলোড়িত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, আজিও তাহা পুরাবিদ্ পণ্ডিতেরা সুস্পষ্টরূপে স্থির করিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদ সংহিতায় দৃষ্ট হয় যে, হিন্দুগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন (১)। যে কারণেই হউক, একদলবীর্য্যবন্ত উৎসাহসম্পন্ন আর্য্য ভারতের পশ্চিমসীমাবস্থ সিন্ধু নদের অববাহিকাস্বরূপ সুবিস্তীর্ণ পঞ্জাব প্রদেশে (পঞ্চনদে) আসিয়া পদার্পণ করেন। ইঁহারাই কালে ভুবনবিখ্যাত হিন্দুর সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। ঋগ্বেদসংহিতায় এই স্থান সপ্তসিন্ধু নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)। সাতটী বেগবতী তরঙ্গিণী প্রবাহিত থাকিয়া এই প্রদেশের শোভা ও রমণীয়তা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। এই বেদকীর্ত্তিত সপ্তসিন্ধু তটে উপনিবিষ্ট হইয়া আর্য্যগণ হিন্দু আখ্যায় অভিহিত হয়েন। সহজেই অনুমিত হয় যে, হিন্দু শব্দটী সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। বাস্তবিকও তাহাই, এই হিন্দু নাম সংস্কৃত মূলক নহে। (৩) বেদাদি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে হিন্দু শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু নাম পারসীকদিগের আবেস্তা বর্ণিত। আমরা যে স্থানে 'স' কারের ব্যবহার করি, পারসীকেরা সে স্থানে 'হ' কারের ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন

(১) শ্রীযুক্ত রমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা দেখ।

(২) য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্ যোবা আর্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু। বধদাসস্য তুবিনৃম্ন নীনমঃ॥ ঋ ৮ ২৪।২৭। অর্থাৎ যিনি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শক্তিমান্ দেব সপ্তসিন্ধু দেশে আর্য্যগণ হইতে দাসগণের অস্ত্র প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। এই সপ্তসিন্ধু শব্দ সাতটি সমুদ্রবোধক নয়, কিন্তু সাতটি নদী বোধক। সপ্তসিন্ধু অর্থে যাঁহারা ক্ষীর দধি প্রভৃতি সাত সমুদ্রের কল্পনা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এই সাতটি নদী যথা—সিন্ধু, সিন্ধুর পঞ্চশাখা এবং সরস্বতী। এই সাতটি নদী এই প্রদেশে বাহিত আছে, তবে সরস্বতী এখন বালুকাগর্ভে বিলীন। সিন্ধু শব্দ যে নদী বোধক, তাহা ঋগ্বেদের ইন্দ্র স্তোত্রের এক স্থলে উল্লিখিত আছে যথা অপাবৃজঃ সর্ত্তবে সপ্তসিন্ধূন্। অর্থাৎ তুমি ইচ্ছানুসারে সাত নদীকে বাহিত করিতেছ।

(৩) কিন্তু গ্রন্থ বিশেষ ইহার উল্লেখ দেখা যায়, যথা—হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে। মেরুতন্ত্র। শব্দকল্পদ্রুমের হিন্দু শব্দ দেখ। অর্থাৎ হে প্রিয়ে! হীন জাতিকে দূষিত করেন, এই হেতু হিন্দু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এরূপ অর্থ অমূলক, কেননা ব্যাকরণানুসরে এরূপ অর্থ কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।

আমরা বলি অসুর, পারসীকেরা বলে অহুর। তাহা হইলে সিন্ধু শব্দ স্থানে, হিন্দু শব্দ ব্যবহার হওয়া স্বাভাবিক, কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, বিজাতীয়দিগের গ্রন্থোল্লিখিত শব্দ আমাদের জাতীয় সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইল কিরূপে? এ কথা সহজেই মিটিয়া যাইতে পারে; কেন না আমরা দেখিতে পাই, অনেক যাবনিক শব্দ আমাদের ভাষা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং আমরা কথোপকথন ও লিখনের মধ্যে সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহার কারণ যবনদিগের সহিত আমাদের বহুকাল একত্রে অবস্থান। ইতিমধ্যে কোন কোন ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পারসীকেরা যে, বহুকাল ধরিয়া হিন্দুদিগের সহিত একত্রে বাস করিয়াছিল, তাহা এই উভয় জাতির আচার ব্যবহার ধর্ম্মপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে জানিতে পারা যায়। সুতরাং পারসীক শব্দ এদেশীয় ভাষা মধ্যে প্রশ্রয় পাওয়া কোনরূপে অসঙ্গত নহে। যাহাহউক, সপ্তসিন্ধুতটই আর্য্যদিগের প্রথম অধিবাস স্থান, কেহ কেহ ব্রহ্মাবর্ত্তকে এই স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত নয়; কারণ ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ ঐ স্থানে—সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাবর্ত্তকে দেবনির্ম্মিত প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং এই স্থানের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের ভূয়সী বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক এই স্থান পরম পবিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ। ভাবিতে গেলে এই স্থানই জ্ঞান ও ধর্ম্মের বাল্যলীলা ভূমি, সভ্যতার আদিম উৎসক্ষেত্র, বীর্য্য ও বিক্রমের প্রথম প্রবাহস্থল, হিন্দুর পক্ষে পরম পবিত্র তীর্থধাম। হিন্দু আজ হৃদয়বিহীন, তাই এ তীর্থের মাহাত্ম্য কি তাহা বোঝে না, জানে না। দেখ, কালের কি কঠোর শাসন, আজ আর সেই সপ্তসিন্ধুতটে পুণ্য ও পবিত্রতার রমণীয় শান্ত মূর্ত্তি বিরাজ করে না, প্রসন্নসলিলা সরস্বতীর পুণ্যপ্রবাহ আজ সৈকতগর্ভে বিলীনপ্রায়, উদাত্তাদি সুমধুর স্বরসংযোষিত সামধ্বনিই বা কোথায়? হে হিন্দু ঋষি! তুমিই বা আজ কোথায়? দূরপ্রবাহিনী সপ্তসিন্ধুর সমাধিময় পবিত্র তটে—যোগ ও ধর্ম্মের লীলা ভূমিতে—আজ কিনা স্বেচ্ছাচার ও অধর্ম্মাচারের পিশাচ সকল অট্ট হাস্যে নৃত্য করিতেছে? ভারতের পুণ্যপুঞ্জপ্রতিভাসিত ললাটে কিনা আজ পাপের ছবি অঙ্কিত, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জলন্ত মূর্ত্তি, পুণ্য ও পবিত্রতার মধুরিমা পূর্ণ মনোরম ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইল? জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষির ভবিষ্যৎ বাণীর কি শেষ এই পরিণাম হইল? (৪) যদি আজ হিন্দুর প্রাণে পূর্ব্বস্মৃতির কণামাত্র সঞ্চিত থাকে, তবে চল ভাই দলে দলে সেই পিতামহ আর্য্যগণের প্রথম অধ্যুষিত তপোপূত সিন্ধু সরস্বতীর সৈকত পুলিনে সমবেত হইয়া তাঁহাদিগের আত্মার পরিতর্পণ করি, এবং সেই মৃতসঞ্জীবনী সলিল সিঞ্চনে এই শ্মশান-ক্ষেত্রে জীবন সঞ্চার করি। যে সময়ে আর্য্যগণ সপ্তসিন্ধু তীরে আসিয়া সমবেত হন, আমরা ভারতের সেই সময়ের অবস্থা একবার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত

(৪) মনুসংহিতাতে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ প্রচলিত আচার ব্যবহার এক দিন সমস্ত পৃথিবী অনুকরণ করিবে।
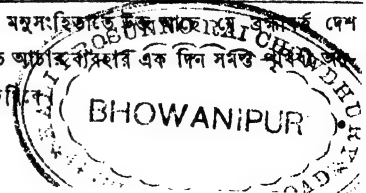
হই। ভারত-ক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থল তখন নিবিড় অরণ্য-মালা শৈল ও জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল এবং তাহার মধ্যে এক দল আম মাংস-ভোজী কৃষ্ণত্বক্ বর্ব্বর লোক বাস করিত। এই অরণ্যচর বর্ব্বর সম্প্রদায় বেদাদি গ্রন্থে দস্যু দৈত্য, অসুর প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য দস্যু শব্দে আর্য্যদিগের শত্রু, যজ্ঞের বিঘ্নকারক ইত্যাদি অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহারা আর্য্যদ্বেষী এবং যজ্ঞের হন্তারক ছিল। এতদ্ভিন্ন, ইহাদের আরও কতক গুলি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়—যথা; অযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞহীন, অব্রত অর্থাৎ ব্রতহীন, অনিন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রদ্বেষী। একদিকে এই কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য দস্যুগণ, অপরদিকে জ্ঞান ও সভ্যতাসম্পন্ন আর্য্য সম্প্রদায়। সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এরূপ স্থলে কি হওয়া সম্ভব। এরূপ অবস্থায় সামাজিকতা বিস্তার করা দূরে থাক, আত্ম সংরক্ষণই একরূপ দুরূহ ব্যাপার। ইহার উপর আর্য্যদিগের অন্তরে প্রভুত্ব স্থাপনের আশাও বলবতী ছিল। সুতরাং উভয় দলের সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষ তখন আর্য্য অনার্য্যের রণকোলাহলে কম্পিত হইয়া উঠিল। আর্য্যগণ সভ্য বিক্রমশীল, তাহাদিগের বিবিধ প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ছিল, আর অসুরেরা বর্ব্বার যুদ্ধানভিজ্ঞ, তাহারা কখন কখন রণে ভঙ্গ দিত, কখন বা ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, কখন বা দলে বলে মিলিত হইয়া আর্য্যদিগের প্রতি, উপদ্রব তাহাদিগের গবাদি ধন সম্পত্তি অপহরণ এবং যজ্ঞের ব্যাঘাত করিত। যাহাহউক, এ সংগ্রামে আর্য্যেরাই দস্যুদিগকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরেও দস্যুরা মধ্যে মধ্যে আর্য্যদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। 'বল' নামক একজন অসুর দেবতাদিগের (এ স্থলে আর্য্যদিগকেই দেবতা বলা হইয়াছে) কতকগুলি গো অপহরণ করিয়া দুর্গম গিরিগুহাতে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, তৎপরে ইন্দ্রদেব সসৈন্যে গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনেন। স্থানান্তরে লক্ষিত হয় যে,দুর্দ্দান্ত অসুরেরা অত্রি ঋষিকে পীড়াযন্ত্র গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়া তুষানল দ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, (৫) ইন্দ্র তাঁহাকে বিনির্গমনের পথ দেখাইয়া না দিলে তন্মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইত। দস্যুরা যে কেবল দেশমধ্যে অত্যাচার করিত তা নয়, নিকটস্থ সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপ মধ্যেও তাহারা বসতি করিত, এবং সমুদ্রযাত্রী বণিকদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। তুগ্র নামক রাজর্ষি বিশেষ দ্বীপ মধ্যস্থিত দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে (৬) স্বীয় পুত্র ভুজ্যুকে সেনাসহ নৌকা দ্বারা তাহাদের প্রতিবিধানার্থ প্রেরণ করেন। এই দ্বীপনিবাসী দস্যুদিগের প্রতিবিধান এবং দমনের নিমিত্ত রণতরী সকল সজ্জিত থাকিত। দস্যুরা যে নিতান্ত হীনপ্রভাব ছিল, তাহা বোধ হয় না, কারণ বেদসংহিতায় দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের নগর ও রাষ্ট্র ছিল এবং সে সমুদয় দুর্গ ও তোরণে পরিশোভিত থাকিত। শম্বরাসুরের নগর সকল প্রস্তরমাত্রায় দৃঢ়ীকৃত ও মণ্ডিত ছিল। বৃষপর্ব্বা দস্যুদলের অধিপতি ছিলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে ইহারা এক কালে অনুরাগবিহীন ছিল, তাহা বোধ হয় না, কেন না দেখিতে পাওয়া যায়, শুক্রাচার্য্য দস্যুদিগের গুরুপদবীতে প্রতি-

(৫) ঋ সং ১ম। ১১৬ সূ। ৮ ঋক দেখ।
(৬) ঋ সং ১ম। ১১৬ সূ। ৩ ঋক দেখ।

ষ্ঠিত ছিলেন। এই দুর্দ্দান্ত অত্যাচার পরায়ণ দস্যুদিগের দমনের জন্য আর্য্যেরা বার বার ইন্দ্রদেবের নিকটে কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার অধিকাংশস্থল এইরূপ কাতরোক্তি পূর্ণ স্তুতিকর সরল পদাবলীতে পরিপূর্ণ। ইন্দ্র দেবের প্রসাদে তাঁহারা বৃত্রাসুর শম্বরাসুর প্রভৃতি পরাক্রান্ত অসুরদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদেবের প্রসাদেই হউক বা নিজ পরাক্রমেই হউক, কিছুকাল মধ্যে আর্য্যেরা ভারতক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুত্ব ঘোষণা করিলেন। বিজয় পতাকা পঞ্চনদে উড্ডীয়মান হইয়া আর্য্যগণের গৌরব ও জয়শ্রী ঘোষণা করিতে লাগিল। দস্যুরা তখন পলায়ন করিয়া গহন গিরিগুহাতে আশ্রয় লইল। যত দিন না শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তত দিন তাহাদিগকে উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত। এই বারে আর্য্যেরা নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হইলেন। সুতরাং তখন সমাজ সংগঠনে প্রবৃত্ত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নি-সংযোগে অনেক অরণ্যানী ভস্মীভূত করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের অধিকার বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রহ্মর্ষি, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র মগধ প্রভৃতি এক একটী স্থান এক একটী রাজ্যে পরিণত হইয়া শোভা ও ঋষিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। এবং তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সপ্তসিন্ধু পরিধৌত প্রদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া অনুগঙ্গ প্রদেশের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। যে সকল স্থল ভয় ও বিপদের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, সে সকল স্থান এখন সুখ ও শান্তির নিকেতন রূপে পরিণত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে বিন্ধ্যাচলের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্ব পশ্চিমে সুদূর পরিব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্য্যদিগের নিবাস ভূমিরূপে পরিণত হইয়া, 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামে আখ্যাত হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিবিধ আয়াসে যেমন আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তৃত ও দৃঢ়ীকৃত করিতে লাগিলেন, সেইরূপ আপনাদিগের সমাজ বন্ধন কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়েই হিন্দু সমাজের সূত্রপাত। যাঁহারা মনে করেন যে, আর্য্যজাতি ইহার পূর্ব্বে সামাজিকতাশূন্য এক দল সামান্য পশুপালক মাত্র ছিলেন, এবং চারণ ভূমির উদ্দেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদিগের সে বিশ্বাস ভ্রান্ত। কেন না ঋগ্বেদ-সংহিতায় দৃষ্ট হইবে যে, আর্য্য জাতি এদেশাগমনের পূর্ব্বে সভ্যতা সম্পন্ন একটী উন্নত জাতি ছিল এবং তাহারা সপ্ত পরিবারে বিভক্ত ছিল। সামাজিকতাসূচক আরও বহুতর নিদর্শন তখন তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ভারতে আসিয়া তাঁহারা সেই বিচ্ছিন্ন প্রায় সমাজের শৃঙ্খলা ও পরিপুষ্টি সাধনে যত্নবান হইলেন। এই প্রাচীনতম বিচ্ছিন্নকল্প আর্য্যসমাজের সংগঠন এবং শৃঙ্খলা করণই হিন্দুসমাজরূপ বিশাল গৃহের ভিত্তিভূমি স্বরূপ। হিন্দুসমাজের প্রথম স্তর এই স্থান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, কি কি উপাদানে এই প্রাচীন সমাজ গঠিত হইয়াছে। আর্য্যেরা আপনাদিগকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া সমাজ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম সম্প্রদায় পুরোহিত—যজ্ঞানুষ্ঠান আর্য্যদিগের একটী চিরন্তন প্রথা, অগ্নিষ্টোম, দশ পৌর্ণমাস, গোমেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞ অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যসমাজে প্রচলিত। যজ্ঞানুষ্ঠান ইহাদিগের একটী বিশেষ পুণ্যজনক পবিত্র ক্রিয়া। এই

চিরাগত পবিত্র প্রথার যাজনার ভার এক সম্প্রদায় গ্রহণ করিলেন। এই সম্প্রদায়ই পুরোহিত। বৈদিক কবি অর্থাৎ সূক্ত-রচয়িতা ঋষিগণ এই পুরোহিতের আসন প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতি ও সূক্তরচয়িতা ঋষিদিগের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, অধিক কি, সে সময়ে ব্রাহ্মণ নামে কোন বিশেষ জাতি ছিলনা, এই পুরোহিত শ্রেণীই কালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এ বিষয় প্রতিপন্ন করিতে হইলে, এ স্থলে বহুল বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা করা গেল না। এই পুরোহিত শ্রেণী নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। যজ্ঞ সম্বন্ধীয় ব্যাপার ভিন্ন পুরোহিতেরা অন্যান্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত থাকিতেন। দ্বিতীয় দল রাজন্য বা ক্ষত্রিয়; ইংরাজিতে ইহাদিগের ঠিক প্রতি শব্দ Lord লর্ড, ইহারা রাজ্য রক্ষা ও প্রজা পালনের ভার গ্রহণ করিলেন, দস্যু দমনের নিমিত্ত ও ইহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত থাকিতে হইত। প্রাগুক্ত পুরোহিত শ্রেণী রাজাদিগের মন্ত্রী ও উপদেশক স্বরূপ ছিলেন। অধিক কি,ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার পুরোহিত-দিগের উপরেই সমর্পিত হইল। তদ্ভিন্ন যুদ্ধকালে রাজাদিগের সঙ্গে থাকিতেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ট মহারাজ সুদাসের পুরোহিত ছিলেন, ইহারা কয়েক বার সুদাসের সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। প্রায় সকল বিষয়েই পুরোহিতেরা ক্ষত্রিয় ভূপতিদিগের কর্ণধারস্বরূপ হইলেন, তৃতীয় দল সাধারণ প্রজা বা বৈশ্য, ইংরাজিতে ইহার ঠিক প্রতিশব্দ People পিপল; ইহারা পশুপালন, ক্ষেত্রকর্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি লোক-হিতকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে বিভক্ত শ্রেণীত্রয়ের স্ব স্ব অবলম্বিত কার্য্য সমূহে আর্য্য সমাজ গঠিত ও নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। রাজা সুশাসন প্রণালী অবলম্বন দ্বারা প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। প্রজারা রাজাকে দেবতা বিশেষে ভক্তি করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যক্তি রাজ শক্তিতে সংযত থাকায় উহা আরও সম্মানাস্পদ হইতে লাগিল। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরা যে সকল বিধি প্রণয়ণ করিয়া দিতে লাগিলেন, রাজা সে সকলের সম্মান ও অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিয়া রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, হিন্দু সমাজ ক্ষত্রিয় ভূপতিদিগের অবাধিত প্রভুত্ব এবং ব্রাহ্মণ্য ভক্তি পরিচালকতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। শূদ্র সম্প্রদায় বিজিত, শরণাগত দস্যু জিত-জাতি বিজেতার নিকট যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহারও আর্য্যদিগের নিকট সেইরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইল। আর্য্যেরা (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা) ইহাদিগকে আপনাদিগের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন। যাহা হউক, এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের উপরে হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মণ এই বিস্তীর্ণ সমাজরাজ্যের নেতা, ক্ষত্রিয় ইহার রক্ষক এবং বৈশ্য শূদ্র ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন আমরা এই সমাজের এক একটী বিষয় লইয়া তাহার প্রাচীনতার সহিত আধুনিকতার তুলনা করিতে চেষ্টা করিব। এ তুলনায় শিক্ষা অনেক হইতে পারে।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
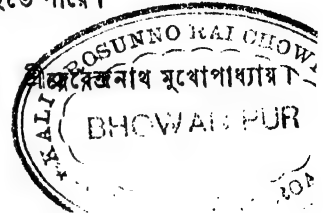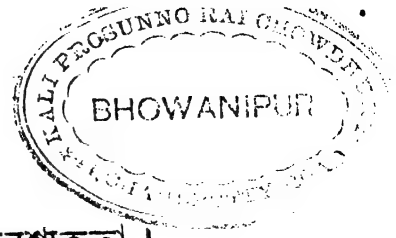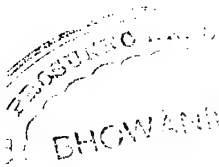
প্রকৃত ইতিহাসের আবশ্যকতা।

কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, ভারতবর্ষের জন-সাধারণের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সকল বিষয়েই মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, জগতে এরূপ মতভেদের দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর কোন জাতীয় লোকের মধ্যেই দেখা যায় না। ইংরাজ, ফরাসী, মুসলমান, ইহুদি প্রভৃতি অন্যান্য সমুদয় জাতীয় লোকের মধ্যেই অনেকানেক বিষয়ে মতের ঐক্য রহিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে, কি রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে, কোন বিষয়েই জন সাধারণের মতের ঐক্য দেখা যায় না।

ঈদৃশ মতভেদের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবই ইহার একটী মূল কারণ। যে জাতীয় লোকের প্রকৃত ইতিহাস নাই, তাহাদের মধ্যে সকল বিষয়েই যে মতভেদ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতীত কালের সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক কোন ঘটনা কিম্বা ব্যাপার দ্বারা দেশীয় লোকের কতদূর উপকার, কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অবধারণ করিতে হইলে,সেই ঘটনা কি ব্যাপারের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের এইরূপ ঘটনা সমূহের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে তৎসম্বন্ধে এক এক জন এক এক প্রকার মত পোষণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা বঙ্গের অনিষ্ট ভিন্ন কোন উপকার হয় নাই। কারণ বর্ত্তমান সময়ে যে আমরা বৈরাগী নামধারী, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বী অসংখ্য অসংখ্য অলস এবং কুচরিত্র লোক দেখিতেছি, এ সমুদয় চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। আবার কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম দ্বারা বঙ্গবাসিদিগের জাতীয় জীবন অনেক পরিমাণে সমুন্নত হইয়াছিল; সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে বৈরাগীদিগের কুৎসিত আচরণ ও অকর্ম্মণ্য জীবন সত্ত্বেও চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম দ্বারা যে দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চৈতন্যের কার্য্য কলাপের প্রকৃত ইতিহাস অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন।

কেবল চৈতন্যের সম্বন্ধেই যে এইরূপ মতভেদ রহিয়াছে, তাহা নহে। প্রত্যেক সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা মুসলমান শাসনের অবশ্যম্ভাবী ফল, না ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অত্যাচারের ফল, তৎসম্বন্ধে ঘোর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এদেশে একখানি ইতিহাস থাকিলে ততদূর মতভেদ সম্ভবপর হইত না।

যে সকল অবস্থা নিবন্ধন ভারতবর্ষ ক্রমে অবনতি হইতে আরো অবনতাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিতে হইলে দেশের প্রকৃত ইতিহাস

জানিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে যাঁহারা বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই দেশের এই অভাব দুর করিবার চেষ্টা করিতেছেন না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রজাভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার চরম ফল কি হইল? আন্দোলনে আন্দোলনে ঠিক যেন ব্যবস্থাপক সমাজের মেম্বরদিগের মাথা ঘুরিয়া গেল। বিরুদ্ধ মত-প্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রমাণ দেখিয়া তাঁহারা কিছুই নিশ্চয় অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে এমনই এক আইন জারি হইল, যাহা দ্বারা কি প্রজা কি ভূম্যধিকারী কাহারও কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। এই আইন দ্বারা শুদ্ধ কেবল মোকদ্দমা এবং বিবাদ বৃদ্ধির অসংখ্য অসংখ্য কারণ সৃজিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে এই সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রম কখন হইত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুদ্ধ কেবল প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণার্থ প্রবর্ত্তিত করা হয়। পাঁচসনা বন্দোবস্তের সময়ের ইজারাদারগণ অত্যন্ত প্রজাপীড়ন করিত, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রজা হইতে খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেও সরকারী কর্ম্মচারীগণ প্রজার প্রতি ঘোর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত ইজারাদারি প্রথা এবালিস হইল। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রজা হইতে খাজনা আদায়ের ভার গ্রহণ করিলেন না। বঙ্গীয় পুরাতন জমিদারগণ বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় প্রজার মঙ্গল সাধন করাই তৎসাময়িক গবর্ণমেণ্টের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিগত ১৮৮৩ সনে যখন প্রজাভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি সমালোচিত হইতেছিল; তখন প্রজা সাধারণের মঙ্গলার্থ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় রায়তকে যে সকল অধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, তদ্দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ হইবে বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার আরম্ভ হইল। অথচ রোড্‌সেস্ সংস্থাপন দ্বারা যে সত্য সত্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা হইল, তৎসম্বন্ধে কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন না। বোধ হয় অতি অল্পলোকেই জানেন যে, ১৭৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরে প্রজা বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়াই বঙ্গদেশে ইহার দশ বৎসর পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। সেই প্রজা বিদ্রোহই কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একমাত্র মূল কারণ। দেবী সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন গবর্ণমেণ্ট ইজারাদারি প্রথা এবং খাস তহসিলের প্রথা উঠাইয়া দিলেন। পুরাতন জমিদারদিগের সহিত ভূমি সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সেই প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে কখন কি বর্ত্তমান প্রজা ও ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইন প্রস্তুত সম্বন্ধে ঈদৃশ ভ্রম হইত?

আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে দিন দিন নানা অমঙ্গল হইতেছে। ইংরাজ ইতিহাস-বেত্তাগণের লিখিত ইতিহাস প্রায়ই পক্ষপাতীত্বে পরিপূর্ণ। তাহাদের ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার গোপন করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগকে বলিতেছি যে, দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংগৃহীত হইলে তদ্দ্বারা লোকের মতামত যদ্রূপ পরিশুদ্ধ হইবে, শত শত বক্তৃতা দ্বারা বোধ হয় সেইরূপ হইবার সম্ভব নাই।

বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস লিখিত হইলে তদ্দ্বারা দেশের অশেষ মঙ্গল হইতে পারে। যে সকল কারণ নিবন্ধন আর্য্যজাতির ক্রমশ অধঃপতন হইয়াছে, তাহা সকলেই জানিতে পারিবেন। এই বিষয়ে তখন আর এইরূপ মতভেদ থাকিবে না। বিগত কালের অভিজ্ঞতা আমাদিগের ভা[illegible]নে পরিশাসন করিবে।

শ্রীচরণ সেন।
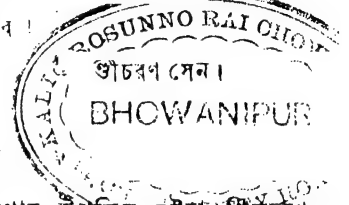
পরাশর সংহিতা।

"কৃতেতু মানব ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥"

একদা ব্যাসদেবকে কতকগুলি ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! বর্ত্তমান কলিযুগের কোন ধর্ম্ম, মানব হিতকর শৌচ ও আচার কিরূপ, কৃপাপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে বলুন। তদুত্তরে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি সর্ব্বজ্ঞ নহি, কি রূপে তাহা বলিব, এ বিষয়টী আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য; অতএব চলুন আমরা তাহার নিকট গমন করি। তৎপর মুনিগণ ব্যাসদেবকে লইয়া বদরিকাশ্রমবাসী মহর্ষি পরাশরের নিকট গমন করিলেন।

বদরিকাশ্রম অত্যন্ত মনোহর, ফলপুষ্প সুশোভিত তরুরাজি সমাকীর্ণ, নদী প্রস্রবণ ও পবিত্র তীর্থ সমূহে অলঙ্কৃত। মৃগ ও পক্ষীগণ সুখে বিচরণ করিতেছে, দেব মন্দির শ্রেণী স্থানে স্থানে বিরাজিত, নৃত্যগীতানুরক্ত যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ ইহার চতুর্দ্দিকে বাস করিতেছে।

মহর্ষি পরাশর ঋষি সভায় সুখে সমুপবিষ্ট, এমন সময়ে ব্যাস মুনিমণ্ডলী সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। পরস্পর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করার পর সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে, ব্যাসদেব বলিলেন, পিতঃ! আমি আপনার নিকট মনু বশিষ্ঠ কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উসনা, অত্রি, বিষ্ণু, স্বর্বর্ত্ত, দক্ষ অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত,যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, আপস্তম্ভ, শঙ্খ, লিখিত, প্রভৃতি ঋষিগণ নিরূপিত ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু সে সকল সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিযুগে সেই সকল ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান যুগের চতুর্বর্গের সাধারণ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ বলুন।

পরাশর বলিলেন, হে পুত্র! হে ঋষিগণ! প্রতি কল্পে প্রলয়াবসানে যখন নূতন সৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শ্রুতি স্মৃতি সদাচার,এই সমুদয় নির্ণীত হইয়া থাকে। কল্পান্তরে অপর কল্পারম্ভে কেহ বেদকর্ত্তা বলিয়া নির্ণীত হন না। কিন্তু ব্রহ্মা বেদের স্মরণ কর্ত্তা, সেইরূপ মনু কল্পারম্ভে ধর্ম্মের স্মরণকারী হইয়া থাকেন অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ হইতে বেদ ও মনু হইতে ধর্ম্ম শাস্ত্র

প্রচলিত হয়। সত্যযুগে এক প্রকার ধর্ম্ম, ত্রেতাতে অন্য প্রকার ও দ্বাপরে আর এক প্রকার এবং কলিযুগে অন্তবিধ ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়া থাকে। সত্যে তপস্যা প্রধান ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে একমাত্র দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র সত্যযুগের জন্য গৌতম সংহিতা ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, দ্বাপর যুগের জন্য শঙ্খ লিখিত ও নিরূপিত ধর্ম্ম শাস্ত্র, বর্ত্তমান কলিযুগের জন্য পরাশর নির্ণীত ধর্ম্মই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

সামাজিক পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য, কেহ কোন দিন ইহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, পারিবেকও না। সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পরাশরের বাক্য দ্বারা ইহা সুন্দররূপে উপলব্ধি হইতেছে।

পরাশর বলেন "কলিযুগে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, প্রভুগণ ভৃত্যগণ দ্বারা, পুরুষগণ স্ত্রীদিগের দ্বারা জিত হইবেক।" আমরা ভগবান পরাশরের পদানুসরণ-করিয়া বলিতেছি এ সকল সভ্যতার ফল। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সহিত জগতে মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতিরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। প্রাচীন মানবগণ সরল প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতেন। এক্ষণ মানবগণ কেবল কূট বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বার্থ সাধন অভিপ্রায়ে সংসারে বিচরণ করিতেছেন। এক্ষণকার মূল মন্ত্র হইয়াছে, "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ, কার্য্য ধ্বংশেচ মূর্খতা।" সত্য ও ধর্ম্মকে অতলস্পর্শে ডুবাইয়া দেও ক্ষতি নাই। কিন্তু আত্ম কার্য্যে বিমুখ হইও না। আমাদের গুরু ইংরাজ ছলে বলে পরের সর্ব্বনাশ দ্বারা সকার্য্যোদ্ধার করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তাহাই আমরা শিক্ষা করিতেছি।

পরাশর অতিথিকে সর্ব্বদেবতা স্বরূপ বলিয়াছেন, এবং অতিথি সেবার মাহাত্ম্যও যথোচিত রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্র সদৃশ নগর সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ণকুটীর সমাকীর্ণ পল্লিগ্রামে গমন করিলে অতিথি সেবার সম্মান অদ্যাপি বিদ্যমান থাকার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পরাশর তিনটী শ্লোক দ্বারা রাজধর্ম্ম অতি সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন——

ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণপালয়েৎ॥
ন শ্রী কুলক্রমায়াতা স্বরূপা লিখিতাপি বা।
খড়েগনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা॥
পুষ্পং পুষ্পং বিচিনুয়ান্মূলচ্ছেদ ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবোদ্যানেন তথাঙ্গরকারকঃ॥

ক্ষত্রিয় শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাবর্গকে রক্ষা করিয়া প্রচণ্ডভাবে বিপক্ষ সৈন্য জয় করত ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিবেক। লক্ষ্মী কদাচ কুল ক্রমানুসারিণী হয়েন না, খড়্গ দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে উপভোগ করিতে হয়, কারণ বসুন্ধরা বীরপুরুষেরই ভোগ্যা। মালাকার যেরূপ উদ্যানের পুষ্প চয়ন করে, রাজা সেইরূপ প্রজার উপর উৎপীড়ন না করিয়া করগ্রহণ করিবে। অঙ্গারকারের ন্যায় সমূলোচ্ছেদ করিবেন না।

ইংরাজ প্রথমোক্ত দুই শ্লোকের মাহাত্ম্য সুন্দর রূপে বুঝিয়াছেন, কিন্তু তৃতীয়

শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিলে আমাদের বোধ হয় এত দুর্দ্দশা হইত না।

পরাশর বীরধর্ম্ম অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক আমরা ভেতু বাঙ্গালী, ইহার মর্ম্ম কি বুঝিব। যাহাকে দর্শন করিয়া ভুবন বিজয়ী আলেকজেণ্ডরের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, সেই পুরুরাজ ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলন। যিনি জন্ম ভূমির জন্য কারাগার পুলিনে শয়ন ও তমসাচ্ছন্ন দৈত্যমনভীতিপ্রদ অন্ধ কূপে মাংসচর্ম্ম বিলীন করিতে কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন করেন নাই তিনিই ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন। কিঞ্চিদূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ভয়ে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত নিবাসী গুর্জরাধিপতি, রাষ্টকোটার (দক্ষিণমহারাষ্ট্র) রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরাশর কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে স্বর্গ্যমণ্ডল
ভেদকৌ।
পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন
ভাষতে॥
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণ বিধ্বংসিকেহমুস্মিন্কা চিন্তা মরণে
রণে॥
যস্ত ভগ্নেষু সৈন্যেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
পরিত্রাতা যদা গচ্ছেৎ সচ ক্রতুফলং লভেৎ॥
যস্য চ্ছেদক্ষতং গাত্রং শর শক্ত্যৃষ্টি মুদ্গরৈঃ।
দেবকন্যাস্ত তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চঃ॥
বরাঙ্গনা সহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিত॥
ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য।
তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে॥
তৎ সোমপানে হি তস্য তুল্যং।
সংগ্রামযজ্ঞেবিধিবচ্চ দৃষ্টম্॥
যং যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিদ্যয়া
স্বর্গৈষিণো বাত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ
প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ॥

এই পৃথিবী মধ্যে যোগরত পরিব্রাজক এবং সম্মুখ যুদ্ধে হতবীর, উভয়েই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধ (স্বর্গে) গমন করিয়া থাকেন। বীর পুরুষ যদি শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং সেই সময়ে কাতরোক্তি না করেন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয় লোকে গমন করেন। জয়লাভ করিতে পারিলে লক্ষ্মীলাভ হয়, এবং সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে স্বর্গে সুরাঙ্গনা লাভ হইয়া থাকে। অতএব ক্ষণবিধ্বংসী দেহ দ্বারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে চিন্তা কি? যৎকালে সৈন্যগণ ছত্রভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে থাকিবে, সেই সময় যিনি তাহাদিগকে রণক্ষেত্রে রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করেন *। রণক্ষেত্রে যাহার শরীর শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গর প্রভৃতি দ্বারা ছিন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হয়, দেব কন্যাগণ তাঁহাতে রত হয় ও তাহার যশোগান করিতে থাকে। যিনি রণে নিহত হন, তাঁহার অনুসরণার্থ সহস্র সহস্র দেব ও নাগ কন্যা ধাবমান হইয়া থাকে এবং সকলেই প্রার্থনা করে, ইনি আমার স্বামী হউন। যিনি শত্রুশরে পরিতপ্ত ও যাহার ললাটদেশ হইতে শোণিত

* বীরকেশরী [illegible] লাভ করিয়াছিলেন।
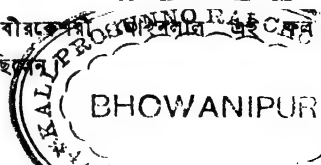
ধারা বিনির্গত হইয়া মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, সংগ্রাম ক্ষেত্রেও তাহার যথাবিধানে সমাহিত সোমপানের ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বর্গ লাভাভিলাষী ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ সমূহ, তপস্যা ও বিদ্যা দ্বারা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্ম যুদ্ধে যে বীর প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনিও সেই লোকে গমন করিয়া থাকেন।

মরুভূমি নিবাসী দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি মানবগণকে, মহম্মদ স্বর্গের যে প্রলোভন দর্শাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রকারও সেই অমৃতোপম লোভ দর্শাইয়া হতভাগ্য আর্য্যসন্তানদিগকে বীর ধর্ম্মে চিরকাল সংযত রাখার উপায় বিধান করিয়া গিয়াছিলেন। পিতৃ পুরুষের বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া আমরা অধঃপাতে যাইতেছি, আর মুসলমানগণ মহম্মদের বাক্য দেবাদেশ বলিয়া মানিতেছেন,এজন্যই তাহারা অদ্যাপি জীবন্ত রহিয়াছেন। একবার মিসরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

পরাশর রমণীগণের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার দেখা যাউক।

পরাশর বলেন, যে রমণী দরিদ্র, পীড়িত ও মূর্খ স্বামীকে অবজ্ঞা করে, সে মৃত্যুর পর সর্প যোনিতে উৎপন্ন হয় এবং বহু জন্ম বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

পরাশর বিধবা বা তৎসদৃশ রমণীদিগের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর :—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গংভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহমোদতে॥

স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, কিম্বা কালগ্রাসে পতিত হইলে, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে, ক্লীব স্থির কিম্বা পতিত হইলে এই প্রকার পঞ্চবিধ আপদে রমণীর অন্য পতি গ্রহণ বিধি বিহিত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। যে নারী স্বামীর সহিত অনুমৃতা হন, তিনি শরীরের সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম পরিমৎ বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করেন। ব্যালগ্রাহী, (অর্থাৎ বেদে) যেরূপ বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করে, তদ্রূপ সহমরণ প্রবৃত্তা রমণী ভর্ত্তাকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গ সুখ অনুভব করেন।

সহ মরণ প্রথা বৈদিক সময় আমাদের দেশে প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে সময় এই প্রথা রহিত করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বদ্ধ পরিকর হইলেন, সেই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পণ্ডিতপ্রবর উইলসন সাহেবকে কয়েকটী বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্র ও তাহার উত্তর রয়ালএঃ সুসাইটীর জর্ণালে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে উহা সহজেই অনুমিত হইবে যে, এই প্রথার পোষণকারী যে কয়েকটী বৈদিক মন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তৎ সমস্তই ভ্রমসঙ্কুল। যাহা হউক, মহাভারতের সময় এই প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু

মুসলমানদিগের শাসনকালেই ইহার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, এবং ইহার গুরুতর কারণও ছিল। যাহারা পতির ক্রোড় হইতে পত্নীকে কাড়িয়া লইয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিত, ভুবনমোহিনী হিন্দু বিধবাগণ যে সেই নরাকার পশুদিগের বিশেষ লোভের বস্তু ছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই জন্যই বোধ হয় মুসলমান শাসন কালে এই প্রথার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাস-লেখক নাই। কেবল বৈদেশীক ভ্রমণকারীদিগের নিকট আমরা ইহার অনেক বর্ণনা শ্রবণ করিতেছি। এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দের সহিত স্বামীর প্রজ্জলিত চিতায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। ফরাশী দেশীয় বিখ্যাত ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার সাহেবের গ্রন্থ হইতে আমরা একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"When travelling from Ahameda-bad to Agra, through the territories of Rajas, and while the caravan halted in a town under the shade, until the cool of the evening, news reached us that a widow was then on the point of burning herself with the body of her husband. I ran at once to the spot, and going to the edge of a large and nearly dry reservoir, observed at the bottom a deep pit filled with wood; the body of a dead man extended there on, a woman seated upon the same pile, four or five Brahmins setting fire to it in every part; five middle aged women, tolerably well dressed, holding one another by the hand, singing and dancing round the pile, and a great number of spectators of both sexes. The pile, where a large quantities of butter oil had been thrown was soon envoloped in flames and I saw the fire catch the woman's garments, which were impregnated with scented oil, mixed with sandarach aud sffron powder; but I could not percieve the slightest indication of pain or even uneasiness in the victim, and it was said that she pronounced with emphasis the words *five two*; to signify that this being the fifth time that she had burned herself with the same husband there were wanted only two more similar sacrifices to render her perfect, according to the doctrine of transmigration of souls; as if a certain reminiscence or prophetic spirit had been imparted to her at that moment of her dissolution."

আবার কতকগুলি এরূপ ঘটনাও ঘটিত যে, পতি বিয়োগে পত্নী উন্মত্ত হইয়া অনুমৃতা হইতেন। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে কিছু প্রবোধ দ্বারা শান্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে রমণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেন। বর্ণিয়ার লিখিয়াছেন, তিনি যৎকালে দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় সচীবপ্রবর দানেসমন্দ খাঁর মুন্সীর সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। হঠাৎ এই মুন্সীর মৃত্যু হইলে তাহার পত্নী অনুমৃতা হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণিয়ার সাহেব স্বয়ং সেই বিধবার নিকট গমন করিয়া ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া বিশেষ পরিশ্রমের সহিত বিধবাকে নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আবার এরূপও কতকগুলি ঘটনা পাঠ করা গিয়াছে, যদ্দারা অনুমিত হয় যে, অধিকাংশ স্থলে বালবিধবাদিগকে বল পূর্ব্বক পোড়াইয়া মারা হইত। ভ্রমণকারীগণ এরূপ অনেক গুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন,
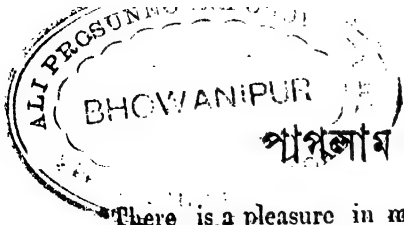
পাগলামি বা প্রেমোন্মাদ

"There is a pleasure in madness which madmen only know."

বিষম উন্মাদ আমি হইয়াছি ভাই রে,
এমন পাগল বুঝি আর কেহ নাই রে ;
শুনেও প্রাণের কথা কেউ প্রাণে নেয় না,
পাগল জেনেও লোকে গায় ধূল দেয় না।
কুটিল সংসারে যেই মন প্রাণ খুলেছে,
লোকে তার অমনি পাগল নাম তুলেছে !
বলুক পাগল লোকে তবু প্রাণ খুলিব,
ভুলিতে কি পারি কথা কি করিয়া ভুলিব ?
হয়েছি পাগল আমি ছন্দোবন্দ জানি না,
অভিধান ব্যাকরণ আদবেই মানি না।
সে মুখের চুম্বনটী ওষ্ঠাধারে লেগে আছে,
নয়নের সে চাহনি দুনয়নে বিঁধে গেছে ;
সেই সুখ আলিঙ্গন বক্ষ মাঝে পশে আছে,
প্রেমমাখা যেই স্মৃতি প্রাণে প্রাণে মিশে গেছে।

এক কথা বারে বারে বলে যে সংসারে,
প্রকৃত পাগল লোকে বলে থাকে তাহারে,
যত কয় সেই কথা ততই তা মিষ্টি লাগে,
কহিতে কহিতে কত সুখ স্বপ্ন প্রাণে জাগে !
কেমনে পাগল আমি হইয়াছি ভাই রে,
একবার মন খুলে বলি শোন তাই রে।

২

যেই দিন গেছিলাম যমুনার পুলিনে,
সেই প্রেম প্রতিমারে দেখিলেম নয়নে ;
অনন্ত আশার স্রোত প্রাণময় বহিল,
হৃদয়ের কাণে কাণে কি জানি কি কহিল ;
পোড়া প্রাণ সে অবধি আর কিছু চায় না,
নয়নের দিঠি আর কোন দিকে যায় না ;
জীবন আকাশে যেন সুখ-তারা উঠিল,
ঊষার আলোকে যেন অন্ধকার টুটিল ;
না জানি কি মধুরিমা ঐ মুখ হইতে,
ছড়িয়া পড়িল আহা সমুদয় জগতে,
মরুস্থল সম আগে ছিল যেই অবনী,
অনেক সুন্দর যেন হয়ে গেল তখনি ;
সংসারে আসিয়া আমি কখনোতো হাসি নি,
স্থাবর জঙ্গমে কভু কারে ভালবাসি নি ;
সেই দিন হতে মোর মুখে হাসি আইল,
কি জানি অজ্ঞাত প্রেম ধরাতল ছাইল।
ক্রমে ক্রমে সে যখন নয়নের কোণেতে,
প্রাণের অনল শিখা ঢেলে দিল প্রাণেতে,
ফাফর হইয়া কত আই ঢাই করিলাম,
পাগল হইব ইহা তখনিতো বুঝিলাম !

৩

ক্রমে ক্রমে সে যখন আপনার হইল,
জীবনের কল কাটি হাতে করে লইল,
দুই দিন দশ দিন কাছে আসি বসিল,
প্রাণের কপাট খুলি ভাল করে পশিল ;
দুই মাসে ছয় মাসে কত কথা কহিল,
তারি লেগে কত কিছু অনুযোগ সহিল ;
কণ্ঠেতে প্রাণের কথা মুখে তার ফোটে নি,
আবেগে নয়ন দুটী ছোটে ছোটে ছোটে নি
সেই মুখ সেই চোকে যতবার চেয়েছি,
অকূল সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছি !
একবার এলে পরে উঠে যেতে চায় নি,
সমুখে খাবার রেখে কতদিন খায় নি ;
যা কিছু বাসিত ভাল সে সকল চায়নি,
আমোদ প্রমোদে আর একদিনো যায়নি ;
অনিচ্ছায় উঠে যেতে অশ্রুবিন্দু ঝরেছে,
অর্দ্ধেক পাগল মোরে সেইদিন করেছে !

৪

তার পর একদিন কি কহিব ভাইরে,

জীবনে এমন দিন কভু হয় নাই রে ;
সারা নিশা কত কিন্তু সুখ স্বপ্ন দেখিলেম,
জেগেও সকল কথা মনে তুলে রাখিলেম ;
ভাবেতে বিবশ হয়ে রহিলাম শয়নে,
ভাবনার নেশা বড় লেগেছিল নয়নে ;
দুঃখের সুখের নিশি তখনো পোহায় নি,
অবনীর অন্ধকার ভাল করে যায় নি ;
হেন কালে সেই ঘরে না জানি কে আইল,
উষার আলোকে যেন কক্ষতল ছাইল ;
সহসা নয়ন মেলি তার পানে চাইলাম,
পরাণ পুতলি মম দেখিবারে পাইলাম ;
প্রেমের উচ্ছ্বাসে তার মুখখানি ভেসেছে,
একটী ফুলের তোড়া হাতে করে এসেছে ;
অরুণে করিয়া কোলে উষা যেন হাসিছে,
অন্তর আকাশে মম সেইরূপ ভাসিছে ;
নীরবে শিয়রে আসি ধীরে ধীরে বসিল ;
অলক্ষিতে কুন্তলের বাঁধনটী খসিল ;
ঘন ঘন শ্বাস বহে দেখিবারে পাইলাম।
ভুলিয়া সকল কথা আপনা হারাইলাম।

৫

তারপর কি হইল পারিব না কহিতে,
প্রাণে যে আবেগ হয় পারিনা কো সহিতে ;
ধীরে ধীরে হাত খানি দুইহাতে ধরিল,
বুকের উপরে রাখি ধর্ম্ম সাক্ষী করিল।
সে তপ্ত পরশে দেহ সিহরিয়া উঠিল,
বিদ্যুৎ অনল শিখা সব গায় ছুটিল।
হাতের উপরে সেই ফুলগুলি রাখিয়া,
ভগ্নকণ্ঠে বলেছিল মুখপানে চাহিয়া ;
"—এই ফুলগুলি সহ হৃদয় আমার রে ;
আজি হতে চির তরে সঁপিলাম তোমারে ;
এখনো এ ফুলগুলি পতঙ্গেরা পায়নি,
শিশির রয়েছে গায় রোদেতে শুকায়নি ;
সেইরূপ এ হৃদয় ফুটিয়াছে যখনি,
অর্পিব তোমার হাতে ভেবেছিনু তখনি ;
একদিন দুই দিনে বনফুল শুকাবে,
অনন্ত অনন্ত কাল এই প্রেম থাকিবে।
কথা শুনে হৃদয়েতে ধরিলাম তাহারে,
ভাঙিল বালুর বাঁধ নয়নের আসারে,
প্রাণের সকল কথা প্রাণে করে লইলাম,
সেইদিন সেই ক্ষণে উন্মত্ত হইলাম!

৬

ধন জন মান যদি সহসা হারায় রে,
শুনেছি মানুষ পাগল হয়ে যায় রে ;
ছিলেম দরিদ্র তায় মহা নিধি পেয়েছি,
না জানি কি অপরূপ পাগল যে হয়েছি।
নিরেট কঠোর যাহা ছিল আগে জগতে,
লইয়া কঠিন প্রাণো পারি নাই দেখিতে ;
আমার সঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে ;
পাগল হইয়া যেন কোন দেশে যেতেছে,
তটিনীর কল কল অনিলের শন্ শনি।
বিহঙ্গ কাকলি আর কাননের ঝন্ ঝনি,
নক্ষত্রের ঝিকিমিকি আকাশের নীলিমা,
শৈশবের সরলতা যৌবনের গরিমা,
সকলেই পাগলের মহাগীত গেতেছে,
আমার সঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে,
গিয়েছে সকল ভয় নাহি কিছু ভাবনা,
দিন মাস পক্ষ বার নাহি করি গণনা ;
না জানি সেরূপ হায় কিবা যাদু করিল,
সমস্ত সংসার তাতে উন্মত্ত হইল ;
এর আগে কোন দিন পাগল ত হইনি,
এলমেল এত কথা কখনো ত কইনি!

৭

এক দিন সন্ধ্যাকালে গেছিলেম বাগানে,
আচম্বিতে সেইখানে দেখা হলো দুজনে ;
কেন জানি বলেছিল—"বুঝেছিরে বুঝেছি,
পাগলের প্রাণদিয়ে মজেছিরে মজেছি ;
তুই যে আমার হবি বুঝিতে তা পারিনে,
আমি তোর চিরকাল আর কিছু জানিনে।"

শুনে নিদারুণ কথা অচেতন হইলেম,
তাহারি চরণ তলে ধরাতলে পড়িলেম ;
আদরে লইয়া কোলে মুখ পানে চাহিল,
বুকে চেপে এ মাথাটী গদ গদ কহিল ;
—"পরাণ পুতলি তুমি আমারি পাগলরে!"
কপালে পড়িল তপ্ত দুই বিন্দু জলরে।
কামিনী কুসুম তরু সেই রঙ্গ দেখেছে,
মধুর চাঁদের আলো সেই ছবি লেখেছে ;
এখনো সে তরুশিরে সেই চাঁদ উঠেছে,
এখনো সে কামিনীর সেই ফুল ফুটেছে ;
সেই চাঁদ সেই ফুলে সুধাইবে যখনি,
ঈষৎ হাসিয়া তারা বলে দিবে তখনি,
—"মধুর সুন্দর মোরা কত কি দেখেছি ভাই,
পাগলের খেলা কিন্তু এমন আর দেখি নাই!"

৮

এক দিন পাগলীর অসুখের লাগিয়া,
অনাহারে বসেছিনু সারা নিশি জাগিয়া ;
পাগলী অজ্ঞান ছিল তা দেখে ঘুমাইনি,
মরার মতন ছিনু জল ফোটা খাইনি।
নিশি ভোরে পাগলিনী পেয়েছিল চেতনা,
চোক মেলে ঘুচাইল মরমের যাতনা ;
অরুণ কিরণে যেন হিমশিলা গলিল,
দুনয়নে আনন্দের বারিধারা চলিল।
বলেছিল পাগলিনী—"বুঝেছি ঘুমাও নি,
অভাগীর মাথা খেয়ে কিছু বুঝি খাওনি ;"
রহিনু নীরবে শুনে সোহাগের তাড়না,
মনে মনে বলেছিনু—"প্রাণেশ্বরি, আর না!
বলেছিল পাগলিনী—"নাই বুঝি মনেতে,
ঐ প্রাণ মিশে গেছে অভাগীর প্রাণেতে ;
দুইটী শিশির বিন্দু এক হয়ে গিয়েছে,
এ দেহ তোমার, ওটী আমার যে হয়েছে ;
মরার উপরে তুমি অভাগীরে মেরেছ।
আমার শরীরে তুমি অযতন করেছ।"
"অপরাধ করিয়াছি" বলে হাত ধরিলাম,
প্রেমানন্দে পাগলীর পায়ে শুয়ে পড়িলাম,

৯

আর এক দিন আমি স্বপনে যা দেখেছি,
কালিকার কথা সম সব মনে রেখেছি ;
না জানি কেমন করে কোন্ দেশে যাইলাম,
কি জানি কেমন করে পাগলী হারাইলাম।
"পাগলী আমার তুই কোথা গেলিরে চলিয়া"
ঘরে ঘরে কাঁদিলাম এই কথা বলিয়া।
অবশেষে কোন এক রাজপুরে যাইলাম,
রাজ সিংহাসনে গিয়া পাগলীরে পাইলাম।
"তোর তরে পাগলিনী কাঁদিয়াছি কত রে,
পাষাণি, তোমার মনে ছিল নাকি এত রে!
আয় মোর পাগলিনি!" এই কথা বলিতে,
পাগলিনী পদাঘাত করেছিল বুকেতে,
নিকটে ঘাতক ছিল, সেও এসে ধরিল,
শিরশ্ছেদ করিবারে অস্ত্রহাতে করিল।
ঘাতকেরে কহিলাম—"দেখ দেখ ভাই রে,
পাগলিনী বিনে মম অন্য গতি নাই রে ;
আমারে কাটিবে যদি রাখ এই মিনতি,
আমার সকল গায় মেখে দাও বিভূতি ;
"পাগলিনী" এই নাম কণ্ঠোপরে লিখিয়া,
বলিদান কর মোরে এইখানে রাখিয়া ;
নামটী কেটোনা যেন এটী ভাই দেখো রে,
পাগলীর পদতলে এ মাথাটী রেখো রে!

১০

তার পর পাগলীর মুখ পানে চাহিলাম,
হেসে হেসে মরমের দুটী কথা কহিলাম ;
—"হৃদয়ে রাখিতে পদ কত দিন চেয়েছি,
ভাগ্যফলে আজি তাহা অযাচিতে পেয়েছি ;
জনম সফল মম হলো এত দিনেতে,
লেগেছে বা পদতলে এই ভাবি মনেতে ;
ধরেছে ঘাতক মোরে শিরচ্ছেদ করিতে,
তোমার লাগিয়া পারি কোটি বার মরিতে,
এক এক রক্তবিন্দু রক্তবীর্য্য হইয়া,
বেড়াইবে পাগলীর প্রেমগুণ গাইয়া ;

জীবন সমাধা হবে শুনে খুষী প্রাণ রে,
স্থূল দেহে রহিয়াছে যত ব্যবধান রে,
সে টুকুও থাকিবেনা, গায় মিশে রহিব,
নিঃশব্দ ভাষাতে প্রাণে প্রেম কথা কহিব;
আজ্ঞা কর সুকুমারি, ঘাতকেরে ত্বরিতে,
প্রেম যজ্ঞে প্রমোদেরে বলিদান করিতে।"
কথা শুনে পাগলিনী তীর সম ছুটিল,
গলায় ধরিল এসে ঘুমঘোর টুটিল;
জেগে দেখি পাগলীর কোলে শুয়ে রয়েছি,
নয়নের জলে তার মাথাটী ভিজায়েছি!

১১

ললিত বিভাস কিবা ঝিঁঝিট পুরবিতে,
গায় যবে পাগলিনী প্রভাতে কি সন্ধ্যাতে;
অভাগীর ভাঙা প্রাণ নেচে উঠে তখনি,
(কখনো জানিনে কিবা রাগ কিবা রাগিণী)
তুলিয়া অনন্ত স্বর সে স্বরে মিশাইয়া,
কত যে অজ্ঞাত গীত ফেলি আমি গাইয়া।
পৃথিবীর বক্ষে যথা কঠিন আবরণে,
অনলের স্রোত আছে অতিশয় গোপনে;
তেমতি এ পোড়া প্রাণে জানি নাই কখনো,
ছিল এত ভাব রাশি বাড়বের মতনো;
পাগলিনী প্রাণ ধরে দিয়েছে যে ঝাঁকনি,
ভেঙেছে বুকের বাঁধ বেরিয়েছে অগিনি;
নাহি জানি পাগলীর প্রেমের কি বলরে,
ছিলেম নীরব কবি হয়েছি পাগল রে!
উথলিয়া উঠে প্রাণ না পারি নিবারিতে,
অস্ফুটস্ত কথা ছুটে নয়নের বারিতে।
বিহঙ্গ হইলে পরে অন্তরীক্ষে ধাইতাম,
দিবা নিশি পাগলীর প্রেমগুণ গাইতাম;
সামান্য মানুষী ভাষা আশা তাতে মেটেনা,
পাগলীর প্রেম কথা ভালকরে ফোটে না!

১২

পাগলীর ছবিখানি সঙ্গে করে রেখিছি,
দণ্ডে তারে দশবার শতবার দেখেছি,
কত দেখি তবু তার নূতনত্ব যায় না,
পাগলীর রূপ মোর নয়নে ফুরায় না;
ছবিতেই পাগলীরে অভিমানী হেরেছি,
আদর করিয়া কত বুকে চেঁপে ধরেছি।
পাগলীর চিঠিখানি সঙ্গে করে রেখেছি,
পড়িতে পড়িতে তারে অশ্রুজলে মেখেছি;
এই দেখ পাগলিনী লিখিয়াছে তাহাতে;
হৃদয়ের কত কথা অমানুষী ভাষাতে;
করেছে স্বাক্ষর নীচে সেই পাগলিনী,
"—চিরদিন তোমারই এই পাগলিনী।"
পাগলীরে যত ফুল দিয়েছিনু ছিঁড়িয়া,
তার কতগুলি মোরে দিয়েছে সে ফিরিয়া;
কি জানি কি মেখে তাতে পাগলিনী দিয়েছে,
শুকায়েছে ফুল তবু গন্ধ আজো রয়েছে,
পারিজাত ফুলে বিধি পাগলিনী গড়েছে,
হয়েছে সুগন্ধ যাহা পাগলিনী ধরেছে;
ভূতলে অমূল্য নিধি পাগলিনী ধনসে,
পেয়েছি নবজীবন পাগলীর পরশে!

১৩

সাধে কি সে পাগলীরে কণ্ঠহার করেছি,
সাধে কি তাহার তরে উন্মত্ত হয়েছি;
জ্ঞানের মলিন দীপ নিবু নিবু জ্বলিত,
"নিশ্চয় জানি না কিছু'' এই মাত্র বলিত;
কার্য্য কারণের ফাঁদে ঘুরে ঘুরে মরিতাম,
জীবনের আদি অন্তে অন্ধকার হেরিতাম।
পাগলী পরশমণি যাই প্রাণ ছুঁইল,
নাজানি কি আলোকেতে চিত্ত আলো করিল;
অনন্ত মঙ্গল আর ইচ্ছা শক্তি মিশিয়া,
সমস্ত সংসার আছে কোলে করে বসিয়া;
প্রেমালোকে এই ছবি পাগলিনী দেখালো,
প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান পাগলিনী শিখালো;
সুন্দর সাধের কিছু দেখি নাই জগতে,
যার তরে চেতে পারি এক দিন বাঁচিতে;
পাগলিনী হইয়াছে জীবনের সার রে,

পাগলিনী করিয়াছে সুন্দর সংসার রে ;
আপনা হইতে যেই পাগলীর লাগিয়া,
নিয়ত প্রার্থনা উঠে হৃদয় বিদারিয়া ;
নয়নের মণি মোর পাগলিনী ধন সে,
জীবন্মুক্তি পাইয়াছি আমি তার পরশে !

১৪

হয়েছি পাগল আমি পাগলীরে লইয়া,
গাইব প্রেমের গীত দেশে দেশে যাইয়া ;
এই প্রেম প্রতিমারে কাঁধে যবে লইব,
নেচে গেয়ে হেসে খেলে দিশা হারা হইব ;
দুই কণ্ঠ মিলাইয়া এক গীত গাইব,
পাষাণ গলিবে তাতে জগৎ মাতাইব ;
সতী দেহ কাঁধে শ... নাকি নাচিল,
দেখে সে প্রেমের খেলা ত্রিভুবন বাঁচিল।

পাশব জগত আজো প্রেম কি তা জানে নি,
"প্রকৃতি পুরুষ" কথা শুনেছে তা মানে নি ;
জীবন্ত প্রেমের ছবি জীবলোকে দেখাবো,
প্রেম কি পরম ধন ভাগ করে শিখাবো ;
আপনারে না ভুলিলে প্রেম কভু হয় না,
বাঁধ ভেঙে না দিলে যে জল স্রোত বয় না ;
শিখাব প্রেমের ধ্যান প্রেমের ধারণা রে,
প্রেমের তপস্যা আর প্রেমের সাধনা রে ;
স্বাধীনতা উদারতা পবিত্রতা শিখাবো,
প্রেম যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিয়ে তবে দেখাবো ;
ভূতলে স্বর্গের শোভা করিব বিস্তার রে,
সার্থক মানব জন্ম হইবে আমার রে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিবিধ।

প্রকৃতি এক ভাব, এক অবস্থা লইয়া চিরকাল থাকিতে পারে না, থাকিতে চায় না। দারুণ শীতের তীক্ষ্ণ কষাঘাত সহ্য করিয়া বৃক্ষ সকল মৃতপ্রায় হইয়াছিল, বসন্তের সুবাতাস বহিয়া বহিয়া সময়ে তাহাদিগকে আবার সজীব করিল। নবপল্লব, নব ফুল শুষ্কপ্রায় বৃক্ষে আবার ফুটিল। একবার শুষ্কতা, অবসন্নতা, জড়তা,—আবার সরসভাব, জীবন্ত ভাব—চিন্ময় ভাব। ধর্ম্ম জীবনেও শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মের অভ্যুদয় আছে। শীতের কষাঘাত সহ্য করিতে না পারিলে বসন্তের সুস্নিগ্ধ সজীব ভাব কাহারও জীবনে ঘটে না। আবার গ্রীষ্মের পর্য্যায়ে পড়িয়া অসহ্য উত্তাপে যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার ভাগ্যেও বর্ষার মধুর ভাব উপলব্ধি হয় না। সহ্য করিতেই হইবে,—অধ্যবসায়কে সম্বল না করিলে আর চলিবে না। দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়া তবে বুঝিয়াছি—অধ্যবসায়কে সম্বল না করিতে পারিলে, সংসার সাধন বা ধর্ম্ম সাধন, কোন সাধনেই জয় লাভ করা যায় না। কাহার জীবন এমন, যাহাকে কখনই শীতের দারুণ কষাঘাতে মুহ্যমান হইতে হয় নাই? পাপ, প্রলোভনপূর্ণ এই ভবসংসারে প্রবল প্রবৃত্তি ও রিপু কুলকে সঙ্গে লইয়া কে কবে বিনা কষ্টে, বিনা দুঃখে শান্তি এবং পুণ্য, পবিত্রতা এবং ধর্ম্ম-রত্ন লাভ করিতে পারিয়াছে? প্রবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় শত্রুর হস্ত হইতেই বা কে কবে বিনা ক্লেশে স্বাধীনতা মহারত্ন কাড়িয়া পাইয়াছে? আশাকে প্রাণে বাঁধিয়া, অধ্যবসায়কে সম্বল করিয়া যে পড়িয়া থাকিতে পারে, যে প্রাণকে উৎসর্গ করিতে পারে, জয় লাভ তাহারই ভাগ্যে। কোন অবস্থায়ই অধীর হওয়া উচিত নহে। সুখে

সংসার চলিতেছিল—সকলের মুখে হাসি খেলিতেছিল—হঠাৎ একদিন সংসারকে ফাঁকি দিয়া, পরিবারকে কাঁদাইয়া, হৃদয়কে ভাঙ্গিয়া এক জন আত্মীয় পলায়ন করিল! কোথায় গেল, কোথায় গেল, বলিয়া পরিবারে হুই চই পড়িয়া গেল, ক্রন্দনের রোল উঠিল—বিচ্ছেদের দারুণ আঘাতে হৃদয় প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল—শরীর অবসন্ন হইল—নিরাশা আসিয়া সব অন্ধকার করিল। শোকের তীব্র আঘাত প্রাণে বড়ই বাজিল! বাহিরে ছিলাম, ঘরে আসিলাম; সংসারে ছিলাম, প্রাণে যাইলাম। আসক্তির আড়ম্বরে মজিতেছিলাম—বৈরাগ্যের নির্জ্জন কুটীরে ফিরিলাম। আলোকে ঘুরিতে ছিলাম—নিরশা-আঁধারে ডুবিলাম। প্রাণ-ঘরে পৌঁছিয়া, নির্জ্জনে বসিয়া, আঁধারে লুকাইয়া তবে দেখিলাম—প্রাণময়ী মা সেখানে নূতন আশার বাণী শুনাইবার জন্য বসিয়া! শান্তিরূপিণী মা সেখানে সকল আঁধার গ্রাস করিয়া বসিয়া! শোকে যে না ডুবিয়াছে, তাহার পক্ষে সে আশার বাণী কল্পনা বলিয়া বোধ হইবে। এক এক অবস্থার ভিতরে মায়ের এক এক রূপ এমনই করিয়া বিকশিত হইতেছে! এক এক পদার্থে বা এক এক ঘটনার পর্য্যায়ে এমন করিয়াই অনন্তের অনন্তরূপ ফুটিতেছে! মায়ের সে স্নিগ্ধ, সে মধুর, সে প্রাণস্পর্শী আশার কথা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম! হায় হায়, মৃত্যুর তীব্র আঘাতে বন্ধুবিচ্ছেদ না ঘটিলে কি পরকালের দিকে সংসারাসক্ত মন ফিরিত? মা ঐ মৃত্যুর ভ্রুকুটী দেখাইয়া যেন বলিলেন, "সন্তান, কেবল বাহ্য সংসার-সুখে মজিলে চলিবে না, কেবল সংসারই লক্ষ্য নহে, এই দেখ, আরো কিছু আছে।" আমি দেখিলাম, আঁধারের ধারে আলো জ্বলিতেছে—নিরাশার তীরে আশা-পবন ছুলিতেছে। আমি দেখিলাম, সেই আশা-আলো দেখিতে দেখিতে আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমি অবিশ্বাসী ছিলাম, প্রকৃত বিশ্বাসী হইলাম? আমি নিরাশায় মজিয়াছিলাম, আশা-বিশ্বাস পাইলাম! মা আমার কত রূপে, কত ভাবে ফুটিতেছেন, আমি ক্ষুদ্র, কেমনে বলিব!!

বন্ধু বিচ্ছেদ—ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ আমাদের সংসারের প্রাত্যহিক ব্যাপার! পরলোকের সহিত সন্ধি স্থাপন না করিলে আর চলে না, তাই দেখিলাম, পরলোকের বিশ্বাস প্রাণকে শীতল করিল, সন্ধি স্থাপিত হইল। পুস্তক পাঠে নহে, লোকের কথায় নহে, প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস-ধনকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসকে পাইতে হইলে সকল প্রকার অবস্থাকেই মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। প্রত্যহ নূতন লোক আসিতেছে, প্রত্যহই চলিয়া যাইতেছে! কোথা হইতে বা আসে, কোথায় বা যায়, আমরা জানি না, আমরা না জানিয়া কাঁদি। কাঁদি তবে বুঝি—মায়ের কোল ভিন্ন আর গতি নাই। মা ই লক্ষ্য, মা ই আমাদের সর্ব্বস্ব।

সমাজের বক্ষে যাহারা দশ বিশ বৎসর অবিচলিত ভাবে বসিয়া আছেন,—তাঁহারা বৈচিত্র্যময়ী মায়ের যে কত রূপই দেখিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা হয় না! দিনের পর দিন যাইতেছে, অমনি নূতন পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! কত বন্ধুকে পাইলাম, কত বন্ধুকে হারাইলাম? কেহ

পরলোকের আঁধারে লুকাইল—কেহ সংসারের আসক্তি, পাপ,কুসংস্কারের সহিত সম্বন্ধ পাতিয়া চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইল, আমি আর খুঁজিয়া পাই না। না পাইয়া কত কাঁদিয়াছি। যে বন্ধুকে পাইয়া প্রাণে এক দিন কত আরাম পাইয়াছিলাম, কত শান্তি পাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম, হায়,সে বন্ধু সময়ে ফাঁকি দিলেন—কোথায় যেন লুকাইলেন। আমি বিচ্ছেদে পড়িয়া কত কাঁদিলাম। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে শিখিয়াছি—ভ্রাতা ভগ্নীর চিরসহবাস মানুষের লক্ষ্য নহে, চির-লক্ষ্য স্বয়ং মা। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বন্ধু এবং ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের দারুণ কষ্ট পাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তবে শেষে মাকে দেখিতে পাইলাম। মা বলিলেন,—'আর কিছুই লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য কেবল আমি। আমাকে ভুলিয়া তোর কোথায় আরাম, কোথায় শান্তি! তোকে কাঁদাইয়াছি, তবে আমি তোকে কোলে পাইয়াছি।" মায়ের সে সুধামাখা নীরব কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া এই শিখিলাম, দুঃখ না পাইলে সুখ ঘটে না, আঁধারে না মজিলে আলোকের মুখ দেখা যায় না। তাঁর ইচ্ছারই জয় হইল।

আবার সমাজে দুঃখের দিন উপস্থিত হইয়াছে। বসন্তের সুস্নিগ্ধ মধুর ভাব চলিয়া গিয়াছে,দারুণ গ্রীষ্মের প্রতাপ জাগিতেছে। জ্যৈষ্ঠের অভ্যুদয়ে সমাজের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই উত্তাপ যে সহ্য করিতে পারিবে, মায়ের ভিন্ন রূপ নিশ্চয় সে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহা পারিবে কে? আমি বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই অসহায়, আমি সহ্য করিতে পারিব না বলিয়া মনে ভয় বড় হইতেছে। ভীত হইয়া আজ সকলের দ্বারে আসিয়াছি। মাকে পাইবার জন্য গত জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধু বিচ্ছেদের কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারিব কি না, সন্দেহ। মা বলেন, আমি তোর ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে রহিয়াছি। মায়ের কথা শুনিয়াই আসিয়াছি। অনেক বন্ধুকে, অনেক ভ্রাতাকে হারাইয়া, আরো বন্ধু, আরো ভ্রাতার অন্বেষণ করিতেছি। এই বিষম দুর্দ্দিনে কে রক্ষা করিবে? কে সহায় হইবে? আমি এই উত্তাপের ভিতরে কেবল সচ্চিদানন্দঘন মাকে দেখিতে চাই। এই বিচ্ছেদ আগুন নির্ব্বাণের একমাত্র আশাবারি—মায়ের শান্তি প্রসাদ। এই সময়ে পরস্পরে পরস্পরের সহায় হইয়া আসুন মাকে ডাকি এবং মায়ের শান্তি প্রসাদ মাগিয়া লই। কষ্ট দূর হউক,নিরাশা দূর হউক,আজ সকলে মায়ের প্রাণে ডুবিয়া বিচ্ছেদ-জ্বালা ভুলিয়া যাই। মা করুণাময়ী আমাদের সহায়; আমরা কিছুতেই মায়ের বিশাল-বক্ষ সমাজ রূপ সুস্নিগ্ধ ক্রোড় ছাড়িবনা। জ্বলিব,পুড়িব, অঙ্গার হইয়া যাইব—তবুও মাকে ছাড়িব না। মা এই উত্তাপের দিনে আমাদিগের প্রাণে অধ্যবসায় ঢালিয়া দিন; আমরা এই কঠিন পরীক্ষার অবস্থায় পড়িয়া যেন মাকে ভুলিয়া সংসারে ফিরিয়া না যাই। মায়ের আশীর্ব্বাদ আমাদের সকলের নিরাশা-দগ্ধ, বিচ্ছেদ-কাতর প্রাণে বর্ষিত হউক। (উৎসবে পঠিত)

২

বহু চিন্তা এবং গবেষণার পর সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে, এই অনন্ত প্রকৃতির মূলে এক অদ্বিতীয় শক্তি বিদ্যমান। যাহার নিকট সেই শক্তি যে ভাবে প্রকাশিত হয়,

সে তাহাকে সেই ভাবেই দেখে। সে শক্তি অনন্ত—অনন্তের আরম্ভ কোথায়, শেষ কোথায়, কেহ জানে না। অরূপ তিনি, অব্যয় তিনি, কিন্তু এক এক জনের নিকট এক এক রূপে প্রকাশিত। প্রত্যেকের ভিতরেই তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত। যাহার ভিতরে তাঁহার যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সে স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার বুঝিবার শক্তি নাই। বৃথা তর্ক যুক্তিতে, সাধন বিনা, লোকে নিরাকারের স্বরূপ ধারণ করিতে পারে না। যাহার ভিতরে তাঁহার কোন স্বরূপই প্রকাশিত হয় নাই, ধর্ম্ম তাঁহার নিকট স্বপ্ন, কুহেলিকা,—আঁধার—কল্পনার জিনিষ। হাজার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইতে পারিবে না। স্বপ্রকাশ আপনি যাহার ভিতরে প্রকাশিত হন নাই, কাহার সাধ্য তাহাকে প্রকাশ করিয়া বুঝাইবে? দেখা এবং স্পষ্ট অনুভব করা চাই। তর্ক যুক্তিতে যেমন সন্দেশের মিষ্টত্ব, জলের শীতলত্ব, অগ্নির উষ্ণত্ব স্বরূপত কাহাকেও বুঝান যায় না, তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপও বুঝান যায় না। সন্দেশের মিষ্টত্ব কি, সেই ব্যক্তিই বুঝিয়াছে, যে সন্দেশের আস্বাদন লইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপও সেই ব্যক্তি বুঝিয়াছে, যাহার সহিত কোন না কোন স্থানে সেই অরূপ অব্যয়ের সহিত কোন না কোন প্রকারে সাক্ষাৎ হইয়াছে। নচেৎ তাঁহাকে কে বুঝিতে পারে? এই জন্যই বলি ধর্ম্মের মূলে বিশ্বাস ও সাধন। বিশ্বাস—স্বতঃজ্ঞানমূলক,—উপার্জ্জিত জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন হয় না। বিশ্বাস যেখানে আছে, সেখানে জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান যেখানে আছে, বিশ্বাসও যে সেখানে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। বিশ্বাস জ্ঞানের অতীত এমন কিছু, যাহাতে মায়ের সহিত সন্তানের সাক্ষাৎ হয়! মাতা ও পুত্রের যোগ রজ্জু বিশ্বাস-মূলক প্রেম।

মায়ের কোলে একটী অবোধ ক্ষুদ্র শিশু। জ্ঞানী নয়, বিদ্বান নয়, একটী অবোধ শিশু। মাকে সে ব্যক্ত করিতে পারে না, অথচ মায়ের কোলে মাথা গুঁজিয়া রাখিয়া নিরাপদ মনে করে। মাকে সে জানে না, অথচ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেই সে চায়। অথবা মাকে সে যতটুকু জানে, তাহাপেক্ষা কত অধিক ভালবাসে! মায়ের চখে চোক, প্রাণে প্রাণ, বুকে বুক। হায়, কি গভীর প্রেমের লীলা! জ্ঞান এখানে এক বিন্দু। বিন্দু অপেক্ষাও বিন্দু। জ্ঞান ভিন্নও প্রেমের রাজত্ব! অথবা প্রেমই জ্ঞানের মূলে। মায়ের প্রাণে প্রাণ রাখিয়া শিশু জ্ঞান পায়, চখে চখ রাখিয়া কত শিখে, বুকে বুক রাখিয়া কত আনন্দ উপভোগ করে। জ্ঞান নাই, কিন্তু বিশ্বাস আছে শিশুর প্রাণে, তাই সে মাকে এত ভালবাসে। অলৌকিক এমন কিছু শিশুর প্রাণে অবতীর্ণ যে, সে মাকে না জানিয়াও ভালবাসে। না জানিয়া ভালবাসায় যে কি সুখ, কি আনন্দ, তা শিশুই জানে। জ্ঞানের পরে যে ভালবাসা আইসে, তাহা ব্যক্তিত্বে দূষিত। স্বর্গের অনাবিল ভালবাসা জ্ঞানের অতীত কিছু। সে ভালবাসা বিশ্বাস-মিশ্রিত স্বর্গের মন্দাকিনী। সে প্রেম আশার সঞ্জীবনী কাহিনী। যে তাহাতে ডুবে, সেই বুঝে, প্রেম কি, ভালবাসা কি? অন্যের পক্ষে তাহা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

সেই অনাবিল স্বর্গীয় প্রেম মানুষকে ভিন্ন

ভিন্ন পথ দিয়া মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যাইতেছে। মানুষের বিকাশ যাহা, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং সেই প্রেম মানুষকে অনন্ত বিকাশের পথে বা প্রকৃত ধর্ম্মে লইয়া যাইতেছে। মানুষ ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। শিশুর মাতৃপ্রেম শতধা হইয়া শেষে শিশুকে কি করিতেছে, দেখাইতেছি।

শিশু, মাতৃ ক্রোড়ে থাকিতে থাকিতেই মাতৃ প্রেম ছাড়া আর কিছু পাইল। তাহা কি, জান? তাহা ভ্রাতৃ-প্রেম। মায়ের ধারে আর একটী শিশু—তাকেও সে ভালবাসিল, বুকে করিল। দেখিল, বুঝিল, মাকে ভালবাসিলেই তৃষ্ণা মিটে না—আরো বুক খালি থাকে। ভাই তখন ভাই ভগ্নীকে বুকে করিয়া বসিল। ভাই ভগ্নীর মিলন কত মধুর, কে না জানে? স্বর্গ সেখানে জাগ্রত। আরো দিন যাইল, আরো বিপদ ঘটিল। পিতা মাতার স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর ভালবাসায় সে অনেক দিন ভুলিতে পারিল না—যাহার সহিত পূর্ব্বে দেখা শুনা বা আলাপ পরিচয় ছিল না, শেষে তাহাকে ধরিয়া টান পড়িল। দূরের মানুষকে নিকটে আসিতে হইল—কাহার ইঙ্গিতে কে জানে, স্বর্গীয় এক আশ্চর্য্য সূত্রে বন্ধুর সহিত বন্ধুর মিলন হইল। গলাগলি, জড়াজড়ি, ধরা ধরি—বন্ধুর সহিত বন্ধুর। পিতৃ মাতৃ প্রেমে যে সুধা ছিল না, ভ্রাতা ভগ্নীর অকৃত্রিম স্নেহের কোলে যে অমৃত মিলে নাই—শুষ্ক কঠোর বন্ধুর হৃদয়ে পাষাণে আবৃত অনন্ত-সুস্নিগ্ধ সে অমৃতের ভাণ্ডার পাওয়া যাইল। কত আনন্দ, কত সুখ! আকাশ মধুময় হইল, পৃথিবী সে সুস্নিগ্ধ প্রেমের প্লাবনে স্বর্গ হইয়া যাইল। এখানেও লীলার শেষ নাই। উপরোক্ত ভালবাসার নানারূপে মজা হইল, তবুও হৃদয় অতৃপ্ত। পরে স্বামী স্ত্রীর মধুর মিলন হইল। রিপুর গঞ্জনায় মাতিয়া মানুষেরা দাম্পত্য প্রণয়ের স্বর্গীয় রূপ দেখিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু এমন কে আছে যে, এই মধুময় প্রেম প্রবাহের প্লাবনে না পড়িয়া সংসারের প্রকৃত সৌন্দর্য্য, প্রকৃত মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিয়াছে? হৃদয় যেন ফাঁক ছিল, তাহা পূরিল—আশা মিটিল, সুখ জমিল। কিন্তু এখানেও শেষ নয়। মাতৃ প্রেমের পার্শ্বে ভ্রাতৃ প্রেম, তার ধারে বন্ধুপ্রেম, তার ধারে দাম্পত্য প্রেম, কিন্তু এখানেও শেষ নাই। এখানে আসিয়াও পরাণ অতৃপ্ত। এই যে প্রেমের নানা রূপ জগতে দেখা যায়,—ইহার কোনটীর সহিত কোনটীর তুলনা হয় না। সকলই পৃথক পৃথক। জিনিস এক—কিন্তু রূপ—ভিন্ন ভিন্ন। দাম্পত্য প্রেমের পরে আমার সন্তান বাৎসল্যের অবতরণ। পারিবারিক প্রেমের বেদ বেদান্ত যখন অভ্যস্ত হইয়া যাইল, তখন—জগৎ-প্রেম বা বিশ্বপ্রেমের উদয় হইল! অনেকের ভাগ্যে এত দূর পৌছিতে পারা সম্ভবপর নহে, সুতরাং বিশ্ব-প্রেমটা অনেকের পক্ষেই কল্পনার জিনিষ। কিন্তু একথা ঠিক, পারিবারিক প্রেম যখন পূর্ণ বেশে হৃদয়কে আলিঙ্গন করে—তখন হৃদয় আরো বিস্তৃত হয়—অনন্তের দিকে আরো ছুটিতে চায়। তখন আরো অতৃপ্তি। যে এত দূর পৌছিয়াছে, সে ইহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। এই যে প্রেমের চক্র ঘুরিতেছে—ইহার মূলে মা। মা ই পৃথিবী দর্শনের একমাত্র সহায়—মায়ের হৃদয় হইতে প্রেম পাইয়াছিল বলিয়া, এই

সকল প্রেমে বালক মজিল। ঐ মাতৃপ্রেম আরো ফুটিল, আরো ফুটিল, আরো ফুটিল যখন—তখন তাহাই বিশ্বপ্রেম রূপ ধরিল। ভালবাসার তখন সহস্র দ্বার মুক্ত—যেদিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই অতুল শোভা—প্রকৃতি সজ্জিত হইয়া মানুষকে আলিঙ্গন করিতে লালায়িত। সকলেই আপন ক্রোড়ের লুক্কায়িত সত্য দেখাইতে ব্যতিব্যস্ত। দেখ, আর মজো, মজিয়া আবার দেখ। দেখিতে না দেখিতে প্রাণে প্রাণ বিনিময় হইয়া যায়। এক প্রাণ তখন শতধা, সহস্রধা হইয়া গিয়াছে—বিশ্বভুবন তখন আনন্দে মাতিয়াছে। তখনই মানুষ দেখে, সকলই একে নিমজ্জিত, সকলই একের ক্রোড়ে চির মগ্ন। প্রেম-প্রসাদ পাইয়া মানুষ তখন দেখে, সকলের মূলেই এক অদ্বিতীয়, সুতরাং তাঁকেই প্রাণ দিয়া তখন কৃতার্থ হয়। একেই সকলের প্রাণ উৎসর্গীকৃত—এক সাগরেই সকলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতেছে। একের কোলেই সকলে মজিতেছে। একের জন্যই সকলে ধাইতেছে। সেই এক শক্তিকে পাইতে হইলে, সকল দিক দিয়াই যাইতে হইবে। যে পরিমাণে অধিক দিক দিয়া তাঁহাকে দেখা যাইবে, সেই পরিমাণে তাঁহাকে অধিক জানা যাইবে। অসংখ্য অসংখ্য নদী ঝরণা মিলিয়া মিশিয়া তবে মহা সমুদ্র। একটীকে ধরিয়া থাক, আর একটীর মহিমা বুঝিবে না। একদিকে যাও, আর একদিকের জ্ঞান তোমার নিকট আঁধার হইয়া থাকিবে। কিন্তু সকল দিক দিয়া যাওয়া বড়ই কঠিন। সকল শক্তি বিকাশের জন্যই সাধন আবশ্যক, সাধন ভিন্ন মানবত্ব লাভ অসম্ভব। কিন্তু এ বড়ই কঠিন সাধন। জ্ঞান আর প্রেম, কর্ম্ম আর ইচ্ছা, এ সকলেরই সমান সাধন করা চাই। এক প্রেমের ভিতরেই কত রূপ, কত ভাব। মাতৃ পিতৃ বাৎসল্য, ভ্রাতৃ স্নেহ, বন্ধুর ভালবাসা, স্ত্রীর প্রণয়—এ কোন্‌টী উপেক্ষার যোগ্য? কোন্‌টী মনুষ্যত্ব লাভের বিরোধী? খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, কোনটীই নয়। পৃথিবীর বড় বড় সাধকগণ, এক এক জন, এক এক ভাবে, বিশ্ব-শক্তির আরাধনা করিয়া গিয়াছেন, সত্য। কেহ মাতারূপে, কেহ পিতারূপে, কেহ সখারূপে, কেহ স্বামীরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু পূজা যে সেখানে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে, এ কথা মানিতেই হইবে। অতএব—বিশ্বশক্তিকে বুঝিতে হইলে সকল প্রকার সাধনার দিক দিয়াই যাইতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া যাইয়া দেখি—সেখানে এক জনই বিদ্যমান। মাতার হৃদয়েও তিনি, ভ্রাতার প্রাণেও তিনি, বন্ধুর মুখেও তিনি, স্ত্রীর বুকেও তিনি। মানুষ যাইয়া দেখে—একেরই বিকাশ সর্ব্বত্র। এক জনই পৃথক পৃথক রূপে ফুটিয়া পড়িতেছেন। অতএব সাধনার একদিক লইয়া কখনই পরিতুষ্ট থাকা উচিত নয়। সকল শক্তির বিকাশ হইলেই বিশ্বশক্তির সহিত স্বরূপত সাক্ষাৎ হইবে; কারণ তিনি সকল শক্তিরই সমষ্টি,—কারণ সকল শক্তির মূলেই তিনি। সকল শক্তির বিকাশ হইলেই মনুষ্যত্ব লাভ বা ধর্ম্ম লাভ, জীবন লাভ বা মুক্তিলাভ ঘটে। অনন্তের তীরে পৌঁছিয়া যে এক স্বরূপ, এক ভাব লইয়া বসিয়া রহিল, সে বিশ্বশক্তি কি, তাহা কিছুই বুঝিল না। সে তর্ক যুক্তির আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। অতএব—সীমা-

বদ্ধ ভাব হইতে অসীমের দিকে গতি যথনই থামিয়া যাইবে, তখনই সাবধান হওয়া উচিত। তখনই মায়ের নাম স্মরণ করিয়া জাগ্রত হওয়া উচিত। কারণ মায়ের বিশ্ব-বিজয়ী নামের ভিতরে বিশ্বাস-রূপ প্রেমাঙ্কুর নিহিত। মাতৃ প্রেম হইতেই সকল প্রেম উদ্ভূত। মাতৃ প্রেম স্মরণ করিয়া মায়ের সন্তান যখন হুঙ্কার ছাড়ে, তখন পৃথিবী কম্পিত হয়, পাপ প্রলোভন দূরে পলায়ন করে। মা ই ভরসা। মাতার মাতা, পরম মাতা, আমাদিগের সহায় হইয়া তাঁহার সকল স্বরূপের ভিতর দিয়া তাঁহার অনন্তরূপ সাগরে আমাদিগকে নিমগ্ন করুন। এই করুন, সীমাবদ্ধ স্থানে যেন আমরা আবদ্ধ না থ
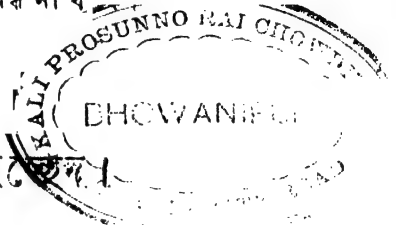
জীবন্ত জীবদেহচ্ছেদ।

অনেকেই জানেন, তবুও একবার বলি যে, বিলাতে সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা, শারীকিক ক্রিয়াদির সূক্ষ্ম এবং অভ্রান্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য,ইতর প্রাণীদিগকে জীবন্তচ্ছেদ করিয়া শরীর-তত্ত্বের পরীক্ষা-আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদির কোন্‌টা কি কার্য্য করে, যন্ত্রে যন্ত্রে মুখ্য ও গৌণ সম্বন্ধ কি, বিশেষ রোগে বা অন্য বিশেষ অবস্থায় কোন্ যন্ত্র কিরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এ সকল কথা মড়া কাটিয়া স্থির হয় না। মড়া কাটিয়া যে পরীক্ষা তাহা পরোক্ষ, কাজেই অস্থির। এই সকল কারণে—সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ এবং প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য, ইতর প্রাণীদিগকে জীবন্ত ছেদ করিয়া পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকল কাজেই বাদী প্রতিবাদী আছে; এখানেও জুটিয়াছে। কিন্তু একটা কথার বিবাদ নাই;—বাদী প্রতিবাদী উভয়েই স্বীকার করিতেছেন যে, জীবন্ত জীবচ্ছেদে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অনেক পরিমাণে প্রত্যক্ষ এবং অভ্রান্ত হইতে পারে। এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হইবে, তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না।

কিন্তু এ প্রথায় প্রতিবাদীদল এই কথা বলেন যে, জীবন্ত দেহচ্ছেদে বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ঘোর নৃশংস আচরণ দ্বারা—জ্ঞানোন্নতি করিয়া লাভ কি? কেবল বুদ্ধি বাড়াইবার জন্য—জ্ঞানের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, জীবন নহে। যাহাতে নৈতিক উন্নতি হয়, স্নেহ বাড়ে, দয়া বাড়ে, হৃদয়ের মহত্ত্ব বিকশিত হয়, তাহারই জন্য জীবন। তবে কেন ছাই ও পোড়া বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিনিময়ে নিষ্ঠুরতা কুড়াইব; মনুষ্যত্ব হারাইব? বৈজ্ঞানিকেরা দুই দিক হইতে একথার জবাব দিয়া থাকেন। সে সকল কথারই এস্থলে সমালোচন করা যাইবে।

(১) জীবন্ত জীবচ্ছেদ সমর্থনকারী পণ্ডিতেরা বলেন যে, জ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞান-হীনের নীতি একটা কথার কথা বা কুসংস্কার মাত্র। আমাদের দেশে সাধারণত

স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-কথা প্রচলিত আছে। হিন্দুরমণী এই ধর্ম্ম প্রতিপালনে অতিশয় অনুরাগিণী; এবং ইহার সুখময় শুভ ফলের জন্য হিন্দু-সমাজ গৌরবান্বিত। কিন্তু এই যে সতীত্ব বলিয়া কথাটা, ইহা কি একটা কুসংস্কার মাত্রে দাঁড়ায় নাই? পতিব্রতা এবং পত্নী-ব্রাত্য, উভয়ই পুণ্যময় ধর্ম্ম—উভয়ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সাধারণত স্ত্রীলোকেরা যে এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাহার কারণ এই যে, এ প্রথা বংশ পরম্পরানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সকলেই বলে ইহা ধর্ম্ম, কাজেই ইহা অবশ্য প্রতিপাল্য। ইহাতে একটা অন্ধ আস্থা আছে, এই মাত্র। কাজেই বলিতে-ছিলাম যে, এ সতীত্ব কথাটা কুসংস্কারে দাঁড়াইয়াছে। বিবাহে পবিত্রতা আছে, এক পতি এবং এক পত্নীত্বে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, এ সকল কথার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু যে কারণে সতীত্ব-ধর্ম্ম প্রতিপাল্য, সে কারণে তো পুরুষকেও একপত্নী হইতে হয়; কিন্তু কৈ, ফলেতো এ হিন্দুর সমাজে স্ত্রীর মত পুরুষদিগকে ত এ ধর্ম্মে আস্থাবান দেখি না? ইহাতেই বুঝা যায় যে, একটা অন্ধ বিশ্বাসের ফলে—একটা কুসংস্কারের জন্যে স্ত্রীলোকেরা সতী। যদি ঠিক ইহার বিপরীত মত, শাস্ত্রের অনুশাসনে প্রবর্ত্তিত হইত, তবে তাহাও এমনি নিষ্ঠার সহিত অবলম্বিত হইত। বিশেষ করিয়া বুঝিলে প্রতীত হইবে যে, এই সতীত্ব বা সততার প্রশ্ন কেবল ইন্দ্রিয় সংযমের প্রশ্নের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্রিয়-সংযমে আমাদের সুখ বাড়ে, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, মন উদ্বেগ-শূন্য হইয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে—অর্থাৎ সাধারণত আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হয়। কিন্তু এ সকল কথাও যে সত্য, তাহারও প্রমাণ আবার শারীরতত্ত্ববিৎ ভিষক্‌দিগের প্রমাণের সাহায্য সাপেক্ষ। এ সকল প্রশ্নেও নানা মুনির নানা মত আছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযমের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করেন, কিন্তু সতীত্ব বা পত্নীব্রাত্যের কড়া আইন জারি করিতে চাহেন না। যাঁহারা এ সকল প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, এই শেষোক্ত মতে ভ্রান্তি দেখাইতে শারীর-বিদ্যার অভিজ্ঞতা চাই। তবেই দেখা গেল যে, দেহতত্ত্বের জ্ঞানের উপর আমাদের অনেক সন্নীতির সত্যতা অস-ত্যতা নির্ভর করিতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে এই জীবচ্ছেদে—উন্নতির এত মূলীভূত কারণে এত হায় হায় কেন; এত প্রতিবাদ কেন? ইহাতে নৈতিক অধোগতি না হইয়া বরং জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিই সাধিত হইবে।

(২) যদি বল যে, গরু মারিয়া জুতা দান করিয়া কি ফল? একটা জীবকে নিষ্ঠুর রূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার জ্ঞানোন্নতি এবং নৈতিক উন্নতি লাভ করা অপেক্ষা একটু অনৈতিক এবং অজ্ঞানী থাকাই বরং ভাল। ঘোর যন্ত্রণা দিয়া জীব বধ করায় যে অনৈতিক অনুষ্ঠান হয়, তাহা কি প্রাণে লাগে না? মিথ্যা বলিয়া সত্য বাহির করা শ্রেয়ঃ নহে; অনৈতিক অনুষ্ঠান দ্বারা সন্নীতি স্থাপনের চেষ্টা অতিশয় অপস্থানুসারিণী।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জীবহত্যা মাত্রই যদি অনৈতিক এবং নৃশংস ব্যবহার, তবে আমিষ ভক্ষণ ও শিকার করার বিরুদ্ধে, এবিষয়ে যেমন হইয়াছে, তেমনি খড়্গহস্ত হও না কেন? তোমরা সে সকল প্রশ্নে হয় নির্ব্বাক, আর না হয় কচ্চিৎভাষী; তবে এ কথাটার বিরুদ্ধে এত ঝড় বহাও কেন? আরও কথা আছে। যাঁহারা আমিষাশী তাঁহারাও অনেকে এই জীবচ্ছেদ প্রথার বিরোধী। আহার ও আমোদের জন্য যে কার্য্য করিতেছ এবং করিতে দিতেছ, উন্নততর কার্য্যের জন্য, জ্ঞানের চর্চ্চার জন্য, সে কার্য্যে বাধা দেও কোন্ যুক্তিতে?

কিন্তু এ উত্তরের পরেও ...ভবাদী দলের বলিবার কথা আছে। তাঁহাদের মধ্য হইতে নিরামিষাশী দল বলিতে পারেন যে, আহারার্থও জীববধ গর্হিত। জন্তু যদি আহার ও শিকারের জন্য বধ্য হইতে পারে, তবে জ্ঞানার্থেও বধ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, কোন কারণে জীব বধ প্রশস্ত নহে। দুইটী শাখায় ইহার উত্তর বিভক্ত করা যাউক।

(১) শিকারের জন্য জীব বধ করা যাইতে পারে কি না? যাঁহারা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানেন, কি প্রণালীতে বনচারী প্রাসাদবাসী হইয়াছে, তাহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত আছেন; তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া আবার বলিতে হইবে কি যে, হিংস্র জন্তু বধই আমাদের উন্নতির ও সভ্যতার, অর্থাৎ মানুষ হইবার প্রথম সোপান? প্রাচীন কালের কথা থাকুক? এখনও যতই লোকবৃদ্ধি হইতেছে, ততই বনপ্রদেশ উচ্ছন্ন করিয়া লোকালয় সংস্থাপন করিতে হইতেছে—এবং অবশ্যই হইবে। লোকালয় স্থাপন করিতে গেলেই বনপ্রদেশ উচ্ছন্ন করা চাই; আবার বনপ্রদেশ উচ্ছন্ন করিতে গেলেই শত শত হিংস্র জন্তুর বুকে শরবিধান করা চাই। আজি কলিকাতার সহরে ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই; কিন্তু এক দিন ছিল,—এক দিন, যেখানে আজি রাজপ্রাসাদ, সেইখানে ব্যাঘ্র ভল্লুক চরিত। সে দিন বহুদিনের কথা নহে। ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কেবল বন ও ব্যাঘ্র ছিল। মানবের অস্ত্র সে সকল ব্যাঘ্রকে বধ করিয়াছে, সে অরণ্য দগ্ধ করিয়াছে, এবং সেই বিপুল অরণ্যভূমে সৌধ রচনা করিয়াছে। যাহা ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, এই মধ্যপ্রদেশ-প্রবাসী লেখক, তাহার সদা প্রয়োজনীয়তা এখানে স্বচক্ষে দেখিতেছেন। জীবন্তদেহচ্ছেদের বিরোধী বেঙ্গলী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি এখনও বাঙ্গালার মফঃস্বলে হিংস্র জন্তু বধের প্রয়োজনীয়তা দেখেন বলিয়া অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের প্রতিবাদ করেন। যদি শিকার করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে সেই শিকারের জন্তুকে (বধ তো করিতেই হইবে) ধরিয়া আনিয়া, জ্ঞানের উন্নতি সংকল্পে উৎসর্গ করায় ক্ষতি কি? এক ঢিলে দুটা পাখী মারায় আপত্তি কেন? বরং কেবল বধ না করিয়া একটু কাজে লাগানই ভাল।

(২) তাহার পর বিচার্য্য এই যে, হিংস্র জন্তু ভিন্ন অন্যান্য জন্তু বধ্য হইতে পারে কিনা? অথবা প্রথমে দেখা যাউক যে, খাদ্যার্থ নিরীহ জন্তু বধ করা যাইতে পারে কিনা? কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ

সাধ্য নহে। অর্থাৎ কথা এই যে, আজিও এ বিষয়ের একটা ন্যায্য ও সর্ব্ববাদীসম্মত মীমাংসা হয় নাই। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে, আমিষবাদ ও নিরামিষবাদ উভয়ই তীক্ষ্ণতা ও যোগ্যতার সহিত সমকক্ষ পণ্ডিতদিগের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। আসল কথা এ বিষয়ে মত ভেদ আছে; এবং সেই মতভেদ সহজে টুটিবার নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যদি আহারের জন্য জীববধ করা যায়, তবে জ্ঞানার্থে অবশ্যই তাহা অকার্য্য হইবে না। যদি প্রতিবাদীদল বিজ্ঞানের প্রমাণে বা নীতির প্রমাণে জীবাহার অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায় বলিয়া স্থির করিতে পারেন, তবে তাঁহারা এ বিষয়ে অনায়াসে প্রতিবাদ করিয়া সফল হইতে পারেন। নচেৎ বৃথা লোকরঞ্জন যুক্তি (Argumentum ad hominem) দ্বারা জীবন্ত জীবচ্ছেদ প্রথা অপ্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।
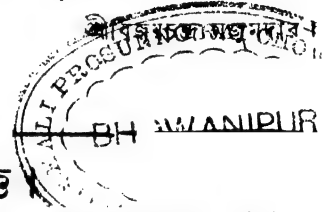
স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত আর নাই। ১২৯৩ সালের প্রথম নিদারুণ ঘটনা—অক্ষয়কুমারের স্বর্গারোহণ। বঙ্গবাসী ১২৯৩ সালকে কখনও ভুলিতে পারিবে না। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বঙ্গ-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। ঐই দিন বাঙ্গালার অমূল্য নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে, ঘরে ঘরে রোদন ধ্বনি উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশে প্রকৃত আড়ম্বরশূন্য মহৎ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যে দুই চারি জন লোকের জীবন লইয়া আমরা গৌরব করিতে পারি—৺অক্ষয়কুমার তাঁহাদের মধ্যে এক জন। অক্ষয়কুমারের জীবন নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য। এমন কি, বাঁচিয়া থাকা কালীন যাঁহার নামের বিশেষ কোন মহিমা লোকে বুঝিত না; আজ তাঁহার জন্য ঘরে ঘরে আলোচনা—ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল। পবিত্রাত্মা অক্ষয়কুমারের জন্য অশ্রুপাত করিয়া বঙ্গভূমি আজ পবিত্র হইয়াছে।

দরিদ্রের গৃহে অমরাত্মা বিনা আড়ম্বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য জীবন ঢালিয়া দিয়া পীড়িত হইয়া নির্জ্জন গৃহে রোগের সেবা করিতেছিলেন—বিনা আড়ম্বরে অমরাত্মা অমর ধামে বিশ্রাম লাভ করিলেন। বঙ্গের সুসন্তান আজ মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। স্বর্গে আজ আনন্দ ধ্বনি, কিন্তু বঙ্গে আজ হাহাকার!

আমরা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, দেশের কোন কোন সুযোগ্য সম্পাদক তাঁহার ধর্ম্মমত লইয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত ছিল, স্বধর্ম্ম পালন করাই লোকের কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম—পিতামাতার বা দেশের ধর্ম্ম নহে। মানব প্রকৃতি অসংখ্য—ধর্ম্মও অসংখ্য, মতও কাজেই অসংখ্য। প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্ম, স্বমত রক্ষা করা। এই মহাত্মাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মের সহিত কাহারও ধর্ম্মের মিল নাই, মিল থাকিতে পারেনা।

প্রত্যেকের ধর্ম্মই পৃথক পৃথক। একটু সূক্ষ্ম ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই—সম্প্রদায় নাই—কলহ নাই, বিবাদ নাই—তাহা উদার। স্বধর্ম্ম পালন করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। কিন্তু "স্ব" শব্দকে এখন পিতা মাতা বা পূর্ব্ব কালের লোকদিকের স্থলে প্রয়োগ করা হইতেছে। ইহা কখনই সঙ্গত নহে। আপন আপন শক্তির বিকাশই যখন ধর্ম্ম, তখন অন্যের ধর্ম্ম কখনই আমার লক্ষ্য হইতে পারে না। এই স্থানে সকলেরই উদারতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষত এই শোকের দিনে, ঐ প্রকার কথা প্রয়োগ করা নিতান্তই রুচিবিরুদ্ধ। অক্ষয়কুমার স্বধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত মহত্ব। তোমার কিম্বা আমার ধর্ম্ম পালন করিলে তিনি কখনই মহৎ লোকের আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন না; তিনিও তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেন। আপন পথে,অসঙ্কোচে যিনি চলিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি। অক্ষয়কুমার এসম্বন্ধে একজন প্রকৃত বীর। যশ নিন্দা,মান অপমান সকল তুচ্ছ করিয়া, অবচলিত ভাবে তিনি আপন লক্ষ্য পথে চলিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমরা তাঁহার নামের গৌরব করি। আপন পথে চলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, এই মহাত্মার তিরোধানে আজ বঙ্গভূমি এত শোককাতর। আপন মনে আপন পথে যে চলিতে পারে, সেই ত মানুষ। মহাত্মা অক্ষয়কুমার প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিজয় নিশান বঙ্গভূমিতে প্রোথিত্ব রাখিয়া প্রকৃত বীর বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ধন্য বঙ্গভূমি, ধন্য অক্ষয়কুমার।

তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় মহত্ব—সাহিত্য-জগতে। একশ্রেণীর লোকের ন্যায় তিনি লোকের রুচি অনুসারে অন্যের মুখ চাহিয়া পুস্তক লেখেন নাই, বরং রুচি মার্জ্জিত করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। লোকের রুচির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অন্যকে কত কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু দেখ, প্রকৃত বীর অক্ষয়কুমারকে সেজন্য কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। আপন ভাষায়, আপন মার্জ্জিত রুচিপূর্ণ জীবনের মহামূল্য কথা সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার পুস্তকের কত আদর! তাঁহার এক একখানি পুস্তক ধর্ম্ম জগতের এক একখানি অমূল্য রত্ন বিশেষ। সাহিত্য এবং ধর্ম্মকে একত্রিত করিয়া এই মহাত্মাই বঙ্গভূমিকে এক উজ্জ্বল পরিচ্ছদ দিয়া গিয়াছেন। যতদিন ভাষার আদর থাকিবে, যত দিন ধর্ম্মের নামে লোকের মন ভিজিবে, ততদিনই এই মহাত্মার নাম অক্ষয়। কাহার সাধ্য—অক্ষয়রত্ন ভাণ্ডারকে বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত করিবে? অক্ষয়কুমার—এখানেও অক্ষয়—পরলোকেও অক্ষয়। দেশ, কালের অতীত অক্ষয়-ধামে—স্বর্গ-মর্ত্ত্যে অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছে। আরো কিছু স্মৃতি চিহ্ন স্থাপিত কর,ভালই, না করিলেও কোন ক্ষতি নাই—আপনার মহত্ত্বে মহাত্মা চিরকালের জন্য অক্ষয় হইয়া রহিয়াছেন। ধন্য বঙ্গভূমি, ধন্য অক্ষয়কুমার! ধন্য বঙ্গসাহিত্য, ধন্য ব্রাহ্মসমাজ! ধন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধন্য উপাসক-সম্প্রদায়!

প্রকৃত মহৎ লোকের জীবনের প্রকৃত মহত্ব প্রকাশ হওয়া অনেক কাল সাপেক্ষ। অক্ষয়কুমারের প্রকৃত মহত্ব বুঝিবার দিন এখনও বহুদূরে। যখন প্রকৃত সময় আগমন করিবে—তখন ভারতের অসংখ্য আর্য্যঋষিগণের পার্শ্বে এই মহাত্মার নাম—প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত বীর, প্রকৃত স্বার্থত্যাগী হিতৈষী বলিয়া পূজিত হইবে। তখন ঘরে ঘরে এই মহাত্মার নাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইবে।

বাল্যবিবাহ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

মানবের দৈহিক পূর্ণতা ও পরিণতি সম্বন্ধে বাল্যবিবাহের ফলাফল আমরা প্রথম প্রস্তাবে এক প্রকার আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি; মানব জীবনের অন্যান্য দিকে ইহার ফলাফল কিরূপ, তাহার বিচারে আমরা এখন প্রবৃত্ত হইব।

শরীর তত্ত্বের ইহা একটি নির্দ্ধারিত সত্য যে, অঙ্গ বা বৃত্তি বিশেষের পরিপুষ্টি অন্যান্য অঙ্গ ও বৃত্তি সমূহের পরিপুষ্টির উপর নির্ভর করে। একটি বালকের ও একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মস্তিষ্কে বিস্তর প্রভেদ। আমরা দেখিয়াছি যে, বাল্যবিবাহ জননশক্তিকে অতি অপরিপক্ক বয়সে বিকশিত ও পরিচালিত করিয়া শারীরিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে। বাল্যে জননশক্তির বিকাশে শরীরের অপরাপর অংশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মস্তিষ্ক তদপেক্ষা বহুতরগুণে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহার কারণ, জননশক্তির আধার স্বরূপ বীজ (Sperms ও Germs) ও মস্তিষ্ক এক স্নায়ু পদার্থ,—একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। এখন যদি বাল্যেই এই জনন শক্তির বৃদ্ধি হইল—তাহা হইলে বালক বালিকার অপরিপক্ক দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাহাও এক প্রকার স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে; এবং মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি হ্রাস হইয়া পড়িবে, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইচ্ছাশক্তি হ্রাস হইলে জনন শক্তির উপর আয়ত্ত কমিয়া যাইবে ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল জননশক্তির অধিকতর বৃদ্ধি ও তাহার আনুষঙ্গিক ফল বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাসতা। এই বিষময় ফলের এখানেই শেষ হইল না—বংশ পরম্পরা ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে জাতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্যে (Nervous debility) পরিণত হইবে। আমরা এই বিষময় ফল পূর্ণরূপে ভোগ করিতেছি, কিন্তু আমরা অন্ধ, তাই ইহার কারণ দেখিয়াও দেখিতে পাইনা। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ—একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন—কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল? দর্শন শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির নিকট দুর্ভেদ্য নহে—বিজ্ঞানশাস্ত্রের জটিল বিশ্লেষণে বাঙ্গালীর বুদ্ধি পরাঙ্মুখ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক গুরুতর চিন্তা ভার অধিককাল বহন করিতে সক্ষম নহে—বাঙ্গালী অল্প পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে, একটু অধিক চিন্তা করিতে হইলেই নানাপ্রকার ব্যাধি আসিয়া বাঙ্গালীর জীবন শুকাইয়া ফেলে—বাঙ্গালীর চিন্তাস্রোত শেষ হইয়া যায়। আমরা এই বাল্যবিবাহের বিষময় ফল—ধাতু দৌর্ব্বল্যের জন্যই অকালে আমাদের কেশব, আমাদের কৃষ্ণদাসকে হারাইয়াছি, ইহারই ফলে আমাদের অক্ষয় কুমার বহুকাল জীবন্মৃত অবস্থায় বাঙ্গালী জীবনের দুর্ব্বিসহ কষ্টভার বহন করিয়া গিয়াছেন। ইহারই বিষময় ফলে আমা-

দের শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর আর দেখিতে পাওয়া যায় না—কেহ মস্তিষ্কের ব্যারামে, কেহ বা বহুমূত্র দোষে পীড়িত হইতেছেন। ধাতু দৌর্ব্বল্য কোন না কোন রূপ আকারে চিন্তাশীল বাঙ্গালী মাত্রেরই জীবন শোষণ করিতেছে, বাঙ্গালী জাতিকে দিন দিন অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। বুদ্ধিবৃত্তি মলিন হইলে,চিন্তা-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইলে, অপরাপর সুসভ্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কখনই সক্ষম হইতে পারিবে না, এবং যে অলঙ্ঘনীয় নৈসর্গিক নিয়মের বলে হীনবল ও অসভ্য জাতি অপেক্ষাকৃত সবল ও সুসভ্য জাতি কর্ত্তৃক জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ক্রমে পৃথিবী বক্ষ হইতে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া সভ্যতার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, সেই নিয়ম প্রভাবে আমরাও, এখনও সাবধান না হইলে যে, এক দিন উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইয়া সভ্যতর জাতির জন্য স্থান করিয়া দিতে বাধ্য হইব, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই।

পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হইলে শিক্ষা হওয়া সুকঠিন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বালিকাদের শিক্ষা ত বিবাহের সহিতই বন্ধ হইয়া যায়। বালকদের মনও নূতন সুখের আস্বাদ পাইয়া কবিতা-প্রিয় হইয়া পড়ে, জ্ঞানোপার্জ্জনে আর সেরূপ মন থাকে না, পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হওয়াতে কত শত বালকের শিক্ষার পথ যে একে বারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তালিকা না পাওয়া গেলেও, ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে, ইহার ফল বড় সামান্য হইবে না।

বাল্য বিবাহের অপর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, একান্নবর্ত্তী পরিবার। এমন কি, একান্ন-পরিবার প্রথা প্রচলিত না থাকিলে বাল্য বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিত এবং বাল্য বিবাহ না থাকিলে একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকাও সুকঠিন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষগুণ আমরা পরে আলোচনা করিব। অপরিণত-বুদ্ধি বালক, সংসার কি, বুঝে না,—আশৈশব পিতা মাতার যত্নে লালিত পালিত, কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, পিতা মাতা আদর করিয়া বিবাহ দিলেন, সেও ভাবিল সংসার কি সুখের—বিবাহের দায়ীত্ব না বুঝিয়াই এই সোণার শৃঙ্খল পায়ে পরিল। যদি সৌভাগ্য বশতঃ সেখানেই তাহার পাঠ শেষ না হইল ত খুব ভাল! যদি তাহার পাঠ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ এম্, এ, বা বি,এল পাশ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মস্তকে সংসারের ভার না পড়িল, তবে তাহার সৌভাগ্যের তুলনা নাই। এত সৌভাগ্য অধিকাংশের অদৃষ্টে ঘটে না। তথাপি একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক, ইহার এত সৌভাগ্যের ফল কি? প্রকৃতির গতি রোধ করিবে কে? তাহার পাঠ শেষ হইতে না হইতে দুই একটি সন্তান হইল, পিতার গলগ্রহ থাকিতে থাকিতে আবার তাহার কতকগুলি গলগ্রহ হইল। পিতা মাতা কাহারও চিরকাল থাকে না, থাকিলেও তাঁহাদের আয়ের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। পাঠ শেষ হইতে না হইতে সংসারের গুরুতর ভার সংসারানভিজ্ঞ যুবকের মস্তকে পড়িল—এতকাল যে সুখময় ভবিষ্যতের কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। পাঠাবস্থায় কত উচ্চ আশা হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল--হয়ত মনে করিয়াছিল, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া মাতৃ ভূমির দুঃখ দূর করিবে; হয়

ত মনে করিয়াছিল, যে নূতন আলোকে তাহার প্রাণ আলোকিত হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দেশবাসী ভাইদের দিয়া তাহাদের প্রাণ আলোকিত করিয়া নিজের জীবনকে ধন্য করিবে ; হয়ত ভাবিয়াছিল, যে, ঘোর দারিদ্র্য ভারে ভারতের মর্ম্মস্থান নিষ্পেষিত হইতেছে, সেই দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন করিতে তাহার জীবন উৎসর্গ করিবে ; হয় ত তাহার প্রাণে এ আশা এক দিন দেখা দিয়াছিল যে, যে সমস্ত কুসংস্কার ও দুর্নীতি ভারতের জীবনী শক্তি হ্রাস করিতেছে, তিনি তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে সক্ষম হইবেন, সক্ষম না হইলেও এই পবিত্রকার্য্যে দেহপাত করিবেন। কিন্তু যখন সংসারের গুরুতর ভার তাঁহার মস্তকে পড়িল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন, ভবিষ্যত্ সে আশারাজি লইয়া ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে যুবক একদিন সিংহ-বিক্রান্ত ছিল, তাঁহার আজ শত আঘাতেও বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই,—জানেন কর্ম্মটি গেলে তাঁহার শিশু সন্তানের মুখে অন্নগ্রাসটি উঠিবে না, বাল্যবিবাহই তাহার জীবনের সমস্ত উচ্চ আশার সমাধি হইল। বাল্যবিবাহ যে যে কারণে পুরুষের শিক্ষার কণ্টক হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা শতগুণে অধিক। বিবাহের পরও যদি বালিকাবিদ্যালয়ে যাইতে পারে, তবে বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাও অতি অল্পদিনের জন্য। যদি আমরা অবস্থান্তর কল্পনা করিয়া লই, তাহা হইলে কিরূপ ঘটে দেখা যাউক। পুরুষের সন্তান হইলেও পিতা মাতার উপর ভার দিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে পাঠাভ্যাস করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সন্তানের অধিকাংশ ভার মাতার স্কন্ধে, সুতরাং সন্তান পালন করিয়া নিয়মিত রূপ লেখা পড়া করা একেবারে অসম্ভব। তবে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি জ্ঞান আমাদের অবশ্য গ্রহণীয় হয়, তবে শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বে, বিবাহিত জীবনের কঠিন কর্ত্তব্য ভার বুঝিতে সক্ষম হইবার পুর্ব্বে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কাহারই বিবাহ করা উচিত নহে। ইহার একটি শুভ ফল এই যে, বালক বালিকার জীবশক্তি (Vitality) জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্যয়িত হইলে তাহাদের জননবৃত্তি বিলম্বে বিকশিত হইবে ও মনও নানাপ্রকার উচ্চ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে নীচ সুখস্পৃহা বাল্যে তাহাদের মনকে কলুষিত করিতে পারিবে না। ইহার শুভ ফল অবর্ণনীয়।

বাল্য বিবাহ সমর্থনকারীরা বলেন যে, বাল্য বিবাহই আমাদের, বিশেষত স্ত্রীজাতির চরিত্র রক্ষার এক প্রধান উপায়—বাল্য বিবাহ উঠিয়া গেলে আমাদের দেশ অপবিত্রতার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। একথা কতদূর সত্য, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। পবিত্রতার সদর্থ কি ? চিত্ত সংযম ও পবিত্রতা আমার নিকট একার্থব্যঞ্জক,—কেবল দেহকে অকলুষিত রাখিলেই যে পবিত্রতা রক্ষা হইল, তাহা নহে, চিত্তকে অন্যার্য্য সুখস্পৃহা হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিতে হইবে। ইহাকেই বলে পবিত্রতা। বাল্য বিবাহ কি এই চিত্ত সংযমের সহায়তা করে ? না তদ্বিপরীত ? প্রবৃত্তি দমনের নাম চিত্ত সংযম, কিন্তু প্রবৃত্তি উদয়ের পূর্ব্বে তাহার পরিতৃপ্তির উপায় করিয়া দেওয়াতে প্রবৃত্তি দমন না হইয়া তদ্বিপরীতই হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ অস্বাভাবিকরূপে কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিয়া মানবাত্মকো

পবিত্রতা ও ধর্ম্মের পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়া দুর্নীতির নরককুণ্ডে ডুবাইয়া দেয়। বাল্য বিবাহ যে পবিত্রতা রক্ষার সহায় না হইয়া বরং তদ্বিপরীত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে মহাত্মা কটন (Mr. Cotton C. S) তাঁহার New India নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন; "It (infant marriage) is intended, no doubt, as a preventive of immorality. But even from this aspect it is a failure, for it allows boys and girls a free scope for indulgence in their passions, at an age when they have reached neither their physical nor mental maturity, and when the observance of chastity ought to have been enforced on them as a moral discipline." Dr. Smith বলেন—"It is almost self-evident that the artificial forcing of physical instincts, and the consequent unnatural stimulation of sexual passion, cannot be regarded as mere error of judgment. It certainly involves a degree of depravity, the consideration of which may, however, safely be left to the 'intuitive moralist'."

যাঁহার নৈতিক জ্ঞান একটুমাত্র জাগ্রত হইয়াছে, তিনি ঋতু কালের আগমনের পূর্ব্বে, কাম প্রবৃত্তির উদয়ের পূর্ব্বে, উক্ত বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে অস্বাভাবিক রূপে আনয়ন করাকে ঘোর দুর্নীতি—মহাপাপ বলিয়া মনে না করিয়া পারেন না। ইংলণ্ডাদি সুসভ্য দেশে যে কার্য্যকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করা হয়, যে মহাপাপের শাস্তি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন, বাল্য বিবাহ সেই মহাপাপেরই জয় ঘোষণা করিতেছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা হিন্দুজাতিকে অধিকতর পবিত্র বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে শুনা যায়, হিন্দু রমণীর অসাধারণ সতীত্ব লইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার সারবত্তা কতদূর, তাহা উভয় জাতির পবিত্রতার আদর্শ তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ইউরোপ যাহাকে মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করে, যাহার দণ্ড চির জীবনের জন্য নির্ব্বাসন, * আমাদের দেশের শাস্ত্র, আমাদের দেশের রীতিনীতি, আমাদের দেশের লোক সাধারণ তাহারই জয় ঘোষণা করিয়া হিন্দুজাতির অনন্ত দুর্গতির পরিচয় দিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, এমন হিন্দু পরিবার কোথায়, যেখানে এই মহাপাপ ধর্ম্মের নামে, পবিত্রতার নামে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে না? অন্যান্য সুসভ্য দেশে যাহা আইন-বিরুদ্ধ, যাহা নীতি বিরুদ্ধ, যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, আমাদের দেশে তাহাই আইন, নীতি ও ধর্ম্ম সঙ্গত বলিয়া আদৃত হইতেছে। হায়! হায়! জাতীয় নৈতিক দুর্গতির এতদপেক্ষা শোচনীয় জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলিবে!!

ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ যে অনেক মহাপাপের প্রসূতি, তাহা ত যাঁহার একটু মাত্র নীতিজ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন; কিন্তু ঋতুর অব্যবহিত পরেই কি বিবাহ হওয়া নীতি-সম্মত, ঋতু উপস্থিত হইলেই যে কাম প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা নহে। ভাল নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হইলে ঋতুর বহু দিন পর পর্য্যন্ত উক্ত প্রবৃত্তির উদয় হয় না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। যাঁহারা এরূপ ঘটনা দেখেন নাই, তাঁহাদের ভাগ্যকে আমরা কৃপার চক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। আর প্রবৃত্তির উদয় হইলেই বা কি? প্রবৃত্তির উদয় হইলেই যে ভয়ে ভয়ে তাহার বিবাহ দিতে হইবে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। কি স্ত্রী কি পুরুষ, আমরা সকলেরই মধ্যে মনুষ্যত্ব

* Vide Criminal Law Ammendment Act 1885.

দেখিতে চাই। প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া জীবন যাত্রা পশুতেই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তবে পশুতে আর মানুষে প্রভেদ কোথায়? যদি প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে না পারিল, যদি প্রবৃত্তির হস্ত হইতে স্বাধীন হইতে না পারিল, তবে মনুষ্য কোন্ গুণে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? যে সমাজ বা জাতির রীতি নীতি প্রবৃত্তি সংযমের সহায়তা না করিয়া বরং প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অনুকূল, তাহার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। অসংযমী পিতা মাতার সন্তান যে অধিকতর অসংযমী হইবে এবং এই প্রবৃত্তি-প্রবণতা বংশ পরম্পরা ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত জাতিকে প্রবৃত্তির দাস করিয়া ফেলিবে, ইহা জীবতত্ত্ব অকাট্য রূপে সংস্থাপিত করিয়াছে। অন্য পক্ষে, সংযমী পিতা মাতার সন্তান যে অধিকতর সংযমী হইবে ও ইহার ফল যে জাতীয় নৈতিক উন্নতি, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। যে জাতি অধিকতর সংযমী তাহারা যে নিশ্চয়ই একদিন অপেক্ষাকৃত অসংযমী জাতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎস্থান অধিকার করিবে, তাহা বিবর্ত্তনবাদের একটি মূল সত্য। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে আমাদের স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব লোপের আশঙ্কা অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু এ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। বাল্য বিবাহ উঠিয়া গেলে আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তৃতির বহুল সুবিধা হইবে এবং যদি শুদ্ধ মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে যে তাহার ফল অত্যন্ত শুভকরী হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুশিক্ষাতে যে নীতি বিশুদ্ধ হয়, তাহার প্রমাণ আধুনিক শিক্ষিত যুবকবৃন্দ। শিক্ষিত যুবকেরা যে অশিক্ষিত যুবকদের অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিকতর বিশুদ্ধ নীতি সম্পন্ন, তাহা কি কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিতে পারেন? আর যে চরিত্র আত্মসংযমের ফল নহে—যাহাকে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে রক্ষা করিতে হয়, সে চরিত্রের, সে সাধুতার আবার মূল্য কি? যাঁহারা পবিত্রতার দোহাই দিয়া বাল্যবিবাহ সমর্থন করেন, আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, যে হিন্দু রমণীর সতীত্ব জগদ্বিখ্যাত, যে সতীত্বের প্রশংসা গীতি গান করিতে তাঁহাদের রসনা সহস্রগুণ বেগবতী হয়, তাহা কি এত অসার, এত ক্ষণভঙ্গুর—হিন্দু রমণী কি বাস্তবিকই এত দূর প্রবৃত্তি প্রবণ যে, সময় ও সুবিধা পাইলেই তিনি সে সতীত্ব রত্ন বিক্রয় করিবেন? যদি বাস্তবিক তাহাই হয়—তবে আমরা সে ঝুটা মাল, সে কৃত্রিম সতীত্ব চাই না।

আর্য্য ঋষিরা বিবাহের যে আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, আমরা সে আদর্শের পক্ষপাতী। দেখা যাউক, বাল্যবিবাহ দ্বারা সে আদর্শ সফল হইতে পারে কিনা। আর্য্যশাস্ত্রেই স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী—একত্রে ধর্ম্মযাজন করিবেন বলিয়া, ধর্ম্মযাজনের সহায় হইবেন বলিয়া তাঁহারা বিবাহ করিতেন, ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। যদি স্ত্রী সহধর্ম্মিণীই হন, তবে বাল্য বিবাহ কখনই সে আশা সফল করিতে পারে না। যাহার ধর্ম্মভাব বিকশিত হয় নাই, যাহার ধর্ম্মভাব বিকশিত হইবে কি না তাহারই ঠিক নাই, তাহাকে সহধর্ম্মিণীর জন্য গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেকে হয়ত বলিবেন "কেন? স্বামী শিক্ষা দিয়া সুকুমার মতী স্ত্রীর অন্তঃকরণকে যে ভাবে ইচ্ছা

গঠিত করিয়া লইতে পারেন। স্বামীর নিজের যদি ধর্ম্মভাব থাকে, তিনি স্ত্রীর অন্তরেও সেই ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিতে পারেন ও তাহার ধর্ম্ম নিজেরই অনুরূপ করিয়া লইয়া একত্রে ধর্ম্মযাজনের অধিকতর সুবিধা হইতে পারে। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে এরূপ অনুরূপ ধর্ম্মভাব ও মত-সম্পন্ন একটি স্ত্রী প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব না হইলেও সুদুষ্কর, কিন্তু বাল্য বিবাহের দ্বারা এ সমস্ত অসুবিধা নিরাকৃত হইতেছে। এখানে স্বামীই স্ত্রীর ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম মতের বিধাতা।" এই যুক্তিটি আপাততঃ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই ইহার অসারত্ব প্রতিপাদিত হইবে। এই যুক্তিটিতে শিক্ষা ও অবস্থাকেই সর্ব্বে সর্ব্বা মানিয়া লওয়া হইয়াছে ও মানব শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি রাজিকে অস্বীকার করা হইয়াছে। মানব-শিশু জন্মকালে কতকগুলি শক্তি বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা দ্বারা ও অবস্থা ভেদে তাহাই অল্লাধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়া থাকে, এবং এই সকল বৃত্তি বা শক্তি যে জন্মকালে সকলের সমান থাকে না, তাহা হিন্দুর পূর্ব্ব সংস্কার-বাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের পৈতৃক সংস্কার-বাদ (Heriditary aptitude) সপ্রমাণ করিতেছে। শিক্ষা ও অবস্থা ভেদে ইহাদের বিকাশের তারতম্য হয় বটে, কিন্তু সহস্র শিক্ষা ও অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহাদের যথেচ্ছা বিকাশ বা নিরোধ সম্ভবপর নহে। একটি মানব শিশুর পক্ষে শিক্ষা ও অবস্থা যাহা, একটি সর্ষপ বীজের পক্ষে মৃত্তিকা ও জলবায়ু প্রভৃতিও তাহাই ; উপযুক্ত অবস্থায় পড়িলে অর্থাৎ উপযুক্ত রূপ মৃত্তিকা, জল, বায়ু, আলোক ও উত্তাপ পাইলে সেই বীজ হইতে একটি সর্ষপ গাছই উৎপন্ন হইবে, অন্য কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না, এবং যে গাছ উৎপন্ন হইবে, তাহারও আকার পরিমিত ;—অবশ্য সকল দিক সুবিধা হইলে অন্যান্য গাছ হইতে অপেক্ষাকৃত বড় হইবে বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই যথেচ্ছা বড় করা যাইতে পারে না। যাহার অন্তরে ধর্ম্মের সংস্কার নাই বা অতি অল্পই আছে, তাহাকে শত শিক্ষা দ্বারাও পরম ধার্ম্মিক করা যায় না। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে বাল্য বিবাহ দ্বারা যে আধ্যাত্মিক বিবাহের উদ্দেশ্য সফল হওয়া স্বপ্নে মেওয়া খাওয়ার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল।

হিন্দুর এই আদর্শ বিবাহের এক দিক যেমন আধ্যাত্মিক, অপর দিক তেমনই সামাজিক। যাহাতে সুসন্তান হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে ও সমাজ রক্ষা করিতে পারে, এই কামনায় তাঁহারা বিবাহ করিতেন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" "প্রজায় গৃহমেধিনাং" প্রভৃতি বাক্য এই মহানীতিই সংস্থাপন করিতেছে। সন্তানের ও সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়াই তাঁহারা সন্তানের জন্ম বিধান করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, সন্তানের জন্ম কালে পিতা মাতার মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর ভাবী সন্তানের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাই তাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, গভীর ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া সন্তানের জন্ম বিধান করিতেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক সন্তান হইয়া সমাজের ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করে। প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া সন্তানের জন্ম বিধান করা বা

ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য নিষ্ফল স্ত্রী-সঙ্গমকে তাঁহারা মহাপাতকের মধ্যে গণনা করিতেন। বাল্য বিবাহ দ্বারা এ আদর্শ কদাপি ফলবতী হইতে পারে না। যৌবনের প্রারম্ভে ইন্দ্রিয়গণ নিজের আবেগেই উচ্ছৃঙ্খল—তৎকালে এরূপ ইন্দ্রিয় সংযম, বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির সুবিধা বর্ত্তমান সত্বে, কখনই সম্ভবপর নহে। যখন এই উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয় শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব দ্বারা কথঞ্চিৎ সংযত হইয়াছে, অন্ততঃ যখন ইন্দ্রিয় সংযমনের আবশ্যকতা ও এই আদর্শ সফল করিবার বাসনা প্রবল হইয়াছে, তখনই বিবাহ করা উচিত। সকলের পক্ষে এ আদর্শ সফল করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু সমাজের বিধি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সকলেই ইন্দ্রিয় সংযত করিতে চেষ্টা করে। বাল্য বিবাহ ইন্দ্রিয় সংযমের সহায়তা না করিয়া তদ্বিপরীতই করিয়া থাকে, সুতরাং ইহা সর্ব্বথা দূষণীয়।

বাল্য বিবাহের মধ্যে একটি ঘোর দুর্নীতি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মাণ লোকের হাতেও হঠাৎ ধরা পড়ে না। ক্রীতদাসত্বের অর্থ কি? না, এক জনের সমস্ত কার্য্য, তাহার শরীর মনের সমস্ত শক্তি অপরের ইচ্ছা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত হওয়া—নিজের শরীর মনের উপর দ্বিতীয় ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শক্তি না থাকা। দাস বিক্রয়ের অর্থ কি? না, কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা ইচ্ছা শক্তি বিকাশের পূর্ব্বে তাহার স্বাধীনতা বিক্রয় করা—তাহার শরীর মনের সমস্ত শক্তির উপর অপরের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া, যে অধিকার হইতে শত চেষ্টাতেও পুনরায় তাহার হৃত স্বাধীনতা উদ্ধার অসম্ভব। ইহারই নাম দাসব্যবসায়। যে দেশের আইন, যে দেশের লোকাচার এরূপ প্রথার সমর্থন করে, সে দেশের লোকও যে অন্তরে ক্রীতদাস, তাহারা যে মানবের মহত্ব, মানবের স্বাধীনতার মূল্য কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহাদের নৈতিক চক্ষু একটু মাত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারা বাল্য বিবাহের মধ্যে ছদ্মবেশী এই দাস ব্যবসায় অবশ্যই দেখিতে পাইবেন। বাল্য বিবাহের অর্থ এই যে, নিজের বিচার শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে, ভাল মন্দ বুঝিবার পূর্ব্বে একটি (তাহার নিকট) অজ্ঞাতশীল লোকের নিকট একটি বালিকার সমস্ত স্বাধীনতা চির দিনের জন্য বিক্রয় করা, তাহার শরীর মনের উপর ভোগ দখলের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া; যাহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করা আর অলঙ্ঘ্য অদৃষ্টের বিরুদ্ধে চেষ্টা করা তাহার পক্ষে একই কথা। কিন্তু আমাদের দেশের আইন, আমাদের দেশের লোকাচার, আমাদের দেশের শাস্ত্র স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার দেয়, তাহা কঠোরতম দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাল্য বিবাহ দ্বারা পিতামাতা কন্যাকে এই দাসত্ব বন্ধনে চির দিনের জন্য বদ্ধ করিয়া দেন। অবশ্য এতদ্দ্বারা আমার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, সকল স্ত্রী সকল স্বামীর নিকট ক্রীত দাসের ন্যায় দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বরং আমরা অনেক স্থলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ দেখিতে পাই। অনেক স্থলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সদ্ব্যবহার ও প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের যুক্তি একটুও হীনবল হয় না। দাসত্বের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা ক্রীত দাসের সহিত প্রভুর গভীর বন্ধুত্বের, দাসের প্রতি

প্রভুর সস্নেহ ব্যবহারের শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তদ্দ্বারা কি দাসত্ব প্রথার ন্যায়-যুক্ততা প্রমাণিত হয়? ইহা কেবল চর্ম্মাবৃত ক্ষত স্থানের ন্যায় রোগ নির্ণয়ের ব্যাঘাত জন্মায় মাত্র। যদি কোন কোন ঘটনায় এরূপ সদ্ব্যবহার না হইত, তাহা হইলে ইহার ন্যায়-বিরুদ্ধতা সকলেরই নিকট প্রতীয়মান হইত ও ইহার সংস্কারেও এরূপ ব্যাঘাত হইত না। দাসত্ব প্রথার প্রকৃত দোষের স্থান ইহা নহে যে, কোথাও অত্যাচার হয় কিনা, কিন্তু অত্যাচারের সম্ভাবনা আছে কি না; প্রভু ইচ্ছা করিলে দাসকে বা স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে অত্যাচার করিতে পারে কি না, দেশের আইন, লোকাচার বা শাস্ত্র, প্রভু বা স্বামীকে এরূপ অত্যাচারের অধিকার দেয় কি না। আমাদের দেশে স্ত্রীর শরীর মনের উপর স্বামীর অধিকারের ইয়ত্তা নাই—স্বামীর যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন, স্ত্রীর তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই, যদি স্বামীর কোন কার্য্যে স্ত্রীর আপত্তি থাকে, যদি স্ত্রী বিশেষ কারণ সত্ত্বেও স্বামীর অবাধ্য হন, স্বামী আইন বলে স্ত্রীকে স্বীয় অধিকারে আনিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর এরূপ কোন অধিকার নাই। আমাদের দেশের শাস্ত্রবিধি এই যে স্ত্রী কর্কশভাষিণী হইলেই স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু অপর পক্ষে স্বামী দুঃশ্চরিত্র হইলেও স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, পরিত্যাগ করিলে আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র, আমাদের দেশের লোকাচার, আমাদের দেশের আইন জোর করিয়া সেই স্ত্রীর শরীর মনের উপর সেই স্বামীর অধিকার দেয়, যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া, সুস্থমনে আপন ইচ্ছায় এরূপ দাসত্বের মধ্যে প্রবেশ করে, আপন শরীর মনের উপর অপরকে সম্পূর্ণ অধিকার দেয়, তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি নাই; তবে আমরা তাহার অবস্থাকে নিতান্ত শোচনীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু যেখানে কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা কাহারও অজ্ঞাতসারে অন্য কেহ তাহার স্বাধীনতা বিক্রয় করে, তাহার শরীর মনের উপর অপর কাহাকেও সম্পূর্ণ অধিকার দেয়, তবে আমরা তাহাকে ঘোর দুর্নীতি, ঘোর পাপাচার বলিয়া মনে করি। যে দেশের শাস্ত্র বিধি, যে দেশের রাজবিধি এরূপ পাপাচারের সমর্থন করে, আমরা সেরূপ শাস্ত্র বিধি বা সেরূপ রাজবিধিকে সয়তানের প্রণীত বলিয়াই মনে করি। যে দেশের লোক এরূপ ঘোর দাসত্বের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের কথা আর কি বলিব—তাহাদের ন্যায়জ্ঞান যে বর্ব্বরজাতি অপেক্ষাও হীন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। এখনও হয় ত কেহ কেহ আপত্তি করিবেন যে, দাসত্বের সহিত বাল্য বিবাহের তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিবাহ কালে বালিকারা যদিও তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারে না কিন্তু বড় হইয়া যখন তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারে তখনও তাহারা নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট নহে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা হৃত হয় নাই। আপত্তিটি যতই অসার হউক না কেন, ইহার নিরাসন হওয়া প্রয়োজন, একটি প্রতিপ্রশ্ন দ্বারা এ আপত্তিটি নিরাকৃত হইতে পারে। আচ্ছা, যাঁহারা নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট, তাঁহারা কি স্বীয় স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন? তাঁহারা কি এই দাসত্ব হইতে

মুক্ত হইতে পারেন? আপত্তি-কারীরা বোধ হয় ইহাতে সম্মতি দিবেন না। তাহা হইলে শ্রীমতী রুক্মা বাইকে লইয়া এত গোল যোগ চলিতেছে কেন? রুক্মা বাইর উপর আমাদের সমাজ কর্ত্তারা এরূপ খড়্গ হস্ত কেন? আর অনেকেই যে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট নহে,তাহার কারণ এই যে, অভ্যাস বশতঃ তাহাদের নিজ অধিকার জ্ঞান এত দূর মলিন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের ন্যায়-জ্ঞান এতদূর অপরিস্ফুট রহিয়াছে যে,তাহারা নিজের অবস্থা বুঝিতে অক্ষম। ইহাদের মধ্যে অনেকে নিজের অবস্থায় এত দূর সন্তুষ্ট যে, তাহারা সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত নহে। অজ্ঞানতাই যে তাহার কারণ, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। জীব প্রকৃতিতে স্থিতি শীলতার একটি ভাব রহিয়াছে, তদ্দ্বারা যে যে অবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সেই অবস্থার প্রতি একটি আসক্তি জন্মিয়া থাকে ও সেই আসক্তির জন্য সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে তাহার কষ্ট হয়। ইহারই প্রভাবে একটি পাখীকে বহু দিন পিঞ্জর বদ্ধ করিয়া রাখিলে পিঞ্জরই তাহার প্রিয় স্থান হইয়া পড়ে, মুক্ত করিয়া দিলেও সে আর সে পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া আকাশের মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে না। কাহাকেও বহুদিন যাবৎ অন্ধকার গৃহে বদ্ধ রাখিলে অন্ধকারই তাহার প্রিয় হইয়া পড়ে,সে আর আলোক সহ্য করিতে পারে না। বিখ্যাত চীন দেশীয় কারাবাসীর গল্প তাহার প্রমাণ। জঘন্য দাসত্ব যে অভ্যাস বশতঃ মানবের কত প্রিয় হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমেরিকার দাস ব্যবসা নিবারণের সময় পাওয়া গিয়াছে—তখন অনেক দাস দাসত্ব প্রথা রক্ষার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল। মানব প্রবৃত্তির এই আশ্চর্য্য Adaptibilityর ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে কেন? আমাদের স্ত্রীলোকদের কেহ কেহ যে অন্তঃপুর কারাগারের রুদ্ধ বায়ু পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু সেবনে পরাঙ্মুখ, ইহাই তাহার অন্যতর প্রমাণ। মানব প্রকৃতিতে এই adaptibilityশক্তি আছে বলিয়াই কি কারাগার অন্ধকার বা দাসত্ব দোষশূন্য হইল? তথাপি এরূপ করা আমাদের দেশের শিক্ষিত (?) লোকের মুখেও শুনা যায়। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

আমরা এপর্য্যন্ত বাল্য বিবাহের ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, এখন সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ মাত্র করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বিবাহের যে যে উদ্দেশ্য, বাল্য বিবাহ দ্বারা তাহার কোনটিই সফল হয় না, বিবাহের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, মানব সমাজ রক্ষা, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, বাল্য বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল বর্ত্তমান ও ভাবী বংশের শারীরিক অবনতি, অর্থাৎ জাতীয় দুর্ব্বলতা,ও তাহার চরম ফল জাতীয় উচ্ছেদ। বাল্যে জনন শক্তির বিকাশ ও পরিচালনে অপরিপক্ব স্নায়ু মণ্ডলের দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী ও তাহার অবান্তর ফল জাতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্য। বাল্য বিবাহ বালক বালিকাগণের মনকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিয়া শিক্ষালাভের পক্ষে বিষম কণ্টক স্বরূপ হয়। অনেকের পক্ষে, বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির পক্ষে বিবাহই শিক্ষার দ্বারে অর্গল স্বরূপ হইয়া তাহাদের জীবনকে পশু জীবনে পরিণত করে। কাহাকেও বা বাল্য বিবা-

হের কল্যাণে অপরিণত বয়সেই সংসারের দুর্ব্বহ কর্ত্তব্য ভার মস্তকে করিয়া দারিদ্র্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয় ও জীবনের যাবতীয় উচ্চ আশা, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত দরিদ্রতার চরণে বলি দিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়। ইহার অবান্তর ফল মসীজীবীর ব্যবসা ও জাতীয় কাপুরুষত্ব ও পরাধীনত্বের চরম সীমা। এই অশিক্ষা বা অল্প শিক্ষার ফল যে কেবল জাতীয় আর্থিক দারিদ্র্য, তাহা নহে, জাতীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি দরিদ্রতাও বটে।

বাল্যবিবাহের আর একটি অনিবার্য্য-ফল, একান্নবর্ত্তী পরিবার। ইহার অর্থ এই যে, পিতামাতা বা তত্তুল্য কোন গুরুজনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও আত্মনির্ভরের অভাব। ইহার বিষময় ফল, জাতীয় আলস্য ও দরিদ্রতা এবং পারিবারিক অশান্তি ও সন্তানাদির কুশিক্ষা। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বাল্যবিবাহ বালবিবাহিত ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ সাধন না করিয়া (যেমন অনেক অদূরদর্শী ব্যক্তি আশা করিয়া থাকেন) বরং তাহাদের নৈতিক অবনতি বিধানই করিয়া থাকে। বাল্য বিবাহ ইন্দ্রিয় সংযমের সহায়তা না করিয়া বরং ইহাকে উচ্ছৃঙ্খল-মার্গ-বিহারী করিয়াই তুলে, এবং প্রবৃত্তির দাসত্বে অভ্যস্ত করিয়া অবশেষে সমস্ত জাতিকে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির ক্রীত দাস করিয়া ফেলে। শৈশবে বিবাহ হইলে সন্তান প্রতিপালন ও সন্তানের শিক্ষা যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ। বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রাণের মিলন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের সখা। তাহাদের এই সখিত্বের মূলে উভয়ের ভাবের ও অবস্থার সামঞ্জস্য সুতরাং এই সখিত্ব স্থাপনের পূর্ব্বে পরস্পরকে সুন্দররূপ জানাও একান্ত আবশ্যক। বাল্যবিবাহ দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। শৈশবে বিবাহ হইলে পতি পত্নী নির্ব্বাচনের ভার অপরের হস্তে থাকিবেই থাকিবে এবং এরূপ পদ্ধতির ফল প্রাণের মিলন নহে, শারীরিক মিলন। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া আর্য্য ঋষিরা বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ দিয়া গিয়াছেন, বাল্যবিবাহ দ্বারা সে আদর্শ কোন মতেই সফল হইতে পারে না, ইহা আমি সুন্দররূপ দেখাইয়াছি। বাল্যবিবাহের মূলে যে ঘোর দাসত্ব প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। অতএব আমরা যেদিক হইতেই দেখি, বাল্যবিবাহের ফল বিষময়—নৈতিক দুর্গতি—জাতীয় অধঃপতন।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।
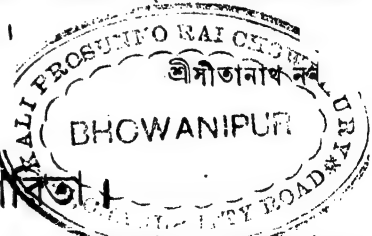
বিজ্ঞানের উপকারিতা।

বিজ্ঞানের আলোচনায় অতি অল্প লোকই নিযুক্ত আছেন। অধিকাংশ মনুষ্য, ইহার অনুশীলন কষ্টসাধ্য, ব্যয় সাপেক্ষ ও অপ্রীতিকর বলিয়া বিবেচনা করেন। বিজ্ঞানের উপাসনা অর্থাগমের তাদৃশ সু-পন্থা নহে মনে করিয়া, অনেকে ইহার নিকট হইতে দূরে দূরে ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন। ইহার শিক্ষায় যে পরিমাণ সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, তদনুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, সন্দেহ করিয়া,

আবার কেহ কেহ ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বিদ্যা মাত্রেরই শিক্ষার প্রথমাবস্থা কৃচ্ছ্র-সাধ্য, নীরস ও অপ্রীতিকর। কিন্তু ইহার ভিতর যতই অগ্রসর হওয়া যায়, পথ ততই কুসুম সমাকীর্ণ ও সুগম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। বিজ্ঞানালোচনা আপাত বিরস হইলেও পরিণাম মনোরম। একথা সকলেরই স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য যে, ইহার অনুশীলনে আমরা যাদৃশ সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইতে পারি, এমন আর কিছুতেই নহে। ইহা দ্বারা নিজের, স্বজাতির ও স্বদেশের যতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়, আর কোন বিদ্যার দ্বারা ততদূর সম্পন্ন হয় না। যিনি বিজ্ঞান-সম্ভূত পরম পবিত্র আনন্দ রাশি উপভোগ করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাকে এই মহাসমুদ্রে রত্নাহরণ জন্য নিমগ্ন হইতে হইবে। শুদ্ধ উপরে সন্তরণ করিয়া বেড়াইলে, কেহই এই অমূল্য রত্নলাভে সিদ্ধ-কাম হইতে পারিবেন না।

পূর্ব্বতন ও অধুনাতন পাশ্চত্য দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের গৌরব-তপন লর্ড বেকনই এই মহা বিস্ময়কর বিপর্য্যয় সংঘটন করিয়াছেন। বেকনের সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে (Philosaphy)র দুইটী মুখ্য উদ্দেশ্য,—মানব জাতির হিত সাধন (Utility) ও মানব জাতির উন্নতি বিধান। (Progress) প্লেটো, সেনেকা প্রভৃতি গ্রীশদেশীয় মহা-মহোপাধ্যায়, অতি পূর্ব্বতন দার্শনিক পণ্ডিতগণ যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমুৎসুক ছিলেন সত্য বটে; কিন্তু তাঁহারা কখন সে সমস্ত জ্ঞান মানবজাতির বাহ্য সুখ সম্পদ বিধানার্থ প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যদি কেহ কখন সমাজের হিত-সাধনোদ্দেশে ইহাদের ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, অমনি অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহার উপর খড়্গ হস্ত হইয়া দাঁড়াইতেন; এবং তাঁহাদের পরম প্রিয় দর্শন-শাস্ত্র, ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও বিরক্ত ভাবে অবস্থান করিতেন। খিলামের প্রথম প্রবর্ত্তক ডিমোক্রিটাস (Democritus) ও কুম্ভকারের চক্র নির্ম্মাতা এ্যানাকারসিস্ (Anacharsis) লোকহিতার্থ বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা যেন ঘোরতর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়া, সেনেকা তাঁহাদিগকে উক্ত অপবাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধে প্লেটো এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—গণিতের আলোচনায়, নিত্য ও শুদ্ধ সত্যগুলি হৃদয় মধ্যে ধ্যান ও ধারণা করিতে শিক্ষা করা যায়, এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া যাবতীয় গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্বে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক আপনাকে ধন্য জ্ঞান করা যায়। কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা গণিতের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা ইহার ঘোরতর পরিপন্থী; তাঁহাদের জ্ঞানানুশীলন বিড়ম্বনামাত্র। কোন সময়, তাঁহার প্রিয় সুহৃদ আর্কিটস (Archytas) জ্যামিতির সাহায্যে একটী ব্যবহারোপযোগী কল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্লেটো বন্ধুর প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট

অনুযোগ করেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আর্কিটস! যে জ্যামিতি শাস্ত্র উচ্চ মানসিক বৃত্তিগুলির পরিচালনে এক মাত্র সহায়, তাহাকে তুমি এরূপ জঘন্য কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ? একার্য্য সূত্রধর ও কর্ম্মকারদিগেরই পক্ষে শোভা পায়; দার্শনিক পণ্ডিতগণের নিকট ইহা অতীব হেয় ও অশ্রদ্ধেয়।" বেকনের মত ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তিনি মুক্ত কণ্ঠে জগৎ সমীপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, "এইরূপ লোক-হিতকর কার্য্যেই জ্যামিতি শাস্ত্র প্রধানতঃ প্রযুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।" জ্যোতিষ সম্বন্ধে সক্রেটিশ বলিয়াছেন—"বার, তিথি, মাস, বৎসর, গ্রহণাদি নির্ণয়োদ্দেশে অথবা জলপথে গমনাগমনের সুবিধার জন্য ইহার সাহায্য গ্রহণ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এই সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ের অতীত স্থানে অধিগমনই জ্যোতিষের লক্ষ্য। জ্যামিতির সত্য যেরূপ চিত্রের মধ্যে আবদ্ধ নহে, প্রত্যুত উহার বহির্ভূত; সেইরূপ জ্যোতিষিক সত্যও নক্ষত্র নীহারিকার অতীত।"

যে বর্ণমালার উদ্ভাবনে মানব সমাজ দিন দিন উন্নত ও সভ্য পদবীতে অধিরোহণ করিতেছে, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও সত্য গুলির বিনিময়-বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের মহোপকার সাধিত হইতেছে, তুমি আমি সহস্র যোজন ব্যবহিত থাকিয়াও পরস্পরের হৃদয়-কাব্য অনায়াসে পাঠ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি, সেই পরম পবিত্র, মহা-হিতকর কার্য্য প্লেটোর অনুমোদিত নহে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"যদি বর্ণমালা উদ্ভাবিত না হইত, তাহা হইলে চিন্তা ও ধীশক্তির বিশেষ পরিচালনা দ্বারা মনুষ্য মানসিক বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি বিধান করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বর্ণমালার সৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত, যাবতীয় জ্ঞান, পত্র ও কাগজ-পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় বলিয়া, মানব হৃদয় পটে তাহার ছায়া অল্পই পতিত হইয়া থাকে। এখন কোন বিষয় মনে রাখিবার তাদৃশ প্রয়োজন হয় না। সুতরাং স্মরণ শক্তি তেজস্বিনী করিতে আর কেহই পূর্ব্বের ন্যায় প্রয়াস পান না। এরূপ বিদ্যা কেবল বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ।" বেকন বলিয়াছেন, "স্মরণ শক্তির অসাধারণ পরিচালনে মানুষের কোন বিশেষ ফল লাভ হয় না। বাজিকর অদ্ভুত কৌশল বলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে এরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে অভ্যাস করে যে, সে অনায়াসে রজ্জুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া অথবা উপবেশন করিয়া নানাবিধ বিস্ময়কর ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিতে পারে। আমরা তাহার কৌশল ও নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া যাই, কিন্তু তাহাকে কখনই শ্রদ্ধা করি না।" চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্লেটো বলিয়াছেন,—"কোন অভিনব অথবা আকস্মিক রোগ বা আঘাতের প্রতিকার একান্ত বিধেয়। কিন্তু দীর্ঘকাল-ব্যাপী ও ব্যভিচার জনিত পীড়া-গ্রস্ত হতভাগ্যের আরোগ্য কদাপি প্রার্থনীয় নহে। কি সমরাঙ্গণে, কি রাজ-সভায়, কি নিকেতনে, কি বিদ্যামন্দিরে, কোথাও চিররুগ্ন ব্যক্তির কার্য্যকারিতা লক্ষিত হয় না। এরূপ লোকের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।"

প্লেটোর মতে, মনুষ্যকে ধর্ম্মপরায়ণ করা, রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। বেকন লিখিয়াছেন,—"মনুষ্য যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণই রাজনীতির মুখ্য অভিপ্রায়।

সমাজান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মোন্নতির উপর সমাজের সুখ শান্তি নির্ভর করে। সুতরাং ধর্ম্ম ও নীতির বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে সযত্নে রোপণ করা সামাজিক মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে দেশ, বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষিত হয়, রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম স্থাপিত হইতে পারে, রাজস্ব, বিচার, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগে রাজ-কর্ম্মচারিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতগণের প্রাণপণে সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। ইহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে, এবং সর্ব্বসাধারণে স্ব স্ব সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।" মেকলে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন,—সমুদয় অভাবের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, যাহাতে মনুষ্য ক্রমশ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, দেব-পদবী লাভ করিতে পারেন, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণের ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু বেকনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে, মনুষ্য যতদিন মনুষ্য থাকিবেন, ততদিন তাহার অভাব মোচন করা আবশ্যক। এবং যাহাতে তিনি সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য চেষ্টা প্রার্থনীয়। প্লেটোর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু ইহা কখন মনুষ্যের আয়ত্ত হইবে কিনা, সন্দেহ। বেকনের উদ্দেশ্য সহজেই ফলপ্রদ হইবে। প্লেটো প্রভৃতি মহা মনীষীগণ শরাসনে শর যোজনা করিয়া নভোমণ্ডলস্থ তারকাবলী বিদ্ধ করিবার জন্য শর ক্ষেপ করিলেন। কিন্তু (তাঁহাদের শক্তি ও নিপুণতার অভাব ছিল না,) দুর্ভাগ্য বশত সমুদয় লক্ষ্যই ব্যর্থ হইয়া গেল। শর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বেকন পার্থিব পদার্থ লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অনায়াসেই তাঁহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। প্লেটো প্রভৃতির দর্শন শাস্ত্র বাক্যে আরম্ভ হইয়া বাক্যেই পর্য্যবসিত হইল। বেকনের দর্শন পর্য্যবেক্ষণে আরম্ভ হইয়া কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতের দর্শন শাস্ত্র ও পূর্ব্বতন ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পরাধীন ভারতে দর্শনের আলোচনা নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না। বহুকাল অধীনতার কাল রাত্রির মধ্যে বাস করিয়া ভারতের প্রদীপ্ত প্রতিভা ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে। সময় সময়, রঘুনাথের ন্যায় নক্ষত্র ইহার অদৃষ্ট গগনে উদিত হইয়া দিগন্ত আলোকিত করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা দুই একটী মাত্র। নব্যভারত পাশ্চাত্য দর্শন স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। Utility ও Progress আধুনিক ভারতের লক্ষ্য। এক্ষণকার পশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্য—জ্ঞান বিশেষ। কি পদার্থ তত্ত্ব, কি সমাজ-তত্ত্ব, কি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য। এক্ষণে দর্শনের চক্ষে বিজ্ঞানের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আজি কালি বিজ্ঞানের চক্ষে সকলই বিজ্ঞান দেখাইতেছে। ভাষা বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ এক্ষণে পূর্ণ। যাহা কিছু দেখিতেছি বা শুনিতেছি, সমস্তই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ভিন্ন আর কথা নাই। বিজ্ঞান সর্ব্বগ্রাসী। এরূপ বিজ্ঞান বা দর্শনের কথা বলা আমার সাধ্যাতীত। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা,—এই চারিটী বাহ্য বিজ্ঞানের মধ্যে অদ্য

শেষোক্ত দুইটীর বিষয় কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি।

এই দুটীকে লইয়া বাহ্য জগত। ইহার সহিত মনুষ্যের চিরকাল সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই দুইটী বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিলে আমরা যে কেবল বাহ্য সুখ সম্পদ-লাভে সমর্থ হইতে পারি, এমত নহে, অধিকন্তু মহান্ আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হই। সুবিখ্যাত ফরাসী দর্শনিক অগস্ত কোম্‌তের "Religion of Humanity" ইহার তুলনায় কিছুই নহে, বলিয়া বোধ হয়। ইহার অধ্যয়ন ও আলোচনায় তুমি যে কেবল সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে অভ্যাস কর, তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বভূতে ও সমুদয় পদার্থে তোমার প্রীতি ও সহানুভূতি প্রসারিত হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় বিশাল ও গভীর হৃদয়-সমুদ্রে বাহ্য জগত একেবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। পদার্থ সম্বন্ধে রসায়ন শাস্ত্রের মূল মন্ত্র কি? পদার্থ সৃজন করা যায় না, ধ্বংশ করাও যায় না, পরীক্ষার দ্বারা ইহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এস্থলে এ বিষয়ের দুইটী প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

(১ম) একটী ফ্লাস্কে খানিকটা তুলা রাখিয়া, তাহার মুখ কর্ক দ্বারা আবদ্ধ কর। অনন্তর বৈদ্যুতিক তার কর্কের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া, ওজন কর। তাহার পর কর্ক-প্রবিষ্ট বৈদ্যুতিক তার দিয়া, তাড়িত প্রবাহ প্রদান করিলে, অভ্যন্তরস্থ তুলা প্রজ্জলিত হইয়া, ধূমোৎপাদন করিবে। অল্পক্ষণের পরই উক্ত ধূম অন্তর্হিত হইলে ফ্লাস্কটীকে ওজন করিয়া দেখ, পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট ভারই দেখিতে পাইবে, বৈদ্যুতিক তাপে কিছুই ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পূর্ব্বে তুলাতে যে কয়টী পরমাণু ছিল, এক্ষণেও সেই পরমাণু গুলিই আছে, তবে তাড়িত প্রবাহে তুলার আকারে না থাকিয়া অন্যরূপে আছে, এইমাত্র প্রভেদ।

(২য়)—এক খণ্ড সীসা লইয়া যদি নাইট্রিক য়্যাসিডে নিক্ষেপ করা যায়, তবে উহা দ্রব হইয়া, অদৃশ্য হইবে ; পরে উহাতে হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড যোগ করিলে, একপ্রকার শুভ্র চূর্ণ অধঃপতিত হইবে। এখন যদি ইহা উত্তপ্ত করা যায়, তবে উক্ত চূর্ণ পদার্থ অদৃশ্য হইবে। এক্ষণে এই দ্রব পদার্থে বাইক্রোমেট অব পটাশ দ্রব যোগ করিলে সুবর্ণ চূর্ণবৎ উজ্জ্বল চূর্ণ অধঃপতিত হইবে। ইহা পটাশ দ্রবযোগে পুনরায় অদৃশ্য হইবে। নাইট্রিক য়্যাসিড যোগে সুবর্ণচূর্ণ পুনরায় অধঃপতিত হইবে। এক্ষণে ঐ চূর্ণকে ব্লোপাইপ শিখায় উত্তপ্ত করিলে পুনরায় সীসকচূর্ণ নেত্র গোচর হইবে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, একটী পদার্থ পদার্থান্তর সংযোগে অসংখ্য প্রকার রূপ প্রাপ্ত হইলেও, তাহার পূর্ব্ব পদার্থ অপনীত হয় না। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন না করিলে, পাঠকগণের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম এবং আনন্দজনক হয় না। এখন বলা যাইতে পারে, পৃথিবীর কোন বস্তুই নশ্বর নহে, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। যে সকল বস্তু আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়, তাহা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় না। জড় পদার্থের সম্বন্ধে ইহা যেমন বলা যায়, মনুষ্যাদি সকল প্রাণীতেই,

সেইরূপ ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গুটীপোকা, যখন প্রজাপতির আকার ধারণ করে, তখন কীট রাজ্যের একটি কীট মৃত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কীট রাজ্যের একটী কীট, রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাপতি রাজ্যের একটী প্রজাপতি বৃদ্ধি করিল মাত্র।

ড্র্যাগুণ ফ্লাইর (Dragoon fly) বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। প্রথমাবস্থায় উহা একটী জলচর কীট ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্রমে যখন অবয়বের সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে এক বিচিত্র আকাশ-বিহারী পতঙ্গ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহচর জলচর প্রাণিদিগের নিকট সে মৃত হইলেও, তোমার আমার সমক্ষে সে জীবিত। জীব রাজ্যে এইরূপ শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু প্রাণী মাত্রেই যে ধ্বংশ প্রাপ্ত না হইয়া, রূপান্তর পরিগ্রহ করে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে যে সত্তরটী (৭০টী) রূঢ় পদার্থ আছে, তাহার অধিকাংশ মানব-শরীর-গঠনে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের শরীরের পরমাণু সকল প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পার্থিব অণু পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু একেবারে ধ্বংশ হয় না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সুহৃদের মৃত্যু ঘটনায় মনুষ্য শোকে দুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। প্রিয়তমের সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটিল, স্মরণ করিয়া, তিনি জগৎ শূন্যময় দেখিতে থাকেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ভাবুক ও বিজ্ঞানামোদী, তিনি পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই তাঁহার সেই মৃত প্রিয়জনকে দর্শন করিয়া সুখী হন। বিকশিত কুসুম-জালে বন্ধুর সহাস্যবদন, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত-বৃষ্টি ধারায় তাঁহার অসীম স্নেহ ও করুণা, দূরাগত বিহঙ্গম-কুজনে তাঁহার কণ্ঠস্বর, তরঙ্গিণীর মৃদু নিনাদে তাঁহার সঙ্গীত-ধ্বনি, এবং সায়ংকালে বাসন্তী সমীরণে প্রাণাধিকের অঙ্গ-সৌরভ, দর্শন, শ্রবণ বা অনুভব করিয়া তিনি পরমানন্দে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। সেবায়ুর সহিত বন্ধুর বাস্পীয় পদার্থ সকল মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা এখন তাঁহার নিজের শোণিতের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে দুইটি জড় শরীর স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে একীভূত হইয়া গেল। এরূপ অবস্থায় আর বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কোথায়?

জড় ও শক্তি লইয়া বাহ্য জগত। একটী অপরটী ভিন্ন থাকিতে পারে না। ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। ইহারা প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। যদি কেহ প্রেম শিক্ষা করিতে চাহেন, ইহাদের উপাসক হউন্। আমরা পৃথিবীতে নয়টি প্রধান শক্তির কার্য্যকারিতা দেখিতে পাই :— (১) Cohesion (যোগাকর্ষণ), (১) Adhesion (বিষম-যোগাকর্ষণ), (৩) Chemical affinity (রাসায়নাকর্ষণ), (৪) Universal gravitation (মাধ্যাকর্ষণ,) (৫) Heat (তাপ), (৬) Light (আলোক), (৭) Electricity (তাড়িত), (৮) Magnetism (চৌম্বকাকর্ষণ), (৯) Vital force (জীবন শক্তি)। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটী শক্তির সহিত কোন পদার্থের অণু সকল যতক্ষণ না মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ কোন কার্য্যই লক্ষিত হয় না। Chlorate of Potash (ক্লোরেট অব পোটাশ) ও চিনি

একত্রে উত্তমরূপ মিশ্রিত কর। পরে, গন্ধক দ্রাবকে একটী কাচ-দণ্ড ডুবাইয়া, উক্ত চিনির সহিত সংলগ্ন কর। তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু পরস্পর স্পর্শ না করিলে, এরূপ প্রজ্জ্বলিত হয় না। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ, তাপ, তাড়িত প্রভৃতির কার্য্য দূর হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯৫০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। তথাপি আমরা তাঁহার প্রচণ্ড উত্তাপ বিলক্ষণরূপ অনুভব করিয়া থাকি। জীবনী শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞান, এখনও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। উক্ত শক্তি সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একটী সহজেই, তাপাদি যোগে অপরের আকার ধারণ করিতে পারে। ইহারাও জড়ের ন্যায় অবিনশ্বর। যদিও আমরা শক্তিকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু কার্য্য দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। শক্তি, জড় বস্তুর গতি উৎপাদন করে, অথবা গতিশীল জড় বস্তুকে গতিহীন করে; এতদ্ব্যতীত গতি সম্পন্ন বস্তুর গতি রেখার অভিমুখ পরিবর্ত্তনেও সমর্থ হয়। অতএব গতিই যে, শক্তির একমাত্র পরিচারিকা, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে, যে সকল শক্তির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা সকলেই এই সূত্রের অন্তর্ভূত। যখন কোন একটী শক্তির কার্য্য আমাদের চক্ষের অদৃশ্য হয়, তখন আমরা সেই শক্তিকে অন্য পদার্থে পুনরুজ্জীবিত দেখিতে পাই; অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গতি উৎপাদনে কিয়ৎ কালের জন্য অদৃশ্য হয়। এরূপ স্থলে এরূপ দেখা যায়, যে পরিমাণে গতি উৎপন্ন হইয়াছে, সে গতিকে বিনষ্ট করিলে, পূর্ব্বের শক্তির আবির্ভাব হইবে, অথবা সেই শক্তির পরিবর্ত্তে অন্য শক্তি যথা পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইবে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী বিষয় প্রদত্ত হইল। মনে করুন, অঙ্গার ও অম্লজন,এই দুইটীর রাসায়নিক সংযোগে কার্ব্বনিক য়্যাসিড (কার্ব্বনডাই অক্সাইড) উৎপন্ন হইল। এই সংযোগে যে শক্তি ব্যয়িত হইল,তাপই তাহার পরিচায়ক। যদি আমরা এই তাপে জলকে বাস্প রূপে পরিণত করি, তবে সেই বাস্প, যন্ত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া, যান্ত্রিক তাপোদ্ভাবন করিবে। অর্থাৎ জলীয় বাস্প দ্বারা গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গতির পরিমাণ নিদ্ধারণার্থে উক্ত বাস্প যত সের বস্তু যত হস্ত উর্দ্ধে ধারণ করিতে পারে, তাহার পরিমাণ দেখিয়া স্থির করা যায়। ঐ গতি দ্বারা পুনরায় উত্তাপ উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সকল শক্তির মূলে এক বিশ্বজনীন শক্তি নিহিত আছে। উহা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। উহা বহুরূপী ও সর্ব্বব্যাপী এবং চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকল পদার্থকে রূপ, রস, গন্ধ প্রদান করিতেছে। সূর্য্যকে সকল শক্তির আকর বলিলে অসঙ্গত হয় না। পৃথিবী গর্ভে, যে সমস্ত কয়লার খনি আছে, তাহা বৃক্ষগণের রূপান্তর মাত্র। কোটী কোটী বৎসর, ইহারা সূর্য্য-তাপ ও সঙ্কোচন সহ্য করিয়া অবশেষে খনিজ পদার্থে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপ ভিন্ন বৃক্ষ সকল কখনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কয়লাই ইহাদের প্রধান খাদ্য। পত্রের হরিৎ পদার্থ (Chlorophyll) সূর্য্য-তাপ সাহায্যে বায়ুর কার্বনিক্ য়্যাসিড (Carbonic Acid) হইতে এই কয়লা

সংগ্রহ করিয়া লয়। বাস্তবিক খনিজ কয়লাকে পৃথিবীর অভ্যন্তর-নিহিত সূর্য্য-তাপ-সমষ্টি বলা যাইতে পারে। কোটী কোটী বৎসর পরে সেই কয়লা সূর্য্য-কিরণের পরিবর্ত্তে আমাদিগকে আলোক প্রদান করিতেছে। "ষ্টীম এঞ্জিনের" (Steam Engine) গতি শক্তির মূল কারণই উত্তাপ। বাষ্প উত্তপ্ত স্থল হইতে শীতল স্থলে চালিত হইয়া এই গতি-শক্তি উৎপাদন করে। পৃথিবীকেও একটী উত্তাপ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। নিরক্ষবৃত্তের (Equator) অন্তর্গত ভূভাগে সূর্য্য কিরণ অত্যন্ত প্রখর। এই স্থান Boiler এর কার্য্যকরে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র অতিশয় শীতল। বিষুবরেখার অন্তর্গত ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উত্তপ্ত বায়ু কুমেরু ও সুমেরু প্রদেশে নীত হয়। যে প্রভঞ্জনের ভীম পরাক্রমে গিরি-শৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া যায়, যে মন্‌সুন বায়ু বণিক্‌গণের বাণিজ্য-পোত দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া দেয়, যে বায়ু যন্ত্রে (Wind-mill) শস্য পেষিত ও চূর্ণ হয়,ইহাদের শক্তি কোথা হইতে আইসে? সূর্য্য-তাপ হইতে ইহারা এই বল ও গতি প্রাপ্ত হয়। Water mill এর শক্তির কারণও সূর্য্য। সূর্য্যোত্তাপই জলাশয় হইতে জল আকর্ষণ করিয়া জলীয়-বাষ্প সকলকে মেঘাকারে পরিণত করে। সেই মেঘই বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া, স্রোতস্বতী আকারে পর্ব্বত গাত্র দিয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই স্রোতই Water mill এর চক্রের গতি-শক্তি প্রদান করে।

জীবগণ কোন না কোন প্রকারে সূর্য্য-তাপ লইয়া জীবিত আছে। উদ্ভিদ্‌গণ সূর্য্যকিরণেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহারা সূর্য্যের উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া রাখে। অধিকাংশ প্রাণী উদ্ভিদ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। সুতরাং তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষ ভাবে সূর্য্য-তাপ হইতে শক্তি লাভ করে। আমরা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু খাইয়া প্রাণ ধারণ করি। আমরাও পরোক্ষে সূর্য্যালোক হইতে বল ও শক্তি প্রাপ্ত হই। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। চারিদিতে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। শরৎকালের সায়াহ্নগগনে মেঘমালার বিচিত্র লীলা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। এ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিল? বৃষ্টির পর আকাশমণ্ডলে যে মনোমোহন ইন্দ্রধনু সমুদিত হয়, তাহার মূল-কারণ কে? সন্তান প্রায়ই পিতামাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কুসুম-রাজ্যে ত এরূপ সাদৃশ্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের পিতা-মাতা প্রায় সকলেই হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। তবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কুসুম দেখিতে পাওয়া যায় কেন? এ সকলের একই মূল কারণ সূর্য্য। সূর্য্যই এই বিশাল বিশ্ব-মন্দিরকে নানাবিধ বিচিত্র শোভা ও সৌন্দর্য্য পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্যদেব যখন মেঘান্তরালে লুক্কায়িত হ'ন, তখন জগত আঁধার হইয়া যায়, জীবগণের মুখ বিষণ্ণ হয়। কিন্তু যখন মেঘ-শূন্য আকাশে আপন প্রভাজাল বিকীর্ণ করিয়া হাসিতে থাকেন, তখন পৃথিবী আলোকিত হয়; জীবগণের মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করে। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌গণের যেরূপ আবশ্যক, মনুষ্যেরও সেইরূপ। সূর্য্য হইতে আমরা যে উপকার প্রাপ্ত হই, তাহা স্মরণ করিয়া মনুষ্য ইহা না বলিয়া থাকিতে পারে না,—"হে দেব! তুমিই রক্ষক, তুমিই বিশ্ব-চক্ষু ও সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের

জনক। সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের মূলে তুমিই বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমারই উপরী নির্ভর করিয়া সকল অবস্থিতি করিতেছে।” তাই বঙ্গের দার্শনিক কবি হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গাহিয়াছেন :—

“দেব দিবাকর, অন্ধকার-হর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, প্রেমের আকর,
কেন না তোমারে নানাদেশে নর
সেবিবে অচল ভকতি-ভাবে ?

* * * *

এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি,
ওহে বিশ্ব-বীজ গগন বিচরি
করিতেছ কাজ দিবস শর্ব্বরী,
প্রকাশি বিবিধ প্রকার বল।
জীব কি উদ্ভিদ তব অবতার,
বহ্নির শকতি তোমার বিকার,
জল কিম্বা স্থল সকল আঁধার,
তুমি অবনীর এক নয়ন।
তুমি মেঘ করি বরষিছ জল,
তুমি কৃষী রূপে ধরিতেছ হল,
গো-মূর্ত্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
তুমি শস্য রূপে পুনঃ উদিত।
তুমি নর হয়ে গড়িতেছ কল,
তাহা চালাইতে লাগে যে যে বল,
বিজ্ঞানেতে বলে, তুমি সে সকল,
তোমার মহিমা অপরিমিত।”

সেই জন্য,পূজ্যপাদ ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ, “ওঁ ভূর্ভুবস্ব তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ” * বলিয়া তোমারই স্তব করিতেন। অদ্যাপিও ব্রাহ্মণগণ ইহা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। ইহাই এখন গায়ত্রী নামে বিখ্যাত। আজিও ব্রাহ্মণগণ মনে করেন, গায়ত্রী পাঠে অন্তঃকরণ পবিত্র হয়, সমস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু “প্রচারে” সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, “সবিতা” সূর্য্য পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরব্রহ্ম নহে।

শুনিয়াছি, প্রকৃতির সহিত কবিদের বড় নৈকট্য সম্বন্ধ। আমাদের বিবেচনায়, যে কবিরা বিজ্ঞানের আলোচনা করেন না, তাঁহারা সম্পূর্ণ কবি নহেন। বৈজ্ঞানিক কবিই প্রকৃত কবি। কারণ, যখন স্বভাবের প্রকৃত ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাহার যথাযথ চিত্রাঙ্কনই কবির কবিত্বশক্তির কার্য্য, তখন বৈজ্ঞানিক,—যিনি স্বভাবের চিত্রকর—কেন না তদ্বিষয়ে সফল মনোরথ হইবেন ? বৈজ্ঞানিক কবিরা জগৎকে চর্ম্ম চক্ষুতে দর্শন করেন না, জ্ঞান চক্ষু দ্বারা প্রকৃতির অন্তস্থল পর্য্যন্ত দর্পণ প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির ন্যায় দেখিতে পান। প্রকৃত সৌন্দর্য্য, যাহা পরমেশ্বরের প্রেমময়ী মূর্ত্তিকে দেখাইয়া দেয়, যাহা অন্তরের অন্তর্নিহিত ভক্তিবারির এক একটী প্রবাহ দ্বারা সেই অচিন্তনীয় পরম পিতার পাদ যুগল বিধৌত করিয়া দেয়, যাহা ভাবুকের ভাব সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গায়িত লহরী, তাহা কি কখন জগতের অন্তর্দর্শন ব্যতীত সম্ভবে ? বাস্তবিক প্রকৃত কবিরা অন্তর্জগতেই মুগ্ধ, বাহ্য জগতে নহেন। এখন দেখিতেছি যে, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনায়, যিনি যাহার প্রার্থী, তিনি তাহাই পাইতে পারেন। Utility চান, Utility পাইবেন ; Progress চান, Progress পাইবেন ; অর্থ চান, অর্থ পাইবেন ; প্রীতি চান, প্রীতি পাইবেন। বিজ্ঞানের দ্বারে

* “সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি। যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।” বঙ্কিম বাবু।

আতিথ্য স্বীকার করুন, অবশ্যই আপনার সকল বাসনা চরিতার্থ হইবে। যাঁহারা কহেন, বিজ্ঞান মানব হৃদয়কে কঠিন ও ধর্ম্মশূন্য করে, তাঁহাদের হৃদয় কি কঠিন, তাঁহারা কি অদূরদর্শী? বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ধর্ম্ম বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া, আমরা অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিব। জন কতক আধুনিক বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতের অজ্ঞেয়তাবাদ শ্রবণ করিয়া লোকের এই সংস্কার হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক হইলেই বুঝি মনুষ্য ধর্ম্মশূন্য হয়। আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, যতই মনুষ্য বিজ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে, ততই মনুষ্য ধার্ম্মিক হইবে। আমাদের আর্য্যঋষিগণ বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা ধর্ম্মেরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা জলকে নারায়ণ, বায়ুকে পবন, এবং অগ্নিকে সর্ব্বশুচি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি সামান্য ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক! পণ্ডিতবর ডারউইন যে ক্রমবিকাশ-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেলে না, অধিকন্তু বিশ্বাসীর হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইয়া অবিশ্বাস দূর করে ও প্রীতি বর্দ্ধন করে। পৃথিবীতে যে সকল অপ্রিয়করী ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, তাহার সবিশেষ কারণ, জ্ঞান, ক্রমবিকাশ জ্ঞান সাপেক্ষ। শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইল, ইহা দেখিয়া তুমি আমি হয়ত বলিব যে, জগদীশ্বরের কি অবিচার, আমাদের কি পরিতাপের বিষয়!! কিন্তু কে বলিতে পারে, এ ঘটনা শিশুর মঙ্গলাভিপ্রায়ে সংঘটিত হয় নাই? হয়ত শিশুকে উৎকৃষ্টতর জীবে পরিণত করিবার অভিপ্রায়েই তাহাকে মুকুলাবস্থায় শুকাইয়া ফেলা হইয়াছে। আমরা হয়ত সকলেই ঐ অবস্থায় মরিয়া জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছি। ইচ্ছাময়ের যখন যাহা ইচ্ছা, তখন তিনি তাহাই করিয়া থাকেন। কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা যেমন, তাঁহার হস্তে আমরাও সেইরূপ। এক ভাঙ্গিতেছেন, আর এক গড়িতেছেন। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়া জীব শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, স্বাধীনতা দিয়াছেন; আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। ভাল মন্দ, দুই আমরা করিতেছি। বলা বাহুল্য, যাহা কিছু পরিণাম-সুখকর, সে সকলই ঈশ্বরের অনুমোদিত। যাহা কিছু কষ্টকর, সে গুলি আমাদের অপরিণামদর্শিতার প্রতিফল মাত্র।

অজ্ঞেয়তাবাদী বৈজ্ঞানিকগণকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা কি জানেন না যে, এমন এক দিন গিয়াছে, যখন বিজ্ঞানের অনেক সত্য লুক্কায়িত ছিল? যে সময়, বিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিত না? কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইতেছে। কত নূতন সত্যের আবিষ্কার হইয়াছে। আজি বিজ্ঞান কতই অসাধ্য সাধন করিতেছে। এত উজ্জ্বল উদাহরণ তাঁহাদের সম্মুখে থাকিতেও তাহারা জগৎ কারণের স্বরূপ নিরূপণে এত হতাশ্বাস হন কেন? ঈশ্বর অজ্ঞেয় বলিয়া, তাঁহার সহিত চিরকালের সম্বন্ধ কেন পরিত্যাগ করেন? আজি তিনি অজ্ঞেয় বলিয়া কি চিরকালেই তিনি অজ্ঞেয় থাকিবেন? থাকেন, থাকিবেন;

তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার স্বরূপ নিরূপণে বিরত থাকিব? আমাদের আদিকারণের অনুসন্ধানে যদি আমরা সযত্ন না হইলাম, তবে আর আমরা মনুষ্য কিসের? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া এত চীৎকার করি কিসের জন্য?

মনুষ্য! তুমি নিরাশ হইও না। আজ তুমি ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর পাইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিও না। তুমি, বিজ্ঞানের সাহায্যে, তোমার ঈশ্বরের গূঢ় তত্ত্ব সরল অন্তরে অন্বেষণ কর। চিন্তা দ্বারা প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে যত্নবান হও। তোমার পরিশ্রমের ফল সময়ে ফলিবেই ফলিবে। তুমি সে ফল ভোগ করিতে না পার, তোমার বংশধরগণ তাহা ভোগ করিবে। আর, সেই অজ্ঞাত পরকালে, মানুষের ভোগ করিবার যদি কিছু থাকে, তবে সেখানে তুমি বঞ্চিত হইবে না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, M. R. C. P. (London.)

নব্যবঙ্গ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নব্য বঙ্গ, দুইটী শক্তি-সংঘর্ষণের ফল। ইংরেজি শিক্ষার বহুল বিস্তারে এবং ইংরেজ রাজপুরুষ ও ধর্ম্ম যাজকগণের সংসর্গে অত্যল্প কাল মধ্যেই বাঙ্গালীর কোমল প্রকৃতির উপর দিয়া যেন একটা পরিবর্ত্তনের প্রবল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই স্রোতের তরঙ্গাঘাতে একটী জিনিষ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সেটী কি? সেটী পূর্ব্বতন বঙ্গের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারাদির অভিনয় ক্ষেত্র, বঙ্গীয় প্রাচীন হিন্দু সমাজ। বঙ্গদেশ ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যদিগের উপনিবাস ভূমি। আজ কাল আমাদের পক্ষে আধুনিক না হইলেও, যখন ভারতের প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার স্মরণাতীত কালের কথা ভাবি, তখন তাহার তুলনায় বঙ্গে আর্য্যোপনিবাস নিতান্ত অধুনাতন বলিয়া প্রতীত হয়। যদিও ইয়ুরোপীয় জাতির বর্ত্তমান উপনিবাস ভূমি আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির উপনিবাসীদের মত বঙ্গীয় আর্য্যোপনিবাসীদের মধ্যে মূলজাতি হইতে বিশেষ পার্থক্য ও পরিবর্ত্তন ঘটিবার বহুল কারণ বর্ত্তমান ছিল না, তথাপি পরাজিত অসভ্যদিগের সংসর্গে এবং মূল সমাজ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়াতে, তৎকালীন বঙ্গ সমাজ স্বভাবতই প্রাচীন আর্য্যসমাজ হইতে কিছু বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আবার নূতন স্থানের জল বায়ু প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতির আধিপত্যে, দৃশ্যাদির পরিবর্ত্তনে ধীরে ধীরে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তৎসহকারে সামাজিক পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহুকালে বহুলীকৃত হয়। এই পরিবর্ত্তিত বঙ্গের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা কালে মুসলমানসভ্যতার গর্ভে সমাহিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণ যে পূর্ব্বতন বঙ্গের কথা বলিয়া আসিয়াছি, ইহা বঙ্গের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার সমাধি-স্তম্ভ বা গোর স্থান মাত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতার নূতন পরিবর্ত্তনের প্রবল স্রোতে, সেই মুসলমান

সভ্যতা-জড়িত মৃত প্রায় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে ধুইয়া ধুইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে।

পদ্মানদীর ভাঙ্গন পাড়ের নিকট দিয়া যাঁহারা জল-পথে ভ্রমণ করেন, সর্ব্বদাই তাঁহাদের চক্ষু একটি দৃশ্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এক দিকে পদ্মার গভীরজল-রাশির আবর্ত্ত-ময় স্রোত ও তরঙ্গের অভিঘাত। অপর দিকে ভগ্ন প্রাচীন পল্লীর ভগ্নাবশেষ। স্তরে স্তরে প্রাচীন মলিন মৃত্তিকাস্তূপ। কোন স্থানে বহুকালের ভস্ম ও অঙ্গাররাশি স্তর রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বা কাল হাঁড়ীর কানা খোলা ও নানা প্রকার আবর্জ্জনার স্তর, কি বহু দিনের পুরাতন আস্তাকুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কত সাপের বাসা, শৃগালের গর্ত্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কত পচা পুকুর খানা ডোবা ভরিয়া উঠিয়াছে, কত বন জঙ্গল আগাছা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ফলবান্ তরু সকলও সমূলে উপাড়িয়া পড়িতেছে। গৃহস্থের আশার বাসা ঘর দরজা সমস্তই দুর্দ্দান্ত নদীর গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। কত হাহাকার, চীৎকার, রোদন ও অমঙ্গলের ধ্বনি। দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অনেক সময় গ্রামবাসী বিপন্ন মানুষদের কষ্ট দেখিয়া দর্শকের চোকে জল আসে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা এই অমঙ্গলের মধ্যেও প্রভূত মঙ্গল দেখিয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন।

স্রোতে যে মাটি বহিয়া নিয়া যায়, তাহার অসার লঘু অংশ স্রোতের বেগে বহুদূরে ভাসিয়া যায় অপরাংশ নদীর জলে বাহিত কাঁকর ও বালীর সঙ্গে মিশিয়া জল গর্ভে নূতন চড়ার পত্তন করে। নূতন চড়া কালে জাগিয়া উঠিলে ক্রমে উর্ব্বরা শস্য ও বৃক্ষ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। নব্য-বঙ্গ পদ্মা নদীর গর্ভস্থ এই নূতন চড়ের মতই দুইটী শক্তির সংঘাতোৎপন্ন একটী অভিনব ক্ষেত্র মাত্র। এই ক্ষেত্র একদল লোক নবোৎসাহে মাতিয়া কার্য্য করিতে উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাদের কথা পরে বলিব। নব্য-বঙ্গের প্রকৃতি নির্ণয় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। অগ্রে তাহাই বলিতেছি।

হিন্দু মুসলমান এই দুই বৃহৎ ভিত্তি-মূলের উপরে অভিনব বঙ্গ সমাজ দণ্ডায়মান। সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় অত্যন্ত ন্যূন হইলেও, দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণকে এক বারে উপেক্ষা করিয়া গণনার বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। অর্দ্ধ-ইংরেজ ইয়ুরেশিয়ানগণকেও এই সম্প্রদায় ভুক্ত মনে করাই উচিত। দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করিতে হইলে দেশ বাসী কাহাকেও অবহেলার চক্ষে দেখা উচিত নয়। যে সমাজ বা দেশ, সমাজস্থ বা দেশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ সাচ্ছন্দ্য উপভোগের ও উন্নতি সাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্র নয়, সে দেশের বা সমাজের অকল্যাণের বীজ তাহার গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে, বলিতে হইবে। সুতরাং অত্যন্ত সূক্ষ্ম গণনায়, তিন সম্প্রদায়ের লোকের উপরেই অভিনব বঙ্গের মঙ্গলা-মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই তিন সম্প্রদায় এত বিষদৃশ ও বিভিন্ন যে, ভাবিলে নিরাশার সাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়। এই হতভাগ্য দেশে কি করিয়া এই তিনের মিলন ও একতা সম্পাদন হইবে, কি করিলে হিন্দু মুসলমান হরিহরাত্মা হইয়া

মায়ের মুখ উজ্জল করিবে, দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তের সঙ্গে এক হইয়া অবিশ্রান্ত কার্য্য দ্বারা এই পতিত দেশকে উদ্ধার করিবে, তাহা আজ কল্পনার অতীত বলিয়াই বোধ হইতেছে। কোথায় মুসলমান জেহাদ প্রচার করিবে, হিন্দু তাহাতে ভৈরব হুঙ্কার মিশ্রিত করিবে, হিমালয় টলিবে, সিন্ধু উছলিয়া উঠিবে, অত্যাচারীর দল আতঙ্কে কম্পিত হইবে; তৎপরিবর্ত্তে আজ কি না হিন্দু মুসলমানের জন্য ভাবে না, মুসলমান হিন্দুর দুর্দ্দশার দিকে ফিরিয়াও চায় না। এ দুঃখ কি প্রাণে ধরে? আমরা স্বায়ত্ত শাসনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, রাজনৈতিক আন্দোলন তুলিয়াছি, প্রজা সভার অধিবেশন করিতেছি, শূকরে দেশের শস্য নাশ করিল বলিয়া ছলনা পূর্ব্বক অস্ত্র আইন রদ করিবারও মন্ত্রণা করিতেছি, স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের ভিতরের অবস্থা কি আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি? আজ যদি নিজেদের উদারতার গুণে দয়া করিয়া ইংরেজ রাজপুরুষগণ আমাদের দেশ আমাদের হাতে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন, তবে আমাদের দশা কি হইবে, একবারও কি বিবেচনা করিয়াছি? কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রাণ এই সকল কথা ভাবিতে গিয়া বিষাদে আকুল হইবে না?

আজ ইংরেজ ভারত বা বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিলে, কালই মুসলমানগণ "আল্লা হো" রবে দেশ অধিকার করিয়া পুনর্ব্বার "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরঃ" নামে অভিহিত হইবে। মুসলমানগণ সাধারণতঃ বাঙ্গালী ভদ্র হিন্দুসন্তানগণের অপেক্ষা অশিক্ষিত এবং দুর্নীতি-পরায়ণ হইলেও তাহাদের জাতীয় একতা আছে। আজ কাফেরের বিরুদ্ধে বাঙ্গালার এক কোণ থেকে এক জন সামান্য ফকির জেহাদ প্রচার করিলে, হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা এবং পেশোয়ার হইতে ব্রহ্ম দেশ পর্য্যন্ত মহম্মদীয়গণ রণোন্মাদে উন্মত্ত হইতে পারে। আবার সমস্ত মুসলমানজগতেও সে আগুন ছড়াইয়া পড়া অসম্ভবপর নয়। কিন্তু হিন্দুর এরূপ একতা নাই। মুসলমানের আগেই হিন্দু হিন্দুকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইবে। আবার রাজপুত প্রধানগণ আপনারা আপনারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকার লইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিবে। পুনরায় দাক্ষিণাত্য হইতে বর্গীর দল আসিয়া পঙ্গপালের মত বাঙ্গলা ছার খার করিবে। পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় রণোন্মত্ত হইয়া প্রথমেই নিকটবর্ত্তী হিন্দুরাজ্য দখল করিবে। একতাবলে বলীয়ান দুর্জ্জেয় মুসলমানগণই তখন অবাধে শতছিদ্র পূর্ণ হিন্দু জাতিকে দলিত করিবে, একথা যে ব্যক্তি চিন্তা শাস্ত্রের "ক" "খ" পড়ে নাই, সেও স্বীকার করিবে। এই জন্যই বলিতেছি, এই মুসলমান সম্প্রদায়ই ভারতের দক্ষিণ বাহু, বঙ্গের প্রধান ভিত্তি মূল। মুসলমান একটী জীবন্ত জাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আজও ইয়ুরোপের সভ্যজাতি সকল মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইতেছেন না। ব্রিটিশ সিংহের দুর্দ্দমনীয় প্রতাপও মুসলমানের নিকট বিধ্বস্ত। সে দিনও মিসরে সামান্য ফকির মেহেধীর নিকটে ইংরাজকে লজ্জা পাইতে হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব? মৃতবৎ হিন্দু জাতির সঙ্গে এক হিসাবে মুসলমানের তুলনা না করাই ভাল। কিন্তু আমাদের শিক্ষিতগণ দেশোদ্ধার

ও স্বাধীনতার কোলাহলের সময় প্রায়ই এই চিন্তা ভুলিয়া যান। আমরাও আজ এ চিন্তা এখানেই পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসমাজ সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কারণ এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করা হঠাৎ সহজ হইবে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, হিন্দু মুসলমান উভয় লইয়া নব্য ভারত নব্যবঙ্গ গঠিত। এই দুই এর অকপট আন্তরিক মিলন ব্যতীত দেশের ভাগ্য ফিরিতে পারে না। হিন্দু যখন হিন্দুর জন্য ভাবিবেন, তখন যেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুসলমানের কথা ভুলিয়া না যান। যাহারা এই মহা মিলন সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাহারাই প্রকৃত দেশেরহিতৈষী এবং যথার্থ ভারত বন্ধু, জাতির গৌরব স্থল।

নব্য বঙ্গে হিন্দুই সর্ব্ব প্রকার আন্দোলনে এবং পরিবর্ত্তনে অগ্রবর্ত্তী। নব্য বাঙ্গালী বলিতে এক মাত্র নূতন ধরণের শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হন। বস্তুত এ দেশে মুসলমানাদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক হিন্দুর নিকট অত্যন্ত আধুনিক। ইংরেজের মত মুসলমানও হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তনের একটী অন্তর কারণ মাত্র। কিন্তু ইংরেজসংসর্গে বা ইংরেজি শিক্ষার ফলে মুসলমান সমাজে বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনই উপস্থিত হয় নাই। যদিও রাজশক্তি হইতে মুসলমানগণ বিচ্যুত হইয়াছেন, তবুও এদেশের পুরাতন এবং নূতন মুসলমান সমাজে অধিক ভিন্নতা ঘটে নাই। প্রথমতঃ এদেশে আদিম উচ্চ বংশসম্ভূত ভদ্র মুসলমানের সংখ্যা নিতান্তই কম। যে সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মুসলমান প্রাধান্যের সময়ে নানা কারণে দলে দলে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের দ্বারাই এদেশের মুসলমান সমাজ পরিপূর্ণ। ইহারা সাধারণত কৃষি কার্য্য ও উঞ্ছ শারীরিক পরিশ্রম করিয়াই দিনপাত করে, এবং সমাজের নিতান্ত নিম্নস্তরে অবস্থিত। সহরাদিতে ভিন্ন ভদ্র মুসলমান প্রায়ই দেখা যায় না। অথবা মধ্যে মধ্যে কচিৎ কোথায়ও দুই এক ঘর জমিদার শ্রেণীর মুসলমান দেখা যায়। নিম্ন শ্রেণী এবং জমিদার, এই উভয় দলের লোকের মধ্যেই লেখা পড়ার চর্চ্চা এদেশে অত্যন্ত কম। যে মধ্যম শ্রেণীর ভদ্র সন্তানগণ কর্তৃক এদেশের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ গৌরবান্বিত, দুর্ভাগ্য বশত মুসলমান সমাজে এই শ্রেণীর লোকের নিতান্তই অভাব। বোধ হয়, এই এক মাত্র কারণেই মুসলমান সমাজে নূতন অর্থকরী ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। এ দেশে সাধারণ শিক্ষার দ্বার চিরদিনই অবরুদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন কোন দিনই বিদ্যা চর্চ্চার জন্য কোন নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক জীবন সমর্পণ করিত না। কিন্তু তথাপি নানা কারণে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের হাতে কালে লেখাপড়ার অনেক কাজ আসিয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পরিবর্ত্তে বৈদ্য কায়স্থই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী। প্রতাপাদিত্যাদির মত প্রতাপশালী লোক এক সময়ে কায়স্থকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এখনও বঙ্গের অনেক প্রধান জমিদার কায়স্থ। নব্যবঙ্গে বিদ্যাতে বুদ্ধিতে পদে কোন বিষয়েই কায়স্থ, বৈদ্য ব্রাহ্মণের নিম্নে নয়। কিছু দিন পূর্ব্বে, সার রাজা রাধাকান্ত দেব কায়স্থ বংশীয় হইয়াও হিন্দু সমাজের পরিচালকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও অনেক

মহাত্মা কায়স্থ হইয়াও হিন্দু জাতির গৌরব ও আদর্শ স্বরূপে পরিগণিত হইতেছেন। ন্যায় বিচারে কায়স্থই এখন বঙ্গদেশে সর্ব্ব প্রধান। সংসর্গ গুণে কায়স্থের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নবশাক শ্রেণীর অনেক সম্প্রদায়ের লোক ও শনৈঃ শনৈ উন্নত হইতেছে। কিন্তু ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে যদিও কায়স্থাদি জাতির মধ্যে কেতাবতি ও পারসী লেখা পড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল, বৈদ্যগণ চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া নিদানাদি পাঠ করিতেন, ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণাদিতে বিদায় পাইবার আশায় চতুষ্পাঠিতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন, বাস্তবপক্ষে শিক্ষার যে মহৎ লক্ষ্য তাহার দিকে চাহিয়া কেহই বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন না। এই জন্য প্রকৃত ভাবে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ এবং গূঢ় তত্ত্ব কেহ শিক্ষা না করিয়া কেবল উপর উপর কূট তর্কাদি শিখিয়াই লেখা পড়া শেষ করিতেন। কবিরাজ ও টোলের পণ্ডিতগণ প্রায়ই এইরূপ আসর জম্‌কান গোছের বিদ্যাভ্যাস করিতেন। অপরাপর ভদ্র লোকেরাও জীবিকা নির্ব্বাহের মত সামান্য খাতা পত্র লিখিতে শিখিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যাহাদের জীবিকার অন্যোপায় ছিল, সুতরাং তাহাদের আর লেখা পড়া শিখিবারও গরজ ছিল না। এজন্য জমিদার তালুকদার ও কৃষকাদি শ্রেণীর লোকের মধ্যে লেখা পড়ার কোনই চর্চ্চা ছিল না। এখনও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাহাদের হাতে অন্যোপায় নাই, তাহারাই অর্থকরী ইংরাজি শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যাকুল। প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক কোন নিগূঢ় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য, জীবনের বিশেষ কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অথবা জ্ঞানাভাবে জীবন গতি বাধ প্রাপ্ত হয় বলিয়া কয় জন লোক আজ কাল লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতেছে? একটী মানুষও আছে কিনা সন্দেহ। চাকরী বন্ধ করিয়া দিলে, লেখা পড়ার সঙ্গে জীবিকার সংস্রব না থাকিলে, নব্য বঙ্গের এই উন্নতির দিনেও অনেকেই কেতাবপত্র বন্ধ করিয়া উপায়ান্তর দেখিবে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, উচ্চ বর্ণের হাতে, জীবিকার জন্য জমিদারি, তালুকদারি এবং লেখা পড়ার চাকরী ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। ভিক্ষা বৃত্তিও শ্রেয়, তবুও এই শ্রেণীর মানুষেরা ব্যবসায় বা কৃষি কার্য্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত নয়। ব্রাহ্মণের হাতে পৌরহিত্য, গুরু ব্যবসায়, অধ্যাপকতা এবং বৈদ্যদিগের হাতে চিকিৎসা ব্যবসায় এক চাটিয়া ভাবে থাকিলেও ইহা দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের উপকার হইতেছিল না। উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণও কেতাবতি বা কায়েতি লেখা পড়ার কাজ করিয়া অনেক কালাবধি সংসার চালাইতেছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের এক চাটিয়া ব্যবসায় নয়। এদিকে জমিদারি তালুকদারিইবা কয় জনের আছে? থাকিলেইবা আজ কালিকার দিনে তদ্দ্বারা যথেষ্ট ভদ্রতা রক্ষা কয় জনের হইতে পারে? কুলীন ব্রাহ্মণাদির বিবাহ ব্যবসায় এবং বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতিতে এক সময়ে কষ্টে দিনপাত হইত! কিন্তু তাহাতেও আর ভদ্রতা রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। এদেশের উচ্চ শ্রেণীর বর্ণত্রয়ের মধ্যে কেন যে সাধারণতই জীবিকার্জ্জন সম্বন্ধে এই রূপ সংকীর্ণ উচ্চ ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কারণ নির্ণয় করিতেও বহু পরিশ্রম করিতে হয় না। বৈদ্যের সংখ্যা

সমস্ত ভারতবর্ষেই অতি অল্প মাত্র। বঙ্গ দেশে বর্ত্তমান সময়েও বৈদ্যের সংখ্যা অতি যৎসামান্য। কিন্তু এক সময়ে অর্থাৎ পাঁচ ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহাদের সংখ্যা যে আরও অল্প ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদ্যদিগের সাধারণ ব্যবসায় চিকিৎসা ব্যবসায় হইলেও, ইহারা এক সময়ে এদেশে বিশেষ পদস্থ ছিলেন। আদিশূর ও বল্লালকে অনেকে বৈদ্যবংশীয়ই বলেন। সাধারণ প্রবাদও এই রূপ। তবে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এসম্বন্ধে বর্ত্তমান্ সময়ে অন্য রূপ মত প্রচার করিতেছেন। এই মত সত্য হইলেও বৈদ্যগণ যে সম্মানিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই। ইংরাজাধিকারের কিছু পূর্ব্বেও রাজা রাজবল্লভাদি বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়া ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এখনও বৈদ্য বংশের ব্যবহার ও চাল চলন সাধারণত এদেশের সমস্ত ভদ্র সমাজের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ত এদেশে এক সময়ে বহু মূল্য কহিনুর মনির মত প্রভূত সম্মানে আনীত ও গৃহীত হইয়াছিলেন। জীবিকার জন্য ভাবা দূরে থাক্, ইহারা এক দিন ষোড়ষোপচারে পূজা পাইতেন। ইহাদের বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তরের সংখ্যা ছিল না। বল্লালীর সময়ে, ঘোষ, বোষ, গুহ, মিত্র, দত্তগণ কিরূপ সম্মানিত ছিলেন, এইরূপ মর্য্যাদা পূর্ণ কৌলীন্য পদই তাহার প্রচুর প্রমাণ। কালে রাজপরিবর্ত্তন ও সংখ্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বংশের সন্তান সন্ততিগণ দুরবস্থায় পড়িলেও যে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করা ইহাদের পক্ষে সহজ হয় নাই, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কৃষি বাণিজ্য চিরদিনই এদেশে উচ্চবর্ণ ত্রয় ব্যতিরিক্ত নিম্ন শ্রেণীর হাতে থাকাতে উহা উঞ্ছ মধ্যে গণ্য। পুনশ্চ মুসলমান রাজাগণও এদেশের এই ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, বৈদ্য,উচ্চবর্ণ ত্রয়কেই সম্মান করিতেন এবং উচ্চ পদাদি দান করিতেন। মুসলমান নবাব ও রাজ পুরুষদের সঙ্গে এই বর্ণত্রয়ের ঘনিষ্ঠতা ও মিশামিশি ছিল। সুতরাং মহম্মদীয়গণের সাধারণ বিলাসিতা ও নবাবদিগের নবাবি চাল চলন মেজাজ সমস্তই এই সকল শ্রেণীতে সংক্রামিত হইয়াছিল। এই ঘটনাও এই বর্ণত্রয়কে জীবিকার্জ্জনাদির সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু উচ্চ পদাভিলাষে চাকুরী গ্রহণ করিয়া করিয়া এবং চাকুরীর সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি ও সম্মানের যোগ থাকাতে চাকুরীটা আর ইহাদের উঞ্ছ কাজ বলিয়া ঘৃণিত হয় নাই। সুতরাং যখন দেশে প্রচুর জনতা বৃদ্ধি হইল, বিদেশীয় লোক দলে দলে আসিয়া প্রবেশ করিয়া বাণিজ্যচ্ছলে দেশের জিনিষ বিদেশে চালান করিতে লাগিল, নানা দিক হইতে নানা প্রকারের বিলাসিতা দেশ মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইল, এই বিষম পরিবর্ত্তনে যখন দেশের সর্ব্বত্র হা অন্ন যো অন্ন শব্দ উঠিল, নানা অভাব দেশবাসীকে আক্রমণ করিল, তখন বঙ্গের মধ্য বিধ ভদ্র সন্তানগণ মান সম্ভ্রম রক্ষা করা মহা সঙ্কট মনে করিতেছিলেন। এইরূপ সঙ্কটের দিনেই দারুণ পিপাসার সময়ের সুশীতল জলের মত দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয়। কথিত আছে, কোম্পানির আমলের ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেশীয়দিগকে শুধু সংস্কৃত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি কয়েক জন মহাত্মা তৎকালীন

গবর্ণর জেনেরাল সাহেবকে বহুযত্নে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিধানের জন্য সম্মত করেন মহাত্মা রামমোহন এ আন্দোলনের একজন অগ্রণী ছিলেন। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার ও এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের একজন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। রামমোহন রায় যে প্রধান যুক্তি দেখাইয়া ছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ, "সংস্কৃত মৃত ভাষা। শুধু সংস্কৃত পাঠে এদেশীয় লোক প্রকৃত বিচক্ষণতা ও মার্জ্জিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি। পণ্ডিত প্রবর অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শেষ ফল ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয়ভাগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এই আন্দোলন সম্বন্ধীয় ইংরেজি চিঠিপত্র নিজের মতের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারেরও মতের স্থূল মর্ম্ম এই যে, সংস্কৃত দর্শনাদি নাস্তিক্যবাদ পরিপূর্ণ। এশিক্ষায় মানুষের প্রকৃত বিকাশ সম্ভবপর নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, নব্যবঙ্গের প্রথম পরিচালকগণ ও তৎকালীন নব শিক্ষিত দল ইংরেজি শিক্ষাকে কিরূপ চক্ষে দেখিয়া ছিলেন। কিন্তু দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচারে গবর্ণমেণ্টের অপর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। দেশীয়গণ ইংরেজি শিখিয়া এইরূপ চতুর চালাক হইবে, ইহাদের এইরূপ চোক ফুটিবে এবং পত্রিকায় ইংরেজের শাসন নীতির সমালোচনা ও ন্যায্যাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন তুলিতে, ইহারা এক সময়ে সমর্থ হইবে, এচিন্তা মনে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে, তৎকালীন রাজপুরুষগণ কিরূপ নীতি অবলম্বন করিতেন, জানি না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, দেশীয়গণ ইংরেজি শিখিলে বিচারালয়াদির নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর কাজকর্ম্ম অতি স্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইবার সুবিধা হইবে। অর্থাৎ একদল স্বল্প বেতনের দেশীয় কেরাণী প্রস্তুত করাই তাঁহাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে তাহার মজ্জায় মজ্জায় এই স্বার্থময় অসার উদ্দেশ্যের কালিমামাখা কলঙ্কের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একি একটা শিক্ষা? যে শিক্ষায় মানুষ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয় না, মানবজীবন প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে ফিরে না, যে শিক্ষা জগতের সার, জীবনের সার, জ্ঞানের সার, নীতির সার, কর্ম্মের সার, ধর্ম্মের সার, মহোচ্চ প্রেম তত্ত্বের ইঙ্গিত স্বরূপ নয়, সে কি আবার একটা শিক্ষা? আলেকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকালয়ে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ থাকা আর আমার তোমার মুখে থাকা একই কথা। আরবের খলিফা আলেকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকালয় ধ্বংশ করিতে সেনাপতিকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবলই কুসংস্কার এবং বর্ব্বরতা নাই, কিছু সত্য কথাও আছে। "যাহা কোরাণে নাই, তাহা অপাঠ্য। আর যদি কোরাণে থাকে, তাহা হইলেও অপাঠ্য।" কোরাণকে যদি তত্ত্ব ও প্রেমের শাস্ত্র বলা যায়, তাহা হইলেও কথার মধ্যে সত্য আছে। আবার খলিফা কোরাণকে যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ ও আদেশ মনে করিয়া কথাটা বলিয়াছিলেন, সে দিক্ দিয়া সেই আলোতে দেখিতে গেলেও কথার মধ্যে কিছু সত্য পাওয়া যাইবে। তবে খলিফা, মতে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া, সেই অমূল্য গ্রন্থ রাশি পোড়াইয়া সত্য

সত্যই পাষণ্ডের কাজ করিয়াছিলেন। এবং কোরাণ সত্য সত্যই সর্ব্ব তত্ত্ব পূর্ণ ঈশ্বরাদেশ বা প্রেমের সর্ব্বজনীন মহাশাস্ত্র নয়। আর আলেকজাণ্ড্রিয়ার গ্রন্থরাশিও তত্ত্বজ্ঞানশূন্য প্রেমের বিরোধী শাস্ত্র ছিল না। খলিফার এই নির্ব্বুদ্ধিতা অবশ্যই অমার্জ্জনীয়। কিন্তু এসকল কথা কেন বলিতেছি? এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী যে শ্রেণীর, তাহার চতুঃসীমানায়ও এইরূপ সমুচ্চ লক্ষ্যের আভাস নাই। এসকল মহৎ লক্ষ্য দূরে থাক্, স্থূল চক্ষে, স্থূল জ্ঞানে মানুষের যতটুকু মনুষ্যত্ব ও মহত্ব হওয়া উচিত, কিম্বা সাংসারিক যে সকল মহোপকার সাধন হওয়া বিধেয়, বর্ত্তমান শিক্ষা দ্বারা এই যৎসামান্য কার্য্যফলও সুসিদ্ধ হইতেছে না। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও স্বর্গীয় মহদুদ্দেশ্যের কথা আর কি বলিব? শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি বা রুচিরও কোন সম্বন্ধ নাই। এ কি শিক্ষা? না বন্দীর শাস্তি বিশেষ কামজারি? দরিদ্র ভদ্র সন্তানগণ পেটের দায়ে দলে দলে এই কামজারি করিতেও আগ্রহের সহিত ছুটিতেছে। এ অর্থকরী কাম জারি বা বন্দীর শাস্তি বিশেষ শিক্ষার ফল এত কাল বসিয়া কি হইয়াছে? কতকগুলি কেরাণী, ডাক্তার ও উকিল প্রস্তুত হইয়াছে, অথবা শাদা কথায় এক দল সাহেবের গোলাম প্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে দেশটা ছাইয়া ফেলিতেছে। কেবল এক দল ধর্ম্ম, চরিত্র, নীতি, হৃদয় ও চিন্তা বিবর্জ্জিত ভার-বাহী বলীবর্দ্দের সৃষ্টিই যে শিক্ষার ফল, সেই শিক্ষাও যদি শিক্ষা হইল, সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষও যদি শিক্ষিত নাম পাইবার উপযুক্ত হইল, তবে দেশের কামার, কুমর, তিলী, সূতরই বা কেন শিক্ষিত নয়? তাহাদের শিক্ষাই বা কেন প্রকৃত শিক্ষা নয়? বস্তুত এখনও এদেশের যে সকল নিম্নশ্রেণীর স্বাধীন ব্যবসায়ীগণ, এই সকল লেখা পড়ার চাকুরে দলের নিকট ছোট লোক নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সত্য কথা বলিতে গেলে তাহারাও আমাদের চেয়ে—অনেক উচ্চ স্থানে বাস করিতেছে। তাহাদের প্রাণেও যে নিশ্মল সুখ ও তেজস্বিতা আছে, আমাদের এদলে তাহাও নাই। অতি দুঃখে অধীর হইয়াই কথাগুলি বলিলাম—অপরের দিকে কেবল চাহিয়া নয়, নিজের চরিত্রে ও মর্ম্ম স্থানে ডুবিয়াও এই সকল দুঃখের কান্না কাঁদিলাম। এ সকল অভদ্রোচিত কঠোর কথায় যদি কাহারও বা কোন সম্প্রদায়ের প্রাণে আঘাত লাগে, তবে কথা গুলির মধ্যে যদি সত্য ও ন্যায় থাকে, কেবল তারই অনুরোধে ক্ষমা করিবেন। নতুবা নিজের বক্ষে হাত দিয়া এ অভদ্রতার প্রতিফল দিবেন। স্থূল কথা এই, ওকালতি, ডাক্তারি বা কেরাণিগিরি শুধুই ব্যবসায় মাত্র। এই সকল যে মানুষের পক্ষে অকর্ত্তব্য, তাহাও নহে। কিন্তু এই করিলেই মনুষ্যত্ব বা প্রকৃত ভদ্রতা অথবা শিক্ষিত নাম পাইবার অধিকারী হওয়া যায় না।

যাহাই হউক, যখন এই ধরণের ইংরেজি শিক্ষা দেশে প্রচার হইতে লাগিল, তখন দেশও ইহা গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রস্তুত ছিল। যেন কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখান হইল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীগণ কেরাণি প্রস্তুত করিতেই যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন, তখন যে ইংরেজি শিখিতে লাগিল, সেই কোন না কোন রকমের একটা সরকারী

কাজও পাইতে লাগিল। কাজে বেশ পয়সা উপার্জ্জনও হইতে লাগিল। যাহার পিতা পিতামহ হয়ত মাসিক তিন, চারি বা পাঁচ টাকা বেতনে পাটওয়ারির কাজ করিত, সেই এখন টটা মিটি ইংরেজি শিখিয়া কুড়ি পঁচিশ, পঞ্চাশ টাকার কাজ পাইতে লাগিল। আবার তৎসঙ্গে ২ দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ ইংরেজ দলের কাহারও কাহারও সঙ্গে তাহার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে সাধারণ লোকের নিকট কিছু সম্মানও বাড়িয়া গেল। সুতরাং দিনের পরে যতই দিন গত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ হইতে বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় জানাদি দ্বারা যুগপৎ দেশের অভাব ও যাতায়াতের সুবিধা যতই বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথিত নিরুপায় ভদ্র পরিবার হইতে ততই দলে দলে বালক আসিয়া গ্রামে, জেলায় ও সহরে ইংরেজি শিখিতে লাগিল। অর্থ উপার্জ্জন ও সাংসারিক অভাব মোচনই শিক্ষার এক মাত্র উদ্দেশ্য হইল। আদৌ কর্তৃপক্ষগণ কোন মহৎ উদ্দেশ্যে বা মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্য এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রচার করেন নাই; এ দেশের লোকও তদ্রূপ কোন সমুচ্চ ভাবে চলিত হইয়া এ শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ইংরেজি শিক্ষা পশ্চাত্য শিক্ষার সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে অনুরঞ্জিত হইলেও এদেশে আমাদের ভাগ্যদোষে শুধুই অর্থকরী হইয়াছে। নতুবা শিক্ষা কি কখনও অর্থকরী হইয়া থাকে? জ্ঞান কখনও মানুষকে বিপথে নিয়া যাইবার উপকরণ হয়? ব্যবহারের দোষেই ভাল ও মন্দ হয়, যাহা উপকারী তাহাই অপকারী হয়। বস্তুত যদি ইংরেজি শিক্ষায় মাত্র যের মনুষ্যত্ব জন্মানের বাধাই ঘটিত, তবে ইংরেজ জাতি আজ পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সভ্য জাতির শ্রেণীভুক্ত হইয়া কটাক্ষে এই পঞ্চবিংশতি কোটি সভ্য অধিবাসীর বিস্তীর্ণ অধিবাস ক্ষেত্র ভারতভূমি সুশাসন করিতে সমর্থ হইতেন না। তবে আজ ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপে ধরাতল কম্পিত হইত না। অথবা ইংরেজ কুলে যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া ধরাধামকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাও কখনও সম্ভবপর হইত না। ইংরেজ আজও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসীর ন্যায় বৃক্ষ কোটরে বাস করিয়া আমমাংসই ভক্ষণ করিত, কিম্বা বাহিরের অন্যান্য কারণে আর একটুকু উন্নত হইত। বর্ত্তমান পদবীতে কখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে আর ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের দর্শন, বিজ্ঞান আমাদিগকে এত মোহিতও করিতে পারিত না। কোন জাতির শিক্ষা কাহাকে বলে? যে সকল উপকরণ বহু কালে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে জাতিকে গঠন করিয়াছে, জাতির প্রতি ব্যক্তির মজ্জায় মজ্জায় যে সমস্ত উপকরণের অংশ রহিয়াছে, সেই সকল উপকরণই সেই জাতির জাতীয় শিক্ষা। জাতির শিরোচূড়া স্বরূপ বিজ্ঞ লোকেরা যুগে যুগে আপনাদের প্রতিভা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাই গ্রন্থবদ্ধ করেন। সেই সকল গ্রন্থ পাঠে সেই জাতির শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া বাহিরের লোকের পক্ষে কঠিন। এই জন্য বিদেশীয় ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা আমাদের যে অপকার হইতেছে, তাহা পরে বলিব। কিন্তু কোন জাতির শিক্ষা কিরূপ, তাহা সেই

জাতির তৎকালীন পদবী ও মহত্বের দ্বারাই পরিমিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, ইংরেজি শিক্ষা মন্দ হইলে ইংরেজ সংসারে এত বড় হইত না। শিক্ষার দোষ নাই। দোষ আমাদের শিক্ষা প্রণালী ও উদ্দেশ্যের। দোষ হইয়াছে আমরা বিদেশীয় পরাজিত জাতি বলিয়া, দরিদ্র এবং অপদার্থ বলিয়া।

ইংরেজ শিক্ষায় কি আমাদের কোনই উপকার হয় নাই? আমাদের আদরের ও প্রাণের ভালবাসার বস্তু নব্য শিক্ষিত দল কি নিরবচ্ছিন্ন নিন্দারই পাত্র? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজি শিক্ষায় দেশে ধীরে ধীরে চিন্তা শক্তির বিকাশ হইতেছে। অনেক বিষয়ে লোকের চোক ফুটিয়াছে। অনেক উন্নতির অঙ্কুর এখনই শিক্ষিত সমাজমধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছে। ভাবী অভ্যুদয়ের আশায় আজ কাহার মন না একটু একটু আন্দোলিত হইতেছে? প্রকৃত আদর্শ ও কোন উন্নত জাতির শিক্ষিত পণ্ডিতদলের তুলনায় আমাদের শিক্ষিত নব্যবঙ্গবাসী কিছুই না, কেবল ইহা প্রমাণ করিতেই কঠোর কথা পর্য্যন্ত বলিতে সঙ্কোচিত হই নাই। কিন্তু ইহারাই যে বঙ্গের দুর্দ্দিন আঁধারে এক মাত্র আশার জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র রাজি, ইহা বলিতে কে কুণ্ঠিত হইবে? দেশের সমস্ত আশা ভরসাই এখন ইহাদের উপরে স্থাপিত। অনেকের আশানুরূপ চরিত্রের বল বা সরলতা নাই, সত্য কথা হইলেও, দেশের যাহা কিছু কাজ এই শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতেই হইতেছে। রাজনীতির দুইটা ফাকা আওয়াজই বল, পত্রিকার দুইটা বাঙ্কা গদই বল, সমাজ সংস্কার নিয়া হাসি ঠাট্টা করাই বল, ধর্ম্ম নিয়া ছেলে খেলা করাই বল, জাতীয় সাহিত্যাদি ও ভাষার সৃষ্টি জন্য জেঠাম করা বকাম করাই বল, আজ যাহা হইতেছে, এক দিন ইহাও হইত না। হইত না বলিয়াই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আদিম সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পিশাচপ্রকৃতির ইংরেজ কুলাঙ্গারগণ বাঙ্গালী জাতিকে নিরাপত্তিতে পশুবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতে সুবিধা পাইয়াছে এবং এই রূপ পৈশাচিক ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছে। কাজেই আজ চির পদানত বাঙ্গালী ইংরেজের প্রক্ষিপ্ত পদ হাতে ঠেকাইতে প্রায়াস পাইলে বা তদ্রূপ দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটী কথা বলিতে উদ্যত হইলেই ইংরাজ হাড়েং চটিতেছেন। অমনি রাগে অন্ধ হইয়া দেশের প্রধান রাজ প্রতিনিধি পর্য্যন্ত দেশীয়দিগকে আরও কঠোর রূপে শাসন করিতে, দেশীয় সংবাদ পত্র গুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে চিঠি লিখিতেছেন। ইংরেজের প্রতিলোমকূপ হইতে আজ বেয়াদব বাঙ্গালির বেয়াদবি দেখিয়া ক্রোধ, বিরক্তি ও ঘৃণার অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এইরূপ হইবেই বা না কেন? যাহাদের পিতা পিতামহ একদিন ইংরেজ পদাঘাত করিলে কথাটি না বলিয়া হস্তার পায়ের বেদনা নিবারণার্থ পুনরায় যত্ন পূর্ব্বক সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিত, ইংরেজ মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিতে উদ্যত হইলে ঘরের সঞ্চিত চাউল মুষ্টি পর্য্যন্ত বলকারীর পদে ঢালিয়া দিয়া তাহার সন্তোষ বর্দ্ধন করিত, ধর্ম্মাবতার, হুজুর, খোদাবন্দ বই ইংরেজের প্রতি ব্যবহারের জন্য যাহাদের পূর্ব্বকর্ত্তাদিগের পৃথক্ ভাষা ছিল না, জোড়হাত করিয়া ভিন্ন সম্মুখে দাঁড়াইবার

সাহস ছিলনা, ঘুস নেওয়া, মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা, এমন কি প্রভুর ইন্দ্রিয় পিপাসা নিবারণের রসদ যোগানই যাহাদের অভিভাবকদিগের একদিন কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য ছিল, আজ তাহারাই কি না পত্রিকায় ও বক্তৃতায় সেই পৌত্রিক প্রভুগণের কাজ ও চরিত্র সমালোচনা করিয়া লম্বা ২ কথা বলিতেছে, তাঁহাদেরই সমকক্ষতা লাভের জন্য ইলবার্ট বিলাদির আন্দোলন করিতেছে, স্বায়ত্ব শাসনাদির জন্য চীৎকার করিতেছে, এমন কি, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় পর্য্যন্ত লোকাদি পাঠাইয়া আপনাদের ন্যায্যাধিকার পাইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বিলাতের সহরে সহরে, পল্লীতে পল্লীতে সভা সমিতি পর্য্যন্ত করিয়া প্রভুদের অপযশের ও গুপ্তচরিত্রের ঘোষণা করিয়া লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিতেছে, একি কোনরূপেই গায়ে সহ্য হইবার কথা? এমন নেমকহারাম বেয়াদব অসভ্য বর্ব্বর কৃষ্ণকায়দিগকে কাহার না গলা টিপিয়া মারিতে ইচ্ছা হয়? বস্তুতই কি ইংরেজ জাতির নিকট আমরা নেংটা কুকী বা গারোর মত এতই বর্ব্বর জাত সমূহ? তবে আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবান্বিত আদিম সুসভ্য আর্য্য সন্তান হইয়াও প্রকৃত সভ্যতাংশে ন্যূন ইংরেজের নিকট এত হতাদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছি কেন? জনবুলের বংশ আত্মমর্য্যাদাও জাত্যাভিমানমুগ্ধ পরঘৃণাকারী বলিয়াই কি শুধু এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? ইংরেজ-জাতির চরিত্রগত এই কুসংস্কার এবং সাঙ্কীর্ণতাও যে একটা কারণ, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা প্রথমাবধিই যদি আমাদের প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ইংরেজের সঙ্গে মিশিতেও ইংরেজকে গ্রহণ করিতে পারিতাম, আমাদের ন্যায়ানুগত অধিকারে হস্ত দিলেই প্রথম সময় হইতে আমরা ইংরেজকে বাধা দিতে উদ্যত হইতাম, তাহা হইলে ইংরেজ আজ আমাদিগকে এতদূর পশুবৎ ব্যবহার করিতে পারিত না। তবে পরাজিত জাতির পক্ষে নববলে বলিয়ান অপরিচিত জাতির সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়া চলা সম্ভবপর নয়। একথায় প্রথম উত্তর এই যে, বাঙ্গালী জাতি ইংরেজের কাছে তদ্রূপ পরাজিত জাতি নয়, বরং বন্ধুজাতি। বাঙ্গালীর সাহায্যেই ইংরেজ আজি এত বড় বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের সম্রাট। ইংরেজের ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে, ইংরেজহৃদয়ে কৃতজ্ঞতা থাকিলে, ইংরেজ চির দিনই বাঙ্গালীকে একখানি বাহু মনে করিয়া কাজ করিতেন। দ্বিতীয় কথা, মুসলমান বা গ্রীকদিগের ন্যায় ইংরেজ হঠাৎ আগত অপরিচিত ভারত আক্রমণকারী পরাক্রমশালী শত্রু নয়। ইংরেজ বণিকবেশে রাজ্য লাভের অনেক আগেই এদেশে বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। এমন কি, ক্লাইব সাহেবকে তৎকালীন বঙ্গের মুখপাত্রেরা বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া দুর্দ্দান্ত সিরাজের উচ্ছেদার্থ সাহায্য চাহিয়া ছিলেন। তৃতীয় কথা, সমানে সমানে টক্কর না দিয়া ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা ও ন্যায্যাধিকার দাবি করা যাইতে পারে। কৃতকার্য্য না হইলেও তাহার ফল উপকারী। কিন্তু তৎকালীন লোক সকল সাধরণত শিক্ষা ও জ্ঞানাংশে হীন হওয়াতেই তাহাদের ব্যবহার দোষেই আমরা ইংরেজ চক্ষুতে এত হীন হইয়া পড়িয়াছি। বৃথা জাত্যভিমা-

নাঙ্ক আর্য্য-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বিদেশীয় ইংরেজ বাঙ্গালীর মূর্খতার ফলেই চরিত্রহীন বাঙ্গালীকে এতদূর পশুবৎ ভাবে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃতকার্য্য হউন না হউন, নব্য শিক্ষিতগণই আজ আমাদের এই পূর্ব্ব পুরুষদের ভুল বুঝিয়া সংশোধন করিতে গিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্বকার নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার অন্ধকার হইতে যে বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ শিক্ষার জ্যোতি শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও দেশের মঙ্গলপ্রদ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আবার তদনুপাতে শিক্ষিতগণও যে অশিক্ষিত মূর্খদল হইতে উন্নত এবং আদরের পাত্র, তাহাতেও ভুল নাই।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

উৎকলে শ্রীগৌরাঙ্গ।

এ কোন্ সন্ন্যাসী পাগলের পারা,
হরিপ্রেম মদে হয়ে মাতোয়ারা,
দুই বাহু তুলি বলে হরিবোল।
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি বাজিতেছে খোল।
চিনেছি ইহাকে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
যেন বর্ণ জ্যোতি তপ্ত-চামীকর।
হাতে করতাল হরি বলে নাচে।
ভক্তগণ সবে ধায় পাছে পাছে।

২

আষাঢ় মাসেতে নবমেঘ মালা।
তাহে ঘন বহে বিদ্যুৎ উজালা।
সৌদামিনী ঘনে রাধাকৃষ্ণ রূপ।
(প্রকৃতি পুরুষ নাহিক স্বরূপ)
হেরিয়া চৈতন্য হইয়া মোহিত।
ব্রজধাম মনে হইল উদিত।
নব মেঘ আর হেরি সৌদামিনী,
উচ্চৈঃস্বরে করে রাধাকৃষ্ণ ধ্বনি।
নবীন সন্ন্যাসী উৎকলে উদয়।
পুরী সিংহদ্বারে "জগন্নাথ জয়"
যাত্রিগণ বলে রথোৎসব দিন।
গৌরাঙ্গ সুন্দর পরিয়া কৌপীন॥

রথের সম্মুখে লাগিল নাচিতে।
দুই বাহু তুলি প্রেমপূর্ণ চিতে॥
বলে হেন দিন না হইবে আর।
ব্রজেশ্বর হরি সম্মুখে আমার॥

৪

নাচে গোরা রায় পাগলের পারা।
চক্ষু হ'তে প্রেম-মন্দাকিনী ধারা
অঙ্গোপরি পড়ে। মাতি সঙ্কীর্ত্তনে
কত নাচে গায় সদানন্দ মনে॥
কভু মুরছিত ধরণী উপর।
কভু উঠে বলে "কোথা ব্রজেশ্বর,
কোথা গেলে তুমি করিয়া অনাথ,"
"কোথা গেলে প্রভু ব্রজপুর নাথ।"
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন।
ক্ষণে উচ্চৈস্বরে করিছে ক্রন্দন॥
ক্ষণে বাহু তুলি আনন্দে মাতিয়া
রথাগ্রেতে নাচে। তাথিয়া তাথিয়া
বাজিছে মৃদঙ্গ। পারিষদগণ
প্রভুরে ঘেরিয়া করিছে নর্ত্তন।
আনন্দেতে সবে করে হরিধ্বনি।
(হরি নামে হ'ল পবিত্র অবনি)॥

শ্রীরামদাস সেন

বাঙ্গলার বর্ব্বর জাতি।

(৪)

ভাগলপুর হইতে ময়ুরভঞ্জ, বালেশ্বর এবং বর্দ্ধমান হইতে মানভূম ও সিংভূম এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে সাঁওতালদিগের বাস। সাঁওতালেরা দক্ষিণাপথবাসী কৃষ্ণকায় বর্ব্বরদিগের সমজাতীয়। বাঙ্গলার উত্তর ও পূর্ব্ব প্রান্তবাসীরা তুরাণীয় বর্ব্বর। তুরাণীয়দিগের মুখ গোল, চোখ বড়, গোল, ও সোজা, নাক উচ্চ ও লম্বা, ঠোঁট মোটা ও বাহির করা, চুল সোজা, মোটা ও কাল, বর্ণ কাল। মোঙ্গলীয়দিগের মুখ বাদামে বা চতুষ্কোণ, চোখ ছোট, বাদামে ও বাঁকা, নাক খাঁদা, ঠোঁট পাতলা, চুল কোঁকড়ান, সরু ও কাল, বর্ণ গৌর। উত্তরদেশীয় কেবল কিরাত ও কোচ জাতি, বোধ হয় তুরাণীয়। হিন্দুদিগের সহবাসে আচার ব্যবহার ভাষা ও বর্ণ এত সঙ্কর হইয়াছে যে, কে কোন্ জাতীয়, নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

সাঁওতালেরা বলে, আহির পিচারী পর্ব্বতে একটী হংস দুইটী ডিম্ব প্রসব করে; তাহা হইতে সাঁওতালদের পূর্ব্ব পুরুষ উৎপন্ন হয়। হাজারীবাগ জেলার চৈচম্পা পরগণার পূর্ব্বে ইহারা বাস করিত। পশ্চিম দিক্ হইতে হিন্দুগণ আসিয়া ইহাদিগকে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে সরাইয়া দিতেছে। চৈচম্পার পূর্ব্বে ইহারা কোথায় ছিল, কেহ বলিতে পারে না। সাঁওতালেরা যেমন আপনাদিগকে হংস শাবক বলিয়া পরিচয় দেয়, খাড়িয়া জাতি তেমনি আপনাদিগকে ময়ুর ডিম্ব জাত বলিয়া পরিচয় দেয়।

সাঁওতালেরা সূর্য্য চন্দ্র ও নাটের পূজা করে। সূর্য্যই সৃষ্টি কর্ত্তা ও রক্ষা কর্ত্তা। সূর্য্যের নাম সিঙবোঙা, নাটদের মধ্যে জাহির ইরাং মণিকা মারং বুড়ু বড় ও বাঘ-ভূত। মরং বুড়ু পর্ব্বতের দেবতা, তাহার উদ্দেশে ইহারা মাঝে মাঝে বৃষ ও মহিষ বলিদান করে। বাড়ীর কাহাকেও বাঘে মারিলে বাঘ ভূতের পূজা করিতে হয়। ইহারা বাঘের চর্ম্ম স্পর্শ করিয়া শপথ করে। তিন চারি বৎসরে একবার প্রাতঃকালে ছাগ বলি দিয়া সূর্য্য পূজা করে। নাটদের পূজা না করিলে দুর্দ্দৈব ঘটে। ইহাদের পুরোহিতের নাম নাইয়া। এই সকল পূজা নাইয়ারা করে। দুর্গা পূজা, দোল যাত্রা প্রভৃতি যে সকল পর্ব্ব হিন্দুর নিকট শিক্ষা করিয়াছে, সেই সকল পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিতে হয়। সাঁওতালেরা জাতিভেদ মানে না, ভালুক, বানর, সাপ, ইন্দুর, সব খায়। হিন্দু ব্রাহ্মণেরও অন্ন খায় না। পুরোহিতদের ব্রহ্মত্তর আছে, তাহার উপসত্ব হইতে বৎসরে দুইবার নারুল ও মৈমুরি উৎসবে গ্রামের মোড়ল বা জগ মাঝি সকলকে খাওয়ায়। এই উৎসবে গরুর মাথায় তৈল দিয়া হাণ্ডিয়া বা মদ খাওয়ায়, এবং পিতৃ পুরুষদের স্মরণ করে।

ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই। পিতামাতা দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দেয়। কন্যার পণ পাঁচ টাকা, বরকন্যার এক সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন বিবাহের প্রধান কার্য্য। স্ত্রী বন্ধ্যা না হইলে ইহারা একাধিক বিবাহ করে না। ভাদ্র মাসে ভাদু ও চৈত্র মাসে চড়ক, ইহাদের বড় আমোদের সময়। ভাদুর তিন দিন ব্যভিচারে দোষ নাই, সকলেই

যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। কুমারী স্বৈরিণী হইলে নিন্দা হয় না। কুমারীকে "সেয়ান" করিবার অধিকার পাড়ার যুবকের, স্বামী জরিমানা দিলে যুবকেরা সে অধিকার ত্যাগ করিতে পারে। বোধ হয় এইরূপ কোন কারণ হইতে হিন্দু সমাজে মাতুল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

ইহারা মৃত দেহ দাহ করে। এব মৃতের মাথার হাড় কয়খানি সংগ্রহ করিয়া দামোদরে ভাসাইয়া দেয়।

নাচিতে ও বাঁশী বাজাইতে সাঁওতালদের বড় আমোদ, মাঝির বাড়ীর সম্মুখের মাঠে ভোজন সমাপন করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা সময়ে যুবকেরা গলায় ফুলের মালা ও মাথায় ময়ুর পাখা দিয়া একত্র হইয়া মাদল ও বাঁশী বাজায়। শব্দ পাইয়া যুবতীগণ হাতে বালা ও চুলে ফুলের সাজ করিয়া তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়। তখন হাত ধরিয়া বুকে পিঠে ছোঁয়াইয়া গোল হইয়া সকলে নাচিতে থাকে। সাঁওতালের ঝুমুর নাচ হিন্দুর রাসের মত। নাচিবার সময় গানও হয়।

সাঁওতাল বস্তিতে মোড়ল বা মাঝি ও পরামাণিক প্রধান। ছেলে মেয়েদের সচ্চরিত্র রাখিবার ভার মাঝির হাতে। পরামাণিক চাস বাসের তত্ত্বাবধারণ করে ও অতিথি সেবা করে।

বীরহোর জাতি মানভূম জেলায় বাস করে। ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা গ্রাম বাঁধিয়া থাকে না, এক এক স্থানে দু তিন ঘর একত্র থাকে। ইহারা পাহাড়ের গায়ে ডাল পাতা দিয়া ঘর করে। চার হাত একটী ঘরে সপরিবারে বাস করে। বড় বড় ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর থাকে। খেজুর পাতের চেটাই এক মাত্র শয্যা। ইহারা কৃষিকার্য্য করে না; যে চাষ করে, তাহার জাতি যায়। বনের পাখী, শশক ও ফল মূল খাইয়া দিনপাত করে। ইহারা অনেক দিন একস্থানে বাস করে না। ফল মূলের অভাব হইলে স্থানান্তরে উঠিয়া যায়। একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় গভীর বনের ভিতর দিয়া যায়, উপায়ান্তর না থাকিলেই সাধারণের গম্য পথ ব্যবহার করে।

পিতা মাতা বিবাহ স্থির করে, কন্যার পণ তিন টাকা। উৎসবে উভয় পক্ষ একত্র হইলে এক পক্ষ বরের অন্য পক্ষ কন্যার দ্রুতগামিতার সুখ্যাতি করে। অবশেষে পিতার আদেশ মত কন্যা ছুটিয়া পলায়, বর তাহার অনুসরণ করে এবং মধ্যে ধরিয়া তাহার সহিত সহবাস করিয়া উৎসবে ফিরিয়া আসে। তখন কন্যাকে নূতন শাড়ী পরাইয়া বর কন্যার কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে রক্ত লইয়া উভয়কে তিলক দিলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

ইহারা মৃত দেহ দাহ করিয়া ভস্ম গুলি নদী জলে ভাসাইয়া দেয়। মৃতাশৌচ দশ দিন, অশৌচান্তে ক্ষৌরি হইয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব একত্রে ভোজন করে। ইহাদের প্রধান দেবতা দেবী, সৃষ্টি ও নাশ কারিণী। আর সকলে তাহার কন্যা ও দৌহিত্রী। এক টুকুরা কাঠে সিঁদুর মাখাইয়া দৌহিত্রী বুড়িয়া মাই, বুড়িয়ার কন্যা বর্শার ফলা দুধামাই এবং একটী সিঁদুর মাখান ত্রিশুলকে দেবী দাস হনুমান বলিয়া পূজা করে। একটা মাটীর স্তুপ বিরভূত এবং একটুকুরা বাখারিতে সিঁদুর মাখাইলে দড়া বা সিপাহী য়। এই দড়া দড় পাহারা বা দ্বারপ্রহরী

নামে লোকদিগের মধ্যে বিখ্যাত এবং দক্ষিণ দ্বার নামে হিন্দু সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুরা দক্ষিণ দ্বার কালুরায়ের কাছে হাঁস বলি দেয়। এক খণ্ড কাঠে সিঁদুর মাখাইলে বনদেবী বনহী হয়। সর্প, ব্যাঘ্র ও দুর্দৈব হইতে দেবতা গণ রক্ষা করে।

কেহ কেহ বলে বীরহোরেরা পূর্ব্বে আপনার পিতামাতাকে ভক্ষণ করিত।

ক্রমশঃ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সাংখ্য তত্ত্বসমাস।

Kapil, Hartmann, Schopenhaeur ... hail substantially the same th... The oldest and the lastest ... of Philosophy though severed in time, by more than two thousand years, speak with the same voice. Davie's Hindu Philosophy. p. 151.

ভারতের দর্শন শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দর্শন শাস্ত্র বুঝি আর নাই। যে জর্ম্মান দার্শনিকগণ আজ সভ্য জগতে সর্ব্বপূজ্য, তাঁহাদের দর্শন শাস্ত্র, ও আমাদের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে বড় অধিক প্রভেদ নাই। বাস্তবিক জর্ম্মানিতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার হওয়ায়, আমাদের দর্শন শাস্ত্র সে দেশের লোকের মনের উপর কিরূপ আধিপত্য করিয়াছে, তাহা এই সকল জর্ম্মান দার্শনিক-দিগের দর্শন পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। স্পাইনোজা বল, কাণ্ট বল, ফিক্তে বল, হিগেল বল, হার্টম্যান বল, ইহাঁরা হয় বেদান্তবাদী, না হয় সাংখ্যবাদী। পণ্ডিত-বর ডেভি এই জন্য বলিয়াছেন, "It is interesting and also instructive to note, how often the human mind moves in a circle. The lastest German Philosophy * * * is mainly a reproduction of the Philosophic System of Kapila."

আর্য্য দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে আবার সাংখ্য-দর্শনই প্রকৃত দর্শন শাস্ত্র। আধুনিক মতে প্রকৃত দর্শনে ব্রহ্মমীমাংসা, কর্ম্মমীমাংসা, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সাংখ্যদর্শনেই কেবল একমাত্র জ্ঞানের আলোচনা আছে, অন্য কোন কথার মুখ্য উল্লেখ নাই। এই জন্য দার্শনিক ডেভি বলিয়াছেন, "The System of Kapila called the Sankhya or the Rationalistic, in its original form, and in its theistic development by Patanjali, contains nearly all that India has produced in the department of Pure Philosophy."

সাংখ্যদর্শন আবার পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকের ধর্ম্ম মতের উপর একাধিপত্য করিতেছে। শুষ্ক জ্ঞান, কূট দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব এত দূর বিস্তৃত হইতে পারে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত *। যে তন্ত্র শাস্ত্র প্রধানতঃ বঙ্গদেশকে, এবং পরোক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের উপর একাধিপত্য করিতেছে—তাহার মূল এই সাংখ্যদর্শন। আবার সকল শ্রেণীর আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবদিগের মূল ভিত্তিও এই সাংখ্য দর্শন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সাংখ্য-দর্শনের মূল গ্রন্থ কি, সে বিষয়ে অনেক মত-ভেদ আছে। অনেকেই সাংখ্য সূত্রকে

* "Budhism apparently owes its origin to the System of Kapila." Hindu Philosophy.

আধুনিক মনে করেন। সে রূপ মনে করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা এ স্থলে বলিবার আবশ্যক নাই। অনেকে সাংখ্য-কারিকাকেই সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ মনে করেন। এই কারিকায় সাংখ্য মত অতি সংক্ষেপে অথচ বিষদ করিয়া ব্যাখ্যাত আছে। আমরা পূর্ব্বে তাহার সার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছি।

এই কারিকা ও সাংখ্য সূত্র ব্যতীত সাংখ্যতত্ত্বসমাস নামক আর কয়টী সূত্র পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, তাহাই মহর্ষি কপিলের মূল সূত্র। এই পঁচিশটী সূত্রে সাংখ্যদর্শনের সমস্ত তত্ত্ব গুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই সূত্র গুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এই সূত্র গুলির আবার সরল ব্যাখ্যা আছে, অনেকে তাহাকেই প্রধান সাংখ্যবাদী পঞ্চশিখাচার্য্যের ব্যাখ্যা বলেন। সে ব্যাখ্যাও সহজলভ্য নহে। এ জন্য এ স্থলে সাংখ্য তত্ত্বসমাস ও তাহার ব্যাখ্যার সরল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ দেখিবেন,* কেমন অল্প কথায় অথচ অতি পরিষ্কার রূপে সাংখ্যের মূল তত্ত্ব গুলি বুঝান হইয়াছে। এই গুলি বুঝিলেই সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে আর অধিক জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না।

শ্রীগনেশায় নমঃ। কপিল মুনিকে নমস্কার। যিনি জন্মের দ্বারাই সৃষ্টির প্রথম হইতেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহর্ষি কপিলকে নমস্কার।

অনন্তর তত্ত্ব সমাস নামক সাংখ্য সূত্র ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

এই সংসারে কোন ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিলের শরণাগত হইয়াছিলেন। তিনি স্বাধ্যায় জন্য (বেদাধ্যয়ন বা অধ্যয়ন) নিজের কুল, নাম ও গোত্র আচার্য্যের নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এ সংসারে শ্রেষ্ঠ (পরং) কি ? প্রকৃত তথ্য (বা সত্য) কি ? কি করিলেই বা কৃতকৃত্য হইব ? (আমার কর্ত্তব্য করা হইবে)।

কপিল বলিলেন, বলিতেছি।

১। প্রকৃতি আট প্রকার। ২। (তাহার) বিকার ষোড়শ প্রকার। ৩। পুরুষ। ৪। ত্রৈগুণ্য ৫। সঞ্চর। ৬। প্রতিসঞ্চর। ৭। অধ্যাত্ম। ৮। অধিভূত। ৯। অধিদৈবত। ১০। বুদ্ধির ক্রিয়া পাঁচ রূপ। ১১। কর্ম্মযোনি পাঁচ প্রকার। ১২। পাঁচ বায়ু। ১৩। পাঁচ কর্ম্মাত্মা। ১৪। পাঁচ প্রকার অবিদ্যা। ১৫। অষ্টবিংশতি প্রকার অশক্তি। ১৬। তুষ্টি নয় প্রকার। ১৭। সিদ্ধি আট প্রকার। ১৮। দশটী মূল বিষয় (মূলিকার্থ)। ১৯। অনুগ্রহ সৃষ্টি। ২০। চতুর্দ্দশ প্রকার ভূত সৃষ্টি। ২১। তিন রূপ মূল সৃষ্টি। ২২। তিন প্রকার বন্ধন। ২৩। তিন প্রকার মোক্ষ। ২৪। প্রমাণ তিন প্রকার। ২৫। দুঃখ তিন প্রকার।

এই কয়টীই যথাতথ্য (মূল সত্য)। ইহাই সম্যক রূপে জানিলে কৃত কৃতার্থ হওয়া যায়, আর পুনর্ব্বার ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। ইহাই তত্ত্ব সমাস নামক সাংখ্যসূত্র।

১। অষ্ট প্রকৃতি।

অব্যক্ত বা (মূল প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র।—এই আট প্রকৃতি।

(১) অব্যক্ত।—লোকে যেমন, ঘট, পট, কুট ও শয্যা প্রত্যক্ষ করে—মূল প্রকৃতিকে সেরূপে জানা যায় না—এই জন্য ইহাকে অব্যক্ত বলে। অর্থাৎ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহা গ্রাহ্য নহে। ইহার অবয়ব নাই,

কারণ ইহার আদি, মধ্য, অন্ত নাই। ইহাই অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ও অব্যয়, অথচ নিত্য রস গন্ধাদি বর্জ্জিত। সুরিগণ বলেন, ইহার আদি নাই, মধ্য নাই, ইহা মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব। ইহা সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, ইহার আদি নাই, বিনাশ নাই। ইহা প্রসবধর্ম্মী, নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ (বা সকলের মূল)। ইহাই অব্যক্ত।

অব্যক্তের পর্য্যায় শব্দ এইঃ—অব্যক্ত, প্রধান, ব্রহ্ম, পুর, ধ্রুব, প্রধানক, অক্ষর, ক্ষেত্র, তমঃ, প্রসূত।

(২) বুদ্ধিঃ—বুদ্ধিই অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায় হইতেই গবাদি পদার্থ বিষয়ে আমাদের প্রতিপত্তি (জ্ঞান) হয় যে, এই অমুক—অন্য কিছু নহে। ইহা গরু, অশ্ব নহে—ইহা স্থানু, মনুষ্য নহে। ইহাই বুদ্ধি।

এই বুদ্ধির আট রূপ। (প্রথম) ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য।

(ক) ধর্ম্ম অধর্ম্মের বিপরীত, শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত কর্ম্মই ধর্ম্ম। ইহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নহে—এবং শুভ বা মঙ্গলের কারণ হয়।

(খ) জ্ঞান—অজ্ঞানের বিপরীত। ইহা হইতেই তত্ত্ব (সাংখ্য) ভাব (জ্ঞানের) ও ভূতের সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

(গ) বৈরাগ্য—ইহা অবৈরাগ্যের বিপরীত। ইহা হইতেই শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে আসক্তি নষ্ট হয়।

(ঘ) ঐশ্বর্য্য—ইহা অনৈশ্বর্য্যের বিপরীত। (অণিমাদি অষ্ট গুণকেই ঐশ্বর্য্য বলে। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, আর কামাবশায়িতা।)

বুদ্ধির এই চারি রূপ সাত্ত্বিক। বুদ্ধির অন্য চারি রূপ এই,—অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য।

(চ) অধর্ম্মঃ—অধর্ম্ম ধর্ম্মের বিপরীত। শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ কর্ম্মই অধর্ম্ম। ইহা শিষ্টাচারের বিরোধী। এবং ইহা অশুভের কারণ।

(ছ) অজ্ঞানঃ—জ্ঞানের বিপরীত। তত্ত্ব, ভাব ও ভূতের জ্ঞান না থাকা বুঝায়।

(জ) অবৈরাগ্যঃ—বৈরাগ্যের বিপরীত। ইহাতেই শব্দাদি বিষয়ে স্পৃহা জন্মে।

(ঝ) অনৈশ্বর্য্যঃ—ঐশ্বর্য্যের বিপরীত। ইহাতে অণিমাদি অষ্টগুণ বিহীন বুঝায়।

বুদ্ধির এই চারিরূপ তামসিক।

ধর্ম্মের নিমিত্ত উর্দ্ধে (স্বর্গে) গমন হয়। জ্ঞানের নিমিত্ত মোক্ষ হয়।

বৈরাগ্যের ফলে প্রকৃতি লয় হয়। ঐশ্বর্য্য জন্য—অপ্রতিহত গতি হয়। বুদ্ধির এই আটরূপ ব্যাখ্যাত হইল।

বুদ্ধির পর্য্যায় শব্দ এই—মন, মতি, মহান, ব্রহ্মা, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, শ্রুতি, ধৃতি, প্রজ্ঞান সন্ততি (train of thought) স্মৃতি, ধী, বুদ্ধি।

(৩) অহঙ্কারঃ—অভিমানই অহঙ্কার। আমি শব্দ করিতেছি (বা শুনিতেছি ?) আমি স্পর্শ করিতেছি, আমি রূপ দেখিতেছি, আমি রসাস্বাদন করিতেছি, আমি গন্ধ উপভোগ করিতেছি, আমিই স্বামী, আমিই ধনবান,আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি ধার্ম্মিক, আমি ইহাকে হত্যা করিয়াছি, আমি বলশালী শত্রুকে হনন করিব, —ইত্যাদি যে প্রতীতি, ইহাই অহঙ্কার।

অহঙ্কারের পর্য্যায় শব্দ এইঃ—অহঙ্কার বৈকারিক, তৈজস, ভূতাদি, সানুমান নিরনুমান। (Dependent or independent upon inference.)

(৪)—(৮) পঞ্চতন্মাত্রঃ—পঞ্চতন্মাত্র অহ:

ঙ্কার যুক্ত (অন্বিত)—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র—এই পাঁচ তন্মাত্র।

(৪) শব্দতন্মাত্র হইতে—শব্দ উপলব্ধি হয় (স্থূল বা পঞ্চীকৃত হইলে) উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অকম্পিত, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদাদি শব্দ বিষয়ের প্রভেদ বিশেষ উপলব্ধি হয়। কিন্তু মূল শব্দ তন্মাত্রের কোন বিশেষ নাই।

(৫) স্পর্শতন্মাত্র—স্পর্শেতে উপলব্ধি হয়। মৃদু, কঠিন, কর্কশ, পিচ্ছিল, শীত, উষ্ণাদি নানারূপ (বিশেষ) স্পর্শ উপলব্ধি হয়। কিন্তু মূল স্পর্শতন্মাত্রে কোন বিশেষ নাই।

(৬) রূপতন্মাত্র—রূপেতে উপলব্ধি হয়। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, হরিত, পীত, হরিদ্র, মাঞ্জিষ্ঠাদি রূপ বিশেষ (নানা প্রকার) উপলব্ধি হয়। কিন্তু মূল রূপতন্মাত্র অবিশেষ।

(৭) রসতন্মাত্র—রসেতে উপলব্ধি হয়। কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার, মধুর,* অম্ল; লবনাদি রস বিশেষ উপলব্ধি হয়। মূল রস তন্মাত্র অবশেষ।

(৮) গন্ধতন্মাত্র—গন্ধেতে উপলব্ধি হয়। সুরভি অসুরভি নানা প্রকার গন্ধ উপলব্ধি হয়। মূল গন্ধ তন্মাত্র একরূপ। এই পাঁচ তন্মাত্রের কথা বলা হইল।

ইহাদের পর্য্যায় শব্দ এই—তন্মাত্র, অবিশেষ, মহাভূত, প্রকৃতি, অভোগ্যা (লোকের ভোগোপযুক্ত নহে) অমু, অশান্ত, অঘোর, অমূঢ়।

প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র নামক এই অষ্টবিধ প্রকৃতির কথা বলা হইল। প্র কুর্ব্বন্তি, বা উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাদিগকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

২। ষোড়শ বিকার।

একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত—এই ষোড়শ বিকার।

(ক) এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

(১) শ্রোত্র (কর্ণ) ইহার দ্বারা শব্দ অনুভব হয়।

(২) ত্বক্,ইহাতে স্পর্শের বিষয় বুঝা যায়।

(৩) চক্ষু,ইহার দ্বারা রূপ বিষয় বুঝা যায়।

(৪) রসনা,ইহার দ্বারা রস বিষয় বুঝা যায়।

(৫) ঘ্রাণ—ইহাতে গন্ধ বিষয় বুঝা যায়।

(খ) আর বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহারা স্ব স্ব কর্ম্ম করে। (১) বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়। (২) হস্তে কর্ম্ম করা যায়। (৩) পদে বিহরণ বা গমন হয়। (৪) পায়ু দ্বারা মল ত্যাগ হয়। আর (৫) উপস্থের দ্বারা আনন্দ উপভোগ হয়।

(গ) আর মন উভয়াত্মক, অর্থাৎ ইহা দ্বারা সংকল্প ও বিকল্প রূপ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়।

এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যা করা হইল।

ইহাদের নামের পর্য্যায় এইঃ—ইন্দ্রিয়, করণ, বৈকারিক, নিয়ত, পদ, অবধৃত, অনু, ও অক্ষ।

(ঘ) তৎপরে পঞ্চমহাভূত।—পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচ মহাভূত।

(১) ইহার মধ্যে পৃথিবী ধারণ রূপে (কঠিনভাবে) প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা অন্যচারি ভূতের সমবায়ে কার্য্য উৎপন্ন করে।

(২) জল—ক্লেদনরূপে (বা তরলভাবে) প্রবর্তিত হয়। ইহা অন্যচারি ভূতের সাহায্যে ক্রিয়া করে।

(৩) অগ্নি—পাচক ভাবে ক্রিয়া করে। ইহাও ক্রিয়া কালে অন্য চারি ভূতের সহিত সম্মিলিত হয়।

(৪) বায়ু—[illegible]বন ভাবে প্রবর্ত্তিত। অন্য চারি ভূতের সহিত ইহা কার্য্য করে।

(৫) আকাশ—অবকাশ দানে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাও অন্য চারি ভূতের সহিত সংযুক্ত হয়।

পৃথিবী ভূতের, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটি গুণ। অপের, স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই চারিগুণ। তেজে, রূপ রস গন্ধ এই তিনগুণ আছে। বায়ুর, শব্দ ও স্পর্শ গুণ। আকাশ শুধু শব্দ রূপ একগুণ যুক্ত।

এই পাঁচ মহাভূতের কথা বলা হইল। ইহাদের নামের পর্য্যায় এই :—ভূত, ভূত-বিশেষ, বিকার, আকৃতি, তনু, বিগ্রহ, শান্ত, ঘোর, মূর্ত।

৩। পুরুষ।

পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিদ্, অমল, ও অপ্রসবধর্ম্মী।

পুরাণ বলিয়া, পুরিতে শয়ন করে বলিয়া, অথবা পুরোহিত বা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী জন্য ইহাকে পুরুষ বলে। ইহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই বলিয়া ইহা অনাদি। নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা সূক্ষ্ম। সর্ব্ব স্থানে বিরাজমান (সর্ব্বমাপ্তবান) এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত (আস্পদ) বলিয়া 'সর্ব্বগত'।

সুখ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া 'চেতন'।

ইহাতে সত্ব, রজ, বা তম গুণ নাই বলিয়া ইহা 'নির্গুণ'।

ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া নিত্য। প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া ইহা 'দ্রষ্টা'।

চেতন জন্য সুখ, দুঃখ, পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহা 'ভোক্তা'।

উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা 'অকর্ত্তা'।

ক্ষেত্র বা গুণদিগকে বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা 'ক্ষেত্রবিদ্'।

ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া ইহা 'অমল'।

নির্বীজ বলিয়া ইহা 'অপ্রসবধর্ম্মী' অর্থাৎ ইহা কিছুই উৎপন্ন করেনা। এই সাংখ্য পুরুষের ব্যাখ্যা হইল।

এই পুরুষের নামান্তর যথাঃ—পুরুষ, আত্মা, পুমান, পুংগুণজন্তুজীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সে, এই।

এই সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল—আট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার, আর পুরুষ।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞো যত্রকুত্রাশ্রমে রতঃ।
জটী, শিখী, খুণ্ডী (Shaven) বাপি
মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

এই পুরুষ কর্ত্তা কি অকর্ত্তা? ইনি অকর্ত্তা, কারণ কর্ত্তা হইলে সকল কর্ম্মই শুভ হইত। তিনরূপ বৃত্তি থাকিত না।

(এই বৃত্তি তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক)।

(১) ধর্ম্ম, সৌহিত (হিতকার্য্য) যম, নিয়ম, নির্বৈরিতা (শত্রুতা বিহীন) সম্যক বিবেচনা (প্রসংখ্যা) জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশক বৃত্তিই সাত্ত্বিকী।

(২) রাগ, ক্রোধ, লোভ, পরপরিবাদ, অতিরৌদ্রতা, অতুষ্টি, বিকৃত আকৃতিরূপ পরুষতা ইহারাই রাজসিক বৃত্তি।

(৩) উন্মাদ, মদ, বিষাদ, নাস্তিকা, স্ত্রী প্রসঙ্গিতা, নিদ্রা, আলস্য, নৈর্গুণ্য, ও অশৌচ, ইহাই তামসিক বৃত্তি।

এই বৃত্তিত্রয় দেখিয়াই জগতে গুণদিগের কর্তৃত্ব—এবং পুরুষ যে অকর্ত্তা, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

রজঃ ও তম গুণ জন্য বিপরীত দর্শন হয় বলিয়া, অবোধ পুরুষ আমি করিতেছি—প্রকৃতির এই গুণগুলি সম্বন্ধে—এই রূপ মনে করে। যে এক গাছি (সামান্য) তৃণকেও কুব্জ করিতে (বাঁকাইতে) অসমর্থ—সেই, এই সমস্ত আমি করিতেছি, আমারই সব, এইরূপ অবোধ অভিমানের দ্বারা উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তার মত হয়—বা কর্ত্তা বোধ করে।

যথা—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায় মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥
প্রকৃতৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥"
ইতি গীতা।

এই পুরুষ এক না বহু?

সুখ, দুঃখ, মোহ, শঙ্কর, বিশুদ্ধ, করণপটু, জন্ম, মরণ ইহাদিগের নানাত্মক জন্য এবং লোক আশ্রম ও জন্ম ভেদ জন্য বহু পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে। যদি পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে এক জন সুখী হইলে সকলেই সুখী হইত, একের দুঃখে সকলে দুঃখিত, এক মূঢ় হইলে সকলেই মূঢ়, এক সংকীর্ণ হইলে সকলে সংকীর্ণ, এক বিশুদ্ধ হইলে সকলে বিশুদ্ধ, একের জন্মে সকলের জন্ম, এবং একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হইত, এই হেতু পুরুষ এক নয় বহু সিদ্ধ হইতেছে। এই বহুত্ব জন্যই আকৃতি, গর্ভ (জন্ম) আশ্রয়, ভাগ্য, সঙ্গতি, বিভাগ ও লিঙ্গ বহুরূপ বা নানা প্রকার হইয়া থাকে।

কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, পতঞ্জলি প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু হরিহর, হিরণ্যগর্ভ ব্যাসাদি বেদান্তবাদী আচার্য্যগণ, আত্মা এক, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার কারণ এই যে (তাঁহারা বলেন) এই সমস্ত বিশ্বই পুরুষময়। যাহা কিছু হইয়াছে বা যাহা কিছু হইবে, বা যাহা অমৃত, তাহা সমস্তই এই ঈশান (আত্মা) ইহা অন্যের দ্বারা অতিরোহিত হয় না। ইহাই অগ্নি, ইহাই আদিত্য, ইহাই বায়ু, ইহাই চন্দ্র। ইহাই একমাত্র শুক্র, ইহা ব্রহ্ম, ইহাই অপ্, এবং ইহাই প্রজাপতি। ইহাই সত্য, ইহাই অমৃত, ইহাই মোক্ষ, ইহাই পরাগতি। ইহাই অক্ষর, ইহাই 'সবিতুর্ব্বরেণ্যং' ইহা অপেক্ষা অপর আর কিছুই শ্রেষ্ঠ (পর) নাই। ইহা ব্যতীত কিছুই পুরাণ বা নূতন নাই।

ইহা বৃক্ষের ন্যায় (স্থির) ভাবে দিব্যালোকে অবস্থিত রহিয়াছে। এই পুরুষের দ্বারা সমস্ত (জগৎ) পূর্ণ রহিয়াছে। (পুরুষ সম্বন্ধে সাংখ্যাকারের প্রকৃত মত কি, তাহা নবজীবননে গত ভাদ্র সংখ্যায় 'ত্রিগুণ ও সৃষ্টি' প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে।)

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বেষাং প্রভু মীশানং সর্ব্বস্য শরণং মহৎ॥
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতত্ত্বানি, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বসম্ভবঃ।

সর্ব্ব নিলীয়তে যস্মিন্, তদ্ ব্রহ্মমুনয়োবিদুঃ॥
এক এব হি ভূতাত্মা দেহে দেহে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
সহি সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চৎ।
বসত্যেকো মহানাত্মা যেন সর্ব্বমিদং ততঃ॥
একোয়ং আত্মা জগতং সকেন বহুধাকৃতঃ।
পৃথক্ বদন্তি চাত্মানং জ্ঞানাদিক প্রবর্ত্তনে॥
ব্রাহ্মণে কৃমি কীটেষু স্বপাকে শুনি হস্তিনি।
পশুগোদংশমশকে সমং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ॥
একমেব যথা সূত্রং সুবর্ণে বর্ত্ততে পুনঃ।
মুক্তা মণি প্রবালেষু মৃন্ময়ে রজতে তথা॥
তদ্বদ্দোষু মনুষ্যেষু তদ্বদ্ধস্তি মৃগাদিষু।
একোঽমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বত্রৈব ব্যবস্থিতঃ॥

৪। ত্রিগুণ।

ত্রিগুণ কি? সত্ব,রজঃ,তমঃ, এই ত্রিগুণ। ত্রিগুণের ভাবকেই ত্রৈগুণ্য কহে।

(১) সত্ব—প্রসাদ, লাঘব, প্রসন্ন, অভীষ্ট, গতি, তুষ্টি, তিতিক্ষা, সন্তোষ, ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা অনন্তভেদযুক্ত এই সত্বগুণকে সংক্ষেপতঃ সুখাত্মক বলা যায়।

(২) রজঃ—শোক, তাপ, ভেদ, উদ্বেগ, দোষ, গমনাদি লক্ষণের দ্বারা অসংখ্য ভেদযুক্ত এই রজঃগুণ সংক্ষেপে দুঃখাত্মক বলা যায়।

(৩) তমঃ—আচ্ছাদন, অজ্ঞান, বীভৎস, গৌরব (গুরুত্ব),আলস্য,নিদ্রা,প্রমাদ, ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা অসংখ্য রূপে বিভক্ত এই তমোগুণকে সংক্ষেপতঃ মোহাত্মক বলা যায়। এই ত্রৈগুণ্য ব্যাখ্যাত হইল।—

"সত্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকং।
তমোহপ্রকাশকং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম সংজ্ঞিতং॥"

৫। সঞ্চর। ও ৬। প্রতিসঞ্চর।

সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর কাহাকে বলে? উৎপত্তিই সঞ্চর (Evolution), আর প্রলয়ই প্রতিসঞ্চর (Dissolution)।

সঞ্চর বা উৎপত্তির ক্রম এইঃ—

(১) সঞ্চরঃ—পূর্ব্বোল্লিখিত অব্যক্ত হইতে, এবং এই প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, সর্ব্বগত ও শ্রেষ্ঠ পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। এই বুদ্ধি অষ্টগুণযুক্ত। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কার ত্রিবিধ। বৈকারিক, তৈজস্ ও ভূতাদি। এই বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দেবতা ও ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে। আর ভূতাদি অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র হইয়াছে। এবং তৈজস্ (অহঙ্কার) হইতে উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে! তন্মাত্র হইতে ভূত সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ব।

(২) প্রতি সঞ্চরঃ—ইহার ক্রম এই—ভূত সকল তন্মাত্রে লীন হয়। তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কারে লীন হয়। অহঙ্কার বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধি অব্যক্তে বিলীন হয়। অব্যক্ত আর কিছুতেই লীন হয় না। কারণ ইহা সৃষ্ট নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি বা অব্যক্ত উভয়ই অনাদি। এই প্রলয় তত্ব ব্যাখ্যাত হইল। (সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ব সবিস্তারে নবজীবনে 'ত্রিগুণ ও সৃষ্টি' প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে।)

৭।৮।৯।—অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবত।

(১) বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোধয়িতব্য অধিভূত, এবং ব্রহ্মা তাহার অধিদৈবত।

(২) অহঙ্কার—অধ্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত, এবং রুদ্র তাহার অধিদৈবত।

(৩) মন—অধ্যাত্ম, সঙ্কল্পিতব্য অধিভূত, এবং চন্দ্র তাহার অধিদৈবত।

(৪) শ্রোত্র—অধ্যাত্ম, শ্রোতব্য অধিভূত, এবং আকাশ তাহার অধিদৈবত।

(৫) চক্ষু অধ্যাত্ম, দ্রষ্টব্য অধিভূত, এবং আদিত্য তাহার অধিদেবতা।

(৬) ত্বক অধ্যাত্ম, স্পর্শয়িতব্য অধিভূত, এবং বায়ু তাহার অধিদেবতা।

(৭) জিহ্বা অধ্যাত্ম, রসয়িতব্য অধিভূত, এবং বরুণ তাহার অধিদেবতা।

(৮) ঘ্রাণ অধ্যাত্ম,ঘ্রাতব্য অধিভূত, এবং পৃথ্বী তাহার অধিদেবতা।

(৯) বাক্ অধ্যাত্ম, বক্তব্য অধিভূত, এবং বহ্নি তাহার অধিদেবতা।

(১০) পাণি অধ্যাত্ম, গ্রহীতব্য অধিভূত, এবং ইন্দ্র তাহার অধিদেবতা।

(১১) পাদ অধ্যাত্ম, গন্তব্য অধিভূত, এবং বিষ্ণু তাহার অধিদেবতা।

(১২) পায়ু অধ্যাত্ম, উৎসৃষ্টব্য অধিভূত, এবং মিত্র তাহার অধিদেবতা।

(১৩) উপস্থ অধ্যাত্ম, আনন্দয়িতব্য অধিভূত, এবং প্রজাপতি তাহার অধিদেবতা।

এইরূপ প্রত্যেক ত্রয়োদশ করণের অধ্যাত্ম,অধিভূত এবং অধিদেবতা হইতেছে

"তত্বানি যো বেদয়তে যথাবৎ।
গুণ স্বরূপাণ্যধিদৈবতশ্চ।
বিমুক্ত পাপ্মা গতদোষ সঙ্গ।
গুণাংস্তু ভুংক্তেন গুণৈঃ ন যুজ্যতে॥"

১০। পঞ্চবুদ্ধি।

পঞ্চবুদ্ধি কি?—(১) ব্যবসায় (অধ্যাবসায়) (২) অভিমান, (৩) ইচ্ছা, (৪) কর্ত্তব্যতা (৫) ক্রিয়া।

(১) অধ্যবসায়—আমাকে ইহা করিতে হইবে (করণীয়) যাহার দ্বারা ইহা স্থির করা যায়, তাহাই ব্যবসায় বুদ্ধি। (বুদ্ধিবৃত্তি।)

(২) অভিমান আত্ম ও পরাত্ম রূপ যে প্রত্যয় তাহাই অভিমান। ইহা অহঙ্কার বুদ্ধির ক্রিয়া।

(৩) ইচ্ছা—ইচ্ছা, বাঞ্ছা ও সংকল্প ইহা মানসবুদ্ধির ক্রিয়া।

কর্ত্তব্যতা—শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় গুলিকে, শব্দাদি বিষয়ে নিয়োগ করিবার যে বুদ্ধি ক্রিয়া তাহাই কর্ত্তব্যতা। ইহা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ক্রিয়া।

(৫) ক্রিয়া—কর্ম্মেন্দ্রিয়দিগের বচনাদি রূপ যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বুদ্ধি ক্রিয়া।

এই পাঁচরূপ বুদ্ধির বিষয় ব্যাখ্যাত হইল।

১১। পাঁচ কর্ম্মযোনি।

পাঁচ কর্ম্মযোনি (Sources of action) কি কি?—(১) ধৃতি, (২) শ্রদ্ধা, (৩) সুখ, (৪)অবিবিদিষা (৫) ও বিবিদিষা, এই পাঁচ কর্ম্মের মূল সূত্র।

(১) ধৃতি—বাহ্যকর্ম্ম সংকল্প করিয়া যাহাতে সেই সংকল্প রক্ষা হয়, এবং তাহাতেই স্থিত (তৎধৃত্তি স্থিত) হইয়া পরিশেষে তাহা প্রতিষ্ঠা বা সাধন করিতে পারা যায়, ইহাই ধৃতির লক্ষণ।

(২) শ্রদ্ধা—(Faith) স্বাধ্যায়, (বেদপাঠ) ব্রহ্মচর্য্য, যজন, যাজন, তপ, দান, প্রতিগ্রহ, হোম, ইহাই শ্রদ্ধার লক্ষণ।

(৩) সুখ—বিদ্যা কি কর্ম্ম (ধর্ম্মকর্ম্ম) কি তপ, সমস্তই যখন সুখার্থ উপার্জ্জন (উপভোগ) করা হয়, অথবা সর্ব্বদা সুখাভিলাষে মতি হয়, তাহাকে (অথবা সেরূপ কর্ম্মযোনিকে) সুখ বলা হয়।

(৪) অবিবিদিষা—(জ্ঞানে অনিচ্ছা) বিষয় মধুমিশ্রিত অন্তকরণ হওয়াই অবিবিদিষা।

(৫) বিবিদিষা (জ্ঞানের ইচ্ছা) ইহাই ধ্যানি (যোগী) দিগের প্রজ্ঞান যোনি। (জ্ঞানোপার্জ্জনের মূলীভূত কারণ।)

একত্ব (প্রকৃতির) পৃথকত্ব (আত্মা ও প্রকৃতির) নিত্য (ঐ) অচেতন (প্রকৃতি) সূক্ষ্ম (মূল প্রকৃতি) কার্য্যের অস্তিত্ব ও মোক্ষ (পরিসমাপ্তি) প্রভৃতি যে জ্ঞান দ্বারা জানিতে ইচ্ছা হয়,তাহাই বিবিদিষা বৃত্তি, বিবিদিষা = কার্য্য কারণ ক্ষয়কারী প্রাকৃতিকী বৃত্তি।

এই পাঁচ কর্ম্ম যোনির ব্যাখ্যা হইল। "বাহ্‌ কর্ম্মাণি সংকল্প্য প্রতীতং যোঽভি রক্ষতি।
তন্নিষ্ঠস্তৎ প্রতিষ্ঠশ্চ ধৃতেরেতদ্ধি লক্ষণং" ॥
স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যজনং যাজনং তপঃ।
দানং প্রতিগ্রহোহোমঃ শ্রদ্ধায়ালক্ষণং স্মৃতং ॥
সুখার্থং বস্তু সেবেত বিদ্যা কর্ম্মতপাংসিত।
প্রায়শ্চিত্ত পরোনিত্যং সুখেয়ং পরিকীর্ত্তিতা ॥
একত্বঞ্চ পৃথত্বঞ্চ নিত্যঞ্চৈবমচেতনম্।
সূক্ষ্ম সৎকার্য্য মক্ষোভ্যং জ্ঞেয়া বিবিষাতসা।
কার্য্য কারণ ক্ষয়করী বিবিদিষা প্রাকৃতিকী বৃত্তি।

১২। পঞ্চবায়ু।

পঞ্চবায়ু কি কি ?—(১) প্রাণ (২) অপান (৩) সমান, (৪) উদান, (৫) ব্যান। এই পাঁচ বায়ু শরীরীদিগের শরীরে অবস্থিত আছে।

(১) প্রাণ নামক বায়ু—মুখ ও নাসিকাতে অধিষ্ঠিত। প্রায়ণ (inspiration) ও উৎক্রমণ (respiration) হইতে ইহা প্রাণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

(২) অপান নামক বায়ু—নাভিতে অধিষ্ঠিত। ইহা অপনয়ন বা অধোগমন করায় বলিয়া অপান।

(৩) সমান নামক বায়ু—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ইহা সমনয়ন বা সমগমন করায় বলিয়া সমান।

(৪) উদান নামক বায়ু কণ্ঠে অবস্থিত। ইহা ঊর্দ্ধ গমন বা উৎক্রমণ করায় বলিয়া ইহাকে উদান বায়ু বলে।

(৫) ব্যান নামক বায়ু ইহা সর্ব্বব্যাপক। এই পঞ্চবায়ুর বিষয় ব্যাখ্যাত হইল।

১৩। পঞ্চ কর্ম্মাত্মা।

পঞ্চ কর্ম্মাত্মা কি কি ?—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস (৩) ভূতাদি, (৪) সানুমান এবং (৫) নিরনুমান।

ইহার মধ্যে বৈকারিক শুভকর্ম্ম কর্ত্তা। তৈজস অশুভ কর্ম্মকর্ত্তা। ভূতাদি নিগূঢ় কর্ম্মকর্ত্তা। সানুমান শুভমূঢ় কর্ম্ম কর্ত্তা। আর নিরনুমান অশুভমূঢ় কর্ম্মকর্ত্তা। এই পঞ্চ কর্ম্মাত্মা ব্যাখ্যাত হইল।

১৪। পঞ্চ পর্ব্বা অবিদ্যা।*

পঞ্চ অবিদ্যা এই—(১) তম, (২) মোহ, (৩) মহামোহ, (৪) তামিস্র, ও (৫) অন্ধতামিস্র। ইহার মধ্যে তমঃ ও মোহ উভয়ে আট প্রকার। মহামোহ দশাত্মক, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—অষ্টাদশবিধ।

(১) তমঃ—অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্র এই আট প্রকৃতিরূপ অনাত্ম পদার্থে আত্মাভিমান করাকেই তমঃ নামক অবিদ্যা বলে।

(২) মোহ।—অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যে মোহ উৎপন্ন হয়, তাহাই মোহ নামক অবিদ্যা। (অথবা অবিদ্যা বিষয়ভেদে অষ্টবিধ হওয়ায় তাহার সমান বিষয়বাচক অস্মিতাকেই মোহ বলে।)

(৩) মহামোহ—পঞ্চ দৃষ্ট (মানুষের দ্বারা) এবং পঞ্চ অনুশ্রাবিক (দেবতাদির

---

* বিপর্য্যয় ভেদাঃ পঞ্চ (৩।৩৭)

"অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচ যোগোক্ত বন্ধন হেতুই বিপর্য্যয়। পাতঞ্জল ২।৩—৯।

দ্বারা) যে সকল শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের দশ বৃত্তি তাহাতে আমি মুক্ত হইব, এইরূপ মনে করাই মহামোহ। (অথবা অদিব্য ও দিব্য-ভেদে শব্দাদি বিষয় দশরূপ হওয়ায়—তদ্বিষয়ের অনুরাগকে মহামোহ বলে)।

(৪) তামিশ্র—অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যে এবং দশবিধ বিষয়ে তিন রূপ অপ্রতিহত দুঃখ উৎপাদন করে বলিয়া, তাহাদের প্রতি যে দ্বেষ হয়—তাহাই তামিশ্র নামক অবিদ্যা। (অথবা আট অবিদ্যা বা অস্মিতা এবং দশরূপ বিষয়ানুরাগ—তাহারই প্রতি যে বিদ্বেষ—তাহাই তামিশ্র।)

(৫) অন্ধতামিশ্র—অণিমাদি অষ্টরূপ ঐশ্বর্য্য দশরূপ বাহ্য বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াও মরণকালে যে বিষাদ উৎপন্ন হয়, তাহাই অন্ধতামিশ্র। (অথবা এই অষ্টাদশ বিষয়ের বিনাশাদি দর্শন করিয়াও তাহাতে যে অভিনিবেশ তাহাই অন্ধতামিশ্র।)

এই পাঁচ রূপ অবিদ্যায়, দ্বিষষ্টি প্রকার ভেদের কথা ব্যাখ্যাত হইল।

১৫। অষ্টবিংশতি আশক্তি।*

অষ্টবিংশতি প্রকার অশক্তি কি কি? একাদশ ইন্দ্রিয় বধ ও সপ্তদশ বুদ্ধিবধ এই অষ্টবিংশতি প্রকার অশক্তি।

(১) একাদশ ইন্দ্রিয়বধ এইগুলিঃ—কর্ণে বধিরতা, জিহ্বায় জড়তা, ত্বকে কুষ্ট, চক্ষুতে অন্ধত্ব, নাসিকার অঘ্রাণত্ব, বাগিন্দ্রিয়ের মুকত্ব (বোবা) হস্তের কুণিত্ব (ঠুঁটো) পদে পঙ্গুত্ব (খোঁড়া) পায়ুতে উদাবর্ত্ত (constipation) উপস্থ ইন্দ্রিয়ে ক্লৈব্য (impotence) এবং মনে উন্মাদ—এই একাদশ ইন্দ্রিয় বধ।

(২) সপ্তদশ বুদ্ধিবধ—তুষ্টি ও সিদ্ধির বিপর্য্যয়ই এই সপ্তদশ বুদ্ধিবধ।

(ক) তুষ্টি বিপর্য্যয়ের কথা বলা হইতেছে;—

(১) প্রধান (প্রকৃতি)—নাই, এই যে বিশ্বাস ইহা 'অনন্তা' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয়।

(২) এই রূপ মহত্তত্ত্বে আত্মজ্ঞানই 'তামসলীলা' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয়।

৩।—আর অহঙ্কার না বুঝিলেই (অদর্শনে বা Non recognition) 'অবেদ্যা' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয়।

৪।—ভূতের কারণ স্বরূপ তন্মাত্র সকল নাই, এইরূপ বিশ্বাসই 'অবৃষ্টি' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয়।

৫।—দশ ইন্দ্রিয় বিষয়কে (object of sense) অর্জন করিবার প্রবৃত্তিকে 'অসুতারা' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয় বলে।

৬।—তাহাদিগকে রক্ষণে যে প্রবৃত্তি তাহাই 'অসুপারা' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয়।

৭।—ক্ষয় দোষ (evils of waste) না দেখিয়া অর্থে যে প্রবৃত্তি তাহাই 'অসুনেত্রী' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয়।

৮।—ভোগে যে আশক্তি তাহাকে 'অসুমরীচি' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয় বলে।

৯।—ভোগ বিশেষে যে প্রাণিবিশেষকে হিংসা করা (injury) রূপ দোষ হয়, তাহা দেখিয়া বুঝিয়া যে ভোগে লিপ্ত হওয়া, তাহাই 'অসুত্তমম্ভসিকা' নামক তুষ্টি বিপর্য্যয়।

তুষ্টির বিপর্য্যয় রূপ এই যে নয় প্রকার অতুষ্টি তাহা ব্যাখ্যাত হইল।

(খ) সিদ্ধি বিপর্য্যয়ের কথা বলা হইতেছে। এই অসিদ্ধি আট প্রকার কথিত হইয়া থাকে।

* "একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তি রুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধে র্বিপর্য্যয়াৎ তুষ্টিসিদ্ধিনাম্॥
বাধির্য্যং কুষ্ঠিতান্ধত্বং জড়তা জিঘ্রতা তথা।
মুকতা কৌণ্যপঙ্গুত্বে ক্লৈব্যোদাবর্তমুগ্ধতা॥
ইতি কারিকা।

১।—ভূত মাত্রের (phenomenal creation) নানাত্বকে একত্ব বলিয়াবোধ হয় (পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে একরূপ প্রতীয়মান হয়) তাহাকে ‘অতার’ নামক সিদ্ধি বিপর্য্যয় বলে।

২।—শব্দ মাত্র শ্রবণে তাহার বিপরীত গ্রহণ করাকে (উপদেশ পাইয়াও তাহার বিপরীত জ্ঞান) ‘অসুতার’ নামক সিদ্ধি বিপর্য্যয় বলে। যেমন নানাত্বজ্ঞ ব্যক্তি (পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞ ?) মুক্ত হয়, ইহা শ্রবণ করিয়া ও উপদেশ পাইয়াও ইহার বিপরীত অর্থাৎ ইহা নানাত্বজ্ঞ মুক্ত হয় না, সিদ্ধান্ত করা, তাহাই অসুতার নাম অসিদ্ধি।

৩।—অধ্যয়ন ও শ্রবণে অভিনিবিষ্ট হইয়াও জড়ত্ব জন্য (obtuseness) এবং অসৎ শাস্ত্রের দ্বারা উপহত বুদ্ধি জন্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধি না হওয়াই ‘অতারতার’ নামক অজ্ঞান।

৪। আধ্যাত্মিক দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়াও যে এই সংসারে অনুদ্বেগ বশতঃ অজিজ্ঞাসু ব্যক্তির (পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিষয়ে অজিজ্ঞাসু ব্যক্তির) জ্ঞানোপার্জ্জনে আনন্দ না হয়, তাহার ‘অপ্রমোদ’ নামক সিদ্ধি বিপর্য্যয় হয়।

৫ ও ৬।—এইরূপ ‘অপ্রমুদিত’ ও ‘অপ্রমোদমান’ নামক দুই রূপ সিদ্ধি বিপর্য্যয়ের বিপরীত ধরিতে হইবে। প্রমুদিত ও প্রমোদমান নামক সিদ্ধির বিষয় পরে দ্রষ্টব্য।

৭। সুহৃদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াও অনিশ্চয় বুদ্ধির যে অজ্ঞান, তাহাই ‘অরম্য’ নামক সিদ্ধি বিপর্য্যয়।

৮। অসম্যক বা (অসম্পূর্ণ) বচন উপদেশ দ্বারা অথবা গুরু পরাঙ্মুখ হওয়ায় যে দুর্ভাগার জ্ঞান সিদ্ধি হয় না, তাহার সিদ্ধি বিপর্য্যয়কে ‘অসৎপ্রমুদিত’ বলে।

এই আট প্রকার সিদ্ধির বিপর্য্যয় অথবা অসিদ্ধির বিষয় বলা হইল। এই সর্ব্বশুদ্ধ (১১ ও ১৭) অষ্টবিংশতি প্রকার অশক্তি ব্যাখ্যাত হইল।

১৬। নবধা তুষ্টি।*

নয় প্রকার তুষ্টি কি কি ?

১।—প্রকৃতিই যে পরমাত্মা ইহা স্থির করিয়া যে নিশ্চিন্ত থাকে (মধ্যস্থ লাভ করে) তাহার যে তুষ্টি, তাহাই তান্ত্রিক বা সাধারণ) সংজ্ঞামতে ‘অম্ভ’ (তুষ্টি) বলে।

২।—অন্য লোকে বুদ্ধিকেই পরমাত্মা সিদ্ধান্ত করিয়া যে পরিতুষ্ট থাকে, তাহার তুষ্টিকে ‘সলিল’ নামক তুষ্টি বলা যায়।

৩।—অপরে অহঙ্কারকেই পরমাত্মা কল্পনা করিয়া পরিতুষ্ট থাকে, তাহার তুষ্টিকে ‘ওঘ’ বলে।

৪—কেহ কেহ অভোগ্য পঞ্চতন্মাত্রকেই পরমাত্মা নিশ্চয় করিয়া পরিতুষ্ট হয়, তাহার তুষ্টিকে বৃষ্টি বলা হয়।

উপরোক্ত চারি প্রকার তুষ্টিকে আধ্যাত্মিক তুষ্টি বলে। এই চারিরূপ তুষ্টি থাকিলে তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব হয়, বলিয়া তাহা দ্বারা মোক্ষ হয় না।

অর্থার্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, আসক্তি, হিংসাদি, বাহ্য বিষয়ের দোষ দর্শনে বিষয় ত্যাগ করাই অন্য পঞ্চ রূপ তুষ্টি।

৫।—অর্থার্জ্জনে দোষ দর্শন করিয়া অতুষ্ট হইয়া পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) হইলে তাহারও মোক্ষ নাই—কারণ তাহার তত্ত্বজ্ঞান নাই। এই পঞ্চম তুষ্টিকে ‘সুতার’ বলা হয়।

---

* আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ। সাংখ্যসূত্র (৩।৪) আধ্যাত্মিকাশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদান কাল ভাগ্যাখ্যাঃ ॥ বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিহিতাঃ ॥ ইতি কারিকা।
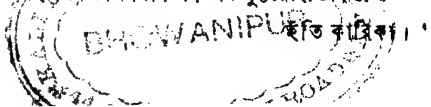
৬।—সেইরূপ অর্থ রক্ষণে দোষ দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া পরিব্রাজক হইলে, তাহারও তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব জন্য মোক্ষ নাই। ইহাই 'সুপার' নামক ষষ্ঠী তুষ্টি।

৭।—আবার অর্থক্ষয়ে দোষ দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া পরিব্রাজক হইলে তাহার তত্ত্বজ্ঞান অভাবে মোক্ষ নাই। এই রূপ 'সুনেত্রা' নামক সপ্তম তুষ্টি বলে।

৮।—অপরে অর্থের সঙ্গ দোষ দর্শনে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া তুষ্টি বশত পরিব্রাজক হইলেও তাহার তত্ত্বজ্ঞানাভাব জন্য মোক্ষ নাই, এরূপ অষ্টম তুষ্টিকে 'সুমরীচিক' বলে।

৯।—অন্যে অর্থ নিমিত্ত প্রাণি (ভূত) হিংসাদি দোষ দেখিয়া তুষ্টী অবলম্বনপূর্ব্বক, পরিব্রাজক হইলে তাহারও তত্ত্বজ্ঞান অভাবে মোক্ষ নাই। এই নবম তুষ্টী উত্তম ও 'সাত্তিকী' নামে অভিহিত। কোন কোন মতে এই শেষ চারি টির নাম প্রকৃতি, উপাদান, কাল, ভাগ্য বিবেক জন্য ধ্যান ত্যাগ—প্রকৃতি। পরিব্রাজক হইয়া ধ্যান ত্যাগ—উপাদান। সন্ন্যাস অবলম্বনে মোক্ষ আশা—কাল। অদৃষ্টফলে মোক্ষ আশা—ভাগ্য।

এই নয় প্রকার তুষ্টি ব্যাখ্যাত হইল।

১৮। অষ্টসিদ্ধি।*

অষ্ট সিদ্ধি কি কি?

১।—তত্ত্ব, ভাব ও ভূত সম্বন্ধে বিচার দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই প্রথম সিদ্ধি, 'তার' নামে অভিহিত হয়।

২।—তত্ত্ব, ভাব ও ভূত সম্বন্ধে শব্দমাত্রেই (শুনিবামাত্রেই) যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই দ্বিতীয় সিদ্ধি 'সুতার' নামে অভিহিত হয়।

৩।—তত্ত্ব, ভাব ও ভূত বিষয়ে অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই তৃতীয় সিদ্ধি 'তারয়ন্তী' নামে অভিহিত হয়।

৪।—আধ্যাত্মিক দুঃখের অপনোদন দ্বারা তত্ত্ব, ভাব, ও ভূত বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই চতুর্থ সিদ্ধি 'প্রমোদ' নামে অভিহিত হয়।

৫।—আধিভৌতিক দুঃখের অপনোদন দ্বারা তত্ত্ব, ভাব ও ভূত বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্চম সিদ্ধি 'প্রমোদিত' নামে অভিহিত হয়।

৬।—আধিদৈবিক দুঃখের অপনোদন দ্বারা তত্ত্ব, ভাব ও ভূত বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ষষ্ঠ সিদ্ধি 'প্রমোদমান' নামে অভিহিত হয়।

৭।—ব্যাপক কাল স্নিগ্ধ সংসর্গ (স্নেহযুক্ত বন্ধুর সহবাস) হইতে তত্ত্ব ভাব ও ভূত বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সপ্তম সিদ্ধি 'রম্যক' নামে অভিহিত।

৮।—পরিচর্য্যা করিয়া (দান করিয়া) গুরুকে পরিতুষ্ট করিলে, তত্ত্ব ভাব ও ভূত বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অষ্টম সিদ্ধি 'সৎপ্রমুদিত' নামে অভিহিত হয়।

এই আট সিদ্ধির বিষয় ব্যাখাত হইল।

১৮। দশ মূলিকার্থ।

দশ মূলিকার্থ (absolute truths) কি কি?

(১)। অস্তিত্ব, (২) একত্ব (৩) অর্থবত্ব, (৪) পরার্থত্ব (৫) অন্যত্ব (৬) অকর্তৃত্ব, (৭) যোগ, (৮) বিয়োগ (৯) বহু (পুরুষ,) ও (১০) শরীরের বিশেষ বৃত্তি-স্থিতি।

(১) অন্যের জন্য সংঘাত (সংযুক্ত)

---

* টিকা। সাংখ্যসূত্র— [illegible]
[illegible] হধ্যায়ন দুঃখ বিঘাতাস্ত্রয়ং সুহৃৎ প্রাপ্তি।
[illegible] সিদ্ধয়োহষ্টৌ [illegible] (প্রভি) [illegible]
ইতি কারিকা।
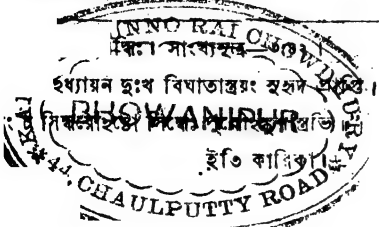
হইয়াছে (সংঘাতপরার্থত্বাৎ) এই জন্য পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

এবং ভিন্ন ভিন্ন অনিত্য পদার্থের (ভেদানাং) পরিণাম হইতেই তাহার অব্যক্ত কারণ আছে, এইরূপ কার্য্য কারণ পর্য্যায়ের দ্বারা প্রধানেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

(২) হেতুমৎ অনিত্য বলিয়া একত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

(৩) প্রীতি অপ্রীতি বিষাদাত্মক ও ত্রিগুণাত্মক জগৎ (ইত্যাদি) বলিয়া অর্থমত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

(৪) নানাবিধ উপায়ের দ্বারা আত্মার কার্য্য করিতেছে বলিয়া পরার্থত্ব সিদ্ধ।

(৫) ত্রিগুণ অবিবেকী ও বিষয়াত্মক বলিয়া ইহার অন্যত্ব (পুরুষ হইতে ভিন্নত্ব) সিদ্ধ হইতেছে।

(৬) তাহার বিপর্য্যয় (বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া) অকর্তৃত্ব (পুরুষের) সিদ্ধ হইল।

পুরুষের দর্শনের জন্য ও কৈবল্য জন্য (পুরুষ দেখিতে পাইবে এবং দেখিয়া মুক্ত হইবে বলিয়া) এবং প্রধানেরও সেই অভিপ্রায়ে পরস্পরের যোগ সিদ্ধ হইতেছে।

(৮) পুরুষের অর্থসিদ্ধি হইলে (চরিতার্থ হইলে) শরীর হইতে তাহার ভেদ (বিচ্ছেদ) সম্পাদিত হয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে বিয়োগ (প্রেভেদই) সিদ্ধ হইতেছে।

(৯) জন্ম, মরণ, ও করণ (১০) হইতে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

(১০) (কুম্ভকারের) চক্রভ্রমণবৎ শরীরের (মুক্তির পরেও) স্থিতি (রূপ) বিশেষ বৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে। এই দশ মূলি কার্থ ব্যাখ্যাত হইল।

(আট সিদ্ধি, নয় তুষ্টি) এই সপ্তদশ এবং পূর্ব্বোপদিষ্ট (অষ্টবিংশ অশক্তি ও পঞ্চ অবিদ্যা) সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ প্রত্যয়(intellectual modifications) এবং এই দশ (মূলিকার্থ) এই ষাট ৬০ বিষয়কেই 'ষষ্টিতন্ত্র' (System of sixty) বলা হয়।

১৯। অনুগ্রহ সর্গ।

অনুগ্রহ সর্গ কি? পঞ্চতন্মাত্র হইতে বাহ্য পদার্থের সৃষ্টিই অনুগ্রহ সর্গ। মনজ ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইলে তাহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়া আধার বর্জ্জিত (রহিয়াছে) দেখিয়া ব্রহ্মা সেই সকল তন্মাত্র হইতে অনুগ্রহসর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

২০। চতুর্দ্দশবিধ সর্গ।

চতুর্দ্দশবিধ সর্গ কি কি?——

(১) আট বিকল্প—দৈব, পৈশাচী, রাক্ষসী, যাক্ষী, গান্ধর্ব্ব্য, ঐন্দ্র, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, এই আট দেব যোনি।

(২) পাঁচরূপ তির্য্যক যোনি—পশু (domestic) পক্ষী, মৃগ (wild, ferocious) সরিসৃপ ও স্থাবর পদার্থ (বৃক্ষাদি)।

(৩) ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত মনুষ্য সৃষ্টি এক প্রকার।

(১) গবাদি মূষিক পর্য্যন্ত পশু মধ্যে গণ্য।

(২) সিংহাদি শৃগাল পর্য্যন্ত মৃগ।

(৩) গড়ুরাদি মশক পর্য্যন্ত পক্ষী।

(৪) অনন্তাদি কীট পর্য্যন্ত সরিসৃপ।

(৫) পারিজাতাদি তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর। এই পাঁচরূপ তির্য্যক যোনি।

২১। ত্রিবিধ ধাতুসর্গ।

পূর্ব্বোক্ত এই কয়টীকে সংক্ষেপে ত্রিবিধ সৃষ্টি বলা যায়। অর্থাৎ (১) বিকল্প সর্গ (২) তির্য্যক যোনি, (৩) ও স্থাবর। ইহাকেই সংসার মণ্ডল বলে।

২২। ত্রিবিধ বন্ধ।

বন্ধ তিন প্রকার। (১) প্রকৃতি বন্ধ (২) বৈকারিক বন্ধ, (৩) দক্ষিণাবন্ধ।

(১) প্রকৃতিবন্ধ—আটরূপ প্রকৃতিকে যে শ্রেষ্ঠতম মনে করে (বা আত্মা মনে করে) তাহার লয়কেই প্রকৃতি বন্ধ বলে।

(২) বৈকারিকবন্ধ—যে সকল লৌকিক পরিব্রাজক বৈকারিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বশীকৃত হওয়ার (ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারায়) শব্দাদি বিষয়ে প্রশক্তি থাকায়, অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় বা কামমোহিত হওয়ায় ও অজ্ঞান জন্য বন্ধ হয়, তাহাদিগের বন্ধকে বৈকারিক বন্ধ বলে।

(৩) দাক্ষিণাবন্ধ—যে সকল গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, অথবা বৈথানস্, কাম ও মোহের দ্বারা উপহত চেতন হইয়া, অভিমান পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করে, তাঁহাদের বন্ধকে দক্ষিণাবন্ধ বলে।

[illegible]। ত্রিবিধ মোক্ষ।

মোক্ষ ত্রিবিধ (১) জ্ঞানোদ্রেক জন্য মোক্ষ, (২) ইন্দ্রিয় ও রাগ (আশক্তি) উপশম জন্য মোক্ষ এবং (৩) সর্ব্ব ক্ষয় (বা ধ্বংশ) হেতু মোক্ষ। জ্ঞানের উদ্রেক হইতে এবং ইন্দ্রিয় ও রাগ উপশম হইতে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ক্ষয় হয় এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ক্ষয় হইলেই কৈবল্য হয়। যথা

"আদ্যোহি মোক্ষো জ্ঞানেন দ্বিতীয়ো রাগ সংক্ষয়াৎ।
কৃৎস্নক্ষয়া তৃতীয়স্তু ব্যাখ্যাতং মোক্ষলক্ষণং"॥

২৪। ত্রিবিধ প্রমাণ।

প্রমাণ ত্রিবিধ—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্ত বচন এই ত্রিবিধ।

১। দৃষ্ট প্রমাণ কি? পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ যখন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তখন দৃষ্ট বলে।

২। লিঙ্গ (Symbol) দর্শনে যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে। যেমন, মেঘোদয়ে বৃষ্টি সিদ্ধ হয়। বকশ্রেণী দেখিলে জলের অস্তিত্ব বুঝা যায়। ধূম হইতে অগ্নি। এই অনুমানই শ্রেষ্ঠ।

৩। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা যাহা সিদ্ধ না হয়, তাহা আপ্ত বচন হইতে প্রমাণ হয়। যেমন ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা, উত্তর কুরু, সুবর্ণময় মেরু পর্ব্বত, স্বর্গে অপ্সরাগণ আছে ইত্যাদি। এই ইন্দ্রাদি প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বশিষ্টাদি মুনিগণ বলিয়াছেন ইন্দ্রাদি আছে, ইহা ব্যতীত আগমেও (বেদেও) আছে। তাহাও আপ্ত বচন।

যিনি স্বকর্ম্মে অভিযুক্ত, রাগদ্বেষবর্জ্জিত, জ্ঞানবান, শীলসম্পন্ন (ধাৰ্ম্মিক) তাদৃশ লোককেই আপ্ত বলিতে হইবে।

এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় কথিত হইল। এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা কি সাধিত (প্রমাণিত) হয়? যেমন লোকে (সংসারে) মানযন্ত্র দ্বারা (মান = ওজন) দ্রব্যে পরিমাণ স্থির করে, যেমন প্রস্থের দ্বারা ধান্য, এবং তুলা যন্ত্রের দ্বারা চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতির পরিমাণ হয়, সেই রূপ এই প্রমাণের দ্বারাও তত্ত্ব সকল, ভাব ও ভূতের জ্ঞান হয়।

(ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত হইয়া ব্রাহ্মণ মহর্ষি কপিলের স্মরণাগত হইয়াছিল) এই জন্য জিজ্ঞাস্য হইতেছে;—

২৫। ত্রিবিধ দুঃখ।

ত্রিবিধ দুঃখ কি কি? (১) আধ্যাত্মিক (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক।

(১) আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শরীরে উৎপন্ন শারীরিক, ও মনেতে উৎপন্ন মানসিক।

বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য জন্য যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, (যেমন জ্বর, অতিসার, বিসুচিকা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি), তাহাই শারীরিক দুঃখ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ঈর্ষ্যা, ইত্যাদি, এবং প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ প্রভৃতি যে সকল দুঃখ, তাহাই মানসিক দুঃখ।

(২) আধিভৌতিক দুঃখ—অধিভূত হইতে জাতই আধিভৌতিক—মানুষ, পশু, মৃগ, সরীসৃপ ও স্থাবর সকল হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই আধিভৌতিক।

(৩) আধিদৈবিক দুঃখ—অধিদেবতা হইতে জাত আধিদৈবিক—শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, অশনিপাত, প্রভৃতি জন্য যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই আধিদৈবিক।

এই ত্রিবিধ দুঃখেতে অভিভূত হইয়াই ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসা বা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। নিঃশ্রেয়স ইহাই সমাস। ইহা জানিলেই আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই মহাত্মা মহর্ষি কপিলের বিজ্ঞান, অনুষ্টুপ ছন্দেতে এই তিন শত শ্লোক জ্ঞেয়।

ইহাই তত্ত্বসমাসাখ্যা বৃত্তি শেষ হইল। শুভ হউক। (তিন শত অনুষ্টুপ শ্লোকযুক্ত তত্ত্ব সমাস এ দেশে পাওয়া যায় না। তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য।)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।
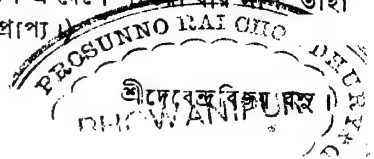
কানন।

ধীরে ধীরে নেমে নেমে ডুবিয়া গিয়াছে রবি
ভাসিছে গগন পটে কত কি মোহন ছবি।
বহেনা পবন ধীরে, কাঁপে না গাছের পাতা,
দোলেনা মৃদুল দোলে ফুলময়ী চারুলতা।
ফুলটি ফুটিয়ে আছে, সুরভি বহিয়ে যায়,
নিঝর আকাশ পানে অবাক নয়নে চায়।
বিশাল বিস্তৃত বট অবশ ঘুমের ঘোরে,
অলস শ্যামল দেহ ভূমি পরশিছে ধীরে।
লতিকা বালিকা তার শ্যামল বাহুর ডোরে,
অশোকে বাঁধিছে বুকে শত ফেরে ঘিরে ঘিরে
বিভল অশোক প্রাণ শত শত বাহু মেলি
হৃদয় মাঝারে তারে অমনি লইছে তুলি।
ঢাকিয়া রাখিছে তারে স্নিগ্ধ হৃদয়ের ছায়ে,
আপনার দেহে তার চারু দেহ মিশাইয়ে।
প্রতিটি পল্লব তুলি চুমিছে মুখানি তার,
মুখেতে প্রীতির হাসি, হৃদয়ে প্রীতির ভার।
নিঝরিণী ধীরে ধীরে নীরবে যাইছে চলি;
কোমল হৃদয়খানি কুলে পড়িতেছে ঢলি,
চুমিতেছে তরুমূল স্নেহ আদরেতে গলি,
হাসি হাসি তরুকুল কুসুম দিতেছে ঢালি।
ধরি সে কুসুমরাশ স্নিগ্ধ নিরমল বুকে,
থেকে থেকে নিঝরিণী উছলি উঠিছে সুখে।
তুলিয়া তরঙ্গ বাহু যাইয়া চুমিছে বেলা
ছড়ায়ে সলিল কণা করিতেছে ছেলে খেলা।
সহসা উছলি উঠে, আকুল হইয়ে ধায়,
হৃদয়ে জগৎ যেন ঢাকিয়া রাখিতে চায়।
প্রতি তরুলতা মাঝে, প্রতি তরঙ্গের গায়,
প্রকৃতির চারুমুখে কার স্নেহ জ্যোতি ভায়;
ডুবে সবে জননীর মধুময় স্নেহ নীরে,
আধ নিমিলিত চোখে যেন সেই মুখ হেরে।
প্রশান্ত শান্তির ছায়া, ঢাকিয়াছে চারিধার,
জননীর স্নেহ মধু উছলিছে অনিবার।
সবে মিলে করিতেছে সেই মুখ-সুধা পান!
সবে মিলে করিতেছে সেই প্রিয় প্রেম গান!
সেই এক ভাব ঘোরে সকলে চেতনা হারা,
শুধু শান্তি, শুধু স্নেহ, শুধু প্রেম পূত ধারা।
জননীর কোলে বসি খুলিয়া প্রাণের দ্বার,
'আয় আয়' বলি সবে ডাকিতেছে অনিবার।
সবাই জগৎ যেন ঢাকিয়া রাখিতে চায়,
হৃদয়ের ছায়াময় কুঞ্জকুটিরের ছায়।
আকাশে হৃদয়ে ঢাকি বিশাল পৃথিবী খানি,
হেরিছে মুখানি তার হইয়ে অবশ প্রাণি।
বিশাল জলধিজল সদাই উল্লাস ময়;
জগৎ ছড়ায়ে তার হৃদয় রাখিতে চায়।
স্রোতস্বিনী প্রবাহিনী ভূধর শিখর ছাড়ি,
প্রশান্ত সাগর কোলে মিশিতে ছুটিয়া যায়,
একটি উঠিলে স্বর প্রতিধ্বনি তাড়াতাড়ি,
ছুটে আসি হৃদে ধরি করে তারে আলিঙ্গন,
দুই শেষে এক হয়ে, ক্রমে দূরান্তরে গিয়ে,
লুকায় প্রশান্তি ক্রোড়ে ত্যজি নদ,নদী,বন।
মিলনের মহামন্ত্র, জগতের পুরোহিত
গাইছে মোহন স্বরে, শিহরিছে চরাচর;
পাপিয়া চমকি উঠি গাইতেছে সেই গান
শত শত বাহু তুলি গাইতেছে পারাবার।
সেই সুকোমল তানে জগৎ পড়েছে বাঁধা,
এক ছেড়ে এক আর সুদূরে বহিতে নারে;
তাই চাঁদে জোছনায়, তাই ফুলে সুষমায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরি সুখে কোলাকুলি করে।

শ্রী[illegible]

বাঙ্গালার বর্ব্বর জাতি। (৫ম)

মুণ্ডাহো এবং ভূমীজদিগের সাধারণ নাম কোল। ইহাদিগের আচার ব্যবহারে সামান্য বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোলেরা পূর্ব্বে বিহার দেশে বাস করিত। তখন চেরো জাতি ইহাদের রাজা ছিল। তাহাদের নামে পূর্ব্বে বিহারকে কীকট বলিত। কীকটের একাংশ ভবিষ্যৎ কালে মগধ নামে অভিহিত হয়। কীকটেরা দুগ্ধ পান করে না বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে,—কিংতে কৃন্বন্তি কীকটেষু গাবো না শিরং দুহ্রে ন তপন্তে ধর্ম্মম্ ৩।৫৩।১৪। (খৃ ৫০০) শবর জাতি কীকটদিগকে বিহার হইতে দূরীভূত করিয়া রাজপদ গ্রহণ করে। চুটীয়ানাগপুরবাসী চের ও কোল জাতি আপনাদিগকে নাগবংশী বলিয়া পরিচয় দেয়। কীকটেরাও নাগবংশী। পরকাল নাই, যাগ যজ্ঞে কি ফল হইবে, ইহা কীকটদিগের মত বলিয়া শয়নাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন। চের ও কোলদিগেরও এই মত। সাহাবাদ জিলায় কীকটদিগের রাজধানী ছিল, সেখানে বুদ্ধগয়ায় ও বিহারের অন্যত্র ইহাদের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বুদ্ধগয়ায় কুডিচন্দ্র নামে এক জন চেরর একখানী শাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে। সাহাবাদে অনেক নাগবংশী আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং চুটীয়া নাগপুরের চের রাজাকে গোষ্ঠিপতি বলিয়া স্বীকার করে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে "বুদ্ধ নাম্না নৃপসুত কীকটেষু ভবিষ্যতি।" বোধ হয় বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার সময়ে অনেক চের বিহারে বাস করিত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার বলে কালক্রমে আর্য্য বলিয়া পরিচিত হয়। কোলেরা আর্য্য সংসর্গে কিছু সভ্য হইয়া থাকিলেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। তাই অদ্যাপি অনার্য্য রহিয়া গিয়াছে। কিয়ঞ্জর ও ময়ূরভঞ্জের ভক্তগণ ভূমীজ কোল।

অদ্যাপি সাহাবাদ বা মিথিলার ব্রাহ্মণেরা চেরদিগকে কোলদিগের মত অনার্য্য বলে; বস্তুত চের ও কোল জাতি যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চের ও কোল জাতি উভয়েই একটী ত্রৈবার্ষিক উৎসব করে। সে উৎসবে বনে বা পাহাড়ে একটী মহিষ বলি দিতে হয়। উভয়েই পুরোহিত "পান" নামে এক নীচ জাতীয় লোক এই উৎসবে পৌরহিত্য করে। যাহার উদ্দেশে এই উৎসব হয়, কোলেরা তাহাকে দড়া বলে। চেররা দুয়ার বলে। এই দুয়ার সাধুভাষায় দুয়ারপাহারা বা দ্বারপ্রহরী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, বীরহোরেরা দড়াকে সিপাহীও বলে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা দক্ষিণ দ্বার সিপাহীর নিকট হাঁস বলি দেয়। হিন্দু পূজায় চেররা শাকলদ্বীপী বা কনৌজি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। রাজপদে ও ধর্ম্মগুণে চেররা রাজপুত হইয়াছে। উহারা এখন উপবীত ধারণ করে এবং চৈন মুনীর সন্তান বা চোহান বলিয়া পরিচয় দেয়। শবর তাড়িত হইয়া চের রাজা যাণি মুকুট রায় রোটস্ হইয়া পালামৌ নগরে আসিয়া

তত্রত্য রাক্সেল বংশীয় রাজা মানসিংহকে পর্য্যু দস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লয়। কোলেরা চুটীয়া নাগপুরের সমতল ক্ষেত্রে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। মিথিলাবাসী চেররা এখন অতি হীনাবস্থাপন্ন; কেবল বনে ও প্রান্তরে বাস করে। পালামৌর চের রাজার সহিত ইংরেজদের একবার যুদ্ধ হইয়াছিল (খৃ ১৮১৩)। অবশেষে ইংরাজেরা তাহার রাজ্য ক্রয় করিয়া লয়। পালামৌর অনেক সম্ভ্রান্ত লোক চের বংশীয়। ইহারা কেহ কুমার, কেহ বাবু, কেহ মাজি উপাধি ধারণ করে। চুটীয়া নাগপুরের ব্রাহ্মণেরা চেরদের জল গ্রহণ করে; কিন্তু ভাত খায়না। চাষ কি মাটী বহা কাজ চেররা ঘৃণা করে। হিন্দুরা চুটীয়া নাগপুরকে ঝাড় খণ্ড বা বনভূম বলে। এবং আর্য্য ভূমির বাহির করিয়া দেয়। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা দশার্ণ নামে অনার্য্য রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত।

ঝাড়খণ্ডে আসিয়া কোলেরা বিভিন্ন গ্রামে বাস করে। কেহ রাজা ছিল না, প্রত্যেক গ্রাম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল। কখন একটী পরিবার মাত্রে একটী গ্রাম গঠিত হইত। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন শিরস্ক বা মুণ্ড স্থানীয় বলিয়া ইহাদের নাম মুণ্ডা হইয়াছে। দশ বার খানি গ্রাম লইয়া এক একটী পরহা বা পাড়া হইত। অদ্যাপি পাড়ায় প্রধানেরা সামাজিক শাসন কর্ত্তা।

কোলেরা কোন মূর্ত্তি বা চিহ্ন পূজা করে না। কিন্তু বলে, অদৃশ্য হইলেও পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দেবতাকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করান যাইতে পারে। এইরূপে কোন কোন পর্ব্বত বা বনভূম দেববাসে পরিণত হইয়াছে। এই সকল স্থানকে ইহারা শর্ণ বা জাহিরা বলে। দেববাসের কোন গাছ কাটিলে দেবতা অনাবৃষ্টি করেন। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষা কর্ত্তা সূর্য্য। ইনি বড় সদয়। কখন অল্পমাত্রায় শাসন করিয়াও কাহাকে বিষম রূপে পীড়ন করে না। তিনি সকল সম্পদের কারণ। সূর্য্যচন্দ্রমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্যভিচার অপরাধে তিনি চন্দ্রমাকে দ্বিখণ্ডিত করেন, কেবল অনুগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে পূর্ণাবয়ব ধারণ করিতে দেন। নক্ষত্র তাঁহার কন্যা। কোলের ন্যায় ওরাঁওরা সূর্য্যকে "ধর্ম্মী" বলিয়া পূজা করে। অন্য দেবতা সূর্য্যের অধীন, তাহারা সর্ব্বক্ষম নহে। চন্দ্রমার আর একটী নাম চনলা, পুরুষেরা সিংবোঙার ভক্ত, চনলা মেয়েদের বড় প্রিয়। সিংবোঙার নীচে মারং বুড়ু। বৎসরে একবার মুরগী ও ছাগল কাটিয়া ও তিন বৎসরে একবার মহিষ বলি দিয়া পর্ব্বতকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। এই সকল উৎসবে হিন্দু ও মুসলমানেরাও যোগ দেয়। গ্রাম্য দেবতা দেশৌলী ও তাহার পত্নী ঝাড়ড়া বা মাবুড়ু। প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বে এক প্রাচীন বনখণ্ড আছে, উহাই দেশৌলীর স্থান। গ্রামের বাহিরে গ্রাম্য দেবতার অধিকার নাই। চাস বাস স্বাস্থ্যের কর্ত্তা দেশৌলী। কূপ ও পুষ্করিনীর দেবতার নাম নাহাএরা, নদী দেবতার নাম গড়াএরা। গ্রাম্য ও জল দেবতা পূজা না পাইলে পীড়া উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন পিতৃপ্রেতগণও সন্তান সন্ততির সম্পদ বিপদের কারণ। প্রতিদিন আহার্য্যের এক অংশ তাহাদিগকে দিতে হয় ও মাঝে মাঝে তাহাদের পূজা করিতে হয়। পিতৃকুলের প্রেতগণের নাম হামহো, শ্বশুর কুলের প্রেতগণের নাম

হোরতন হো। ভূমীজ কোলেরা শঙ্কিনী নামে কালীর পূজা করে এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট নরবলি দেয়।

কোলদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই। বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয় হওয়া খুব সম্ভব, তথাপি পিতামাতা পাত্র কন্যা স্থির করিয়া দেয়। পণ চারি হইতে কুড়ি। পণ বেশী হওয়ায় অনেক নারীর বিবাহ হয় না। কোল সর্দ্দারের নাম মানকী। মানকী কন্যার বিস্তর পণ ৪০টা গরু ও টাকা। বর কন্যা একত্র মদ খাইলে লড়কা কোলের বিবাহ হয়। তিন দিন পরে কন্যা স্বামী গৃহ হইতে পলাইয়া আসে। আবার স্বামী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। তাহার পর সে ঘরকন্না করে। বরের আত্মীয়গণ সমর সাজে পাত্রী আনিতে যায়, কন্যাপক্ষীয়েরাও সমর সাজে আসিয়া যুদ্ধ করে, তাহার পর যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় পক্ষ গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করে। তার পর বরকন্যাকে সিঁদুর মাখাইয়া একটা আম গাছের সহিত বরের ও মৌয়া কি আম গাছের সহিত কন্যার বিবাহ হয়। গাছে সিঁদুর মাখান হইলে তাহারা গাছটীকে আলিঙ্গন করে, সেই সময় গাছের সহিত তাহাদের বাঁধিয়া ফেলে। অনন্তর ধানের উপর লাঙ্গলের ফলা, তার উপর শিল রাখিয়া তাহার উপর পাত্রী দাঁড়ায়, পাত্রীর আঙ্গুল চাপিয়া দাঁড়াইয়া বর পাত্রীর কপালে সিঁদুর দেয় এবং পাত্রী বরের কপালে সিঁদুর দেয়। তারপর মেয়েরা উভয়ের মাথায় এক এক কলসী জল ঢালিয়া দিলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। ভিজা কাপড় ছাড়িতে গিয়া বর কন্যা এক ঘরে প্রবেশ করে, আর বহির হয় না। ও দিকে উভয় পক্ষীয় স্ত্রী পুরুষে আমোদ আহ্লাদে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে, প্রত্যুষে তাহারা বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়া বর কন্যা ও তাহাদের কাপড় লইয়া স্নান করিতে যায়। এই সময় একটী বরের, একটী পাত্রী দল হয় এবং পরস্পরকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে। বর জলের মধ্যে একটী কলসী লুকাইয়া রাখে। পাত্রী তাহা খুঁজিয়া বাহির করে; আবার পাত্রী লুকায়, বর তাহা বহির করিলে পাত্রী জলপূর্ণ করিয়া কলসিটী মাথায় লয় এবং এক হাত দিয়া কলসিটী ধরে। সেই হাতের ছিদ্রের ভিতর দিয়া পিছন হইতে বর একটী তীর ছোঁড়ে, পাত্রী মাথায় সেই রূপ কলসী রাখিয়া পা দিয়া তীরটী তুলিয়া স্বামীকে দেয়। এই রূপে শত্রু বিনাশক ও পদ প্রদর্শক রূপে স্বামী অধীনতা ও গৃহ কর্ম্মপটুতা ও স্বামী সেবকতার নিদর্শন দেখায়। সাঁওতালের ন্যায় কোল সমাজেও উৎসব উপলক্ষে ব্যভিচারের একশেষ হয়। বিবাহিতা নারীর সতীত্ব গৌরবজনক, ব্যভিচারীকে পণের টাকা দিতে হয়।

মুড়া ও লড়কা কোলেরা গরু, মেষ, ছাগল, হরিণ, কুক্কুট ও শশক খায়। শূকর মাংস নিম্ন শ্রেণীর ন্যায় উচ্চ শ্রেণীতে তত আদরণীয় নহে। অথচ ভাতের উপর অন্য জাতির ছায়া পড়িলে অখাদ্য হয়। কোলেরা দুধ খায় না। কনিষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সব ভাই একত্র বাস করে। তাহার পর সমান অংশে পৈতৃক বিষয় ভাগ করিয়া লয়। গরু ছাগলের মত ভগিনীদিগকেও ভাগ করে। ভাগে না মিলিলে বিবাহের পণ সমান অংশ করিয়া লয়। কোলেরা বেশী কাপড় পরিতে ভালবাসে না। সাধারণতঃ একটা বটুই বা কৌপিন পরিয়া থাকে।

কুমারীরা বেশ ভূষায় সজ্জিত থাকে। ইহারা ডান কাণের উপর খোঁপা বাঁধে, খোঁপায়-ফুল গুঁজে ও গলায় কাল মালা পরে। অনার্য্য-দিগের মধ্যে কোল খুব দীর্ঘকায়, তাম্রবর্ণ এবং দেখিতে কিছু সুশ্রী। কোল রমণীর অলঙ্কার বাঁকমল ও তাড়। লড়কানারী তীরের মত একটা উল্কি পরে, এটী তাহা-দের গদনা বা জাতীয় চিহ্ন, নাম সই করিতে না পারিলে লড়কা একটী তীর আঁকিয়া স্বাক্ষর করে। মুড়া নারীর গদনা জুয়াঙ্গ ও খাড়িয়াদের মত। সন্তান হইলে পিতা-মাতার আট দিন বিশি বা অশৌচ হয়। এ কয় দিন আর কেহ বাড়ীতে থাকিতে পায় না এবং স্বামী স্ত্রীর পাচকতা করে। আট দিন পরে সকলে ফিরিয়া আসে এবং জ্ঞাতি বন্ধুকে ভোজ দিয়া সন্তানের নাম করণ করা হয়। কোল নারীকে সকল কার্য্যই করিতে হয়, কেবল লাঙ্গল দিতে হয় না। ইহারা "গাই বলদে চযে।"

ইহাদের সাতটী পর্ব্ব (১) মাঘ পর্ব্ব গোলায় শস্য তুলিয়া ইনি মদ পান করিয়া ইহারা উৎসবে মত্ত হয়। তখন প্রভু ভৃত্য পিতা পুত্রের পার্থক্য থাকে না। নির্ল-জ্জতা, সুরাপান ও ব্যভিচারের চূড়ান্ত হয়। দেশৌলীর কাছে তিনটী মুরগী কাটিয়া তিল পিটা ও পলাস ফুল দিয়া পূজা করিয়া উৎ-সব আরম্ভ করিতে হয়। (২) চৈত্র বৈশাখে শালফুল ফুটিলে দড়ার উদ্দেশে সারুল বা বোঙা। সবাই শাল ফুল তুলিয়া ঘর সাজায় ও আপনি সাজে। ইহাতেও খুব সুরাপান হয়, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে ব্যভিচার হয় না। এই সময় লাঙ্গল দিবার জন্য মাঠ পরিষ্কার করিতে হয় (৩) দামু রায়—বৈশাখ মাসে নূতন চাসের সময়, ছাগল ও মুরগী কাটিয়া পিতৃ লোকের পূজা করিতে হয়। (৪) হরিহর বা হিরা বোঙা--প্রচুর শস্য হইবার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশৌলী ও জাহির বুড়ীর পূজা করিতে হয়। (৫) বাতৌলি বোঙা বা করম—আষাঢ় মাসে একটা মুরগীর পালক বাঁশে গুঁজিয়া ধান্য ক্ষেত্রে পুতিয়া আসিতে হয়। ইহা না করিলে ধান পাকে না। (৬) ভাদ্র মাসে পূম নামা বা নবান্ন—একটা মুরগী ও নূতন চাউল দিয়া সিংবোঙার পূজা করিতে হয়। (৭) ধান ঝাড়া হইলে কলম বোঙা।

নাটের ক্রোধ ও ডাকিনীর অত্যাচারে পীড়া হয়। ওঝা বা সোখা ডাকিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। নারিকেল মালার মত একটা কাঠের মালার উপর শিল রাখিয়া একটা বালক বসে। গ্রামের এক এক জন লোকের নাম করিয়া চারিটী চাউল ফেলিয়া ছেলে-টীকে মারিতে হয়। ডাকিনীর নাম উচ্চারিত হইলে শিল ঘুরিতে থাকে। পূর্ব্বে ডাকিনীকে সবংশে মারিয়া ফেলিত। এখন ইংরাজের ভয়ে মারিয়া ফেলিতে পারে না কিন্তু বড় যন্ত্রণা দেয় এবং তাহাকে দিয়া দৃষ্টি কাটিয়া লয়। সে না পারিলে, যন্ত্রণায় যদি মৃত্যু না হয়, তবে তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়া-ইয়া দেয়। কেহ যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য আত্ম-হত্যা করে,—কখন প্রেতদিগকে বা দেশৌ-লীকে পীড়ার কারণ বলিয়া শোখা নির্দ্দেশ করে, তখন ঘটা করিয়া তাহাদের পূজা দিতে হয়।

গারো, খসিয়া ও কোলদেব সৎকারপদ্ধতি একরূপ। মৃতদেহ ধুইয়া তেল ও সিঁদূর মাথাইয়া বস্ত্রালঙ্কার, আহার্য্য ও পানীয় এবং অস্ত্র শস্ত্রের সহিত একটা বাক্সে রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া তাহার বাড়ীর সম্মুখে বাক্স

শুদ্ধ দাহ করিতে হয়। শবরেরা হিন্দুদের মত উত্তর শিরে, কোলেরা দক্ষিণ শিরে, এবং ভূয়ারা পশ্চিম শিরে দাহ করে। অনন্তর ভস্মগুলি কবর দেয় এবং অস্থি খণ্ড একটী মাটীর বাসনে করিয়া মা বা স্ত্রীর ঘরে রাখে। তাহার পর স্মৃতি-স্তম্ভ সংগ্রহ হইলে, বাড়ীর কাছে একটা গর্ত্ত কাটিয়া অস্থি কাটিয়া কবর দিতে হয়। দিবার সময় আটটী কুমারী ভাঙ্গা কলসী বা ভাঙ্গা বাসন হাতে করিয়া গম্ভীর ভাবে নাচিতে থাকে। এবং গম্ভীর শব্দে মাদল বাজে। মা কি স্ত্রী অস্থি খণ্ড মাথায় বহিয়া লয়। মাঝে নামাইতে হয়, তখন কুমারীরা কলসী ও বাসন দেখাইয়া বলে "হায় সব খালি" রহিয়াছে, এই রূপে প্রত্যেক বাড়ীতে, যে গোঠে, যে মাঠে, যে বনে যেখানে সে যাইত, সেখানে যাইতে হয়। যাহাদের বাড়ী যায়, তাহারা চোখের জল দিয়া বিদায় করে। ক্রমে কবরের নিকট পৌঁছে। চাল ভাত ও অন্য আহার্য্য [illegible] অস্থি খণ্ড সমাহিত করিতে হয়। অসুরানাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্যৎ শরীর ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কুবন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে। ছান্দোগ্যং। কেহ সন্তানগণের কৃপণতা বা তাচ্ছিল্য ভয়ে আপনাদের স্তম্ভ আপনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া যায়। কবরের পার্শ্বে ছোট ছোট পাথরের স্তম্ভ করিয়া তাহার উপর বড় স্তম্ভটী রাখে। এক একটী কবরে খসিয়া ও কোলেরা অনেকের অস্থি সমাহিত করে। কবর ভিন্ন অন্যত্রও মৃতের উদ্দেশে স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। কোল গৃহে পিতৃগণের একটী বেদী থাকে, প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে আহার্য্যের একাংশ তাহার উপর রাখিতে হয়। স্বর্গ নরক ইহাদের বিশ্বাস নাই। কোলেরা সাহসী, সরল, সদয় ও সত্য প্রিয়।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।
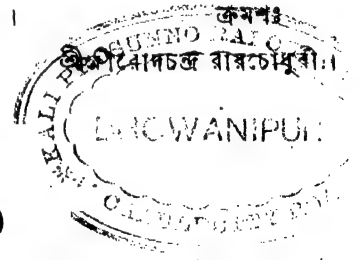
প্রার্থনাতত্ত্ব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

প্রার্থনা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, প্রার্থনা মানবহৃদয়ের নীচ ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। যাঁহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি সকল অবস্থায় আপনার শক্তি সামর্থ্যের প্রতি নির্ভর করেন। অন্যের দ্বারস্থ হওয়া হীনতা। আত্মনির্ভরেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত মহত্ত্ব। দুঃখে বিপদে, পাপপ্রলোভনে, সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় যিনি পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপনার আন্তরিক শক্তির উপর নির্ভর করেন, তিনিই মানুষ। আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানই মানুষের স্বভাব। আত্মনির্ভরেই প্রকৃত মহত্ত্ব;—প্রার্থনা দুর্ব্বলতা-প্রসূত হীন-ভাব।

এই সকল কথার মধ্যে সত্য আছে; কিন্তু তাহা অনিষ্টকর অসত্যের সহিত জড়িত। আত্ম নির্ভর ভাল। কিন্তু মনুষ্য যখন দুর্ব্বল পরিমিত জীব;—মনুষ্যশক্তির যখন সীমা আছে, তখন আত্মনির্ভরের ন্যায় অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করাও মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক;—কেবল

স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবী। মানুষের সাহায্য ব্যতীত মানুষ ইহসংসারে থাকিতে পারে না ;—থাকা অসম্ভব। মনুষ্য সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানব জীবন পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ। কে বলিতে পারে যে, আমি একাকী অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতি সকলই করিব ?—সুবিধা, সুখ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইব ? অন্যের সাহায্য ব্যতীত মানব জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে বার্দ্ধক্যে, মানুষ, মানুষের ক্রোড়ে বসিয়া মানুষের হস্ত ধরিয়া, মানুষের মুখ পানে তাকাইয়া, মানুষের স্কন্ধে ভর দিয়া জীবন পথে অগ্রসর হয়। নতুবা জীবন সুখকর হওয়া দূরে থাকুক, জীবনের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। আত্মনির্ভর ভাল ; যতদূর মানুষ আপনার ব্যক্তিগত শক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া চলিতে পারে, ততদূর স্বাভাবিক, সঙ্গত ও উচিত। কিন্তু সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই মানুষ পদে পদে মানুষের মুখাপেক্ষী ;—তখন আর মানুষ অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারে না ;—"আমি আপনি সব করিব, অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইব না।"

যখন মানুষের সাহায্য ভিন্ন মানুষ অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিতে পারে না, তখন, কে তুমি হে মানুষ ! যে তুমি বলিতে পার যে, সেই অগম্য অপার বিশ্বকারণ, বিশ্ববিধাতা, বিশ্বজীবন জগতের পিতামাতা পরমেশ্বরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে তোমার অপমান হয় ! তোমার পক্ষে হীনতা হয় ! হে কীটস্য কীট ! যে অনন্তদেব প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, যাঁহার সত্তায় তোমার সত্তা, তাঁহার নিকট তোমার আত্মগৌরব কি ! যদি কিছু গৌরব থাকে, তাহা সেই অনন্ত সাগরেরই এক কণিকা মাত্র।

প্রার্থনাবিরোধীদিগের উক্ত আপত্তি যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত হইলে কেবল প্রার্থনার মত খণ্ডিত হয়, এরূপ নহে, উহাতে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন যে, ভগবানের প্রতি নির্ভর ধর্ম্মের মূল ভাব। মানুষ যত দিন আত্মসম্মান বা আত্মগৌরবের সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে, ততদিন সে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। পরিমিত যখন অনন্তের প্রতি নির্ভর করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই তাহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রতি নির্ভরেই ধর্ম্মের আরম্ভ, নির্ভর-ভাবের উন্নতিতেই ধর্ম্মের উন্নতি। বাবা নানক বলিয়াছেন ; "কুকুর যেমন তাহার প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, সেইরূপ, হে ঠাকুর ! আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিব।"

কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন যে, প্রার্থনা করা কুড়ের কর্ম্ম। ছোট শিশু মার কাছে দুগ্ধ প্রার্থনা করে ; কিন্তু যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি,—কোন "বুড়ো খোকা" —মাকে বলে "মা দুদ খাওয়াইয়া দেও" তাহা কি নিতান্ত হাস্যকর হয় না ?"

প্রার্থনা করা কুড়ের কর্ম্ম নয়। পরিশ্রমী ভিন্ন প্রার্থনা করিতে পারে না। যিনি ধর্ম্মসাধন ব্রতে ব্রতী হইয়া সংসারের কোন কষ্টকেই কষ্ট বোধ করেন না, কোন প্রকার পরিশ্রমকেই পরিশ্রম বলিয়া মনে করেন না ;—যিনি জীবনের উদ্দেশ্য সাধন কার্য্যে আপনার হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া অর্পণ করিতে প্রস্তুত, তিনিই প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত।

ভয়ঙ্কর পদ্মার মধ্যে নাবিক যখন প্রবল ঝটিকায় পতিত হয়, চারি দিকে উত্তাল তরঙ্গ, যখন আর সে নৌকা বাঁচাইতে পারে না,—আর তাহার "হালে পানি পায়না," তখনই তাহার মুখ হইতে "আল্লা আল্লা" ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে; তখনই সে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করে, আরোহী-গণকে আপনার আপনার দেবতার নাম লইতে অনুরোধ করে। যখন সন্তরণকারীর হস্তপদ অবশ হইয়া যায়, তখনই সে "রক্ষাকর, রক্ষাকর" বলিয়া চীৎকার করে।

পার্থিব বিষয় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়ে উহা আরও অনেক গুণে অধিক। মানুষ যখন অন্তর বাহিরে রিপুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত;—যখন তাহার সহস্র প্রতিজ্ঞা চূর্ণ বিচূর্ণ,—যখন সংসার-রূপ ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রলোভন, বিপদ ও মৃত্যু তাহার সম্মুখীন, যখন বিদ্যা বুদ্ধি, শক্তি সামার্থ্য সত্বেও মানুষ পরাস্ত ও বিভ্রান্ত, তখন কোথায় থাকে আত্মনির্ভর, কোথায় থাকে আত্ম গৌরব; তখন মানুষের প্রাণ আপনা হইতে সংসারাতীত জ্ঞান শক্তি ও করুণার নিকট "রক্ষাকর,রক্ষাকর," বলিয়া চীৎকার করে।

শিশুকে মাতা দুগ্ধ পান করাইয়া দেন, যুবা ও বৃদ্ধ আপনি দুগ্ধ পান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে সকলেই শিশু। এখানে সকলকেই মাতার হস্তে দুগ্ধ পান করিতে হয়। আমি বিজ্ঞ, আমি প্রবীন, এরূপ অভিমান থাকিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। শিশু না হইলে সে রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয় না।

প্রার্থনা কি? প্রার্থনা ভাষা নহে, প্রার্থনা অঙ্গ ভঙ্গী নহে, প্রার্থনা চক্ষের জল নহে। বোবা ছেলে যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মার মুখ পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টি করে, তখন কি সে প্রার্থনা করে না? প্রার্থনা ভাষা নহে। পক্ষাঘাৎ রোগে শয্যাগত রোগীর প্রাণ যখন শান্তির জন্য লালায়িত হয়, তখন কি সে প্রার্থনা করেনা? প্রার্থনা করযোড় প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী নহে। যখন শোকদগ্ধ হৃদয় আপনার আগুনে আপনি জ্বলিতে থাকে, শোকান্তকারী পরম পুরুষের নিকট "ত্রাহি ত্রাহি" করিতে থাকে, অন্তরস্থ যন্ত্রণার এক কণিকাও অশ্রুবারি রূপে বাহিরে প্রকাশ পায় না, তখন কি সে হৃদয় প্রার্থনা করে না? প্রার্থনা চক্ষের জল নহে। রোগী যখন রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অতীব কাতরপ্রাণে চিকিৎসককে বলে,—"রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করুন; সন্তরণ-নিরত অবশাঙ্গ ব্যক্তি যখন ভীতিবিহ্বল হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল ভাবে অন্যের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, তখন তাহারা প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা বাহিরে নহে, অন্তরে। বাহিরে তাহার প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু সকল অবস্থাতেই প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিক পদার্থ;—প্রার্থনা মানসিক অবস্থা বিশেষ।

সেই অবস্থাটী কি? প্রার্থনার স্বরূপ কি? প্রার্থনা বলিলে কি বুঝায়? কি কি উপাদানে উহা গঠিত। চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হইয়া চুনে হলুদ। হাইড্রজিন ও অক্সিজিন মিশ্রিত হইয়া জল। নাইট্রজিন ও অক্সিজিনে বাতাস। সেইরূপ কি কি মানসিক অবস্থার সংমিশ্রণে প্রার্থনারূপ অবস্থার অভ্যুদয়?

একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। শীতল জলপূর্ণ পাত্র হস্তে সম্মুখে কেহ দণ্ডায়মান

হইলে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়? তন্মধ্যে এই তিনটী বিষয় দেখিতে পাই। প্রথম, সে ব্যক্তি শীতল জলের অভাব অনুভব করিতেছে, দ্বিতীয়, সেই অভাব দূর করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে; তৃতীয়, সেই জল পাত্র ও পাত্রধারী ব্যক্তির প্রতি তাহার চিত্ত নির্ভর ও প্রত্যাশাপূর্ণ হইয়া ধাবিত হইতেছে।

সেইরূপ প্রার্থনার মধ্যেও তিনটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অভাব বোধ, অভাব দূর করিবার জন্য ব্যাকুলতা, এবং তজ্জন্য ভগবানের নিকট হৃদয়ের একান্ত নির্ভর।

প্রার্থনার ভিতরে এই যে তিনটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কোনটী ছাড়িয়া দিলে চলে কি? অর্থাৎ উহার মধ্যে একটী কিম্বা দুটী ভাব পরিত্যাগ করিলে প্রার্থনার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে কি?

প্রথমতঃ দেখ অভাববোধ ব্যতীত প্রার্থনা সম্ভব কি না। কখনই না। যে জানেনা, অনুভব করেনা যে তাহার অভাব আছে, তাহার প্রার্থনা কেমন করিয়া হইবে? কিসের জন্য হইবে? দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি অভাব দূরীকরণের জন্য ব্যাকুল নহে, তাহার পক্ষেই বা প্রার্থনা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তৃতীয়ত, অভাব দূর হইবার জন্য পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর ব্যতীতই বা কেমন করিয়া প্রার্থনা হইতে পারে? এই তিনটী কথা এত সহজ যে, উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

এস্থলে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, নির্ভর হইলেই কি প্রার্থনা হইল? নির্ভর ও প্রার্থনা কি একই পদার্থ? নির্ভ-রের ভাব ও প্রার্থনার ভাব নিশ্চয়ই এক। আমি কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতেছি, ইহার অর্থ কি? ইহাই কি নহে যে, কোন কার্য্য করিতে আমি আপনাকে অক্ষম বলিয়া অনুভব করিতেছি এবং ইচ্ছা করি-তেছি যে, কোন ব্যক্তি আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য দান করেন?—অর্থাৎ আমার মন চাহিতেছে যে, আমি সাহায্য পাই। "নির্ভর করিতেছি" ইহার অর্থ এই যে, আমি মনে মনে বলিতেছি, 'আমি পারি না, তিনি আমাকে সাহায্য করুন, বা তুমি আমাকে সাহায্য কর।" 'তোমার প্রতি নির্ভর করি,' অর্থাৎ তোমার সাহায্য চাই বা প্রার্থনা করি। ভাষার বাহিরে যেরূপেই কেন ভাব প্রকাশ হউক না, অন্তরের অন্তরে নির্ভর ও প্রার্থনা একই পদার্থ।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী ভাব লইয়া প্রার্থনা,—উহার কোন একটী ছাড়িয়া দিলে প্রার্থনার স্বরূপ বিনষ্ট হয়,—ইহা সত্য হইলেও প্রার্থনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ক বিচারে উহা আসল কথা নহে। ঐ তিনটী ভাব লইয়াই প্রার্থনা, ইহা বুঝি-লেই যে, প্রার্থনা সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসা হইল, এরূপ নহে। ঐ তিনটীর মধ্যে শেষ কথাটীতেই বিশেষ আপত্তি। অভাব-বোধ ও অভাব দূরীকরণের জন্য ব্যাকুলতা, এই দুটী যে উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা কে না বলিবে? নিরীশ্বরবাদীও তাহা স্বীকার করে। প্রার্থনাবিরোধী এস্থলে বলিবেন যে, ঐ দুটী হইলেই হইল; পরমে-শ্বরের প্রতি নির্ভর আবার কেন?

যদি শেষটী ছাড়িয়া দিয়াও ফল সমান হইত, তাহা হইলে আপত্তিটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু

তাহা হয় না। কেবল মাত্র অভাব বোধ ও ব্যাকুলতায় একপ্রকার ফল আছে, সত্য বটে, কিন্তু ঐ তিনটী ভাবের রাসায়নিক সংযোগে যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ফল লাভ হয়, তাহার সহিত আর কিছুরই তুলনা হয় না।

পিত্তলের একখানি থালার উপরে চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিলাম। উহা লোহিত বর্ণ হইল। কেবল চূর্ণ ও হরিদ্রার পরস্পর সংযোগে লোহিতবর্ণ হইল, অথবা চূর্ণ হরিদ্রা ও পিত্তলের সংযোগে হইল, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য পিত্তল নির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য প্রকার ধাতুপাত্রে, বা প্রস্তর পাত্রে বা কেবল হস্তের উপর চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া দেখিলাম, সেইরূপই লোহিত বর্ণ হইল। সুতরাং বুঝিলাম যে, পিত্তলপাত্র লোহিত বর্ণের উৎপত্তির হেতু নহে।

বিচার্য্য বিষয় সেইরূপ করিয়া পরীক্ষা করা কি সম্ভব? একপ্রকার সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন? কার্য্যতও অনেক সময় তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। কেবলমাত্র অভাববোধ ও ব্যাকুলতার ফল কি, তাহা জানি, সেই সঙ্গে যখন ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভর আসিয়া মিলিত হয়, তাহারও ফল কি, জানি। এই উভয়ই পরীক্ষাসিদ্ধ জ্ঞান,—প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া দিতেছে যে, উভয়ের ফলে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অতিরিক্ত ব্যাকুলতা মানুষকে পাগল করে। তৃষ্ণায় কি তৃষ্ণা নিবারণ হয়? জল চাই। যখন হৃদয় তাঁহার দিকে ছুটিয়া যায়, তখনই এমন কিছু পায়, যাহাতে তাহার যন্ত্রণা দূর হয়। যখন তৃষিত চাতক "ফটিক জল" বলিয়া ডাকিতে থাকে, তখনই স্বর্গ হইতে অমৃত ধারা তাহার শুষ্ককণ্ঠ সরস করে। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ,—প্রত্যক্ষ সকল প্রমাণের মূল।

প্রার্থনা কি? অন্ধকারে বাক্স খুলিতে গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে যখনই ঠিক্ জায়গায় চাবিটী লাগে ও ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তখনই বাক্স খুলিয়া যায়। প্রার্থনা সেই চাবি ঘুরাণ। যখনই চাবি ঘুরিবে, অমনি বাক্স খুলিবে

ঐ সামগ্রীটি অন্ধকারে রহিয়াছে। ওখান হইতে সরাইয়া এখানে রাখ, সূর্য্য কিরণ আপনি উহার উপর পড়িবে। সেইরূপ মোহমগ্ন মনকে সরাইয়া অধ্যাত্ম রাজ্যের এমনি স্থানে রাখিতে হইবে যে, আপনিই উহার উপর আলোক পড়ে। প্রার্থনা সেই স্থান।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
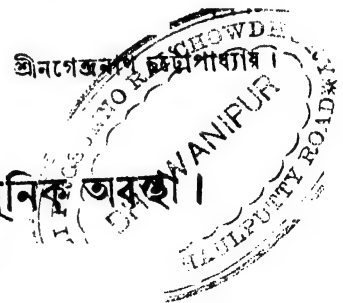
হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

ধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম কি? দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, জড়োপাসনা, পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ সকলই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত। শাক্ত, বৈষ্ণব, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী সকলেই হিন্দু। এইরূপ পরস্পর বিরোধী ও বিভিন্ন মত হিন্দুধর্ম্মের সাগরোপম বিশালগর্ভে সমাবিষ্ট

হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, তবে হিন্দুধর্ম্মের কি কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট বা নির্দ্ধারিত মত নাই? ইহার কি কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিভূমি নাই? আপাতত তাহাই বোধ হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা দেখিলে সুস্পষ্ট ভাবে ইহার একটী বিশেষ ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই ভূমির অন্বেষণেই গমন করিতেছি। এই পুরাতন ধর্ম্মের বহ্বায়ত কলেবর যে এতাদৃশ বিসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গঠিত, ইহার কারণ, হিন্দু ধর্ম্ম বৌদ্ধ অথবা ইস্লাম ধর্ম্মের ন্যায় কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বা প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহা কোন স্বর্গাগত প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের হৃদয়কন্দর নিহিত উৎস হইতে ধরাতলে উৎসারিত হয় নাই। এই সকল ধর্ম্ম বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং প্রবর্ত্তকের মস্তিষ্ক নিঃসৃত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিমিত মত ও বিশ্বাসের উপাদানে ইহাদের দেহ গঠিত। তদতিরিক্ত অর্থাৎ প্রবর্ত্তকের মত ও বিশ্বাসের বহির্ভূত বা বিরোধী বিষয় এই সকল ধর্ম্মে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। আবার অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন মহাপুরুষ অথবা তদনুবর্ত্তী শিষ্যেরা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মতামত ও বিধি নিষেধ সকল শৃঙ্খলাকারে নিবদ্ধ করিয়া এক এক খানি শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই সকল শাস্ত্রই তাহাদিগের ধর্ম্ম মতের এক মাত্র অবলম্বন বা ভিত্তিভূমি। সেই শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া তাহারা কোন কথা বলেন না, সেই শাস্ত্রের বিরোধী বা বিপরীত মত কোন রূপে গ্রহণ করেন না। মুসলমানের নিকটে কোরাণ-বিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ কর, সে কর্ণে অঙ্গুলি দিবে, খৃষ্টানের সম্মুখে বাইবেলের বিপরীত মত ব্যক্ত কর, সে দূরে পলায়ন করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নয়, সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের এমন একখানি কোন বিশেষ গ্রন্থ নাই, যাহার উপরে সকল মতামত নির্ভর করে। কেহ কেহ সনাতন বেদকে হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন ভূমি বলিয়া উল্লেখ করেন, সুতরাং বেদানুমোদিত মতই তাঁহারা হিন্দু মত বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে; কারণ হিন্দুধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ ও গতির বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে, এমন কি বেদের পরবর্ত্তী সময়ে, এমন অনেক কথা ও মত হিন্দু-সমাজ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ ও পালন করিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণরূপে বেদবিরুদ্ধ, এবং বর্ত্তমান সময়ে ত অনেক বেদ-বিপরীত মত হিন্দুধর্ম্ম পোষণ করিতেছে। অনেক ঋষি বেদ-বিরোধী মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অনেক শাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন, সে সকলই হিন্দু ধর্ম্মের ভিতরে বই বাহিরে নয়। সুতরাং বেদই একমাত্র হিন্দু-ধর্ম্মের মত প্রতিপাদক গ্রন্থ বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? সেই হেতু এমন একখানি পুস্তক নাই যাহা পাঠ করিলে হিন্দু ধর্ম্মের সকল মত পরিজ্ঞাত হইতে পারি। হিন্দুধর্ম্ম রূপ বহু কালের পুরাতন বিশাল দেব-মন্দির শাস্ত্রের অনন্তক্ষেত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্মের সুবিস্তীর্ণ সিংহাসন,ভারতের প্রাচীনকালের জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজিত। যেমন পর্ব্বত পৃষ্ঠের নানা স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু বারিকণা অল্পে অল্পে নিঃসারিত হওত কিছু দূরে সকলে সম্মিলিত হইয়া এক প্রবল স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে, হিন্দুধর্ম্ম

সেইরূপ কালে কালে নানা জনের হৃদয়াধিষ্ঠিত জ্ঞানাচল হইতে অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়া, এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাকারে মানব রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য নদীর যখন পৃথিবীতে সঞ্চার মাত্র হয় নাই, তখন ইহা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ সলিলে প্রবাহিত হইতেছিল। যদিও ইহার জল এখন পঙ্কিল এবং আবিলীকৃত, তথাচ এই বহুযুগ-বাহিনী স্রোতস্বিনী মানবজাতির বিবিধ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, ইহার শীতল সুমিষ্টোদকে অনেক সংসার-তাপিত শ্রান্ত জনের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইয়াছে। এখন তবে দেখি, এই ঘোর বৈচিত্রতাপূর্ণ চিত্রের মধ্যে কোন একতা আছে কি না? বৈসাদৃশ্যের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি না? এই বিশেষ বিশেষ মতের মধ্যে কোন সাধারণ সূত্র সঞ্চারিত আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; প্রকৃতপক্ষে তাহাই হিন্দুধর্ম্ম। তাহা হইলে অগ্রে বিশেষ বিশেষ মতের বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। সাধারণত বেদ পুরাণ স্মৃতি তন্ত্র এই ভিত্তি চতুষ্টয়ের উপরে হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ মহাভারত ভগবদ্গীতা গ্রন্থেও হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব নিষ্কাষিত আছে, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদ, এই বেদে হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীনতা অথবা আদিম অবস্থার বিশেষরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। বেদ চারিভাগে বিভক্ত; কিন্তু মনুসংহিতাদি প্রাচীনতর গ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যত তাহাতে বেদকে ত্রয়ীবিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার কারণ অথর্ব্ববেদ বেদের পরিশিষ্ট স্বরূপ এবং পরবর্ত্তী কালে রচিত। সুতরাং তৎপূর্ব্বগ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ থাকাই সম্ভব। কোন কোন গ্রন্থে পাঁচ বেদের উল্লেখ আছে। যজুর্ব্বেদ দুই অংশে বিভক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণ; বোধ হয় সেই জন্যই পঞ্চবেদের কথা লিখিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এখন বেদের প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি, প্রত্যেক বেদই দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র কল্প ও ব্রাহ্মণ কল্প। অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস্ মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ এই তিন ভাগে বেদকে বিভক্ত করিয়াছেন*। যাহাহউক, হিন্দু জাতির চিরপ্রচলিত বদ্ধমূল বিশ্বাস বেদ অভ্রান্ত অপৌরুষেয় গ্রন্থ। এ মত যদ্যপি সত্য হয়, তবে বেদকে একবারে ভ্রমপ্রমাদ শূণ্য অভ্রান্ত বোধে ইহার প্রতি কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে অগ্রে দেখা উচিত বেদ অভ্রান্ত কি না? বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ সম্বন্ধে সাধারণত প্রবাদ বাক্য এই যে, ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে চারি বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি পরাশর "বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখ" এই কথা তাঁহার সংহিতা মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের রচয়িতা নয়, কিন্তু স্মরণকর্ত্তা মাত্র। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদ যখন সৃষ্টপদার্থ হইল, তখন তাহাদের বর্ণ কল্পনা করিয়া বলিলেন,

* "Mantra prayer and praise, embodied in texts and metrical hymns. Brahmana, or ritualistic precept and illustration written in prose.

Upanishad, mystical or secret doctrine, appended to the foresaid Brahmana, and written in prose and occasional verse." Monier William's Hinduism p. 18.

ঋগ্বেদ জবাকুসুমবর্ণ, যজুর্ব্বেদ কাঞ্চনবর্ণ এবং অথর্ব্ববেদ কজ্জলবর্ণ ইত্যাদি। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে, বিষ্ণু হইতে সরস্বতী ও বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার শান্তিপর্ব্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ যতই অনুসন্ধান করা যায়, বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ততই বিভিন্ন মতের আবিষ্কার হইয়া পড়ে। সে সকলের সমাহরণ পূর্ব্বক প্রস্তাব বাহুল্যের আবশ্যকতা মনে করি না। বেদ মানববুদ্ধি বিরচিত পুস্তক, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমত—বৈদিক মন্ত্রের এক স্থলে লিখিত আছে—

অবা নো অগ্ন উতিভির্গায়ত্রস্য
প্রভমনি বিশ্বাসুধীষু বন্দ্য।

অর্থাৎ হে অগ্নি! সমস্ত ক্রিয়া কলাপে তোমাকে স্তব করিতে হয়, তুমি গায়ত্রীচ্ছন্দে সূক্তের সম্পাদন বিষয়ে আমাদিগকে তোমার পালনীয় ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা কর। এস্থলে পরিষ্কার রূপে দেখা যাইতেছে ঋষিরা সূক্ত রচনার জন্য অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। পুত্র নিজেই আপনার পিতাকে দেখাইয়া দিতেছে। দ্বিতীয়ত—যাহারা বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন, প্রত্যেক সূক্তের আরম্ভেই সেই সূক্তকর্ত্তা ঋষি এবং যে ছন্দে সূক্ত রচিত, তাহার নাম উল্লিখিত আছে। যেমন ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথমেই মধুশ্ছন্দা ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দের কথা লিখিত আছে, তাহার অর্থ এই মধুশ্ছন্দা ঋষি সেই সূক্তের কর্ত্তা এবং গায়ত্রীচ্ছন্দে সেই সূক্ত বিরচিত। তৃতীয়ত—অনুক্রমণিকা নামক বেদের পরিশিষ্ট বিভাগে কোন্ ঋষি কোন্ কোন্ সূক্ত রচনা করিয়াছেন, কোন্ ছন্দে কোন্ সূক্ত রচিত, তাহার একটী পরিষ্কার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ৪র্থ—মৎস্য পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে বেদ-রচয়িতা ঋষিগণের নাম ও বংশ বৃত্তান্ত বিশদরূপে লিখিত আছে। সুতরাং বেদ মনুষ্য বিরচিত পুস্তক বই আর কিছুই নহে। আবার যখন মনুষ্য বিরচিত তখন কিরূপে অভ্রান্ত বলা যাইতে পারে? হিন্দু জাতির এই চিরপূজ্য সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ বহুকাল ধরিয়া মনুষ্যের শ্রুতিপথে অবস্থিতি করিতেছিল, সেই জন্য ইহার অপর নাম শ্রুতি। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে বিভক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বেদব্যাস খ্রীষ্টের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নবমাধ্যায়ে লিখিত আছে, ত্রেতাযুগের প্রথমভাগে পুরূরবা নামক নৃপতি বেদকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এখন দেখা গেল, বেদ ঈশ্বর প্রণীত আপ্তবাক্য নয়। মন্ত্র বিভাগের অপর একটী নাম সংহিতা। এই সংহিতাংশ কেবল স্তুতিময়; ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, উষা প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থ পুঞ্জের স্তুতিচ্ছলে বহুতর সুকোমল কবিত্বপূর্ণ পদাবলী সরলস্বভাব ঋষিগণের কণ্ঠ হইতে উদ্গীরিত হইয়া সংহিতা বিভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সংহিতোক্ত ধর্ম্মকে মানবজাতির ধর্ম্মভাবের বাল্যাবস্থা বলিয়া বোধ হয়। বাল্যসুলভ সরলতা ও কোমলতা ইহার প্রতিস্তরে প্রতিফলিত দেখা যায়। এক দিকে সরলতা যেমন ধর্ম্মের বাল্যাবস্থার প্রাণ, অপর দিকে

†পঞ্চদশী গ্রন্থে নারদের বিষয়ে এক স্থলে লিখিত আছে—সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্। শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ ইত্যাদি।

বিস্ময় ও বিভীষিকায় ইহার উৎপত্তি। আর্য্য-ঋষি নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন—রক্তবর্ণা উষার আবির্ভাবে প্রকৃতি রমণীয় অবস্থা ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বাকাশে নবোদিত সূর্য্যের কণকাম্বুরঞ্জিতকিরণচ্ছটা, সুখদ সুস্নিগ্ধ সমীরণের মৃদু মন্দ সঞ্চার, বিহঙ্গকুলের হর্ষসূচক কল-কল-ধ্বনি, নব প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয় প্রাণ-স্পর্শী সৌরভ বিস্তার করিতেছে, বসুন্ধরা সতী অল্পে অল্পে আপনার তিমিরাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, অসাড় জগতে চেতনা ও প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিতেছে; এই সকল পরম মনোরম ব্যাপার দর্শনে বৈদিক ঋষির সরল প্রাণ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন ভাবিলেন, তবে বুঝি উষা সামান্য নয়; তখন বিস্ময়োৎফুল্ল হৃদয় হইতে উষাদেবীর স্তুতিচ্ছলে বহুতর সূক্ত নিঃসারিত হইল। প্রকৃতির একটী সামান্য পরিবর্ত্তনঘটনা দেবপদবী প্রাপ্ত হইল। আবার দেখিলেন, বায়ু প্রবলাকার ধারণ করিয়া নিমেষে বৃক্ষ লতা উৎপাটিত করে, ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের সহিত ঘন ঘন প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে, তখন বায়ুর প্রলয়কারিণী রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া, বৈদিক ঋষির হৃদয় বিভীষিকাতে অবনত হইয়া পড়িল। বায়ুকে দেবপদে বরণ করিয়া তাহার তুষ্টি উদ্দেশে মন্ত্র রচনা করিতে লাগিলেন। অজ্ঞানতাপূর্ণ শৈশবাবস্থায় মনুষ্য জাতি প্রকৃতির শক্তির নিকট অবনত হয়, কিন্তু জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি দিন দিন মনুষ্যের শাসনাধীন হইয়া আসে। যে সময়ে মনুষ্য হৃদয়ে বুদ্ধি বিবেক সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয় নাই, যে সময় মানব-হৃদয় জ্ঞানালোকে পরিমার্জ্জিত ও বিশোধিত হয় নাই; তখনকার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর আশা করা যাইতে পারে? বেদের সংহিতাবিভাগ এইরূপ অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের পূজায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম্ম রূপ বিশাল রাজ্যের প্রথমস্তর এইরূপে নির্ম্মিত হয়। ক্রমে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে তাহারা চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, এই যে সমস্ত ভৌতিক ব্যাপার, যাহাদিগকে আমরা পূজা করি, ইহারা নিজেই ইহার নিয়ামক নহে, ইহাদের পশ্চাতে এক কৌশলময়ী স্বতন্ত্র শক্তি সংযোজিত রহিয়াছে, যাহার দ্বারা সকল কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে। প্রত্যেক পদার্থের পশ্চাতেই এই শক্তি কার্য্য করিতেছে। তখন তাহারা বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তিনী প্রতি-পদার্থগত এক অন্তর্যামিনী শক্তির পরিচয় পাইলেন; এই স্থানে তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম পরিস্ফুটন হইল, তখন তাহারা সেই অন্তর্যামিনী শক্তির আরাধনা করিতে লাগিলেন। সংহিতার স্থানে স্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সংহিতার পর ব্রাহ্মণবিভাগ। এই বিভাগ কেবল যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম কাণ্ডে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ বিভাগে বিবিধ প্রকার যজ্ঞের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসংখ্য প্রকার যজ্ঞের মধ্যে—রাজসূয়, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি কয়েকটী যজ্ঞ প্রধান। দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হইত। গোমেধ যজ্ঞে গো বলিদান করা হইত। একথা শুনিলে হয়ত অনেক হিন্দু এখন চমকিত হইবেন। সে সময় গোবধপ্রথা কেবল প্রচলিত ছিল, তা নয়, কিন্তু গোমাংস ভক্ষণ বিশেষ রূপে

ব্যবহৃত ছিল। এমন কি বেদের উত্তর কালবর্ত্তী সময়ে রচিত গ্রন্থ মধ্যেও গো-মাংস ভক্ষণের কথা লিখিত আছে। অশ্বমেধ-যজ্ঞেতে অশ্ববলিদান করিত। আর্য্যজাতি যে এক সময়ে হিমাচলের উত্তরপশ্চিমস্থিত দেশবিশেষে বাস করিত, এই অশ্ববলিদান প্রথাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কারণ তাতার দেশে অদ্যাপি অশ্ববলিদান প্রচলিত আছে। তাতারদেশীয় লোকেরা অশ্বমাংস ও অশ্বদুগ্ধ অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে। নরমেধ যজ্ঞেতে আর্য্যেরা মনুষ্য বলিদান করিতেন। এই বীভৎস যজ্ঞের কথা স্মরণ হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শুনঃশেফের বৃত্তান্তে এই ভয়াবহ ব্যাপার প্রচলিত থাকার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের এক শত মহিষী সত্বেও তিনি অপুত্রক হন। তিনি মহর্ষি নারদকে বলিলেন, যে আপনি আমার পুত্রের জন্য বরুণদেবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করুন। যদ্যপি পুত্র হয়, তবে আমি তাহা বরুণকে উৎসর্গ করিব। বরুণদেব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কিছু দিন পরে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র জন্মিল। তখন বরুণ আসিয়া বলিল, কই আমাকে পুত্র বলিদান দাও? তিনি বলিলেন, সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হউক। কিন্তু বয়স্ক হইলে পুত্র পিতার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে বনে গমন করিলেন। বরুণদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন, তাহাতে রাজার উদরস্ফীত হইল। রাজপুত্র রোহিত বনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, অজীগর্ত্ত নামক একজন ঋষি অন্নাভাবে মুমূর্ষু প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন রোহিত অজীগর্ত্তকে বলিলেন, আমি তোমাকে শতগো প্রদান করিতেছি, তুমি তোমার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে বিক্রয় কর। ঋষি তাহাই করিলেন। রোহিত শুনঃশেফকে পিতার নিকট লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার পরিবর্ত্তে ইহাকে বলিদান কর। হরিশ্চন্দ্র তখন রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ করিলেন। শুনঃশেফকে হত্যা করিবার জন্য যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করা হইল। তার পর লিখিত আছে, শুনঃশেফ অগ্নির আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করেন। এই ঘটনায় সুস্পষ্টরূপে বোধ হইতেছে,—তখন যজ্ঞে নরবলি দান প্রচলিত ছিল। বেদের মন্ত্র বিভাগে পুরোহিত পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ মধ্যে পুরোহিত পদবীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরহিত্য এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তাহা লইয়া ঘোর বাদবিসম্বাদ হইত। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বহুদিনব্যাপী বিসম্বাদ তাহার প্রমাণ। বৈদিক পুরোহিত চারি প্রকার ছিল—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা; ইহাদের প্রত্যেকের অধীনে আবার তিন জন করিয়া পুরোহিত নিযুক্ত থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পুরোহিতের আবশ্যক হইত। বৈদিক কবিরাই পরে পুরোহিতের পদপ্রাপ্ত হয়েন। এই অসার জিঘাংসা-কলুষিত নানাপ্রকার যাগযজ্ঞ ও কর্ম্মকাণ্ডময় ব্রাহ্মণবিভাগের মধ্যে একটী অতি সারবান্ উজ্জ্বল অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশের নাম আরণ্যক বা উপ-

নিষদ। ইহা ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট। তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল পরমার্থ বিনিমিত পদাবলী পান করিতেন, এইজন্য ইহাদের নাম আরণ্যক হইয়াছে।*

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রার্থনা।

দুই জনে দিয়াছি সাঁতার—
ও পারে মেঘের কোলে, একটি আলোক জ্বলে,
সেই স্নিগ্ধ আলোকণা লক্ষ্য দুজনার।
কে বলিবে, পাব কি না পাব পর পার!

দুজনে শপথ করি, দোঁহে হাতে হাত ধরি,
পবিত্র বন্ধনে বাঁধি হৃদয় দোঁহার,
নাহি ফুরাইতে বেলা, ছাড়িয়া দিয়েছি ভেলা
সম্মুখে রয়েছে পড়ি অকূল পাথার!

পবন বহিছে বেগে, আকাশ ঢেকেছে মেঘে,
ওপারের আলোকণা নিবু নিবু প্রায়;—
প্রচণ্ড তরঙ্গদল, করিতেছে কোলাহল
বুঝি ক্ষুদ্র ভেলা খানি পার নাহি পায়!

ভয়ে সারা দুই জনে, ডাকিতেছি প্রাণপণে,
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধি, কোথা দয়াময়!
অকূল সাগরে মোরা, হইয়াছি দিশাহারা,
আঁধারে ঘেরেছে দিক্—আকুল হৃদয়!

প্রবল স্রোতের টানে, বিকট আবর্ত্ত পানে
শুষ্ক তৃণটীর মত যাইছি ভাসিয়া—
প্রতি তরঙ্গের ঘায়, ভেলা ডুবু ডুবু প্রায়
কি হবে উপায় কিছু পাইনা ভাবিয়া!

শ্রীকিশোরীলাল গুপ্ত।

কেমন হইয়া গেছে প্রাণ!

কেমন হইয়া গেছে প্রাণ,
ভাল করে প্রাণ ভ'রে না পেরে গাহিতে গান!

মনে হয়, পাই যদি,—
একটি অলস নদী,
একটি নধর বট, হেলে ভাঙা তীরে;
ঝর ঝর পাতা গুলি কাঁপিছে সমীরে।
নিঝুম মধ্যাহ্ন-কাল;
অলস স্বপন-জাল
অলখিতে ব'হে যায় হৃদয় ভরিয়া!
দূর—মাঠ-পানে চেয়ে,
চেয়ে—চেয়ে, স্থধু চেয়ে
র'হেছে পড়িয়া!
সে—থা দুটি গাভী চরে;
হোথায় কাতর স্বরে
ডাকিছে ফটী—ক্;
কোথা—কুকো কুব কুব;
হোথা হংসী দেয় ডুব;
ডোঙা-খানি বহে যায় ধিকি ধিক্ ধিক্।
দূরেতে—পথিক দুটি
চ'লে যায় গুটি গুটি
মেঠো পথ দিয়া;
পাশ দিয়ে, ল'য়ে জল,
আঁখি দুটি ঢল ঢল,
কুলবধূ দ্রুত গেল মৃদু চমকিয়া।

* "These are appended to the Aranyakes—certain chapters of the Brahmanas, so awe inspiring and profound, that they were required to be read in the Solitude forests." Monier William's Hinduism. 44 P.

ঊর্ম্মিরাজি বল্লাল দিঘীর পাদমূল বিধৌত করিত, তাহা এক প্রকার বুঝা যাইতে পারে।

প্রাগুক্ত রূপে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সংগঠিত হইল বটে, কিন্তু প্রথমে ইহা একটী সামান্য পল্লীগ্রামের মত হইয়াছিল। পূর্ব্ব নবদ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; সুতরাং তাহার কোন সমৃদ্ধি ইহাতে লক্ষিত হয় নাই। পরে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক জন উদাসীন সন্ন্যাসী আসিয়া এই গ্রামে ভগবতীর একটী ঘট স্থাপন করেন। ইনি এক জন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর মাহাত্ম্যও চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। দেবীর নাম 'পোড়ামা'। পোড়ামা নাম কেন হইল, জানি না; কিন্তু ঐ ঘট অদ্যাপিও এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষমূলে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ প্রদেশের সমস্ত লোক সিদ্ধপীট জ্ঞানে ঐ স্থানে পূজা দিয়া থাকে। এমন কি, টোলের ছাত্রগণ পাঠ সমাপনান্তে পোড়ামার পূজা না দিয়া যাইতে পারেন না। এই রীতি এক্ষণে প্রচলিত আছে কি না, জানি না, কিন্তু ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম যে, কৃতবিদ্য ছাত্র পোড়ামার পূজা দিয়া সেই বৃক্ষ মূলে সমবেত অধ্যাপক মণ্ডলীর নিকট উপাধি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে স্বদেশে যাইতে পাইতেন। অতি প্রাচীন সময় হইতেই নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তজ্জন্য নানাবিধ ও নানা দেশীয় ছাত্রগণ এখানে আসিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিত; তদ্ব্যতীত গঙ্গাস্নানোপলক্ষেও বহুবিধ লোকের সমাগম হইত। এই সকল কারণে নবীন নবদ্বীপ আবার বিগত সৌভাগ্যের কিয়দংশ উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিল।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত হয়; এবং ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। এই সময় মধ্যে প্রাচীন নবদ্বীপ ধ্বংশ হইয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ সংগঠিত হইল; শুধু তাহা নহে, পুনরায় ইহা বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রধান নগর হইয়া উঠিল। চৈতন্য চন্দ্রের সময়ে এই গ্রাম যে, একটী সমৃদ্ধিশালী উপনগর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তদ্দারা আমাদের কথাই দৃঢ়ীভূত হইতেছে। বিদ্যা, বাণিজ্য, তীর্থ ও রাজকীয় সকল অংশেই নবদ্বীপের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়;—

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই;
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা;
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে?
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ;
সরস্বতী দৃষ্টি পাতে সব মহা দক্ষ।
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে;
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপ যায়;
নবদ্বীপে পড়ি সে বিদ্যা রস পায়।
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব লোক সুখে বৈসে;
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।'

চৈঃ ভাঃ আদি ১ অধ্যায়।

চৈতন্যের সময়ে এই নগরে এক জন

কাজী বা রাজকীয় কর্ম্মচারী বাস করিতেন। চৈতন্য চরিতামৃতের ও চৈতন্য ভাগবতের নানাস্থানে ঐ কাজীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাজীর দরবারে বা দেওয়ানে কোন্ দিন কি আদেশ হইত, তাহা জানিবার জন্য প্রজাগণ বড়ই উৎসুক থাকিত; এবং কোন অহিতকর আদেশ হইলে তজ্জন্য প্রভূত শঙ্কিত হইত। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, কাজী সায়েব বিচার কার্য্য ব্যতীতও দেশের শান্তি রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিতেন। এক্ষণকার উপবিভাগ সমূহে যেরূপ সবডিবিসনাল অফিচার ও দেওয়ানী বিচারকগণ পৃথক পৃথক নিযুক্ত হইয়া থাকেন; তখন বোধ হয় এক কাজীই উভয়বিধ ক্ষমতাই পরিচালনা করিতেন।

চৈতন্য-ভাগবতের দশমাধ্যায়ে গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ বলিয়া যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা নবদ্বীপের সমৃদ্ধিশালিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। নানা জাতীয় লোক শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে নগরের বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আচার্য্য, তন্তুবায়, গোপ, গন্ধ বণিক, শঙ্খ বণিক, মালাকার, তাম্বুলী, তরকারী বিক্রেতা, মৎস্য বিক্রেতা, মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই বহুল পরিমাণে উল্লেখ দেখা যায়। হাট, ঘাট বাজার, রাজ পথ ও অট্টালিকা সমূহেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা যায়। সুতরাং এই নগর যে তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহা নিঃশঙ্ক চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গঙ্গার অপর পারস্থ কোন কোন পল্লীর বিষয়ও বর্ণনা আছে। নবদ্বীপাধিবাসীগণ কার্য্যার্থ বা ভ্রমণার্থ ঐ সকল গ্রামে সর্ব্বদা গতি বিধি করিতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ সাঙ্গো পাঙ্গো লইয়া ঐসকল গ্রামে যাইয়া সময়ে সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন :—

"নিত্যানন্দ সকল পার্ষদগণ সঙ্গে,
প্রতি গ্রামে ফিরেন সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
খানা চৌতা, বড়গাছি, আর দোগাছিয়া;
গঙ্গার ওপার কত যায়েন কুলিয়া।"

এই সকল গ্রাম এক্ষণে নবদ্বীপ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছে। সুতরাং ভাগীরথী কাল ধর্ম্মে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে যে অনেক সরিয়া গিয়াছে ও নবদ্বীপকেও সরাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালের পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে কণ্টক নগরী (কাঁটোয়া) শান্তিপুর, বরাহনগর, কুমারহট্ট (হালিসহর) সপ্ত গ্রাম, পাণিহাটি, গৌড়, রাম কেলি; উড়িষ্যার মধ্যে জলেশ্বর, বালেশ্বর, যাজপুর, কটক ও পুরী প্রভৃতি চৈতন্যবিলাসের স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণকার সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতা, কি হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কোন স্থানেরই উল্লেখ নাই। তৎকালে যে এই সকল স্থান কোন অংশেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাঁটোয়া প্রভৃতি নগরের ভৌগলিক তত্ত্ব সর্ব্ব সাধারণেরই বিদিত আছে। সুতরাং তাহার বর্ণনায় প্রস্তাব বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

লীলাভেদ।

চৈতন্যের জীবনেতিহাস লেখকগণ তাঁহার জীবন গ্রন্থ খানি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের

অদ্ভুত ঘটনাবলী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার মর্ত্ত্য জীবন ৪৮ বৎসরকাল ব্যাপী। চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস ও চৈতন্যমঙ্গল কর্ত্তা লোচন দাস, ইহা একরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্য জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুসরণ করিয়া তচ্চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদের প্রণালীকে আধ্যাত্মিক বিভাগ এবং শেষোক্ত গ্রন্থকার তাঁহার প্রাকৃত জীবন অবলম্বন করিয়া লীলাভেদ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার অবলম্বিত প্রথাকে প্রাকৃতিক বিভাগ বলা যাইতে পারে। ২৩ বৎসর বয়সের সময় শ্রীচৈতন্য পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াতীর্থে গমন করেন; সেই খানে ভক্তবর ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ও তিনি পুরীর নিকটে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এত দিন তিনি বিদ্যা রসে মত্ত এক জন দাম্ভিক পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু এক্ষণ হইতে বিনয় ও ব্যাকুলতা অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল এবং তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভক্তি বিকাশের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। এখন হইতে তিনি পূর্ব্বের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিচার বিতণ্ডা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা রজনী প্রেম ভক্তির অনুশীলনে ও সঙ্কীর্ত্তন বিলাসে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে বৃন্দাবন দাস প্রমুখ গ্রন্থকারগণ এই খানে তদীয় জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছেন। আবার তখন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত একসম্বৎসরকাল তাঁহার জীবনে মূর্ত্তিমতী ভক্তির অলৌকিক বিকাশ দেখা গিয়াছিল। প্রেমোন্মত্ততা, মহানৃত্য, মৃদাঙ্গ করতাল সংযোগে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তগণের সহিত বিবিধ লীলা বিলাস ও সমাধি মহাভাবের প্রগাঢ় অবস্থা, এই সময়ের প্রধান ঘটনা। সে জন্য এই খানে তাঁহার জীবন গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে দেশ পর্য্যটন ও নীলাদ্রিতে অবস্থিতি এবং লীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসরের ঘটনা তৃতীয় বা শেষ পরিচ্ছেদ। এই তিন পরিচ্ছেদের নাম আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষ খণ্ড।

লোচন দাসের বিভাগ, বৃন্দাবন দাসের ঠিক্ অনুকরণ নহে। কিছু বিশেষ আছে। ইহার মতে জন্ম হইতে গয়া গমন পর্য্যন্ত আদিখণ্ড; নবদ্বীপ বিলাস, সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাদ্রিতে গমন মধ্যখণ্ড; এবং দেশ পর্য্যটন ও নীলাচলে অবস্থিতি, শেষ বা অন্ত্য খণ্ড।

পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-লীলা এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন,—জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ ত্যাগ ২৪ বৎসর কালের ইতিবৃত্ত আদিলীলা এবং শেষ জীবনের ২৪ বৎসরের ঘটনাবলীকে শেষ লীলা বলিয়া তিনি অবধারণ করিয়াছেন। শেষের ২৪ বৎসরের মধ্যে আবার ৬ বৎসর কাল দেশ পর্য্যটনে ও অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর কাল ক্রমিক নীলাদ্রিতে অতিবাহিত হয়, সে জন্য শেষ লীলা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, প্রথম ৬ বৎসর মধ্য লীলা ও শেষ ১৮ বৎসর অন্ত্য লীলা নামে অভিহিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন;—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি,
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্ধান।
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস;
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস;
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন;
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে;
কৃষ্ণ প্রেম লীলামৃতে ভাসাল সকলে।
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান;
মধ্য অন্ত্য নামে শেষ লীলার দুই নাম।"

চৈঃ চঃ আদিলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার লীলাভেদ তত্ত্বতভাবে দেখিতে গেলে সুসঙ্গত ও শ্রেণী বিন্যস্ত হইলেও, চৈতন্যচরিতামৃতের বিভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখবোধ্য বলিয়া বোধ হয়। এবং লোচন দাসের প্রবর্ত্তিত প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক মনে হয়। কারণ নীলাচলে গমন কোন অংশেই চৈতন্য জীবনের এরূপ ঘটনা হইতে পারে না, যেখানে একটী পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্তি হইতে পারে।

মহা নির্ব্বাণ।

"Who knows whether that which is called living be not indeed rather dying, and that which is called dying, living?" Plato.

প্রকৃতির কোলে সবই হরগৌরী ভাব,—দুই বিপরীত স্বরূপ বিকশিত। ফুলের মিষ্ট হাসি, পাখীর মধুর কাকলী, আকাশের নীলিমায় চাঁদের স্নিগ্ধ ফুটন্ত জ্যোতি, উৎসের মৃদু-মধুর শন্‌শনি, মানুষের হৃদয়ের নবীন প্রেম—এ সকলই চির মধুময়, চির শান্তিময়, চির আরামময়। প্রকৃতির নৃত্যের তালে তালে কত আনন্দ, কত শান্তির প্রস্রবন যেন উথলিয়া পড়িতেছে! কবির লেখনী গাইয়া তাহা শেষ করিতে পারে না—ভাবুক ভাবিয়া অন্ত গণিতে পারে না। কত আলো—কত শোভা—কত আনন্দ—চতুর্দ্দিকে নিমিষে নিমিষে ফুটিয়া পড়িতেছে। কিন্তু হায়, কেবল ইহাই প্রকৃতির লক্ষ্য নহে—ইহাই শেষ নহে। আলোকের কোলে গাঢ় অন্ধকার, হাসির ধারে ক্রন্দন, আনন্দের ধারে বিষাদ, জীবনের ধারে মরণ,—অনন্ত মরণ নিত্য খেলা করিতেছে! ফুলের হাসিময় পাপ্‌ড়ী ঝরিয়া পড়িতেছে,—পাখীর মধুর কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—আকাশের চাঁদের জ্যোতি আঁধার-রাহু গ্রাস করিতেছে। শিশুর সরল হাসিকে মরণ-বিষধর চুম্বন করিয়া, মাতৃ অঙ্কে শিশুকে ঢলাইয়া ফেলিতেছে;—স্ত্রীর প্রেমের বসন্ত বাহার স্বামীর হৃদয়ে চির-উৎস ঢালিতে পারিতেছে না। মরণের ইঙ্গিতে, কে জানে কেন, সুখের ধারে শোক—আনন্দের বাজারে নিরানন্দ—সদাই বিরাজ করিতেছে! এই দ্বিভাব, দ্বিরূপময় সংসারে—মানুষ কেমনে শান্ত চিত্তে বসবাস করিবে?—এই হরগৌরী রূপের গভীর রহস্য মানুষ কেমনে ভেদ করিবে? আসক্তি এবং বৈরাগ্যের

সহিত একই সময়ে মানুষ কেমনে সন্ধি স্থাপন করিবে? জীবন এবং মরণের মন্ম-ভাব একই সময়ে কেমনে মানুষ মজিবে? এই কথার উত্তর যে দিতে পারে, সেই প্রকৃত বীর—সেই প্রকৃত সাধু সেই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

সকল মানুষ কিন্তু এই দুই অবস্থাসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যে ধন পাইয়াছে,—সে কেবলই ধন চায়,—আরো চায়, আরো চায়। কি এক দারুণ পিপাসা তাহার প্রাণে অবতীর্ণ, সে কিছুতেই ধনের মমতা ছাড়িতে পারিবে না। মাটীর টাকা মাটীতে পড়িয়া থাকিবে, মাটীর দেহ শ্মশানে নির্ব্বাণ হইবে, আগুন এবং কাঠ জীবনের শেষ কাহিনী লিখিবে, একথা শত বার, সহস্রবার তাঁহার কাণে কাণে বল, সে কিছুতেই ঐ ধনপিপাসা ছাড়িবে না। দারুণ পিপাসা—কিছুতেই যায় না। কাহার পিপাসা বা যায়? ধন-পিপাসার ন্যায় জ্ঞান-পিপাসা, সৌন্দর্য্য পিপাসা, সুখ-পিপাসা—যশ-পিপাসা, প্রেম পিপাসা—কোন পিপা-সারই শান্তি নাই।—ক্রমাগতই রাবণের চি-তার ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষ রূপ দেখে, আরো দেখে, আরো দেখে—কিন্তু দেখার সাধ কিছুতেই আর মিটে না;—সুখের আশা কিছুতেই ঘুচে না। মানুষের এ যে কি দারুণ ব্যাধি, বুঝি না—মানুষ কিছুতেই মানুষের সঙ্গ-ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিবে না। "রূপ দেখাও, আরো দেখাও; শ্যাম, তোমার পায়ে ধরি, দূরে যাইও না।" শ্যাম-পিপাসায় ভোর রাধিকা কেবল এই কথাই বলিতেছে! অদর্শন তীক্ষ্ণবাণ কিছুতেই রাধার প্রাণে সয় না। আরো প্রেম-মদিরা ঢাল, আরো ঢাল—আরো মাতো, আরো মাতো। ডুবিলে ত আরো ডুব। কুল নাই, জাতি নাই,—কিছুই নাই—শ্যামের জন্য রাধিকা সর্ব্বস্ব দিয়াছে। রাধিকার আদর্শে গঠিত বঙ্গ সমাজের দশা কি হইয়াছে?—বঙ্গ সমাজও আসক্তির এই মধুর সহবাস লোভে এতই পিপাসিত হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কিছুতেই তার মন নাই। সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই—প্রাচীনআর্য্যকীর্ত্তি ক-লাপ কিছুতেই নাই? নাই বা থাকিল! ঢালো আরো ব্রাণ্ডি—ঢালো আরো মদিরা—আরো মত্ততা। রিপুর উত্তেজনায় বাঙ্গালী আজ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, কে ভাবিতে পারে? কুল নাই, জাতি নাই—জ্ঞাতি নাই, কুটম্ব নাই, প্রেমের দায়ে নহে, রিপুর দায়ে বাঙ্গালী-রাধিকার সর্ব্বস্ব গি-য়াছে! কিন্তু গিয়াছে কোথায়? কাহার চরণে? ঐ আসক্তির মধুর চরণে। মানুষ যাহা পারে নাই, মানুষ তাহা কেমনে পারিবে? মানুষ সুখের সময় দুঃখের কথা কেমনে ভাবিবে?—মানুষ মিলনের সময়ে বিচ্ছেদ-কাহিনী কেমনে ধারণ করিবে? মানুষ সহবাস-সুখ উপভোগের সময় কেমনে শোকের সঙ্গীত শুনিবে? এ সকল নাকি অসম্ভব। বালিকার প্রণয় ভোলা অসম্ভব। ধনের পিপাসা ভোলা অসম্ভব, সুরার মাদ-কতাভোলা অসম্ভব। চাঁদের হাসি ভোলা অসম্ভব। ফুলের মধু ভোলা অসম্ভব। প্রণ-য়ীর প্রণয় ভোলা অসম্ভব। অসম্ভব কিন্তু মানুষ প্রকৃতির হাত এড়াইবে কেমনে? ইচ্ছা করিয়া মানুষ এ সকল ভুলিতে পারে না—আসক্তির হাত ছাড়াইতে পারে না বটে—কিন্তু প্রকৃতি ত ছাড়িবার নয়। সে বৈচিত্র্যের মধুরিমা ঢালিবেই ঢালিবে! তো-মার প্রাণ চায় না, তাতে কি? সে আলোর

ধারে আঁধার লেপিবেই লেপিবে। সে সুখের ধারে দুঃখের তীক্ষ্ণ বাণ ছুড়িবেই ছুড়িবে! সে জীবনের ধারে মরণকে রাখিবেই রাখিবে! হায়, একি বিষম ব্যাপার! হায়, একি নিদারুণ কাহিনী! হায়, প্রকৃতির একি ভয়ানক রব!!

মানুষের প্রাণে প্রকৃতির কষাঘাত সময়ে সময়ে বড়ই বাজে! এমন করিয়া কি মারিতে হয়! এই সুখ, এই আনন্দ—এই উৎসব, এই ভরা সংসার—হায় মহূর্ত্তের মধ্যে এ কি হইল!! স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রী হাসিতেছিল, হঠাৎ ঢলিয়া পড়িল! মাতার কোলে সন্তান ফুটিতেছিল, হঠাৎ মলিন হইয়া যাইল! আজ স্ত্রী, কাল স্বামী, আজ পুত্র, কাল পিতা—সুখের সংসার হইতে একে একে কত আত্মীয়, কত আত্মীয়া এইরূপে প্রাণে শেলাঘাত করিতে লাগিল! "সংসার কি তবে দুঃখের? সংসার কি তবে বিষাদের?"—বক্ষে করাঘাত করিয়া মানুষ অবশেষে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আসক্তির তীরে পৌঁছিয়া, অবশেষে মানুষ, বৈরাগ্যের ভিতরে বাধ্য হইয়া প্রবেশ করিতেছে! মানুষের উল্লাস, উত্তেজনা, সাহস, বীর্য্য—সব নিবিয়া যাইতেছে; প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মানুষ, প্রকৃতির হাতের পুত্তলিকার ন্যায় এমনই করিয়া জীবন এবং মরণের মধ্য দিয়া, কে জানে কোথায়, যেন যাইতেছে! বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এমনই করিয়া কে যেন অনন্তের শিশুকে টানিয়া লইতেছে! আমার ইচ্ছা ত, কেবল সুখ লইয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃতি তা দেয় কই? ইচ্ছা ত আনন্দ উল্লাসে সংসার করি—কিন্তু পোড়া প্রকৃতি সে ইচ্ছার কথা কিছুতেই শুনে না। মানুষ যে কেমন অধীন—তা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে মানুষ বুঝিতেছে। কিছুই যেন করিবার শক্তি নাই। মানুষ যে কত হীনবল, তাহা এমনই করিয়া সময়ে সে জানিতেছে! মানুষ যে কত ক্ষুদ্র—তাহা সময়ে এমনই করিয়া সে বুঝিতেছে। "দাঁড়াও, যাই, যাই, যাই—সই, সই, সই"—মানুষ ঠেকিয়া বুঝিয়া তবে প্রকৃতিকে এই কথা বলে। মানুষকে যে কেবল স্বাধীন বলে, তার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে? মরণের ভিতরে মানুষ যাইতে চায় না—তবুও যাইতে হয়। শোক দুঃখের তীক্ষ্ণ কষাঘাত মানুষ সহিতে চায় না, তবুও সহিতে হয়। তবেই দেখ, মানুষ কত অধীন। অধীন হইতেও অধীন। মানুষ প্রকৃতির দাসানুদাস। স্বাধীনতা কি তবে মানুষের নাই? আছে। আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছি। স্বাধীনতা ও অধীনতা, দুই মানুষের আছে। দুই ভাব, দুই রূপই প্রকৃতির। কেবল স্বাধীনতা, লক্ষ্য নয়; কেবল অধীনতাও নয়। মানুষ স্বাধীন-অধীন। মানুষ, মরণের পথে, দুঃখের পথে, বৈরাগ্যের পথে, আপন ইচ্ছায় যায় না। মরণের পথে, দুঃখের পথে, বৈরাগ্যের পথে—অনন্ত জীবনের আরম্ভ! অনন্ত জীবনের পথে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া যায় না। মানুষ সীমার পথে, অস্থায়িত্বের পথে—পাপের পথে—আপন ইচ্ছায় যায়। স্বাধীনতা এই খানে। যাহা চিরকাল আমার নয়, তাহাকেই মানুষ আপনার ভাবে—আপন ইচ্ছায়! যাহা বিষ, তাহাকেই সুধা ভাবিয়া চুম্বন করে, লোক আপন ইচ্ছায়। মানুষ ধন চায়, মানুষ যশ চায়, মানুষ সংসার চায়—মানুষ রিপু চরিতার্থ করিতে চায়। এ

সকল কদিনের বলত? আজ আছে ত, কাল নাই। এক নিমেষের জন্য যাহা, তাহাকে লইয়াই মানুষ থাকিতে চায়। এই খানে মানুষের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার মানুষকে নরকের পথে লইয়া গিয়াছে—আরো যাইবে। আদমের অবনতি—কেবল স্বাধীনতায়। রাধিকার দুর্গতি—কেবল স্বেচ্ছাচারিতায়। যে রিপু দুদিন দশদিন বই থাকে না, তার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকে—মানুষ স্বেচ্ছায়। আর ঐ যে অন্ধকার—গভীর হইতেও গভীর—ঘন হইতেও ঘন, ঐ যে অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় শোক দুঃখ, ঐ যে শ্মশান আগুন এবং কাঠ দিয়া মহা নির্ব্বাণের মহাপাঠ লিখিতেছে, উহার ভিতরে যে মানুষ ডুবিতে চায় না, উহার ভিতরে কি তা জান?—উহাই নব নেয় আরম্ভ। কি শাস্ত্র লিখিতেছে—আগুন-কালিতে ঐ মহা বৈরাগ্যের শ্মশান?—শাস্ত্র এই—"ধূলি মাটীর খেলা ছাড়—অনন্ত জীবন পথে অগ্রসর হও।" আলোক ত সীমাকে দেখাইয়া দেয়—আসক্তি ত ক্ষুদ্রেরই পরিচয় দেয়। এ সকল লইয়া কেন চিরকাল ভুলিবে? চাহিয়া দেখ, অন্ধকার অসীমের কাহিনী বলে, বৈরাগ্য অনন্তের রূপই দেখাইয়া দেয়। আলোক—সসীম-ব্যঞ্জক, অন্ধকার অসীম-ব্যঞ্জক। আলোক, স্বাধীনতার লক্ষ্য; অন্ধকার অধীনতার পরিণাম। দ্বিপ্রহর গভীরা অন্ধকারা রজনী—মহাশ্মশানে মানুষের পরিমাণ মহা অক্ষরে লিখিত হইতেছে—অনন্ত। অনন্ত কি? না, মানুষ যাহা ধারণা করিতে পারে না। মরণ কি? না, মানুষ যাহা বুঝিতে পারে না। অনন্তে ডুবাইবার জন্য আলোকের ধারে অন্ধকার। অনন্তের পথে লইয়া যাইবার জন্য, জীবনের ধারে মরণ। অনন্তের তত্ত্ব শিখাইবার জন্য, সংসারের কোলে শ্মশান। অনন্তে লক্ষ্য ফিরাইবার জন্য—আসক্তির কোলে—মহানির্ব্বাণ। অনন্তের কাহিনীতে নিমগ্ন করিবার জন্য, স্বাধীনতার ধারে অধীনতা। তোমার ইচ্ছা থাক্, বা না থাক, ভাই, অহঙ্কারী, সংসার-আসক্তি-নিমগ্ন মানুষ, তোমার পরিণাম ঐ শ্মশান, ঐ মরণ, আর ঐ অনন্তের পথ! ক্ষুদ্র হইয়া কি মানুষ চিরকালই ক্ষুদ্র থাকিবে! না—তা নয়। অনন্তের শিশু অনন্তের পথ ধরিবেই ধরিবে! আসক্তি নয়—সুখ নয়—আলোক নয়—সীমা নয়—কিছুই মানুষের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য—ঐ অনন্ত! লক্ষ্য, যাহা মানুষ জানে না, তাহাই। লক্ষ্য, যার ভিতর মানুষ যাইতে চায় না, তাহাই! কেন তবে মজিব? কেন আসক্তি বা সুখ, ধন বা যশ, আলোক বা সীমা, স্বাধীনতা বা নরক লইয়া বসিয়া থাকিব? চাই না, কিছুই চাই না। সংসার যা'ক, আসক্তি যাক্, সুখ যাক্, আনন্দ যাক্, মিলন যাক,—শরীর যাক—কিছুই চাই না। আমার এই ইচ্ছা, আমি দাসানুদাস হইয়া—একের কোলে মাথা রাখিয়া, অভয়-ব্রত গ্রহণ করিয়া, ঐ অনন্ত মরণকে স্পর্শ করিয়া ঢলিয়া পড়ি। আরো ইচ্ছা এই—সামঞ্জস্য করিব; হর গৌরীর মাহাত্ম্য বুঝিব; স্বাধীনতা ও অধীনতার মর্ম্ম ভেদ করিব। 'আয় শ্মশান, আয় দুঃখ, আয় শোক, আয় মরণ, তবে তোরা আয়, আমার কাছে আয়! ভেদাভেদ নাশ কর্, স্ত্রী পুত্রের আসক্তি নির্ব্বাণ কর্'—আমি সংসারে থাকিয়া থাকিয়া তোকে চুম্বন করিয়া মহা বৈরাগ্যের মহা শাস্ত্রের মহত্তত্ত্ব

বুঝি। ইচ্ছা, মহানির্ব্বাণে আসক্তিকে ডুবাইয়া—জীবনত্ব, দেবত্ব, সংসারের অতীতত্ব যাহা কিছু, তাহাই লাভ করি। চিরকালের জন্য সীমাকে লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়া অসীমের দাস হইয়া যাই। ভয় কি!—ভাবনা কিসের? মাটীর ভিতরেই সোণা। জীবনের ভিতরেই মরণ। মরণের ভিতরেই অনন্ত জীবন প্রস্ফুটিত। মহাকালী, মহামায়ার জাল ছিন্ন করিয়া, উগ্রচণ্ডা, রণরঙ্গিণী, উন্মা দিনীবেশে বিকট হাসি হাসিয়া কেবল অসুরদল নাশ করিতেছেন। অসুর পরাজিত হইবে না? রিপুর গঞ্জনা নিবিবে না? স্বাধীনতা ডুবিবে না? মায়ের ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হইবে। মহাকালীর মহা প্রতিজ্ঞা অবশ্য পূর্ণ হইবে। মানুষ, মৃণ্ময়ত্ব বা অসুরত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব বা জীবনত্ব লাভে অবশ্য বাধ্য হইবে। মানুষ, অবশ্য রক্ষা পাইবে। মাভৈ মাভৈ রবে, মানব-তনয় এক দিন অনন্তের দিকে ধাবিত হইবেই হইবে। ধূলি মাটীর খেলা—অসুরত্ব বা বালকত্ব, এ সকল চিরকাল মানুষকে জীবনত্ব হইতে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে না। মহাশ্মশানের ভিতর দিয়া মানুষ সেই মোক্ষ, সেই স্বর্গের দিকে যাইবেই যাইবে। আদম-সন্তান আবার অধীন হইবে। রাধিকার আসক্তি আবার বৈরাগ্যের গীতি গাইতে গাইতে ভগবৎভক্তিতে পূর্ণ হইয়া, মহা নির্ব্বাণের পথে উল্লসিত চিত্তে ধাবিত হইবেই হইবে। মানুষ, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি এই অপরিহার্য্য বিধানের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে? সাধ্য নাই বলিয়াই, মহানির্ব্বাণ-ব্রতে সকলেই দীক্ষিত। রাজা, প্রজা, ধনী দরিদ্র—বড় ছোট সব একাকার, ঐ মহানির্ব্বাণে। সংসার ছিন্ন করিয়া ধূলিবালির আকর্ষণ ঠেলিয়া—মানুষ মায়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া, ঐ দেখ, কেমনে মহানির্ব্বাণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে! মাতার কোলে এই শিশু হাসিতেছিল, খেলিতেছিল,—এই দেখ, ঢলিয়া পড়িল! স্বামী, প্রেমালিঙ্গনে জীবনকে কৃতার্থ করিতেছিল—হায় হায়;ঐ দেখ প্রেমের ডোর ছিন্ন,—স্বামীর কোলে সতীর দেহ মহানির্ব্বাণ-প্রাপ্ত। পতঙ্গ কেমন উল্লাসে পুড়িয়া মরিতেছে। মানুষ,অনায়াসে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতেছে! কিসের আশায়? কাহার ইঙ্গিতে? আশা না থাকিলে কি শোককে জয় করা সম্ভব? আশাই মৃত্যুঞ্জয় বীজ মন্ত্র। কিসের আশা? জীবনের আশা;—মহা জীবনের মহা আশার মহা আসক্তির মায়ায় সংসার আসক্তি সে ভুলিতেছে! প্রাণের মূলে সেই আশার বাণী—মহাজীবন-কাহিনী সদা নিনাদিত হইতেছে যখনই মানুষ সেই সুধা-বিনিন্দিত আশার কাহিনী শুনিতেছে, তখনই বন্ধন ছিঁড়িয়া, স্বেচ্ছাকে ডুবাইয়া, মহানির্ব্বাণে ডুবিতেছে। এক দিন না একদিন, হে মানুষ, তোমাকে এই মহানির্ব্বাণে ডুবিতেই হইবে! অহঙ্কার, জ্ঞান বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য সুখ, সব একাকার হইবে। গৃহে শ্মশান, হৃদয়ে শ্মশান, আকাশে শ্মশান! চতুর্দ্দিক অন্ধকার, মহা অন্ধকার—বায়ু শোঁ শোঁ বহিতেছে, আগুন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, একদিন ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতেই হইবে। প্রকৃত মানুষ তাঁহারা, যাঁহারা এই অপরিহার্য্য মহানির্ব্বাণ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সময় থাকিতে থাকিতে, জীবন, মরণ, সুখ দুঃখ, আসক্তি এবং বৈরাগ্যকে একই সময়ে আলিঙ্গন করিতে পারেন। এই কঠোর সংসারে

—এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে, এই নিত্য হাসিমৃত্যুময় সংসার-শ্মশানে যাঁহারা প্রকৃত অস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া চক্ষুকে ঐ মহা অন্ধকারের অতীত স্থানে ফিরাইতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। আসক্তির কোলে বৈরাগ্য, সংসারের কোলে শ্মশান, জীবনের কোলে শব-সাধনে সিদ্ধ হইয়াই, মহাদেব, মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকালের জন্য অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই মহানির্ব্বাণকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইয়াই খ্রীষ্ট চিরকালের জন্য অমর! অতএব মরণের ভিতরে যে জীবন, মাটীর ভিতরে যে চিন্ময় বস্তু, আসক্তির অতীত যে মহাপদার্থ, তাতে দৃষ্টিকে ফিরাইয়া যত দিন লক্ষ্য-সিদ্ধ করিতে না পারিবে, ততদিন কিছুতেই মানুষের মরণের ভয় যাইবে না। অমর সেই, যে মৃত্যুকে ভয় করে না। সুখী সেই, যে দুঃখে কাতর হয় না। প্রকৃত প্রেমিক সেই, যে বৈরাগ্যকে,—বিচ্ছেদকে ভয় করে না। মৃত্যুর ভয়, দুঃখের ভয়, বিচ্ছেদের ভয়কে অতিক্রম করিয়া—এ সকলের অতীত যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারাই মহানির্ব্বাণ, ব্রতে দীক্ষিত। সংসারে থাকিয়াও তাঁহারা সংসারে নন্; সংসারে না থাকিয়াও তাঁহারা সংসারে আছেন। ইহকাল, পরকাল; স্বর্গ, মর্ত্ত্য উভয়কে প্রাণগত করিয়া যাঁহারা চিরস্থায়ী অনন্ত জীবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—প্রকৃত তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারাই মানুষ, তাঁহারাই জীবিত, তাঁহারাই দেবতা, তাঁহারাই অমর। তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিয়াও মোক্ষ বা বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন। আর সকলই মৃত, সকলই অসার।

নব্যবঙ্গ।

(তৃতীয় প্রস্তাব।

ইংরাজি শিক্ষায় যে সকল দোষ ঘটিয়াছে, তাহাও উল্লেখ করা উচিত। ইংরেজি বিজাতীয়, বিদেশীয় ভাষা। বাল্য কাল হইতে যে ভাষা অভ্যস্ত হয়, যে ভাষাবিৎ লোকদের মধ্যে বর্দ্ধিত ও প্রতিপলিত হওয়া যায়, ভাষার প্রাণ স্বরূপ যে সকল আচার, ব্যবহার, প্রবাদ, গল্প, হিয়ালী, পুরাণ, ইতিহাস কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে, সেই ভাষাই মানুষের প্রাণের পিপাসা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার এক মাত্র ভাষা। আবার দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ভেদে যেমন বিভিন্ন মানবপ্রকৃতি সংগঠিত হয়, তেমনই ভিন্ন২ মানব প্রকৃতির অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষা সংগঠিত হয়। ইহা স্বভাবের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। একই সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী, গুরুমুখী প্রভৃতি এবং একই লাটিনের অপভ্রংশে ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জর্ম্মান্ প্রভৃতি ভাষা সৃষ্টির ইহাই প্রধান কারণ। যদিও প্রদেশ ভেদে অনেক সময় প্রাচীন আর্য্য ভাষার সঙ্গে তদঞ্চল-নিবাসী বর্ব্বর জাতির ভাষা মিশ্রিত হইয়া প্রাদেশিক ভাষা গুলির অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ভাষার মৌলিকতায় সামান্য বিকৃতি মাত্র ঘটিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশীয় মানব প্রকৃতিই ভাষার মৌলিকতাকে বিকৃত শাখা প্রশাখায় বিভাগ করিবার মূল কারণ। আবার একই মূল ভাষার আকৃতি চিরদিন সমান থাকে না। কেবল সারবত্তা এবং

বঙ্গ-দর্শনই ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূল নহে। কাল ক্রমে মানুষের রুচি ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তনেই ধীরে ধীরে ভাষার আকৃতি-গত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। এই জন্য ঋগ্বেদের ভাষা যেরূপ অবোধ্য, তৎপরবর্ত্তী বেদ ও সূত্র সমূহের ভাষা তদ্রূপ নয়। আবার উপনিষদের ভাষা এবং পৌরাণিক ভাষা ক্রমান্বয়ে আরও সহজতর ও ভিন্নাকৃতিবিশিষ্ট। আর্ষ-কালের পরে সংস্কৃত ভাষার মৃত্যু ঘটিয়াছে। আর্ষকাল পর্য্যন্ত ভাষা ব্যাকরণকে শাসন করিতেছিল। তৎপরেই ব্যাকরণ ভাষার পরিচালক হইয়াছে। সংস্কৃতের এই মৃতাবস্থায়ও কালিদাসী ভাষা, জয়দেবী ভাষা ও আধুনিক চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের ভাষায় কত প্রভেদ ঘটিয়াছে! বাঙ্গালা ভাষারও সাময়িক আকৃতিগত প্রভেদ দেখা যাইতেছে। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের সময়ে বাঙ্গলা ভাষার যে আকৃতি ছিল, তাহা বৈষ্ণব-যুগে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলী সমূহ হইতে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য ভাগবতাদির ভাষা অনেক বিভিন্ন। বৈষ্ণবী ভাষার অপেক্ষা মুকুন্দ নারায়ণ, রাম প্রসাদ এবং ভারত চন্দ্রের ভাষা আরও পৃথক্। তৎপরেই ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সম-কালীয় ভাষা। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রভাকরের ভাষায় যেমন "বেদের টোল না বেদের টোল" ইত্যাদি জটিল যমক ও অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারের ছড়াছড়ি পূর্ণ ঝগড়ার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছিল, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় কুমার দত্তের যুগে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া সুমার্জ্জিত রুচি-পূর্ণ প্রাঞ্জল ও তেজস্বীরূপ ধারণ করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্যের ন্যায় পদ্যেরও ভাষা রঙ্গলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতির সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতে-ছিল। ইহার পরেই গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পদ্যে মাইকেল মধুসূ-দন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই শেষ আকৃতির বাঙ্গলা ভাষাই ঈষৎ উন্নতাবস্থায় ক্রমেই উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। বঙ্গদর্শন, বান্ধব ও আর্য্যদর্শনের যুগ হইতে ভারতী, নব্যভারত, প্রচার ও নবজীবনের যুগ উন্নততর বোধ হইতেছে। পূর্ব্বের সোমপ্রকাশ প্রভৃতি হইতে সাধারণী ও সঞ্জীবনী প্রভৃতির লেখা অনেক উন্নত। ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশীয় জীবন্ত ভাষা সমূহেরও এই রূপ যুগের পরে যুগ-পর্য্যায় দেখা যায়। মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তনই ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তনের মূল। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং বাহ্য প্রকৃতির সাময়িক পরিবর্ত্তনে দিন দিন মানব প্রকৃতি যেমন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা গুলিও তেমনই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। একথা প্রমাণ করিতে আর যুক্তি বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু ভাষার সঙ্গে মানব প্রকৃতির এই রূপ ঘনিষ্ঠ এবং অবিভিন্ন সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, মাতৃ ভাষাই মানুষের প্রকৃত সর্ব্বাঙ্গীন হৃদয়ের ভাষা। বিজাতীয় ভাষায় মানুষ সহস্র জ্ঞান লাভ করিলেও, তজ্জা-তীয় লোকের প্রতিযোগিতায় প্রকৃত পক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় না। মাতৃ-ভাষা ভিন্ন পর জাতীয় ভাষায় কখনও কোন মানুষ প্রকৃত উচ্চ দরের কবি বা

কাব্য-লেখক হইতে পারে না। এমন কি, বিশুদ্ধ উচ্চারনাদিতে পর্য্যন্ত যথেষ্ট হীনতা দৃষ্ট হয়। অত্যন্ত ভয়ে বা ক্রোধাদিতে জ্ঞান শূন্য হইয়া উত্তেজিত হইলে, চিরাভ্যস্ত ভাষাই তখন মানুষের ভাষা হয়। এই কারণে যে সকল পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী লোক সচরাচর পশ্চিম বাঙ্গালার ভাষা অনুকরণ করেন, অত্যন্ত ক্রোধান্ধতার সময়ে গালিগালাজাদিতে তাঁহাদেরও মুখ হইতে প্রদেশীয় ভাষাই বাহির হয়। উচ্চারণাদির কাঠিন্য ও প্রকৃতি-সিদ্ধ অনভ্যস্ততাই ইহার একমাত্র কারণ। বস্তুত সর্ব্বপ্রকারেই জাতীয় লোকাপেক্ষা সাধারণত বিজাতীয় লোক ভাষা ও ভাষা-গত ভাব গ্রহণাদি সম্বন্ধে হীনতর না হইয়াই পারে না। এই জন্য পারসী আরবীর প্রচলন সময়ে মুসলমানগণই সর্ব্ব বিষয়ে তৎকালীন বিদেশীয় যাবনিক শিক্ষায় বিচক্ষণ ও অগ্রণী ছিলেন। এখনও ইংরেজগণ শিক্ষাসম্বন্ধে দেশীয় লোকদের গুরু ও পরিচালক। যতকাল না আমাদের জাতীয় ভাষায় জাতীয় শিক্ষা উন্নত রূপে আরম্ভ হইবে, ততকাল ইংরেজ জাতির নীচে থাকিয়া, ইংরেজকে আদর্শ ও প্রধান মনে করিয়া হীনতর জাতিরূপে আমাদিগকে জগতের নিকট পরিচিত হইতে হইবেই হইবে। অপর পক্ষে, আমাদিগকে হীনতর মনে করা ইংরাজেরও স্বাভাবিক হইবে। জ্ঞান ও প্রতিভাই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রধান বীজ। এই দুই বস্তুর অভাবে মানুষের ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়ই কলুষিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া অবনতির চরম অবস্থায় উপস্থিত হয়। কাহারও কাহারও মাতৃভাষায় অত্যন্ত অনধিকার প্রযুক্ত কোন কথা বলিতে হইলেই বিজাতীয় ভাষা বাহির হইয়া পড়ে। অনেক সময় মাতৃ-ভাষা অপূর্ণ ভাষা হইলে, অভ্যস্ত বিজাতীয় পূর্ণ ভাষায় আবশ্যক মত কোন কোন দরকারি কথা বার্ত্তা বলিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এখানেও নিরবচ্ছিন্ন বিজাতীয় ভাষা বলা নিষ্প্রয়োজনীয় ও কদর্য্য রুচির পরিচায়ক। আবশ্যক মত কথা ব্যবহার বা উদ্ধৃত করিয়া স্বজাতীয় ভাষায় বলিলে বা লিখিলেই ভাল হয়। ইহাতে আপাতত বিষয়টী, সর্ব্ব সাধারণের বুঝিবার উপযোগী একটী স্থায়ী জিনিস হয়.অপর পক্ষে, ইহাতে মাতৃ ভাষার ক্রমোন্নতিও সাধন হয়। অনেক মহাত্মা ব্যক্তি দ্বারা এইরূপেই বঙ্গ ভাষা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের সমস্ত উচ্চ শিক্ষিত লোক পূর্ব্বাবধি এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে, বঙ্গ ভাষার আরও যে কত উন্নতি হইত, বলা যায় না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের পরেও দেশের সাধারণ শিক্ষিত দলের এদিকে তত চোক পড়ে নাই। বঙ্কিম বাবু এবং তাঁহার বঙ্গদর্শনের লেখক দলের পরবর্ত্তী সময় হইতেই এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক্, অভাব পক্ষেই মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করিতে, স্থলবিশেষে বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় লয়। কিন্তু উহা আমাদের পূর্ব্ব যুক্তির কোনটীরই প্রতিবাদক নয়।

বিদেশীয় বিজাতীয় শিক্ষায় তদ্ভাষার বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্যাদি পাঠে যেমন সেই জাতীয় লোকের অপেক্ষা বিচক্ষণতা লাভ করা যায় না,অর্থাৎ প্রকৃত বিজ্ঞতাংশে চিরদিনই ন্যূন থাকিতে হয়, তেমনই প্রকৃত প্রতিভা সম্বন্ধেও হীনাবস্থায় থাকিতে

হয়। প্রতিভা অতি স্বাধীন জিনিষ। কোন রূপ অনুকরণে বা অস্বাভাবিক চেষ্টায় কিম্বা বিশেষ বাঁধা-বাঁধি নিয়মের শৃঙ্খল মধ্যে ইহার বিকাশ অসম্ভবপর। জ্ঞানের পর্য্যালোচনাতেই অনুকরণ কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পূর্ণ মৌলিকতা মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়। কারণ মানুষ জন্মাদি-জনিত পূর্ব্বসংস্কার ও পরজ্ঞান সাপেক্ষ না হইয়া পারে না। তবে শিক্ষা-জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের মৌলিকতা অক্ষুন্ন রাখিতে যে পরিমাণে উপযোগী, তাহা সেই পরিমাণেই উৎকৃষ্ট। মানুষের মনে বহু দর্শিতার সহিত চিন্তার উন্মেষ বা তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদ্রেক করিয়া দিবে, ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিক্ষা বরং জন্মাদি-জনিত পূর্ব্ব সংস্কার এবং শৈশব শিক্ষার অন্ধকার মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাত কিরণ ঢালিয়া দিয়া তাহা উজ্জ্বল ও সুমার্জ্জিত করিবে, এই জন্যই শিক্ষার এত আদর। কিন্তু বিদেশীয় শিক্ষায় ইহা পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। বিদেশীয় জ্ঞান, বিদেশীয় বিষয় অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হয়। বিদেশীয় লোক-চরিত্র, বিদেশীয় লৌকিক আচার ব্যবহার, বিদেশীয় প্রকৃতির বর্ণনা, বিদেশীয় প্রাকৃতিকাবস্থা ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাদিই বিদেশীয় জ্ঞানের ভিত্তি ও ভাষার বাক্তব্য বিষয়। আবার ভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিকাবস্থায় অবস্থিত পণ্ডিতগণের প্রতিভাদিও ভিন্ন প্রকার। এই সকল কারণে বিদেশীয় শিক্ষা মানুষকে কেবল মাছী-মারা নকল নবিশ করে; সকল জ্ঞানই মুখস্থ হয়। হৃদয়, চরিত্র ও জীবনের মূল পর্য্যন্ত সে শিক্ষার শিকড় পৌঁছায় না। এই রূপ ভাসা ভাসা মৌখিক শিক্ষা মানুষকে বিকৃত ও অপ্রতিভাশালী করিয়া তোলে। আবার বিদেশীয় ভাষা ও জ্ঞানের বিষয় গুলি অবগত হইতে বহুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার দরকার হয়। পুনশ্চ কোন বিষয়ই হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয় বলিয়া, পাঠের রুচিও দিন দিন কমিয়া যায়। এইরূপ কাঠিন্য সহকারে চিনির বলদের মত বোঝা বোঝা গ্রন্থ বহন করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া, চিন্তা ও প্রতিভা হারাইতে হয়। এই সকল কারণে আজ কাল আমাদের দেশে প্রতিভাশালী লোকের বড়ই অভাব দৃষ্ট হইতেছে। যে সকল গ্রন্থাদি বাহির হইতেছে, তাহাতে মৌলিকতা অল্পই থাকে। সমস্তই কেবল ইংরাজির ছায়ায় রচিত হইতেছে। বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঈশ্বর গুপ্তের সময় হইতে বঙ্গ ভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের লেখকগণের লেখাতে প্রতিভা এবং মৌলিকতা দৃষ্ট হইবে। যাঁহারা প্রথম যুগের বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী ও বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহ, তৎপরবর্ত্তী মুকুন্দ নারায়ণ, রাম প্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের লেখা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অথবা অধিকাংশ শিক্ষিত বঙ্গবাসীকেই এসম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিতে হইবে না। যদিও কবিকঙ্কন চণ্ডী পড়িলে অন্নদামঙ্গলের নূতনত্ব বড় একটা থাকে না, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যা সুন্দর পড়িলে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের কল্পনা চাতুর্য্যের মৌলিকতা অধিক থাকে না, তথাপি লেখার মধ্যে, হীরাদির চরিত্র রচনায় যেন কবির কেমনই একটা মূল প্রতিভার ছায়া পড়িয়াছে। ইহারই পরে ঈশ্বর গুপ্তের লেখা। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী লোকের লেখাতে আর নকল

ভিন্ন বড় কিছুই একটা দেখা যায় না। বরং বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে আবার লেখার জীবন ফিরিয়া আসিতেছে। দেশীয় শিক্ষিতগণ যতই মাতৃ ভাষাকে আদরের চক্ষে দেখিয়া, ইহাকেই আপনাদের লিখিত ও মৌখিক ভাষা করিয়া তুলিবেন, ততই আমাদের গৌরবের দিন ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইবে। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, লাটিন, গ্রীক, আরবী প্রভৃতি নানা ভাষার নানা জ্ঞান শিক্ষায় কোনই বাধা নাই। কিন্তু প্রথমে মাতৃ ভাষায় বিচক্ষণতা লাভ করিতে হইবে এবং মাতৃ ভাষাকেই বলিবার ও লিখিবার প্রধান ভাষা করিতে হইবে। যেন সকলেরই পদে পদে মনে থাকে, মাতৃ ভাষার অঙ্গাভরণ সংগ্রহ করিতেই অন্য ভাষা পড়িবার দরকার। ইংরেজী পড়িয়া মাতৃ ভাষা ভুলিয়া সাহেব হইব, ফ্রেঞ্চ পড়িয়া ফরাশী সাজিব, এ কুৎসিত ভাব স্বপ্নেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আর কি বলিব? ভাষাই জাতীয় জীবনের সর্ব্ব প্রধান যন্ত্র। জাতীয় ধর্ম্ম, সমাজ নীতি, বিজ্ঞান, সকলেরই উন্নতির মূল ভাষারপূর্ণ উন্নতি। বর্ত্তমান সময়ে বিচারালয়াদির সামান্য কার্য্য দিতে পর্য্যন্ত ইংরেজি ভাষার প্রচলন হইয়াছে। ইংরেজি না জানিলে এখনকার ভদ্র সন্তানের চাকরী যোটা ভার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে আপাতদৃষ্টিতে দেশ মধ্যে বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রচারিত হওয়ায় বর্ত্তমানের রাজনীতি বা ধর্ম্মাদির আলোচনা ও আন্দোলন করিবার কিছু সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু পরোক্ষে আর একটী স্থায়ী ক্ষতি হইতেছে। মাতৃভাষা বঙ্গ ভাষার আশানুরূপ উন্নতি বা পূর্ণত্বলাভের অংশে বড় ক্ষতি হইতেছে। আবার বাঙ্গালা শিক্ষার প্রতিও মানুষের আদর কমিয়া যাইতেছে। বস্তুত, পাশ্চত্য জ্ঞানের আলোক এই সময়ে দেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়াতে, কি ভাষার উন্নতি, কি রাজনীতি, ধর্ম্ম নীতি, সমাজ নীতির উন্নতি, সকল বিষয়েরই উন্নতি হইবে। কিন্তু এজন্য গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় যাহাতে সমভাবে ইংরেজি ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার উপায় হয়, উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহু পরিমাণে দেশে বৃদ্ধি পায়, বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানালোচনার প্রতি যাহাতে আপামর সাধারণ নর নারীর রুচি ও আগ্রহ হয়, তৎসম্বন্ধে ভূয়ঃ ভূয়ঃ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু অলসের মত একটা অনিষ্টকারী কৃত্রিম উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে দেখিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। বিচারালয়াদি ত পরের হাতের কথা। দুঃখের কথা কি বলিব? দেশের রাজনৈতিক সভাগুলি পর্য্যন্ত ইংরেজিতে ছাড়া একটী কথা লেখা পড়া করেন না। ধর্ম্মালোচনার ক্ষেত্রেও এই বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্ক হয়। বাস্তব পক্ষে, এই সমুদয়ের কঠোর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আবার গবর্ণমেণ্টকে কান্নাকাটি জানাইতে এবং ইংরাজ সমাজে বিজ্ঞতা লাভ করিতে অনেক শিক্ষিত লোক ইংরেজি পত্রিকা বাহির করিয়া থাকেন। এই কারণে দেশে ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞ লোকের শক্তি ইহাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহাও অতি দুঃখের বিষয়। মাতৃ ভাষার উন্নতি করে, জাতীয় চরিত্র গঠন করে

এই সকল শক্তি প্রযুক্ত হইলে আমাদের অনেক উন্নতি হইত। দেশে একখানি ইংরেজি পত্রিকা থাকিলেই রাজ পুরুষদিগকে মধ্যে মধ্যে নিষ্ফল কান্না জানাইয়া তাঁহাদের কাণ ঝালাপালা করা যাইতে পারে। এ বৃথা নিষ্ফল কান্না কাঁদিবার জন্য এত মেহানত ও চেষ্টা ব্যয়ের দরকার কি? মিরার সম্পাদকের মত লোক একখানি বাঙ্গালা দৈনিক কাগজ বাহির করিলে কি ভাল হয় না? অপরাপর বিজ্ঞ বিজ্ঞ সম্পাদকেরা যদি বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়া আপনাদের চিন্তা ও প্রতিভা দেশের লোকের প্রকৃত উপকারে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে কি বাঙ্গলা ভাষা প্রতি দিন অনেক উন্নত হইয়া জাতিকে আরও গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হইত না? অবশ্যই ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদ করা উচিত। কেননা মানুষের প্রাণে ন্যায়ের অঙ্কুর থাকিতে অপ্রতিবাদে ন্যায়-বিরুদ্ধ অত্যাচার সহ্য করিতে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয় না। আন্তরিক সরল সাহসের ভাষাতে অন্যায় ও অসত্যের দোষ ঘোষণা করাই মহত্ত্বের কাজ। ইহাতে অত্যাচারের আগুন না নিবিয়া প্রথমে ঘনীভূত হয়। প্রবল অত্যাচারীকে দোষ দেখাইয়া বাধা দিলে বরং বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে মুণ্ডচ্ছেদন করে। বস্তুত অত্যাচার নিবারণই প্রথমত প্রতিবাদের ফল নয়। তবে ইহাতে ধীরে ধীরে জাগ্রত অত্যাচারিত মানুষের প্রাণে যে আগুন সঞ্চিত হয়, কালে তাহাই অত্যাচারীর অত্যাচার সমূলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। বর্ত্তমান আয়র্লণ্ড এবং কিছুদিন পূর্ব্বের ইটালি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। "কার্ব্বনেরো" প্রভৃতি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী সম্প্রদায়ের পরেই ম্যাটসিনীর দল আবির্ভূত হয়। আয়র্লণ্ডে এখনও অল্প অল্প নর-রুধির ইন্ধনে ভিতরে ভিতরে অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন হইতেছে। পার্নেলাদি সাহসী পুরুষগণ অভ্যুদিত হইতেছেন। গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব বহু দর্শন বলে ইহা অবগত হইয়াই আয়র্লণ্ডকে অংশত স্বাধীনতা দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

বস্তুত নীরবে অত্যাচার সহ্য করিলে অত্যাচার সহ্য করা মানুষের অভ্যস্ত হইয়া যায়। এইরূপ অভ্যাসের ফলে, মানুষ আত্মমর্য্যাদা বোধ-শূন্য হইয়া পরের দাসত্ব করিতেও লজ্জার পরিবর্ত্তে শ্লাঘা বোধ করে। আমাদের সমাজে নিম্ন বর্ণের লোক ইহার দৃষ্টান্ত। বহুকাল হইতে আর্য্যজাতির অত্যাচার অপ্রতিবাদে সহ্য করিয়া করিয়া সর্ব্বপ্রকার উচ্চাধিকারে বঞ্চিত হইয়া, এখন আর আপনারা যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মত মানুষ, ইহাই বিশ্বাস করিতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে অনেক শিক্ষিত উদারচেতা ভদ্রসন্তান এখন এইরূপ বৈষম্য দূর করিয়া নিম্ন বর্ণের লোককে সমস্ত সামাজিকাধিকারের অংশ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভদ্র হিন্দু সমাজাপেক্ষা এই সকল নিম্ন বর্ণের লোকেরাই সেই মহদুদ্দেশ্যের প্রতিবাদী হইয়াছে। ইংরেজেরাও ইহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার, উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমভাবেই প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু চিরদিন নীচে থাকিয়া থাকিয়া ইহারা এমনই হইয়াছে যে, আর যেন উপরে উঠিতে ইহাদের প্রাণে সেরূপ অভিলাষই জাগে না। এইজন্য জাতিভেদাদির যত আটাপিটি কুসংস্কার, তাহা ইহাদের মধ্যেই এখন আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। বস্তুত বঙ্গ

দেশের ভদ্র হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে অনেক শিথিলতা দেখাইতেছেন। গূঢ়রূপে কাহারও প্রাণে যেন জাতিভেদাদির কড়াকড়ির প্রতি আর গাঢ় শ্রদ্ধা নাই। বরং চিরাভ্যাসই এখন সামাজিক পরিবর্ত্তনের অন্তরায় হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর মত স্ত্রীলোকেরাও নীরবে উচ্চাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া হইয়া, অত্যাচার সহ্য করিয়া করিয়া, অত্যন্ত নীচে পড়িয়া গিয়াছে। তবে এ বিষয় এত প্রাচীন ও জটিল যে, তাহার উদাহরণ দিয়া মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া বড় সহজ নয়। যাহা হউক্, অত্যাচারের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। এই প্রতিবাদ সরল সাহসের ন্যায়সঙ্গত ভাষায় এবং চরিত্র ও জীবনের দ্বারা হওয়া উচিত। চোর অপরের চুরির প্রতিবাদ করিলে ফল হয় না। নিজে সর্ব্বদা অত্যাচার করিয়া, পক্ষপাত করিয়া, মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া মিথ্যাবাদী, পক্ষপাতী, অত্যাচারীর অত্যাচারের ও স্বভাবের বিরুদ্ধে কতকগুলি চালাকীর কথা বলিলে, তাহা কেবল হাওয়ায় মিশিয়া যায়। বস্তুত পত্রিকা পত্রিকা নিষ্ফল কান্না গবর্ণমেণ্টের কাণে ঢালিয়া যে ফল ফলে, তাহা সামান্য ও অস্থায়ী। তবে রাজকীয় কার্য্যের পক্ষপাত শূন্য মতামত প্রকাশ করা এবং অবৈধ ব্যবহারের দোষ দেখান, দেশের লোকের কর্ত্তব্য। পুনশ্চ সরল সাহসের ভাষায় অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করাও তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়। এই কাজের জন্য ভূরি ভূরি ইংরেজি পত্রিকার দরকার নাই। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে দেশের সমস্ত বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোক আপন আপন মতামত প্রকাশ করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা আপনা হইতেই জানিতে ব্যগ্র হইবেন। বিশুদ্ধ ভাব রক্ষা করিয়া এই সকল বাঙ্গালা কাগজের মতামত ইংরেজিতে অনুবাদ করিবার জন্য একখানি মাত্র সুপরিচালিত, দেশের মুখপাত্র স্বরূপ ইংরেজি পত্রিকা থাকিলেই এতৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত আপত্তি খণ্ডিত হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি, সমস্ত ভারত-ব্যাপী আন্দোলন তুলিতে হইলে ইংরেজিতেই আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু ভারতের জন-সাধারণের সাধারণ ভাষা ইংরেজি নয়। মুষ্টি-পরিমেয় শিক্ষিত লোকের পক্ষেই শুধু একথা খাটিতে পারে। তবে দেশের মুখ পাত্র শিক্ষিত দলের মন উত্তেজিত হইলে, তাঁহারা নিজের নিজের প্রদেশীয় ভাষায় দেশ ব্যাপী আন্দোলন তুলিবেন। বস্তুত ইহা বেশী কার্য্যের হইতেছে না। যাহা হউক্, কর্ম্মে না হইলেও বিষয়ে সত্য থাকিলে তাহার অপলাপ করা উচিত নয়। কারণ আজ না হয়, কাল কাজে পরিণত হইবে। তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করাও উচিত নয়। কিন্তু তাহার জন্যও ঐ একখানি ইংরেজি পত্রিকাই যথেষ্ট। আর এক কথা। সমস্ত ভারতের কোন বিষয়ে হাত দিবার অপেক্ষা অগ্রে আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠন করাই দরকার হইতেছে। আমাদের জাতি বলিতে সমগ্র হিন্দু জাতি, এটা কেবল জোর জবরের একটা ভাসা ভাসা কথা। সমগ্র ভারত এক করিবার এত গুরুতর অন্তরায় রহিয়াছে যে, তাহা এক খানি বৃহৎ গ্রন্থে লিখিলেও ফুরায় কি না, সন্দেহ, এবং ভাবিলে অপার নিরাশার সাগরে ডুবিতে হয়। কখনও এই শত শত বিভিন্ন ধর্ম্ম, প্রকৃতি, সম্প্রদায়, সামাজিক অচার

ব্যবহার ও ভাষাপূর্ণ ভারত স্থায়ীরূপ দৃঢ় একতার বন্ধনে বদ্ধ হইবে কি না, নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। হইলেও তাহা অনেক দূরের কথা এবং তাহার জন্য এখন অধিক কাজ করিবারও সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী। ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচারে ইংরেজের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনের ফলে. বিদ্যাসাগর ও কেশব চন্দ্র সেনের অভ্যুদয়ে ও জীবনের অক্লান্ত চেষ্টায় বঙ্গদেশ, বঙ্গ সমাজ আজ অনেক বিষয়েই সুন্দর প্রস্তুত। এখন এই সমাজের জন্যই দিন রাত্রি খাটিবার দরকার হইয়াছে। অনেক সময়ে মানুষ নিজের চরিত্র ও জীবন গঠিত না করিয়া পরের জীবন ও চরিত্র গঠনের জন্য ভাবিয়া অস্থির হন। বস্তুত ইহার ফল প্রায়ই হাস্যজনক। গাঁয় না মানিলে নিজে নিজে পরামাণিক হইয়া লাভ কি? আপনার জীবন, চরিত্র ও হৃদয় গঠিত এবং উন্নত হইলে জন সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা এবং তাহাদের জীবন উন্নত করা অতি সহজ এবং স্বাভাবিক হয়। জাতিতে জাতিতেও এই কথা। অনুপযোগী বিস্তীর্ণ কাজে হাত না দিয়া উপযোগী অল্প কাজ হাতে নিলেই প্রকৃত পক্ষে অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। সমগ্র ভারতে এখন একটী জাতি, জাতির মত হইয়া দাঁড়াইতে পারিলে যে মহা যুগান্তর উপস্থিত হইবে, শত শত বর্ষ দেশময় ঢেঁড়রা পিটাইয়া বেড়াইলেও তাহা সম্ভবপর হইবে না।

শ্রী ... চরণ চট্টোপাধ্যায়।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয় বাবুর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত জীবনী প্রায় সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রে আলোচিত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে তাঁহার চরিত্র প্রকটন না করিয়া, অন্য এক প্রণালী অবলম্বন করিলাম। অক্ষয় বাবুকে কত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এ প্রস্তাবে তাহাই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার যে যে মূর্ত্তি আমাদের শিক্ষাদায়ক, অদ্য তাহার কিয়দংশের আভাস প্রকটিত হইল।

১। বাল্যাবস্থা হইতে, দত্ত মহাশয়ের শিক্ষানুরক্তি, অধ্যবসায় ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি শৈশব কালেই "আমি লেথ্‌বো, আমি লেথ্‌বো" এবং তাহার কিছু দিন পরে অর্থাৎ আনুমানিক ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে "সকলের মা বলে লিখ্‌তে যা, আর আমার মা বলে, লিখ্‌তে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে" এই দুই বাক্যে শিক্ষা-বিষয়ে অক্ষয় বাবুর অনুরাগ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। বাল্যকালে যাঁহার বিদ্যানুরাগ এত প্রবল, উত্তর-কালে তাহা কিরূপ প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়াছিল, অক্লেশেই অনুধাবন করিতে পারা যায়। তদীয় জীবনে অধ্যবসায় কত দূর কার্য্যকারী ছিল, বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ হইয়া যাইবার পরের অবস্থা পাঠ করিয়া দেখি-

লেই, বিলক্ষণ প্রতীতি হইতে থাকে। তখন তাঁহার স্কন্ধে পরিবার প্রতিপালনের গুরুতর ভার পড়িল। অর্থোপার্জ্জন সুতরাং তখন একান্ত প্রয়োজনীয়। ওদিকে ঐরূপ অবস্থাতেই উচ্চ গণিত, বিজ্ঞান শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যার আলোচনা চলিতে লাগিল। এরূপ উভয় সঙ্কট দশায় কয় জন মনুষ্যের —বিশেষত কয়টী বাঙ্গালীর ধৈর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে? বিদ্যাধ্যয়নে যে অধ্যবসায়ের এ-খানে সূত্রপাত, তাহা আমরণ দত্তজের সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছিল। চারুপাঠে লিখিত "অধ্যবসায়" প্রবন্ধ তিনি নিজ হৃদয়-কন্দর হইতে চেষ্টা করিয়া বহির্গত করেন নাই; কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নিয়ম বলে উৎসারিত হইয়াছিল। বুদ্ধিমত্তার অন্যান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে বাল্যাবস্থার একটী বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলেই, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট হইবে। কাঠাকালী, বিঘাকালী লিখিতে বসিয়া পৃথিবী কত বিঘাই হইবে? পৃথিবী কতই বড়? পৃথিবীর সীমা কোথায়?' ইত্যাদি বাক্য যে বালকের মনে উদিত হয়, শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলে পর, তাহার চিত্ত-প্রবৃত্তির গতি কীদৃশ অপ্রতিহত হয়, অধিক আয়াস স্বীকার করিয়া তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এবিষয়ে আরও একটী ঘটনার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। হোমর্-ইলিয়ড্ পাঠ করিয়াই, অক্ষয় বাবুর হৃদয়ঙ্গম হয়, "গ্রীক্‌জাতি পূর্ব্বে পৌত্তলিক ছিল; পরে তাহারা সেই মত মিথ্যা জানিয়া, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে। যথন গ্রীক্‌দের মধ্যে এরূপ ঘটিয়াছে, তখন বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া, হিন্দুসমাজেও তদ্রূপ ঘটিবার অসম্ভাবনা কি?'

২। তিনি এদেশের এক অকপট, অথচ নির্ভীক-সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক বীর পুরুষ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদ-বেদান্ত-বিষয়ক ভ্রম ও কুসংস্কার তাঁহারই অতুল চেষ্টা-বলে তিরোহিত হইয়াছে। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রহিত করিবার নিমিত্ত অকাতরে কত শ্রম করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে বোধগম্য হওয়া এক প্রকার দুরূহ ব্যাপার। অসবর্ণ-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহের প্রচলন-পক্ষে যে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন বা প্রগাঢ় উদ্যোগ ছিল, তাহার প্রমাণ জানিবার প্রয়োজন হইলে, তৎকৃত প্রবন্ধ গুলি একবার মাত্র অনুশীলনেই প্রতীতি জন্মিয়া যায়।

৩। স্ত্রীজাতির উন্নতি-কল্পে দত্ত মহাশয় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। এখন তো নারীকুলের অভ্যুদয় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে। উপস্থিত সময়ের প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি অবলাদের জন্য সরল প্রাণে তার-স্বরে যুক্তিগর্ভ রচনা পাঠ দ্বারা এদেশীয় পক্ষপাতী, কঠোর-হৃদয়, প্রবল পুরুষ-দলেরই নিকটে গম্ভীর ভাবে আবেদন করিতেন। বড় সুখের বিষয়, তাঁহার অধিকাংশ অভিলাষ তিনি সফল হইতে দেখিয়া গেলেন।

৪। দত্তজের চতুর্থ মূর্ত্তি অতিমাত্র শিক্ষাপ্রদ। "চিরকালই শিক্ষার কাল; সে কাল কখনই অতীত হয় নাই" এইটী তাঁহার বদ্ধমূল সংস্কার *। তিনি বিদ্যার্থী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বটে, অথচ তিনি আমাদের এক অতি প্রধান শিক্ষাদাতা। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান,

* চারুপাঠ ১ম ভাগ, সপ্তত্রিংশ সংস্করণ, ৮৪ পৃষ্ঠা।

জীবনচরিত, দর্শন, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সদৃশ শিক্ষক দুর্লভ।

৫। অক্ষয়কুমার বাবু কেবলই অধ্যাপক-রূপে বঙ্গসমাজে পরিচিত নহেন। তিনি স্বয়ং এক জন অসাধারণ বিদ্বান্। বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং ইংরাজী † এই তিন ভাষায় তাঁহার যে কিরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, ধারণা করা যায় না, বলিলেই হয়। ইহার কিছু কিছু নিদর্শন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত ভাষাত্রিতয়ে অতুল পাণ্ডিত্য ব্যতীত, জর্ম্মান্ ও পারস্য ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার ছিল। এতদ্ভিন্ন সুশিক্ষিত বলিয়া যে তাঁহার এক প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল, এ ক্ষেত্রে তাহা নির্দ্দেশ করাই অনাবশ্যক।

৬। "অদ্বিতীয় দার্শনিক"—* দত্ত মহাশয়ের এক লোক-প্রসিদ্ধ উপাধি। উদাহরণ স্থলে শুদ্ধ একটী বিবরণ প্রকটন করিতেছি। সাংখ্য দর্শনের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"† সূত্রের টিপ্পনীতে ঐ আখ্যা সুসঙ্গত ও সুপ্রমাণীকৃত করিয়াছে। যে অলৌকিক চিন্তাশক্তি দর্শনবেত্তাদের জীবনের সম্বল, তাহা তো তাঁহার একান্ত অনুগত চির সহচরের কার্য্য করিত। এত বড় মস্তিষ্ক রোগেও তাহার অণুমাত্রেরও হ্রস্বতা করিতে সমর্থ হয় নাই,—ইহা যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই আমাদের গৌরব-

† সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় বাবুর নিরতিশয় বোধাধিকারের অন্যতম প্রমাণ; সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকদের ভ্রান্তিপ্রদর্শন। অক্ষয় বাবু ওরিয়েণ্টেল্ সেমিনারীর ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বিদ্যার্থিগণের অন্যতম। তাঁহার ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতাবিষয়ে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতাংশই

"Men like Herman Geffroy and D. L. Richardson presided over the Institution (Oriental Seminary) and raised it to a position which enabled it to turn out some of the best English Scholars among our countrymen, of whom Babu Girish Chandra Ghose (Editor of Bengali) ** Babu *Akshaykumar Datta* deserve mention."—(*The life of* [illegible] *Nath Pandit;*

"Of a *philosophic* turn of mind, ac-[illegible]ate habits of thought . . . he (Akshay Kumar Datta) is an ornament to Republic of letters in Bengal."—*Hindu Patriot*, Feb. 13, 1871.

† "কপিল ঋষির এই নাস্তিকতাবাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে সাংখ্য পণ্ডিতেরা নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও জগৎ সগুণ অর্থাৎ নানাপ্রকার গুণ বিশিষ্ট, অতএব নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ সংসারের উৎপত্তি হইল? * * *

"কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জগতে কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জীবের সুখ দুঃখের এরূপ বৈষম্য ঘটিত না। অতএব ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঘটিকাযন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র, গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইত্যাদি বস্তুতে যেরূপ বুদ্ধি-কৌশল বিদ্যমান আছে, যাঁহারা এই বিশ্বযন্ত্রে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণ কৌশল-রাশি দর্শন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ বিশ্বকারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, এবং সেই সমস্ত অদ্ভুত কৌশল, অনির্ব্বচনীয়-কৌশল-সম্পন্ন নৈসর্গিক আদিম নিয়মের কার্য্য জানিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্ত্য মহিমার অতিমাত্র আধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্যপণ্ডিতদিগের উল্লিখিত আপত্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন, ঐ আপত্তি ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ বিষয়ে এক দিন উত্থাপিত হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব-নিরূপণ বিষয়ে কোন রূপেই নিয়োজিত হইতে পারে না।"—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১ম ও ২য় পৃষ্ঠার টীকা।]

জনক। তিনি চিন্তাশালী ছিলেন; সুতরাং সৎ হউক, অসৎ হউক, তাবদ্বিষয়েই তাঁহার অনুরাগ, এরূপ কঠোর দৃশ্য তাঁহার জীবনে ছিল না। সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধায়ী বুঝি আর ওরূপ কেহ নাই। তাঁহার স্মরণার্থ সভায় শোভাবাজার রাজবাটীর নাট্যমন্দিরে পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহোদয় এই কথা অতি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন। যাঁহারা তদুপলক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই স্বকর্ণে তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন।

৭। এ সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে তাঁহার সুনিভৃত হৃদয়-ভাণ্ডারে একটী মহামূল্য রত্ন সঞ্চিত ছিল। তাঁহার চরিত্রের নানাংশের উৎকৃষ্টতাই আমাদের নিকটে মহারত্ন। সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গাম্ভীর্য্য, সৎসাহস, প্রশস্ত ভাব, পরিচিত অপরিচিত সাধারণ ব্যক্তির প্রতি সদয় ব্যবহার, অধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ, জন্মভূমি ও স্বদেশীয় ভাষার উপর অনন্যসাধারণ অকপট প্রীতি ইত্যাদি ভূরি ভূরি অনুকরণ-যোগ্য কত কত সদ্‌গুণ তদীয় দেহে বিরাজমান ছিল! তাঁহার অভাবে আমরা এক ধর্ম্মবীর হারাইয়াছি। সত্যপ্রিয়তা গুণ যাহার শিরোভূষণ, সেই পুরুষ-সিংহের বিরহে দে

পড়িয়া গিয়াছে।*

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।
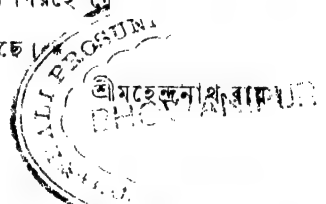
গতি রহস্য।

(বিজ্ঞানানন্দ ও ত্বরিতানন্দের কথোপকথন)

ত্বরি। ওগো বিজ্ঞানানন্দ দাদা, ওগো!

বিজ্ঞা।—(সচকিতে) অ্যাঁ!

ত্বরি।—এত ডাক্‌ছি, আর ছাই চৈতন্যই নাই? রাস্তায় যখন চল তখনও ঘুমুতে ঘুমুতে যাও নাকি? বলি কোন্ দিকে যাত্রা?

বিজ্ঞা।—বড় গোলে ফেল্লে ভাই; কোন্ দিকে যাচ্চি, এটা বলা বড় সোজা কথা নয়। হয় ত কোন দিকেই যাচ্চি না; আর নয় ত যে দিকে যাচ্চি ব'লে তুমি আমি স্থির কর্‌বো, আমার গতি হয় ত ঠিক তাহার বিপরীত দিকে। এমনতর সন্দেহ যুক্ত স্থলে কি উত্তর দিব ভাই?

ত্বরি।—দেখি দাদা চোখ দুটো? তাইত, ক্ষেপনিত? সোজা হেঁটে যাচ্চ, আর কোন্ দিকে যাচ্চ তা বল্‌তে পার্‌লে না?

বিজ্ঞা। ভাই স্থির হয়ে শোনো; তুমি পৃথিবীর গতি স্বীকার কর কি না? অর্থাৎ পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে, এটা মান কি না?

ত্বরি। অবশ্য মানি; বলি তার সঙ্গে একথার সম্বন্ধ কি?

বিজ্ঞা। আছে; মনে কর যে, তুমি ও আমি এখন পশ্চিম দিকে ১০০ হাত অগ্রসর হ'লেম। কিন্তু আমরা যতক্ষণে ১০০ হাত অগ্রসর হয়েছি, ততক্ষণে পৃথিবী যে কত হাজার মাইল পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছেন, তার হিসাব কর্‌তে পার? সেই হাজার হাজার মাইল থেকে আমাদের ১০০ হাত বাদ দিলে, বরং স্থির হবে যে, আমরা উল্টা পূর্ব্বদিকেই চলিতেছি।

* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত উদ্ধৃত চিহ্নযুক্ত অংশ দৃষ্ট হইবে, তৎসমুদয় মৎ-প্রণীত "অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত" হইতে গৃহীত। যাঁহারা বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মূল গ্রন্থ পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হইবেন।

ত্বরি। বিদ্যা বুঝেছি। বলি দাদা, সকালে বিকালে অবকাশ মত একটু আধ্‌টু মধ্যম নারায়ণ তৈল ব্যবহারে তোমার আপত্তি কি ?

বি। যা বল্‌তে হয়, বল; কিন্তু গতি বড় শক্ত কথা। খাঁটী নিরপেক্ষ গতি (absolute motion) কিম্বা নিরপেক্ষ বিশ্রাম (absolute rest) বলিয়া কিছু বুঝা যায় না। আমাদের যে গতি বা বিশ্রাম, সেটা কেবল পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থের সহিত তুলনায় স্থির হয়। মনে কর যে, তুমি আর আমি গাড়িতে যাচ্চি। এখন আমরা দুজনেই যে, খুব অগ্রসর হচ্চি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি ও আমি যদি স্থির হয়ে বসে থাকি, তাহা হলে, তোমার তুলনায় আমি ঠিক তোমার পার্শ্বেই স্থির আছি, কিন্তু বাহিরের স্থানের সহিত তুলনায় হয় ত খুব এগিয়ে গিয়েছি।

ত্ব। ও দাদা, তুমি কেমন একটা এলো মেলো কথা বল্লে, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

বি। আচ্ছা, আর একটা দৃষ্টান্ত দি। মনে কর যে, তুমি যেন একখানা ১০০ হাত দীর্ঘ নৌকায় উঠে গঙ্গার কোথাও যাচ্চ। তুমি নৌকা খানার আগা গলুয়ের ঠিক মাথায় একজন মাঝির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছ। আর জলের মধ্যে ঠিক সেই খানটায় একখান কাঠ পোঁতা আছে। নৌকা খানা যেন মিনিটে ১০ হাত অগ্রসর হচ্চে; আর তুমিও সেই সময়ে, নৌকার গতির বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পিছু গলুয়ের দিকে ঠিক মিনিটে ১০ হাত কো'রে এগিয়ে পড়্‌ছ। তুমি এরূপ অবস্থায় প্রতি মিনিটে দশহাত কো'রে সেই মাঝিকে ছাড়িয়ে যাচ্চ বটে, কিন্তু জলের মধ্যে যে কাঠটা পোঁতা ছিল, তুমি ঠিক তার পার্শ্বেই আছ।

ত্ব। দাঁড়াও দাদা, একটু ভেবে নি।

বি। এর আর ভাবনা চিন্তা কি ? যখন নৌকা খানাও মিনিটে দশ হাত অগ্রসর হচ্চে; আর তুমিও সেই সময় বিপরীত দিকে ১০ হাত সরে সরে যাচ্চ, তখন সেই কাঠটা, তোমার পিছু গলুয়ে পোঁছান পর্য্যন্ত বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।

ত্ব। ঠিক দাদা, ঠিক বলেচ।

বি। এখন দেখ! ঐ কাঠ্‌টা অবশ্য মাটিতে স্থির হয়ে আছে; তুমিও দশ মিনিট কাল হাতই নাড় আর পাই নাড়, ঐ কাঠটার পার্শ্বেই আছ; তখন তুমি কাঠের নিকটে স্থির আছ বল্‌তে হবে! অর্থাৎ কাঠের সঙ্গে তুলনায় তুমি বিল্‌কুল নড় নাই। আবার দেখি যে, সেই আগা গলুয়ের মাঝিটার সঙ্গে তুলনায় তুমি ১০ মিনিটে ১০০ হাত অগ্রসর হয়েছ। সেই জন্যই বল্‌ছিলাম যে, গতিটা পরসাপেক্ষ (Relative)।

ত্ব। তুমি বেশ কথা প্রমাণ কল্লে ভাই যে, আমি এগিয়েছি অথচ এগুই নাই। তোমার উকীল হওয়া ভাল ছিল; খুব মোকদ্দমা ডিক্রী কর্ত্তে পার্ত্তে।

বি। সে কথা যাক্, তুমি আমার কথা বুঝ্‌লে কি না ?

ত্ব। বুঝিলাম; কিন্তু এযুক্তি তোমার নিঃঝক মাটীর উপর দিয়া চল্‌বার বেলায় খাটিবে কেন ?

বি। কেন ? তোমাকে তো সেই জন্যই পৃথিবীর গতির কথা পূর্ব্বে বলেছি ?

পৃথিবীর গতির সহিত তুলনায়, আমাদের গতি এক রকম নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু সূর্য্যের সঙ্গে তুলনায় আবার গোলমাল হইয়া যায়। কারণ পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিদিকে একটা নির্দ্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে যাচ্চেন; সূর্য্য আবার তেমনি তাঁর পরিবারস্থ গ্রহাদি লয়ে আর এক কেন্দ্র অবলম্বন কো'রে আর এক দিকে ঘুর্‌তেছেন। এম্‌নি যত বাড়াবে অনন্ত জগতে একথা ততই বেড়ে যাবে। সূর্য্য পৃথিবীর তুলনায় স্থির কিন্তু বৃহত্তর সূর্য্যের তুলনায় গতিশীল। এইরূপে হিসাব করে দেখ যে, ছোট বালুকণা থেকে অতি বড় সূর্য্য পর্য্যন্ত সকলেরই গতি পর-সাপেক্ষ (relative)। সকলেই চলিতেছে, অথচ চলিতেছে না। এখন ভেবে দেখ যে, আমাদের গতিটা কেমন রকম ব্যাপার।

হরি। আমাদের গতির, তাহলে অতি দুর্গতিই বল্‌তে হবে। আমাদের পাদুখানি যে নড়্‌ছে তবুও স্থির হোলো না যে, আমরা চলিতেছি কি না? হা মীমাংসা! দাদা তুমি একটা স্কুল খুলে এসকল কথা লোক জনকে শেখাও। কিন্তু আমার ছেলেকে সে স্কুলে কিছুতেই দিব না। (উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বসন্ত।

অনন্ত শূন্য আঁধারে ডুবিয়া আছে; সমস্ত নিস্তব্ধ, নীরব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গভীর নিদ্রামগ্ন;—নিশ্চল, নির্জ্জীব; কিন্তু বিকাশোন্মুখ, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, পূর্ণকলেবর;—যেন ফুট ফুট হইয়াছে, অথচ ফুটিতেছে না। শুভক্ষণে বসন্তের নিশ্বাস বহিল; সেই শীতল, স্নিগ্ধ নিশ্বাসস্পর্শে নিদ্রিত জগতের বিশাল দেহে সর্ব্বাঙ্গীন রোমাঞ্চ হইল; নিমেষে অনন্ত আকাশের স্তরে স্তরে অসংখ্য হসিতচ্ছবি, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠিল। তটিনী ছুটিল, বাতাস বহিল, প্রকৃতির সবুজ অঙ্গে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল; ফুল ফুটিল, জ্যোৎস্না হাসিল, বিহগিনী কলকণ্ঠে তান পূরিল,—বসন্তের মৃতসঞ্জীবন বাত্যাস্পর্শে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নবজীবন লাভ করিল! বসন্তের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফুটন,—বসন্তের নিশ্বাস-স্পর্শে—জড় পরমাণু সমষ্টিতে প্রাণের সঞ্চার, সেই জন্য বসন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ; বসন্তের তিরোভাবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়। মর্ত্ত্যে বসন্তের লীলা আছে, কিন্তু বসন্ত অপার্থিব; যেমন পৃথিবী জ্যোৎস্নার ক্রীড়াভূমি হইলেও জ্যোৎস্না পার্থিব পদার্থ বিশেষ নহে;—চন্দ্রের জ্যোতি মাত্র, তেমনই বসন্তও অপার্থিব,—পৃথিবী তাহার লীলাস্থলী মাত্র। যে দেশের ফুলগুলি চির-অম্লান—ফুটে কিন্তু ঝরে না; যে দেশের চাঁদ চির-স্বপ্রকাশ—উঠে কিন্তু মরে না, শুধু অন্তহীন সুখ খেলিয়া বেড়ায়, বসন্ত সেই জ্যোতির্ম্ময় দেশের অধিবাসী; মর্ত্ত্যলোকে সেই স্বর্গীয় সুখের আভাস মাত্র। সেই জন্য বসন্ত সুখ—দিব্যসুখের উৎস। বসন্তের আর এক নাম প্রেম। স্বর্গ মর্ত্ত্য যে অচ্ছেদ্য প্রেমডোরে বাঁধা, মর্ত্ত্যে বসন্ত সেই প্রেমের স্ফূর্ত্তি, কোকিলের স্বর সেই প্রেমের পঞ্চম, শিশির সেই প্রেমের অশ্রু; মলয়ানিল সেই প্রেমের স্নিগ্ধ শ্বাস, নৈশ-গগনে দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুর্য্য সেই

প্রেমের জীবন্ত মর্ত্ত্যলীলা। নিশীথে শুভ্র-বসনা কৌমুদীর বিমল উৎসঙ্গে ঘুমন্ত জগৎ, আর সুপ্ত জগতের শ্যাম বক্ষে ঘুমন্ত কৌমুদী!—এমন অভিন্ন ভাব, এমন নেশা, এমন মদবিভোর, পবিত্র, স্বর্গীয় প্রেম কে কোথায় দেখিয়াছ? এ প্রেম বাসন্তী প্রেমের ছায়া মাত্র। রাধিকা সে প্রেমের মূর্ত্তিমতি প্রতিকৃতি, গোকুলে সে প্রেমের পূর্ণলীলা, বৃন্দাবন সে প্রেমের কেলিকুঞ্জ। বিরহে সেই প্রেম সম্যক্ স্ফুটিত, সেই জন্য বসন্তে বিরহ। সে প্রেম অপরাহ্নের ছায়ার ন্যায়;—বিশ্বব্যাপী। সার্ব্বভৌমিকতা প্রেমের প্রাণ। সেই জন্য বসন্ত গৃহত্যাগী উদাসীন। বসন্ত যোগী,—যোগে আর প্রেমে সুর বাঁধা। প্রকৃতির নিভৃত অন্তঃপুরে মনোজ্ঞ তপোবন সাজাইয়া সমাধিমগ্ন বসন্ত যোগানন্দরস উপভোগ করে।

প্রেমে নবীনত্ব আছে, সেই জন্য বসন্ত নবীন,—পুরাতন, অথচ চির নবীন; বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া আসে, তবু নবীন। প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য, যুবতীর বিলাস ভঙ্গি, কিশোরের চিত্তচাঞ্চল্য,—বসন্তে এ সকলই আছে, অথচ বসন্ত চির যুবক; যৌবনে বসন্তের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। প্রেম সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, তাই যৌবন বড় সুন্দর। বসন্তে সেই সৌন্দর্য্যের চরম বিকাশ, কোকিল কণ্ঠে সে বিকাশ স্বর-রূপে নির্গত। ফুল সে সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র হৃদয়টী ভরিয়া পূরিয়া রাখে, সেই জন্য ফুল সুন্দর। সৌন্দর্য্যে কোমলতা আছে, কোমলতায় স্নিগ্ধতা আছে,—তাই ফুলশয্যা এত মধুর, এত সুস্নিগ্ধ, সুকোমল, সুন্দর! বসন্ত সঙ্গীতের সমষ্টি। সুকণ্ঠের কলকণ্ঠ সে সঙ্গীতের অব্যক্ত প্রতিধ্বনি মাত্র। তটিনী উর্ম্মিবক্ষে যে অস্ফুট কলস্বনে বহিয়া যায়, পবন যে সুললিত গাথা গাইয়া বনে বনে বিচরণ করে, কুসুম যে মধুর, নীরব সংগীতে—কুঞ্জকানন প্লাবিত করে, বসন্ত সে সঙ্গীতের পূর্ব্বধ্বনি। প্রতিধ্বনি পূর্ব্বধ্বনির পরিচায়ক,—যেখানে সঙ্গীত, সেখানে প্রেম। বাসন্তী সঙ্গীত, বাসন্তী প্রেমের রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। সেই প্রাণকাড়া সংগীতে প্রাণীর প্রাণিত্ব বিলোপ হয়, বিশ্বচরাচর আত্মহারা হইয়া—নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া—সেই এক ভুবন-ভুলান, মোহন, জীবন্ত সংগীতে লয় প্রাপ্ত হয়। কবি সেই আত্মবিলোপ হৃদয়ঙ্গম করেন, তাই বলিয়াছেন;—

> "O cuckoo! shall I call thee bird,
> Or but a wandering voice?"
> "Even yet thou art to me
> No bird: but an invisible thing,
> A voice, a mystery."

প্রেম, সৌন্দর্য্য, সংগীত, নবীনত্ব, আর প্রাণ—এ সকলই কাব্যের উপাদান, সেই জন্য বসন্ত কাব্য। শুধু কাব্য নহে, একটা আদ্যন্ত রহিত মহাকাব্য। এ মহাকাব্যের নিকট মানুষের মহাকাব্য তুচ্ছ, তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। যে অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সংগীত লইয়া বসন্ত, পৃথিবীর বড় বড় মণীষীগণ সেই প্রেম, সেই সৌন্দর্য্য, সেই সংগীতের এক টুকু আভাস মাত্র পাইয়া এক একটী অমর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী হইতে বসন্ত উঠাইয়া লও, পৃথিবী প্রেমশূন্য, সৌন্দর্য্য শূন্য, সংগীতশূন্য, কবিতাশূন্য, প্রাণশূন্য হইবে। বিষম মায়া—বড় দুর্ভেদ্য সমস্যা। এই সমস্যা,—এই স্বপ্নময় কুহেলিকা, এই কুহেলিকাময় স্বপ্নের সম্যক্ রহস্যোদ্ঘাটনের নামই জীবন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

অনন্ত প্রেম।

অমিয়ার ধারা সম এ মর মরত ধামে,
তুইলো পিরীতি ;
ললিত লাবণ্য তব নিতি নিতি নব নব,
বিকাশে মূরতি।
কোমল কমল কলি, আজি যে পড়িবে ঢলি,
তপন কিরণে,
তপনের পানে চেয়ে, হেসে হেসে খুন হয়ে,
বান্ধয়ে বন্ধনে।
অই যে আকাশে তারা, যেন হিরকের ছড়া,
স্বভাবের গলে ;
চাঁদের ওচাঁদ মুখে, তাকিয়ে মনের সুখে,
নাচিছে সকলে।
প্রশান্ত গম্ভীর নীর, সীমাহীন জলধির,
থাকে অচঞ্চল,
সমীর সখির সনে, মিলিলে প্রফুল্ল মনে,
করি কল কল,
পাহাড়-তরঙ্গ তুলি, হৃদয় ভাণ্ডার খুলি,
করে সম্ভাষণ।
বিটপির উচ্চ শিরে, বাহিয়া উঠিছে ধীরে,
লতা হীন জন।
এঝোঁপে ডাকিছে পাখি, শরীরে পুলক মাখি
সুতান সুস্বরে।
অন্য কুঞ্জে তদুত্তরে, সঙ্গীত লহরী করে,
বিমুগ্ধ অন্তরে।
কোমল মল্লিকা বধূ, পিয়ায় বুকের মধু,
ভ্রমর পবনে।
প্রকৃতি সৌন্দর্য্যরাশি, ঢেলে দেয় হাসি হাসি
পুরুষ চরণে।
হায় এ সুন্দর ছবি বিরচিল কোন্ কবি
প্রকৃতির মাঝে!

যে দিকে যখন চাই নিরখি সকল ঠাঁই
প্রেম মূর্ত্তি রাজে।
যুবক যুবতী যারা প্রেম বলি হয় সারা,
না জানে কি তাহা।
চেয়ে দেখ সত্যপ্রীতি, স্বভাবে বিহরে নিতি
কি সুন্দর আহা!
আপনারে ভুলি যায় পরলাগি সমুদয়
করি বিসর্জ্জন।
পৃথিবীর ভালবাসা শুধু নিজ সুখ আশা
প্রেম কি কখন ?
প্রণয়ী আপন প্রাণ অবহেলে করে দান
বিনা বিনিময়।
পারে কি ধরম ধন হরিতে প্রণয়ী জন
হইয়ে নির্দ্দয়।
দূরে যারে ওরে পাপ দিসনারে অভিশাপ,
প্রণয়ের নামে।
স্বর্গের বাঞ্ছিত ধন কর প্রেম! আগমন
এমরত ধামে।
বান্ধা যার আকর্ষণে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহসনে
চেতন অচেতন।
সর্ব্বত্র গাইছে গীতি অনন্ত অক্ষয় প্রীতি
বিশ্ব বিমোহন।
হায় কবে ক্ষুদ্র নরে মোহপাশ ছিন্ন ক'রে
হেন প্রেম লাগি,
গাইবে প্রেমের গীতি, মাতাবে ত্রিদিব ক্ষিতি
হয়ে সর্ব্বত্যাগী।
জীবন-নিয়ন্তা সনে আনন্দ বিহ্বল মনে
অক্ষয় বন্ধনে,
মাতিবে অনন্ত কাল ভাঙ্গিবে কুহকজাল
অনন্ত জীবনে।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

দুঃখ-পরাজয়ের উপায়

দুঃখ-পরাজয়ের উপায় অতি অল্পাক্ষরেই প্রকাশ করা যায়। এমন কি, একটী মাত্র কথা দ্বারাই তাহা ব্যক্ত করা যায়। সেই কথাটীর নাম ধর্ম্ম। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যই ধর্ম্ম পথে চলিতেছে না, তাই দুঃখের পরাজয়ও দুন্দুভি নিনাদে ঘোষণা করা যাইতে পারিতেছে না। একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন ;—"করো না কো অপকার, কর উপকার ; এই ধর্ম্ম, এই কর্ম্ম সংসারের সার।" একথার সারবত্তা কোন মনুষ্যই অস্বীকার করিবে না। তবে কেন কেবল অল্প সংখ্যক মনুষ্যই ধর্ম্মপথে চলে? তত্ত্বজ্ঞানী ইহার উত্তরে বলিবেন যে, অধিকাংশ মনুষ্যই মায়া-মোহিত, তাই তাহারা হিতাহিত বুঝে না। ধর্ম্ম যে শ্রেয়স্কর, একথা বুঝে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহারা তাহা ভুলিয়া যায়। অবশ্য ভ্রম ও অজ্ঞানতা দ্বারাও অনেক অনিষ্ট ঘটে। কিন্তু অনেক স্থলে আত্মহিত সাধনের উপায় অবগত থাকা সত্ত্বেও লোকে তাহা কার্য্যকালে ভুলিয়া যায়। একজনের পীড়া হইল, কিন্তু চিকিৎসক তাহার সমস্ত কারণ বুঝিয়াও একটী বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া অন্য কারণ অনুমান করত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। পীড়ার উপশম হইল না। এস্থলে ভ্রমই দুঃখপরাজয়ের অন্তরায় হইল বটে। অনেক স্থলে অজ্ঞানতাও উহা ঘটাইতে দেয় না ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও যে লোকে অনেক প্রকার অধর্ম্মাচরণ করে, ইহাই আশ্চর্য্য। সে রোগের আর ঔষধ নাই।

মনুষ্য মায়া-মোহিতই বটে। নচেৎ বৃদ্ধ শুক্রাচার্য্য মাথার দিব্য দিয়া যে মদ্যপান করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আবার অনেক লোক মত্ত হইয়া পড়িবে কেন? শুক্রাচার্য্যের কথা ত দূরের, অনেক মাতালের সাক্ষাতেই কত মাতাল মদ্যপান দোষে প্রাণ হারাইল, তথাপিও তাহাদের চৈতন্য হইল না।

গুণী ব্যক্তি যে এজগতে দারিদ্র্যাদি নিবন্ধন কষ্ট পায়, তাহার জন্য দোষী কে? অবশ্য জগতের আর আর গুণজ্ঞ লোক। এই দোষ চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। কেবল যে গোল্ডস্মিতই এজন্য দুঃখ পাইয়াছেন, তাহা নহে। জগতে চিরকালই এই দশা ঘটিয়া আসিতেছে। মানুষ মহামোহেই মোহিত বটে। যে ব্যক্তি অন্যের গুণ বুঝিয়া স্বীকার না করে, সে দোষী! যে ব্যক্তি কোন জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহা উপযুক্ত স্থলে অস্বীকার করে, সে অত্যন্ত অপরাধী। কোন সারগর্ভ পুস্তকের সারগর্ভতা জানিয়াও যে সম্পাদক তৎসম্বন্ধে নিজের যথার্থ মত প্রকাশ না করেন, তিনি কদাপি ধার্ম্মিক শব্দের বাচ্য নহেন। গুণীর দারিদ্র্যের প্রধান কারণ,—দেশীয় লোকের মূর্খতা বটে, কিন্তু সংবাদ পত্রাদির সম্পাদকগণের অবহেলাও একটী প্রবল কারণ।

দস্যু তস্করাদি চিরকালই অপরাধ করিতেছে এবং চিরকালই শাস্তিভোগ করিতেছে ; তথাপি তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। চিরকালই জ্ঞানীগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, দুষ্কর্ম্ম করিও না, কিন্তু চিরকালই জগতে দুষ্কর্ম্ম চলিতেছে। ইহার

কারণ কি? মহামোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোহই সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে এবং পাপকে প্রশ্রয় দেয়। পাপ হইতেই দুঃখ উদ্ভূত।

জগতে সত্যপরায়ণ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। এক সম্প্রদায় হইতে এক খান উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইল, অন্য সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া তাহার উৎকর্ষই স্বীকার করিল না। সত্যের অনুরোধে আপনার শত্রুরও যিনি প্রকৃত গুণ স্বীকার করেন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। আহা! অজ্ঞান লোক কত নূতন সত্য-প্রচারককে বঞ্চিত করিয়া জগৎকে কলঙ্কিত করিয়াছে! ইতিহাসবেত্তা অনেক স্থলে শত্রুর প্রকৃত গুণ অপ্রকাশিত রাখিয়া ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে! এই জন্য, অনেক জ্ঞানী, ইতিহাসের অনেক কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক হন। সত্যের নানা শত্রু! কেহ অর্থলোভে, কেহ স্বদেশের মিথ্যা-গৌরব লোভে, কেহ প্রিয় পাপীর পার্থিব দণ্ড পরিহারার্থে, কেহ যশলাভের লোভে, কেহ দুষ্কর্ম্ম গোপন করিবার আশায়, কেহ পাপী হইয়াও সাধুনাম লাভের লোভে, কেহ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভাশায় সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকে। এই প্রকারে নানা প্রকারের লোক দ্বারা নানা প্রকার সত্যের অপলাপ ঘটে। কবি কথনও কল্পনা বৃত্তির এত দূর বশীভূত হইয়া পড়েন যে, অনৈসর্গিক বিষয়কেও প্রকৃত সত্য বলিয়া পরিচয় দেন। মহাপুরুষ-ভক্তগণ সময়ে সময়ে এতদূর অন্ধভক্তি প্রদর্শন করেন যে, সময়ে সময়ে মানুষের উপর ঐশ্বরিক ক্ষমতা-আরোপ করেন। কখন কখন প্রিয়-ব্যক্তিকে এপ্রকার গুণেও গুণী করা হয় যে, সে গুণ তাহাতে একেবারেই নাই। আবার জনসাধারণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াও সত্য দূষিত হয়। আবার আমোদ প্রমোদের অনুরোধেও সত্যকে অবহেলা করা হয়। আরো নানা কারণে লোকে সত্যের অপমান করে। কিন্তু এটী প্রকৃত কথা যে, সত্য-সেবা দ্বারা সত্যসুখ লাভ হয় এবং মিথ্যার সেবা বিপদের দ্বার মুক্ত করে। অসার কল্পনার সেবা দ্বারা অসার কল্পিত সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জ্ঞানীগণ দুঃখ-পরাজয়ের নানা উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু লোকে যে তাঁহাদের সাহায্য চায় না, ইহার কি করা যায়? রাজা, সমুদয় প্রজাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন, দুষ্টদমন ও শিষ্টের পালনের উপায় করিবেন; দুর্ব্বলের বল ও অনাথের নাথ হইবেন; সর্ব্বদা ন্যায় সঙ্গত বিচার করিবেন। সংক্ষেপত ধর্ম্মভীরু হইবেন। কয় জন রাজা এ উপদেশ পালন করিরা থাকেন? পৃথিবীর অধিবাসী সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প লোকেই তাহা করিয়া থাকে। নীতি অতি অন্তরভেদী রোদন করিতেছেন, কিন্তু অতি অল্প লোকই তাঁহার ক্রন্দন শ্রবণে ব্যথিত হইতেছে। অনেক পৌত্তলিক বলিতেছেন, হরিণামে মহাপাপীর পাপ মুক্ত হয়। মহাপাপীও হরিণাম গ্রহণ করিলে ভক্তির পাত্র হয়। কতক কতক ব্রাহ্মও ঐ ধুয়া ধরিয়া বলিতেছেন "পাপী সন্তানে অধিক দয়া।" খ্রীষ্টান ধর্ম্মোপদেষ্টাও বলিতেছেন "যিশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহা হইলেই মুক্তিলাভ হইবে।" অনেক দুর্নীতিপরায়ণ খ্রীষ্টান বিশ্বাস করিতেছে, "আমাদের মুক্তি হইবে, যে হেতুক আমরা যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন

করিয়াছি। "সংসারী বলিতেছেন, ধর্ম্মপথে থাকিলে সংসার চলে না।" রাজা পলিসি শব্দ দ্বারা অনেক দুর্নীতি ঢাকিতেছেন। উকীল মোক্তারগণ শত শত বার মিথ্যা কথা কহিতে লোভাক্রান্ত হইতেছেন। এই রূপে সকলেই পাপের পথে হাটিবার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। তবে আর নীতি অন্তরভেদী স্বরে রোদন না করিয়া কি করেন! প্রায় সকলেই তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতেছেন, তিনি আর কি করেন? জগতের কি শোচনীয় দিন উপস্থিত!

বোধ করি এস্থলে একটী কথা বলা অনুচিত হইবে না। উকীল ও মোক্তারের ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া আইন প্রভৃতি যাহাতে বালকের পক্ষেও সুবোধ্য হয়, এ প্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই ব্যবসায়ে মিথ্যারই লীলা। তবে যে সকল ব্যক্তি ঐ দুই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদিগের জন্য অন্য প্রকার জীবিকা বিধান করিয়া দেওয়াও নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আবার ধর্ম্মকে অর্থাৎ উপাসনা সম্বন্ধীয় মতকে জীবনের আবশ্যকীয় কর্ম্মের সীমা হইতে অনেক দূরে লইয়া যাওয়াতেও নীতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম মতকে যতই সাংসারিক কার্য্য মধ্যে প্রযুক্ত করা হইবে, ততই নীতির বল বর্দ্ধিত হইবে, ততই সংসারের মঙ্গল হইবে। নীতির আদেশ পালন ভিন্ন দুঃখ-পরাজয়ের আর উপায় নাই। নীতিই ধর্ম্ম—ধর্ম্মই নীতি। নীতি ও ধর্ম্মকে জীবনগত করিতে না পারিলে কিছুতেই মানুষ পাপ বা দুঃখকে পরাজয় করিতে পারিবে না। শ্রীকিশোরী লাল রায়।

পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। নানা প্রবন্ধ—শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল কর্ত্তৃক রচিত। রাজকৃষ্ণ বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। যে গ্রন্থ রাজকৃষ্ণ বাবুর গভীর পাণ্ডিত্য এবং সুতীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতার পরিচয় স্থল, তাহাকে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ক্ষুদ্র কাঠ-গড়ায় পূরিয়া প্রচলিত ধরণে বাহবা দিয়া বিদায় দিতে লজ্জা হয়। যখন বিদ্যাপতি, শ্রীহর্ষ এবং ঐতিহাসিক ভ্রম প্রবন্ধে প্রত্নবিদের তীক্ষ্ণানুসন্ধান; চার্ব্বাক্ দর্শন, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও কোমৎ দর্শন প্রভৃতিতে অশেষ শাস্ত্রাধ্যায়ন স্ফুরিত হইতেছে, তখন রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থকে প্রশংসনীয় ও সুপাঠ্য বলিলে কিছু নূতন কথা বলা হয় না। যদি দেখি, এ বঙ্গ দেশে এ পুস্তকের আদর হয়, তবে বুঝিব, বাঙ্গালী মানুষ হইতেছে, সৎ শিক্ষা কি, তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে।

রাজকৃষ্ণ বাবুর কোন কোন প্রবন্ধে কচিৎ কচিৎ একটু আধটু ত্রুটী লক্ষিত হয়; সেগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মন্দ নহে। (১) তিনি কোম্‌ৎ দর্শনের যদি শুদ্ধ ব্যাখ্যা দিতেন, তাহা হইলে কোন কথা বলিতাম না; কিন্তু তিনি যখন সমালোচনা করিতেও ত্রুটী করেন নাই, তখন সে সম্বন্ধে একটা কথা বলি। কোঁথ্ বিজ্ঞান শাস্ত্রকে যেরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞান প্রণালীর দোষ রাজকৃষ্ণ বাবু কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু মূলত আরও গুরুতর দোষ আছে। তাঁহার বিজ্ঞানের উৎপত্তি পর্য্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ত-

নহেই, অধিকন্তু এই রূপ উৎপত্তি পর্য্যায় আদৌ স্বীকার করা যায় না। ঠিক একটার পর একটা, এমন করিয়া কোন বিজ্ঞানেরই দৃষ্টি হয় নাই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত প্রায় এরূপ সম্বন্ধ যে, অনেক গুলির অভ্যুদয় সমসাময়িক; এবং পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ। এমন হইতে পারে যে,যখন এক বিজ্ঞানের সত্য কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে (Qualitatively) বুঝা যাইতেছিল; তখন আর একটী বিজ্ঞানের সত্য, উজ্জ্বল ও নির্দ্দিষ্ট ভাবে (Quantitatively) প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। তাহা বলিয়াই একটী আর একটীর উৎপাদক স্বীকার করা যায় না। এ সম্বন্ধে (Herbert Spencer), এর যে তিনটী প্রবন্ধ আছে, তাহার সহিত মিলাইয়া লইলে রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ আরও সুন্দর হইত। (২) ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবু কেবল অনুকৃতিবাদ অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু এ মতটী প্রাচীন। যে সময়ে বঙ্গদর্শনে ঐ প্রবন্ধ লেখা হয়, তখন ঐটীই প্রবল ছিল। কিন্তু অধুনা Sayce প্রভৃতি উহাকে অসম্পূর্ণ বুঝাইয়াছেন; এবং তদতিরিক্ত সমাজ সম্মিলনে ভাষার উৎপত্তির আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে কথাটার উল্লেখ করিতে গেলে একটা প্রবন্ধ হয়। যাহা হউক, এই গ্রন্থ পুনঃমুদ্রাঙ্কনের সময় রাজকৃষ্ণ বাবু Sayce দৃষ্টে প্রবন্ধকে আরও উজ্জ্বল করিতে পারিবেন।

উপসংহারে বলি যে, রাজকৃষ্ণ বাবুর 'নানা প্রবন্ধ' বঙ্গ সাহিত্যের এক বিশেষ গৌরবের পদার্থ। এরূপ গ্রন্থ যে দেশে প্রকাশিত হয়, সে দেশও ধন্য, আর যে ভাষাতে প্রকাশিত হয়, সে ভাষাও ধন্য। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, এরূপ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের নাকি এ দেশে আদর হয় না। আমাদের লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই।

২। **বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা**—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। আমরা এই গ্রন্থখানা আদ্যোপান্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এইগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যদিচ কোন কোন বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের ঐক্য না থাকুক, তথাপি আমরা তাঁহার যুক্তি ও গবেষণার প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। এই পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহের বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে, গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষতার সহিত সেই সকল খণ্ডন করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহের বিরোধী পক্ষদিগকে আমরা এই পুস্তক খানা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৩। **প্রসাদ প্রসঙ্গ**।—৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত; চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এপুস্তক সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই, কারণ এ পুস্তক খানি বঙ্গ সমাজে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছে। এরূপ হৃদয়গ্রাহী, ভক্তি-রস পূর্ণ গ্রন্থের বহুল প্রকাশ ভিন্ন সমাজের উন্নতি অসম্ভব। এই সংস্করণে অনেকগুলি নূতন সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৪। **যোগ-সাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর**।—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত। এরূপ কুসংস্কার-পূর্ণ মত সকল অবাধে দেশে প্রচারিত হইতে দেখিলে, সকলের প্রাণেই ক্ষোভের

উদয় হয়। আমাদের ইচ্ছা ছিল, পুস্তক খানিকে বিশেষ রূপ সমালোচনা করিব, কিন্তু নানা কারণে তাহা হইতে বিরত হইলাম। "যোগ শিক্ষা করিতে হইলে এইরূপ কোন সিদ্ধ যোগীর নিকটই দীক্ষা লাভ করা উচিত। নতুবা যার তার কাছে দীক্ষিত হওয়া যৎপরোনাস্তি অকর্ত্তব্য। * * যাঁহার শক্তি অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে, তিনিই অনন্ত প্রস্রবণ লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও যোগ-দীক্ষা দিবার অধিকার নাই।" বিজয় বাবু এই কথা বলিতেছেন, এবং নিজে দীক্ষা দিতেছেন, সুতরাং তিনি যে একজন সিদ্ধ ব্যক্তি, প্রকারান্তরে ইহাই প্রচার করিতেছেন। ইহাপেক্ষা আধ্যাত্মিক অহঙ্কার এবং আত্মাভিমানের কথা আর কি হইতে পারে, আমরা বুঝি না। কিন্তু সে কথা থাকুক। "পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে"—এ কথার অর্থ কি? সকল শক্তির মূলেই ত ভগবান বিদ্যমান;—তাঁহাতে যুক্ত নয়, এমন শক্তির কি কল্পনাও করা যায়? "অনন্ত প্রস্রবন লাভ করিয়াছেন"—ইহারই বা অর্থ কি?—অনন্তকে পূর্ণ রূপে সসীম মানুষ কখনই কি লাভ করিতে পারে? সিদ্ধাবস্থারই বা অর্থ কি? ভগবানের স্বরূপ, জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি সকলই অনন্ত। সাধকের এমন দিন কি কখনও হইতে পারে যে, ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে? যত অগ্রসর হইবে, ততই অভাববোধ বাড়িবে। সাধনের আরম্ভ আছে, শেষ নাই। পাইতে আরম্ভ করিয়া, পাইয়া পাইয়া যাহা শেষ করা যায় না—তাহাই ত অনন্ত। ঈশ্বরকে একটা সঙ্কীর্ণ কিছু মনে করিয়া লইলে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি মানুষের পক্ষে সম্ভব, নচেৎ নয়। আমরা এই পুস্তক খানি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া ইহাই বুঝিলাম, বিজয় বাবুর ধর্ম্ম মত সকল নিতান্ত অপরিষ্কার, এবং পরস্পর-বিরোধী। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উন্নত মত সকল তিনি জীবনগত করিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি। তিনি এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বিশ্বাসচঞ্চলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্ম অতি সরল, অতি সোজা। বাহাদুরী করিতে গেলেই গোল। সরল ভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া গেলেই যথেষ্ট; বৃথা হই-চই করিয়া ছাই-ভস্ম একটা খাড়া করিতে চেষ্টা করিলে তাহা টিকিবে কেন? আমাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহার এ প্রবর্ত্তিত যোগ প্রণালী প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট কখনই আদর পাইবে না।

৫। জয়নগর পাঠালয়ের সপ্তম সাম্বৎসরিক বিবরণ।—এই পুস্তকালয়ে মোট ১১৯৩ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত মোট ১৫৫৩ লোক এই পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লইয়া পড়িয়াছে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। ইনি অন্ধ। ইঁহার চেষ্টায় এরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকালয় চলিতেছে, ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের কথা। দৃষ্টি শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াও যেরূপ অধ্যবসায় এবং যত্ন সহকারে অঘোর বাবু বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। ভগবান এই পুস্তকালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায় হউন।

৫। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ প্রবেশিকা।—শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য

৺০। যাঁহারা সাহিত্য সেবক, ব্যাকরণ লিখিতে তাঁহারাই অধিকারী। বাঙ্গলা ভাষায় দিন দিনই নূতন নূতন পরিচ্ছদ সংযুক্ত হইতেছে। আধুনিক ভাষার সহিত যাঁহারা পরিচিত নহেন, তাঁহারা অভিনব বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে অধিকারী নন্। বাঙ্গালা ভাষার মূল সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ, সন্দেহ নাই, কিন্তু দিন দিনই বাঙ্গালা ভাষা স্বাতন্ত্র্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই স্বতন্ত্র অভিনব ভাষার সূক্ষ্ম-তত্ত্বের মাধুর্য্য যাঁহারা হৃদ্গত করিতে অক্ষম, তাঁহারা ইহার ব্যাকরণ না লেখেন, সেই ভাল। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, মহেন্দ্র বাবুর ন্যায় সাহিত্য-জগতের পরিচিত ব্যক্তি এই কার্য্যে হাত দিয়াছেন। তিনি ব্যাকরণ লিখিতে বসিয়া অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব' এবং ৯ কার তুলিয়া দিয়া যে সৎসাহস এবং ভাষা-সংস্কার-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বাস্তবিক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি বিভক্তি, সমাস ও কারকেরও কিছু কিছু সংস্কার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, আরো সংস্কারের প্রয়োজন। আশা করি, মহেন্দ্রবাবু কালে বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে সকলে হাত দিবেন। তাঁহার এই ব্যাকরণ খানি যে প্রচলিত অনেক ব্যাকরণ অপেক্ষা ভাল হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা অধিকন্তু।

৬। বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার প্রণীত। মূল্য ৷৷০। তারিণীবাবুও বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। তিনিও এই ব্যাকরণ সঙ্কলন করিতে যথেষ্ট দক্ষতা এবং সংস্কার-সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরোক্ত দুইখানি ব্যাকরণই স্কুলে প্রচলিত হইবার যোগ্য। পূর্ব্বোক্ত খানি নিম্ন-শ্রেণীতে, এবং শেষোক্ত খানি উচ্চশ্রেণীতে।

৭। মোহ-মুদ্গর—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত—শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত. মূল্য ৴১০। এ পুস্তক সম্বন্ধে অধিক কিছুই বক্তব্য নাই—এই উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রত্যেক শ্লোক প্রত্যেকের মুখে মুখে রাখা উচিত।

৮। সাবিত্রী লাইব্রেরী—৬ষ্ঠ ও ৭ম বাৎসরিক বিবরণী।—সাবিত্রী লাইব্রেরী বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতির জন্য অক্লান্ত অন্তরে যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য। মাতার ভক্ত সন্তান,—স্বদেশ-বৎসল সন্তান-গণের অক্ষয় কীর্ত্তি, সাবিত্রী লাইব্রেরী। এক দিন নহে, দুদিন নহে, ৭ বৎসর যাবৎ সভার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বৎসর বৎসর সভায় এক একটী সুন্দর বক্তৃতা পাঠ হইয়া থাকে। লাইব্রেরিটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, আমরা একান্ত অন্তরে কামনা করি।

৯। চারুপ্রবন্ধ—প্রথমভাগ; শ্রীমনোমোহিনী গুহ বিরচিত। মূল্য ।৴০। স্বামীর চেষ্টায় স্ত্রী কিরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া বঙ্গগৃহের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন, এই চারুপ্রবন্ধ তাহার দৃষ্টান্ত। তিনিই প্রকৃত স্বামীর উপযুক্ত, যিনি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্ত্রীকে প্রকৃত সৎশিক্ষা প্রদান করিতে যত্নশীল। এই গ্রন্থকর্ত্রীর স্বামী এই কারণে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। চারুপ্রবন্ধের ভাষা প্রাঞ্জল, রুচি মার্জ্জিত, ভাব সরল। স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ বিধানের জন্য যে সমস্ত সভা আছে, পুরস্কারের জন্য এই পুস্তকক্রয় করিয়া ইহাঁকে উৎসাহিত করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। বর কন্যা বিক্রয় বা পাস করার ডাকাতী।—শ্রীমোহিনীমোহন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵০। কন্যার বিবাহ দিতে হইলে আজকাল কিরূপ বিপন্ন হইতে হয়, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। টাকার অভাব হইলে সৎপাত্র মেলা দুষ্কর। সৎপাত্রের অর্থ—পাস করা ছেলে। এসম্বন্ধে সমাজের যে কি বিষম দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা জানেন। পুস্তকখানি অতি সৎউদ্দেশ্যে লিখিত। সকলেরই উৎসাহ দেওয়া এবং পাঠ করা উচিত।

১১। ভারতশ্রমজীবী।—মাসিক পত্র,—বার্ষিক মূল্য ৷৶০। কয়েক মাস হইতে আবার সুন্দর বেশে বাহির হইতেছে। সরল উপদেশ পূর্ণ অনেক সার কথা থাকে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এরূপ উপকারী পত্রিকার বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

১২। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য।—উপেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ প্রণীত, মূল্য ৵০। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব কি না, অতি সুন্দররূপে গ্রন্থকার তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা এক পক্ষের যুক্তি পাঠ করিয়াছেন, উপেন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধ তাঁহাদের পাঠ করা একান্ত উচিত। ইহাতে অনেক সারকথা আছে।

১৩। নীহারিকা।—'বনলতা' রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৸০। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে ইনিই প্রধান কবি, একথা বলিলে অধিক কিছুই বলা হয় না। বঙ্গমহিলার নাম দিয়া পুরুষের লিখিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং ইনিই প্রধান মহিলা-কবি। বিদেশীয় কবিদিগের সহিত ইনি বিশেষ পরিচিত। বঙ্গমহিলার লেখা বলিয়া আমরা অতি যত্ন সহকারে ইহার কবিতা পড়িয়া থাকি। ইহার লেখায় উজ্জ্বল প্রতিভা বা সজীব কবিত্বের পরিচয় না পাইলেও ইহার নিকট আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা বঙ্গমহিলার হস্তপ্রসূত মনে করিয়া লইলে, গৌরব করিবার অনেক কথা আছে। ইহাপেক্ষা ভাল কবিতা কোন বঙ্গমহিলা বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন কিনা, আমরা জানি না।

১৪। বঙ্গরবি।—বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য ১৷০। মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে আমরা বড় একটা মতামত প্রকাশ করি না, কিন্তু সহযোগীগণের অনুরোধ এড়ান কষ্টকর বলিয়াই অবশেষে মত দিতে হইল। অনেক বড় বড় লেখকের নাম বঙ্গরবির মলাটের পৃষ্ঠায় আছে; কিন্তু তাঁহারা লিখিতেছেন বলিয়া পরিচয় পাইলাম না। যে দুই সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে বিশেষ গৌরব করিবার কিছুই পাই নাই। রবির তেজ যেন বড়ই নিবু নিবু বোধ হইতেছে। যাহা হউক, সহযোগীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করি।

১৫। নবজীবন—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মাসিক পত্রিকার মধ্যে এখানি যে একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ প্রায়ই নবজীবনের পৃষ্ঠাকে স্বীয় স্বীয় চিন্তার উজ্জ্বল কণা সকলের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। সত্য কথা অবশ্যই বলিতে হইবে, ইহাঁদের ন্যায় চিন্তাশীল লেখক বাঙ্গলায় অতি অল্পই আছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,

নবজীবনে সময়ে সময়ে এরূপ জঘন্য রুচি-পূর্ণ অশ্লীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে যে, তাহা কোন ক্রমেই শিক্ষিত ভদ্রলোকের পাঠ্য হইতে পারে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায়, 'অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক' একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকার কুৎসা-পূর্ণ প্রবন্ধ যে কেন নবজীবনের ন্যায় পত্রিকার পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করে, আমরা বুঝিতে পারি না। নবজীবনের উদ্দেশ্য—নবধর্ম্ম প্রচার করা ; কিন্তু এযে কিরূপ নবধর্ম্ম, বুঝি না। মিথ্যা কুৎসা রটনা করা একটা মহৎ কাজ নয়—ইহাতে বাহাদুরীও বড় একটা নাই। যে সে লোকেই এরূপ করিয়া থাকে তারপর যদি ঘটনা সত্যও হয়, তবুও কি এই সকল জঘন্য বিষয় মাসিক কাগজের আলোচ্য হইতে পারে? বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে অশান্তির আগুন—পল্লীতেং চরিত্রহীনতার জীবন্ত ছবি, সে সকল বিষাদের চিত্র আঁকিতে কাহার সাধ যায়? কেবা পারে? কে বা করে? চিন্তাশীল লোকের একমাত্র কার্য্য—কেবল আদর্শ চরিত্র সম্মুখে ধরা। আমাদের সহযোগী মধ্যে মধ্যে এ যে কিরূপ রুচির পরিচয় দেন, বুঝি না।

সে কথা থাকুক। দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ব্রাহ্মসমাজ এবং বেথুন স্কুলকে এই প্রবন্ধে অত্যন্ত তীব্র ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যিনি যাহা বলুন, আমাদের সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই ; কারণ ইহা বর্ত্তমান সময়ের একটা ফ্যাসন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেথুন স্কুল সম্বন্ধে গুটিকতক কথা না বলিয়াই পারি না। সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত কুল কামিনীরা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এই স্কুল সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশিত হইলে, তাহার সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণে সর্ব্বসাধারণের অধিকার সমান। বাস্তবিক যদি স্কুলের গলদ্ থাকে, বাহির হউক, আমরা সাবধান হই। আর যদি মিথ্যা কুৎসা রটনা হইয়া থাকে, তাহারও তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। এইরূপ লেখাতে যে বেথুন স্কুলের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে স্ত্রীশিক্ষার ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে, ইহা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বিশেষরূপ চিন্তা করা উচিত। স্কুল-কমিটী যদি ইহার তীব্র প্রতিবাদ না করেন, তবে কোন ভদ্রমহিলার আর এই স্কুলে পাঠ করা উচিত নয়

১৬। **কল্পনা**—চতুর্থ বৎসর, ষষ্ঠ সংখ্যা। কল্পনা আবার বাহির হইয়াছে এবং বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে।

১৭। **বেদব্যাস**—শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের আলোচনাতে পূর্ণ। বেদব্যাসের ন্যায় পত্রিকার অত্যন্ত দরকার আছে। পত্রিকাখানি বেশ চলিতেছে।

এতভিন্ন গার্হস্থ পাঠ, বাঙ্গালীর ইয়ুরোপ দর্শন, চিন্তা বিন্দু, বালক বন্ধু, উদাসীন, ভারত সম্বাদ, তিনটি দৃশ্য, বড় বউ বা সুধাবৃক্ষ, বঙ্গের বীরপুত্র, ভীষ্মের শরশয্যা, মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগবিন্দ সিংহ, পরাশর সংহিতা, জীবন সহায়, উদ্গীথা, Hindu Riligion, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, লক্ষ্মীমণি চরিত এবং গৃহিণীর কর্ত্তব্য—দ্বিতীয় সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তকগুলি ক্রমে পরে পরে সমালোচিত হইবে। আমরা পূর্ব্ব-প্রাপ্ত পুস্তক রাখিয় পর-প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা অগ্রে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

চৈতন্য-চরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৭ম)

থা ও পরিচয়।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ নবদ্বীপের আদিম নিবাসী ছিলেন না; পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়া তাঁহার পিতা নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট দেশে উপেন্দ্র মিশ্র নামে একজন সম্ভ্রান্ত বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ নামে তাহার সাত পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে জগন্নাথ জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথের ঔরসে ও শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র অতি শান্ত ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন; এবং দেবার্চ্চনা, অধ্যয়ন, তপজপাদি ব্রাহ্মণোচিত পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠানেই জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাকে লোকে পুরন্দর উপাধি দিয়াছিল; সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। বিবাহের পূর্ব্বে কি পরে জগন্নাথ স্বদেশ পরিত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় না; সম্ভবত নবদ্বীপাগমনের পরই তিনি পরিণীত হইয়া থাকিবেন। কারণ তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপবাসী সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত লোক ছিলেন। সমস্ত নবদ্বীপবাসীই নীলাম্বরের যথেষ্ট সম্মান ও খাতির করিত এবং সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস তাঁহার শিষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সুতরাং সুদূর দেশ শ্রীহট্টে নীলাম্বর যে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব বোধ হয় না। তবে ইহা হইতে পারে যে, জগন্নাথের ন্যায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন।

শচী জগন্নাথের প্রথমে সন্তানভাগ্য বড় ভাল ছিল না। এক একটী করিয়া আটটী কন্যা জন্মগ্রহণান্তর গতাসু হইলে পতি পত্নী বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছিলেন; এবং সন্তান কামনায় বিষ্ণু পূজাদি নানারূপ দেবানুষ্ঠান করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনান্তর সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী পুত্র জন্মিল। পুত্রের নাম বিশ্বরূপ হইল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিশ্বরূপ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে একজন ভগবৎপরায়ণ সাধুমধ্যে পরিগণিত হইলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য একটী বৈষ্ণব দলের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচার করিতেছিলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের নানা উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপের জন্মের পর দীর্ঘকাল যাবৎ শচী জগন্নাথের আর কোন অপত্যোৎপাদন হয় নাই। পরিবারের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় চৈতন্যচন্দ্র উদিত হইলেন। তখন বিশ্বরূপ প্রায় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

এইখানে বিশ্বরূপের শেষ জীবনের কথা কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। অন্ন ব্যঞ্জন

প্রস্তুত হইলে বালক বিশ্বম্ভর মাতৃ আজ্ঞায় ভোজন জন্য জ্যেষ্ঠকে ডাকিতে যাইতেন, এবং জ্যেষ্ঠের হস্ত ধরিয়া লইয়া আসিতেন। উভয় ভ্রাতার কমনীয় সৌন্দর্য্য ও ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সামান্য বালক নহেন। এইরূপ কতকদিন কাটিয়া গেলে জগন্নাথ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম লক্ষ্য করিয়া বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বরূপ সংসারে অনাসক্ত ছিলেন, এক্ষণে পরস্পর পরিণয়ের কথা শুনিতে পাইয়া রাত্রিযোগে গৃহ পরিত্যাগ করত পিতামাতাকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গেলেন; এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রজ্যা করত দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটে সন্ন্যাসলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই সময়ে নবদ্বীপে যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতেন ও ভবিষ্যতে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সর্ব্ব প্রধান পার্ষদ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এখানে তাঁহাদের জীবনের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কিছু কিছু বলিয়া রাখা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সকলের মধ্যে অদ্বৈত বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ ছিলেন। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কমলাক্ষ, নিবাস শান্তিপুর। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বোধে ভক্তি ও পূজা করিত। ঈশ্বর হইতে দ্বৈত বা ভেদ না থাকা বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত হইয়াছিল; এবং আচার্য্য স্বরূপে ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন বলিয়া 'আচার্য্য' উপাধি যুক্ত হয়। নবদ্বীপেও তাঁহার এক বাটী ছিল। বোধ হয়, অধ্যাপনা উপলক্ষেই নবদ্বীপে বাসস্থান হয়। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণ যত্নে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। ভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য মঠের প্রধান সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আগমন করেন ও অদ্বৈতকে দীক্ষিত করিয়া যান। সেই হইতে অদ্বৈতের ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। চতুর্দ্দিকে ভক্তিহীন শুষ্ক ক্রিয়াকাণ্ডে রত লোকদিগকে দেখিয়া করুণহৃদয় অদ্বৈত বড় ব্যথিত হইতেন এবং ভগবানের অবতারণার জন্য সর্ব্বদাই সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। কথিত আছে যে, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ও অধর্ম্ম বিনাশের জন্য শীঘ্রই ভগবান অবতীর্ণ হইবেন। এই আশায় আশান্বিত হইয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী গঠনপূর্ব্বক সর্ব্বদা গীতা ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, নিভৃতে বসিয়া ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত সদালাপ ও সংকীর্ত্তনে কাল অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পত্নী সীতাদেবীও স্বামীর ন্যায় ভক্তিমতী ও পবিত্রচারিণী ছিলেন।

অদ্বৈতের ভক্ত গোষ্ঠির মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত একজন প্রধান ছিলেন। ইনি ও ইঁহার অপর তিন সহোদর শ্রীরাম, শ্রীপতি, ও শ্রীনিধি পণ্ডিতও চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে ভক্তি পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আদিবাস কুমারহট্টে বা বর্ত্তমান হালিসহরে ছিল। কোন কারণ বশত

ইঁহারা সপরিবারে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরি সংকীর্ত্তন করিতেন এবং প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেন বলিয়া নগরবাসী অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল এবং সুযোগ পাইলে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িত না। দেবানন্দ পণ্ডিত নামে নবদ্বীপে একজন বিখ্যাত ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র ভাগবত পাঠ করিত; কিন্তু তিনি ভাগবতের ভক্তি পক্ষে কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। এক দিন শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহার টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণচরিত্র শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া বহুল পরিমাণে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। দেবানন্দের তরলমতি শিষ্যগণ পাঠের ব্যাঘাত হয় দেখিয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। দেবানন্দ উপস্থিত থাকিয়াও তাহা করিতে নিষেধ করেন নাই, এই অপরাধে উত্তরকালে চৈতন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীবাস পণ্ডিত লোকের এতই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন যে, চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ ও নবদ্বীপ ত্যাগের পর ইঁহারা পুনরায় কুমারহট্টে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিসেন। নবদ্বীপে অবস্থিতি কালে শ্রীবাস ভবনই চৈতন্যের বিলাসের প্রধান স্থান ছিল। শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীও স্নেহময়ী ও উদারমতী ছিলেন।

গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বনমালী আচার্য্য এবং আরও অনেকানেক ব্যক্তি এই বৈষ্ণব দলের সভ্য ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপের মাধব মিশ্রের পুত্র। শৈশব সময় হইতেই ইনি সংসারে বিরক্ত হইয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করেন এবং চির কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বী হইয়া আজীবন ধর্ম্মানুশীলনেই অতিবাহিত করেন। ইনি চৈতন্যের একজন পরম প্রিয় সুহৃদ ও প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

নবদ্বীপের কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলে মুরারি গুপ্তের জন্ম হয়। ইঁহাদিগকে গুপ্ত বেজ বলিত। এক্ষণেও নবদ্বীপে বেজ পাড়া বলিয়া একটী পল্লী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নামানুসারে ঐ পল্লীর নাম হইয়া থাকিবে। মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহাকে বৈষ্ণবেরা হনুমানের অবতার বলিয়া থাকেন। ইনি চৈতন্যের প্রথম জীবনের এক কড়চা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দ দত্ত—ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্টে। ইনি চৈতন্যের সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। যখন বিশ্বম্বর বিদ্যা মদে মত্ত, ইনি তখন হইতেই শান্ত ও শুদ্ধভাবে হরিভক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন। একত্রে অধ্যয়ন হেতু মুকুন্দ ও সঞ্জয়ের সহিত বাল্যকাল হইতেই চৈতন্যের সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল।

শ্রীমান্ পণ্ডিত—নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীচৈতন্যের মনের ভাব পরিবর্ত্তনের কথা ইনি বৈষ্ণব সমাজে জানাইয়াছিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপবাসী জনৈক ভিক্ষুক। চৈতন্যের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে

নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। গয়া হইতে আগমনের পর ইঁহারই গৃহে সর্ব্ব প্রথমে চৈতন্যদেব আপন মনের পরিবর্ত্তিত ভাব বন্ধুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ও কোন সময়ে ইঁহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া খাইয়াছিলেন; এবং অপর সময়ে ইঁহার পাক করা অন্ন চাহিয়া খাইয়াছিলেন।

বনমালী আচার্য্য—নবদ্বীপস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ। কোন সময়ে রাজকীয় আদেশে ইঁহার বাটী কাটিয়া উঠাইয়া দিবার ও স্ত্রীলোকদিগকে অসম্ভ্রম করিবার দণ্ড প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ রাত্রিযোগে সপরিবারে পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু ঘাটে খেয়ার নৌকা না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছিলেন; কথিত আছে যে, এমন সময় স্বয়ং ভগবান্ খেয়ারীর রূপ ধরিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী করিয়া ইঁহাকে পার করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সকল লোক ব্যতীত নবদ্বীপে আরও অনেক লোকের সহিত চৈতন্যের বহুতর সম্পর্ক ছিল। এস্থানে তাঁহাদের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান নামে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে তাঁহার টোল ছিল, এবং বুদ্ধিমন্ত তাঁহার একরূপ মুরুব্বি ছিলেন। চৈতন্যের দ্বিতীয় বিবাহের সমস্ত ব্যয় বুদ্ধিমন্ত খান সরবরাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য চৈতন্যের আত্মীয় ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং চৈতন্য ইঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন। কোন সময়ে ইঁহারই বাটীতে সাঙ্গো পাঙ্গ লইয়া বিবিধ সাজ সাজিয়া গীত বাদ্য ও নৃত্য সংযোগে শ্রীচৈতন্য নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য নামে ব্রাহ্মণের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরাঙ্গের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। বনমালী আচার্য্য এই বিবাহের ঘটকালী করিয়াছিলেন। সনাতন পণ্ডিত নামে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় পরিণয় সম্পন্ন হয়। সনাতন রাজ পণ্ডিত ছিলেন, কাশীনাথ মিশ্র দ্বিতীয় বিবাহের ঘটক ছিলেন। শ্রীধর নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি নবদ্বীপে তরকারী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; লোকে তাহাকে 'খোলা বেচা শ্রীধর" বলিত। বিদ্যানন্দে মত্ত হইয়া যখন নিমাই পণ্ডিত সকলের সঙ্গেই বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখনও সময়ে সময়ে তিনি শ্রীধরের ভগ্ন কুটীরে আসিয়া তাহার সহিত পরিহাস করিতেন, শ্রীধরকে তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে, যদি শ্রীধর প্রত্যহ তাঁহাকে থোড় কলা মোচা আদি না দেন, তবে তাঁহার যে গুপ্ত সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহা সকলকে বলিয়া দিবেন। শ্রীধর একজন অতি সরল প্রকৃতি সাধু পুরুষ ছিলেন। কোন সময়ে গৌরাঙ্গ ইঁহার ফুটা লৌহ পাত্রে জল পান করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের বাটীতে মহা প্রকাশের দিন চৈতন্য দেব ইঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের বাসস্থান যদিও নবদ্বীপ নহে, তথাচ শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিবেচনায়, এ স্থানে তাঁহারও কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। জেলা বীরভূমের অন্তর্গত এক চাকা বীরচন্দ্রপুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্ম

স্থান। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার পিতার নাম হাড়ো ওঝা, মাতার নাম পদ্মাবতী দেবী। নিত্যানন্দ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম কুবের পণ্ডিত। সন্ন্যাসাশ্রমে নিত্যানন্দ নাম হইয়াছিল। তাঁহার কিশোর বয়সের সময় তাঁহাদের বাটীতে এক জন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিল, বালকটীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া অভ্যাগত সন্ন্যাসী কৌশল ক্রমে হাড়ো ওঝাকে সত্যে আবদ্ধ করত বালকটীকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন এবং আপনার চেলা করিয়া নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ মথুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং লোক মুখে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ এবং হরি নাম প্রচারের বার্ত্তা পাইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। নিতাই মহা প্রেমিক, সরল এবং করুণহৃদয় ছিলেন। চৈতন্য ইহাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য করিতেন। তাঁহাকে পাইয়া শচী দেবী কথঞ্চিৎ বিশ্বরূপের শোক সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থিতি কালে ইনি শ্রীবাসালয়ে থাকিতেন। শ্রীবাসের পত্নী পুত্র জ্ঞানে ইহাকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া দিতেন। নিত্যানন্দ হরি প্রেমেমগ্ন থাকিয়া বালকের ন্যায় আচরণ করিতেন, কখন গঙ্গায় সাঁতার দিতেন, কখন দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতেন এবং কখন বন্ধুদিগকে প্রহার করিতেন, ও ভোজন কালে সকলের পাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন ছড়াইয়া দিতেন। বৈষ্ণবেরা ইহাকে বলরাম ও লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে যবন হরিদাস এক জন অতি উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি বিস্ময়জনক ও অলৌকিক। সে জন্য এখানে তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা যাইতেছে। চৈতন্য জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে এক দিন অদ্বৈতাচার্য্য গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যায় নিমগ্ন আছেন, শিষ্যগণ কেহ বা শুনিতেছেন, কেহবা ভাববেশে সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এবং কেহ কেহবা প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, শ্মশ্রুধারী এক সুদীর্ঘ পুরুষ হরিনাম গান করিতে করিতে পুলকাশ্রু প্রেমে গদ গদ হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলায় ও হস্তে হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গে ধূলি ধূসরিত, নয়নে দর দরিত ধারা বহিতেছে, এবং মুখশ্রীতে যেন চির শান্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে মনে করিলেন, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবতা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন, জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, তাঁহার নাম যবন হরিদাস, নিবাস বুড়ন গ্রাম। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণব মণ্ডলীর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তখন সকলে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নৃত্য করিতে করিতে হরিদাসের মহাভাবের আবেশ হইল। তাহা দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য নহে। তদবধি তিনি অতি যত্নের সহিত হরিদাসকে নিজালয়ে রাখিয়া দিলেন। শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য এক গোহা নির্ম্মিত লইল। তিনি সেখানে নামানন্দ সুখে জীবন অতিবাহিত

করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের গৃহে ভোজন করিতেন এবং সময়ে সময়ে নবদ্বীপে আসিয়া ভক্তমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইতেন। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

তাঁহার পূর্ব্ব জীবন অতি কৌতুকজনক ও নানাপ্রকার ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। বুঢ়নগ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে তাহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই শুষ্ক মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার বীতরাগ ও প্রেম ভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা জন্মিয়াছিল। কি প্রকারে ও কাহার সংসর্গে পড়িয়া তাঁহার এই রূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল ও কেইবা তাঁহাকে হরিদাস নাম প্রদান করিল, বৈষ্ণবেতিহাসে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, পিতা মাতা তাঁহার হিন্দুয়ানি দৃষ্টে অবশেষে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বাটী হইতে বাহির হইয়া হরিদাস কোন নির্জ্জন বেণা বোনের মধ্যে গোহা নির্ম্মাণ করত হরিনাম সাধন আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র খান্ নামে সেই দেশের এক অত্যাচারী ও পাষণ্ড জমিদার ছিল। সে হরিদাসের কঠোর তপস্যার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে এক সুন্দরী ও যুবতি বেশ্যাকে রাত্রি যোগে তাঁহার গোহায় প্রেরণ করিল। বেশ্যা যাইয়া হরিবাসকে জানাইল যে, সে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম না করিয়া কাহার সহিত আলাপ কবিতেন না; সুতরাং বেশ্যাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলেন যে, নাম সংখ্যা পূর্ণ হইলেই তিনি তাহার সহিত আলাপ করিবেন। এদিকে নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, তখন সেই বারবনিতা ভগ্নোদ্যম হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল, ও আপন প্রভুকে সমস্ত অবগত করিল। পাপমতি রামচন্দ্র ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তৎপর দিন রাত্রে আবার ঐ বারনারীকে প্রেরণ করিল। সে দিন হরিদাস তাহাকে বলিলেন যে, কল্য বড় দুঃখ পাইয়াছ, অদ্য নাম সাঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, অবশ্য তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। বেশ্যা তচ্ছ্রবনে গোহার দ্বারদেশে সদা হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে আপনিও দুই চারিবার উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে দিনও নাম সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই নিশাবসান হইয়া গেল, তৃতীয় রাত্রিতে বেশ্যা আসিলে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন যে, এক মাসে এক কোটি হরিনাম জপ করিবার ব্রত লইয়াছি, মনে করিয়াছিলাম যে, কল্যই নাম শেষ হইবে, তাহা হইয়া উঠে নাই; আজ নিশ্চয় সাঙ্গ হইবে, তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সহিত সঙ্গ করিতে পারিব। বেশ্যা পূর্ব্ববৎ দ্বার দেশে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল ও আপনি ও মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম ভাবে নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। সাধু সঙ্গের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, এই রূপ করিতে করিতে বেশ্যার মন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন সে আপনার কুৎসিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং হরিদাসের চরণতলে কাঁদিয়া পড়িয়া রামচন্দ্র খানের চরিত্র আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল। হরিদাস বলিলেন যে "তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি এবং এদেশ পরিত্যাগ করিয়াও যাইতাম, কেবল তোমার উদ্ধারের জন্য এই তিন দিন এখানে

রহিয়াছি।” তখন সেই বেশ্যা নিজ পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর হরিদাস তাহাকে বলিলেন যে, তোমার যথা সর্ব্বস্ব দীন দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া এই গোহার মধ্যে থাকিয়া একাগ্রচিত্তে হরিনাম সাধন কর, অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বেশ্যা তাহাই করিল এবং মস্তক মুণ্ডন করত এক বস্ত্রা হইয়া নাম সাধন করিতে আরম্ভ করিল। ঈশ্বর কৃপায় অচিরাৎ সে রিপু দমনে সমর্থ হইয়া পরম বৈষ্ণবী হইয়া উঠিল।

হরিদাস সেখান হইতে চাঁদপুর গ্রামে বলরামাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন, বলরাম সপ্তগ্রামের পুণ্যশীল জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ছিলেন। তিনি হরিদাসের সৌম্যমূর্ত্তি ও ভক্তিভাব দেখিয়া নির্জ্জন স্থানে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। এই খানে হিরণ্যের পুত্র বালক রঘুনাথ দাস হরিদাসের দর্শন পান ও এই সাধু সঙ্গগুণে ভবিষ্যতে তিনি হরি ভক্তি পাইয়া উদ্ধার হইয়া যান। এই স্থানে অবস্থিতি করার সময় বলরাম এক দিন হরিদাসকে জমিদারের সভায় লইয়া যান। হরিদাসের সাধু ব্যবহারে ও সুমিষ্ট আলাপে সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান হইলেন। এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসও তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিলেন। কেবল গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি অসাধু ব্যবহার করিয়াছিল। এই ব্যক্তি মজুমদারদিগের ঘরে আরিন্দাগিরি করিত এবং গৌড়ে বাদসাহের দরবারে যাতায়াত করিত। হরিদাস নামাভাসে মুক্তি হয়, এই ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যক্তি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল যে, ‘আপনারা এই ভাবুকের কথা শুনিবেন না, কোটি জন্ম ব্রহ্ম জ্ঞানে যে মুক্তি হয় না, তাহা কি নামাভাসে হইতে পারে? তাহা যদি হয়, তবে আমার নাক কাটিব।’ হরিদাস দাঢ্য সহকারে উত্তর করিলেন যে, যদি না হয়, তবে আমার নাক কাটিব। তচ্ছ্রবণে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল ও অশেষ প্রকারে গোপাল চক্রবর্ত্তীর নিন্দা করিতে লাগিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও সেই দিন হইতে গোপালকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। সভাসদ্‌গণ গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষমা করিবার জন্য হরিদাসকে অনুরোধ করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, আপনারা কিছু মনে করিবেন না। এই ব্যক্তির উপর আমার কোন রাগ নাই। এ তর্কনিষ্ঠ; তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নামের মহিমা কি বুঝিবে? কথিত আছে যে, কিছু কাল পরে ঐ ব্যক্তির কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়াছিল, তাহাকে লোকে মনে করিল যে, ভগবদ্ ভক্তের অপমান করার জন্য, ভগবান তাহাকে ঐ দণ্ড দিলেন।

চাঁদপুর হইতে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানকার ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলেই তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধা করিত, আপামর সাধারণ সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিত। কেবল স্থানীয় কাজি তাঁহার হিন্দুর আচার ব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত বিরক্ত হইল ও তাঁহার প্রতি নানাপ্রকারে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ঐ গোঁড়া কাজি দেশাধিপতির নিকট তাহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ আনিল যে, হরিদাস মুসলমান হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত হিন্দুর আচার ব্যবহার অবলম্বন

করিয়াছেন। দেশাধিপতির সম্মুখে নীত হইলে, হরিদাস অকুতোভয়ে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রেরিত পিতরও দণ্ড ভয়ে আপন অভীষ্ট দেবকে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং ক্রুশে হত ধর্ম্মবীর ঈশাও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আত্মবিচ্যুত হইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মসিংহ হরিদাস যবনের দণ্ড ভয়ে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। বিচারের পূর্ব্বে তাঁহাকে এক কারাগারে রাখা হইল। সেখানে আরও কতকগুলি বন্দী ছিল। ভগবদ্ভক্ত সাধু হরিদাসের আগমনে তাহাদের মনে আশ্বাস হইয়াছিল যে, তবে বুঝি তাহাদেরও কারামুক্তির সময় আগতপ্রায়। এই ভাবিয়া তাহারা হরিদাসকে বন্দনা করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের নাম করিতে লাগিল। হরিদাস তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে,

'থাক থাক এখন আছহ যেইরূপে
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে।'

তাঁহার ঈদৃশ নিষ্ঠুর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বন্দীগণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন ভক্ত হরিদাস তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তাহাদের চিত্তে এখন যেরূপ ঈশ্বরে মতি হইবে এইরূপ সমস্ত জীবন যেন থাকে।' তিনি এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এবং আরও কহিলেন যে, অচিরাৎ তাহাদের কারা মুক্তি হইবে, কিন্তু তাহারা যেন পীড়ন ও অত্যাচার না করিয়া শান্তভাবে জীবন যাপন করেন।

পরদিন রাজ সমক্ষে নীত হইলে যবনাধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—

"কেন ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হইয়াছ যবন,
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত,
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত।
জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার।
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার;
সে পাপ ঘুচাও করি কলিমা উচার।'

হরিদাস কিরূপে উত্তর দিয়াছিলেন দেখুন;—

"শুনি মায়া মোহিতের বাক্য হরিদাস।
অহো বিষ্ণু মায়া বলি কৈল কিছু হাস।
বলিতে লাগিলা তবে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর;
নাম মাত্র ভেদ কহে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন,
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন।
এতেকে যে আমার সে ঈশ্বর যে হেন
লওয়াইয়াছেন চিত্তে করি আমি তেন।
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনি আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম্ম,
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি কর্ম্ম।"

চৈঃ ভাঃ ১৪ অধ্যায়।

এই যুক্তি পূর্ণ ও সারগর্ভ কথা শুনিয়া যবনপতি সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পার্শ্বস্থ কাজিগণ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, যদি হরিদাসের দণ্ড না হয়, তাহা হইলে তাহার দৃষ্টান্তে ও কুমন্ত্রণায় অপরে ও মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। তখন যবনাধিপতি হরিদাসকে কলমা পড়িয়া পুনরায় স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অথবা বিধর্ম্মীর

প্রতি সমুচিত রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে ইহার অন্যতরটী তিনি মনোনীত করিতে পারেন বলায়, ধর্ম্মবীর হরিদাস বলিতে লাগিলেন ;—

'খণ্ড খণ্ড এই দেহ, যায় যদি প্রাণ ;
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।'

তখন নিষ্ঠুর কাজীগণ পরামর্শ করিয়া হরিদাসের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিল যে, বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করা হউক ; এবং আরও বলিল যে, যদি তাহাতেও উহার মৃত্যু না হয় তখন বুঝা যাইবে যে, ও যাহা বলিতেছে তাহা সত্য বটে। পাইকগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র বন্ধন করত তাহাকে বাজারে বাজারে সাধারণের সম্মুখে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। কথিত আছে যে, হরিদাস তখন নামানন্দে নিমগ্ন হইয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় শত্রু নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন ; কেবল মধ্যে মধ্যে তাহার দণ্ডদাতাদিগের ভীষণ পাপের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, "প্রভো! ইহারা জানে না যে কি পাপ করিতেছে।" তাঁহার জন্য সর্ব্ব সাধারণ লোকে হায় হায় করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে এবং নানা প্রকারে নবাবকে শাপ দিতে লাগিল। পরে তিনি ধ্যান যোগে মহা সমাধিতে মগ্ন হইলে যবনগণ মনে করিল যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্তিকা প্রোথিত করিলে তাহার সদগতি হইবে বিবেচনায়, তাঁহার দেহ নদীতে নিক্ষেপ করা স্থির হইল। কথিত আছে যে, নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঠাকুর হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে পুনরায় সেই যবনাধিপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন যবনরাজ তাঁহাকে মহাপীর জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকারে তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিলেন ও তাঁহার স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছ গমনের আদেশ দিলেন।

এই প্রকারে ঠাকুর হরিদাস রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় যবনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ গান করিতে করিতে ফুলিয়া নগরে ব্রাহ্মণ সজ্জন মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ফুলিয়াবাসী সকল লোকেই পরম আনন্দ লাভ করিল ও আনন্দসূচক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিদাসও মহানন্দে তাঁহাদের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন যে, 'আপনারা আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। আমি অনেক সময় ঈশ্বর নিন্দা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে জন্য প্রভু আমাকে এই শাস্তি দিলেন। ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত আছি ; কারণ কুম্ভীপাক নরক ভোগ না করাইয়া তিনি যে আমাকে এত অল্প দণ্ড দিলেন ইহা তাঁহার অতীব কৃপা বলিতে হইবে'। তদবধি তিনি গঙ্গাতীরে গোফা মধ্যে থাকিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর এই গ্রামে এক দিন কোন এক ভদ্র ব্যক্তির বাটীতে ডঙ্কের নৃত্য হইতেছিল। তৎকালে এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বাঙ্গে অহিভূষা ধারণ করিয়া গীত বাদ্যের সংযোগে নৃত্য করিয়া বেড়াইত, তাহার নাম ডঙ্কের নৃত্য। ডঙ্ককে তখন দেবাধিষ্ঠিত বোধে লোকে ভক্তি ও ভয় করিত।

হরিদাসও ঐ নৃত্যের স্থলে ছিলেন। কৃষ্ণের কালীদহের লীলা বিষয়ক সঙ্গীত

হইতেছিল। হরিদাস তাহা শুনিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে ডঙ্কের গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক, ডঙ্ক তাকে কিছু না বলিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। তদ্দৃষ্টে এক দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণ যুবক বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কৃত্রিম ভাবে নৃত্য করিতে করিতে ঐ ডঙ্কের উপর যাইয়া যখন পড়িল, অমনি ডঙ্ক তাহাকে নির্ঘাৎ প্রহার করিতে লাগিলেন। সে ব্রাহ্মণ বাপ বাপ করিয়া পলাইয়া গেল। সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, অহিভূষাধারী ডঙ্ক বলিলেন যে, ভগবদ্ভক্তকে পরিহাস করিয়া ঐ ব্যক্তি যে কৃত্রিমভাব দেখাইল, সেজন্য উহাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া দিলাম।

হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। দুষ্টবুদ্ধি লোকদিগের তাহা ভাল লাগিত না। তাহারা সাধুভক্তের বিদ্রূপ করিয়া কত কথাই বলিত। কেহ বলিত 'এ পাষণ্ড বেটারা রাজ্য ছারেখারে দিবে, ইহাদের জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে। এক্ষণে বিষ্ণু শয়নের সময়; এখন কি উচ্চ ডাক ডাকিতে আছে! হরির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ পাঠাইয়া দিবেন। কেহবা বলিত 'আরে ভাই যদি ধানের দাম কিছু চড়ে, তবে এ বেটাদের ঘাড় ধরিয়া কিলাইয়া দিব'। একদিন হরিনদী গ্রামের একদুর্জ্জন ব্রাহ্মণ হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'ওহে হরিদাস! বলি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর কেন? চুপ করিয়া নাম করিলে কি ফল হয় না? কোন্ শাস্ত্রে ডাকিয়া নাম লইতে বলিয়াছে? হরিদাস বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন যে, ঠাকুর! আমি শাস্ত্র-তত্ব কিছুই জানি না। তোমরা ব্রাহ্মণ; তোমরা শাস্ত্র-মত সকল অবগত আছ। তোমাদের মুখে শুনিয়া আমার যাহা কিছু শিক্ষা। এই বলিয়া তিনি বলিলেন, "উচ্চ কীর্ত্তন করিলে শতগুণ ফল হয়"। বিপ্র বলিলেন, কেন? হরিদাস বৃহন্নারদীয় পুরাণের প্রহ্লাদোক্তি বচন অনুসরণ করিয়া উত্তর করিলেন যে, "নীরবে যে নাম করে, তাহার কেবল পুণ্য হয়; কিন্তু উচ্চ নামে নাম করিলে শ্রোতাদেরও পুণ্য হইয়া থাকে। পরোপকার করার এরূপ ক্ষমতা থাকিতে মানুষের কি পরোপকার করা কর্ত্তব্য নহে। মনে করুন, দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন কেবল আপনাকে পোষণ করে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি সহস্র লোকের ভরণ পোষণের ভার বহন করে; বলুন দেখি, এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এই কথা শুনিয়া বিপ্র তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল যে "ব্রাহ্মণে শাস্ত্র বুঝে না, এক্ষণে হরিদাস শাস্ত্রকর্ত্তা হইয়াছে। হায়! কালে কতই হইবে, কথিত আছে যে যুগ শেষে যে সে বেদোচ্চারণ করিবে, এ যে তাহাই হইল" ইহা বলিয়া—হরিদাসকে বলিল যে, তুই বেটা যাহা ব্যাখ্যা করিলি তাহা যদি সত্য না হয়, তবে তোর না'ক কাটিব'। সাধু হরিদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কথিত আছে যে, কিছু দিন পরে বসন্ত রোগে এই ব্যক্তির নাক খসিয়া পড়িয়াছিল।

এইখান হইতে হরিদাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নবদ্বীপে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব দলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল পরে আচার্য্যের

সহিত শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন যে, পিতৃবাসরে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য শ্রাদ্ধ পাত্রে তাঁহাকে ভোজন করিতে দিতেন। ইহাতে হরিদাস তাঁহাকে বলিতেন যে, "তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব সাক্ষাৎ লইয়া গৃহস্থালি করিতেছ, আমি যবন, আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিও না, করিলে তোমার জাতি নষ্ট হইবে।" অদ্বৈত তাহার উত্তর করিলেন যে "তোমাকে ভোজন করান বেদপরায়ণ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইতেও শ্রেষ্ঠ।"

হরিদাসের সাধন অতি কঠোর ছিল। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরি নাম জপ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। ইহা যে কিরূপে সম্ভব হইত, তাহা বুঝা যায় না। এইরূপে ভক্ত হরিদাস হরি নাম সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তখনও কিন্তু চৈতন্য দেব অবতীর্ণ হন নাই।

হরিদাস ঠাকুর যবন কুলোদ্ভব হইয়াও পরম ভক্ত হইয়াছিলেন; সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ এখনও অবনত মস্তকে তাঁহার গুণ গান করিতেছে ও চৌষট্টি মহন্তের মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাঁহার পূজা ও ভোগ দিতেছে। বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ তাঁহার জাতি সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"জাতিকুল নিরর্থক সবে বুঝাইতে
জন্মিলেন নীচ কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়,
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব বেদে কয়।
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে;
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে।
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে।
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপী হনুমান
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম।"

চৈঃ ভাঃ ১৪ অধ্যায়।

হরিদাস ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের পর-জীবনের ইতিহাস চৈতন্যচরিত বর্ণনার সময় বিবৃত হইবে। শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত

অতৃপ্ত বাসনা।

বাসনা পূরে না। বাসনার প্রকৃতিই তাই। যে বলে, তাহার সাধ মিটিয়াছে, সে মুদির দোকান করে। মুদিরও সাধ মিটে না। শিশুর নাচিবার বাসনা, নাচিয়া নাচিয়া পা ধরিয়া গিয়াছে, নাচাইতে নাচাইতে হাত ধরিয়া গিয়াছে, তবু তাহার নাচিবার সাধ মিটে নাই। বালকের খেলিবার সাধ, সমস্ত দিন খেলিয়াছে, সন্ধ্যা হইয়াছে তবুও খেলিবার সাধ মিটে নাই। বালক অভিমানে রজনীকে অভিশাপ দেয়।

'যারে রজনি তুই মরিয়া
আমরা যতেক ভাই, হইলাম ঠাঁই ঠাঁই
যারে রজনি তুই মরিয়া।'

কাহারও সাধ পূরে না। এ জনমের সাধ পূরেও না, ফুরায়ও না। অতৃপ্ত বাসনা কাতর কণ্ঠে চিৎকার করে,

'এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে,
কিবা জন্ম জন্মান্তরে এসাধ মোর পূরাইবে।

কোনও সাধ পূরে না। ধনের সাধ,

মানের সাধ, বিদ্যার সাধ, কোন সাধই মিটে না। রূপের সাধ,—তাও মিটে না, বসিলাম মাজিলাম কত কি করিলাম, তবু যেন তাহার মনের মতনটী হইলাম না। প্রেমের সাধ, তাও মিটে না। এক জনের অতীত দশ জনের কথা বলিতেছি না, সে যাহারা পারে—হয় তাহারা দেবতা, না হয় তাহারা পশু। সেই প্রেমময়ীর মুখখানি।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন
না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখনু তবু
হিয়া জুড়ন না গেল।"

এ খেদের কথা নহে, আনন্দের কথা। বাসনা তৃপ্ত হইল না বলিয়া যে কাঁদে, সে বালক, প্রজাপতিটী ধরিতে পারে নাই বলিয়া দুকূল হারাইয়া অকূলে ভাসিতেছে। এ পিপাসার তৃপ্তি হইলে মানুষ কি বাঁচিত? জীবনের তৃপ্তি মৃত্যুতে, দিবার তৃপ্তি রাত্রিতে, বাসনার তৃপ্তি পাষাণে। যাহার বাসনা তৃপ্ত হইয়াছে, সে কৃপার পাত্র; হয় মরিয়াছে, না হয় পাষাণ হইয়াছে। বাসনায় তেজ, তেজে সজীবতা, সজীবতায় মনুষ্যত্ব। আমার বাসনা কখন যেন পূর্ণ না হয়। সত্যানন্দ বাঙ্গালীর কল্পিত ব্রহ্মচারী, সাধক নহেন। তাই বাসনা পূরাইতে চাহিয়া ছিলেন। বাসনা পূর্ণ হইলে সে কি আর আমার থাকিবে? হিয়া যখন জুড়াইবে তখন আর তাহাকে হিয়ার ভিতরে পূরিতে বাসনা থাকিবে না, চক্ষু যখন তৃপ্ত হইবে তখন আর তাহার দিকে চাহিতে আমার সাধ হইবে কেন? তাহাকে কি ভুলিতে আমার সাধ? আমি জীবন চাহি, মৃত্যু চাহি না; যে মৃত্যু চায়, সে কৃপাধীন। আমি অনন্ত জীবন চাহি, অনন্ত কাল নির্নিমেষ নয়নে সেই এক খানি মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব। অতৃপ্ত বাসনার মধুরতা বুঝিয়াই বাসনাকে অতৃপ্ত রাখিবার জন্য কেহ কেহ বাসিতকে অনন্ত করিতে চান। তাঁহারা ক্ষুদ্র প্রতিমা চাহেন না, অনন্ত নিরাকারের বাসনা করেন, ইঁহারাও ভণ্ড ব্রহ্মচারী। প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝেন নাই, নকলটাকে আসল বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আমি নীলাকাশের একটী ক্ষুদ্র তারারদিকে চাহিয়া অনন্ত যুগ অতিবাহিত করিতে পারি, ফুলের বাগানে একটী যুই ফুলের সোহাগে এজীবন গোঁয়াইতে পারি, ঘাসের বনে একটা শিশির কণার অনন্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত কাল দেখিলেও আমার তৃপ্তি হইবে না। আর সেই মুখ খানি, প্রতিমা-বিনিন্দিত সেই মুখ খানি, শরদের নির্ম্মল গগনে পূর্ণ শশি বিনিন্দিত সেই মুখ খানি, ননী চাচে আলতার ফুটে রাঙ্গান সেই মুখখানি, গোলাপের পাকে যুথিনয়া সেই মুখ খানি, পলকে পলকে বহুধারূপিনী সেই মুখ খানি, আমার প্রাণভরা সেই মুখখানি। অনন্তের অনন্তত্ব ফুরাইবে, তবু তাহা দেখিবার সাধ আমার পূরিবে না। সে যে নিতুই নব, "লাখ নয়ন বিহি না দিল হামারে" বিধাতা যদি লক্ষ চক্ষু দিত, চক্ষে নিমেষ না দিত, আনন্দের অশ্রু না দিত, তার সেই গোলাপী সরম টুকু না দিত, সকলই জোছনার রাত্রি হইত, আর কোটী কল্প পরমায়ু হইত, তবুও তার সকল সৌন্দর্য্য দেখা হইত না।

ক্ষিতি রেণু গণি যদি আকাশের তারা
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা।

সকলি যদি সম্ভব হয়, তথাপি আমার এ পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা নাই। কাজল

দিয়া যখন চোখের ছানি কাটিবে, তখন তুমি ও ভাই আমার মত দেখিবে। আমার মতনটী তুমি যখন পাইবে, তখন তুমি আমার মত বলিবে যে, প্রাণটা সদাই যেন "পাছে হারাই" করিয়া ভাবিতেছি। কেন ক্ষণেকের তরে কাল মেঘ আসিয়া সে পূর্ণ শশী আবরিত করে, বলিয়া বিধাতাকে নিন্দা করিবে, আমার মত তুমিও তাহাকে

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার

দেহক সরবস গেহক সার

বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। তখন আর স্বৈরণ কলঙ্কে ভীত হইবে না। পাগলিনী রাধিকার মত স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া দিবে, যে ননদিনী গঞ্জনা ও তিরস্কার করে, সেই ননদিনীকে ডাকিয়া বলিয়া দিবে,

ননদিনি বল নগরে

ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী

কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।

না, বাসনার তৃপ্তি হয় না; বাসনার যে তৃপ্তি হয় না ইহাই মানুষের সৌভাগ্য। দুর্ব্বল ক্ষীণপ্রাণ জরাজীর্ণ পীড়িত গাড়ী থামিলেই বাঁচে, স্রোতস্বিনীর উদ্দাম বেগ সে ধারণ করিতে সমর্থ নহে, বাসনার অতৃপ্তি সে ক্লেশকর মনে করে, অতৃপ্ত বাসনাপূর্ণ উদ্দাম জীবন অনন্ত তুষানল বলিয়া আখ্যাত করে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চায়, নীল কান্তারে পৃথিবীর গতি, নীলাকাশে গ্রহগণের দ্রুত ধাবন কোনও দিন ক্ষান্ত হইবে না। অনন্ত আকাশে অনন্ত বিশ্ব অনন্ত কাল চলিতে থাকিবে, আমার অনন্ত আত্মার অনন্ত বাসনা জন্মে জন্মে অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা সুখ সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? তুমি আর আমি, এক দিনের জন্য নহে, অনন্ত কালের জন্য নীল গগনে বিচরণ করিব, চোখের উপর মুখ খানি ভাসিতে থাকিবে, প্রাণটা এমনি করে পূর্ণ করিয়া, বিচ্ছেদ নাই, বিড়ম্বনা নাই, মৃত্যু নাই, অন্ধকার নাই, কেবল জ্যোতি, কেবল বাতাস, কেবল উচ্ছ্বাস, কেবল আনন্দ। দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ শিশু সরল বৎসতর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া কাঁদিয়া গগন ফাটায় "আহা তুমি যদি আমার মত মরা হইতে।"

প্রাণের প্রাণতা এইখানে, জীবনের জীবনত্ব এইখানে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই খানে, ক্ষীণকায় শুষ্ক মস্তিষ্ক পীড়িত জনে পরকাল নাই বলিয়া সুস্থ হয়, এ দৌড় তাহারা আর সহিতে পারে না। অনন্ত জীবন স্মরণ করিতে, আত্মার অমরত্ব কল্পনা করিতে তাহারা ভীত হয়। অমরত্ব না থাকিলে, উঃ কল্পনায়ও গা শিহরিয়া উঠে। তুমি আমি ছাড়াছাড়ি হইব, সাঁঝের তারা দুটীর মত অনন্ত গগনে পর্য্যটন করিব না, অনন্ত বিশ্বে ঘুরিব না, "আলস যমুনা বহই যায়" দেখিব না, সায়াহ্নের রাঙ্গাপায় প্রকৃতি লুটাইয়া পড়িতেছে দেখিব না, ফুল গুলি ফুটিবে, ফুলগুলি ঝরিবে দেখিব না, পাখী গান গাইতে গাইতে উড়িয়া পলাইবে দেখিব না, আর তোমার সেই মুখ খানি— ঈশ্বর আমার কল্পনা নিবারণ করুন।

না ভাই! এ সুখের সংসারে ফুলের বনে তোমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিও না। জগত সুখের, সাহারাও নহে, শ্মশানও নহে। দুঃখের হইলে কি জীব এত দিন থাকিত, কেহ বংশ বৃদ্ধি করিত, জন্মিলেও কেহ বাঁচিত? তুমি দুর্ভাগ্য ও নহ। এ সুখের সাগরের পাড়ে বসিয়া থাক, দু চারিটা সুখের ঢেউ তোমার গায়েও লাগিবে।

বিকৃত চক্ষে গোলাপের শয্যাকে তুষানল বলিয়া কল্পনা করিওনা, হিম গিরিতে অনলকণার সম্ভাবনা নাই। এস ঐ বাজিতেছে, আমার সঙ্গে নাচিতে এস।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সিদ্ধিদাতা গণেশ।

১
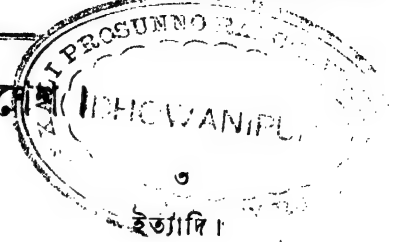
উদ্ধব ঘোষ চাষ করিয়া খায়। প্রত্যহ প্রত্যুষে হল কাঁধে করিয়া এক যোড়া হেলে গরু লইয়া ক্ষেতে যায়। যাইবার সময় একবার তারাচাঁদ সরকার মহাশয়ের বাড়ীর দিকে যায়। সরকার মহাশয় প্রাতে আপনার বহির্বাটীর বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাকু সেবা করেন। উদ্ধব দূর হইতে তাঁহাকে একটি নমস্কার করিয়া মাঠে যায়। উদ্ধবের বিশ্বাস যে, প্রাতে সরকার মহাশয়কে দেখিয়া ক্ষেতে গেলে চাষে ফল ভাল হয়।

২

অলকাসুন্দরী আজ ছয় বৎসরের পর হাসিতেছে। পতিব্রতার পতি ছয় বৎসর গৃহে ছিল না। কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসে ছিল। যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিয়া পতি আজ বাড়ীতে আসিয়াছে। আহ্লাদের কাঁদাকাটার পর অলকাসুন্দরী পতিকে হাসিতে হাসিতে বলিল—তুমি আজ আসিবে তা আমি জানি। পতি জিজ্ঞাসা করিল—কেমন করিয়া জানিলে? আমি ত পত্র লিখি নাই। পতিব্রতা উত্তর করিল—আজ সকালে ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে কমল পিসীর মুখ দেখিয়াছিলাম। দেখিবা মাত্র মনে হইয়াছিল, আমার ছয় বৎসরের দুঃখ আজ ঘুচিবে।

৩

ইত্যাদি।

এইরূপ এদেশে কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রায় সকলেরই বিশ্বাস যে, কাহারো কাহারো মুখ দেখিয়া দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিলে সে দিবসটাই সুখে কাটে এবং সে দিবসের কার্য্যও সফল হয়। এ বিশ্বাস যুক্তিমূলক কি না, এস্থলে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। এখানে একটি কথার উল্লেখ করিলেই চলিবে। যাহাদের দর্শন লোকে সুফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে ধীর ও শান্তস্বভাব বিশিষ্ট দেখা যায়। অন্তত এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহাদিগকে দেখা লোকে মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তাহাদের আকারে উগ্রতা, ঔদ্ধত্য বা চপলতা লক্ষিত হয় না। ধীরতা, সংযম ও শান্তি যাহার মূর্ত্তিতে ব্যক্ত, সে স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, লোকে কেবল তাহারই দর্শনের সহিত সিদ্ধির প্রত্যাশা সংযুক্ত করিয়া থাকে।

লোকের যেরূপ বিশ্বাস, পৌরাণিক পণ্ডিতের শিক্ষাও সেইরূপ। সে শিক্ষা সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট। গণেশমূর্ত্তি চঞ্চলতা, চপলতা, উগ্রতা, ঔদ্ধত্য, ব্যগ্রতা, হঠকারিতা বা অস্থিরতার মূর্ত্তি নয়। সে মূর্ত্তি স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সংযম, সতর্কতা ও চিন্তাশীলতার মূর্ত্তি। গণেশকে

দেখিলে চালাক চট্‌পটে বা ব্যস্তসমস্ত বলিয়া মনে হয় না। গণেশ দেখিতে ধীর স্থির শান্ত। আজ কাল লোকে সচরাচর যে সকল গুণ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আবশ্যক মনে করে, গণেশ মূর্ত্তিতে সে সকল গুণ ব্যক্ত নয়। আজিকার ইউরোপে এবং ইউরোপের দেখাদেখি আজিকার নব্য বঙ্গে লোকের এইরূপ ধারণা যে, হুটাপুটি লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি তাড়াতাড়ি হুড়ামুড়ি চালাকি ব্যতীত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। কিন্তু সে রকম কোনও ভাবই গণেশের মূর্ত্তিতে লক্ষিত হয় না। গণেশের মূর্ত্তিতে সেরকম ভাবের বিপরীত ভাবই অভিব্যক্ত। এখন কথা হইতেছে—গনেশ সত্য না মিথ্যা। কার্য্য সিদ্ধির জন্য ব্যস্ততা চঞ্চলতা প্রভৃতি গুণ আবশ্যক, না ধীরতা গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণ আবশ্যক? এ কথার সম্যক উত্তর এই যে, দুই ই আবশ্যক; কিন্তু ধীরতা সংযম গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি গুণই বেশী আবশ্যক। কোনও কার্য্য করিতে হইলে অনেক দিক, অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক সুবিধা অসুবিধা, অনেক অগ্র পশ্চাৎ, অনেক ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান, অনেক ওজর আপত্তি, ইত্যাদি উত্তমরূপে ধীরভাবে সাবধানে সুগভীর প্রণালীতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। এই প্রকারে সকল রকম বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়, কার্য্য করা উচিত কি না। শুদ্ধ একটা ক্ষণিক মানসিক আবেগে কার্য্য আরম্ভ করা অকর্ত্তব্য। সকল দিক বিবেচনা না করিয়া, কেবল ভাব বা আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা একটা মতের খাতিরে কার্য্য করিলে ফল প্রায়ই শোচনীয় হয়। আবার কার্য্যের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যের অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সে সকল বাধাবিঘ্ন ও কার্য্য করিতে করিতে ধীর ও গভীর ভাবে বুঝিয়া দেখিতে হয়। নহিলে আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ কার্য্য সিদ্ধির জন্য বিচার বিবেচনা ও মন্ত্রণা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক। সে বিচার বিবেচনা বা মন্ত্রণার ত্রুটি হইলে অপরিমিত উৎসাহ উদ্যম ক্ষিপ্রকারিতা ইত্যাদি থাকিলেও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। একটি উদাহরণ দি। যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যম উগ্রতা চঞ্চলতা প্রভৃতি কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি তত হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রণস্থলেও প্রথমোক্ত গুণগুলি অপেক্ষা শেষোক্ত গুণ গুলি জয় লাভের জন্য বেশী আবশ্যক। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিংটনের উদ্যম, উগ্রতা ও উৎসাহ নেপোলিয়নের অপেক্ষা কম ছিল। নেপোলিয়নের ধৈর্য্য ও চিত্তস্থৈর্য্য ওয়েলিংটনের অপেক্ষা কম ছিল। অসংখ্য ইংরাজ সেনার বিনাশ দেখিয়াও ওয়েলিংটন ব্লুকরের আগমন পর্য্যন্ত স্থির ধীর অবিচলিত ভাবে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন দূরে তোপ ধ্বনি হইতে শুনিয়া চিত্তস্থৈর্য্য হারাইয়া আপন পক্ষের সেনানায়ক মার্শল গ্রুজে আসিতেছে ভাবিয়া বীর বিক্রমে আপন সেনা রণস্থলে পরিচালনা করিয়া শীঘ্রই পরাজিত হইয়াছিলেন। কার্য্যের মহা উদ্যম, উৎসাহ ও ব্যস্ততার ভিতরেও অবিচলিত বুদ্ধি, স্থির চিত্ত, সম্পূর্ণ আত্ম সংযম এবং গভীর চিন্তাশীলতা আবশ্যক। নহিলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এই জন্যই সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি উগ্রতা, চঞ্চলতা বা ব্যস্ততা ব্যঞ্জক নয়, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য সংযম

শান্তি গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা ব্যঞ্জক। কার্য্য সিদ্ধির হিসাবে গণেশ মূর্ত্তিই প্রকৃত মূর্ত্তি—গণেশ মূর্ত্তিই প্রকৃত সত্য।

আজিকার দিনে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সকল সময়েই মানুষের এই সত্যটি স্মরণ করা আবশ্যক, কেন না সকল সময়েই মানুষ স্বল্লাধিক পরিমাণে কেবল মাত্র মানসিক আবেগের বা অশুদ্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু আজ কাল আমরা কিছু বেশী আবেগবান ও হঠকারী হইয়া, সকল দিক না দেখিয়া না বুঝিয়া, কার্য্য করিয়া থাকি। কালেজ ছাড়িয়াই আমরা পালে পালে আদালতে ওকালতি করিতে যাই। ওকালতি করিতে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহা আছে কি না, ওকালতি করিতে যে অর্থ বা অপরের সহায়তা আবশ্যক, তাহা আয়ত্তাধীন কি না, ইত্যাদি নানা কথার মধ্যে কোনও কথাই বিবেচনা না করিয়া আমরা দলে দলে উকিল হইতে যাই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা দলে দলে ডাক্তার হইতে যাই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে চাকুরির উমেদার হই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা পালে পালে মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় লইয়া গ্রন্থকার হইয়া । ইংরাজি শিখিয়া আমরা আমাদের দেশের সকল জিনিসই ঘৃণার চক্ষে দেখি। তাই কোনও দিক না দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুই না বুঝিয়া এক একটা ভাবের বা অপরিপক্ক সংস্কারের তাড়নায় আমরা উন্মত্তের ন্যায় গৃহসংস্কার, সমাজসংস্কার, ধর্ম্ম সংস্কার প্রভৃতি আকাশ পাতাল সংস্কার করিতে যাই। কোনও সংস্কারই করিতে পারি না। বরং একটা দোষ সংস্কার করিতে গিয়া দশটা দোষ সৃষ্টি করিয়া বসি। রোগীর রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া আমরা আধ মিনিটের মধ্যে রোগের পরীক্ষা শেষ করিয়া এমনি ঔষধাদি ব্যবস্থা করি যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্বয়ং রোগীরও শেষ হইয়া যায়। এইরূপ সকল কার্য্যেই আমরা মনে করি যে, তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি লম্ফ ঝম্প করিলেই খুব কাজ করা হয়। তাই যেমন আমাদের মনে একটা খেয়াল উঠে অমনি আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে যাই। তাই আমরা কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারি না।

অতএব এই হঠকারিতা ও আবেগানুবর্ত্তিতার দিনে সিদ্ধিদাতা গণেশের কথা স্মরণ করা বড় আবশ্যক। গণেশের সেই স্থির ধীর গম্ভীর শান্ত সংযত চিন্তাশীল মূর্ত্তি চিত্তে অঙ্কিত করিয়া সকল কার্য্য স্থির ধীর গম্ভীর শান্ত সংযত ও চিন্তাশীল প্রণালীতে না করিলে আমাদের বিশৃঙ্খলতা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে এবং আমরা ঘরে বাহিরে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনার ভাগী হইব। অতএব আমাদের সকলেরই ভক্তিভাবে সেই সিদ্ধিদাতা গণেশমূর্ত্তি চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। গণেশ মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডপতিরই এক বিস্ময়কর মূর্ত্তি। জলে স্থলে মহাশূন্যে যখন তুমুল ঝটিকা বহিতে থাকে—আকাশে বিদ্যুৎ ঝন্‌ঝনা জলে তরঙ্গ গর্জ্জন, জলে স্থলে আকাশে পঞ্চভূতে প্রলয়াস্ফালন—তখনও জল স্থল বায়ু বহ্নি ব্যোম সকলেরই সকল নিয়মগুলি সম্পূর্ণ সূক্ষ্মতম প্রণালীতে প্রতিপালিত হয়, কাহারো কোন নিয়মের কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যর্থ বা বিপর্য্যস্ত হয় না, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডপতির

বিস্ময়কর গণেশ মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বিশ্বপটের অন্তরালে যাইতে হয়। কার্য্যসিদ্ধির কারণ বুঝিতে হইলেও কার্য্য-ক্ষেত্রের অন্তরালে ঢুকিতে হয়।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।
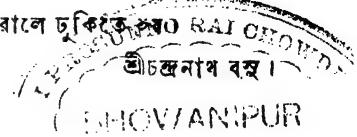
স্বামী ও স্ত্রী।

স্বামী ও স্ত্রী, সৃষ্টির এক অপূর্ব্ব জিনিস। অপূর্ব্ব—স্বামীর নিকট স্ত্রী, এবং স্ত্রীর নিকট স্বামী। এই উভয়বিধ জিনিসেই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল নিহিত। এই উভয়বিধ জিনিসেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সংসার-গরল-সাগরে অমিয়া-ধারা, প্রলোভন-দগ্ধ-গৃহ-মরুভূমিতে এক মাত্র শান্তির ধারা—স্বামী ও স্ত্রী। উভয় উভয়ের দ্বারা জীত, উভয় উভয়ের দ্বারা বশীকৃত, উভয় উভয়ের দ্বারা উপকৃত। স্বর্গের মন্দাকিনী, জীবন-উৎসের একটী মধুর ধারা,—দাম্পত্য প্রেম। স্বর্গ, মর্ত্ত্য,—আকাশ পাতাল—সব একাকার এই মধুর প্রেমের ডোরে। মানুষের মনুষ্যত্ব—ইহারই চরম ফল।

ফুল ফুটে কেন?—পাখী গায় কেন?—ঝরণা বহে কেন?—চাঁদ হাসে কেন?—মলয় চলে কেন?—এ সকলের এক উত্তর, এ সকলের প্রয়োজন আছে। পুরুষের হৃদয় কঠিন কেন?—নারীর হৃদয় কোমল কেন?—উভয়ের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য কেন? উভয় উভয়ের নিকট মধুর কেন?—উভয় উভয়কে চায় কেন?—ইহারও একমাত্র উত্তর, প্রয়োজন আছে। সৃষ্টি, বিকাশের জন্য লালায়িত। এ সকলেরই উদ্দেশ্য—সৃষ্টি-বিকাশ সাধন করা। কাহার ইঙ্গিতে, কে জানে, সকলেই ক্রমাগত সেই বিকাশের পথে হাটিতেছে। পরস্পর সকলে ক্রমাগত সৃষ্টি বিকারই সহায়তা করিতেছে। দাম্পত্য প্রেম, সৃষ্টি বিকাশের মূল বিন্দু।

মানুষ বড়ই মূর্খ। মানুষ, সৃষ্টি বিধানের অতীত হইতে চায়। উষ্ণ রক্তের জোরে মানুষ মনে করে, সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া বুঝি পবিত্র থাকা যায়। দাম্পত্য-প্রেমকে যাহারা ঘৃণা করে, বা উপেক্ষার চক্ষে দেখে, তাহারা শ্মশানের জীব—মরুভূমির বালুকণা, পৃথিবীর পাপের ভাণ্ডার। তাহারা করিতে না পারে, এখন কোন কার্য্যই নাই। ভালবাসা—তাহাদের নিকট স্বপ্ন। ভালবাসা, তাহাদের নিকট প্রহেলিকা। ভালবাসা—তাহাদের নিকট মৃত। সন্তান-বাৎসল্য এবং দাম্পত্য প্রণয়ই সংসারে—প্রেমের আদর্শ। এই উভয়বিধ ভালবাসায় যাহারা বঞ্চিত, তাহারা অহঙ্কার-স্ফীত মানবশরীরে পশু-বিশেষ। তাহাদের সম্মান কেহ করিও না। তাহাদিগকে মানুষের আদর্শ ভাবিয়া ভুল করিও না। প্রেমে যাঁহার হৃদয় নত—প্রকৃত ভক্তির পাত্র তিনি। ভক্তি, প্রণয়ীর হৃদয়-উৎসের মধুর ফল।

মানুষ বড়ই মূর্খ—মানুষ প্রেমে স্বার্থ দেখে। যে প্রেমে স্বার্থ আছে, সে প্রেম প্রেমই নয়। প্রেমের পণ, আত্ম বিসর্জ্জন। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে স্বার্থ মৃত। প্রেমের অনুরোধে, বাধ্য-বাধকতায় মানুষ যেখানে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে পারিয়াছে—আপনার জন্য আর যেখানে কিছুই নাই, অহং-তত্ত্ব যেখানে বিসর্জ্জিত হইয়াছে,—সেই খানেই প্রেমের বিকাশ হইয়াছে। স্ত্রীত্ব স্বামীত্বে, স্বামীত্ব স্ত্রীত্বে যেখানে বিসর্জ্জিত, সেই

খানেই দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ হইয়াছে। ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে, স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, স্বাধীনতা রহিয়াছে যেখানে, সেখানে বিবাহ হয় নাই; সেখানে দাম্পত্য প্রেম নাই। ভারতবর্ষ দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ বলিয়া খ্যাত। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা, ইহারা মানব-সমাজে নরদেহে দেব-কন্যা, ইহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম জগতের আদর্শ। কিন্তু প্রেমের জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ, এ দেশেও, পুরুষের ভাগ্যে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এই জন্যই দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য্য অপরিবর্ত্তিত থাকে নাই। এ দেশের রাধিকা এবং ভগবতী—প্রেমেরই রূপান্তরিত দুটী স্বর্গীয় ফুল; তাই তাঁহারা আদর্শ।

দাম্পত্য-প্রেম শূন্য যে বিবাহ পৃথিবীর বায়ুকে কলুষিত করিতেছে, তাহা নরকের জিনিস। তাহা রিপু-সেবার উপকরণ মাত্র। সমাজের এবম্বিধ লাইসেন্স-প্রথার কোনই মূল্য নাই। প্রকৃত সতীর হৃদয়ের কথা—"এ হৃদয় তোমার, এদেহ তোমার, এ সর্ব্বস্ব তোমার, স্বামি, আমি তোমারি, তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা, আমি চিরকাল তোমার দাসী।" প্রকৃত স্বামীর তিরোধানে সতীর জীবন ভার বোধ হয়—বেহুলা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ইহার দৃষ্টান্ত। প্রকৃত স্বামীর কথা, "সতি, তুমি ফুলের সুবাস, চক্ষের অঞ্জন, হৃদয়ের ভূষণ, আমি চিরকাল তোমার অস্তিত্বেই জীবিত। তোমার অভাবে আমি মৃত, তুমিই আমার হৃদয় রাণী।" সতীর অভাবে মহাদেবের উন্মত্ততা বড়ই স্বাভাবিক, বড়ই মধুর চিত্র। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম যেখানে, সেখানে স্বামীর অভাবে স্ত্রীর মৃত্যু, স্ত্রীর অভাবে স্বামীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্বামী মরিয়াছেন, অথচ স্ত্রী বিদ্যমান আছেন, ইহা মিথ্যা কথা। স্বামী যেখানে নাই, সতীও সেখানে নাই, জীবিত থাকিয়াও নাই। সতী যেখানে নাই, স্বামী সেখানে তিরোহিত। ইহাই স্বাভাবিক। একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। স্বামীর অবলম্বন সতী, সতীর অবলম্বন স্বামী। স্বামী-শূন্য সংসার সতীর নিকট শ্মশান! সতী স্বর্গে গেলে, স্বামীর মনও স্বর্গ চায়। সতীর স্বামী ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং স্বামীর তিরোধানে সতীর আর কি থাকে? একের তিরোধানে অপরের অস্তিত্ব বিদ্যমান যেখানে, সেখানে দাম্পত্য প্রেমের অভাব, সেটা দূষিত রিপু-সেবার উপকরণ মাত্র। প্রকৃত বিবাহ জীবনে একবার মাত্র হয়। বিপত্নীক বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহেরই অঙ্গ বিশেষ। ইহা অত্যন্ত দূষিত। সমাজের কলঙ্ক অপনয়নের জন্য এ সকলের অস্থায়ী উপকারিতা স্বীকার করিতে চাও, কর, কিন্তু ইহাকে প্রেমের আদর্শ বলিয়া কখনই ভুল করিও না। যতদিন প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের সৃষ্টি না হইতেছে, তাবৎ এই সকল বিবাহ অপরিহার্য্য। অপরিহার্য্য বলিয়াই আদরের জিনিস নয়। যে বিবাহে প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের উদয় হয় নাই, অথচ রিপুর চরিতার্থ হইতেছে, সে বিবাহ ঘৃণার জিনিস। বাল্য বিবাহ বিবাহই নয়, সুতরাং বাল-বিধবা বা বাল-বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ সর্ব্বদাই যুক্তিসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি নাই, এবং থাকিতে পারে না। আর্য্য-সমাজ-সংস্কার দলের অগ্রণীগণও এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক। সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাই না। এক সতী, এক স্বামী, ইহাই আদর্শ। বহুবিবাহ, দাম্পত্য

প্রেমের বিরোধী কথা। মানুষের যাহা ছিল, তাহা যতক্ষণ অপরে উৎসর্গ না হয়, ততক্ষণ প্রকৃত প্রণয় উদয় হয় না। একবার প্রদত্ত হইলে আর কি বাকী থাকিবে যে, অপরকে দিবে? মরণে আত্মার শেষ নয়—অনন্ত কাল স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। স্বামী-শূন্য স্ত্রীর বিবাহ এবং স্ত্রী-শূন্য স্বামীর বিবাহ উভয়ই ঘৃণার জিনিস। প্রেমের চক্ষে সুন্দর কুৎসিত ভেদাভেদ নাই, সব সমান। দাম্পত্য প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত, সে অন্য রমণী বা অন্য পুরুষের প্রতি কখনই কুটিল নয়নে তাকাইতে পারে না। তাহার নিকট একমাত্র সুন্দর তাহার স্ত্রী, বা তাহার স্বামী। সমাজ দাম্পত্য-প্রেমহীন হইয়া পড়িয়াছে, বাল্য বিবাহকে বিবাহ নামে অভিহিত করা হইতেছে, বিবাহটা পুরুষের রিপু-সেবার একটা উপকরণ হইয়া উঠিয়াছে, এই গুরুতর বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের দুই ভিন্ন বিধান সমাজে চলিতেছে বলিয়াই বিধবা-বিবাহের সপক্ষে কথা বলিয়া থাকি। দাম্পত্য প্রেমহীন বাল্য-বিবাহের স্রোত প্রবাহিত থাকিয়া সমাজকে কলুষিত করিতেছে বলিয়া পুনর্বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে, নচেৎ পুনর্ব্বিবাহ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃত বিবাহ একবার ভিন্ন আর হইতে পারে না। বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই আদর্শ বিধান। কিন্তু যত দিন বাল্য বিবাহ প্রচলিত, এবং পুরুষের বহুবিবাহ স্রোত প্রবাহিত, ততদিন সে কথা খাটে না। পুরুষের বহুবিবাহ উঠিয়া গেলে, এবং বাল্য-বিবাহ নিবারিত হইলে, বিধবা বিবাহের কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। বহুবিবাহে সমাজ এবং দেশের ভয়ানক দুর্গতি হইতেছে। স্বৈরিণীর সৃষ্টি, লম্পটের সৃষ্টি, ব্যভিচারের সৃষ্টি, বিবাহ-শিথিলতার চরম ফল। বিবাহ-শিথিলতা বা বাহুল্যে দাম্পত্য-প্রেম তিরোহিত হইয়াছে। ভারতে সতীদাহ নিবারণ হইয়াছে যে দিন হইতে, সেই দিন হইতে বিবাহ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে, দাম্পত্য প্রেমের মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছে। অথবা দাম্পত্য-প্রেমের তিরোধান বুঝিয়াই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ রূপ-কলঙ্ক নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং বেণ্টিক সে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন প্রকৃত সতী ছিল না বলিয়াই তাঁহারা এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, নচেৎ আত্মত্যাগ নিবারণ করে, কোন্ আইনের সাধ্য? তখন সতীদাহ হইত না, দ্বিচারিণীর দাহ হইত, তাই আইন এ কার্য্যে সফল-কাম। আজও যে বেণ্টিক এবং রাজা রামমোহন রায়কে এজন্য পূজা করা হইয়া থাকে, ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, আজও দাম্পত্য-প্রেমের পুনরুদ্ধার সাধন হয় নাই। পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং সভ্যতা, আর্য্য বিবাহ-প্রথাকে যে বড়ই কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতায় এসম্বন্ধে যে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, এক মুখে তাহা বলা যায় না। হা ভারত! হা দাম্পত্য-প্রেম! হা সতীত্ব! হা স্বামীত্ব!

বিবাহ-শিথিলতার আর একটী প্রধান কারণ, বাল্যবিবাহ, এবং বিবাহ-চাঞ্চল্য। মানুষের বাল্যলীলা দেখিয়া ভবিষ্য জীবন-গতি নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বাল্য-কালে শিশু বালক বালিকার মন অপরিপক্ক। অপরিপক্ক মন লইয়া যখন তাঁহারা অভিভাবকগণের উত্তেজনায় পরিণীত হয়, তখন বরকন্যা

পরস্পর পরস্পরকে একটী খেলার সামগ্রী মাত্র মনে করে। দেখিতে দেখিতে ভাল বাসা গাঢ় হইতে পারে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমমূলক। খেলার সামগ্রীর প্রতি যেমন ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা, বস্তুত এদেশের বালক বালিকারা সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা লইয়া জীবন পথে অগ্রসর হয়। তারপর যখন শরীরের সহিত মন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে মন মিলে না। উভয়ের জীবনগতি সময়ে সময়ে উভয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। পরস্পরের জীবন তখন পরস্পরের ভারস্বরূপ মনে হয়। এক জনের দায়িত্ব গ্রহণে অপরের আর অভিলাষ থাকে না। এদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা অবিরত শিক্ষা দিতেছে, ভাল না বাস, স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর। বিবাহ-ভঙ্গ প্রথা আর্য্য আইন-বিরুদ্ধ, সুতরাং তখন যুবক যুবতীরা মনে মনে মন ভাঙ্গিয়া আপন আপন স্বেচ্ছার পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। শুভ বিবাহে দারুণ গরল উৎপন্ন হয়। গৃহে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। স্বৈরিণীর দল পুষ্ট হয়। লম্পটতার পঙ্কিল স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। বাল্যবিবাহে দেশের এক বিষম অনিষ্ট সাধন করিতেছে। মন-মত বিবাহ না হওয়ার দরুণ বিবাহটা স্থানে স্থানে কেবল রিপু-সেবার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত, কোথাও বা গৃহ কার্য্যের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—ব্যভিচার বা রিপুদোষ। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রেমহীনতা। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—হৃদয়-হীনতা। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—পশুত্ব। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের অভাবে পিতা পুত্রকে ভালবাসে না, পুত্র পিতাকে নরকের দেবতার সহিত তুলনা করে, শ্রদ্ধা করে না, পূজা করে না। এই প্রকারে সমাজের পবিত্র স্বর্গীয় সম্বন্ধগুলি পর্য্যন্ত অপবিত্র রূপ ধারণ করিতেছে। ইহারই পরিণাম—গৃহ-বিবাদ, বা স্বার্থ-সাধনের জন্য আত্মীয়তা-বিসর্জ্জন। এ সকল যখন উপস্থিত হয়, তখন দেশ নরকের অভিনয় দেখাইয়া মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। তখন যে মানুষের চেহারা কি কদাকার হয়, মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

আর এক প্রকার বিবাহ-প্রথা সমাজে দেখা দিতেছে, তাহাকে বিবাহ চাঞ্চল্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বালকদিগকে একটু সতর্ক করিয়া দিয়াছে, বালকেরা সাধারণত আর ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহিত হয় না। ১৬ বৎসরের পর তাহাদিগের একটু রিপুচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে থাকে। এই সময়ে বিবাহের প্রস্তাব হইলে তাহারা হিতাহিত জ্ঞান-শূন্যের ন্যায় কেবল বাহ্য রূপ দেখিয়া মজিয়া পড়ে। ভিতরের গুণাগুণ বিচার নাই—বাহিরের রূপই এই সময়ে প্রধানত বিবাহের উপকরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৬।১৭ বৎসরের বালক মানসিক সৌন্দর্য্য কি বুঝে? আজন্মালম্বিত কৃষ্ণবর্ণ কেশবিন্যাস, গোলাপী ওষ্ঠ, উজ্জ্বল নাসিকা, ঈষৎ রক্তাভ ভ্রূ, মধুর কটাক্ষ, মধুর হাসি, হাসিতে অমৃত, অমৃতে কোমলত্ব, এই সকলই বালকের মন কাড়িয়া লয়। বালক তখন অধীর হইয়া পড়ে। শিক্ষা বা উন্নতির পথে অর্গল পড়িয়া যায়। শিক্ষালয় কর্কশ হইয়া পড়ে, গৃহ বা শ্বশুরালয় মধুর হইয়া উঠে। পত্রের পর মধুর পত্র প্রেরিত হইতেথাকে। এই প্রকার রিপু-চাঞ্চল্যে কত বালক যে অপাত্রীর

সহিত পরিণীত হইয়া শেষে অশ্রুপাত করিয়াছেন, কে তাহার গণনা করিতে পারে? যৌবন যখন ফাঁকি দেয়, চাঁদমুখ যখন নিষ্প্রভ হয়, সুধা যখন গরল হয়, অসময়ে সন্তান প্রসবে বালিকার সোণার রূপ যখন নিবিয়া যায়, হায়, হায়! তখন কত যুবক গৃহকে, স্ত্রীকে যে জীবনের ভার মনে করে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? মন তখন অন্যত্র গিয়া পড়ে, অন্য যুবতীর মধুর কটাক্ষ তখন বড়ই মিষ্ট!! এইরূপ বিরক্তি উদয়ে স্ত্রী এবং স্বামীর মন যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন ভালবাসা বিজলীর ন্যায় আকাশে বিলীন—মানুষ তখন পশু। বিবাহ তখন ভঙ্গ! বিষপ্রয়োগে তখন যদি স্ত্রীর বা স্বামীর প্রাণ বহির্গত নাও হয়, তবে অন্যবিধ গরল পানে হৃদয় যে পুড়িয়া ভস্ম হয়, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। এইরূপ বিচ্ছেদে কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়া গিয়াছে, কত সোণার অট্টালিকা পিশাচের নিবাস হইয়া রহিয়াছে! বঙ্গভূমি এইরূপ জীবন্ত পিশাচের লীলাখেলায় আজ মলিন! বঙ্গদেশ এইরূপ পিশাচের নৃত্যে আজ নিস্তেজ ও হীনপ্রভ!!

সামাজিক যত জটিল প্রশ্ন আছে, আমাদের মতে তন্মধ্যে বিবাহ-প্রশ্ন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই প্রশ্নের ভালরূপ মীমাংসার উপরই সমাজের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। দুই মিলিয়া একত্ব-সাধন, এ বড়ই শক্ত কথা। এই সাধনে অসিদ্ধিই যে বর্ত্তমান সমাজের হীনাবস্থা বা চরিত্রহীনতার প্রধান কারণ, এ কথা কাহার অস্বীকার করিবার যো নাই। অথচ অনেকেই এই বিষয়ে উদাসীন। কি উপায় ধরিলে, স্ত্রী ও স্বামীর একীকরণ সাধিত হইতে পারে, এ কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যত দিন সদুপায় আবিষ্কৃত না হইবে, ততদিন উচ্ছৃঙ্খল সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই।

আজ কাল মানুষ বড়ই স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা নহে—স্বেচ্ছাচারিতা। এই স্বেচ্ছাচারিতামূলক স্বাধীনতা প্রধান যুগে—বিবাহরূপ অধীন শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে এক শ্রেণীর লোকের মন চায় না। একথাও স্থানে স্থানে উঠিতেছে যে, বিবাহ-প্রথা তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছা-ভালবাসার প্রথা প্রতিষ্ঠিত কর। এ সকল পাশ্চাত্য কুশিক্ষার একদেশদর্শী মত সকলের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন করাই উচিত। এই দূষিত মতের আলোচনাতেও পাপ আছে। প্রেমশিক্ষা মানবের একমাত্র লক্ষ্য। প্রেম-বিকাশের প্রধান আশ্রয় পিতা মাতা, ভাই,ভগিনী, এবং সকলের উপরে স্ত্রী এবং স্বামী। এ সকল ভালবাসার উৎকর্ষ সাধন ক্ষেত্র—পরিবার। পশুসমাজে পরিবারের মধুরতা নাই। পশুসমাজে পুত্রই সময়ে মাতার স্বামী হয়। পিতা মাতা ভাই ভগিনী, স্বামী স্ত্রী—এ সকল মধুর সম্বন্ধই যদি উঠিয়া যায়, তবে মানুষের প্রধান লক্ষ্য, সমাজের মুখ্য পরিণাম—ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই সকল সম্বন্ধের মধুরতা—সম্পূর্ণরূপে বিবাহরূপ অধীন শৃঙ্খলে নিবদ্ধ। বিবাহরূপ অধীনতা মানিও না,—পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্বামী স্ত্রী—এ সমস্ত সম্বন্ধ তখন ছিন্ন;—তখন মানুষে আর পশুতে কোনই পার্থক্য নাই। এই সকল ঘৃণিত অসার কথার আর অধিক সমালোচনা করিতে চাহি না,

আমরা এই পর্য্যন্ত বলি, যে কারণে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিবাহ প্রথা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, সেই সকল কারণ আমাদের দেশে উপস্থিত হইলে, এ দেশের দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। হতভাগ্য ভারতের দুর্দ্দিন আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে।

স্বেচ্ছাচারমূলক স্বাধীনতার কথা, পরিবার বা সমাজ গঠনের পক্ষে বড়ই প্রতিকূল। স্ত্রীত্ব বা স্বামীত্ব—ইহার মূলেই অধীনতা। যত অধীনতা—যতই সম্বন্ধের মধুরতা বৃদ্ধি। প্রেমের বিকাশ কেবল—অধীনতায়। অধীনতায় যে বিষ দেখে, সে ত দাম্পত্য প্রেমকে নরকের জিনিষ মনে করিবেই; তাতে কেন কুণ্ঠিত হও? প্রেমের মূলেই অধীনতা। নির্ভর এবং বিশ্বাসই অধীনতার প্রাণ। যেখানে বিশ্বাস এবং নির্ভর নাই—সেখানে অধীনতা নাই, সেখানে প্রেমও নাই। ভালবাসা দাসত্ব বই আর কিছুই নয়। মা সন্তানকে ভালবাসে, তার অর্থ কি, তা জান?—তার অর্থ, আপনাকে ভুলিয়া সন্তানের জন্য খাটিয়া খাটিয়া দেহ বিসর্জ্জন দেওয়া। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, তার অর্থ কি, জান? অর্থ, স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীর প্রাণ বিসর্জ্জন। অধীনতা ভিন্ন প্রেম নাই। ভগবৎ-ভক্তি—সেও অধীনতা, স্বামী-ভক্তি, সেও অধীনতা, মাতৃ-ভক্তি সেও অধীনতা, সমাজ ভক্তি, সেও অধীনতা, দেশ ভক্তি, সেও অধীনতা। "আমি তোমারি তুমি যা বলিবে, প্রাণ দিয়াও তাহা করিতে পারি" এ ভাব না হইলে ভালবাসার অঙ্কুরই হয় না। রাধিকার প্রেম দেখ। রাধিকা কলঙ্কিনী, তার কুল নাই, মান নাই, জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, শ্যামের জন্য সর্ব্বস্ব সে ঢালিয়া দিয়াছে। রূপের জন্য নহে—গুণের জন্য। বাঁশরীর স্বর—রাধার প্রাণে সদা বাজিতেছে, সে আর কত স্বর শুনিয়াছে, কিন্তু ঐ শ্যামবাঁশরীর মধুরধ্বনি কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই। আর কিছুতেই তার মন নাই, আর কিছুই সুন্দর নয়। ঐ স্বরই সে শুনিবে, ঐ চরণেই সে পড়িয়া মরিবে। মার, কাট, যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই শ্যাম-প্রণয়ের বিরাম নাই। কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ গান—কৃষ্ণ-জীবন রাধিকার। প্রেমের টানে রাধার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জিত হইয়াছে। এই গভীর ভালবাসার আধ্যাত্মিকতা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ভগবানের উপর যখন এই রূপ প্রেমের উদয় হয়, তখন মানুষ দেবতা হয়, তখনই প্রকৃত ভক্তির অভ্যুদয় হয়। এক প্রেমের জন্য রাধিকা কলঙ্কিনী, টাকার জন্য নয়, যশের জন্য নয়,—মানুষের একমাত্র লক্ষ্য মধুর প্রেমের জন্য রাধা মজিয়াছে, ডুবিয়াছে, কুল ছাড়িয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচার হইয়াছে। মহাদেব এবং ভগবতীর প্রেমের ভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, প্রমীলা, বেহুলা ও মন্দোদরী প্রভৃতি মহিলাগণের সতীত্ব বা গভীর প্রেমের ইতিহাস এখনও উজ্জ্বল। মরণের ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই—অরণ্যের ভয় নাই—স্বামীর জন্য সতী অভয়া। স্বামী নখিন্দরের মৃত শরীর লইয়া সতী বেহুলা অকূলে ঝাঁপ দিয়াছেন, স্বামীকে বাঁচাইবেন, তবে ছাড়িবেন। ক্রমে মৃত শরীর পচিয়া উঠিল, কৃমি কীট জন্মিল, কিন্তু বেহুলা-প্রেম তবুও অবিচলিত। সীতা, দময়ন্তী ও সাবিত্রীর কথা আর কি তুলিব! তাঁহারা

ত যমকেও ভয় করেন নাই! স্বর্গ, তুমি এই খানে। স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ তখনই, যখন প্রণয়ে স্বার্থ নাই। ভারতে আর কি সে স্বর্গের আবির্ভাব সম্ভব হইবে না? প্রতিধ্বনি একথার উত্তর দিতে অসমর্থ।

স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, যতদূর সম্ভব, পঙ্কিল হইয়া গিয়াছে! রিপুর উত্তেজনা নিবিয়াছে ভালবাসা বাড়িয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, কিন্তু ভালবাসা সজীব হইতেছে, এ দৃশ্য আজ কাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়-যোগ ভুলিয়া যাও, স্ত্রী এবং স্বামীর সম্বন্ধ যেন আর নাই! চতুর্দ্দিকে এইরূপ দৃশ্য! এই যে স্বার্থ-মূলক, ইন্দ্রিয়মূলক প্রণয়, ইহাকে কখনই প্রেম বলিয়া ভুল করিও না। ইহা আসক্তি, ইহা মোহ, ইহা নরক, ইহা পশুত্ব। সংসারে পশুত্বের অভিনয়—প্রেমহীন রিপু পরিচালনায়। প্রেমের বিকাশ মানুষের লক্ষ্য, কিন্তু রিপুর বিকাশ নয়। রিপু দু দশ দিনের বই নয়। প্রেম অনন্ত কাল স্থায়ী। অনন্ত স্থায়িত্বের সহিত ক্ষণস্থায়িত্বের কিছু যোগ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু ক্ষণস্থায়িত্বই লক্ষ্য নয়। স্ত্রীত্ব ও স্বামীত্বের লক্ষ্য—অনন্ত প্রেম-সাধন। যে প্রেম নিতি নিতি নূতন হয়, যাহাতে পুরাতনত্ব নাই, সেই অনন্ত প্রেম সাধন। যেখানে এ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, মানুষ সেখানে পশু, পরিবার সেখানে নরক। সেখানে মানুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্ব রাজত্ব করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধ রিপু-পরিচালনার উপকরণ বই আর কিছুই নয়। এই পশুত্ব সমাজে প্রশ্রয় পায়, ইহা কখনই সঙ্গত নয়। এই পশুত্বের স্রোত প্রতিহত করিবার মানসে যাঁহারা বিবাহ-বন্ধ-ব্রত বা কুমারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ, স্বীকার করি; কিন্তু মহৎ নয়। এই সৎ ব্রত গ্রহণ করিলেই সমাজ পবিত্র হইবে না। বরং আরো উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে। বিবাহ প্রথা যাহাতে দাম্পত্য প্রেম সাধনার উপযোগী হইতে পারে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহারাই সহায়তা করা উচিত। বিবাহরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইলে প্রেম শিক্ষা একরূপ অসম্ভব; সুতরাং ইহাকে ঘৃণার চক্ষে বা উপেক্ষার চক্ষে না দেখিয়া ইহাকে সংশোধন করা উচিত। বিবাহের মূলে বিশ্বশক্তি বিকশিত, তাঁহাকে ভুলিয়া প্রেম সাধন হয় না। স্ত্রী এবং স্বামীর মনকে বিশ্বশক্তিতে মজাইয়া দেওয়া চাই। সেই শক্তিতে ডুবিতে না পারিলে মানুষের সাধ্য কি, রিপু ভুলিয়া প্রেমের সেবা করিবে? সেই প্রেমই আসল প্রেম, দাম্পত্য প্রেম,যাহার লক্ষ্য সেই শক্তি। সেই প্রেমের সাধনায় জয়ী হইলে রিপু পরিচালনা হয়, হউক; কিন্তু প্রেমের পূর্ব্বে রিপুর কথা উঠিলেই বিপদ। প্রেম, বাহ্যরূপ চায় না। প্রেম সেই ভিতরের রূপ বা অনন্ত সৌন্দর্য্য-পিপাসিত। ভিতরের শক্তি ভুলিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিবাহ যত দিন নিবদ্ধ, ততদিন প্রেমের জন্য মানুষ বিবাহিত হইতেছে না, নিশ্চয় বুঝিবে। যে যুবক কেবল বাহিরের রূপ দেখিয়া মজিতে চায়, সে ধর্ম্ম বা নীতি, প্রেম বা পুণ্য, এ সকলের কিছুই ধার ধারে না। সে কেবল পাশব বৃত্তি পরিচালনা করিতে চায়। এরূপ বিবাহ পশুত্বেরই প্রশ্রয় দেয়। এরূপ বিবাহের পোষকতা করা কখনই উচিত নয়। দাম্পত্য প্রেমের পরিচয় যে বিবাহে পাওয়া যায় না, যে বিবাহের মূল লক্ষ্য,

ধর্ম্ম সাধন নয়, সে বিবাহে কৃতী লোকের যোগ দেওয়া উচিত নয়। রূপজ-মোহ বড়ই অনিষ্টজনক। হায়, আমি কত বন্ধুকে যে এই মোহে পড়িয়া প্রাণ বা মনুষ্যত্ব হারাইতে দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, পৃথিবীর নরনারী তাহার কিছুই জানে না। বড় বড় পণ্ডিতের পতন হইতেছে, এই রূপজ-মোহে। দিনে দিনে কত মহত্ব, কত হৃদয়ত্ব, কত মনুষ্যত্ব—এই মোহে যে ডুবিয়া যাইতেছে, কে গণিতে পারে? কত দেবত্ব পশুত্বে পরিণত হইয়া যাইতেছে, এই রূপজমোহের ছলনায়। অতএব সাবধান, আপনার জন্য সাবধান, সমাজের জন্য সাবধান! ভাই, আপনি মজিও না, সমাজকেও মজাইও না প্রেমের পথে যাইতে চাও, ভাল কথা, অগ্রসর হও; কিন্তু আপনাতে ডুবিয়া পরীক্ষা করিয়া লইও, রিপু এবং বাহ্যরূপ ভুলিতে পারিতেছ কি না, পরীক্ষা করিবে—স্বার্থের অঙ্কুর ডুবাইতে পারিয়াছ কি না, পরীক্ষা করিবে, বিশ্বশক্তিকে রমণীর হৃদয়ে দেখিতে পারিতেছ কি? যদি না পারিয়া থাক, অগ্রসর হইও না। বিসর্জ্জন না দিলে, জীবন পাইবে না। স্বামীত্বকে ডুবাইতে না পারিলে স্ত্রীত্বে মিশিতে পারিবে না। স্বামী, আপনার মহত্বে কেবল স্ত্রীর মহত্ব বসাইবেন। স্ত্রী আপন গুণ ভুলিবেন, কেবল স্বামীর গুণ দিবানিশি স্মরণ করিবেন। স্বামীত্ব, স্ত্রীত্বে এবং স্ত্রীত্ব স্বামীত্বে যখন ডুবিবে, তখনই একাত্মক প্রেম উদ্ভূত হইবে। তাহাই স্বর্গের মন্দাকিনী। তাহাই সংসারে শান্তি সলিল, তাহাই মানুষে অমিয়া ধারা। তাহাই মানুষের লক্ষ্য। তাহারই ভিতরে বিশ্বপতি মাতৃরূপে বিরাজিত। যদি ভাই, এরূপ প্রেমের অঙ্কুর হৃদয়ে দেখিতে না পাইয়া থাক, সাবধান,—সাবধান! সন্তান উৎপাদন—প্রেমের ফল না হইয়া যখন রিপুর ফল হয়, তখন মাতৃ ভক্তির স্থানে সন্তানের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এই ঘৃণার উদ্রেকের সহিত মাতার মাতা পরম মাতার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। জগৎ আপনি উদ্ভূত হইয়াছে, হইতে পারে, এই বিশ্বাসই সন্তানের মনে তখন জাগ্রত হয়। এইরূপ অবস্থায় বিশ্বাসহীনতা, প্রেম-হীনতা যে কতদূর প্রশ্রয় পায়, তাহার পরিচয় আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ সমূহ। ধর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ কোথায় রিপুকে আরো ভুলিবে, আরো ভুলিবে, না দিন দিন আরো আটিয়া ধরিতেছে। এক একজন লোকের দশ পনরটী সন্তানই উৎপন্ন হইতেছে! এক বিবাহের পর পর কত বিবাহই হইতেছে! অথচ দাম্পত্য-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। স্ত্রীবিয়োগে অমনি দশটী সন্তান লইয়া পিতা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতেছেন! কোন কোন সমাজে দশটী সন্তান লইয়া বিধবা স্ত্রীও দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতেছেন। মুসলমান সমাজের দুর্গতি, এবং পাশ্চাত্য সমাজ সমূহের শিথিল অবস্থা যখন স্মরণ হয়, তখন শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে;—বিধবা বিবাহের পক্ষে আর কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। মূল কথা, স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধে যতদিন সংসারের মাটীর জিনিস, রিপুর উত্তেজনা থাকিবে, ততদিন কিছুতেই সংসার মধুময় হইবে না। বাল্য-বিবাহ যে কারণে দোষের, যৌবন চাঞ্চল্য-বিবাহও সেই কারণে দোষের। সমাজের বিবাহ প্রথার আমূল সংস্কার

প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ থাকিতে দাম্পত্য-প্রেম মূলক বিবাহ অসম্ভব, ইহা এক শ্রেণীর লোকের চিন্তা করা উচিত; রূপজ মোহ থাকিলে যৌবন-বিবাহ বিঘ্নকারক, ইহাও আর এক শ্রেণীর লোকের চিন্তার বিষয়। ধর্ম্মের টানে, ধর্ম্মের মায়ায় মোহিত হইয়া যতদিন স্ত্রী পুরুষে মিলিতে না পারিবে, ততদিন বিবাহে কেবল গরলই উৎপন্ন হইবে। স্ত্রীত্ব এবং স্বামীত্বের মূলে সংসারের অতীত কিছু বিদ্যমান। সেই অতীত কিছুর পানে দৃষ্টিকে না ফিরাইয়া যাহারা সংসারের চোক লইয়া ওদিকে চাহিবে, এবং মজিবে, তাহারা আপনারা ত গেলই, সমাজকেও ডুবাইয়া যাইল। স্বামীর ভিতরে, স্ত্রী যদি স্বামীর স্বামীকে না দেখেন,তবে প্রকৃত স্বামী-সেবা অসম্ভব; আর স্বামীও যদি স্ত্রীর হৃদয়ে শক্তি-রূপিণীকে না দেখেন, তবে স্ত্রী-সেবা আরো অসম্ভব। উভয়ের মূলে যে অদ্বিতীয় শক্তি বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করা চাই, নচেৎ বিবাহ নরক। উভয়ের মধ্যে স্বর্গের অমিয়া ধারা ঢালিয়া রাখিয়া যিনি পরস্পরকে বাঁধিতেছেন, মিলাইতেছেন, তাঁহাকে যে না দেখিল, তাঁহার এ পথে আসা বিড়ম্বনা মাত্র। এই মিলনের মূলে স্বয়ং মা বিদ্যমান। দুটী নদীকে মিলাইয়া এক করেন—তিনি। তাঁহারই অজস্র করুণা প্রবাহ এখানে প্রবাহিত। তাঁহার করুণাতেই স্বামী স্ত্রীর উপযোগী, স্ত্রী স্বামীর উপযোগিনী,—হৃদয়ে হৃদয়, চখে চখে, প্রাণে প্রাণ। একের কোলে অপরের মাথা, একের দেহে অপরের দেহ। একের জীবনে অপরের জীবন। স্বাধীনতায় অধীনতা, জ্ঞানে প্রেম, প্রেমে কর্ম্ম। মিলন, মধুর মিলন। বিবাহ—মধুর বিবাহ। এই রূপ স্বর্গের দিকে চক্ষুকে ফিরাইয়া মাকে স্মরণ করিয়া, স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ যখনই লক্ষ্য পথে, এই বিধানের মধ্যে পা ফেলিতেছে, তখনই স্বর্গ হইতে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। মধুর উলুধ্বনিতে দেশ পূর্ণ হইতেছে—প্রেমের সঙ্গীতে ধরা প্লাবিত হইতেছে। বিশ্ব পুরোহিত দুই ঝরণা মিলাইয়া এক করিয়া দিতেছেন। এই আদর্শ বিবাহ যাহাতে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণপণে সকলের সে জন্য চেষ্টা করা উচিত। রিপু বিবাহ যাহাতে দেশে প্রশ্রয় না পায়, তজ্জন্যও সকলের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। বিবাহ যদি স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকের চিত্রই আঁকিল, তবে সে বিবাহে প্রয়োজন কি? বিবাহ যদি দাম্পত্য প্রেমের ঘোষণা না করিয়া স্বেচ্ছাচারের বিজয় নিশান উড়াইয়া দেশকে রিপু প্লাবনে ডুবাইতে লাগিল, তবে সে বিবাহের কে আদর করিবে? দেশ ডুবিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিথিল-বিবাহ প্রথা বঙ্গ সমাজের অণুতে অণুতে প্রবেশ করিয়াছে। রিপুর অত্যাচারে পুরুষ এবং স্ত্রী পশুত্বে পরিণত হইয়াছে। হায়! সোণার ভারতের আজ কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে! ব্যভিচার প্রণয়ের নামে বিক্রীত হইতেছে, বহুবিবাহ দাম্পত্য-প্রেমের নামে ঘোষিত হইতেছে। ধর্ম্মের পুণ্য প্রবাহে দেশ আমূল ধৌত না হইলে, এই পঙ্কিল সমাজের উদ্ধারের আর উপায় নাই। যত দিন পর্য্যন্ত ভারতসন্তান ধর্ম্মে অনাস্থাবান, ততদিন সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। ভগবান এই পতিত সমাজের উদ্ধার করুন।

নব্যবঙ্গ। (৪র্থ)

ভারতে অল্প দিন পরেই বাঙ্গালী একটা জাতির মত জাতি হইবে, বাঙ্গালা ভাষা একটা ভাষার মত ভাষা হইবে, বঙ্গীয় নব ধর্ম্মের জ্যোতিতে সমস্ত জগৎ নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবে। একথা এখন স্বর্ণাক্ষরে প্রস্তর ফলকে খোদিয়া দেওয়া যাইতে পারে। চির দিনই জ্ঞান, প্রতিভা, এবং কুসংস্কার-বর্জ্জিত ধর্ম্ম যাঁহাদের জীবনে থাকে, তাহারাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ইহা অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়তির অন্তর্গত। অনেকে পাশববলের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কিলাইয়া কাঁটাল কখনই পাকান যাইবে না, গঙ্গাকে কখনই উজান বহাইয়া হিমালয়ে তোলা যাইবে না, বাঙ্গালী পাশববলে কখনও অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে না। তবে দীর্ঘ জীবন ও সুস্থদেহ লাভের জন্য শারীরিক ব্যায়ামাদির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তজ্জন্য এসকলের চর্চ্চার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু পাশববলে আমরা কখনও শ্রেষ্ঠ হইব না। যে যুগ আসিতেছে, ইহাতে জ্ঞান ও মনের তেজেরই মূল্য অধিক হইবে। মনে বল ও বুদ্ধির একত্র সমাবেশ হইলে, এই কৌশল-প্রধান যুগে যুদ্ধাদিতে জয় লাভ করাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। যাহা হউক, এই বর্দ্ধনশীল নবতরুর মূলে জল সেচন না করিয়া, মরুভূমিকে বাগানে পরিণত করিবার চেষ্টা কখনই সঙ্গত নয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গালার উন্নতিই এখন প্রধান কার্য্য। সুতরাং এদিক দিয়াও সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলনাদির জন্য ইংরেজি পত্রিকাদি বাহির করিবার প্রয়োজন দেখিতেছিনা। কিন্তু পর জাতীয় ভাষার প্রতি যে এত বৃথানুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাও বর্ত্তমান নিভাজ বিজাতীয় শিক্ষা লাভেরই ফল। এই জন্যই এই সকল কথা লইয়াই বিস্তৃত রূপে আন্দোলন করিয়াছি।

ইংরেজি শিক্ষার আর একটী ফল, দেশীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা সঞ্চার। এই রূপ ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশীয় লোকের লিখিত বিজাতীয় ভাব ও ভাষাপূর্ণ গ্রন্থে দেশীয় রীতি নীতি ও ধর্ম্মের ছায়া কিছুই থাকে না। বরং সর্ব্বদা তদ্বিপরীত ভাবের কথা বার্ত্তাই থাকে। আবার যাঁহারা শিক্ষক হন, তাঁহারা হয় বিদেশীয়, না হয় বিদেশের শিক্ষায় শিক্ষিত লোক। ইঁহাদের মৌখিক উপদেশ এবং চরিত্রেও দেশীয় কিছুই শিখিবার থাকে না। ইহাতে আমাদের সমাজ মধ্যে বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ভাব প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্ম সাধন, জীবনের উচ্চ লক্ষ্য-পথ নির্ণয় করা ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ কথা দূরে থাক্, আদবে ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্ম পিপাসাই মানুষের কমিয়া গিয়াছে। দেশময় একটা কঠোর রুক্ষতার স্রোত আসিয়া পড়িয়াছে। এই রুক্ষতার সমাজ মধ্যে যে সকল ফলোৎপাদন হইয়াছে, তাহা প্রথম প্রস্তাবের প্রথমাংশ হইতে প্রায় শেষ ভাগ পর্য্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি। ভাগ্য ক্রমে আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা প্রণালীতে যথোচিত নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন। বস্তুত কোন রকম সাম্প্রদায়িকতাই শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্যের

মূলে থাকা সুসঙ্গত নয়। এ বিষয়ে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী বড়ই সুন্দর। কিন্তু এখনকার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন প্রণালী এবং পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী কোন প্রকারেই উৎকৃষ্ট নয়। পাঠ্য গুলিতে হৃদয়াদির সর্ব্বাঙ্গীন পরিচালনা, সুরুচি ও সাধুতা বুদ্ধির উপকরণ অত্যল্পই থাকে। যাহা থাকে, তাহাও আমাদের প্রকৃতির অনুপযোগী বিদেশীয় আকারের। বস্তুত পাঠ্য পুস্তক গুলির প্রকৃতি দেখিলেই বোধ হয় যেন লোক গুলিকে আফিষ ও বিদ্যালয়াদির কর্ম্মের উপযুক্ত করাই তাহার আসল উদ্দেশ্য। পরন্তু যে জাতিকে শিক্ষক ও পরিচালক মনে করিয়া তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতেছি, তাঁহাদের প্রকৃতি অতি সাংসারিক। ব্যবসা বাণিজ্য, কলকৌশল, বাহিরের জ্ঞান বিজ্ঞান এই সকলই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বাদি সম্বন্ধে ভুক্ত-ভোগি-জ্ঞান সাতিশয় কম। হিন্দু জাতির বিশেষ উত্তেজনার ক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করা অভ্যাস। আর পাশ্চাত্য সভ্যজাতি মাত্রেরই রাজনীতি, সমাজ নীতি, এমন কি, ধর্ম্মনীতি পর্য্যন্ত সাংসারিক সুবিধার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ পলিচি (Policy) নামক স্বার্থাভিসন্ধির উপরে স্থাপিত। সুতরাং এশিক্ষায় ভারতীয় হিন্দু জাতির সহস্র সহস্র বর্ষের চেষ্টার ফল জীবন-ব্যাপী আধ্যাত্মিকতা একবারেই বঙ্গবাসীর জীবনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। অথচ পাশ্চাত্য ধর্ম্মালোক হিন্দু সন্তানের নিকট অধিক মনোহর হইতে পারে নাই। এই জন্য দলে দলে লোক শিক্ষার দোষে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হইতেছিল। কতকগুলি ধর্ম্ম-পিপাসু লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে উদ্যোগী হইতেছিল। রামমোহন রায়ের ধর্ম্মান্দোলন বঙ্গদেশকে এই উভয় বিভীষিকা হইতেই কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আজ কাল বঙ্গদেশময় যে ধর্ম্মান্দোলন চলিতেছে, এ সকলই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্য ও জীবনের ফল। রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধেও দিন দিনই যে বঙ্গদেশ, বঙ্গসমাজ আমূল বিলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, ইহাও সেই মহাত্মারই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। এমন কি, প্রাচীনতা-রক্ষা এবং সংস্কার-পক্ষপাতী যে দুইটী নবদল একই উদ্দেশ্য মূল মন্ত্র করিয়া বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উভয় দলেরই প্রকৃত পরিচালক মৃত রাজা রামমোহন রায়। নব্যবঙ্গের এই নবীন মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত না হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পরিবর্ত্তন-প্রবণ কোমল প্রকৃতি বাঙ্গালী জাতির কি দুর্গতি হইত, কে জানে? কেবল বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতের শিক্ষিত লোকের নিকট এবং পৃথিবীর সুদূরসভ্যজনপদ সমূহে এই শুভ সমাচার উপস্থিত হইয়াছে। রামমোহনকে কালে বঙ্গবাসী দেবতার মত উচ্চ আসন দিয়া মানব-গৌরবের প্রকৃত পূজা করিবে। যাহা হউক, পাঠ্য পুস্তক গুলি যেমন এই সকল অনিষ্ট নিবারণের উপযোগী নয়, তেমনই পঠনার্থীর রুচি ও প্রকৃতির অনুযায়ীও নয়। বরং অনেকের পক্ষে অনেক বিষয়ই সাতিশয় কর্কশ বলিয়া ছাত্রগণ তাহাতে প্রকৃত অধিকার লাভ করিতে পারে না; তাহাতে আবার কার্য্যত শিক্ষা না হইয়া কেবল কল্পনার শিক্ষাই হয়। ইহাতেও

অভিজ্ঞতার বাস্তবিক হানি হয়। কিন্তু অভিজ্ঞ হও আর না হও, পরীক্ষার কোন একটী বিষয়ে উত্তীর্ণ না হইতে পারিলেই তোমার জীবনের আশা ভরসার অবসান হইল! বস্তুত অন্যান্য সাধারণ শিক্ষা উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া যে বিষয়ে যাহার রুচি আছে, বুদ্ধি খেলে, সেই বিষয়ে তাহার পরীক্ষা লইয়া তাহারই উচ্চ প্রশংসাপত্র তাহাকে দান করা উচিত। অথবা বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রণালীর অনুসারেও যে বিষয়ে যে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাকে সেই সেই বিষয়ের চর্চ্চা করিবার অবসর দেওয়া উচিত। কিম্বা পুনর্ব্বার পরীক্ষা গ্রহণ সময়ে কেবল যে বিষয়ে যে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, শুধু সেই বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করাই বিধেয়। ইহাতে শিক্ষার্থী মাত্রেই বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অধ্যয়ন কার্য্যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কতগুলি কর্ম্মচারী প্রস্তুত করিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিলে, অবশ্যই উত্তীর্ণ করিতে কড়াকড় নিয়ম জারি করিয়া চলিবেন। কিন্তু দেশীয় বিদ্যালয় সমূহ সাহসের সহিত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরীক্ষাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগ করুন।

* * * *

বাস্তবিকই কি বিদেশীয় শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচলিত না থাকাই উচিত? বস্তুত ইহা বাতুলের কথা মাত্র। দেশীয় ভাষাকে বলিবার ও লিখিবার যন্ত্র করিয়া নানা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা না করিলে কখনও জাতির বা ভাষার প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। অবশ্যই রাজকীয় জাতির ভাষা ইংরেজিই সমস্ত বিদেশীয় ভাষার মধ্যে আমাদের শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধাজনক এবং তাহাতে অধিক পরিমাণে স্বার্থও আছে। এই জন্য দেশ মধ্যে ইংরেজির অধিক চর্চ্চা অনিবার্য্য। আবার ইংরেজির মত সুন্দর ভাষার আলোচনাতে আমাদের উপকারও কমাইবার কথা নয়। বাস্তব পক্ষে ইংরেজি ভাষাই আমাদিগকে জাগ্রত করিয়াছে। পুনশ্চ ইংরেজি আমাদের নিকট অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মান, রুসিয়ান এবং চাইনিজ প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের জীবন্ত জাতি সকলের ভাষাও বিশেষরূপে শিক্ষা ও আলোচনা করা আমাদের উচিত। যদিও ইংরেজি ভাষা অনেক জাতির জ্ঞান ও চিন্তার ফল কিয়ৎ পরিমাণে বহন করিয়া আনিয়া আমাদিগকে উপহার দিতেছে, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সকল জাতির বিবরণ জানা এবং তাহাদের চিন্তা ও জ্ঞানাদির সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের অতি গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। জর্ম্মান পণ্ডিতদিগের প্রসাদে এবং ইংরেজ পণ্ডিতগণের অনুগ্রহে সংস্কৃত চর্চ্চাও আমাদের মধ্যে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইতেছে। এই সংস্কৃতের চর্চ্চা দিন দিনই যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহা করা উচিত। তবে বাঙ্গালাতে সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের বিশুদ্ধতর অনুবাদ হইলেও এই প্রকার প্রাচীন মৃত ভাষার আলোচনা সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হইবে এবং তৎসঞ্চিত জ্ঞান লাভ করিতেও অযথা সময় নষ্ট হইবে না। এই রূপে দেশ মধ্যে যাহাতে নানা ভাষার আলোচনা হয়, দেশীয় শিক্ষিত ও ধনী লোকদিগকে এজন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। দেশীয় প্রধান প্রধান বিদ্যালয় সমূহে এই সকল বিদেশীয় ভাষার সমুচিত চর্চ্চার সুন্দর উপায় খুলিয়া

রাখা বিধেয়। নতুবা জাতিটা কেবল ইংরেজের মাছী মারা নকলনবিস হইয়া উন্নতির পথ হইতে নামিয়া পড়িবে। বর্ত্তমান সময়ের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা শীঘ্রই কমাইয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত। নব্যবঙ্গ ভূত অথবা বর্ত্তমানের বিদেশী কাহারও নকল ফটোগ্রাফ খানি হইবে না। নব্য বঙ্গ নব কার্য্য-ভার লইয়া নবীন রূপে জগতে অবতীর্ণ হউক্; ভগবান এই আশীর্ব্বাদ করুন।

যাহা হউক, কথা প্রসঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার অনেক দোষগুণ বিচার করিলাম। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু সন্তানের মধ্যে মধ্যবিৎ শ্রেণী থাকাতেই ইহারা দলে দলে ইংরেজি শিখিয়া বঙ্গবাসী হিন্দুর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। মুসলমান সমাজে এই মধ্যবিৎ লোকের অত্যন্ত অভাবই তাহাদিগকে এ যুগে মূর্খ করাইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্ম সংস্কারের অন্ধতা ও গোঁড়ামীও দ্বিতীয় কারণ। তবে বঙ্গদেশে আঢ্য ও ভদ্র মুসলমানের সংখ্যা বড়ই কম। যে সকল কৃষক শ্রেণীর মুসলমান বঙ্গদেশের অর্দ্ধাংশের অধিক স্থান ব্যাপিয়া বাস করিতেছে, তাহারা প্রায় সকলেই ভদ্র হিন্দু সন্তানগণের বশীভূত এবং তাঁহাদেরই পরামর্শানুসারে প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই পরিচালিত হয়। এই কারণে সমগ্র ভারতে হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ যেমন একটা ভয়ঙ্কর উন্নতির অন্তরায়, বঙ্গদেশে তেমন নয়। শিক্ষিত হিন্দুগণ উদারতা সহকারে কিছু দিন সাধু উদ্দেশ্যে খাটিতে পারিলেই বঙ্গের মুসলমানগণকে হাত করিয়া সমস্ত বাধা বিঘ্ন নিবারণ করিতে পারিবেন। আবার ইংরেজের কোন প্রকার কুটিল রাজনীতিও এই অশিক্ষিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে হিন্দুর প্রীতি অদ্যাবধি বিদ্বেষপরতন্ত্র করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু সন্তানগণ যদি এখন হইতে মুসলমানের সুখ দুঃখের সহিত কার্য্যত আপনাদের সুখ দুঃখ মিশাইয়া তাহাদের প্রতি অনবরত সদাচরণ ও বন্ধুতা দেখাইতে পারেন, তবে অল্পকালের মধ্যে আশার অতীত ফল ফলিবে। সুতরাং যেরূপেই হউক, নব্যবঙ্গে হিন্দু সমাজই পরিচালক এবং ক্ষমতাবান। এই জন্য এখন মুসলমান সমাজের কথা রাখিয়া—কেবল হিন্দু সমাজেরই আলোচনা করিব। বঙ্গের হিন্দু সমাজই ভারতের আশা। নব্যবঙ্গ বলিতে বর্ত্তমানে হিন্দুনিবাস বঙ্গকেই বুঝায়। নব্য বাঙ্গালী বলিতে এখনও হিন্দু বাঙ্গালীকেই বুঝায়। মুসলমানকে তাহার অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। যেন হিন্দুসমাজের প্রকৃত উন্নতি ও শিক্ষার উপরেই বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি এবং শিক্ষা নির্ভর করিতেছে।

নিবিষ্টচিত্তে কিছুকাল আলোচনার পরে সহজেই প্রতীত হইবে যে, পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসমান নব্যবঙ্গে হিন্দু সমাজের মূল বন্ধনে ঘোরতর শিথিল ভাব উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকটে ইহা একটী পুরাতন কথামাত্র। সুতরাং এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলে, ততদূর চিত্তাকর্ষক হইবে না। যাহা হউক্, এই ধ্বংশাবশিষ্ট বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ, বলিতে গেলে, যেন শতধা বিভক্ত হইয়া, নানা শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ততদূর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনায় বিশেষ ফল হইবে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। স্থূলত বঙ্গে হিন্দু সমাজ মধ্যে

এখন দুইটী সম্প্রদায় দেখা যাইতেছে। প্রথম—প্রাচীন সম্প্রদায়। দেশের ভদ্রাভদ্র প্রায় সমস্ত নর নারীই এই সম্প্রদায় ভুক্ত। হিন্দু সমাজের হিন্দুত্ব যাহা কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবে অবশিষ্ট আছে, তাহা এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। হিন্দু সমাজ বলিলে, এখন হইতে নব্যবঙ্গের হিন্দু সমাজই বুঝিয়া লইতে হইবে। যাহা হউক্, দেশের প্রায় সমস্ত হিন্দুরমণী এবং নিম্ন শ্রেণীব জনগণ ও ভদ্র বংশীয় পুরুষগণেরও অধিক সংখ্যক মানুষই এই সম্প্রদায় ভুক্ত। দেশের হিন্দু মুসলমান সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এবং ভদ্র বংশেরও প্রায় সাড়ে পনর আনা নরনারী প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। স্থূল কথা, এই মৃতপ্রায় জনসমাজে যাহা কিছু সামাজিক আধিপত্য আছে, তাহা এই প্রাচীন সম্প্রদায়েরই আছে। "ইয়ঙ বেঙ্গল" বা নব্যবাবুগণ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানে স্ফীত হইয়াও সময় সময় আপনাদের মতামত, এমন কি, বিবেক, বুদ্ধি, বিশ্বাস পর্য্যন্ত পায়ে দলিত করিয়া, দলে দলে এই ভগ্নপ্রায় সমাজ শক্তিরই চরণাশ্রিত হইতেছেন। সর্ব্বদা কি দেখিয়া থাকি? আজ দেখিলাম, একজন যুবক শিক্ষার জ্যোতি পাইয়া, সাম্য, একেশ্বরবাদ, সমাজ সংস্কার বলিয়া সচীৎকারে গগন মেদিনী কাঁপাইতে ছিলেন। বোধ হইল যেন, সত্য সত্যই এ দুর্দ্দিন-আঁধারে এক "অগ্নিময় জলন্ত পুরুষ" স্বর্গের সমাচার বহন করিয়া বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেন ইনিই এ পতিত দেশটাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিবেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে একি হইল? সে জলন্ত অগ্নিস্তম্ভ, হঠাৎ যেন কি রূপে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল? যে এইমাত্র সাম্যের কথা বলিতেছিল, সে যে এখন ঘোরতর বৈষম্যবাদী হইয়াছে! যে একেশ্বরবাদের সমাচার বহন করিয়া সর্ব্বত্র ফিরিতেছিল, সে যে এখন ভয়ানক পৌত্তলিকতার গোঁড়া! যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সত্যকে প্রাণের ভূষণ করিবে, বিবেককে যে আপনার রাজা করিবে, সে যে এখন ঘোর কপটতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনাকে হৃদয়ের মাণিক্য, অঙ্গের অলঙ্কার করিয়াছে! চিন্তাশীল, বলুন ত, কোন্ মন্ত্র, কি শক্তি এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিল? এ কথার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি "সেই প্রাচীন ভগ্ন বিশিষ্ট সমাজ শক্তির বিন্দু-কটাক্ষে এই ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।" বস্তুত নব্য বাবুগণ, যতই শিক্ষা ও জ্ঞানের অভিমান করুন না কেন, সমাজ-শক্তি এখনও তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। এই শক্তি তাঁহাদের হাতে অর্পিত হইলে, আপাতত ভাল কি মন্দ হইত, একথা অবশ্যই হঠাৎ বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহারা যে এখনও সমাজের বহিঃ প্রাঙ্গনের এক মুষ্টি ধূলিমাত্র, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার নাই।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।
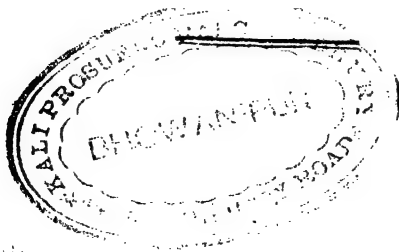
বাঙ্গলার বর্ব্বর জাতি। (৬ষ্ঠ)

কিয়ঞ্জরের ভুঁইয়ারা ভূমীজ কোল। ইহাদের ধর্ম্মমত চুটিয়ানাগপুরের অন্যান্য কোলদের ধর্ম্মমতের অনুরূপ। প্রসবের পর সাত দিন অশৌচ হয়। তাহার পর সন্তানের মাথা কামাইয়া নামকরণ করে। নামকরণ পদ্ধতি অন্যান্য কোলদের মত, জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতামহের ও মধ্যম সন্তান প্রপিতামহের নাম পায়, অন্যান্য সন্তানকে অন্যান্যের নাম দেওয়া হয়। বর কন্যা আপনা আপনি পছন্দ করিয়া বিবাহ করে। বিবাহের প্রথম প্রস্তাব পাত্রীর নিকট হইতে আসে। রাঙ্গী ও ত্রিলোকী ধাঙ্গড় বাস ও ধাঙ্গড়ীন বাসের ন্যায় ভুঁইয়াদের মধ্যেও কুমার কুমারীর স্বতন্ত্র শয়ন গৃহ আছে। তাহাকে মন্দর ঘর বলে। কুমার কুমারীর চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখা পিতা মাতার কর্ত্তব্য নহে। স্বজাতির মধ্যে ব্যভিচার নিন্দনীয় নহে। পরজাতির সহিত হইলে কিছু নিন্দা হয়। চুটিয়া কোলদের মত ইহাদেরও নাচিবার একটি স্থান থাকে, তাহাকে দরবার বলে। দরবারে যাইয়া যুবকেরা অন্দরে কাটী দিলে যুবতীরা সকলে উপস্থিত হয়। তখন সকলে মিলিয়া নৃত্য গীত আমোদে মত্ত হয়। সেখানে কর্ত্তৃ পক্ষ কাহারও যাইতে নাই। কখনও ভিন্ন গ্রামের যুবকেরা দল বাঁধিয়া দরবারে আসে। তখনও গ্রামের সকল যুবতী সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে রাত্রিপাত করে। যুবকেরা চিরুণী ও মিঠাই লইয়া আসে, যুবতীরা তাহাদিগকে রাধিয়া খাওয়ায়। পর দিন আহারের পর যুবকেরা বিদায় লয়। যুবতীরা নদীতট পর্য্যন্ত অনুগমন করে। নদীর উভয় পার হইতে উভয় পক্ষের বিরহ গান গীত হয়।

কিয়ঞ্জরের রাজাকে সিংহাসনে বসাইবার অধিকার ভুঁইয়াদিগের। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ক্রিয়া করিলেও কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। ভুঁইয়াদিগের আশীর্ব্বাদ একান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণেরা সমস্ত আয়োজন করিয়া বসিলে রাজা এক ভুঁইয়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া মণ্ডপে উপস্থিত হন। যাহার পিঠে চড়েন, সে ঘোড়ার মত শব্দ করে এবং চারিদিকে ভুঁইয়ারা বাজনা বাজায়। বেদীর উপর একখান রাঙ্গা কাপড় বিস্তৃত থাকে, সেখানে আর একজন ভুঁইয়া সিংহাসনের আকারে উপবেশন করে। রাজাকে সেই সিংহাসনে বসিতে হয়। ভুঁইয়া সর্দ্দারেরা তাহার চারিদিকে উপবেশন করে। পাখা, চামর ও ছাতার স্বরূপে ভুঁইয়ারা রাজাকে নানা জিনিষ দেয়। তখন ভাটেরা গান গায় ও ব্রাহ্মণেরা সাম পাঠ করে; ও বাজনা বাজে। অনন্তর প্রধান সর্দ্দার চন্দনের টীকা দেয়, পুরোহিত ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা তাহার অনুসরণ করে। তখন একখানি প্রাচীন বংশ ক্রমাগত তরবারী রাজার হাতে দেওয়া হয় এবং একজন ভুঁইয়া আসিয়া গলা বাড়াইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসে। রাজা তরবারী দিয়া তাহার গলা স্পর্শ করে। পূর্ব্বে দ্বিখণ্ড করা হইত, এখন কৃত্রিম বলিদান হয়। যে বংশ হইতে এ ব্যক্তি আসে, সে বংশ জায়গীর পায়। গলায় তরবারী ছোঁয়াইলে সে উঠিয়া পালায়। তিন দিন

আর দেখা দেয় না। ইহাই অভিষেক, তাহার পর সর্দ্দারেরা চাল, ঘি, মধু, দুগ্ধ প্রভৃতি উপহার দেয়। একএকটী দ্রব্য উপহার দিবার পূর্ব্বে সকল সর্দ্দার তাহা স্পর্শ করে। অনন্তর "আমরা তোমাকে রাজা বলিয়া বরণ করিলাম" বলিয়া সকলে বিদায় লয়। রাজা সেই পূর্ব্বের ঘোড়ায় চড়িয়া গৃহে প্রস্থান করেন।

ধাঙ্গড় শব্দের অর্থ পাহাড়ী। যাহাদিগকে আমরা ধাঙ্গড় বলি, তাহারা আপনাদিগকে খুবংক বলে। কেহ বলে, গুজরাট, কেহ বলে, কঙ্কণ প্রদেশ হইতে ইহারা রোটস্ বা রুহিদাসে আসে; সেখান হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল রাজমহলে আর একদল চুঠিয়ানাগপুরের উত্তর ও পশ্চিম অংশে যাইয়া বাস করে। ধাঙ্গড় গ্রামে সর্দ্দার মুণ্ডা বা মাহতো এবং পুরোহিত পান প্রধান। দেবত্তর সম্পত্তি পানের অধীন, ধাঙ্গড়েরা বড় উৎসবপ্রিয়, পুরোহিত না হইলে উৎসব হয় না। মাহতো সামাজিক ও অন্যান্য কার্য্যের তত্ত্বাবধান করে, গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত যুবককে রাত্রিতে একটা স্বতন্ত্র ঘরে বাস করিতে হয়। সে ঘরটার নাম ধুমকুরীয়া। কুমারীদিগকেও এই রূপ করিতে হয়। কিন্তু প্রায়ই কুমারদিগের গৃহে কুমারী দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারীর ব্যভিচার নিন্দনীয় নহে। ধুমকুরীয়ার মধ্যে কি হয়, কেহ প্রকাশ করিলে বিশেষ শাস্তি পাইয়া থাকে। এখানে ছোট ছেলেরা বড়দের সেবা করে। ধুমকুরীয়ার সম্মুখে তেঁতুল গাছের নীচে আখড়া বা নাচিবার স্থান; শ্রান্ত বা দর্শকদিগের জন্য সেখানে বসিবার আসন থাকে।

পুরুষেরা কোমরে একখান কাপড় দিয়া কোমরের উপর তসর সুতা বা বেত দিয়া বাঁধে। মেয়েরাও কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় দিয়া চাপিয়া রাখে, কেহই কাটা কাপড় ব্যবহার করে না। যাহারা সভ্যজাতির সংসর্গে আসিয়াছে, তাহারা লাল পেড়ে মোটা শাড়ি দিয়া গা ঢাকে, ঘোমটা দিবার বা মাথা ঢাকিবার পদ্ধতি নাই। মেয়েরা গলায় পুঁথির মালা ও হাঁসুলি, দুই হাতে তামার আঙ্গটী ও খাড়ু এবং পায়ে বাঁক মল পরে। ইহারা পরচুল দিয়া ডান কাণের উপর খোঁপা বাঁধে। কাণে ফুটা করিয়া ইয়ারিং পরে। মাথায় ফুল গুজিতে বড় ভাল বাসে। নাচিবার সময় গায়ে একটা রঙ্গিণ কাপড় জড়ায় এবং মাথায় পালক বাঁধে।

বাল্য বিবাহ নাই। পাত্র আপনি পাত্রী পছন্দ করে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বিবাহের সব আয়োজন করিয়া দেয়। পণ চারি টাকা। মুণ্ডাদের ন্যায় ইহারাও দৈব পরীক্ষা করিয়া বিবাহের শুভাশুভ নির্ণয় করে। সব স্থির হইলে সমর সাজে বরপক্ষ পাত্রীর গ্রামে প্রবেশ করে, অমনি কন্যা পক্ষ আক্রমণ রোধ করিতে আসে। একটা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটা ক্রমে নাচে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। বর কন্যা অন্যের কোলে উঠিয়া নাচে যোগ দেয়। কন্যার বাড়ীর সম্মুখে লতা পাতা দিয়া একটা কুঞ্জ প্রস্তুত থাকে। মেয়েরা বর কন্যাকে সেখানে লইয়া জোয়ালের উপর ধানের শিষ, তাহার উপর শিল রাখিয়া তাহার উপর দুজনকে দাঁড় করায়; কন্যার পিছনে বর কন্যার গোড়ালি চাপিয়া দাঁড়ায়। বর কন্যার মাথার উপর একটা কাপড় দিয়া এবং চারিদিকে কাপড়ের

কালাত করিয়া পুরুষেরা তাহার বাহিরে অস্ত্র লইয়া দাঁড়ায়। হিন্দুরা কদলি কুঞ্জে সুতা দিয়া ঘিরে। বর পিছন হইতে পাত্রীর কপালে সিন্দুর লেপিয়া দেয়। মুখ না ফিরাইয়া কন্যাও ঐরূপ করে। কুঞ্জের ছাদে পূর্ণ কুম্ভ থাকে। সিঁদুর দেওয়া হইলে একটা তোপ হয়; অমনি কুম্ভগুলি উলটিয়া পড়িয়া কুঞ্জস্থ সকলকে জলে ভাসাইয়া দেয়। তখন কাপড় ছাড়িবার জন্য বর কন্যা এক ঘরে প্রবেশ করে, শীঘ্র বাহির হয় না, বাহির হইলে স্বামীস্ত্রীরূপে গণ্য হয়। বরের পোষাক একটা চাপকান ও পাগড়ী, কন্যার কোন বেশভূষা হয় না। বাঙ্গালী মেয়েদের মত ধাঙ্গড়ী কুমারীরা গুই বা ফুল পরস্পরে খোপায় গুজিয়া দেয়, মালা বদল করে ও আলিঙ্গন করে। সেই অবধি চিরদিনের বন্ধুতা জন্মে। আর কেহ কাহারও নাম ধরিয়া ডাকে না।

ধাঙ্গড়দের যাত্রা বিখ্যাত। ইহারা কোলদের অপেক্ষা উত্তম নাচিতে ও গাহিতে পারে। শৈশবাবস্থা হইতে বালক বালিকারা নৃত্য গীত শিক্ষা করে। সর্দ্দারের বাড়ীর সম্মুখে আম বাগানে বৎসরে একদিন যাত্রা হয়। যাত্রার পূর্ব্বদিন ঠাকুর পূজা দিয়া বৃদ্ধেরা খুব সুরাপান করে। পরদিন প্রত্যেক গ্রামের এক একটি নিশান আম বাগানে যাইবার পথে পুঁতিয়া রাখে। বিকালে স্ত্রী-পুরুষ সাজ গোজ করিয়া বাজনা বাজাইয়া ছাতা চামর লইয়া নাচিতে নাচিতে রঙ্গ স্থলে উপস্থিত হয়। সেখানে সকল গ্রামের লোক একত্র হইয়া সমস্ত দিন নৃত্য গীত করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

সৃষ্টিকর্ত্তা ও সম্পদ বিধাতা বলিয়া ধাঙ্গড়েরা ধর্ম্মী বা ধার্ম্মেশ নামে সূর্য্যকে সম্মান করে। বিপদ আপদের কর্ত্তা নাট। সূর্য্য বড় শান্ত প্রকৃতি, নাটের অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করে না, নাটদেব পূজা করিয়া থাকে। মাটী, প্রস্তর বা কাষ্ঠ খণ্ডকে চণ্ডীদড়া স্বর্ণ বুড়ী প্রভৃতি নটের প্রতিমূর্ত্তিরূপে পূজা করে। চণ্ডী ব্যাধের দেবতা ও তাঁহার অনুগ্রহে সব শীকার হয়। ঠাকুরের কাছে গজ মহিষ ছাগল বা মুরগী কাটে। ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র তিন কথায় বর্ণন করা যাইতে পারে; ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না। ইহকালে কি পরকালে, পাপের দণ্ড হয় বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস নাই। দুর্দ্দৈব পাপের ফল নহে, নাটের ক্রোধ বা হিংসা জনিত। মুড়াদের ন্যায় ইহারাও ডাকিনীকে বড় ভয় করে, এবং ডাকিনীর উপর বড় অত্যাচার করে। নরহত্যা করিতে ইহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। খ্রীষ্টানদের উপর ডাকিনী অত্যাচার করে না। কেবল মাত্র এই বিশ্বাসে অনেকে খ্রীষ্টান হইয়াছে। বাঘ মারিলে বাঘ হয়, আর সকলের ভূত হয়। রাজমহলীদের পুনর্জন্মে বিশ্বাস আছে। ওঝা ডাকিয়া রোগের চিকিৎসা ইহাদের ও কোলদের একরূপ। ভূত ছাড়াইবার সময় ওঝারা চাল দিয়া একটা মাটীর মূর্ত্তি পূজা করে। হিন্দু ভক্ত ধাঙ্গড়েরা মহাদেবের পূজা করে। গোন্দজাতি বড় দেব নামে ঠাকুরের কাছে নরবলি দেয়, ইহারা নরবলির পরিবর্ত্তে কাঠ মানুষের মূর্ত্তি গড়িয়া মহাদেবের কাছে কাটিয়া থাকে।

কোল ও ধাঙ্গড়দের পর্ব্ব প্রায় একরূপ।

কেবল করম পূজার ঘটাটা বেশী হয়। ধান রুইবার সময় করম গাছের একটা ডাল আখড়ায় পুতিয়া কাপড় ও মালা দিয়া সাজাইয়া পূজা করিতে হয়। এই পর্ব্বে অত্যাচার অনাচারের একশেষ হয়। করমের পূজা করিলে ভূতের কোপ শান্তি হয়। প্রচুর শস্য হইয়া থাকে। ইহারা বলে, শাল ফুল ফুটিলে ধর্ত্তীর (ধরিত্রীর) বিবাহ হয়, তাই সারুল পর্ব্বের আবশ্যকতা। সারুলে শর্ণ বুড়ীর পূজা হয়। শর্ণ বুড়ী জাহেরা ও দেশৌলার নামান্তর মাত্র। পাঁচটা মুরগী কাটিয়া চাউলের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া সবাই এক একটু প্রসাদ পায়। তার পর শালফুল তুলিয়া ঘরে ফিরে। পরদিন পান আসিয়া সকলের মাথায় এক একটী শাল ফুল দেয়, শিষ্যেরা পুরোহিতের মাথায় এক এক কলসী জল ঢালিয়া দেয়, তার পর খুব মদ খাওয়ায়। গুরু শিষ্যে মিলিয়া বাড়ীতে খুব নৃত্য হয়। তার পর সমস্ত দিন রাত্ আখড়ায় যুবক যুবতীদের নৃত্য। সারুল করিলে প্রচুর বৃষ্টি হয়।

ধাঙ্গড়েরা টাকা কড়ি সঙ্গে দিয়া মৃত দেহ দাহ করে। তার পর একটা নূতন পাত্রে অস্থি গুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাড়ীর সম্মুখে একটা খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। পর বৎসর পৌষমাসে বাজনা বাজাইয়া পাত্রটী নদীতটে কবর দিতে হয়। সমস্ত গ্রামের হদ বাড়ী একদিনে হয়। গ্রামে একটী ভস্ম অসমাহিত থাকিলে কাহার বিবাহ হয় না। হদ বাড়ীর পরে গ্রামে বিবাহের ধুম লাগে।

বোধ, অঙ্গুল দশ পল্লা ও খন্দ মহলে বঙ্গোপকূলে পর্ব্বতে খন্দদিগের বাস। কয়েকখানি গ্রাম লইয়া একটী মট হয়, একটী একটী মট এক একজন সর্দ্দারের অধীন। সর্দ্দার অপেক্ষা পরিবারের কর্ত্তার প্রাধান্য অধিক। সর্দ্দার গোত্রের প্রধান। পুত্র পৌত্র সকল একত্র বাস করে। গৃহ মধ্যে গৃহিণী রাজ্ঞী। কর্ত্তারা মিলিয়া পঞ্চায়েৎ করে; সর্দ্দারেরা মিলিয়া রাজ্য চালায়। প্রধান বংশ হইতে সর্দ্দার মনোনীত করিতে হয়। কিন্তু কাহাকে মনোনীত করিতে হইবে নির্দ্দিষ্ট নাই।

যাহাকে কর্ম্মক্ষম বিবেচনা করে, প্রজারা তাহাকে মনোনীত করে। সর্দ্দার রাজা ও পুরোহিত সম্মান ভিন্ন তাঁহার আর কোন লাভ নাই, প্রাসাদ নাই, ভৃত্য নাই, সম্পত্তি নাই, সকল বিষয়ে তাঁহার ও তাঁহার প্রজার অবস্থা একরূপ। অন্য সর্দ্দারদের (আবার) মত না লইয়া কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই। শাসনেরও নিয়ম আছে। হত্যাকারীকে হত্যা করিবার অধিকার হত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদিগের। দেহের প্রত্যেক অঙ্গের এবং প্রাণের নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে। মূল্য দ্বারা অপরাধীর প্রতিশোধ লওয়া যায়। কেবল ব্যভিচারীর মূল্য নাই। স্বামী ব্যভিচারীকে হত্যা করিলে স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিবে। ধরা পড়িলে চুরী করা সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে হয় বা তাহার মূল্য দিতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার ধরা পড়িলে নির্ব্বাসন হয়। জমী যে আগে দখল করে, তাহারই হয়; জমী বিক্রয় করিলে এক মুঠা মাটী লইয়া ক্রেতাকে দিতে হয়। মহাপরীক্ষা ও পঞ্চায়েৎ দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হয়। ঠাকুরের কাছে মেষ বলি দিয়া, সেই মেষের রক্ত মাখান চাউল খাইলে যে মিথ্যাদাবী করে, তাহার মৃত্যু হয়। প্রসাদী রক্ত

বিবাদী জমীর মাটী মাথাইয়া খাইলেও ঐরূপ হয়। মিথ্যা শপথ করিলে সর্ব্বনাশ হয়। বাঘের চামড়া ছুঁইয়া শপথ করিতে হয়। পরিবারের কাহাকেও বাঘে কামড়াইলে জাত যায়। ইহাদের পুরোহিতকে ডোমনা বলে। আহত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি ডোমনাকে দিলে জাতি যায় না। গিরগিটের চামড়া ছুঁইয়া মিথ্যা শপথ করিলে দাদ হয়। তপ্ত জল তেল বা লোহা ছুঁইয়াও পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। মকদ্দমায় হারিলে পঞ্চায়েৎকে মদ মাংস খাওয়াইতে হয়। যে বিষয় রক্ষা করিতে না পারে, সে বিষয় পায় না। স্থাবর সম্পত্তি পুত্রগণ ও অস্থাবর সম্পত্তি কন্যাগণ ভাগ করিয়া লয়। পুত্র অভাবে ভাই পায়। বংশে পুরুষ না থাকিলে গ্রামের লোক ভাগ করিয়া লয়। ভগিনীদের ভরণ পোষণ ও বিবাহের ব্যয় ভাইকে দিতে হয়। খন্দেরা সাহসী, সহিষ্ণু, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রিয়। অসম সাহসে ইহারা ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, অনাহারে ও রোগে পীড়িত হইয়াও কেহ শত্রুর শরণাপন্ন হয় নাই। শির দিয়াছে তবুও বিশ্বাস ঘাতক হয় নাই। জিহ্বা উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি ঘরের কথা প্রকাশ করে নাই। ইহারা মাথার উর্দ্ধে হাত তুলিয়া নমস্কার করে। পথে সাক্ষাৎ হইলে "আমি যাইতেছি" "যাও" বলিয়া পরস্পরকে সম্ভাষণ করে। ইহারা নীচতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে।

জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু উপলক্ষে খন্দ গৃহে উৎসব হয়। পূর্ব্ব পুরুষেরা সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। জলে চাল ফেলিয়া পুরোহিতেরা পরীক্ষা করিয়া বলে, কে জন্ম লইয়াছে। তাহারই নামানুসারে সন্তানের নামকরণ হয়। সপ্তম দিনে পুরোহিত ও গ্রামস্থ লোকদিগকে ভাল করিয়া ভোজন করাইতে ও মদ খাওয়াইতে হয়। স্বগোত্রে ও নিকট কুটুম্বের সহিত বিবাহ হয় না। ভিন্ন গোত্রের সহিত শত্রুতা থাকিলেও বিবাহ চলে। বিবাহের দিন বিবাদ স্থগিত রাখিয়া এক সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে। পরদিন প্রাণান্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। দশবার বৎসরের বালকের ও চৌদ্দ পনর বৎসরের বালিকার বিবাহ হয়। সুতরাং স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী চার বছরের বড় হয়। শ্বশুর টাকা দিয়া বধু ক্রয় করে এবং সংসারে দাসীর মত রাখে। চাল, মদ ও কুটুম্ব সঙ্গে লইয়া বরের পিতা কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। পুরোহিত আসিয়া তাহাদের মদের স্বাদ লয় ও দেবতাকে একটু দেয়। তখন বৈবাহিকেরা কর স্পর্শ করে। পুরোহিত বর কন্যার গলায় হরিৎ সুতা জড়াইয়া দেয় এবং ঢেঁকিশালে লইয়া হরিদ্রা জল গায়ে দেয়। সমস্ত রাত্রি পান ভোজন ও নৃত্য গীতে অতিবাহিত হয়। শেষ রাত্রে বরের পিতৃব্য বরকে ও কন্যার পিতৃব্য কন্যাকে স্কন্ধে লয়, আর একটু নৃত্য গীতের পর বরের পিতৃব্য কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। কন্যাপক্ষ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়, বর পক্ষ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পুরোহিত বর কন্যার অনুসরণ করে। পথে নদী পড়িলে বিবাহে অশুভ ঘটিতে পারে, এজন্য পুরোহিতের আবশ্যক। তিনি অমঙ্গল শান্তি করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে এইরূপ বিবাহ রাক্ষস বিবাহ নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

স্বামীর উপর খন্দ রমণীর প্রাধান্য অসামান্য। সন্তান না হইলে পণের টাকা ফিরাইয়া দিয়া যখন ইচ্ছা সে পিতৃ গৃহে চলিয়া যাইতে পারে। গর্ভবতী নারীরও বিবাহের ছয় মাস মধ্যে ঐরূপ করিবার অধিকার আছে। স্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন স্বামী দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে পারে না এবং উপপত্নী রাখিতেও পারে না। কিন্তু ব্যভিচার প্রভৃতি কোন কারণে একবার বিবাহ ভঙ্গ হইলে নারী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে না। অন্যান্য বর্ব্বর সমাজে জারজ সন্তান ঔরস সন্তানের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়; খন্দ সমাজে সেরূপ হয় না। কুমারীদিগের ব্যভিচার নিন্দনীয় নহে। যে কেহ যে কোন কুমারীকে লইয়া বনে প্রবেশ করিতে পারে। অন্যে সে পথে না যায়, এজন্য একটা পল্লব ভাঙ্গিয়া পথে রাখিয়া যায়। কিন্তু বিবাহিত নারীর ব্যভিচারের কথা শুনা যায় না। স্ত্রী গৃহ কার্য্য করে, ভোজন করিয়া স্বামীর সেবা করে, এবং আবশ্যক হইলে সন্তানটী পিটে বাঁধিয়া মাঠে গিয়াও স্বামীর সাহায্য করে।

খন্দেরা মৃত শরীর দাহ করে। সাধারণ লোকের মৃত্যু হইলে বিশেষ ঘটা হয় না। দশম দিনে কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে হয়। কোন সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে ঢোল ও ঘড়ি বাজাইয়া গ্রামের ও গোত্রের সকলকে একত্র করিয়া চিতার উপর একটী পতাকা রোপণ করিতে হয়। চিতার নিকট এক থলি চাউল রাখিয়া তাহার উপর মৃত ব্যক্তির অস্ত্র শস্ত্র, বাসন ও কাপড় সাজাইয়া চিতায় আগুন দিতে হয়। কুটুম্বেরা চিতার চারি পার্শ্বে নাচিতে থাকে। পতাকা দগ্ধ হইলে কুটুম্বের সহিত দ্রব্য সামগ্রী ভাগ করিয়া লয়। পরের নয় দিন ভস্মের চতুষ্পার্শ্বে সকলে নৃত্য করে। দশম দিনে নূতন সর্দ্দার মনোনীত করে।

খন্দেরা সাহসী, বিশ্বস্ত ও আতিথেয়ী। প্রাণ ও সম্মান অতিথির; তিনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর। গ্রামে নূতন লোক আসিলে সকলেই তাহাকে আপন বাড়ীতে ডাকিতে থাকে। যতদিন ইচ্ছা তিনি থাকিতে পারেন। অতিথিকে কেহ তাড়াইতে পারে না। অপরাধী বা শত্রুকেও সযত্নে আশ্রয় দিতে হয়। পুত্রের হত্যাকারীও আশ্রয় লইলে তাহার কেশমাত্র স্পর্শ করিতে নাই। কখন কখন শত শত্রু খন্দ গৃহে আশ্রয় লইয়া বৎসরেক অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়াছে। তখন পায়ে পড়িয়া তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিতে বা লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে। ইংরাজের শত্রুদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহারা প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তথাপি আশ্রিত-বিড়ম্বনা করে নাই। খন্দেরা বলে, যে কেহ মিত্র নয়, সেই শত্রু। কিন্তু আতিথেয়তা তাহাদিগের এই সংগ্রামে স্পৃহা ও জীঘাংসা শাসিত করিয়াছে। একমাত্র দুর্ভাগ্য অতিথি-শ্রেণীতে প্রবেশ বঞ্চিত মেরায়া ভূদেবীর নিকট বলি দিবার জন্য ক্রীতদাস।

খন্দের দুইটি কর্ম্ম, কৃষি ও যুদ্ধ। অন্য ব্যবসায়ীদিগকে ইহারা ঘৃণা করে। পান, কামার, কুমার, গোয়ালা, সুঁড়ী, খন্দ সমাজে অতি নীচ জাতি, তাহারা গ্রামের প্রান্তরে বাস করে। কৃষি কর্ম্মে তাহাদের অধিকার নাই। ইহারা কোন ব্যবসায় করিলে, ইহাদের পাদ স্পর্শ করিলে খন্দের জাতি যায়। পানেরা কাপড় বুনে, বাজনা বাজায়, ও দূতের কার্য্য করে। ইহারাই হিন্দুগৃহ

হইতে ভূদেবীর বলি মেরারা সংগ্রহ করিয়া আনে। কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে একটা তীর হাতে লইয়া পান গোত্রের সকলকে সংবাদ দিয়া আসে। যুদ্ধে ইহাদের বড় আমোদ। চুল ফিরাইয়া পালক বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে যায়। প্রাণান্ত হইলেও খন্দ যুদ্ধে আশ্রয় ভিক্ষা করে না। যে পর্য্যন্ত না একপক্ষ জনশূন্য হয় সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। যুদ্ধে যাইবার সময়ে ভূদেবী বেড়া পেন্নুর কাছে নর বলি স্বীকার করে এবং যুদ্ধ দেবী লোহা পেন্নুকে ছাগ বলি দিয়া পূজা করিয়া যায়। একখান রক্তমাখা কাপড় ফেলিয়া দিলে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক অস্ত্র, আহার্য্য লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং উপদেশ, আহার্য্য ও অস্ত্র দিয়া যোদ্ধাদিগের সাহায্য করে। খড়্গ, কুঠার, ধনুর্ব্বাণ ও ফিঙা খন্দের অস্ত্র। আহত না হইয়া যে শত্রুকে মারিতে পারে, তাহার দক্ষিণ হস্ত লোহা পেন্নুর বড় উপাদেয় নৈবেদ্য এবং প্রথম শত্রুর রক্ত সৌভাগ্যের কারণ, সকলেই তাহার রক্তে আপন আপন কুঠার রঞ্জিত করিয়া লয়। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে দেবতার প্রসাদ বলিয়া খন্দেরা বর্ণন করে, আত্ম শ্লাঘা করে না। খন্দ বড় সুরা প্রিয়। সুরা না হইলে কোন উৎসব হয় না। কিন্তু রমণীরা পুরুষদের সম্মানার্থ স্পর্শ করে মাত্র, পান করে না। রমণী মাতাল হইলে বড় নিন্দা হয়।

আকাশ পাতাল জল স্থল দেবতায় পূর্ণ, তাহাদের ন্যায় তাহাদেরদেবতাদেরও সবার সঙ্গে শক্রতা। রক্ত পান করাইয়া তাহাকে শান্ত না করিলে কাহারও রক্ষা নাই। তাহাদের মধ্যে আর্য্য দেবতা, অনার্য্য নাট, ও বর্ণ সকল প্রকারের দেবতা দেখা যায়। ভূদেবী বুড়া পেন্নু, যুদ্ধ দেবতা লোহা পেন্নু, নদী দেবতা জোরী পেন্নু, পুষ্করিণী দেবতা মুণ্ডা পেন্নু, বৃষ্টি দেবতা পিদজু পেন্নু, নির্ঝর দেবতা সুগু পেন্নু, বনদেবতা গসা পেন্নু, মৃগয়া দেবতা পিলামু পেন্নু, জন্ম দেবতা গরী পেন্নু, এবং বসন্ত দেবতা জুগা পেন্নু। এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট অনেক দেবতা আছে। হিন্দু দেবতাদিগের মধ্যে কালী প্রধান। ইহাদের একটী বাঘ দেবতা, গাছের তলায় তাহাকে রাখিলে গাছ শুকায়, নদীতে রাখিলে নদী শুকায়। তাহার পুরোহিত তিনচারি বৎসরের অধিক বাঁচে না। অথচ স্বপ্নাদেশে পৌরহিত্য স্বীকার করিতে হয়। যে কেহ স্বপ্নাদেশ পাইলেই পুরোহিত হইতে পারে। পুরোহিতেরা যুদ্ধ করে না, এবং সংসারী কাহারও অন্ন গ্রহণ করে না। ইচ্ছামত পৌরহিত্য পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। হিন্দুদেবতার পুরোহিত ব্রাহ্মণ।

কৃষিকার্য্য খন্দের জাতীয় ব্যবসা, বেড়াপেন্নু তাহার জাতীয় দেবতা। এ পৃথিবী পূর্ব্বে চঞ্চল ও অকৃষ্ঠ ছিল। বুড়া পেন্নু শিশুর রক্ত উপহার পাইয়া পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও শস্য শালিনী করেন। সন্দে পেন্নুর নিকট কখন নর বলি হয়। বিপদ আপদে, সময়ে অসময়ে বুড়াপেন্নুর নিকট নরবলি না দিলে খন্দের জাতীয়তা থাকে না। বুড়া পেন্নুর মত নিষ্ঠুর দেবতা আর নাই, সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ নররক্ত দিয়া তাহার তুষ্টি সাধনকরিতে হয়। ধান বুনিবার ও কাটিবার সময় প্রতি বৎসর সকলে মিলিয়া দুইবার নরবলি দিয়া তাহার রক্তে আপন আপন ক্ষেত্র রঞ্জিত করে। এতদ্ভিন্ন কোন গৃহে মড়ক হইলে, কাহাকে

বাঘে খাইলে বা অন্য কোন বিপদ হইলে বুঝা যায়, বুড়া পেন্নুর ক্রোধ হইয়াছে। তখনি গৃহস্থ আয়োজন থাকিলে নর মুণ্ডে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে, আয়োজন না থাকিলে একটা ছাগলের কাণ কাটিয়া কি একটী সন্তানের কাণ ফুড়িয়া দেবীকে সেই রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, বৎসর মধ্যে মনোমত উপহার দিবে। যদি বলি সে সময়ে সংগ্রহ করিতে না পারে, আপন সন্তানের মুণ্ড দিয়া দেবীর নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে হয়। খন্দ ও ব্রাহ্মণের মাংস দেবী গ্রহণ করেন না। পানেরা অন্য স্থান হইতে দরিদ্র হিন্দু সন্তানদিগকে ক্রয় করিয়া বা চুরী করিয়া আনে। গ্রামে অনেকগুলি বলির আয়োজন করিতে হয়, কখন কাহার আবশুক হয়, কে জানে? শিশুর কোমল মাংস দেবীর বিশেষ প্রিয়, অভাবে যুবকের মাংসও চলে, কিন্তু জরা-গ্রস্ত বৃদ্ধের শুষ্ক মাংস দেবীকে দিতে নাই। বালকেরা গ্রাম মধ্যে সচ্ছন্দে ভ্রমণ করে, এবং সকল গৃহেই যথেষ্ট যত্ন ও আদর পায়, যুবকদিগেরও যত্নের অভাব হয় না, কিন্তু যথেচ্ছ বিচরণের স্বাধীনতা পায় না। বলি দিবার দুইদিন পূর্ব্ব হইতে সুরাপান ও উৎসবে সকলে মত্ত হয়। এ দুইদিন ব্যভি-চারে দোষ নাই। তৃতীয় দিনে মেরায়াকে বলি দেয়; এবং সকলে এক একটু করিয়া তাহার মাংস ভাগ করিয়া লয়। অনেক কষ্টে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই বীভৎস ব্যাপার নিষেধ করিয়াছেন।

কিয়ঞ্জর ও ঢেঁকানলের পাহাড়ে জুয়াঙ-দিগের বাস। জুয়াঙেরা বলে, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে তাহারাই প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল। বৈতরণী তটে গোনাসিকা গ্রাম তাহাদের আদিম নিবাস। গোরুর নাসিকার মত স্বাভাবিক দুটি ছিদ্র এখানে আছে, তাই ইহার নাম গোনাসিকা। ইহারা বলে, বৈতরণী গঙ্গা অপেক্ষা প্রাচীন। গো-নাসিকা হইতে ইহারা ঢেঁকানলে আসে, সেখানে ভূমীজদিগের উৎপাতে কেহ বা পর্ব্বত পৃষ্ঠে, কেহ বা কিয়ঞ্জরে আশ্রয় লইয়াছিল।

অতি অল্পদিন হইল জুয়াঙেরা প্রস্তর যুগ অতিক্রম করিয়াছে। পাথরের অস্ত্র শস্ত্র অদ্যাপি এখানে বহুল পাওয়া যায়। ধাতুমাত্র ইহারা চিনিত না, লৌহকার ও দেশে নাই। ধাতুবাচক কোন শব্দ ইহা-দিগের ভাষায় নাই। সিলাই করিতে, কি কাপড় বুনিতে, কি মাটীর বাসন প্রস্তুত করিতে কেহ জানে না। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কোথায় একটু চাষ করিতে কিছু দিন থাকে, যেখানে যখন থাকে সেখানে সামান্য একটা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করে; চাষ ফুরাইলে অন্যত্র চলিয়া যায়। চাষের অপেক্ষা বন্য ফল মূলে অধিক দিন কাটে।

গোনাসিকায় অদ্যাপি কুড়ি পঁচিশ ঘর জুয়াঙ আছে। ইহাদের এক এক খানি ঘর চারি পাঁচ হাত লম্বা, তিন চারি হাত প্রশস্ত। দ্বারটি এত ক্ষুদ্র যে একজন মোটা মানুষের প্রবেশ করিতে কষ্ট হয়, ঘরগুলি এত অনুচ্চ যে দাঁড়ালে মাথায় চাল ঠেকে। ইহারই ভিতর দুটি কুঠরী, একটীতে জিনিষ পত্র থাকে, আর একটীতে খায় ও শোয়। গ্রামের সব ছেলেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ আছে। সেটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও সুগঠিত; এই ঘরটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। একটিতে গ্রামের বাদ্যযন্ত্র থাকে, ও ছেলেরা

ঘুমায়। বাহিরেরটী খোলা ঘর। অতিথি ও নিমন্ত্রিতেরা তাহাতে রাত্রি কাটায়।

ইহারা অতি সামান্য চাষ করে, রাজাকে খাজনা দেয় না। তাহারা ঘর মেরামত করে ও বোঝা বয়। ইহারা বড় সুরা প্রিয়, কিন্তু মদ প্রস্তুত করিতে জানে না, কিনিয়া খায়। ইন্দুর বাঁদর বাঘ ভালুক সাপ বেঙ সকলই ভক্ষ্য। উদ্ভিদের মধ্যে কোনটী খাদ্য কোনটী বিষাক্ত, দেখিলেই বুঝিতে পারে। লতায় ফিঙা করিয়া পাথর ছুড়িয়া শিকার করে, ধনুর্ব্বানও ব্যবহার করিয়া থাকে। পাথর সুচল করিতে জানে না। ইহারা সামরিক নহে। কাপড় পরে না। কোমরে লতা জড়াইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে আসামপাতা গুঁজিয়া থাকে। গলায় কাঁচের মালা এবং হাতে ও কাণে কাঁসার গহনা পরিয়া থাকে। পুরুষেরা অতি সামান্য কৌপিন পরে। মুড়াখাড়িয়া ও ধাঙ্গড়দের মত জুয়াঙ নারী মুখে উল্কি পরে। কপালে ও দুই রগে তিন তিনটা রেখা টানে। জুয়াঙেরা বড় খর্ব্বকায়, পুরুষেরা তিন হাত, মেয়েরা তিন হাতেরও অল্প উচ্চ। জুয়াঙ ভাষায় স্বর্গ, নরক বা ঈশ্বর বাচক কোন শব্দ নাই। ডাকিণীর ভয় নাই। পরকালে বিশ্বাস নাই। ইহাদের মধ্যে কোন পর্ব্ব নাই। শস্য জন্মিবার জন্য মাটীর উপর কখন কখন মুরগী কাটে। বিপদ আপদে সূর্য্যের উদ্দেশে ঐ রূপ করিতে দেখা যায়। বৃদ্ধ হইলেই পুরোহিত হইতে পারে। পুরোহিতকে নগাম বলে। বিবাহের কোন পদ্ধতি নাই। কোন নারীকে কাহারও পছন্দ হইলে সে তাহার বন্ধুদিগকে ঘটকালি করিতে পাঠায়; প্রস্তাব মঞ্জুর হইলে কিছু ধান্য পাঠাইতে হয়। তাহার পর বরের বন্ধুরা যাইয়া পাত্রী ও পাত্রীপক্ষীয়দিগকে বরের বাড়ীতে আনে। সেখানে সমস্ত রাত্রি আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া যায়। সকল কুটুম্বদিগকে কিছু ধান চাউল দিয়া বিদায় করিতে হয়। জুয়াঙেরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু দারিদ্র্য হেতু সচরাচর দুইটির অধিক দেখা যায় না। লড়কাদের মত দক্ষিণদিকে মাথা রাখিয়া ইহারা মৃতদেহ দাহ করে। ভস্মগুলা কোন নদীতে ফেলিয়া দেয়; তিন দিন মাছ মাংস ও লুণ খায় না। প্রেতের উদ্দেশে কোন উৎসর্গ করে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

দেখিলাম কৈ ?

দেবি! দেখিলাম কই ?

কপোলে কুন্তলচূর্ণ, অধর অমৃতে পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই!
ললাটে লাবণ্য সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি এক দিন বই!
এলান কুন্তল ভারি, ঘন ঘোর অন্ধকার
ছড়ায়ে রয়েছে যেন জলধর অই!
স্নেহে যেন ছানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই!

দেবি! দেখিলাম কই ?

এ দগ্ধ হৃদয়ে দেবি তুমিই আমার
অমৃতের অবলেপ, আনন্দ তাড়িত ক্ষেপ,
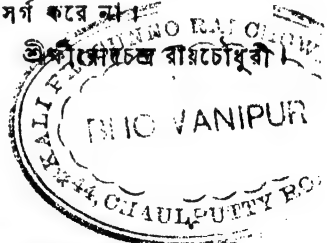
স্বর্গীয় শান্তির শত সঙ্গীতের ধার!
ও রক্ত অধরে হাসি, উঠে প্রাণ পরকাশি
সরল শরত শোভা শত চন্দ্রমার!
যতক্ষণ দগ্ধ আঁখি, ও নয়নে মেখে রাখি
ভুলে থাকি এ সংসার জ্বালা যন্ত্রণার!
এ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি তুমিই আমার!

২

প্রিয়তমে!
এক দিন হৃদয়ের রত্ন সিংহাসনে,—
যদিও দিবস কত, ঢাকিয়াছে অবিরত
পরতে পরতে তারে শত আবরণে!
একদিন হৃদয়ের রত্ন সিংহাসনে
বসায়েছি যে প্রতিমা, কি লাবণ্য! কি মহিমা!
পবিত্র করিলে প্রাণ পরশি চরণে!
হৃদয় অজ্ঞাত ভাবে, কি জানি কি সুখলাভে
আপনা ঢালিয়া দিল অঞ্জলি অর্পণে!
কি জানি চরণ তব পূত পরশনে!

৩

দেখিনি মানব চক্ষে সেরূপ অতুল,
দেখিনি কখনো প্রিয়ে, মানবের আঁখি দিয়ে,—
সে দিন দেখেছি যদি তবু হয় ভুল!
শুধু কল্পনায় আনি, দেখা'ল প্রতিমা খানি
বিনোদ বদন ভরা এলোমেলো চুল!
ফুটিয়া উঠিয়া হায়, লুঠিয়া পড়িছে পায়
অযতনে অনাদরে নীচে তরুমূল!
স্বর্গের সুরভি মাখা বিনোদ বকুল!

৪

মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে,
নয়ন সতর্ক রাখি, চারিদিকে চেয়ে থাকি,
দেখিনা হৃদয়ে জানি কোন্ পথে আসে!
সেই এলো মেলো চুল, বিনোদ বকুল ফুল
প্রাণের ভিতর জানি কোথা হ'তে আসে!
মোহিল সে প্রাণ মন সুরভি উচ্ছ্বাসে!

৫

মোহিল সে প্রাণ মন স্বর্গীয় স্বপন,
আজি ক'বছর পরে, একটী মুহূর্ত্ত তরে
নহে নিদ্রা—নহে তন্দ্রা— নহে জাগরণ!
একটী মুহূর্ত্ত তরে, কত যত্নে মনে পড়ে
কত আদরের সেই আকুল স্মরণ!
কত অশ্রুজলে ভাসি, কত কাঁদি, কত হাসি,
আকুল প্রাণের সেই কত আকিঞ্চন!
কত পুণ্যে হায় হায়, কত যুগ তপস্যায়
হেরিব তোমার প্রিয়ে, চারু চন্দ্রানন!
কই দেখিলাম দেবি জাগ্রত স্বপন!

৬

কই দেখিলাম আজ হৃদয়ের রাণি!
হৃদয় নন্দনে দেবি, যে চরণ নিত্য সেবি
কই দেখিলাম সেই চরণ দুখানি!
একমাত্র অদ্বিতীয়, প্রাণের অধিক প্রিয়,
জগতে তোমারে বই আর নাহি জানি!
কই এলো মেলো চুল, কই সে বকুল ফুল
কই সে আকুল ভাষা আধ আধ বাণী!
আধ ঘোমটায় ঢাকা, আধ আধ লাজ মাখা,
কই গো সে দয়াময়ী দেবী বীণাপাণি!
কই দেখিলাম আজ হৃদয়ের রাণি।

৭

দেবি! দেখিলাম কই?
কপোলে কুন্তল চূর্ণ, অধর অমৃত পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই!
ললাটে লাবণ্য সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু
দেখেছি কি না দেখেছি এক দিন বই!
এলান কুন্তল ভার, ঘন ঘোর অন্ধকার
ছড়ায়ে রয়েছে যেন জলধর অই!
স্নেহে যেন ছানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই!
দেবি! দেখিলাম কই?

প্রিয়া-কর পরিত্যক্ত হারে ও গোলাপ,
সত্যই আমার মত, তোর(ও) কিরে পাপ?
তুই(ও) কি আমার মত, বিপন্ন দুর্ভাগা এত,
তোর(ও) কি কপাল আহা এত অভিশাপ?
পরেনি চিকন চুলে, পরে নাই কর্ণমূলে
অনাদরে ত্যজিয়াছে চারু চন্দ্র চাপ!
মোহময় স্পর্শ তার, আমিও পাবনা আর
প্রাণভরা রহিয়াছে শত পরিতাপ!
গোলাপ! আমার মত তোর(ও) কিরে পাপ?

আয়রে গোলাপ তুই আয় বুকে আয়,
প্রিয়া-কর পরশিয়া, আসিলি অমৃত নিয়া,
দেখিব জ্বলন্ত যদি হৃদয় জুড়ায়!
আয় তোরে বুকে ধরি, আয় রে চুম্বন করি,
দেখি তোর মুখে কত মধু পাওয়া যায়!
পরাণ করিলি চুরি, কি লাবণ্য! কি মাধুরী!
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ মাখা তোর গায়!
আয়রে হৃদয়ে ধরি, আয় রে চুম্বন করি,
সমুজ্জ্বল তুই তার কপোল আভায়!
আয়রে গোলাপ তুই আয় বুকে আয়!

২

তুই ফুল প্রেয়সীর প্রিয় আশীর্ব্বাদ,
দিয়েছে হৃদয় রাণী, আশার আশ্বাস বাণী
আকুল পরাণে ঢেলে অনন্ত আহ্লাদ!
মনে লয় সর্ব্বদাই, বুকে রাখি, চুম খাই!
সত্যই গোলাপ তাই এত করে সাধ!
বল্ কোথা মুক্ত কেশে, প্রিয় সরস্বতী বেশে
বিরাজে বিনোদী দেবী বল্ সে সম্বাদ!
তুই ফুল প্রেয়সীর প্রিয় আশীর্ব্বাদ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মহাহিন্দু সমিতি।

(সমালোচন।)

বোধ হয়, আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, গত শ্রাবণ মাসের নবজীবনে মহাহিন্দু সমিতি নামক একটী সমিতি সংস্থাপনের অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন সহযোগীও এসম্বন্ধে আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানপত্রের উদ্দেশ্য এরূপ মহৎ, এবং ইহার সহিত সমস্ত হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ এরূপ ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ যে, আমরাও এসম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কিন্তু অনুষ্ঠান পত্র সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে আমরা তাহার মর্ম্মার্থ প্রথমে পাঠকদিগকে অবগত করাইব।

(১) "হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা, এবং সাধারণত হিন্দুজাতির উন্নতিসাধন করা মহাহিন্দু সমিতির উদ্দেশ্য।"

(২) "কেবল হিন্দুরা মহাহিন্দু সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। হিন্দুরা দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। বৈদান্তিক ও ব্রাহ্ম নিরাকারবাদী হিন্দু। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক, তথাপি যখন তাঁহারা বিবাহাদি গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তখন হিন্দুসমাজের যেমন অন্যান্য

শ্রেণীর লোকদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায়, সেইরূপ তাঁহাদিগকেও হিন্দু গণ্য করা কর্ত্তব্য। বিলাত ফেরৎ হিন্দুরা— ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এই দলভুক্ত। সকল প্রকার হিন্দু, এই মহাহিন্দু সমিতির সভ্য হইতে পারেন।"

৩। "হিন্দুদিগের মতে সকল বিষয়েই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে। মহাহিন্দু সমিতির অধিবেশনে হিন্দুসমাজের সকল প্রকার উন্নতি অর্থাৎ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম,শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। ধর্ম্ম বিষয়ে কেবল সাধারণ হিন্দুবর্গের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে যেমন ঘোরতর মনোবাদকারী তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা, এই সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে সেরূপ তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সামাজিক বিষয় আদপে বিতর্কিত হইবে না।"

৪। "ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরেও গ্রামে মহাহিন্দু সমিতির শাখা সকল সংস্থাপিত হইবে। এই সমস্ত শাখার সমষ্টি মহাহিন্দু সমিতি বলিয়া গণ্য হইবে।"

৫। "প্রত্যেক শাখায় একজন সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক থাকিবেন। কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইবেন। যদি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য অথবা শাস্ত্রী-শ্রেণী মধ্যে তেমন উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে না করিয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে মনোনীত করা যাইবে।"

৬। "যে ঘরে শাখা সভার অধিবেশন হইবে, তাহার দ্বারে নারিকেল ফল ও আম্র শাখা যুক্ত পূর্ণকুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ সংস্থাপিত হইবে। যে গালিচা বা মাদুরীর উপরে অধিবেশন হইবে, তাহার মধ্যস্থলে পুষ্পপূর্ণ পুষ্পপাত্র শোভার্থ রাখা হইবে। ভারতীয় চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি ও "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য অঙ্কিত ধ্বজা প্রতি অধিবেশনে সভা গৃহের উপর সংস্থাপিত হইবে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধূনা পোড়ান হইবে ও ধূপ দীপ জ্বালা হইবে এবং শঙ্খধ্বনি করা হইবে। দিবসে অধিবেশন হইলেও দীপ জ্বালা হইবে।"

৭। "সম্পাদক, উপস্থিত সকল সভ্য যেরূপ আপনি আপনি বসিয়া গিয়াছেন, সেই অনুসারে, সকলের কপালে চন্দন চিহ্ন ও গলায় মালা দিয়া সমিতির কার্য্য আরম্ভ করিবেন। তার পর সভাপতির সকল হিন্দুসম্প্রদায়ের উপযোগী, ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত একটী স্তব দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন, সভ্যরাও তৎসময়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন। তৎপরে সভাপতি ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিবেন। এবং তাঁহার পর কোন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া মান্ধাতা, পুরুরবা, সগর, দিলীপ, প্রভৃতি আর্য্যনামাবলী পাঠ করিবেন। আর্য্য নামাবলী পঠিত হইলে পর সাধারণ হিন্দু মহাত্মাদিগের কীর্ত্তন পূর্ণ গান গীত হইবে।"

৮। স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু সিমন্তিনীগণ, যে ঘরে সমিতির অধিবেশন হইবে, তাহার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ঘরে বসিবেন। দুই ঘরের মধ্যে একটি পরদা ফেলা থাকিবে।

৯। "প্রত্যেক গ্রাম বা নগর, যেখানে শাখা সমিতি সংস্থিত, সে নগরে অথবা

গ্রামে মধ্যে মধ্যে নগর সংকীর্ত্তন হইবে; তাহাতে" ঈশ্বর ও মাতৃভূমি' 'জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, প্রভৃতি স্বদেশ প্রেমোত্তেজক বাক্য অঙ্কিত ধ্বজা সকল হস্তে বাহিত হইবে। ঐ নগর সংকীর্ত্তনে জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে।"

১০। "মহাহিন্দু সমিতি যুবকদিগের জন্য ব্যায়ামাগার সংস্থাপন করিবেন, এবং তাহাদিগকে ব্যায়ামাভ্যাস ও পৌরুষ সূচক ক্রীড়া করিতে উৎসাহ প্রদান করিবেন, এবং অস্ত্র আইন প্রভৃতির ন্যায় আইন রদ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত আন্দোলন করিবেন।"

১১। "মহাহিন্দু সমিতি, যত দূর সাধ্য, দেশীয় শিল্পে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং য়ুরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহারে বিরত থাকিবেন, এবং দেশীয় শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সকল এবং কাপড়ের কল প্রভৃতি সংস্থাপনে যত্নবান হইবেন।"

১২। মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির জন্য এবং দিন দিন সেই জাতির যে অবনতি হইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন। ভারতবর্ষের লোক কৃষিজীবী। গাভী যেমন তাহাদিগের উপকারী, এমন অন্য কোন জন্তু নহে, এজন্য তাহারা গাভীকে অতি পবিত্র জীব জ্ঞান করে। গোদুগ্ধ হিন্দুজাতির প্রধান আহার। তাহা তাহাদিগের বল বীর্য্যের প্রধান কারণ। গো জাতির রক্ষা ও উন্নতি সাধন চেষ্টা, যেমন সাধারণ হিন্দু জাতির ঐক্য সাধনের উপায়, এমন অন্য কিছু নহে।"

১৩। "মহাহিন্দু সমিতি সংস্কৃত বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবেন এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান হইবেন।"

১৪। "মহাহিন্দু সমিতি বক্তা ও গায়ক নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রেরণ করিবেন। তাহারা আর্য্যকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে স্বদেশ প্রেমাগ্নি প্রজ্জলিত করিবেন।"

১৫। "প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের মহানগরে সেই দেশের সকল শাখা সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের একটি সাধারণ সভা হইবে, এবং প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষের সকল স্থানের শাখা সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মহা সভা হইবে। এই মহা সভার অধিবেশনে কোন বৎসর কলিকাতা, কোন বৎসর বোম্বাই, অথবা এইরূপ অন্য কোন মহানগরে হইবে।"

১৬। "মহাহিন্দু সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকিবে, তাহাতে "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। এই বাক্যের নিম্নে পদ্ম পুষ্পের প্রতিকৃতি থাকিবে। মহা হিন্দু সমিতির প্রত্যেক সভ্য উক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও মহাবাক্য নিজ নিজ অঙ্গুরীয়ের উপর অঙ্কিত করিয়া তাহা ধারণ করিবেন। এইরূপ অঙ্গুরী ধারণ মহা হিন্দু সমিতির সভ্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইবে।"

১৬। "প্রত্যেক সভ্যকে সভ্য হইবার পূর্ব্বে সমিতিতে প্রবেশ দক্ষিণা স্বরূপ এক টাকা এবং বাৎসরিক দাতব্য এক টাকা অথবা অধিক দিতে হইবে।"

আমরা মহা হিন্দু সমিতির উদ্দেশ্য এবং তাহার নিয়মাবলী পাঠকবর্গকে অবগত করাইলাম; এইবার আমরা এ সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মতামত প্রকাশ করিব।

হয়ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন

যে, দেশে এত গুলি সভা এবং সমিতির পর আবার একটি নূতন সভা সংস্থাপনের প্রয়োজন কি? সভায় সভায় ত দেশ প্লাবিত, তাহার উপর আবার এই এক নূতন সভা অথবা 'বক্তৃতামণ্ডপ' সংস্থাপনের অনুষ্ঠান পত্র কেন। আমরা ইহার উত্তরে বলিব যে, দেশ সভায় সভায় প্লাবিত সত্য, বক্তৃতামণ্ডপের যে অভাব নাই, তাহাও সত্য; কিন্তু তথাপিও মহা হিন্দু সমিতির ন্যায় একটি সভা সংস্থাপনের অভাব আছে। ভারতবর্ষে সাধারণত যেসকল সভা আছে, তাহার সকলেরই উদ্দেশ্য, হয় রাজনৈতিক আন্দোলন, না হয় সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষা। যে সকল সভা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থাপিত, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য যে সকল সভার সৃষ্টি, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের দুই একটি কথা বলিবার আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা যে দেশের অপরিসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের লোক রাজনীতি যে কি, তাহা বুঝিতে না পারিলে এবং সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য না হইলে এই সকল আন্দোলন দ্বারা দেশে সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী মঙ্গল কখনও সংসাধিত হইতে পারে না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা; ভারত সভা, পুনা সার্ব্বজনিক সভা, এ সকলেরই উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং ইহাদিগের দ্বারা আন্দোলনও যথেষ্ট পরিমাণেই হইয়াছে। কিন্তু কেবল আন্দোলন লইয়া চিরদিন থাকিলেও চলিবে না, আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের প্রয়োজন। আমাদিগের শাসনকর্ত্তাগণ যদি বুঝিতে পারেন যে, আন্দোলনই আমাদিগের স্বদেশপ্রেমের চরম সীমা, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গে তদুপযুক্ত ব্যবহারই করিবেন। কিন্তু যদি আমরা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আমরা কেবলই বক্তৃতা করিতে অথবা সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতে নিপুণ নহি, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রেও অগ্রসর, তাহা হইলেই তাঁহারা আমাদিগকে উপযুক্ত সম্মান করিবেন; এবং আমাদিগের আন্দোলনের সারবত্তা আছে বুঝিয়া আমাদিগের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে সঙ্কুচিত হইবেন। মহা হিন্দু সমিতির প্রধান লক্ষ্য, কার্য্য। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, ভারত ভূমি সভা প্লাবিত বলিয়া সেখানে মহাহিন্দুসমিতির আবশ্যকতা নাই।

এই বার আমরা দেখিব যে, মহা হিন্দু সমিতির অনুষ্ঠাতা তাহার এই শুভ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারাই বা তাঁহার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কত দূর। তিনি সমিতির অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান এবং সর্ব্ব প্রথম উদ্দেশ্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা।

(২) হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা।

(৩) সাধারণত হিন্দু জাতির উন্নতি সাধন করা।

সমিতির এই উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম প্রস্তাবের সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা অতি গুরুতর সমস্যার কথা।

হিন্দুদিগের প্রকৃত ধর্ম্মই যে কি, তাহাই যখন আজিও সন্দেহ ও বিবাদের স্থল, তখন হিন্দুধর্ম্মের স্বত্ব ও অধিকার বলিলে আমরা কি বুঝিব? যে দেশে গোমাংসভোজী, সুরাপায়ী কিন্তু পুত্তলিকাসেবী ব্যক্তি হিন্দু, অথচ নিরামিষাহারী মাদক মাত্র ত্যাগী, কিন্তু নিরাকারবাদী ব্যক্তি অহিন্দু এবং সমাজে অপদস্থ, সে দেশে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা কিরূপ অযৌক্তিক এবং কতদূর দুরূহ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে ধর্ম্মেরই আদৌ স্থিরতা এবং সংজ্ঞা নাই, সেই অনিশ্চিত এবং সহস্র সম্প্রদায়বিভক্ত ধর্ম্মের অধিকার কথনও নির্ণীত ও রক্ষিত হইতে পারে না। বিশেষত মহাহিন্দুসমিতির অনুষ্ঠাতা কেবল শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা গাণপত্যদিগকেই যে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, তাহা নয়। তিনি নিরাকারবাদী, বিধবা-বিবাহ-পক্ষপাতী এবং জাতিভেদ-দ্বেষী ব্রাহ্মদিগকেও, এমন কি যাঁহারা কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস করেন না, অথচ বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকেও পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কেবল হিন্দু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ইঁহারা সকলেই যদি হিন্দু, তবে স্বদেশপ্রেমিক স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন হিন্দু নহেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর একবার বলিয়াছিলেন যে, 'আমি একজন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টিয়ান"; এই নিয়মানুসারেও তাহা হইলে পৌত্তলিক হিন্দু, অপৌত্তলিক হিন্দু, জাতিভেদপ্রার্থী হিন্দু, এবং যবনান্ন ভোজী হিন্দু, ব্রাহ্ম হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী হিন্দু, এইরূপ অসংখ্য জাতীয় হিন্দুর আবির্ভাব হয়। বলা বাহুল্য যে, আমরা এই সকল স্থলে হিন্দু ধর্ম্ম অর্থে বেদ উপনিষৎ প্রতিপাদিত হিন্দু ধর্ম্মের কথা বলিতেছিনা, বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের কথা বলিতেছি।

এ সম্বন্ধে আমাদিগের সংস্কার এই যে, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ অধিকার কিছুই হইতে পারে না। যাহা কিছু অধিকার হওয়া সম্ভব, সে অধিকার কেবল হিন্দুর নহে, খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই সাধারণ অধিকার। মনে করুন একজন ব্রাহ্ম যদি কোন দেব মূর্ত্তির অপমান শুনিয়া দুঃখিত হন, তাহা হইলে জুমামস্‌জিদে মৃত শূকর শাবকের কথা শুনিয়াও তাহার দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য। এবং তাহা যদি হন, তবে কেবল হিন্দু জাতির সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য কোন সভায় তাঁহার যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। জগতের যে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর যখনই কোন অত্যাচার হইবে, দুঃখিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

এ সম্বন্ধে আমাদিগের শেষ কথা এই যে, হয়ত মহা হিন্দু সমিতির অনুষ্ঠাতা বৃদ্ধহিন্দু চিন্তা করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের নামেই সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর একত্রিত হইবার সম্ভাবনা। তিনি দৃষ্টান্তস্থলে সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস উপলক্ষে আন্দোলন এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুর সম্মিলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে আন্দোলন, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধামূলক, তাহা

আদৌ ধর্ম্মগত নহে। সুরেন্দ্র বাবু না হইয়া যদি রাম, শ্যাম, কিম্বা যদুর ন্যায় কোন ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইতেন, আর নরিস সাহেব শালগ্রামশিলা কেবল আনয়ন নয়, হাই-কোর্টের অঙ্গনে চূর্ণ করাইতেন, তাহা হইলেও এরূপ আন্দোলন হইত কি না, আমাদিগের সন্দেহ। ধর্ম্মের নামে সে সজীবতা হিন্দু জাতির মধ্যে এখন আর নাই, তবে তাহা দ্বারা সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের একত্রিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

এই স্থলে বৃদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আরও যে দুই একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা তাহারও সমালোচন করিব। তিনি যে ব্রত হিন্দু জাতির লক্ষ্য রূপে নির্ণীত করিয়াছেন, তাহা যে কোন ধর্ম্মব্রত অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা আমরা বলি না, স্বদেশ এবং স্বদেশের উদ্ধারসাধন অপেক্ষা মহাব্রত মানব জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সে ব্রত গ্রহণ করিতে যাইয়া ধর্ম্মের আচ্ছাদন লইব কেন? ধূপ ধূনা দীপ জ্বালাইতে যাইব কেন? যাঁহারা ধূপ ধূনাকে দেব পূজার আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাহা করিতে পারেন। কিন্তু হয়ত অনেকের নিকট তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় হইবে। আর একটি কথা এই, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য অথবা শাস্ত্রী শ্রেণী মধ্যে তেমন উপযুক্ত ব্যক্তি পাইলে অন্য ব্যক্তিকে না করিয়া তাঁহাকেই সভাপতি মনোনীত করা যাইবে কেন? এসকলেরই উদ্দেশ্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণ; ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়া কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা। কিন্তু উদ্দেশ্য যতই কেন মহৎ হউক না, আমরা তাহার সিদ্ধির জন্য কখনই আমরা কৌশলের (Policyর) সাহায্য লইতে প্রস্তুত নহি। বৃদ্ধ হিন্দু যে জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন; "গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা যেমন সাধারণ হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনের উপায়, এমন অন্য কিছুই নহে।" কৌশল লক্ষ্য না হইলে বৃদ্ধ হিন্দু কেবলই গো জাতির রক্ষার কথা বলিতেন না। গোজাতির ন্যায় ভারতবর্ষের মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি সমস্ত গৃহপালিত পশুই হীনাবস্থ; গোজাতি অধিক উপকারী সত্য, কিন্তু গৃহধর্ম্মের সাহায্যের জন্য অন্যান্য গৃহপালিত পশুদিগেরও উন্নতি আবশ্যক। যদি কেবল ভারতের কৃষির উন্নতিই বৃদ্ধ হিন্দুর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের রক্ষার কথাও উল্লেখ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া গোজাতির দোহাই দিয়া সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে একত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। এরূপ কৌশলেও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; থাকিলেও তাহা দ্বারা পরে একটি গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবে। আমরা সে কথা পরে বলিব।

এ সম্বন্ধে আমাদিগের মত এই যে, আমরা যাহা কিছু করিব, তাহা স্পষ্টভাবেই করিব। একের দোহাই দিয়া অন্য কার্য্য কখনই করিব না। স্বদেশ এবং স্বজাতির মঙ্গল সাধন অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্ম আবার মহত্তর? সেই মহাধর্ম্ম যখন আমাদিগের লক্ষ্য, তখন তাহার উপর খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান অথবা হিন্দু ধর্ম্মের আরোপ করিতে যাইব কেন? যিনি জন্মভূমির এই দুরবস্থা

দেখিয়া এবং আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়াও এই মহা ব্রত সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন, সহস্র কৌশল অবলম্বন করিলেও তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম উদ্দীপিত হইবে না। শত শত দীপ প্রজ্বলিত করিলেও তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দুরীভূত হইবে না।

ধর্ম্মের এই অংশটুকুবাদ দিলে বৃদ্ধ হিন্দুর সহিত আমাদিগের আর বড় মতদ্বৈধ হয় না। তিনি ভগবৎগীতা হইতে যে অংশ টুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের কেন, সকল দেশের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই উপযুক্ত। এই সম্প্রদায়পূর্ণ দেশে বাস্তবিকই ইহার অপেক্ষা সর্ব্ববাদীসম্মত স্তোত্র আর হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ স্তোত্রে কি সকলে পরিতৃপ্ত হইবেন? এমন শুভ দিন কি আসিবে যে, ভারত সন্তান সকলে একই উদ্দেশ্যে, এক স্থানে সমবেত হইয়া, হিন্দু, ব্রাহ্ম, জৈন, শীক, সকলেরই উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় দেবকে স্মরণ করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন? ইহা করিতে হইলে সম্প্রদায়গত পার্থক্য পরিত্যাগের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে পার্থক্যের জন্য যে জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ, তাহা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে এই রূপ সম্মিলন কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু এই সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা সমিতির আরও দুই একটি উদ্দেশ্যের সমালোচন করিব।

বৃদ্ধহিন্দু এক স্থলে বলিয়াছেন যে, মহাহিন্দুসমিতি আপনাদিগের অধীনে নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবেন। আমরা বলি যে, কেবলই সংস্কৃত বিদ্যালয় কেন, স্থানীয় অভাব বুঝিয়া সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী অথবা তাদৃশ অপর কোন বিদ্যালয় সংস্থাপনে যত্নবান হওয়া সমিতির কর্ত্তব্য।

এ স্থলে আর একটি কথা বলিলেই আমাদিগের এ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হয়। মহাহিন্দু সমিতির অধিবেশন সময়ে পঠিত হইবার জন্য বৃদ্ধ হিন্দু কতকগুলি আর্য্য নামাবলী গ্রথিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম কথা এই যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম এরূপ আছে যে ঐ সকল নামধারী ব্যক্তিগণ জগতের যে কি মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং কিসেই বা যে তাহারা উত্তর বংশীয়গণের শ্রদ্ধার পাত্র, তাহা আমাদিগের অবগত হইবার উপায় নাই। সংস্কৃত দুই একখানি গ্রন্থে তাহাদিগের নামোল্লেখ আছে মাত্র। এই সকল নাম-শেষ ব্যক্তিগণের নাম পঠিত হইলে কোন উপকার হইবে কিনা; তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোন শ্রদ্ধেয় মহা পুরুষের নাম শ্রবণ মাত্র যে ভক্তির ভাবের উদয় হয়, তাহা সকল সময়ে এবং সকলের হৃদয়ে সম্ভব নয়, দুই চারিজন স্বদেশ এবং স্বজাতিপ্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণের হৃদয়ে সেরূপ ভাব উদ্দীপিত করিতে হইলে, নামধারীগণের ক্রিয়াকলাপ বর্ণন করা আবশ্যক। সুতরাং কেবল কতকগুলি নাম পাঠ করিলেই সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, সকলকে তাহাদিগের ক্রিয়া কার্য্য বুঝাইয়া দিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই নামাবলীর মধ্যে এমন অনেক নাম আছে, যাহাদিগকে লোকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে। যদি নিষ্ঠ হিন্দু লইয়াই এ সভা গঠিত হয়, তবে রামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য বলিলে

নিশ্চয়ই অনেকের হৃদয়ে ব্যথা লাগিবে। জানি না, যিনি লোকরঞ্জনের জন্য গোজাতির রক্ষা-প্রার্থী, অপর লোক ছাড়িয়া ভট্টাচার্য্য অথবা শাস্ত্রী শ্রেণীর লোককে সভাপতি করিতে উদ্যত, এবং ধূপ,দীপ, মালা, চন্দনে হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে চান, তিনি কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রকে মনুষ্য বলিতে সাহস করিলেন। সভার হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রকে, দিলীপ অথবা সগরের ন্যায় মনুষ্য বলিলে চলিবে না। এ সকল নাম অন্যভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে।

আমরা পাঠকবর্গকে সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী বলিয়াছি। সভার অনুষ্ঠাতার সহিত যে সকল স্থলে আমাদিগের মতের বিভিন্নতা আছে, তাহাও বলিলাম। এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় সভার আবশ্যকতা ও তাহার ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহা হিন্দু সমিতির উদ্দেশ্য কার্য্য। একটি জাতিকে উন্নত করিতে হইলে তাহাকে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য মহাহিন্দু সমিতি প্রাণপণে যত্ন করিবেন। দেশীয় শিল্পের যাহাতে উন্নতি হয়, ভারত সন্তান যাহাতে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল বৃদ্ধিরও উপায় শিক্ষা করিতে পারেন, এবং মৃত ভারত সন্তানের প্রাণে অতীতের সুখময় দিনের কথা স্মরণ করিয়া, এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের অসীম কীর্ত্তি চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার নবজীবন সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য অন্তরের সহিত তৎপর থাকিবেন। এবং বক্তৃতা, গীত, সংকীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতি উপায় দ্বারা গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পাইবেন। অনুষ্ঠান পত্রে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেরূপ কার্য্য করিতে পারিলে এই সভা দ্বারা যে একটি মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, ভারতবর্ষ সভায় সভায় ভারাক্রান্ত হইলেও এখানে এইরূপ একটি সভার বাস্তবিকই অভাব আছে।

মহাহিন্দু সমিতির ন্যায় সমতির অভাব আছে সত্য, কিন্তু যেভাবে ইহার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ একটি সভা আদৌ সংস্থাপিত হইতে পারে কিনা এবং পারিলেও তাহা কতদূর স্থায়ী হইবে, যাহা আমরা বলিতে পারি না। এই সম্প্রদায়-বিভিন্ন এবং জাতি-বিদ্বেষপূর্ণ দেশে ধর্ম্মের নামে কোন একটি মহৎ কার্য্য করিবার দিন এখনও আসে নাই। এখানে সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম এত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, এবং সমাজের অবস্থা এতই শোচনীয় যে, ধর্ম্মরক্ষা করিতে যাইয়া অনেক স্থলেই সমাজের বিদ্বেষ ভাজন হইতে এবং একটি না একটি সম্প্রদায়গত ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে হয়। এরূপ স্থলে ধর্ম্মের নামে সকল শ্রেণীর লোককে একত্রিত করিবার চেষ্টা অলীক কল্পনা মাত্র। জগতে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কেবল এক দেশের অথবা এক শ্রেণীর জন্য সৃষ্ট নহেন। প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিই তাঁহাদিগের জন্য এবং তাঁহারাও প্রত্যেক দেশ ও জাতির জন্য। ইঁহারা সকল ধর্ম্ম হইতেই সার গ্রহণ করিতে পারেন, এবং কাহারও হৃদয়ে ব্যথা না দিয়া

অকুণ্ঠিত চিত্তে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন। ইঁহারা সমকালীন লোকগণের নমস্য এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের পূজনীয়। মহাহিন্দু সমিতির অনুষ্ঠাতা এই মহাপ্রাণ মানব শ্রেণীর এক জন। তিনি আপনার উদারতা গুণে সমগ্র হিন্দু জাতির সম্প্রদায়গত পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে এক মহাসূত্রে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রস্তুত হইলেও সমাজ যে তজ্জন্য প্রস্তুত, তাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। তাঁহার সেই শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ দেবতাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা সেই শুভ দিন দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেও, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব বলিয়া আশা-শূন্য।

ধর্ম্মের নামে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করিতে যাইয়া, এবং তজ্জন্য গোজাতির রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজের আর একটি গুরুতর অনিষ্ঠ ঘটাইবার সম্ভাবনা। এই গোবধ লইয়া যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কি ভয়ানক বিদ্বেষ দিন দিন প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাহার উপর আবার এ সকল প্রসঙ্গ কেন? গোজাতির উন্নতি সাধনে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু যাহা সম্প্রদায় বিশেষের ভক্ষ্য, তাহাকে ধর্ম্মের নামে রক্ষা করিতে যাইয়া-আত্ম বিরোধের প্রয়োজন কি? গোজাতি যে মানবের বিশেষ উপকারী, তাহাতে সন্দেহ কি? কেবল গোজাতি কেন, গৃহপালিত পশু মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে মনুষ্যের উপকারী। কিন্তু তাহা বলিয়া যে এই সকল জন্তুর মধ্যে কোনটি পবিত্র এবং ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রক্ষণীয়, এ বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ করিবার চেষ্টা না করাই ভাল। ইহাতে সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন কিছুতেই ইষ্ট সাধিত হইবে না।

আমরা বলিয়াছি যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হইলেও ভারতবর্ষ যেরূপ নানা শ্রেণীর এবং নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের দ্বারা অধ্যুষিত, তাহাতে এরূপ উপায় ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সম্প্রদায়গত অথবা ধর্ম্মগত পার্থক্য আছে বলিয়া কি আমাদিগের তবে সত্য সত্যই একত্রিত হইবার উপায় নাই? ভারতবর্ষের এই বহুযুগব্যাপিনী অমানিশা কি আর প্রভাত হইবে না? যে সুখসূর্য্য একবার অস্তমিত হইয়াছে, আর কি তাহা উঠিবে না? উঠিবেই উঠিবে। এই দুঃখ যন্ত্রণার শেষ হইবেই হইবে। ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্যে পরিমিত পাপের জন্য অপরিমিত দণ্ড কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এ নিয়ম কেবলই ব্যক্তিগত নহে, ব্যক্তির ন্যায় জাতির উপরেও ইহা প্রয়োজ্য।

ধর্ম্মের নামে সমস্ত হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা সম্ভব কিনা, এ বিষয় লইয়াই বৃদ্ধ হিন্দুর সহিত আমাদিগের মতের বিভিন্নতা, কিন্তু অন্য দুই একটি সামান্য বিষয় ভিন্ন অপর সকল স্থলেই তাঁহার প্রস্তাবে আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহার প্রত্যেক কথায়, বক্তৃতায়, প্রার্থনায়, গীতে তাঁহার মহা-প্রাণতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। তিনি ভারতবর্ষের যে অভাব অনুভব করিয়া এই মহাহিন্দু সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, অনেকেই সে অভাব অনুভব করিতেছেন। শীঘ্রই হউক, অথবা বিলম্বেই হউক, তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। হয়ত সে

শুভদিন এই বৃদ্ধ হিন্দু অথবা এই প্রবন্ধ-লেখক কেহই দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু তথাপিও যে সে দিন আসিবেই আসিবে, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। আমরা ধর্ম্মের নাম করিয়া রাজনৈতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক, কিন্তু যদি কখন ঈশ্বর ও মাতৃভূমি-অঙ্কিত ধ্বজা উড়াইবার দিন আমাদিগের জীবনে আইসে, তবে সেই ধ্বজা হস্তে বৃদ্ধ হিন্দুর পার্শ্বে দাঁড়াইতে ভীত হইব না। আমরা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সফল হউক, এবং ঈশ্বর ও মাতৃভক্তি-অঙ্কিত পতাকা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইতে থাকুক। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান, তুমিই আমাদিগের সহায়; জননী জন্মভূমি, তুমিই আমাদিগের আরাধ্যা দেবী; তোমরা উভয়ে ভারত সন্তানের প্রত্যেককে বৃদ্ধ হিন্দুর আশা পূর্ণ করিবার উপযুক্ত বল দেও।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

তীর্থ দর্শন ও দেশভ্রমণ।

তীর্থদর্শন ভারতবাসীর একটী অতি পুরাতন জাতীয় প্রথা ও জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভদ্র অভদ্র, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী ও পুরুষ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই সুবিধা মত কোন না কোন তীর্থ দর্শনের অভিলাষে গমন করিয়া থাকেন। প্রাচীন কালে প্রথমে যখন তীর্থ দর্শন প্রথা সংস্থাপিত হয়, তৎকালে বাস্তবিক উহার উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া সুকঠিন। আপাতত পুণ্য সঞ্চয়ই উহার প্রধান উদ্দেশ্য। তীর্থস্থানে গমন করিয়া অন্তরের সহিত দেবার্চ্চনা করিলে ধার্ম্মিক ব্যক্তির পুণ্য সঞ্চয় না হইবে কেন? কিন্তু বাস্তবিক এই প্রকার ব্যক্তির সকল স্থানই তীর্থস্থান, তিনি সকল স্থানেই চেষ্টা ও যত্ন-দ্বারা দেবারাধনায় মনোসংযোগ করিতে পারেন। অতএব কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিরূপিত সময়ে গমন করিবার অন্যান্য আবশ্যকতা থাকার সম্ভব। এতদ্ব্যতীত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করিবারও আবশ্যকতা আছে, তাঁহারা এরূপ মনে করিতেন। সুতরাং দেশভ্রমণ তীর্থ পর্য্যটনের একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দেশভ্রমণ, বিশেষ বিশেষ স্থানে গমন, এবং নানা জাতীয় লোকের সহিত একত্র সম্মিলন ও দেবার্চ্চনার ভিন্ন ভিন্ন ফল তীর্থ দর্শনে সংশ্লিষ্ট আছে।

আপাতত আধুনিক তীর্থ পর্য্যটন প্রথা যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও প্রাণনাশক, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। যখন এই প্রথা প্রথমে সংস্থাপিত হয়, তখন বোধ হয়, উহা স্বাস্থ্যোন্নতির একটি উপায় স্বরূপ ছিল। এই দুইটি প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে, প্রতি বৎসর আমরা জ্ঞাত হই যে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাত্রীর মধ্যে ভয়ানক পীড়া ও মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে। কখনও শুনিতে পাই যে, অমুক মেলায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ দেশে দেশে রোগ বিস্তার করিয়া যাইতেছে। অথচ তীর্থস্থান গুলিকের বিষয় চিন্তা করিলে সহজেই বিশ্বাস হয় যে, সেই সকল স্থান স্বভাবত স্বাস্থ্যপ্রদ; সুতরাং চেষ্টা করিলে এখনও অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলিকে স্বাস্থ্যপ্রদ করা যাইতে পারে।

এদেশে তীর্থ স্থানের মধ্যে গঙ্গাসাগর, জগন্নাথ ক্ষেত্র, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অগ্রবন, মথুরা. বৃন্দাবন, হরিদ্বার, জলামুখি ও দ্বারকাই প্রধান। এতদ্ব্যতীত কতকগুলিন স্থানীয় তীর্থ স্থানও দেশের ভিন্নং প্রদেশে আছে; যথা—কালীঘাট, তারকেশ্বর, সীতাকুণ্ড, যোগমায়া, বক্রেশ্বর, নবদ্বীপ ইত্যাদি।

উল্লিখিত কয়েকটি স্থানের মধ্যে, গঙ্গাসাগর, জগন্নাথক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, জলামুখী, এ কয়েকটিই মনোরম্য স্থান। এবং এ সকল স্থানেই প্রায় জল পথে গমন করা যাইতে পারে। সকল গুলিই সমুদ্র বা সুবৃহৎ নদীতীরে অবস্থিত। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ জলপান করিয়া শরীর ও মন প্রফুল্লিত হইলে, তাঁহার কৃপায় ঐ সমুদয় সুখ সম্ভোগ করা যায়। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তাঁহার পূজায় মনোনিবেশ করা বিশেষ সুবিধাজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অসাবধানতাবশত ঐ সমুদয় স্থান পরিতোষজনক ও স্বাস্থ্যপ্রদ না হইয়া অনিষ্টকর ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের নিবাসীগণ চিরকাল স্থলে বাস করে, সমুদ্র কিরূপ, তাহা কখন নয়নগোচর হয় না. সুতরাং জীবনের মধ্যে দুই একবার দুস্তর সুনীল তরঙ্গমালাপূর্ণ সমুদ্র দর্শন করিয়া সেই অসীম অনন্ত পুরুষের মহৎভাব কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সক্ষম হয়, ইহা অতি বাঞ্ছনীয়। বিশেষত, তথায় গমনাগনের জন্য কয়েক দিন জলপথে যাত্রা করিতে হয়, তাহাতে নদীগর্ভ হইতে নানা রমণীয় স্থান দর্শন করিয়া ও ক্ষুদ্র তটিনী কিরূপে ক্রমে বিস্তীর্ণ ভাব ধারণ করিয়া সাগরে আত্ম সমর্পণ করে ও তাহার সহিত মিলিত হয়, এ সমুদায় ব্যাপার দেখিলে বিস্ময়, কৌতুহল, ও প্রীতির উদয় হয়। জ্ঞানদ্বার উন্মুক্ত হয়, অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়; দেশ বিশেষের লোকের সহিত ভালবাসা জন্মে। এক্ষণে যে ঐ সমুদয় সুখময় ফলের বিপরীত ফল জন্মে, তাহার অনেক কারণ আছে। যথা;—প্রথমত, যাত্রীর অনভ্যাস বশত আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে হয় বলিয়া অন্তরে উদ্বেগ ও ভয় জন্মে, পরে জলপথে গমন ও ভয়ঙ্কর সমুদ্র দর্শন করিয়া, মন নিস্তেজ ও নিরুৎসাহিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ত, সুবৃহৎ ও সুবিধাজনক নৌকা ও আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারায়, পথের মধ্যে বিস্তর কষ্ট পাইতে হয়। উপযুক্ত স্থানাভাবে নৌকায় শয়ন এবং নিদ্রার অভাবে সাগরদ্বীপে পৌছিয়া বিস্তীর্ণ স্থানে স্বচ্ছন্দ ভাবে গমনাগমন করিতে না পারায়, বহুলোক সমাগম হেতু এবং মল মূত্রাদি পরিত্যাগের সুব্যবস্থার অভাবে এবং স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য দ্রব্যের অনাটনে শরীর মন অবসন্ন ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। এজন্য যাত্রার পূর্ব্বে এই সমুদয় বিষয় বেশ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া যে যে বন্ধুগণের সহিত একত্র গমন করিতে হইবে, তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে এক খানি উপযুক্ত নৌকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। পরে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যা সংগ্রহ করিয়া হর্ষান্বিত চিত্তে তীর্থের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া যাত্রা করিবেন। যথা সময়ে আহার নিদ্রা করিতে হইবে; স্থানে স্থানে নৌকা হইতে তীরে অবতীর্ণ হইয়া, দেখিবার স্থান

থাকিলে, সেই স্থান দর্শন করিয়া যাইবেন। ইত্যবসরে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ লোক সমাগমের বিষয় অবগত হইয়া যাহাতে ঐ স্থানটি বাস্তবিক স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, তাহার সমুদয় ব্যবস্থা করিবেন। অতিরিক্ত জনতা হইলে বা কোন সংক্রামক রোগের সঞ্চার হইলে শীঘ্রই সেই স্থান পরিত্যাগ করত আপন আপন নৌকায় আরোহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন।

জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার তিন উপায়। প্রথম স্থলপথ, দ্বিতীয় সমুদ্রতীরে নৌকাগমন, তৃতীয় খাল দিয়া বাষ্পীয়পোত বা নৌকা গমন। প্রথমটি অত্যন্ত কষ্টজনক ও অনিষ্টকর। বঙ্গবাসীর বহুদূরে পদব্রজে ভ্রমণ করা অনভ্যাস, বিশেষত বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের। সুতরাং হটাৎ ঐ তীর্থদর্শনের অভিলাষে ভ্রমণ করিতে মনন করিয়া প্রতি দিন ৫।৭ ক্রোশ চলিলে, এবং অসময়ে স্নানাহারাদি করিলে, শরীর দুর্ব্বল ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। প্রায় কোন স্থলে রাত্রি যাপন করিবার জন্য সুবিধামত স্থান নাই; অর্থাৎ কেবল কর্দ্দমময় স্থানে শীতল বায়ুতে শয়ন করিতে হয়। কোন কোন স্থানে রোগের ভয় থাকে; সেই সমুদয় স্থান দিয়া ঐরূপ ক্লান্ত শরীরে গমন করিলে রোগাক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা; সুতরাং পুরীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে বা উপস্থিত হইয়াই রোগাক্রান্ত হইতে হয়, ক্রমে রোগ সংক্রামক আকার ধারণ করে, এবং বহু লোকের সমাগমে জলবায়ু সকলই দূষিত হয়, তথায় স্নান-আহারের সময় থাকে না। মনের মধ্যে ভয় বা উদ্বেগ জন্মে, ইত্যাদি নানা কারণে সংক্রামক রোগ বৃহদাকার ধারণ করিয়া অনেকের প্রাণবিনাশ করে। অনেকে রুগ্ন অবস্থাতেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন, পথিমধ্যে যে যে স্থান দিয়া গমন করেন, হয়ত তথায় রোগের বীজ বপন করিয়া আসিতে থাকেন। জলপথে গমন করিলে এই সমুদয় দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং গমনাগমনের বিশেষ ক্লেশ থাকে না, ইচ্ছামত খাদ্য সামগ্রী লওয়া যাইতে পারে, এবং স্বয়ং বহন করিতে হইবে না বলিয়া শয্যার বস্ত্রাদি লওয়া যাইতে পারে। এবং তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া শীঘ্র আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন।

গয়া যাইবার জলপথ নাই, স্থলপথে পদব্রজে বা বাষ্পীয় রেলপথে গমন করা যায়। পদব্রজে ভ্রমণ করিবার আপত্তি ও অসুবিধা উল্লেখ করিয়াছি, বিশেষত সমস্ত পথ বিপদ শূন্য নহে, সুতরাং রেলপথে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই পথে গমন করিলেও যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক আপনাদের আবশ্যকীয় শয্যাবস্ত্র ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে, সময় মত স্নানে আহার করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং কার্য্য সমাধা হইলে শীঘ্র সেই জনাকীর্ণ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা হইলে নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কয়েক দিবস বাস করিয়া পুণ্যাত্মা বুদ্ধদেবের প্রধান স্থান পরিদর্শন করত মনকে প্রফুল্লিত করিতে পারেন।

কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ও হরিদ্বার এই কয়েকটি স্থানেই জলপথে গমন করা যায়, কিন্তু অধিক সময় ও ব্যয় আবশ্যক করে, সুতরাং কতক পরিমাণে অসুবিধাজনক; এজন্য রেলপথে যতদূর যাওয়া যায়, ততদূর তাহাতেই যাওয়া উচিত, অবশিষ্ট

পথ সুবিধামত নৌকায় বা গাড়ীতে ভ্রমণ করিলেই চলিতে পারে।

বারাণসী বা কাশী—এক কালে অতি মনোরমা ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান ছিল, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। বিস্তীর্ণ গঙ্গানদীর উপর উত্তর তটে অবস্থিত, চতুঃপার্শ্বস্থ দেশের উপর আধিপত্য করিবার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু নানা কারণে অধুনা কাশী উত্তর পশ্চিমের একটি প্রধান অস্বাস্থ্যকর নগর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং কাশীধামে গমন করিতে হইলে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া গমন করা উচিত। অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যজনক স্থানে বাসস্থান লওয়া উচিত ও পূজাদি সমাধা হইলে, কালবিলম্ব না করিয়া প্রত্যাগমন করা আবশ্যক।

প্রয়াগ—গঙ্গা ও যমুনা এই দুই বিখ্যাত স্রোতস্বতীর সঙ্গম স্থলের নাম প্রয়াগ, এলাহাবাদ নগরের অতি নিকট। প্রয়াগ স্বভাবত অতি মনোহর স্থান; কিন্তু তথায় বহুলোক বাসের কোন বন্দোবস্ত নাই। প্রতি বৎসর শীতকালে তথায় একটি মেলা হয়, এবং ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হয়, সেই সময়েই ঐ স্থান ভয়ানক হয়। বিগত ১৮৮১ সালে প্রয়োগে একটি কুম্ভমেলা হইয়া গিয়াছে, তদুপলক্ষে তথায় প্রায় ১০০০০০০ দশলক্ষ লোকের সমাগম হয়; সুতরাং শীঘ্রই ঐ স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং ১১দিবস পরে ঐ স্থানে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, ক্রমে ঐ রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করে। কেহ কেহ বলেন যে, যাত্রীরা দেশ বিদেশে ঐ রোগের বীজ বপন করিয়াছিল, ঐ বিষয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যাত্রীরা বাটী-প্রত্যাগমন কালে অধিক পরিমাণে পীড়িত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য ঐ রোগ বহু ব্যাপক রূপ ধারণ করে নাই? যাহারা ঐ মেলা উপলক্ষে এলাহাবাদে গমন করে নাই, তাহাদিগের মধ্যে ঐ রোগ অতি সামান্য রূপে হইয়াছিল। অর্থাৎ যাহারা ঐ অস্বাস্থ্যকর স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছিল।

এই রূপে মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, জ্বলামুখী, ইত্যাদি তীর্থ দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিতে বিদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে যে সমুদয় কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হয়, সাধ্যানুসারে তাহার লাঘব করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া যাত্রা করা উচিত। হরিদ্বার ও জ্বলামুখী অতি শীতল স্থান, সুতরাং ঐ দুই স্থানে গমন করিতে হইলে, তজ্জন্য উপযুক্ত পরিচ্ছদ ও শয্যা সঙ্গে লওয়া আবশ্যক। উহার অভাবে জ্বর, কাশী, বাতাদি রোগ জন্মিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা।

এই কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিলে বিখ্যাত গঙ্গানদী যে কিরূপে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া আসিয়া ক্রমে পললময় ভূমিতে পতিত হইয়াছে, ও কিরূপে প্রয়াগে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে, ও পরে কি প্রকারে ভাগিরথী ও হুগলী নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। বিশেষত তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে আর অধিক লেখা অনাবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ

করিয়াছি যে, দেশভ্রমণ তীর্থপর্য্যটনের একটি প্রধান অঙ্গ। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পুণ্য সঞ্চয় ব্যতীত তীর্থ দর্শনে দেশ ভ্রমণের ফল ফলিয়া থাকে। সুতরাং দেশ ভ্রমণে শুভ বা অশুভ ফলের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। নানা কারণে দেশ ভ্রমণ স্বাস্থ্যপ্রদ বা স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ হইতে পারে।

দেশভ্রমণ নানা প্রকারে হইয়া থাকে; ভিন্ন২ সময়ে, ভিন্ন২ স্থানে, ভিন্ন২ অভিপ্রায়ে দেশ ভ্রমণ করা যায়। অল্প বা অধিক কাল প্রবাসে ক্ষেপণ করা যায়। ভ্রমণের উপায়ও অনেক প্রকার; যথা, পদব্রজে, নৌকায়, অশ্ব উষ্ট্র, গো-মহিষাদি জন্তু-চালিত যানে, বা বাষ্পীয় রথে, বা বাষ্পীয় পোতে ভ্রমণ করা যায়।

যে উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করা যায়, তাহার উপর উহার উপকারিতা নির্ভর করে। সচরাচর এদেশের লোকে বিষয় কর্ম্ম, তীর্থ দর্শন, বন্ধুদর্শন এবং রোগের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির উপলক্ষে দেশ-ভ্রমণ করিয়া থাকে। কখন বা স্বেচ্ছামত দেশ ভ্রমণ করে, কখন বা বাধ্য হইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে হয়. এই দুই প্রকার ভ্রমণের মধ্যেও বিশেষ প্রভেদ আছে।

অধুনা বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে অনেককেই বহু দূরদেশ গমন করিতে হয়, বঙ্গবাসী ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা স্বেচ্ছামত উৎসাহিত মনে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে ঐ সকল দূরদেশে অজানিত স্থানে ও ভিন্ন জল বায়ুতে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই সুস্থ শরীরে স্বকার্য্য সাধন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অথচ আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পদূর গমন করিতে হয়, অসময়ে যাত্রা করিয়া, বা অসময়ে স্নান আহার করিয়া বা নিরুৎসাহিত মনে গমন করেন বলিয়া তাঁহারা পীড়িত হইয়া পড়েন।

কাহাকেও বা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূরদেশে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, তাহাতে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয় না; স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সুবন্দোবস্ত করা হয় না। সুতরাং উদ্বিগ্ন মনে ব্যস্ত হইয়া যাত্রা করিতে হয়; অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দূর গমন করিতে হয়, তজ্জন্য নানা প্রকারে শরীর মন রুগ্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অভ্যাস ও অনভ্যাসের উপর দেশ ভ্রমণের উপকারিতা বা অনুপকারিতা নির্ভর করে।

দেশভ্রমণে যাঁহাদিগের অভ্যাস নাই, যাঁহারা একস্থানে বহু কাল যাপন করিয়াছেন, সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইলে তাঁহাদিগের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভয় জন্মে। তাঁহারা মনে করেন যে, বাটী পরিত্যাগ করিলে বিদেশে অজানিত স্থানে কি রূপে যাইবেন বা থাকিবেন। হটাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তাঁহারা অনভ্যাসবশতঃ আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতেও সুবিধামত আয়োজন করিতে না পারায় অশেষ ক্লেশ সহ্য করেন। বিশেষত রুগ্ন ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের উহাতে নানা প্রকারে অনিষ্ট, এমন কি প্রাণবিয়োগ হইবারও সম্ভাবনা। কিন্তু যদি তাঁহারা ভ্রমণ কালের সমস্ত সুবিধা করিতে পারেন; কোন্ স্থানে যাইতে হইবে, কতদিন থাকিতে হইবে, তথায় কি২ দ্রব্য সামগ্রী

পাওয়া যায়, কিরূপ যানাদি প্রাপ্তব্য, এই সমুদয় বিষয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির সমভিব্যাহারে গমন করিতে পারেন. তবে কোন অসুবিধা না হইয়া বরং স্ফূর্ত্তি, স্বাস্থ্য-লাভ ইত্যাদি সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

অভ্যস্ত ভ্রমণ। অধুনা অনেকেই রেলওয়ে ট্রেনের দৈনিক যাত্রী হইয়াছেন; তাঁহারা প্রতিদিন প্রাতে বাটী হইতে কর্ম্ম স্থানে গমন করেন; ও স্বায়ং কালে তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। এই রূপ ভ্রমণ কতক পরিমাণে সুবিধাজনক হইলেও ইহা দ্বারা সময় নষ্ট হয় ও স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। শীত, গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই প্রাতে ৫ টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ক্ষুধা উদ্রেকের পূর্ব্বেই ৬।৭ টার মধ্যে কিঞ্চিৎ আহার করিতে হয়। পরে তাঁহারা পদব্রজে বা কোন প্রকার গাড়ীতে উদ্বিগ্ন চিত্তে ষ্টেসনে পৌঁহুছিয়া ট্রেণে কতকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, ট্রেণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম স্থানে গমন করেন। এই শারীরিক পরিশ্রমের পর ৫।৬ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। বাটী আসিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তির নিমিত্ত শীঘ্র পান ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই রূপে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। পারিবারিক বিষয়ে তত্ত্বাবধারণের সময় থাকে না, মানসিক বৃত্তিরও বিরাম থাকে না। সে সময়ে আহার ও আহারের পরপরিশ্রম হেতু অজীর্ণ বা ক্ষুধা-মান্দ্য বা অম্লরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন সেই এক সময়ে এক স্থানে এক ভাবে গমন করায় চিত্তের পরিবর্ত্তন হয় না, মনের স্ফূর্ত্তি হয় না।

যে উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তাহার উপর ভ্রমণের উপকারিতা নির্ভর করে। ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, চিকিৎসক মারীভয়ের সময় রোগীর চিকিৎসার জন্য বিশেষরূপে নিয়োজিত হইয়া যাত্রা করেন। এবং যখন ২।৩টী বন্ধু নিয়মিত বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া একত্রিত হইয়া দুই তিন মাসের জন্য স্বেচ্ছানুসারে নানা ঐতিহাসিক বিখ্যাত স্থান পরিদর্শন করিতে ভ্রমণ করেন; বা যখন কোন সঙ্কট রোগের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য বা শরীরকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিবার মানসে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ভ্রমণ করেন, কিম্বা যখন কেহ কোন অশুভ সমাচার পাইয়া দূর দেশে যাত্রা করেন বা সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষে তার যোগে আদেশ পাইয়া, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে গমন করিতে বাধ্য হয়েন, তাঁহাদের ভ্রমণের ভল আবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

পরিশেষে যে উপায়ে ভ্রমণ করা যায়, তাহার উপরও উহার উপকারিতা নির্ভর করে। স্বাস্থ্যের জন্য ভ্রমণে কিঞ্চিৎ শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিলেই উপকার হয়। সচরাচর অল্প দূর ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত পদব্রজে ভ্রমণ করাই উপকারী। যদি প্রতি দিন নিয়মিত সময়ে, স্নান আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাত না জন্মে, এবং পথিমধ্যে বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান থাকে, তবে প্রতিদিন ২।৩ বা ৪ ক্রোশ করিয়া চলিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর দেশের মধ্য দিয়া,

বা বর্ষা বা হেমন্ত কালে ভ্রমণ করা অবিধেয়।

যদি দূরদেশে গমন করিবার মানস থাকে বা শীঘ্র কোন স্থানে গমন করা আবশ্যক হয়, তবে অধুনা রেলওয়ে ট্রেণে গমন করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু ট্রেণে গমন করিলে শীঘ্র নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় মনে করিয়া ভ্রমণের উপযোগী আবশ্যকীয় সামগ্রী লইতে ঔদাস্য করা উচিত নহে। প্রতিদিন যথাসময়ে আহার নিদ্রা হইতে পারে, এরূপ স্থানে যাত্রাভঙ্গ করা, এবং আবশ্যক মত বিশ্রামের পর পুনরায় বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করা উচিত। একাদিক্রমে ৩।৪।৫ দিন ট্রেণে বাস করিয়া ভ্রমণ করার অনিষ্টকর ফলের বিষয় আমরা বিশেষ অবগত আছি। সচরাচর কোন গুরুতর অনিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু রুগ্ন, দুর্ব্বল বা সামান্য অসুস্থ শরীরে ঐরূপ ভ্রমণ করিলে ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে। সচরাচর গুরুতর অনিষ্ট না হইলেও শিরোবেদনা, কর্ণের মধ্যে অসুখজনক শব্দ, দৃষ্টিক্ষীণতা, অঙ্গ বেদনা, অতিনিদ্রা বা অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে এবং ভ্রমণের উপকারিতা হ্রাস হয়।

যদি সময়ের অনাটন না থাকে এবং প্রশস্ত দ্রুতগামী ও পরিষ্কার নৌকা দুষ্প্রাপ্য না হয়, তবে সুবিধামত সময়ে এতদ্দেশীয় বৃহৎ নদীতে কিছুকাল জল পথে ভ্রমণ করিলে বিশেষ উপকার আছে। ইহাতে যাতায়াতে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমেরও ক্ষতিপূরণ হয়। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন হেতু শোণিত শোধিত হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও খাদ্য সহজে পরিপাক হয়। সময়ে সময়ে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কোন স্থান দর্শন করা যাইতে পারে, অভাবে কিঞ্চিৎ পদচারণ করাও যাইতে পারে। একমাস কাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পুনরায় অধিক আগ্রহের সহিত স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়।

অশ্বারোহণের প্রথা এদেশে এত অল্প যে, তাহা অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করা বাঞ্ছনীয় ও উপকারী হইলেও এক্ষণে তদ্বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া অব্যবস্থা হইবে। অশ্বারোহণে অনতিদূর ভ্রমণ করিয়া আবশ্যকমত বিশ্রামলাভ করিবার সুবিধা থাকিলে, বিশেষত দুই এক বন্ধুর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিলে অনেক প্রকারে উপকার হয়। পদচালনে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না, অথচ অপেক্ষাকৃত অধিক দূর গমন করা যায়, অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে গমন করা যায়। এজন্য অধিক বায়ু সেবন করা হয়, অথচ ব্যয় অল্প হয়।

সচরাচর আমাদিগকে যে প্রকার শকটে ভ্রমণ করিতে হয়, তাহা অতি অসুবিধাজনক ও কষ্টদায়ক। এদেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আরো অনেকদিন শকট ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং যাহাতে ঐ সমুদয় শকটের গঠন পরিবর্ত্তিত হয়, যাহাতে শকটগুলি প্রশস্ত ও আরামজনক হয়, এবং রৌদ্র ও বৃষ্টির উৎপাত হইতে আরোহীকে রক্ষা করিতে পারে, এরূপ উপায় করা উচিত।

ভ্রমণের বিষয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে একটি বিষয়ে সতর্ক করিতে ইচ্ছা করি। বহুদূর বা বহুকাল ভ্রমণ করিয়া বা ভ্রমণের সময় অযথোচিত পরিশ্রম করিয়া বা যথা সময়ে আহার নিদ্রা অভাবে শরীর রুগ্ন বা বলহীন হইলে পর, কোন অস্বাস্থ্য-

কর স্থানে গমন করিলে তত্তৎস্থান নিবাসী-গণের অপেক্ষা শীঘ্র রুগ্ন হইয়া পড়িতে হয়। এইরূপ অবস্থায় বিসূচিকা বা অন্য সংক্রামক রোগ-বহুল যে স্থানে অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয়, অনেকে সেই সেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অতএব ভ্রমণকালে কোন কারণে বলহীন বা অসুস্থতা না জন্মে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, এবং ভ্রমণ শেষ হইলে নূতন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথাকার জল বায়ুর অবস্থা অবগত হইয়া উপযুক্ত স্থানে বাসস্থান স্থির করা আবশ্যক।

শ্রীধর্ম্মদাস বসু।
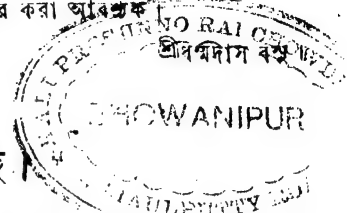
শাক্যসিংহের বিবাহ।

শাক্যগণ যে দিন শাক্য সিংহকে কৃষি গ্রামের জম্বুবৃক্ষমূলে সমস্ত দিবা ধ্যান সুখে অতিবাহিত করিতে দেখিয়াছিল—সেই দিন হইতেই তাহাদের মনে কুমারের গার্হস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিশঙ্কা জন্মিয়াছিল। তদবধি তাহারা সর্ব্বদাই ভাবিত যে, মৌহূর্ত্তিকগণের গণনার প্রথম পক্ষ * সত্য হইলে নিশ্চিত এই রাজবংশের উচ্ছেদ হইবে।

রাজা শুদ্ধোদন একদা প্রধান প্রধান শাক্যের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল ;—

"মহারাজ! কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে মৌহূর্ত্তিকগণ যাহা বলিয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কুমারের অঙ্গ লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তাহারা বলিয়াছিল যে, "যদি কুমারোঽভি নিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতো ভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক সম্বুদ্ধঃ। উত নাভি নিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তী চ বিজিতবান্ ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্ন সমন্বাগতঃ।" এই কুমার যদি গৃহ নিষ্ক্রান্ত হন, তাহা হইলে ইনি তথাগত অর্থাৎ বুদ্ধ হইবেন, আর যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে ইনি ধার্ম্মিকপ্রবর চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন এবং সপ্তরত্ন প্রাপ্ত হইবেন। অতএব "হে মহারাজ! আমাদের বিবেচনায় কুমারকে শীঘ্র শীঘ্র গৃহ নিবিষ্ট অর্থাৎ বিবাহিত করুন। স্ত্রীগণ বেষ্টিত থাকিলে কুমার রতি বা সুখ অনুভব করিবেন, তাহা হইলে আর নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবেন না। এই কার্য্য শীঘ্র নির্ব্বাহ করা উচিত : করিলে অবশ্যই এই চক্রবর্ত্তী বংশ অনুচ্ছেদ হইবে, আমরাও অন্যান্য রাজগণের নিকট সম্মানিত হইব।"

রাজা বলিলেন, "তবে আপনারা কুমারের উপযুক্তা কন্যা অনুসন্ধান করুন।"

বলিবা মাত্র শত শত শাক্য হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "আমার কন্যা কুমারের অনুরূপ, আমার কন্যা কুমারের অনুরূপ।"

রাজা শুদ্ধোদন কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "বড়ই দুষ্কর!—কুমার নিতান্ত দুরাসদ! আপনারা যান, কুমারকে গিয়া বলুন—তুমি কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।"

* শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হইলে গণকগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিল, এই কুমার যদি অভিনিষ্ক্রম করেন, অর্থাৎ গৃহ ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ হইবেন, আর যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন।

অনন্তর শাক্যগণ কুমারের নিকট গমন করিল। রাজার প্রস্তাব জ্ঞাত করিয়া বলিল "কুমার! আপনি কোন্ কন্যার পানিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা বলুন।"

কুমার প্রত্যুত্তর করিলেন, "সপ্তাহ পরে প্রত্যুত্তর দিব।" শুনিয়া অমাত্যগণ যথাগত স্থানে গমন করিল।

অমাত্যগণ গমন করিলে পর কুমার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন:—"কামের অনন্ত দোষ, তাহা আমি জানি। কামই সকল দুঃখের, সকল শোকের মূল, ইহা বিদিত আছি। কাম ভয়ঙ্কর খড়্গাধারার তুল্য, প্রজ্বলিত অগ্নিময়, ইহাও আমি জ্ঞাত আছি। আমার কামভোগে ইচ্ছা নাই, তাঁহাতে অনুরাগও নাই। আমি প্রতিদিন বৃক্ষমূলে ধ্যান সমাধিসুখে শান্ত চিত্তে বাস করিব,—সেই আমি কি প্রকারে স্ত্রীগৃহে থাকিব? যে আমি মৌনত্রয় * অবলম্বন করত বিজন বনে শোভা পাইব, সেই আমি কি স্ত্রী সংবৃত হইয়া শোভা পাইতে পারি? পুনর্ব্বার অন্যদিক্ ভাবিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, না,—বিকারের মধ্যে থাকিয়া নির্ব্বিকার শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য, সত্ত্ব পরিপাক দেখানই উচিত,—পরিবারদিগকেও বিনয় শিখান উচিত। পদ্ম কর্দ্দমে বৃদ্ধি পায়, জল মধ্যেই শোভা পায়। অতএব, বোধিসত্ত্ব যদি পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি শত শত প্রাণীকে মুক্ত করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র ও গৃহধর্ম্ম দেখাইয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহারা অনুরাগী ছিলেন না,—বিষয় ব্যাসক্ত ছিলেন না,—ধ্যান ভ্রষ্টও হন নাই, সুখচ্যুতও হন নাই, কি খেদ! যাহাই হউক, আমিও পূর্ব্ব বুদ্ধের দৃষ্টান্তে লোক শিক্ষা দিব, তাঁহাদেরই গুণ প্রচার করিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি একটী গাথা গান করিলেন। সপ্তদিবস আগত হইলে তিনি সেই গাথাটী পত্রারূঢ় করিয়া পিতৃ সমীপে প্রেরণ করিলেন। গাথাটী এই;—

"নচ প্রাকৃতা মম বধূ বনরূপ যা স্যাৎ
যস্যান ঈষদিগুণাঃ সদ সত্য বাক্যা।
যা মহ্যচিত্ত মভি রাধয় তেহ প্রমত্তা।
রূপেন জন্মকুল গোত্র তয়া সুসুদ্ধা॥ ১
সা গাথ লেখ লিখিতে গুণ অর্থ যুক্তা,
যা কন্য ঈদৃশ ভবেন্মম তাং বরে থাঃ।
ন মমার্থ প্রাকৃত জনেন অসংস্কৃতেন,
যস্যা গুণা কথয়মী মম তাং বরে থাঃ॥২
যা রূপ যৌবনধরা ন চ রূপ মত্তা,
মাতা স্বসা বৈ যথ বর্ত্ততি মৈত্র চিত্তা।
ত্যাগে রতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ দান শীলা,
ত্যং তাদৃশীং মম বধুং বরয়স্ব তাত!॥ ৩
যস্যাচ মাস্যু রখিলা ন চ দোষ মস্তি,
ন চ শাঠ্য ঈর্ষ্য ন চ মায় ন চ ভ্রক্ষ ভ্রষ্টা।
স্বপ্নান্তরেহপি পুরুষেণ পরেভি রক্তা,
তুষ্টা স্বকেন পতিনা সদ সংযত অপ্রমত্তা॥৪
ন চ গর্ব্বিতা ন অপি উদ্ধত ন প্রগল্‌ভা,
নির্মনি মান বিগতাপি ন চ চেটী ভূতা।
নচ পান শৃঙ্গ ন রসেষু ন শব্দ গন্ধ,
নির্লোভ ভিক্ষ বিগতা স্বধনেন তুষ্টা॥ ৫
সত্যোস্থিতা ন পিচ চঞ্চল নৈব ভ্রান্তা,
ন চ উদ্ধতা ন চ স্থিতা হিরিবস্ত্র ছন্না।
ন চ দৃষ্টি মঙ্গলরতা সদ ধর্ম্মযুক্তা।
কায়েন বাচ মনসা সদ শুদ্ধ ভাবা॥ ৬

---

* বাক্য মৌন, ইন্দ্রিয় মৌন, ও চিত্ত মৌন অর্থাৎ কথা না বলা, ইন্দ্রিয় পরিচালন না করা; চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা।

ন চ স্তান মিদ্ধ বর্হলা ন চ মান মূঢ়া,
মীমাংসযুক্ত স্থকৃতা সদ ধর্ম্মচারী।
শুশ্রৌ চ তস্য শুশুয়ে যথ শাস্ত্র প্রেমা,
দাসী কলত্রজনি যাদৃশ মাত্ম প্রেম ॥ ৭
শাস্ত্রে বিধিজ্ঞ কুশলা গণিকা যথৈচ,
পশ্চাৎ স্বপেৎ প্রথম মুস্তিতেত চ শয্যাৎ।
মৈত্রানুবর্ত্তি অকুহাপি চ মাতৃ ভূতা,
এতাদৃশীপি নৃপতে! বধুকাং বৃনীষ ॥ ৮
ব্রাহ্মানীংক্ষত্রিয়াংকন্যাংবৈশ্যাংশূদ্রীংতথৈবচ
যস্যা এতে গুণাঃসন্তিস্তাং মে কন্যাং প্রবেদয়॥
এই গাথা বাক্যের মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

যিনি প্রাকৃতা রমণী নহেন, যাহার ঈর্ষাদি মন্দগুণ নাই, যিনি সর্ব্বকালে সত্যবাদিনী, যিনি সদা সাবধান থাকিয়া আমার প্রতি চিত্ত ধারণ করিবেন, যাহার রূপ কুল গোত্র ও জন্ম সমস্তই বিশুদ্ধ, সেই রমণী আমার অনুরূপা বধূ। ১

যে কন্যা গাথা লিখনের অর্থ ও গুণ জ্ঞাত আছে, সেই কন্যা আমার পত্নী হইবার যোগ্যা, এবং আমার নিমিত্ত সেই কন্যাকে বরণ করুণ। যে কন্যার নিমিত্ত, সেই কন্যার গুণ বলিতেছি, সেই সকল গুণ যাহাতে থাকিবে তাহাকে আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করুন, অসংস্কৃত ও প্রাকৃত (অশুদ্ধ) মনুষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। ২

যে রূপে ও যৌবনে উত্তমা অথচ রূপ মত্তা বা যৌবন মদ মত্তা নহে, যে মাতার ন্যায় অথচ ভগ্নির ন্যায় মৈত্রচিত্তা অর্থাৎ সর্ব্বদা কল্যাণ প্রার্থিনী, যে ত্যাগশীলা, যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে * দান করিতে ভালবাসে, হে পিতঃ। তাদৃশী কন্যাকেই আমার বধূ হইবার জন্য বরণ করুন। ৩

সমস্ত দোষ যাহার নিকট নিরস্কৃত এবং যাহার কোন দোষ নাই, শঠতা, ঈর্শা, মায়া এ সকল কিছুই নাই, যে সপ্নেও পর পুরুষে আসক্ত হয় না এবং স্বীয় পতিতে সদা সন্তুষ্টা থাকে, এবং সদা সাবধান ও সংযত চিত্ত থাকে। ৪

যে গর্ব্বিতা নহে, উদ্ধতা নহে, প্রগলভা নহে, মানিনী নহে, অথচ চেটীর ন্যায়ও নহে, পানাভিলাষিনী নহে, রস গন্ধে ও শব্দে এ সকলে অভিলাষিণী নহে, নির্লোভ, প্রার্থিনী নহে, আপন ধনে সুসন্তুষ্টা থাকে। ৫

সত্যনিষ্ঠা, অচঞ্চলা, অভ্রান্তা, অনুদ্ধতা. লজ্জাবতী, মঙ্গল দর্শনে অভিরতা, সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণা, সদাসর্ব্বদা কায়মন বাক্যে শুদ্ধ ভাবা। ৬

ধর্ম্মে ও ধ্যানে আলস্য শূন্যা, ঋদ্ধি যুক্তা, মান মূঢ়া নহে, সর্ব্বদা মীমাংসাযুক্তা অর্থাৎ বিচার দর্শিনী, ধর্ম্মচারিনী, শ্বশ্রুর প্রতি, শ্বশুরের প্রতি যথা শাস্ত্র প্রণয়বতী, দাস দাসীর প্রতি ও অন্যান্য জনগনের প্রতি আত্ম সমদর্শিনী। ৭

শাস্ত্রে ও শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে কুশলা, পশ্চাৎ শয়ন ও অগ্রে উত্থান করে, সর্ব্বভূতে মৈত্রী স্থাপন করে, কুহক জানে না, মাতার ন্যায় কল্যাণবতী হয়, হে মহারাজ! আপনি ঈদৃশী বধূ বরণ করুন। ৮

ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা, বৈশ্য কন্যা, অথবা শূদ্র কন্যা, যাহাতে ঐ সকল গুণ থাকিবেক, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ বন্ধ নির্ব্বাহ করুণ। ৯

* শ্রমণ সন্ন্যাসী। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন, এইরূ[illegible] অনেকের মনে উদ্ভূত হইয়াছে। কত[illegible] লোক ইহার মূল। কোনও বৌদ্ধ গ্র[illegible] দেখা যায় না, বরং ভক্তি করিতে দেখা যায়। উপরোক্ত বুদ্ধ বাক্যটী তাহার অন্যতম নিদর্শন।
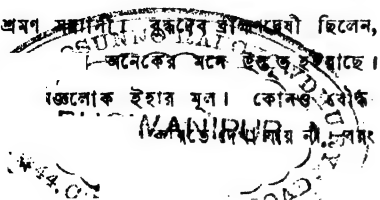
গাথা শুনিয়া সভাস্থ শাক্যগণ প্রমুদিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন পুরোহিতের হস্তে গাথা লিপি অর্পণ করিয়া বলিলেন, কপিলবস্তু মহানগরে ঈদৃশী গুণবতী আছে কি না অনুসন্ধান করিয়া দেখুন।

ন কুলেন ন গোত্রেন কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ॥

আমার কুমার কুল গোত্র প্রভৃতিতে বিস্মিত নহে, যাহাতে গুণ, সত্য ও ধর্ম্ম আছে, তাহাতেই কুমারের মন রত।

পুরোহিত গাথা লিপি লইয়া কপিলবস্তু নগরের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কুমারের অনুরূপ কন্যা দেখিলেন না। অনন্তর সর্ব্বশেষে দেখিলেন, দণ্ডপাণি শাক্যের গোপা নাম্নী কন্যা আছে, সেই কন্যাটী যথোক্তরূপ গুণসম্পন্না। পুরোহিত উপবিষ্ট হইলে গোপা তাঁহার সমীপগামিনী হইয়া, চরণ বন্দনপূর্ব্বক বলিলেন হে, মহা ব্রাহ্মণ! কি কার্য্যে আপনার আগমন হইয়াছে? পুরোহিত বলিলেন, শুদ্ধোদনের পুত্র পরম রূপবান্, তেজ ও গুণযুক্ত। তাঁহাতে দ্বাত্রিংশৎ মহা পুরুষ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। তিনি এই গাথা লিখিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যাহাতে এই সকল গুণ থাকিবে, সেই কন্যা আমার পত্নী হইবে।

পুরোহিত এই কথা বলিয়া গাথা লিপি গোপার হস্তে ন্যস্ত করিল। গাথা লিপি পাঠ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক গাথা ভাষায় বলিলেন,—

"মহ্যেতি ব্রাহ্মণ গুণ। অনুরূপ সর্ব্বে
সোমে পতির্ভবতু সৌম্য স্বরূপ রূপঃ।
ভণ হি কুমার যদি কার্য্য মা বিলম্বং
মা হীন প্রাকৃত জনেন ভবেয় বাসঃ॥"

হে ব্রাহ্মণ! আমাতে সমস্ত অনুরূপ গুণ আছে। সেই সুশোভন সৌম্য মূর্ত্তি কুমার আমার পতি হউন। আপনি কুমারকে গিয়া বলুন, যদি আমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যেন বিলম্ব না করেন এবং আমার যেন হীনজনের সঙ্গে বসতি করিতে না হয়।

অনন্তর পুরোহিত রাজার নিকট গমন করিলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন।

রাজা তখন মনে মনে বিচার করিলেন, কুমার নিতান্ত দুরাসদ, কি জানি, পাছে কোন অন্যথা ঘটনা হয়? অতএব এমন কার্য্য করা উচিত—যাহাতে আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু কন্যা সম্মিলিত হউক, তন্মধ্যে যাহাতে কুমারের চক্ষু নিবিষ্ট হইবে, তাহাকে বধূত্বে গ্রহণ করা যাইবে।

অনন্তর তিনি নগরে ঘণ্টা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ কন্যাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবেন, সেই দিবস নগরের সকল কন্যাকেই পুরস্কার গৃহে যাইতে হইবে।

অনন্তর সপ্তম দিবস আগত হইলে ভগবান বোধিসত্ত্ব পুরস্কার গৃহে গমন পূর্ব্বক ভদ্রাসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। নগরের কুমারিকাগণ একে একে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে ও পুরস্কার লইতে প্রবেশ করিতে লাগিল; পরন্তু তাহার কেহই কুমারের তেজ ও শ্রী সহ্য করিতে পারিল না, সকলেই পুরস্কার লইয়া তন্মুহূর্ত্তেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিল না।

অনন্তর দণ্ডপাণিতনয়া গোপা দাসীগণ পরিবৃতা হইয়া পুরস্কার সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে বোধিসত্ত্বের

সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং অনিমেষ নয়নে বোধিসত্ত্বের তেজঃশ্রী দেখিতে লাগিলেন, বোধিসত্ত্বও তাঁহার গুণ শ্রী অবলোকন করিতে লাগিলেন। পুরস্কার্য্য দ্রব্য তখন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, কিছুই ছিল না, তৎকারণে মনে মনে বিচার করিতেছিলেন; ইহাকে কি পুরস্কার দেওয়া উচিত। এদিকে গোপা পুরস্কার লাভে বিলম্ব দেখিয়া হাস্য প্রভা বিস্তার করত কুমারের নিকটগামিনী হইয়া বলিলেন, কুমার! আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমাকে ঘৃণা করিতেছেন?

কুমার বলিলেন, আমি তোমাকে ঘৃণা করিতেছি না, তুমি বিলম্ব আসিয়াছ, তাই মনে মনে বিচার করিতেছি। এই বলিয়া তিনি নিজ বহুমুল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক গোপার হস্তে অর্পণ করিলেন। গোপা প্রসন্ন বদনে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "ইহাই আমি আপনার নিকট আশা করিতেছিলাম।" গোপা ঐ কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক বলিলেন, "কুমার! আপনিও আমার এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন।" কেননা আমি আপনাকে নিরলঙ্কার দেখিতে ইচ্ছুক নাহি।

অনন্তর এই বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদিত হইলে পর, রাজা শুদ্ধোদন পুরোহিত ব্রাহ্মণের দ্বারা দণ্ডপাণিকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনার কন্যা আমার তনয়কে প্রদান করুন।" কিন্তু দণ্ডপাণি রাজার সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনিও বলিয়া পাঠাইলেন, "আমরা শিল্পজ্ঞ ব্যতীত অন্য পাত্রে কন্যা সমর্পণ করি না, ইহা আমাদের কুলধর্ম্ম। আপনার পুত্র সুখে পরিবর্দ্ধিত; কোনও প্রকার শিল্প জানে না, যুদ্ধাদিও জানে না, এনিমিত্ত আমি কুমারকে কন্যা প্রদান করিব না।"

পুরোহিত এই বার্ত্তা রাজ সকাশে নিবেদন করিলে রাজা শুদ্ধোদন বিমনা ও দুঃখিত হইলেন। এদিকে কুমার তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া রাজসকাশে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "মহারাজ! কি জন্য আপনি বিমনা ও দুঃখিত হইয়াছেন?" রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন "তাহা তোমার শুনিতে নাই।" কুমার পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পুনর্ব্বার বলিলেন, "না, তাহা তুমি শুনিও না।" এইরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিলে রাজা আর ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কুমার বোধিসত্ত্ব পিতাকে দণ্ডপাণি শাক্যের প্রস্তাবে দুঃখিত দেখিয়া হাস্য সহকারে বলিলেন, "মহারাজ! এনগরে আমার সমান শিল্পজ্ঞ কে আছে? আপনি দুঃখিত হইবেন না; আমি সমস্ত শিল্পই জ্ঞাত আছি।" শুনিয়া রাজার মুখকমল বিকসিত হইল; তিনি বলিলেন, পুত্র, তুমি শিল্প দেখাইতে পারিবে? কুমার বলিলেন, পারিব, আপনি শিল্পিদিগকে আহ্বান করুন।"

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন কপিলবস্তু মহানগরে ঘণ্টা ঘোষণা করিয়া দিলেন। "সপ্তম দিবসে কুমার আপনার শিল্প প্রদর্শন করিবেন, শিল্পি মাত্রেই যেন ঐ দিবস শিল্প প্রদর্শন গৃহে সম্মিলিত হন।"

সপ্তম দিবস আগত হইলে শিল্পবাটিকা সজ্জিত হইল, ক্রমে পঞ্চ শত শাক্য কুমার শিল্প প্রদর্শনার্থ সমাগত হইল। একদিকে শিল্পগণ, অন্যদিকে দর্শকগণ, মধ্যে জয় পতাকা। একজন বৃদ্ধ শাক্য উঠিয়া সভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নিম্ন লিখিত বাক্য শুনা-

ইল।—"যে কুমার আজ এই সভায় অসি, ধনুর্ব্বান, যুদ্ধ ও অন্যান্য কর্ম্ম শিল্প দেখাইয়া জয় লাভ করিতে পারিবেন, দণ্ডপানি কন্যা গোপা সেই কুমারের সহধর্ম্মিণী হইবেন।"

অনন্তর কুমারগণ আপন আপন বল, বীর্য্য ও শিক্ষা প্রভৃতি দেখাইতে প্রস্তুত হইল। প্রথমে দেবদত্ত, পরে সুন্দর নন্দ, তৎপরে কুমার বোধিসত্ত্ব শিল্প দর্শন গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেবদত্ত কুমার আগমন কালে নগরদ্বারাবস্থিত এক মত্ত হস্তীকে চপেট প্রহারে বধ করিয়াছিলেন, তৎপরে সুন্দরনন্দ তাহাকে দ্বারদেশ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব কুমার তাহাকে পদাঙ্গুলির দ্বারা নগর বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। এইরূপে কুমার বোধিসত্ত্ব সর্ব্ব প্রথমে বল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশোভাজন হইলেন।

সভা প্রবেশের পর প্রথমে লিপি শিল্পের ও লিপি জ্ঞানের আলোচনা হইল, কুমার বোধিসত্ত্ব তাহাতেও শ্রেষ্ঠ হইলেন। শাক্য কুমারগণের গুরু বিশ্বামিত্র মধ্যস্থ ছিলেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মনুষ্য লোকে ও অন্যান্য লোকে যে কোন লিপি আছে—কুমার বোধিসত্ত্ব সে সমস্তই বিদিত আছেন, আমরা তাহার নামও জানি না।

কুমার লিপি জ্ঞানে জয় লাভ করিলে সংখ্যা শিল্পের আলোচনা আরম্ভ হইল, ইহাতেও তিনি জয় লাভ করিলেন। অর্জ্জুন নামক গণক সংখ্যা জ্ঞান বিচারের সাক্ষী ছিলেন, তিনি গাথা ভাষা অবলম্বন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এই জ্ঞান সাগর কুমার গণনা পথে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

অনন্তর যুদ্ধ শিল্পের প্রস্তাব হইল। নন্দ, আনন্দ, সুন্দর নন্দ ও দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্য কুমারগণ একে একে কুমার বোধিসত্ত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন, পরন্তু সকলেই পরাজিত হইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিলেন, তাহাতেও তাঁহারা জয় লাভ করিতে পারিলেন না। পরে বাণক্ষেপ পরীক্ষা আরম্ভ হইল, কুমার বোধিসত্ত্ব তাহাতেও জয় লাভ করিলেন। পরে ধনুঃ পরীক্ষা আরম্ভ হইলে শত শত কঠোর ধনু আনীত হইল, কুমার বোধিসত্ত্ব সে সমস্ত ধনুই করায়ত্ত করত গুণযুক্ত করিয়া দিলেন, অন্য কেহ পারে নাই। এই অবসরে কুমার উচ্চৈঃস্বরে সভাস্থ জনগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নগরে এমন কোন্ ধনু আছে যাহা আমার বল সহ্য করিতে পারে?" শুনিয়া রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "পুত্র! তোমার পিতামহ সিংহ হনু; তাঁহার এক-ধনু আছে; শাক্যগণ পুষ্প চন্দন দিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকেন, কেহই তাহা গুণ যোজনা করা দূরে থাকুক, তুলিতে সমর্থ নহে। অনন্তর সেই ধনু সভা মধ্যে আনীত হইল, কুমারগণ একে একে চেষ্টা করিলেন, জ্যা যোজনা দূরে থাকুক, কেহই তাহা তুলিতে শক্ত হইল না; কিন্তু কুমার বোধিসত্ত্ব তাহা অবলীলা ক্রমে উঠাইলেন, গুণ যোজনা করিলেন, বাণ যোজন করিলেন, আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক দশ ক্রোশ দূরে সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেন।*

* এই হস্তী যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে গর্ত্ত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা হস্তীগর্ত্ত নামে বিখ্যাত আছে।

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে লেখা আছে যে, এই বাণ যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে একটী মহান্ গর্ত্ত হইয়াছিল। সেই গর্ত্ত এক্ষণে "শরকূপ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এবং লঙ্ঘিতে, প্লাক্ চলিতে, লিপি-মুদ্রা-গণনা-সংখ্যা, সালম্ভ-ধনুর্ব্বেদে, জবিতে, প্লবিতে, তরণে, ইষ্বীস্ত্রে, হস্তিগ্রীবায়াং, অশ্বপৃষ্টে, রথে, ধনুষ্কলাপে, স্থৈর্য্যে, স্থাম্নি, সুশৌর্য্যে, বাহুব্যায়ামে, অঙ্কুশগ্রহে, পাশগ্রহে, উদ্যান নির্যানে, অবযানে, মষ্টিবন্ধনে, শিখাবন্ধে, ছেদ্যে, ভেদ্যে, তরণে, স্ফালনে, অক্ষুন্ন বেধিত্বে, মর্ম্মবেধিত্বে, শব্দ বেধিত্বে, দৃঢ়প্রহারিত্বে, অক্ষ-ক্রীড়ায়াং, কাব্য ব্যাকরণে, গ্রন্থরচিতে, রূপে, রূপকর্ম্মণি, অধীতে, অগ্নি কর্ম্মণি, বীণায়াং, বাদ্যনৃত্যে, গীতজবিতে, আখ্যাতে, হাস্যে, লাস্যে, নাট্যে, বিড়ম্বিত্বে, মাল্যগ্রন্থনে, সংবাহিতে, মণিরাগে, বস্ত্ররাগে, ময়োক্তে, স্বপ্নাধ্যায়ে, শকুনিরুতে, স্ত্রীলক্ষণে, পুরুষ লক্ষণে, অশ্বলক্ষণে, হস্তিলক্ষণে, গোলক্ষণে, অজলক্ষণে, মিশ্রিত লক্ষণে, কৈটভেশ্বর লক্ষণে, নির্ঘণ্টৌ, নিগমে, পুরাণে, ইতিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, নিরুক্তে, শিক্ষায়াং, ছন্দসি, যজ্ঞকল্পে, জ্যোতিষি, সাংখ্যে, যোগে, ক্রিয়াকল্পে, বৈশেষিকে, বৈশিকে, অর্থবিদ্যায়াং, বার্হস্পত্যে, আশ্চর্য্যে, আসুরে, ভৃগপক্ষেতে হেতুবিদ্যায়াং, জতুযন্ত্রে, মধূচ্ছিষ্টকৃতে, সূচীকর্ম্মনি, বিদলকর্ম্মনি পত্রচ্ছেদ্যে গন্ধঃ মুক্তৌ,—ইত্যেব মাদ্যাসু সর্ব্বকর্ম্মকলাসু লৌকিকেন্দিষু দিব্যমানুষ্যকাতি ক্রান্তাসু সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতেষ্য। *

ভগবাণ বোধিসত্ত্ব এবং ক্রমে সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মকলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন; শাক্যগণ তাঁহাকে আহ্লাদে সম্মানিত করিলেন, গোপার মন, নয়ন কুমারের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল, তদিয় পিতা দণ্ডপাণি তখন হৃষ্ট হইয়া সয়ম্বর মন্ত্রদান করিলেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কুমার শাক্য সিংহের সহস্র স্ত্রীছিল, অন্মধ্যে গোপাই শাক্যসিংহের প্রধানা মহিষী ছিলেন।

শ্রীরামদাস সেন।

* অতি প্রচীন কালে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সময়ে কি কি শাস্ত্র ও কর্ম্মশিল্প বিদ্যমান ছিল, তাহা এই তালিকায় দ্বারা জানা যায়।

প্রার্থনা-তত্ত্ব।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

প্রার্থনার বিরুদ্ধে আর একটী আপত্তির মীমাংসা করিয়া আলোচ্যবিষয়ের উপসংহার করিব। অনেকেই বলেন যে, প্রার্থনা করিলে যে আধ্যাত্মিক উপকার লাভ হয়, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু কে বলিল যে, স্বয়ং পরমেশ্বর কৃপা করিয়া প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ মনুষ্যের আত্মায় আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রেরণ করেন? প্রার্থনা করিবার সময় কতকগুলি মানসিক বৃত্তির পরিচালনা হয়। যে ভাব, ভক্তি বা বল, প্রার্থনা দ্বারা লাভ হয় বলিয়া মনে করিতেছ,—তোমার প্রার্থনা শ্রবণে পরমেশ্বর তোমাকে যাহা দান করেন বলিয়া বিশ্বাস কর, বাস্তবিক তাহা পরমেশ্বরের দান নহে, তোমার মনোবৃত্তি সঞ্চালনের ফল মাত্র। প্রার্থনাশীল প্রার্থনা করিয়া ফল লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহা মানবাত্মায়

পরমেশ্বরের কার্য্য নহে; আত্মার নিজের উপরে নিজের কার্য্য।

এই আপত্তিটির পরিষ্কার মীমাংসা করিতে হইলে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে একটি তত্ত্বের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব সাপেক্ষ নহে। যে কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হইবে, তাহা হইবেই। কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে, আমাদের ইচ্ছা শক্তি সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলে, কখনই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না।

আমার অঙ্গুলি অগ্নির সংস্রবে আসিল। অঙ্গুলি অবশ্য দগ্ধ হইবে। আমি অগ্নিতে অঙ্গুলি দিতে পারি, অথবা অগ্নি হইতে দূরে রাখিতে পারি, এইটুকু আমার স্বাধীনতা, কিন্তু যদি আমার অঙ্গুলি অগ্নির সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে উহা দগ্ধ হইবে। অগ্নিতে হস্ত দিয়া যদি আমি বলি, হস্ত দগ্ধ হইয়া কাজ নাই; অগ্নি সে কথা শুনিবে না। আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি, শীতল জল পান করা বা না করা আমার কার্য্য। জল পান করিতে পারি, না করিতেও পারি, কিন্তু যদি শীতল জল কণ্ঠে ঢালিয়া দি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তৃষ্ণা নিবারণ হইবে। জল পান করিতে করিতে যদি বলি, তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া কাজ নাই, আমার কথায় কিছুই হইবে না, তৃষ্ণা নিবারিত হইবে। অমৃতের কার্য্য অমৃত করে, বিষের কার্য্য বিষ করে। যাহার যে কার্য্য, তাহা হইবে। বিষপান করিয়া যদি ইচ্ছা করি, শরীর সুস্থ থাকুক, কেন থাকিবে? উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া যদি বলি, ক্ষুধা থাকুক, কেন থাকিবে? জড়জগৎ সম্বন্ধে যেমন, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে সেইরূপ। মনুষ্যের মনে ভাব সঙ্গের নিয়ম (association of ideas) কার্য্য করিতেছে। উহা আমাদের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। জ্ঞানালোচনা করিলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়; কাব্য শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে ভাব বৃদ্ধি হয়। মনে করিলে জ্ঞানালোচনায় বিমুক থাকিতে পারি, অথবা কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ না করিতে পারি, কিন্তু ফলাফলের উপর আমাদের কোন হাত নাই।

অন্তর বাহিরে কোথাও ফলাফলের উপর হাত নাই। আমরা আমাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিচালনা করিতে পারি। কিন্তু তাহার ফল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়, আমি হোক্ বলিলে হয় না।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানবের ইচ্ছাশক্তি সাপেক্ষ নহে বলাতে, অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে ইচ্ছা শক্তি নিজেই কারণ হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে, অথবা জগতের কার্য্য কারণ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনানিচয়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিতে পারে। যদি এমনও কেহ বলেন যে, মনুষ্য অগ্নির মধ্যে হস্ত দিয়াও আপনার মানসিক শক্তির বলে হস্ত দগ্ধ হওয়া নিবারণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও যাহা বলা হইতেছে তাহা অযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, কার্য্য কারণের নিয়ম অক্ষুণ্ণই থাকে।

আমার ইচ্ছায় হয় না, কোন মানুষের ইচ্ছায় হয় না। তবে কাহার ইচ্ছায় হয়? তুমি বলিবে, প্রাকৃতিক নিয়মে হয়, কিন্তু নিয়মের অর্থ, কার্য্য প্রণালী। কাহার কার্য্য প্রণালী? তুমি বলিবে, প্রকৃতির কার্য্য প্রণালী। প্রকৃতি কাহার নাম? প্রকৃতি বলিয়া কি কোন ব্যক্তি আছে?

যদি বল যে, যে প্রণালীতে জগতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহারই নাম প্রকৃতি, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়ম শব্দের অর্থ কি হইবে? জগতের কার্য্য প্রণালীর কার্য্য প্রণালী!! আবার বলি এ নিয়ম বা কার্য্য প্রণালী কাহার? যদি বল, প্রকৃতির অর্থ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহাশক্তি; তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, ঐ মহাশক্তি কি পদার্থ?

এস্থলে আর একটি কথা বলি। বিজ্ঞান বা নাস্তিকতার ভাষায় যাহাকে প্রাকৃতিক কার্য্যবলে, ধর্ম্মের ভাষায় তাহা পরমেশ্বরের কার্য্য। ঈশ্বর বিশ্বাসীর নিকটে প্রকৃতির সকল কার্য্যই পুরুষের কার্য্য। অগ্নিতে দগ্ধ হয়, জল শীতল করে, এই দুইটী বিষয় বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হইলে বলিব, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, জল শীতল করিতেছে। কিন্তু উহা ধর্ম্মের ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতে হইলে বলিব, পরমেশ্বর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতেছেন, জল দ্বারা শীতল করিতেছেন। তিনি জগতের প্রাণ, জগতের আধারভূতা শক্তি। লোকে যাহাকে প্রাকৃতিক কার্য্য বলে, সে সকলই তাঁহার কার্য্য। প্রাকৃতিক শক্তি ও ঐশী শক্তি একই পদার্থ। প্রকৃতি বলিয়া কোন পদার্থ বা ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার করি না। এক ঐশী শক্তি বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জগতে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে।

প্রকৃতি ও ঈশ্বর, এই উভয়ের স্বতন্ত্র সত্ত্বা কল্পনা মাত্র। পরমেশ্বরের কার্য্য ও প্রকৃতির কার্য্যের মধ্য দ্বৈতবাদ একান্ত অযুক্ত। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, ঐ প্রকার পার্থক্য-বোধ ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর। ঐশী শক্তি ভিন্ন, জগতের অন্তর্গত, স্বতন্ত্র এক অন্ধশক্তির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইলে, উক্তরূপ দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা কখনই সম্ভব নহে। অন্ধশক্তি অর্থশূন্য বাক্য।

সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনা, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এক মহা শক্তির কার্য্য। কিন্তু উহার স্বরূপ কি? উহা অন্ধ শক্তি না জ্ঞানময়ী শক্তি? এই প্রয়োজনীয় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে, শক্তিতত্ত্ব বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। শক্তির জ্ঞান আমাদের কিরূপে উৎপন্ন হয়? বহির্জগতে ঘটনা পরম্পরা প্রত্যক্ষ করি, শক্তি কোথায়? বহির্জ্জগতে ইন্দ্রিয়-বোধ (sensation) ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষীভূত হয় না, শক্তি কোথায়? অন্তর্জগতে শক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়। আত্ম শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিনা। বহির্জগতে শক্তি কার্য্য করিতেছে, বিশ্বাস করি। আত্ম শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি যখন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, আত্ম শক্তি হইতেই শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। আরও একটি কথা বলিতে হইবে যে, বহির্জগতে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা আত্মশক্তির সদৃশ। সাদৃশ্য না থাকিলে উভয়কেই এক নাম দেওয়া যায় না; সুতরাং বলিতে হইবে যে, বহির্জগতে যে শক্তির কার্য্য হইতেছে, উহা জ্ঞানময়ী শক্তি।

যে গুণ থাকিলে কার্য্য করিতে পারা যায়, তাহার নাম শক্তি। বহির্জগতে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনা। শক্তি কোথায়? আমাদের কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি আছে। কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি কেবল আত্মারই গুণ। সুতরাং যেখানে কর্ত্তৃত্ব বা শক্তি, সেখানেই আত্মা।

জগতে দুই প্রকার শক্তি দেখিতেছি। এক জীবাত্মার নিজ শক্তি, আর এক ব্রহ্মাণ্ডের (বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে) অন্তর্গত মহা শক্তি। প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টির জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি।

আত্মশক্তি হইতে যে, শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি স্বীকার করিতে চাহেন না। সুতরাং একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাদের ভিতরে যে ভাব নাই, বাহিরে তাহা থাকিলেও কি আমাদের পক্ষে তাহার জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে? যদি আমার দয়া, প্রেম প্রভৃতি ভাব বা বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কি অন্যের দয়া, প্রেম প্রভৃতি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতাম? "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" অর্থাৎ আমার ভিতরে যে ভাব আদৌ নাই, তাহা বাহিরে থাকিলেও,আমার পক্ষে থাকা না থাকা সমান; উহার বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান (idea) সম্ভব নহে।

যে যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, অন্ধশক্তি অসম্ভব, শক্তি বলিলেই জ্ঞানময়ী শক্তি হইবে, সেই যুক্তিটির সমুদয় অংশগুলি একটি একটি করিয়া বলিতেছি!

১। বহির্জগতে ইন্দ্রিয় বোধ (sensation) ব্যতীত আর কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। শারীরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা শক্তির জ্ঞান লাভ হয় না।

২। কেবল অন্তর্জগতে আত্মজ্ঞান দ্বারা শক্তির জ্ঞান লাভ করা যায়।

৩। আত্ম জ্ঞান দ্বারা যে শক্তিকে জানি, তাহা জ্ঞান পদার্থ;—তাহা মানবাত্মার একটি গুণ বা অবস্থা।

৪। আর কোন প্রকার শক্তির জ্ঞান বা ভাব আমাদের নাই; শক্তি বলিলেই আত্মার শক্তি বুঝি।

৫। আমাদের নিজ শক্তি হইতে পৃথক্ কোন শক্তি মানিতে হইলে তাহা আত্মার শক্তি বা গুণ বলিয়াই মানিতে হইবে; কেননা আত্মার শক্তি হইতেই আমাদের শক্তির জ্ঞান লাভ হইয়াছে।

৬। বহির্জগতে শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না, সুতরাং বহির্জগতে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাও আত্মার শক্তি, জ্ঞানময়ী শক্তি।

৬। বহির্জগতে শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া আমরা থাকিতে পারিনা; সুতরাং বহির্জগতে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাও আত্মার শক্তি, জ্ঞানময়ী-শক্তি। *

শক্তি তত্ত্ব বিষয়ে এত কথা বলিলাম কেন? প্রার্থনাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে, তাহার সহিত উহার সম্বন্ধ কি? এখন তাহাই দেখাইব। আমরা কাজ করি বটে, কিন্তু ফলাফল আমাদের হস্তে নাই। বহির্জগতে যে সকল ঘটনা বা কার্য্য হইতেছে—তাহা আমাদিগের ইচ্ছা নিরপেক্ষ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখি, আমরা মনোবৃত্তি পরিচালনা করি বটে, কিন্তু উহার ফল স্বভাবতঃ লাভ করি; অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা লাভ করি, কিন্তু এই প্রাকৃতিক শক্তি যাহা বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে নিরন্তর কার্য্য করিয়াছে, তাহা অন্ধশক্তি নহে,

* এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। Roots of faith এবং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা নামক পুস্তক দেখ। উক্ত পুস্তকদ্বয়ে এই বিষয়টি বিশেষ রূপে সমালোচিত হইয়াছে।

জ্ঞানময়ী শক্তি, আত্মার শক্তি। এখন দেখ, আমি প্রার্থনা করিলাম; উহাতে আধ্যাত্মিক মঙ্গল লাভ হইল। প্রার্থনা করি বা না করি, সে বিষয়ে আমার স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ প্রার্থনা আমি নিজে করি। কিন্তু প্রার্থনার ফল আসে, হয়; উহা আমি সৃষ্টি করিনা। তবে উহা কোথা হইতে আসে? উহা কে প্রেরণ করেন? প্রার্থনার ফল যখন আমার নিজের সৃষ্ট নহে, তখন ইহা বলিতেই হইবে যে, উহা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী জ্ঞানময়ী মহা শক্তির কার্য্য;—পরমেশ্বরের কার্য্য। যাহা জীবের কার্য্য নহে, তাহা ব্রহ্মের কার্য্য। সুতরাং প্রার্থনার ফলদাতা স্বয়ং পরমেশ্বর।

প্রার্থনা করিয়া যাহা পাই, তাহা মনোবৃত্তি পরিচালনার ফল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, বলিতে হইবে যে, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কেবল প্রার্থনা বিষয়ে কেন? সকল বিষয়েই ঐরূপ। আমি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিলাম;—জ্ঞানালোক লাভ করিলাম, আমার বুদ্ধি বৃত্তি নিচয় পরিপুষ্ট হইল। পুস্তক পাঠ করা নিজের কার্য্য, কিন্তু উহা পাঠ করিয়া যে ফল পাইলাম, তাহা প্রকৃতির কার্য্য, অর্থাৎ পরমেশ্বরের কার্য্য। কাব্য শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার হইল। চর্চ্চা করা আমার কার্য্য; কিন্তু ভাব সঞ্চার মানসিক নিয়মের ফল, অর্থাৎ পরমেশ্বরের কার্য্য। একটি বক্তৃতা বা সঙ্গীত শুনিয়া আমার মন ভাল হইল; শ্রবণ করা আমার কার্য্য, কিন্তু মন ভাল হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের ফল বা পরমেশ্বরের কার্য্য। সকল বিষয়েই এইরূপ। প্রকৃতির কার্য্য ও পরমেশ্বরের কার্য্যের মধ্যে দ্বৈতবাদ মানি না। স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মানি না। যাহা আধ্যাত্মিক, তাহা সমগ্র স্বভাব রাজ্যের একটি বিভাগ মাত্র। কিন্তু এক ভাবে বলা যায় যে, যাহা প্রাকৃতিক, তাহাই আধ্যাত্মিক, কেন না, এক মহান্ আত্মা সমগ্র প্রকৃতির প্রাণ ও শক্তি, সকলি তাঁহারই কার্য্য।

"যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা"

তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে কলের মধ্যে ফেলিয়া মানুষ করেন না, কলে দুদ খাওয়ান না। মহা কার্য্যশালী মহাশক্তি, জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী আপনার অগণ্য, অসংখ্য সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, নিরন্তর তাহাদের কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন।

এখন প্রার্থনা-বিরোধী জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে প্রার্থনার বিশেষত্ব কি রহিল? পরমেশ্বরের দিকে কিছুই বিশেষত্ব নাই। আমাদের পক্ষেই বিশেষত্ব। অগণ্য অসংখ্য পথ দিয়া আমরা তাঁহার কৃপা লাভ করিতেছি। জ্ঞানচর্চ্চা করি, ধ্যানপরায়ণ হই,—সৎ কথা বা সঙ্গীত শ্রবণ করি, কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, অথবা প্রার্থনা করি, যাহাই কেন করিনা, যে কোন প্রণালী দিয়া তাঁহার করুণা স্রোত অবতরণ করিতে পারে। তাঁহার পক্ষে সকলই সমান। আমাদের পক্ষে আমরা কোন একটী বিশেষ উপায়ে তাঁহার করুণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

অনেকেই বলেন, প্রার্থনা করিতে পারি না; প্রকৃত প্রার্থনা কেমন করিয়া হইবে? আপনার অভাব ও তাঁহার দয়া চিন্তা কর। প্রার্থনা আপনি আসিবে। জ্বলন্ত হৃদয়ে

জ্বলন্ত প্রার্থনা, স্বর্গের সিংহাসনকে বিচলিত করে। যে হস্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, জীবন্ত সরল প্রার্থনা সেই হস্তকে জীবের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত করে। তখন জীব সুস্পষ্ট অনুভব করে যে, এক উচ্চতর শক্তি তাহার অন্তর রাজ্যকে আলোড়িত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া তেছে—এক স্বর্গীয় অগ্নি তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ জঞ্জাল ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে। প্রার্থনাশীল ইহা প্রত্যক্ষ করেন। একটি বাস্তব ঘটনা সহস্র তর্ককে চূর্ণ করিয়া দেয়। প্রার্থনাশীল যখন আপনার অন্তরে পরমেশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষ করেন, তখন আর দার্শনিক তর্কের প্রয়োজন থাকে না। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আপনার অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, তুমি সহস্র তর্ক করিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিব না। তুমি যদি তর্ক করিয়া প্রমাণ করিতে পার যে, চিনি তিক্ত, তাই বলিয়া চিনি সত্য সত্যই তিক্ত হইবে না। তোমার মুখে যদি তিক্ত বোধ হয়, তাহাতে কেবল এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, তুমি পীড়িত হইয়াছ তোমার রসনা অরুচি রোগে রুগ্ন। যদি আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া থাকি, তুমি আমাকে ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া প্রমাণ করিলেও আমি সে কথা গ্রাহ্য করিতে পারিনা। বহির্জ্জগতের ঘটনা ইন্দ্রিয়বোধ দ্বারা জানিতে পারি। অন্তর্জ্জগতের ঘটনা সংজ্ঞা (consciousness) দ্বারা জানি। অন্তরে যাহা সঙ্ঘটিত হয়, আন্তরিক প্রত্যক্ষ অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কি আছে? দার্শনিক জানেন, দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে কি ফল। অন্য লোক কি বুঝিবে? কবি জানেন, কাব্য রসের আস্বাদনে কি হয়। অন্য লোকে কি বুঝিবে? প্রার্থনাশীল জানেন, প্রার্থনায় কি হয়। অন্য লোকে কি বুঝিবে? সকল দেশের, সকল যুগের সাধুগণ একতানে বলিতেছেন, প্রার্থনা স্বর্গের মন্দাকিনীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করে। তাহার পবিত্র স্পর্শে পতিত মানব সন্তান উদ্ধার হইয়া চলিয়া যায়। সেই মন্দাকিনী জলে অবগাহন কর, সহস্র প্রকার দার্শনিক তর্কে যাহা হয় নাই, তাহাই হইবে, তোমার সংসার যন্ত্রণা চিরদিনেরজন্য চলিয়া যাইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাসি-মালা।

১

অনাদরে, বাসি-মালা ব'লে
কে গেছে ফেলিয়া পথ ধারে!
কত লোক যাবে পায়ে দ'লে
কথাটা ভাবেনি একেবারে?

২

আহাহা! যা ছিল একদিন,
সহায় সময় কাটাবার;
চোখে চোখে হ'লে সমুখীন্
চাহিতে হ'তই পানে যার;

৩

যার তরে—আদরে বা ভুলে,
গাঁথিতে বা পরিতে পরাতে,—
গিয়েছিল অলক্ষিতে খুলে,
কথা ব্যথা র'হেছে যে পাতে।

৪

কত মান-অভিমান-হাসি,
কত মোছামুছি অশ্রুজল,
কত চাওয়া-চাহি বাসাবাসি,—
গত ব'লে ধূলার সম্বল ?

৫

বাসি-মালা, গত প্রেম-ছায়া,
অবশেষে আবর্জ্জনা মত ?
প্রাণে যদি নাহি স্মৃতি-মায়া,
কেন লোকে প্রেম করে এত ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সঙ্গীত।

গভীর পূর্ণিমা-রাত্রি। সুদূর আকাশ হইতে অনন্ত শূন্য প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্নার স্রোত বহিতেছে; সেই অনন্ত জ্যোৎস্না-স্রোতের স্নিগ্ধ হিল্লোলে ব্রহ্মাণ্ডকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। নৈশসমীর মৃদুমধুর লহরী তুলিয়া সেই বিশ্ব প্রেম-কোলে একটুকু সোহাগ মিশাইতেছে। কি যেন একটা কুহক, কি যেন একটা সৌন্দর্য্যের ঐন্দ্রজালিক মায়া, আজ ব্রহ্মাণ্ডকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেই নীরব, নিঝুম নিশীথে সুদূর কাননবিবর আপূরিত করিয়া কি একটা অব্যক্তনাদী কলবিহঙ্গম কণ্ঠবৎ মধুর, মনোমোহন, উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল;—জ্যোৎস্না বৃক্ষচ্ছায়ার সহিত জড়াজড়ি করিয়া নবদূর্ব্বাদল-খচিত সেই কানন প্রান্তের শ্যাম শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল,—চতুর্দ্দিকে পাখীরা সমস্বরে উলুধ্বনি করিল; ফুলেরা বিচিত্র মাল্য রচনা করিয়া ফুটিয়া উঠিল;—আর পবন সেই ফুল্ল বন-কুসুমরাজির সুরভিভার ছড়াইয়া সেই জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল, প্রেমোৎফুল্ল ব্রহ্মাণ্ডের বেণী-বিনাস্থিত চিকুরদামে কদম্ব কুসুম-রেণু মাখাইয়া দিল। সেই সুদূর কাননোত্থিত সুরকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতে—সেই মনোমোহন বাঁশীর স্বরে,—প্রাণের নিভৃত নিরালে—ভাবপুঞ্জের লীলাভূমে—কি একটা ছায়ারূপী, আবেশময় ভাবের মদিরা ঢালিয়া দিল;—প্রাণ আর ঘরে থাকিতে চায় না; পাখা বাঁধিয়া উড়িয়া উড়িয়া আকাশের কোলে, পাখীর বোলে, তটিনীর কলস্বনে, ঐ জোছনার প্রাণে মিশাইয়া যাইতে চায়;—ঐ যে বাঁশীর লীলাময়ী স্বর লহরীর পেছনে একটা কি সঙ্গীতের মত অস্ফুট, আধ আধ সুর উঠিতেছে, আকুল প্রাণ দেহ ছাড়িয়া সেই সঙ্গীতসুরের পিছু পিছু ছুটিয়া দূর-দিগন্তের পারে কোথায় কোন্ সৌন্দর্য্য রাজ্যের প্রান্তদেশে হারাইয়া যাইতে চায়। বুঝি ঐ মুরলীর আবেশময় স্বরে—ঐ প্রাণ-স্পর্শী সঙ্গীতের স্বপ্নময় ঘুমঘোরে, বিশ্ব-রূপিনী প্রেমময়ী রাধা কুলত্যাগিনী—গৃহ-ত্যাগিনী হইয়াছিল। আজ এই উৎসবময় নিশীথে, এই সৌন্দর্য্যের কাম্যকাননে, মানবে মানবে, জড়ে মানবে, জড়ে জড়ে, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে, কি-জানি একটা মধুর সামগ্রীর আদান প্রদান চলিয়াছে। ঘোম্‌টা খুলিয়া কুলবনিতারা প্রাণ ভরিয়া বুকের মধু পিয়াইতেছে; গুঞ্জোন্মত্ত মধুকর সেই মঞ্জু কুঞ্জে গুণগুণিয়ে ফুলমধু লুটিয়া লই-তেছে। বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না, তবু নীরবে প্রেমালাপ চলিয়াছে;—প্রেমের আলাপ এই ভাবেই চলিয়া থাকে। প্রেমের আলাপ মুখে নয়, বুকে; ভাষায় নয়, ভাবে। একটুকু

হাসিতে, একটুকু চাহনিতে কত রাশি রাশি কথা ফুটিয়া পড়িয়াছে, ভাষায় তা ফুটাইতে পারে নাই। প্রেমের ভাষা স্বতন্ত্র, প্রেমালাপ মানুষের ভাষায় চলে না; মনের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে;—Orpheonsএর বীণার ঝঙ্কারে যে মদিরাময়ী ভাষা শুনিয়া তরুলতা মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় নাচিতে নাচিতে স্বস্থান হইতে বিচলিত হইত; গোপেন্দ্র নন্দন ব্রজদুলালের বেণু ধ্বনিতে যে ঐন্দ্রজালিক ভাষা শুনিয়া ধেনুবৎস গোষ্ঠে ফিরিয়া যাইত,—আজ সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। এই প্রেমালাপে, এই বিনিময়ে ব্রহ্মাণ্ডটা যেন একটা সৌন্দর্য্যের পণ্যবীথিকা; সঙ্গীত তার ভিত্তি,—অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তরে অন্তরে স্রোত বাহিয়া চলিয়াছে। এই যে প্রেমের বিপণী ব্রহ্মাণ্ড, সৌন্দর্য্যে যার অভিব্যক্তি,—সঙ্গীত তার গ্রন্থি, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একটা অদৃশ্য বাঁধানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সঙ্গীতের আকর্ষণে ব্রহ্মাণ্ড ছিন্নবৃন্ত, ভ্রষ্টলক্ষ্য হয় না। সঙ্গীত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া স্তরে স্তরে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে; এই যে ফুল, এই যে জ্যোৎস্না, এই যে স্ফুটনক্ষত্ররাজি আকাশমণ্ডল, এসকলই ঘনীভূত সঙ্গীত মাত্র। এই সঙ্গীতে ফুলে নক্ষত্রে স্বর্গে মর্ত্ত্যে কথাবার্ত্তা চলে; এই সঙ্গীতে মেঘমালা আকাশ বাহিয়া কেজানে কোথায় ছুটিয়া যায়, বুঝি নক্ষত্রেরা বাঁশী বাজাইয়া ডাকিয়া লইয়া যায়।—

> "মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়,
> চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
> "সুদূরে—অতি—অতিদূরে,
> বুঝিরে কোন্ সুরপুরে
> তারাগুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরী বাজায়!"
> —রবীন্দ্রনাথ।

কোকিলের ঝঙ্কার, বসন্তের স্ফূর্ত্তি, ফুলের পাপ্ড়ি, সেই মোহন বংশীর এক একটী সুর মাত্র। তাই কবি সেই গম্ভীর, পবিত্র দিনে,—যেদিন কালের বিকট চুম্বনে দেহ-কুসুমিকা ঝড়িয়া পড়িবে, সেই মৃত্যুদিনে,—একটা ফুল দেখিয়া মরিতে চাহেন:—

"I long to see a flower the day I die."

T ennyson.

প্রেমের পরিণতি এই বাঁশীর স্বরে,—এই আবেশময়, আবিলতা জড়িত সঙ্গীতে, সেই জন্য Echo অশরীরী হইয়া এখনো বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, প্রতিধ্বনি করিয়া বেড়ায়। নিরাশ প্রেমে Echor দেহ শুকাইল বটে, কিন্তু সঙ্গীতাত্মক যে প্রাণ তাহা এখনো অচলে, গহনে, নদীতটে, তরুলতা কাঁপাইয়া, আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যায়।

সঙ্গীতের বাড়ী স্বর্গে.—মর্ত্ত্যে সুরলোক হইতে অবতারিত। তাই মর্ত্ত্যলোকে দেবাদিদেব ত্রিনেত্র তাহার প্রবর্ত্তক; শিঙ্গা ফুকাইয়া শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়ায়,—কারণ শ্মশান আধ্যাত্মিকতার অন্তিম পীঠস্থান,—শোক দুঃখের সমাধিক্ষেত্র.—স্বপ্নময় ভবিষ্য জীবনের তীরভূমি;—শ্মশানে না গেলে মানুষ সঙ্গীতের মাধুর্য্য, সঙ্গীতের স্বর্গীয় ভাব ভাল করিয়া বুঝে না; সঙ্গীতকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারে না; চোখের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎ চম্কাইয়া কিজানি কোথায় লুকাইয়া পড়ে, প্রাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। মৃত্যুর অর্থ আর কিছুই নহে,—পৃথিবীর লীলা খেলা এড়াইয়া সেই জ্যোতিঘন সঙ্গীতাত্মক প্রাণ অথবা প্রাণাত্মক সঙ্গীতে পরিণত বা লীন হওয়া মাত্র। সসীমের অসীমে, সাকারের

নিরাকারে, স্বগুণের নির্গুণে, মৃন্ময়ের চিন্ময়ে পরিণতির নামই মৃত্যু। ইহাই হিন্দুর যোগ, ইহাই হিন্দুকবিত্বের পরিণাম-কুঞ্জ,—হিন্দু ধর্ম্মের, হিন্দুদর্শনের চরম তীর্থ। ইহাই হিন্দুর সোহহং।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।
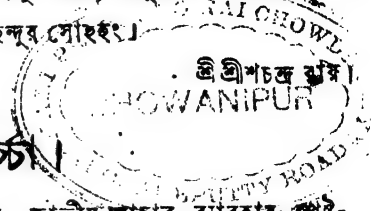
বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা।

আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্রই সংস্কৃত-সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষার সমাদর দিন২ বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত থাকিয়া সংস্কৃত পুনরায় আমাদের দেশে আদৃত হইতেছে দেখিয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমাদের রত্নপ্রসবিনী জন্মভূমির অন্তর্নিহিত রত্নরাশি ক্রমে২ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া আদৃত হইতেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের মনিষীগণও ভারতের ভূতপূর্ব্ব গৌরবের কথা স্ব২ দেশে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। চিরতমসাচ্ছন্ন নির্জ্জীব ও নিস্পন্দ ভারতসন্তানগণের জ্ঞান চক্ষু ক্রমে২ উন্মীলিত হইতেছে। ভারতের অতীত জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অবিচলিত যত্ন ও অধ্যবসায়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত রহিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে সাত সমুদ্র পার হইয়া ভারতের যোগদর্শনাদির নিগূঢ় তত্ত্ব অবগতির জন্য ও চিরমোহনিদ্রায় নিদ্রিত ভারতবাসীর উদ্বোধনার্থ পাশ্চত্য বিদ্বান্ ও বিদুষীগণ উপস্থিত হইয়া ভারতের পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দ্বারে২ বিঘোষিত করিতেছেন। ভারতবাসি! তুমি কি তোমার অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনোদনে নিশ্চেষ্ট থাকিবে?

জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবন, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আচার ব্যবহার স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে সংস্কৃত সাহিত্য পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে এবং হইতেছে। স্থানে স্থানে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ অতি মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিতেছেন। ভারতের যোগী সন্ন্যাসীদিগের প্রতি লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ দুঃসাহসে ভর করিয়া মুদ্রিত করত বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছে। স্থানে স্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয়রোল উত্থিত হইয়া নিদ্রিত ও মোহমুগ্ধ হিন্দু সন্তানদিগকে জাগরিত ও প্রবুদ্ধ করিতেছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়া দেশীয় লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। লোকের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্ম-বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। ভারতের লুপ্ত-প্রায় সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে সকলেরই সোৎসুক দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখন আর সংস্কৃতের চর্চ্চা বর্ষীয়ান্ শাস্ত্রবিদ্ টোলের পূজ্যপাদ পণ্ডিতগণের ও তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ নাই;

সংস্কৃত সাহিত্য পণ্ডিতগণের যত্ন-পরিরক্ষিত কীটদষ্ট, জীর্ণ হস্তলিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে কেবল সীমাবদ্ধ নহে। ইউরোপীয়দিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী ও পরীক্ষা-প্রণালী, পরিবর্ত্তন-বিরোধী ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডারের চিরন্তন পরিরক্ষক পণ্ডিতমণ্ডলীর চির-উপেক্ষিত ও অনাদৃত টোলমধ্যেও প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া মহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে; টোলের চিরপ্রচলিত প্রথাকে দূরীভূত করিতেছে। যে সমাজে ধর্ম্মপ্রচার প্রথা কখনও প্রচলিত ছিল না, সেই সমাজের ধুরন্ধরগণ স্থানে স্থানে যাইয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনার্থ ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং লোকের ধর্ম্মমতের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। যে সংস্কৃত সাহিত্যকে মহামহোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায়ও এক সময়ে "কাল্পনিক বিদ্যা" (imaginary learning) বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই, অদ্য সম্প্রদায় ও জাতি নির্ব্বিশেষে সেই সংস্কৃতের সর্ব্বত্র সমাদর হইতেছে, কল্পতরু হিন্দুধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠতম বলিয়া প্রখ্যাপিত হইতেছে,—এ আনন্দ রাখি কোথায়? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে সংস্কৃত কিরূপে পুনরুজ্জীবিত হইয়া এক্ষণে সর্ব্বত্র-সমাদৃত হইতেছে, কি উপায়ে তাহার বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, পঞ্চাশৎবৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্য কিরূপ তুমুল ঝটিকায় নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, এবং কি উপায়ে ঈশ্বর-কৃপায় তাহার পুনরুদ্ধার বিহিত হইল—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা সংক্ষেপে বলিতে অদ্য সশঙ্কচিত্তে লেখনী ধারণ করিয়াছি। ইহাতে যে যে ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে, পাঠকবর্গ নিজগুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

কি শুভক্ষণেই ভুবনবিখ্যাত নানা-ভাষাবিৎ পণ্ডিত সার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্টের একজন অধস্তন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াই হিন্দুদিগের ব্যবস্থা-প্রণালীতে সবিশেষ রূপে ব্যৎপন্ন হইতে অভিলাষী হইয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও উদ্যোগেই ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী আসিয়ার ও ভারতীয় সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসাদির সবিশেষ আলোচনা ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি জনসমাজে প্রচারার্থ সুপ্রসিদ্ধ "এসিয়াটিক সোসাইটী" সংস্থাপিত হয়। কোম্পানির কলিকাতাবাসী প্রায় সমস্ত প্রধান২ কর্ম্মচারী ইহার সভাশ্রেণী ভুক্ত হইলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহানগরী লণ্ডনে কলিকাতার সভার যাবতীয় উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া মহামতি পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেবের প্রযত্নে "রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটী" সংস্থাপিত হয়। তদনন্তর বোম্বাই নগরীতে, সিংহলে, আমেরিকায়, জাপানে, জার্ম্মেনি, এবং ফ্রান্সেও আসিয়ার এবং ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদির পর্য্যালোচনার ফল লোকসমাজে প্রকাশার্থ 'আসিয়াটিক সোসাইটী' সংস্থাপিত হইয়া আমাদের লুপ্তরত্নের উদ্ধার সাধন করত চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছে। ভারত সম্বন্ধে যাহা

কিছু জানিতে সক্ষম হইয়াছি ও হইতেছি, সেই সকলই প্রায় এই সকল সভার প্রসাদাৎ। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। নতুবা অকৃতজ্ঞতা মহাপাপে ভারতবাসী চির কলঙ্কিত থাকিবে। এই সমুদয় মহোপকারিনী সভার জননী কলিকাতার ভুবনবিখ্যাত সভা। সার উইলিয়াম জোন্স ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে কেবল এই সভা সংস্থাপন করিয়াই নিরস্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি মনুসংহিতা, গীতগোবিন্দ ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারের মাধুর্য্য সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুগভীর গবেষণাপূর্ণ "এসিয়াটীক রিসার্চ্চ" নামক অমূল্য পত্রিকার ২৮টী প্রবন্ধ প্রচার করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল এই পণ্ডিতপ্রবর কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতের যে কতদূর উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইল না। কলিকাতায় অনেক কৃতবিদ্য সাহেব তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সার চার্লস উইলকিন্স, হেনরি টমাস কোলব্রুকই সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার উইলকিন্স ইংরেজদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার একখান ব্যাকরণ স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি ও অনুরাগ বর্দ্ধনার্থ প্রচার করেন। তিনি ভগবদ্গীতা ও হিতোপদেশ এবং মহাভারতের কোন কোন অংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। "এসিয়াটিক রিসার্চ্চ" পত্রিকায় এদেশীয় পণ্ডিতদিগের অবোধ্য কতিপয় প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন। যে দেশের প্রকৃত ইতিহাসের বিশেষ অসদ্ভাব, সে দেশে তাম্রশাসনাদি ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়, সন্দেহ নাই। ইনিই এই পন্থা উদ্ভাবিত করেন।

কোলব্রুক সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিচারপতি ছিলেন। তিনি অমরকোষ, দায়ভাগ, মিতাক্ষরার দায়াধিকার, তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "বিবাদভঙ্গার্ণব" নামক সুবিখ্যাত ব্যবস্থা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পারস্য অনুবাদ হইতে হলহেড সাহেব দ্বারায় "Code of Jentoo Laws" নামক অদ্ভুত অনুবাদ প্রকাশিত করেন। তিন নকলে আসল খাস্ত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যবস্থা গ্রন্থ অনুসারে বিচারালয়ে অনেক সময় বিচার কার্য্য সম্পাদান হইত। কোলব্রুক অবিচলিত উৎসাহ ও যত্নে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়া হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের এই অভূতপূর্ব্ব অবমাননার নিরাকরণ করেন। তিনি ১৮০৬ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। বেদের অস্তিত্ব ও মর্ম্মার্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের

মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-প্রথম প্রচার করেন। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা, হিন্দু ষড়দর্শন ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গম্ভীর গবেষণা-পূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ইউরোপে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে ভারতের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রচারিত করেন। তিনি ইংরেজীতে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও মুদ্রিত করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ ও পুস্তক এত সুযুক্তি ও গভীর গবেষণা-পূর্ণ যে, এক্ষণ পর্য্যন্তও প্রামাণিক বলিয়া তাঁহার কথা গণ্য হইয়া আসিতেছে।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর হোরেস্ হেমেন উইলসন্ মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য 'মেঘদূতের' অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃতে অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান, বিষ্ণুপুরাণ ও ঋগ্বেদের অনুবাদ তাঁহার পাণ্ডিত্যের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণ, নাটক, ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায়, হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকানেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচারিত করিয়া সাহিত্য জগতে স্বকীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যত কাল সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল উইলকিন্স জোন্স, কোলব্রুক ও উইলসন, সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা পাইবেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী, ইংরেজী অনুবাদ সহিত বাল্মীকির মহাকাব্য রামায়ণ, শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত খ্রীষ্ট মিসনারিদিগের তত্ত্বাবধানে, মাসিক দেড় শত টাকা ব্যয়ে, তত্রত্য ব্যাপ্টিষ্ট মিসনযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। মাত্র তিন ভাগ পুস্তক মুদ্রিত হইলে উহা স্থগিত করা হয়। ইতি মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যত্নে ও ব্যয়ে মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী, নৈষধচরিত এবং সুশ্রুত মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিকের শাসন সময়ের শেষ ভাগে তিনি ডাফ, মেকলে প্রভৃতি মহামতিগণের উদ্যোগে ও পরামর্শে দেশ মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার বিধানার্থ ডাইরেক্টর মহোদয়দিগকর্ত্তৃক নিয়োজিত সমুদয় টাকা প্রয়োগ করিতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রকাশিত খণ্ড গুলি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য সামান্য কাগজের মত ওজন করিয়া বিক্রয় করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের এই আকস্মিক বিপৎপাতের সময় এসিয়াটিক সোসাইটী গবর্ণমেণ্ট হইতে মুদ্রিত খণ্ড গুলি আনাইয়া উহা সমাপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হন। পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের গুরুতর ব্যয়ভার বহনার্থ ভারতবর্ষের ও ইউরোপের স্থানে স্থানে দেশীয় ও ইউরোপীয় সংস্কৃত ও প্রাচ্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ও সভার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ইংলণ্ডে ডিরেক্টর মহোদয়দিগের নিকট সাহায্যার্থ এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল স্থান ও ব্যক্তি হইতেই প্রার্থনার অনুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটী উক্ত গ্রন্থ গুলি প্রচার আরম্ভ করেন। মহাভার-

তের ১৪০০ পৃষ্ঠা, পূর্ব্ব নৈষধচরিতের ২০০, সুশ্রুতের অর্দ্ধেক এবং রাজতরঙ্গিণীর ২০০ পৃষ্ঠা মাত্র গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছিল। চারি বৎসরে এসিয়াটিক সোসাইটী বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের মুদ্রাঙ্কন সমাপন করেন। ডিরেক্টর মহামতিগণ সোসাইটীর প্রার্থনানুসারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য মুদ্রাঙ্কনার্থ বার্ষিক পাঁচশত টাকা দিতে গবর্ণর জেনারেলকে আদেশ করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তর হারবিলন 'কাব্য সংগ্রহ' নাম দিয়া ক্ষুদ্র২ কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশিত করেন। মহাভারতের সঙ্গে২ হরিবংশও মুদ্রিত হয়।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লিড্‌লে সাহেবের পরামর্শানুসারে (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা) ভারতীয় গ্রন্থাবলী নাম দিয়া এসিয়াটিক সোসাইটী অনুবাদ সহ সংস্কৃত পুস্তক মাসে২ খণ্ডশঃ প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিতবর রোয়ার সাহেব সানুবাদ ৪খণ্ড ঋগ্বেদ সংহিতা সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্য সহ প্রকাশিত করেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভট্ট মক্ষমুলার ইংলণ্ডে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সভাষ্য ঋগ্বেদ মুদ্রিত করিতেছেন শুনিয়া তিনি তাহা হইতে ক্ষান্ত হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর রোয়ার সাহেব শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীক সহ ঋগ্বেদীয় ঐত্তরেয় উপনিষদ্, যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক-তৈত্তিরীয়-ঈশ-কঠ-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, সামবেদীয়কেন-ছান্দোগোপনিষদ্, এবং অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যোপনিষদ্—এই একাদশ-খানি ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় ছান্দোগ্যোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকাভাগে তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য সবিশেষ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। দশখানার ইংরেজী অনুবাদ ডাক্তর রোয়ার মহোদয় ইতি পূর্ব্বেই (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের অধিকাংশের মূলমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। শাঙ্করভাষ্য সহ উক্ত উপনিষদগুলি ডাক্তর রোয়ার সাহেবের যত্নেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অনেক পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় উহাদিগকে এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক দৃষ্টে প্রকাশিত করেন। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাকও মুদ্রিত করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বনৈষধ স্বকৃত পাণ্ডিত্য পূর্ণ টীকা সহ এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রবন্ধে ও ব্যয়ে মুদ্রিত করেন। মহামতি রোয়ার ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণের টীকা সহ অবশিষ্ট একাদশ সর্গ প্রকাশ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার রোয়ার প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্য-দর্পণ প্রকাশ করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত সাহিত্য-দর্পণ নিঃশেষিতরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। এই জন্যই এই নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস কালেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ডাক্তর বেলেণ্টাইন্ সাহিত্যদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাবু প্রমদাদাস মিত্র উহা সমাপ্ত করেন।

রোয়ার সাহেব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত ভাষা পরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ইংরেজী অনুবাদ সহ মুদ্রিত করেন। মুক্তাবলীর স্থানের স্থানের মাত্র অনুবাদ করা হয়। তিনি ইতিপূর্ব্বে বেদান্তসারের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চানক্যশিষ্য কামন্দকীকৃত নীতিসার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উপাধ্যায়-নিরপেক্ষ নাম্নী টীকা সহ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল পরে বিগত বৎসর ৫খণ্ডে উহা সমাপ্ত হইয়াছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মা ভক্তিমার্গোপদেশক চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রকাশিত করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহা কর্তৃক শুক্লযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তৈত্তিরীয় আরণ্যক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ও বিশ্বনাথ শাস্ত্রী বিশেশ্বরের টীকা সহ গোপালতাপনীয়োপনিষদ্ মুদ্রিত করিয়া, অথর্ব্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণ ও অগ্নিপুরাণের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করত কালকবলে নিপতিত হন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মুদ্রাঙ্কন পরিসমাপ্ত করেন। তিনি ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধজীবনী, ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১৮৭৫), ত্রিভাবারত্ন টীকা সহ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্য (১৮৫৪) ভোজরাজ প্রণীত টীকা ও ইংরেজী অনুবাদসহ মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র (১৮৮০), বায়ুপুরাণ (১৮৭৯), প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সোসাইটীর পত্রিকায় অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া আমাদের দুর্গত দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

পণ্ডিত রামময় তর্করত্ন মহাশয় নারায়ণের কৃত টীকা সহ ২৯খান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ (১৮৭২), শঙ্করাচার্য্যের টীকা সহ নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্ প্রকাশিত করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পণ্ডিত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী হলায়ুধের টীকা সহ পিঙ্গলাচার্য্যকৃত সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ছন্দঃসূত্র (১৮৭১) প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ (১৮৬১) মুদ্রিত করেন। পূর্ব্বনৈষধের ন্যায় ইহাতেও তিনি সংস্কৃত টীকা সংযোজিত করেন।

পণ্ডিতবর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহোদয় সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ (১৮৬৯), গর্গনারায়ণকৃত টীকা সহ ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (১৮৬০), অগ্নিস্বামী কৃত ভাষ্য সহ সামবেদীয় লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্র (১৮৭০) প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় গর্গনারায়ণের টীকা সমেত ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১৮৬৪), শঙ্করভাষ্য ও গোবিন্দানন্দের টীকা সহ মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্র (১৮৫৩) প্রকাশিত করেন।

পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় শঙ্কর মিশ্রের ও নিজের টীকা সহ বৈশেষিক দর্শন (১৮৬০), বাৎসায়ন ভাষ্য সহ ন্যায়দর্শন (১৮৬৪) ও আনন্দগিরি কৃত শঙ্করদিগ্‌বিজয় নামক শঙ্করাচার্য্যের জীবনী প্রকাশিত করেন। তিনি মাধবাচার্য্য প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের সারাংশও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন।

পণ্ডিতবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি হেমাদ্রি-

কৃত অতি বিস্তীর্ণ চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি -নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহা প্রকাশিত করিতেছেন। এপর্য্যন্ত প্রায় ৪৮৬০ পৃষ্ঠায় অর্দ্ধেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত বৎসর (১৮৮৫) হইতে শেষোক্ত মহাত্মা নবদ্বীপের পণ্ডিতশিরোমণি গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রণীত 'চিন্তামণি' নামক সুবিখ্যাত ন্যায়দর্শন, মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ের ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১৮৫৫), নারদ পঞ্চরাত্র (১৮৬১) শাঙ্করভাষ্যসহ বেদান্ত সূত্রের ইংরেজী অনুবাদ (১৮৭০) প্রকাশ করেন। শেষোক্ত পুস্তকের এক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়। ইনি ঋগ্‌বেদের প্রথম অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের, রঘুবংশের প্রথম আট সর্গের এবং ভট্টিকাব্যের প্রথম পাঁচসর্গের ইংরেজী অনুবাদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠসৌকর্য্যার্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রণীত 'হিন্দুষড়দর্শন' তাঁহার বিদ্যাবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বালশাস্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বাচস্পতি মিশ্রের প্রণীত 'ভামতী' নামক বেদান্তদর্শনের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের টীকা (১৮৭৫) প্রকাশ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় সটীক সামবেদ (১৮৭১) প্রকাশিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপে সামবেদ সংহিতা ১৮৪২ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সামশ্রমী মহোদয় যাস্কাচার্য্যকৃত নিরুক্ত ও (১৮৮০) টীকার সহিত প্রকাশ করিতেছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহোদয় তৈত্তিরীয় (কৃষ্ণযজুঃ) সংহিতা; পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে প্রকাশিত করিয়া আসিতেছেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার রোয়ার কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শবরস্বামীকৃত ভাষ্যসহ মীমাংসা দর্শন প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় সামবেদীয় গোভিল গৃহসূত্র (১৮৭১) স্বকৃত টীকা সহ পরিসমাপ্ত করিয়া, মাধবাচার্য্যের সুবিস্তীর্ণ টীকাসহ পরাশরস্মৃতি (১৮৮৩) ও মাধবাচার্য্যকৃত কালমাধব (১৮৮৫) প্রকাশ করিতেছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীননাথ বিদ্যারত্ন চণ্ডেশ্বর কৃত বিবাদরত্নাকর নামক স্মৃতি গ্রন্থ (১৮৮৫), শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী বৃহন্নারদীয়পুরাণ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কূর্ম্মপুরাণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত সকলেই অতি সুপণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন ও আছেন। ইঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বিশেষত বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ অদম্য উৎসাহ ও অবিচলিত অধ্যবসায়

সহকারে কার্য্য করিয়া আমাদের ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা এখনও কার্য্য করিতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের অক্ষয়ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকুন।

ইউরোপীয় ভারতহিতৈষী পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কতিপয় মহাত্মার নাম ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যদর্পণের প্রথমাংশের ও কপিল সূত্রের (১৮৬২) অনুবাদক ডাক্তর বেলেণ্টাইন স্বপ্নেশ্বরের ভাষ্য সহ শাণ্ডিল্য মুনি-প্রণীত ভক্তিসূত্র প্রকাশিত করেন।—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক কাউয়েল্ তাঁহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সানুবাদ উদয়নাচার্য্যকৃত সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলি নামক ন্যায়দর্শনও প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ থাকার সময়ে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিগত বৎসর সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শঙ্করানন্দের ভাষ্যসহ কৌষিতকীব্রাহ্মণোপনিষদ্ (১৮৬১), রামতীর্থের ভাষ্যসহ মৈত্রী উপনিষদ্ (১৮৬২) ইংরেজী অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।—ডাক্তর হল সাহেব সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য (১৮৫৪), বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রণীত সাংখ্যসার (১৮৫৫), রঙ্গনাথের টীকা সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত (১৮৫৪), ধনিকের টীকা সহ ধনঞ্জয় প্রণীত দশরূপ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ (১৮৬২), শিবরাম ত্রিপাঠীর টীকা সহ সুবন্ধু প্রণীত বাসবদত্তা (১৮৫৫) প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্যসার ও বাসবদত্তার ভূমিকায় তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।—ডাক্তার কার্‌ন্ বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতা (১৮৬৪) সুদীর্ঘ ভূমিকা সহ প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাসিংহের ভাষ্যসহ সর্ব্ববর্ম্মণাচার্য্য প্রণীত কলাপ ব্যাকরণ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আচার্য্য এগ্‌লিং প্রকাশ করিতেছেন। ডাক্তর জলি বিষ্ণুস্মৃতি (১৮৮০), নারদস্মৃতি (১৮৮৫), ও মনুটীকা সংগ্রহ (১৮৮৫), প্রকাশ করিতেছেন। আচার্য্য গার্ব্বে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (১৮৮১), এবং জে কোরি সাহেব জৈন মহাপুরুষদিগের 'পরিশিষ্টপর্ব্ব' নামক জীবনী (১৮৮৩), ও সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এসিয়াটীক সোসাইটী কর্ত্তৃক ৭০ খানা পুস্তক প্রায় ৫০০ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত সমিতি সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশার্থ বার্ষিক চারি হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইয়া আসিতেছেন। সভার পুস্তকাগারে প্রায় ছয় হাজার (৫৮৮৫) হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত পুস্তক সংরক্ষণার্থ সভা ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভারতের ভিন্ন২ প্রদেশে যে যে সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহা একেবারে লোপ না হয়, তজ্জন্য উক্ত সনে সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক পাঁচ ছয় হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন। হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তকের নাম ও বিষয়ের তালিকা করণে প্রার্থিত সাহায্য ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। তদানীন্তন বোর্ড অব কণ্ট্রোল এই সুসঙ্গত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠান। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সভার সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিতবর প্রিন্সেপ সাহেব সভার পুস্তকাগার-স্থিত সংস্কৃত পুস্তকের

যে তালিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি বারাণসী ও কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাবলীর নামের তালিকাও সংযোজিত করিয়া দেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পুস্তকালয়দ্বয়ে যেং মহামূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ সুযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে, কালেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তাহা প্রকাশ করা একান্ত উচিত। নতুবা উক্ত পুস্তকালয় দ্বয় দ্বারা সর্ব্বসাধারণের কোনও উপকার সংসাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরবাসী পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের প্ররোচনায় ও ব্যবস্থা-সচিব মহামতি হুইট্লি ষ্টোক্ সাহেবের পরামর্শে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা, স্ব স্ব অধিকারভুক্ত প্রদেশের পুস্তকালয় সমূহে যে যে হস্ত লিখিত পুস্তক রক্ষিত হইতেছে, তাহার তালিকা করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত করিতে যত্নবান্ হন। মহামতি লর্ড লরেন্সের অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য অচিরেই অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। বঙ্গেশ্বর শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতি এই গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। ইহার জন্য বার্ষিক তিন হাজার টাকা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। রাজেন্দ্র বাবু এ পর্য্যন্ত ২০খণ্ড পুস্তকে প্রায় তিন হাজার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে যেযে সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বীকানীরের মহারাজের পুস্তকাগারের ১৭৯৪ খান হস্ত লিখিত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং নেপালে বুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে যে সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া ভারতের লুপ্তোদ্ধার করত ভারতবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ২৫০৭ হস্তলিখিত মূল্যবান্ পুস্তক ক্রয় পূর্ব্বক এসিয়াটীক সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও তত্তৎপ্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যত্নে অনেকানেক পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটী যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই বর্ণন করিয়াছি। অতঃপর অন্যান্য ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন স্ব স্ব যত্ন, অধ্যবসায় ও অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারে কীদৃশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। সংস্কৃতে অমরকোষ মেদিনী প্রভৃতি যে সকল অভিধান আছে, সে সকলই সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য অন্যান্য শাস্ত্রের গ্রন্থের ন্যায় শ্লোকাকারে রচিত। কাশীনাথ বসাক নামক কলিকাতা-বাসী একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত "শব্দার্ণবাভিধান" নামে একখানি সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত ভাষার অভিধান শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়-ব্যুৎপত্তিগত অর্থাদি সহ অকারাদি ক্রমে আট ভাগে প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালি-কর্ত্তৃক এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত গদ্য অভিধান বিরচিত হয়। ইহার পাঁচভাগ এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে। কোন কোন অংশে ইহা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক সঙ্ক-

লিত সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম আট ভাগে পরিসমাপ্ত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুর ইউরোপ ও ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে উক্ত পুস্তক বিতরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি ও পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত অক্ষরে শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ের অভাবগুলি দূরীকরণ পূর্ব্বক শব্দকল্পদ্রুম তৃতীয়বার মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পণ্ডিত চূড়ামণি তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয় দ্বাবিংশতি খণ্ডে "বাচস্পত্য" নামক বৃহদভিধান প্রকাশিত করিয়া স্বীয় অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃতে এই তিন খানিই সুবৃহৎ অভিধান। প্রথমোক্ত অভিধান অমুদ্রিত ভাবেই আছে।

পণ্ডিতপ্রবর তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বকৃত টীকা সহ অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কয়েক খানি গ্রন্থ নিজেও রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে সিদ্ধান্ত বিন্দুসার, তুলাদানাদি পদ্ধতি, গয়া শ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি, শব্দার্থ রত্ন, বহুবিবাহবাদ, গায়ত্রী ব্যাখ্যা, বিধবা বিবাহ বিচার প্রধান। তাঁহার ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রযত্নে অনেকানেক পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। পণ্ডিত জীবানন্দ এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত অনেক গুলি পুস্তকই পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র বসাকও কতকগুলি পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় মুগ্ধবোধ, কাদম্বরী, দশকুমার চরিত টীকা সহ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার চণ্ডকৌশিক নাটক, কল্কীপুরাণ প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে মূল মহাভারত সাধারণের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। সকলেই কবিবর কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠেই পরিতৃপ্ত থাকিত। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বাহাদুর কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। তৎপর একাদশ বৎসর গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয় দাতব্য ভারত কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ ১২ হাজার, ইংরেজী অনুবাদ তিন হাজার, বাঙ্গালা হরিবংশ তিন হাজার, বাঙ্গালা রামায়ণ পাঁচ হাজার, মূল তিন হাজার ও মূল মহাভারত চারি হাজার বিতরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত বৰ্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রামানুজের টীকা সহ রামায়ণ সানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় রামায়ণের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করিয়া মহাভারত পদ্যে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভূকৈলাসের রাজবাড়ী হইতে কুমার সত্যবাদি ঘোষাল বাঙ্গলা অনুবাদ সহ যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শন প্রকাশ

করিয়া বাঙ্গালীকে হিন্দুদর্শন শিখাইতে যত্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফলিত জ্যোতিষ, তন্ত্রসার ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ প্রভৃতি প্রকাশিত করিয়া গরুড় ও অগ্নি পুরাণ বাহির করিতেছেন। বটতলা হইতে ব্রতমালা, বিরাট পর্ব্ব, ভগবদ্গীতা, তন্ত্রসার, রঘুনন্দন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে মনুসংহিতা ও অন্যান্য সংহিতাগুলি প্রকাশিত করিয়া যান। তৎপরে পণ্ডিত জীবানন্দ উহার ভিন্ন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

বাঙ্গলা পুস্তকের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বঙ্কিম বাবুর উত্তরচরিতের সমালোচনা ও কৃষ্ণচরিত, চন্দ্রনাথ বাবুর অভিজ্ঞান শকুন্তলের সমালোচনা, প্রফুল্ল বাবুর বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, রামদাস বাবুর ঐতিহাসিক রহস্য, অক্ষয় বাবুর ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, রাজেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতবর্ষীয় গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড, রজনী বাবু প্রণীত জয়দেবচরিত ও পাণিনি বিচার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাবু গৌরগোবিন্দ রায় কেশব বাবু কৃত নববিধান সংক্রান্ত পুস্তকাবলী সংস্কৃত শ্লোকে অনুবাদিত করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছেন। রমেশ বাবু বঙ্গানুবাদ সহ ঋগ্বেদ সংহিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, সংস্কৃত সাহিত্য কলিকাতা হইতে বহুলরূপে দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত এখন টোলের কীটদষ্ট জীর্ণ হস্ত লিখিত পুস্তকের মধ্যে কেবল আবদ্ধ রহে নাই। সকল কার্য্যেই শুভাশুভ ফল একত্র অবস্থান করিতে দেখা যায়। সুযোগ পাইয়া অনেক প্রতারক সংবাদ পত্রের স্তম্ভে পুস্তক প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়া বিলক্ষণরূপে সরলহৃদয় ধর্ম্মার্থী লোকদিগের অর্থশোষণ করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। নিতান্ত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ পুস্তকও অবাধে প্রকাশিত হইয়া জনসমাজে হলাহল সঞ্চারিত করিতেছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও সানুবাদ দুরূহ পুস্তক প্রকাশিত করিয়া অর্থ ও যশ উভয়ই লাভ করিতেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে কেবলই নানা পুস্তক প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কত লোকেই প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। হিন্দু রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেছে। নির্জ্জীব হিন্দুসমাজ পুনরায় সজীবতার একটু একটু পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোন কোন হিন্দুবীর, সাহেবেরা সংস্কৃত সাহিত্য ও আর্য্যধর্ম্মের আলোচনা করিয়া যে হিন্দুধর্ম্মের বর্ণনাতীত অনিষ্ট করিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রভাবেই যে সংস্কৃত সভ্যজগতে সবিশেষ আদৃত হইয়াছে, ভারতে এতদূর প্রচারিত হইয়াছে—ইঁহারা তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটে নাই, কি তাঁহারা একেবারে অভ্রান্ত, তাহা বলিতেছি

না। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে এরূপ তুচ্ছতাচ্ছীল্য প্রদর্শন অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাঁহাদেব গ্রন্থাদি পাঠ করত তাঁহাদের অযৌক্তিকতা ও ভ্রান্তি দৃঢ়তর যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শনে কোনও সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী কখনও যুক্তি ও তর্কের ধার ধারে না। সংস্কৃত সাহিত্য বিস্তারের প্রধান অন্তরায়, মুদ্রিত পুস্তকগুলির অধিক মূল্য। বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত পুস্তকের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্তও যথোপযুক্ত সুলভ মূল্য হয় নাই। যাঁহারা অর্থোপার্জনের নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তক অযত্নসম্পাদিত ও ভ্রম পরিপূর্ণ। যতদূর সতর্কতা ও যত্ন অবলম্বন করা উচিত, ততদূর যত্নের সহিত যে সে ব্যক্তি দ্বারা পুস্তক সম্পাদনের গুরুতর ভার সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই পাঠকবর্গ সংস্কৃত পুস্তক পড়িতে বসিয়া পদে পদে বিড়ম্বিত ও ধৈর্য্যচ্যুত হন।

যে জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপের যথাযোগ্য আদর ও সম্মান করিতে জানে না, সে জাতির অভ্যুদয় সুদূরপরাহত, পরপদানতি ভিন্ন তাহার আর অন্য গতি নাই। সংস্কৃতের মত মধুর ভাষা পৃথিবীতে নাই। এই জন্যই সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অনন্ত রত্ন পরিপূর্ণ সাহিত্য জগতে দুর্ল্লভ। এত অত্যাচার ও বিপ্লবের পরও প্রায় পঞ্চদশ সহস্র নানাবিধ হস্তলিখিত ও অমুদ্রিত পুস্তক বিদ্যমান আছে বলিয়া অনুমিত হয়। সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্য জগতের শীর্ষস্থানীয়া, সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী। ঋগ্‌বেদ সভ্যজগতের প্রাচীনতম ইতিহাস। ভারতের জ্ঞান ও বিদ্যা আরবদিগের দ্বারা ইউরোপ নীত হইয়া, ইউরোপকে জ্ঞান ও সভ্যতালোকে উজ্জ্বল করিয়াছে। যখন ইউরোপ ও পৃথিবীর অপরাপর অংশ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন ভারত জ্ঞান ও সভ্যতার পূর্ণ আলোকে আলোকিত ছিল। কালের কুটিল প্রভাবে ভারতের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইতে লাগিল। ভারতের দুর্দ্দিন ও দুরবস্থার সময় সমাগত হইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ও গরিমা সমস্ত হারাইল। যে জাতির কবি, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি; দার্শনিক, কপিল, গোতম, পতঞ্জলি, ও শঙ্করাচার্য্য ;– জ্যোতির্ব্বিদ্, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত; চিকিৎসক, চরক ও সুশ্রুত; ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য ও রঘুনন্দন, সে আর্য্যজাতির বংশধরেরা আজ মুগসর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় আর্য্য মহর্ষিগণের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ ভারতের গৃহে গৃহে সংকীর্ত্তিত হউক। ভগবান্ ভারতকে পূর্ব্বগৌরবে মহিমান্বিত করিয়া ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূরীকৃত করুন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।
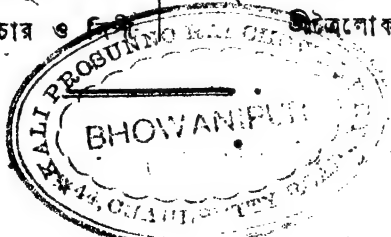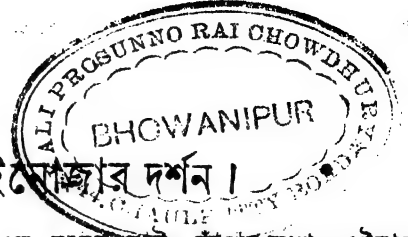
সাংখ্যদর্শন ও স্পাইনোজার দর্শন।

স্পাইনোজার দর্শনকে অনেকেই অকারণ নিরীশ্বরবাদ অথবা জড়বাদের ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ ভ্রান্ত মতের কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি যে সাবস্টান্স (Substance) বা সদ্বস্তুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ অনেকেই আত্মা বা মনের বিপরীত সামান্য জড় মাত্র মনে করেন। কিন্তু স্পাইনোজা ইহাতে অসীম অব্যয় ও অনন্ত গুণবিশিষ্ট বা নির্গুণ পুরুষ বুঝিতেন। এই অনন্ত পুরুষকেই তিনি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এই বহুরূপ জগত তাঁহারই ভাব বা অবস্থার বিকাশ, ইহাই বুঝিতেন। এই ঈশ্বরকে তিনি কোন কোন স্থলে (নেচার বা) প্রকৃতিও বলিয়াছেন। মহর্ষি কপিলও সেইরূপ জগতের মূল নিত্যপদার্থকে প্রকৃতি নাম দিয়াছেন। তবে স্পাইনোজা জগতের মূল কারণ ও ব্যক্ত জগতের মধ্যে একটু প্রভেদ করিয়াছেন। ঈশ্বরই তাঁহার মতে সমস্ত জগতের সত্বার ও তাহার বিকাশের অব্যয় কারণ স্বরূপ। তিনিই এক মাত্র, সংস্বরূপ। যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহারা সমুদায়ই ঈশ্বরের মধ্যে রহিয়াছে—ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই আমরা ধারণা করিতে পারি না। তিনি অনন্ত পদার্থ স্বরূপে সকলের মূল এবং সকলই তাঁহার অংশ স্বরূপ। তাঁহার ন্যায়, যাঁহারাই অনন্ত পুরুষের সহিত সান্তের বা সসীমের সম্বন্ধ তত্ত্ব স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। স্পাইনোজা জড় জগতকে ঈশ্বরের সহিত এক বলেন নাই,—তাঁহার অংশ, এইমাত্র বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরের দুইটী গুণ আমরা জানিতে পারি, চৈতন্য (thought) ও ব্যাপ্তি (Expansion) কিন্তু ইহারা ভিন্ন নহে। ঈশ্বরই সব—একমেবাদ্বৈতম। তাঁহার মতে ব্যাপ্তিই চিদের (thought) ব্যক্তরূপ, আর চিৎই ব্যাপ্তির অব্যক্তরূপ। ঈশ্বর শরীরী নহেন, তবে জগত তাঁহার বিকাশিত অংশমাত্র। শরীর (বা জগত) তাঁহার ব্যাপ্ত গুণের ভাববিশেষ মাত্র —তাঁহার অস্থায়ী বা অসৎ অবস্থা মাত্র। সমস্ত বিকাশিত পদার্থেরই পরিবর্ত্তন আছে—লয় আছে—যিনি নিত্য এবং অব্যয়, ইহারা তাঁহারই বিকাশিত স্বরূপ মাত্র। তিনিই অনন্ত—আপনাতে আপনি বিদ্যমান আছেন। আর যাহা সান্ত, তাহা সেই অনন্তের আধারে বিদ্যমান রহিয়াছে—সুতরাং সান্ত অনন্তের স্বরূপ নহে।

জর্মান পণ্ডিত কুঁজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ব্যক্ত জগত ঈশ্বরের কার্য্য ভাব বা রজঃ শক্তির পরিণাম মাত্র—কিন্তু এই কার্য্য রূপে তাঁহার শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই।*

স্পাইনোজার মনোবিজ্ঞানের মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমত অস্পষ্ট থাকে, মনের আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার

---

* "The Universe is the Deity passing into activity but not exhausted by the act."
Cousin, (Cours. de Phil. Intro.)

দ্বারাই তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। কিন্তু মন কখন স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের দ্বারা মনের কার্য্য নিয়মিত হয়, সে কারণেরও আবার অন্য পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ থাকে, এইরূপ। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা সকল বস্তুরই বিকাশ ও পরিণতি হয়। ঈশ্বরও স্বেচ্ছায় বা কোন অভিপ্রায়ে কার্য্য করেন না। কেননা (তাঁহার বাসনা বা আশয় নাই।) তাঁহার (স্বভাবতঃই বা) স্বতঃই কার্য্য শক্তির স্ফুরণ হয়—ইহা তাঁহার গুণ বিশেষ মাত্র। যখন স্বাধীন ইচ্ছা নাই, স্বাধীন কার্য্য সম্ভব নহে (কারণ মানুষ সেই অনন্ত অপরিহার্য্য সাধারণ নিয়মের অংশ মাত্র) তখন পাপ পুণ্য, সৎ অসৎ ভাল মন্দ কিছুই থাকিতে পারে না। তবে যে সকল কর্ম্মে লোক সাধারণের উপকার হয়, তাহাকেই মানুষেরা পুণ্য বা সৎকার্য্য বলে। মূল কথা, ঈশ্বরই সকল বিষয়ের মূল কারণ। তিনিই আমাদের মনের নিয়ন্তা। তিনিই চৈতন্য গুণের দ্বারা আমাদের মনকে নিয়মিত করেন—আবার ব্যাপ্তি গুণের দ্বারা কর্ম্মের নিয়ন্তা ও মূল স্বরূপ হয়েন। মূর্খ মানুষ মনে করে যে, সে তাহার নিজ সংকল্প বা ইচ্ছা বলে কর্ম্ম করিতেছে—তাহারা জানে না যে যতক্ষণ শারীর যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ মনের কোন ক্রিয়া শক্তিই থাকে না, আর আমাদের সংকল্প আমাদের শরীর জন্য বাসনার ফল মাত্র।

স্পাইনোজার মতে—বাহ্যঘটনার স্বরূপ জ্ঞান (বা মানসিক অনুমিতির সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধের জ্ঞান (বা truth) সম্ভব। প্রথমত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণা বা স্মরণ শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে সামান্য শ্রেণী-বিভাগ করা যায় এবং বাক্যের দ্বারা সে শ্রেণীর নামকরণ হয়। তৎপরে চিন্তা বা যুক্তির দ্বারা এবং পরিশেষে সহজ জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের স্বরূপ জ্ঞান আমরা উপলব্ধি করি। ইহা প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণপণ্ডিত শেলিংও স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানের প্রথম উপায় বা প্রত্যক্ষের অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ ভাব হইতেই আমাদের ভ্রম বা বিপর্য্যয় হয়। চিন্তা বা ইচ্ছা ও তাহা হইতে যে কার্য্য হয়, তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কারণ শরীর ও মন উভয়ই একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ মাত্র।* জর্ম্মান পণ্ডিত হিগেলও বলিয়াছেন, যে, তাহাদের মূলে কোন পার্থক্য নাই—বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই—কারণ তাহারা একই ঈশ্বরের অংশ মাত্র। ঈশ্বরের চৈতন্য ও জড়, এই দুই অংশের সহিত কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা স্পাইনোজা স্পষ্ট করিয়া দেখান নাই। তবে যদি জড়কে তাঁহার ব্যক্তরূপ ধরা যায়, জড় জগৎকে তাঁহার প্রকাশ-রূপ বলা যায়, পদার্থ সকলকে তাঁহার ব্যাপ্তি স্বরূপের ভাব মাত্র স্বীকার করা যায়, তবে বেদান্তের মায়াবাদের সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

* * * * *

কপিল ও স্পাইনোজার মত ঠিক এক নহে। তবে সেশ্বর সাংখ্য (ভগবান) পতঞ্জলি ও ভগবদ্গীতায় ঈশ্বর ও প্রকৃতির যেরূপ ব্যাখ্যা আছে বা যেরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা স্পাইনোজার মতের অনুরূপ। এই মতে এক অদ্বি-

* "Are but one thing considered under different attributes."

তীয় ব্রহ্মের দ্বৈত রূপ আছে—এক চৈতন্য বা পুরুষ, আর এক জড়রূপ বা প্রকৃতি। স্পাইনোজা ঈশ্বরের যে দুই রূপ—চৈতন্য ও ব্যাপ্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। এই ব্যক্ত জগত পরমাত্মার জড় বা ব্যাপ্তি স্বরূপের অথবা প্রকৃতির বিকাশ মাত্র। আত্মার কার্য্য শক্তির স্ফুরণেই জগতের বিকাশ—আবার কল্প পরে—তাঁহার জড় (প্রকৃতি) রূপেই জগতের লয় হয়,—তাহারই মধ্যে বিলীন হয়। সমস্ত লোক অথবা ব্যষ্টি সৃষ্টি পরমাত্মার বিকাশ ভাব মাত্র—সকল বস্তুই তাহা হইতে জাত এবং তাঁহাতেই নিহিত আছে। আকাশ (ether) যেমন সর্ব্বব্যাপি এবং সকল বস্তুর মধ্যেই প্রবিষ্ট আছে, একমাত্র তিনিও সেই রূপ সকলকে আবৃত করিয়া সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। স্পাইনোজার মত আর ভগবদ্গীতার মত একই। উভয়েই বিবর্ত্তনবাদ মতে জগত-সৃষ্টি বুঝিয়াছেন,—তবে এ বিবর্ত্তনবাদ ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ নহে। কারণ, ইঁহাদের মতে জগত ক্রমে ক্রমে নিম্নতর অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় পরিণত হইতেছে না—উচ্চতম অবস্থা হইতেই নিম্নতম অবস্থায় পরিণত হইতেছে—বুদ্ধি হইতেই ক্রমে ক্রমে জড়ের সৃষ্টি ও বিকাশ হইয়াছে। ইহাদের বিবর্ত্তনের যাহা শেষ সীমা, ডারউইনে তাহাই মূল ভিত্তি। বাস্তবিক হিন্দু এবং জর্ম্মান দার্শনিক ঠিক একরূপ যুক্তি ও চিন্তা প্রণালী দিয়া একরূপ তত্ত্বই উদ্ভাবন করিয়াছেন। * উভয়েরই মতে আত্মা বা মন—কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই আপনাকে জানিতে পারে, আর এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার দ্বারাই উৎপন্ন হয়।

আরও এক বিষয়ে দুই দর্শনের সিদ্ধান্ত একরূপ। স্পাইনোজার অদৃষ্টবাদ আর হিন্দুদার্শনিকের অদৃষ্টবাদ একই প্রকার। তবে জর্ম্মান দার্শনিকের যুক্তির ছটা কিছু জাঁকাল রকম। কপিলের মতে সমস্ত জগত এক অদ্ভুত যন্ত্র (machine) মাত্র। ইহা সেই অদ্বিতীয় একের কার্য্যশক্তির দ্বারা পরিচালিত। যদিও পাপ পুণ্যের মধ্যে স্বতঃ প্রভেদ আছে, যদিও আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান পাপ পুণ্যের মধ্যে কঠোর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যখন তাহারা সেই অনন্ত নিয়মেরই ক্রিয়া মাত্র—তখন তাহাদের প্রকৃত প্রভেদ কোথায়? (তাহার জন্য দায়ী কে?) উভয় দর্শনের মতেই ধর্ম্মজ্ঞানের কোন ভিত্তি নাই—মানুষ সুধু তাহার নিজের সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়, এই পর্য্যন্ত।

তবে ভগবান পতঞ্জলি বলেন, নির্ব্বিকল্প যোগের দ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ হইলেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়, পরম আনন্দ লাভ হয়। আত্মার সহিত মানুষের ভালমন্দ কাজের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। শ্রেষ্ঠ লোক (পরম পুরুষার্থ লাভ করিলে) কাহারও সহিত সহানুভূতি দেখান না।

* "Both taught that the universe was an evolution, but not such an evolution as Darwin has endeavoured to prove from the lowest point of being to the highest state—from the one highest or sole being to its lowest depths, there being a gradation from *Budhi* down to inanimate matter. The one, in this gradation ends, where the other begins. *The Hindoo and the German philosopher moved in other respects, in precisely the same lines of thought.*"

Davies p. 143.

তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকেন। সে অবস্থায় কোনরূপ কর্ম্মের আবশ্যক হয় না, কোনরূপ কর্ত্তব্য থাকে [illegible]রও এই মত। (অসমাপ্ত) শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

ধর্ম্মের বিচিত্র গতি।

ধর্ম্ম একদিকে যেমন সহজ, সরল, সার্ব্বভৌমিক, সর্ব্ববাদিসম্মত সাধারণ সত্য, তেমনি ইহা অতিশয় জটিল, কুটিল, বক্র, দুর্গম। সৃষ্টিকর্ত্তা এক অদ্বিতীয় জ্ঞানময় ঈশ্বর, পৃথিবীর জাতি মাত্রে সকলেই ইহা স্বীকার করে; তিনি সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলস্বরূপ, পবিত্র ন্যায়বান, সর্ব্বোপরি অধিপতি, সরল হৃদয়ে একান্ত চিত্তে তাঁহার উপর নির্ভর বিশ্বাস ও ভক্তি করিলে তিনি শরণাগত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, মনুষ্যকে দেবত্বে পরিণত করেন; এবং তিনি সকলেরই পিতা মাতা সুহৃদ; সমস্ত জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই সহজ ধর্ম্ম। কিন্তু এই সহজ সত্য কিরূপ দুরারোহ, দুর্ব্বোধ এবং বিকৃত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, পৃথিবীর ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিচিত্র প্রকৃতি মনুষ্যের ভিন্ন প্রকার শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও অবস্থানুসারে সেই এক আদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ পুরুষ পরমেশ্বর নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। লোকচরিত্রের বিচিত্র গতি অনুসারে, একই ধর্ম্মতত্ত্ব সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্মমত সকলের বিভিন্ন পথ ধরিলে মন বিভ্রান্ত, শ্রান্ত, বিরক্ত হইয়া কেবল সেই আদি প্রস্রবণ মূল সত্যের দিকেই যাইতে চায়। এক একটী ধর্ম্ম, কত কত মত এবং সম্প্রদায়েই বিভক্ত হইয়াছে! সে সমস্ত আলোচনায় মনুষ্যের ধৈর্য্য থাকে না।

কিন্তু এ সকল মতভেদ ও প্রণালী ভেদের কি কোন অর্থ নাই? কেবল কি উহা অন্ধ বিশ্বাস এবং অজ্ঞানতার কার্য্য? এরূপ সিদ্ধান্ত সহজ বটে, কিন্তু সহসা অবিচারে এপ্রকার মীমাংসা করা সঙ্গত বোধ হয় না। ধর্ম্মশক্তি অতিশয় উর্ব্বরা, অতি অল্প সংখ্যক প্রশস্তমনা উদারচিত্ত মহাজনগণের হৃদয়েই কেবল তাহার পূর্ণ বিকাশ এবং সর্ব্বাঙ্গীন সমাবেশ হয়; কাল সহকারে সাধারণ জনসমাজের ভিতরে ক্রমে তাহা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে; তখন যাহার যেরূপ শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, সে এবং তৎভাবাবিষ্ট ব্যক্তিগণ সেই পথে চলে এবং আপনাপন অবলম্বিত পন্থাকেই সার মনে করিয়া অপর ধর্ম্মপ্রণালীকে ভ্রান্তি কুসংস্কার বলে। পূর্ণ ধর্ম্মের আংশিক ভাব গ্রহণে এই রূপ অন্ধতা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহার ভিতরেও ভগবানের লীলা আছে। জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম্ম, ইহার কোন না কোন একটীর আধিক্য এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষিত হয়। এই সকল ধর্ম্মগোলের মধ্যে চতুর প্রেমিক সত্যজ্ঞান পিপাসু আত্মা কেবল মূল প্রস্রবণ সর্ব্বরসাশ্রয় পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার ভিতরে এই ধর্ম্মাঙ্গ চতুষ্টয়ের মিলন দেখিতে পান। ফলতঃ মূল সত্য যিনি ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে জগতে কিম্বা কোন প্রকার ধর্ম্ম-কোলাহলে বা মতবিচারে আর বিভ্রান্ত করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বত্র কেবল সেই একেরই লীলা সন্দর্শন করেন।

ধর্ম্মসমাজ সকল দেখিতে দেখিতে কেমন অল্প কাল মধ্যে নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। চারি শত বৎসরের মধ্যে নানক ও চৈতন্যের শিষ্য প্রশিষ্যগণ কতই না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রচনা করিলেন! বহু-দূরে যাইবারই প্রয়োজন কি, অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই দেখুন না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম কত বিচিত্র প্রণালীর ভিতর দিয়া চলিয়া আসিল এবং কোথায় কিরূপ আকার ধারণ করিল? একটু ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, প্রত্যেকেরই যেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং স্বতন্ত্র ধর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্র-দায়ের মধ্যেই এইরূপ স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হইবে। অবশ্য বাহিরে দুই পাঁচটী বাহ্যকার্য্য সমবেত ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে এবং তাহাকে একটী সাধারণ নামে অভিহিত করি... আমি অমুক সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি বাক্য সচরাচর সকলে ব্যবহার করেন, কিন্তু আন্তরিক ভাবের একতা কোথায়? সে একতা যেখানে, সেই ত স্বর্গ-রাজ্য! তাহা অতি বিরল। প্রাচীন ধর্ম্মের ইতিহাসে মানবের ধর্ম্মচরিত্র যেমন নানা বর্ণে চিত্রিত আছে, বর্ত্তমানেও তাহাই হইতেছে। ব্রাহ্মগণ কেহ হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশ বিশেষকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কেহ ভয়সি পার্কার নিউম্যানের বিচারপথ ধরিয়াছেন, কেহ প্রাণায়াম সাধনপূর্ব্বক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছেন; কেহ বাউল, কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা, কেহ প্রেততত্ত্ববাদী, কেহ ভাব প্রধান পথে, কেহ বা জ্ঞান বিচার পথে. কেহ অধিক আহ্বাবলম্বনপ্রিয়, কেহ নির্গুণ ব্রহ্ম বাদী; কেহ মনুষ্যের মুখাপেক্ষী, কেহ অধ্যা-ত্মবাদী নিরাবলম্ব ব্রহ্মোপাসক, কেহ সামাজিক,কেহ বাহ্য সংস্কারপ্রিয়; যিনি যে পথটী ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাই ধরিয়া চলিতেছেন। যে ধর্ম্মের দ্বারা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইবার কথা, তাহাই আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল! কেহ কেহ সাকারের রাজ্যে গিয়া জড়বাদী হইতেছেন, কেহ নিরাকারের অজ্ঞানিত অকূল সমুদ্রপথে পড়িয়া অন্ধকার দেখি-তেছেন। ব্রাহ্মগণ নানা দিকে দৌড়িতে-ছেন, কোথায় গিয়া তাঁহারা আশ্রয় পাই-বেন, কাহার যে কি পরিণাম হইবে, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। রোগ আরোগ্যের পূর্ব্বে রোগের লক্ষণ যদি বুঝা যায়, তাহা হইলে আরোগ্য লাভের আশা হয়। তেমনি ধর্ম্মের ঠিক পথটী ধরিতে পারিলে গন্তব্য স্থানে যাত্রীদলের পৌঁছিবার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। যিনি যে পথে যাউন, এক জায়গায় শেষ সকলকে আসিয়া মিলিতে হইবে, কারণ একই পথ; এখন কেবল এক-মাত্র প্রয়োজন, যেন কোনরূপ কুটিল স্বার্থ-পরতা আত্মাভিমান নীচ অভিসন্ধির চক্রে কেহ পতিত না হন। নানা জনে নানা মতের সংগ্রাম করিতে থাকুন, তদ্দ্বারা ক্রমে প্রকৃত পথ বাহির হইয়া পড়িবে; যিনি যথার্থ পরিত্রাণার্থী তিনি কদাপি প্রবঞ্চিত হইবেন না। সত্য ধর্ম্মের মনোহর মূর্ত্তি মানব প্রকৃতি এক দিন দেখিতে পাইবে। প্রকৃত ধর্ম্ম চিরকাল লুক্কায়িত থাকিবে না। আদিম কালের অসভ্য লোকেরা যেমন স্বভাবও অভাবের দ্বারা চালিত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতার সোপানে উঠিয়াছে, ধর্ম্মসংগ্রামে তেমনি মানবকুল একদিন জয় লাভ করিবে। অন্বেষণ কর, চিন্তা কর, প্রার্থনা

হর, তত্ত্বপিপাসু হও, সহজ ধর্ম্মের সরল এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পথ প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানদাতা ঈশ্বরের প্রেরিত জ্ঞানে কেবল তাঁহাকে বুঝা যায়, অপর কোন উপায় নাই। আশা এই, তাঁহার অভিনব রাজ্যে যে সকল প্রজা আসিতেছেন, তাঁহারা রাজ রাজেশ্বরের শুভ বিধান যথাসময়ে সকলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

বঙ্গের অমর সন্তান।

মানুষের হৃদয় বিষভরা। সুধাভরা হৃদয় পৃথিবীতে নাই, এমন কথা আমরা বলি না; এমন কথা বলিলেও পাপ আছে। সুধাভরা হৃদয় না থাকিলে পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইত। সুধাভরা হৃদয় আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প,—সাগরের বিন্দু, পাহাড়ের রেণুবৎ। এই বিন্দুবৎ সুধা পাইবার আশায় মানুষ মানুষের জন্য লালায়িত, পিপাসিত। আয়, আয়, কাছে আয়, কোলে আয়, এই বলিয়া পিপাসিত মানুষ মানুষকে হৃদয়ে বাঁধিতে চায়। কিন্তু যখন কাছে আসে, প্রাণে বসে,—তখন হায় হায়! মানুষের গুপ্ত গরল ঢালিয়া মানুষ মানুষকে কেবলই কষ্ট দেয়। মানুষের দুর্ব্যবহারে মানুষ তখন ত্যক্ত বিরক্ত—মানুষ তখন জ্বালায় অস্থির। যতদিন মানুষ দূরে, ততদিনই যেন মধুর; যখনই কাছে, অতি কাছে, তখনই যেন তিক্ত। মানুষের গায়ের উষ্ণ বাতাস মানুষের অসহ্য। হিংসায়, অহঙ্কারে, স্বার্থে মানুষকে মজাইয়া বিষতুল্য করিয়া তুলিতেছে। সমাজ বিষতুল্য, দেশ বিষতুল্য! আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব—আরো বিষতুল্য!!

মানুষের হৃদয়ের এই শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া যখন প্রাণ মন বিষাদে মলিন হয়; শরীর মন অবসন্ন হয়, নির্জ্জনে একাকী বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, মানুষের সঙ্গ লইতে অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণা জন্মে, যখন হৃদয়পুরী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,—প্রেমশূন্য হৃদয় যখন শ্মশানে পরিণত, তখন হঠাৎ কোন মহাদেব, কোন খ্রীষ্ট, কোন বুদ্ধ, কোন চৈতন্য বিধাতার আদেশে সেই আঁধারে, সেই শ্মশানে জাগিয়া মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মানুষ সে সুধাভরা চিত্র দেখিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠে, শ্মশানে বসিয়া স্বর্গ, অমৃত এবং শান্তির স্নিগ্ধ প্রস্রবন পাইয়া আবার নাচিয়া উঠে, আবার সংসারে, আবার আলোকে, আবার জীবনে ফিরিয়া আইসে। মৃত মানুষ আবার সজীব হইয়া উঠে। বিষভরা হৃদয়ের কাছে সুধাভরা হৃদয় না থাকিলে, সংসারে মানুষ টিকিতে পারিত না।

পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য, সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার জন্য যেমন এক একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন, মৃত মানুষকে জীবিত করিবার জন্যও তেমনি এক একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন। * মৃত কে? যে হিংসার দাস,—যে অহঙ্কারের দাস,—যে স্বার্থের দাস। মৃত কে? যে অন্যের ভাল ও মহত্ত্ব দেখিতে পায় না—অন্যকে

* "The mass of creatures and of qualities are still hid and expectant. It would seem as if waited, like the enchanted princess in fairy tales, for a destined human deliverer. Each must be disenchanted, and walk forth to the day in human shape."
Emerson.

ভালবাসিতে জানে না। মৃত কে? যে জীবন পাইয়া নরকের সেবা করে—যে সুধার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে বিষ ভরিয়া রাখে; যে আলোকের বদলে হৃদয়ে অন্ধকার, কুসংস্কার পোষণ করে। সমাজে এইরূপ মৃত জীবের সংখ্যাই অধিক! এক হিসাবে সমাজ শ্মশানেরই প্রতিরূপ। মৃত মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য, পতিত সমাজকে পবিত্র করিবার জন্য, কোন খ্রীষ্ট, কোন চৈতন্য বা কোন বুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইঁহাদের আবশ্যকতা আছে বলিয়া আর আর সকলের আবশ্যকতা নাই, এ কথা বলি না। সৃষ্ট জীব জন্তু, অণু পরমাণু, বৃক্ষ লতা, সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং সকলেই এক হিসাবে, আপন আপন বিশেষত্বের জন্য পরস্পরের চেয়ে বড়। মানুষ সকলেই মহাপুরুষ—আপন আপন বিশেষত্বে—মহত্ত্বে। নিউটন এক হিসাবে মহাপুরুষ, মিল আর এক হিসাবে মহাপুরুষ; নেপোলিয়ন, রুসো, ভল্টেয়ার ও ম্যাট্সিনি এক এক হিসাবে ইঁহারা সকলেই মহাপুরুষ। আবার তুমি আমি, রাম যদু, আমরাও সকলে এক এক হিসাবে মহাপুরুষ। মহতের সন্তান বলিয়া মহাপুরুষ। সকলের সৃষ্টিরই প্রয়োজনীয়তা আছে—সকলের মধ্যেই বিশেষত্ব বিদ্যমান। বিষভরা হৃদয়, এবং সুধাভরা হৃদয়, এই দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। সকলেই মহাপুরুষ বলিয়া সকলে তুল্য নহে। তুলনা অসম্ভব। নিউটন বড় কি ম্যাটসিনি বড়, রুসো বড় কি খ্রীষ্ট বড়?—ইহার মীমাংসা হয় না। আপন আপন বিশেষত্বে সকলেই বড়। পৃথিবীর দর্শন কাব্য বিজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য, বিবর্ত্তন-মূল আবিষ্কারের জন্য যেমন কোন প্লেটো, কোন সেক্সপিয়র বা কোন ডারউইনের প্রয়োজন, মানুষের হৃদয়ের গরল তুলিয়া সুধা ভরিয়া দিবার জন্যও সেই রূপ কোন খ্রীষ্ট বা নানকের প্রয়োজন। শত্রুকেও ভাল বাসিবে, * ইত্যাদি সত্যে দীক্ষিত করিয়া মানুষের হৃদয়কে উন্নত করিবার জন্য খ্রীষ্টের অবশ্যই আবশ্যকতা ছিল। বিধাতার রাজ্যে বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না। আমরা যখন সূক্ষ্মরূপে সৃষ্টি-মহত্ত্বের গভীরতার ভিতরে ডুবিয়া যাই, তখন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হই। এই জগতে, যেখনে যেটির প্রয়োজন ছিল, ঠিক তাহাই যেন হইয়াছে! এই জগতে যখন যেটীর প্রয়োজন হইয়াছে, ঠিক তখনই যেন পৃথিবীতে তেমনটীর আবির্ভাব হইয়াছে! আবার যখন যেটীর প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, তখনই সেটীর তিরোধান হইয়াছে! জগতে ঘটনার অন্তরালে হইতে কেবল মঙ্গলই ফুটিতেছে। মঙ্গলময়ের ইচ্ছারই জয়!

বাঁশী কি সুধুই বাজে? কোকিল কি সুধুই ডাকে? বাঁশীর পশ্চাতে উর্দ্ধ কর্ণে রাধা বিদ্যমান, তাইত বাঁশী বাজে! কোকিলের ডাকের পশ্চাতে বসন্ত লুক্কায়িত, তাই ত ডাকে! আকাশ ভরা মধুর পঞ্চম সুর কোকিলের—ঐ বসন্ত স্পর্শে! কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। আবার কার্য্য না আসিলেও কারণ ঘুটে না। য়িহুদী বংশের দুর্দ্দশা—খ্রীষ্ট জন্মের অবশ্যম্ভাবী কারণ। শাক্ত ধর্ম্মের হীনপ্রভাই চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের মূল কারণ। যে বায়ুতে খ্রীষ্ট এবং

---

* "But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you." *Bible.*

চৈতন্যকে মানুষ করিয়াছে,তদানীন্তনের সেই দূষিত বায়ু ভিন্ন ইঁহারা কখনই ফুটিতে পারিতেন না। দুঃখ পায় লোকে—আরো সুখ পাইবে বলিয়া ; মরণ খেলা করে—মানুষকে জীবন দিবে বলিয়া। লোক যখনই পাপে ডুবিতেছে, আরো ডুবিতেছে, আরো ডুবিতেছে, দেখিবে,তখন নিশ্চয় বুঝিবে,তাহার পশ্চাতে স্বর্গ আসিতেছে। নিশ্চয় বুঝিবে, ঐ পতন উদ্ধারের পূর্ব্ব লক্ষণ! দেখিয়া শুনিয়া তবুও অবিশ্বাসী থাকিবে? শ্যামবাঁশরী বাজিতেছে, কিন্তু রাধা নাই ; বসন্ত আসিয়াছে, কোকিল নাই ; ইহা হইতেই পারে না। জগাই মাধাই জন্মিয়াছে,চৈতন্যের আবির্ভাব হয় নাই ; য়িহুদী বংশের পতন হইয়াছে, কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মেন নাই, ইহা অসম্ভব কথা। চৈতন্যের জন্ম, জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের জন্য, এবং জগাই মাধাইর জন্ম, চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ। যেখানে শ্যাম, সেই খানেই রাধা ; যেখানে চৈতন্য, সেই খানেই নিতাই বা সেই খানেই জগাই মাধাই। যেখানে খ্রীষ্ট, সেই খানেই পতিত য়িহুদী সমাজ ; যেখানে বসন্ত, সেই খানেই কো[illegible]ল। প্রেমের মধুর টানে নরক ও স্বর্গ, [illegible]কাশ ও পাতাল, পাপী ও পুণ্যাত্মা, সব [illegible]ধা। এসকল অবশ্যম্ভাবী। কার্য্য আছে কারণ নাই,অথবা কারণ আছে, কার্য্য নাই, ইহা অসম্ভব। পতন আছে উত্থান নাই, অথবা উত্থান আছে পতন নাই—ইহা অসম্ভব। সুখ আছে, দুঃখ নাই ; অথবা দুঃখ আছে সুখ নাই, ইহা অসম্ভব। জীবন থাকিলেই মৃত্যু আছে। আবার মৃত্যুর পরেই নব জীবন আছে। শ্মশানের কোলেই স্বর্গ বিদ্যমান।

মানুষের হৃদয় বিষপোরা, কিন্তু সুধু তাহাই নয়। বিষের ধারে সুধাও আছে। অথবা বিষে বিষে পুড়িতে পুড়িতে যখন মানুষ ভস্মময় হইবে,তখনই সুধার ছিটা স্বর্গ হইতে পড়িবে। পড়িবেই পড়িবে। বঙ্গদেশের বড়ই দুর্দ্দিন। আজ কাল বিষময় হৃদয়ই চতুর্দ্দিকে। মানুষে মানুষে কাটাকাটী চলিয়াছে, গৃহে গৃহে অশান্তির রোল, —বন্ধু বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ, পিতা পুত্র বিচ্ছেদ, স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদ, ভাই ভগিনী বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ-বিষ বঙ্গসমাজকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ মানুষের ধারে যাইতে চায় না,মানুষ মানুষের মুখ দেখিলে মজে না। মানুষ স্বার্থের পথে, বিচ্ছেদের পথে, স্বেচ্ছাচারিতার পথে—নরকের পথে ক্রমাগত হাটিতেছে। অহঙ্কার, হিংসা বিদ্বেষ যেখানে পাইতেছে, সুধা বলিয়া হৃদয়ে তুলিতেছে। এই বিচ্ছেদের দিনে, এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, এই অহঙ্কার এবং হিংসা বিদ্বেষের রাজত্বের দিনে,—বঙ্গদেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, আলোক—কেশব এবং রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি! বঙ্গের পঙ্কিলময় ভূমি হইতে কেশব এবং রাজকৃষ্ণ কুসুম ফুটিয়াছেন। ইহা ভাবিলেও আনন্দ পাই। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা অনেক বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে,—আমাদের সর্ব্বদাই মনে পড়ে,—শান্ত, বিনয়ী, নিরহঙ্কারী রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি। ভ্রাতার পার্শ্বে ভ্রাতা, সতীর ধারে স্বামী,—মধুর মিলন, মধুর চিত্র। এই পোড়াদেশে নিরহঙ্কারী জ্ঞানী, বিনয়ী ধনী, অহিংসাপরায়ণ যোগীর একত্র মিলন—রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে। প্রকৃত বিদ্বানের নিকট অহঙ্কার নাই, প্রকৃত চরিত্রের নিকট হিংসাবিদ্বেষ নাই, প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট সম্প্রদায় নাই,

—রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি এই বিষভরা বঙ্গসন্তানের নিকট ইহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন! রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে গভীর পাণ্ডিত্য, আড়ম্বর-শূন্য অচলা বিশ্বাস, অকৃত্রিম দেশ ভক্তি, একত্রে শোভা পাইয়াছে। এক কথায়, এই দুর্দ্দিনে রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তির বড়ই প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—নানা প্রবন্ধ; সমাজে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—চরিত্র; এই হুজুগের দিনে, এই হৈ চৈ পূর্ণ আন্দোলনের দিনে, এই চরিত্র-হীনতার দিনে—একমাত্র উজ্জ্বল চিত্র—রাজকৃষ্ণমূর্ত্তি। সে সৌম্য, সে গম্ভীর, সে বালকের ন্যায় সরল এবং মহাদেবের ন্যায় পবিত্র মূর্ত্তি নাকি আমরা আর দেখিব না! বঙ্গদেশ হইতে নাকি রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে! না—যতদিন বঙ্গদেশে হিংসা বিদ্বেষের রাজত্ব বিদ্যমান, অহঙ্কারের পরাক্রম বিদ্যমান, প্রকৃত সাধুহৃদয়ের অভাব—ততদিন বঙ্গে নির্ম্মল চরিত্র রাজকৃষ্ণ অমর!! ততদিন হৃদয়ে হৃদয়ে রাজকৃষ্ণের জন্য অক্ষয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। শমনের সাধ্য নাই—শ্মশানের আগুনের এমন তেজ নাই যে, সেই অমূল্য ধনকে ভস্ম করিতে পারে!! এমন নিদারুণ কথা মুখে আনিও না, এমন পাপের কথা আমার কাণে ঢালিও না। অন্ধকার যতদিন—আলোকও ততদিন। দুঃখ যতদিন, সুখও ততদিন! মলিন বঙ্গসমাজ যতদিন—স্বর্গের রাজকৃষ্ণ অমর ততদিন।

আমি বঙ্গদেশের অনেক সাধুচিত্র দেখিয়াছি—কিন্তু রাজকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে যেমন পবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তেমন আর কাহাকে দেখিয়াও হয় নাই। একজন বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন,—"সাধু সে, যাহাকে দেখিলে ভগবানকে মনে হয়।" এই সংজ্ঞায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাধু—কারণ তাঁহাকে দেখিলেই ভগবানকে মনে হইত। রাজকৃষ্ণ বাবুর শত্রু কি আছে?—এমন জীব কি এই বঙ্গদেশে আছে, যে রাজকৃষ্ণ বাবুকে দেখিয়া উপকার পায় নাই? ধর্ম্ম-মতভেদে দেশ অশান্তিতে পুড়িতেছে; কিন্তু দেখ—রাজকৃষ্ণ অবিচলিত—ঘৃণা বিদ্বেষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই—সকলের বাড়ীতে বাড়ীতে কি মধুর খেলা খেলিয়া বেড়াইতেছেন! পিতায় পিতায় ঝগড়া করিয়া মরিতেছে, কিন্তু শিশু শত্রু-শিশুর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতেছে! যে সময়ে বঙ্গদেশের বড় বড় ধর্ম্মের ধুরন্ধরগণ ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ, ঝগড়া কলহ করিয়া মরিতেছে,—তখন শিশু অপেক্ষাও সরল এবং পবিত্র স্বর্গের রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি, ভেদাভেদ ভুলিয়া, ঘরে ঘরে ফিরিয়া, শান্তি এবং সদ্ভাব কুড়াইয়া লইতেছে! তাঁর মূর্ত্তি মিলনের মূর্ত্তি—আপন-পর ভুলানে মূর্ত্তি—সুধামাখা স্বর্গের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির বিসর্জ্জনে বঙ্গদেশ কাঁদিবে না, তবে কি করিবে? বাঙ্গালীর রোদনের অবশ্য কারণ আছে।

বাঙ্গালী কাঁদে কেন? বাঙ্গালী আজও মহত্তের মহত্ত্ব জীবনগত বা হজম করিতে পারে নাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর মহত্ত্ব যে দিন বাঙ্গালী জীবনগত করিতে পারিবে, সেই দিন শোক অশ্রু শুকাইবে—সেই দিন হৃদয়ের পানে চাহিলেই অমর সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। গুণেই মানুষ অমর, গুণ ভিন্ন মানুষের পূজ্য কিছুই নাই। প্রকৃত সাধুচরিত্র—অমর; ইহকালে কিম্বা পরকালে তাঁহার মৃত্যু

নাই। হৃদয়ে হৃদয়ে চিরকাল সাধু বিচরণ করেন। মহত্ত্ব জীবনগত করার অর্থ, মহত্ত্ব চরিত্রে প্রতিফলিত করা। বাঙ্গালী যে দিন রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বিনয়ী, হিংসা বিদ্বেষ বর্জ্জিত, নিরহঙ্কারী নির্ম্মল যোগী হইবে, সেই দিন শ্মশানের ভিতর হইতে নব বেশে অমর সন্তান স্বদেশী ভ্রাতার হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতে আসিবেন। পুনরুত্থানের অর্থ আর কিছুই নহে, চরিত্রে যে ছিল না, তাহার চরিত্রে আসিয়া বসা। কথিত আছে, খ্রীষ্ট মৃত্যুর সাত দিবস পর গোর হইতে পুনরুত্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহার একমাত্র অর্থ এই, সাত দিবস পর শিষ্যদিগের চরিত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শিষ্যদের প্রকৃত খ্রীষ্ট-প্রাপ্তি হয় নাই। কারণ, প্রকৃত খ্রীষ্ট-প্রাপ্তি হইলে কখনও তাহারা প্রতারকের হস্তে খ্রীষ্টকে সমর্পণ করিত না। খ্রীষ্টকে প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পর তাহারা কখনও কাঁদিত না। ক্রুশবিদ্ধ গুরুর জন্য শিষ্যদিগের ক্রন্দন তখন স্বাভাবিক ছিল, কারণ তাহারা তখনও অমর আত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। সাত দিন পরে যখন খ্রীষ্ট শিষ্যচরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন শিষ্যদিগের চক্ষের জল ঘুচিল, তখন খ্রীষ্ট নাম প্রচারের জন্য সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। শোক তখন নিবিল। শ্মশান তখন স্বর্গের আলোক জ্বালিল। দেশ তখন পবিত্র হইল। প্রকৃত মহৎ লোকের মহত্ত্ব যখন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আর শোকতাপ থাকে না;—অন্ধকারে তখন আলো পেলে, বিষের ধারে তখন সুধা হাসে। রাজকৃষ্ণ চরিত্রের মহত্ত্ব যেদিন বাঙ্গালী চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হইবে, সেই দিন প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এদেশে অমর হইবেন। তখন শোক, দুঃখ, কিছুই থাকিবে না। তখন কর্ণিলিয়া মাতার ন্যায় সন্তানের গৌরব স্মরণ করিয়া বঙ্গমাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন। ভ্রাতৃ-মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া ভ্রাতা তখন আনন্দিত হইবেন। তখনই শ্মশান স্বর্গের পথ দেখাইবে—তখনই নরকে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাইবে। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন সাধুর তিরোধানে বাঙ্গালীর ক্রন্দন স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য।

দেখিতে দেখিতে, চখের পলক পড়িতে না পড়িতে, আমরা অনেকগুলি অমূল্য রত্ন হারাইলাম! কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, তারকপরামাণিক, অক্ষয়কুমার, রামকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ—ইহারা সকলেই আপন আপন বিশেষত্বে মহাপুরুষ। দেখিতে দেখিতে আমরা এতগুলি অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলাম। এখন যাহাতে আমরা ইঁহাদের চরিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে পারি, তাহার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। ইঁহাদের পুনর্জ্জন্ম আমাদের জীবনে না হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন, করুন। কিন্তু সকলের পূর্ব্বে ইঁহাদের মহত্ত্বকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখা কি উচিত নয়? কৃতজ্ঞতা-প্রকাশমূলক প্রকৃত শ্রাদ্ধ সেই দিন বঙ্গে হইবে, যেদিন ইঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্বে আমরা দীক্ষিত হইব। অক্ষয় স্মৃতি-চিহ্ন ইহাকেই বলে। দিন যাইতেছে—শ্মশানের আগুন হু হু করিয়া জ্বলিতেছে—কত রত্ন পুড়িয়া যে ভস্মময় হইবে, কে জানে? অতএব প্রকৃত মহত্ত্ব, প্রকৃত

চরিত্র, প্রকৃত রত্ন যাহাতে বঙ্গ হইতে বিসর্জ্জিত না হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা বিধেয়। অমর সন্তানদিগকে যদি অমর করিতে চাও, তবে ভাই, অগ্রে তাঁহাদিগের চরিত্রে দীক্ষিত হও। ভগবান এই করুন, এই সকল অসামান্য সন্তানগণের মনুত্বে দীক্ষিত হইয়া যেন ইঁহাদিগকে বঙ্গ সন্তানেরা অমর করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পতনের পরে উত্থান, বিষের পরিবর্ত্তে আবার হৃদয়ে সুধার ধারা বর্ষিত হউক। দেশ ধন্য হউক, সমাজ পবিত্র হউক।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। গার্হস্থ্য পাঠ।—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, প্রণীত। এই সুন্দর পুস্তক খানি বঙ্গ মহিলাগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। সোজা কথায়, গৃহ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি আবশ্যকীয় উপদেশ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই মহৎ কর্ত্তব্য পালনের জন্য চন্দ্রনাথ বাবুকে ধন্যবাদ। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনকারী সভাগুলির পাঠ্য তালিকায় এই পুস্তকখানিকে ভুক্ত করা একান্ত উচিত। পুস্তকের মূল্য পাঁচ আনার স্থলে ৵০ আনা হইলে ভাল হয়। কারণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য লোকে বড় একটা পয়সা খরচ করিতে চায় না।

২। বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন।—মূল্য ১্; ২৫২ পৃষ্ঠায় পুস্তক খানি সমাপ্ত। এই পুস্তকের কতকাংশ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তক খানি অতি বিস্তৃত। ইহাতে ফ্রান্স, লণ্ডন, ইতালী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পুস্তকে এমন অনেক নূতন নূতন দৃশ্যের বর্ণনা আছে, যাহা বাঙ্গালার আর কোন পুস্তকে নাই। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, মন তৃপ্তি পায়।

৩। চিন্তাবিন্দু।—ধর্ম্মবিষয়ক কতকগুলি চিন্তা; মূল্য ৵১০। এখানি ক্ষুদ্র উপদেশ পূর্ণ পুস্তক। উপদেশগুলি সারগর্ভ। পড়িলে গ্রন্থকারের ধর্ম্ম চিন্তার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

৪। বালক-বন্ধু।—প্রথম-ভাগ, মূল্য /০। সৎউদ্দেশ্যে লিখিত। পুস্তক খানি সরল ও উপদেশপূর্ণ। বালক বালিকারা পাঠ করিলে উপকৃত হইবে।

৫। রাজা রামমোহন।—বালক বালিকাদিগের জন্য প্রচারিত, মূল্য তিন পয়সা। অতি সরল ভাষায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অমূল্য জীবনের সার সার কথাগুলি ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তক খানি অতি সুন্দর হইয়াছে।

৬। HINDU RELIGION by Dinanath Ganguli of Poona. দীনু বাবু একজন হৃদয়মান ব্যক্তি। তাঁহার মহৎ হৃদয়ের অনেক সার কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সকল মতের সহিত ঐক্য না হইলেও, এ পুস্তক খানিকে তাঁহার মহৎ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বলিয়া আমরা আদর করি। ইহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

৭। বড় বউ বা সুধাবৃক্ষ।—শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত। মূল্য ১্। লেখকের বাঙ্গালা ভাষায় দখল জন্মিয়াছে। এই উপ-

স্তাস খানির উদ্দেশ্য ভাল, এবং লেখা মিষ্ট ও সরল।

৮। ভীষ্মের শরশয্যা।—কাব্য। প্রথম খণ্ড, শ্রীনবীনচন্দ্র কর্ম্মকার প্রণীত, মূল্য ৷৹। বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখুন—"যেমন সংগীত সমিতির মধ্যে কোকিলকণ্ঠী বালক বংশের বংশী-বিনিন্দিত সংগীত লহরীবিনোদিত শ্রোতৃ মণ্ডলের শ্রুতিমণ্ডল, বিদূষকের বদন বিগলিত হাস্যরস সন্দীপিত বিদূষক সংগীতে বিরক্ত ভাবাপন্ন হয়; সেইরূপ, নবীন এই কাব্য খানি, ললিত ভাবালঙ্কারালঙ্কৃত বিবিধ কাব্য পাঠ সংতোষিত পাঠক পরিকরের শ্রুতি নিকরের বিরক্তি উৎপাদননিবন্ধন জন সমাজে অবতারিত হইল।" তারপর পুস্তকের ভিতরের ভাষা দেখুন,—

"ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মতেজে-তেজস্বী-অমিত-
বিক্রমে বিক্রান্ত দ্রোণগুরু, আর দ্রোণি
অজেয় সংসারে।"

স্থানান্তরে—"আথি বিথি স্নান পূজা
বিধি সমাপিয়া।
অর্দ্ধমোছা কেশে, আর আর্দ্র বসনেতে,
আসি ঘরে, অন্ধরাজ প্রিয়া অন্ধরাজে
নিবেদিলা,"

আবার "এ হেন ভকতিনত-ভগিনীসুতের
বচন শুনি শকুনি, সুখ উচ্ছলিত
হৃদয়ে আলিঙ্গি ভূপে," ইত্যাদি

ভাল মন্দ পাঠক বিচার করিয়া দেখুন।

৯। বঙ্গের বীর পুত্র—মহাকাব্য—প্রথম খণ্ড; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৲। এখানি মহাকাব্য হইয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে এখনও মত দিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, কারণ এখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি যে, যোগেন্দ্র বাবুর কাব্য লেখার যথেষ্ট শক্তি আছে। তাঁর ভাষা সরল অথচ সতেজ,—আবেগময়, কবিত্বময়। বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের জীবনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইতেছে। আমাদের আশা আছে, পুস্তক খানি শেষ হইলে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইবে।

১০। পরাশর সংহিতা—বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ১৲। সংস্কৃত গ্রন্থসকলের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া যে সকল মহাত্মা অমর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের তালিকায় কৈলাসবাবুর নাম সন্নিবেশিত করা একান্ত উচিত। ইঁহার দ্বারা প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতি উপাদেয় জিনিস হইয়াছে। ইনি সম্প্রতি সংহিতাগুলি বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া দেশের মহৎ উপকার সাধন করিতে ব্রতী হইয়াছেন। পরিষ্কার অক্ষরে,সরল বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইতেছে। এই সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়া কৈলাস বাবু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন, দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। ভগবান ইঁহার আশা সফল করুন।

১১ ও ১২। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও মহারাজা নন্দকুমার—শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। প্রথম খানির মূল্য ১৷৹, এবং শেষ খানির মূল্য ১৷৹। এই দুই খানিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। উভয় উপন্যাসই এক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে লিখিত, উভয়েরই ভাব ভঙ্গী এক প্রকার,উভয়েই গ্রন্থকারের সম্মান অপ্রতিহত রাখিয়াছে; এজন্য উভয় পুস্তককেই আমরা একত্রে সমালোচনা করিলাম। সমালোচনা করিলাম বলিলে ঠিক বলা হয়না, কারণ এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মতামত কোন কাজেরই নয়। বৃহৎ সমালোচনার স্থান নাই, আবশ্যকতাও তত নাই বলিয়া সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

চণ্ডী বাবু এই দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া স্বদেশ-প্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম, বহুল অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। কেবল তাহা নহে—এজন্য তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের চাকুরীর মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে! ইহা কয়জন লোকে পারে? দেশের জন্য কয়জন লোক এ প্রকার চাকুরী-রূপ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারে?—চণ্ডী বাবু এ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর আদর্শ। গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী থাকিয়াও অম্লানচিত্তে ইংরাজ-কলঙ্ক চিত্রিত করিয়া স্বদেশী ভ্রাতাদিগকে সজীব করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। চণ্ডী বাবু ধন্য, এবং তাঁহার লেখনীও ধন্য।

চণ্ডী বাবু স্বদেশের জন্য এই মহৎ কর্ত্তব্য পালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রতারিত হন নাই। তাঁহার পরিশ্রম-প্রসূত উভয় গ্রন্থই বাঙ্গালীর নিকট আদৃত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থই বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালীর সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

চণ্ডী বাবু এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বলিয়া দেশে পরিচিত হইয়াছেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে দেশের লোকেরা চিনিতে পারিয়াছে। ইহা অল্প ক্ষমতার পরিচয় নয়। বাস্তবিক, চণ্ডী বাবুর লেখায় মিষ্টত্ব আছে, তেজ আছে, সরলতা আছে, বর্ণনায় বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য আছে, ভাষায় কমনীয়তা আছে, ভাবে কবিত্ব আছে। স্বভাব বর্ণনাতে বা চরিত্র আঁকিতে তিনি যে অকৃতী, তাহা নন্। তাঁহার দুই চারিটী চরিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসাংশে তবুও কেন যেন তাঁহার পুস্তক গুলি কিছু পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি, আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তিনি এত ব্যস্ততার সহিত লেখনী চালনা করিতেছেন যে, এ সকল বিষয় ভাবিতে সময় পাইতেছেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রতিভা অংশে হীনপ্রভ বলিয়া যে এরূপ হইতেছে, আমাদের তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁহার একটু সতর্ক হওয়া যেন উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

আর একটী কথা। বঙ্গদেশের লোককে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়াই চণ্ডী বাবুর এইরূপ বিমিশ্রিত গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এটী আমাদের নিকট বড় সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। একজন খাটী সোণার আদর করিতে জানে না বলিয়া যে, বিমিশ্রিত সোণা দিয়া তাহাকে ভুলাইতে হইবে, ইহা বড় সঙ্গত নয়। এই প্রণালীতে কখনই লোকে খাটী জিনিসের আদর করিতে পারে না। বিশেষতঃ এই রূপ বিমিশ্রণে আদি অকৃত্রিম জিনিসকেও কালে লোকে কৃত্রিম বলিয়া ভুল করিতে পারে। কথাটা স্পষ্ট করিয়াই লিখি। যে সকল ঐতিহাসিক অমূল্য সত্য ঘটনা এই উভয় গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে, সে সকলের সহিত স্থানে স্থানে অনেক কাল্পনিক চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। উপন্যাসে তাহা না হইয়াই পারে না। কোন্‌টী কাল্পনিক এবং কোন্‌টী সত্য—ইহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। এক সময়ে সত্যকে কাল্পনিক, এবং অন্য সময়ে কাল্পনিককে সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। এই পুস্তক পাঠে লোকের মনে অনেক ভ্রম জন্মিতে পারে। এজন্য দায়ী কে

এইরূপ সংমিশ্রণে আমাদের দেশের ইতিহাসের অমূল্য সত্যগুলি, ইংরাজ রাজত্বের ঘোরতর কালিমাময় কলঙ্কগুলি কালে সন্দেহ-মেঘে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। এই জিনিস গুলিকে অকৃত্রিম অবস্থায় যদি চণ্ডীবাবু সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেন, তবে আজ না হইলেও, কালে তাঁহার নাম ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিত। আশু ফললাভের আশায়, শ্রদ্ধেয় চণ্ডীবাবু এসম্বন্ধে যে গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন, তাহার আর মার্জ্জনা নাই। তিনি দেশের উপকারের পরিবর্ত্তে পাছে অপকার করেন, এই আশঙ্কায় আমাদের প্রাণ কিছু অস্থির, কিছু ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের কার্য্য কখনই উপন্যাসের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। সেজন্যই আমাদের একান্ত অনুরোধ, চণ্ডীবাবু এ পথ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের এক খানি প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। টাকার অভাবে তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে না, আমাদের সে আশঙ্কা নাই। ভারতের অগণিত রাজন্যবর্গ এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় অবশ্য মুক্ত হস্তে সাহায্য করিবেন। কিন্তু আশু ফল লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডীবাবু কি এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হইবেন? স্বার্থ সময়ে সময়ে মহৎ ব্যক্তিকেও অন্ধ করিয়া তুলে।

আমরা কর্ত্তব্যের একান্ত অনুরোধে উপরোক্ত কথাগুলি না লিখিয়া পারিলাম না, চণ্ডীবাবু সেজন্য ক্ষমা করিবেন। তিনি হৃদয়বান, তিনি স্বদেশ প্রেমিক, তিনি বাঙ্গলা ভাষার একজন প্রকৃত হিতৈষী যোগ্যে বলিয়া বুঝিয়াছি বলিয়াই এতগুলি কথা লিখিলাম। তাঁহার দ্বারা ভারত ইতিহাসরূপ এই মহাব্যাপার সাধিত হইতে পারে, আর কাহারও দ্বারা হইবার নয় বলিয়াই সরলভাবে এতগুলি কথা লিখিলাম। আশা করি, তিনি কথাগুলি একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

পরিশেষে আমরা সাদরে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছি। আসুন সকলে মিলিয়া পতিত জাতির উদ্ধারে ব্রতী হই; জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে জীবনকে আহুতি দিয়া আমরা ধন্য হই।

১৩ ও ১৪। **গৃহিণীর কর্ত্তব্য এবং লক্ষ্মীমণি চরিত।** দ্বিতীয় সংস্করণ— শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। এই উভয় পুস্তকই সাধারণের নিকট পরিচিত। এই সুন্দর পুস্তক দুখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় "লক্ষ্মীমণির শেষ পরিণাম" শীর্ষক যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা অমূল্য পদার্থ; শেষাংশ পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। লক্ষ্মীর জীবন ঘটনাপূর্ণ, এই ঘটনাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত জীবনী সকলেরই একবার পাঠ করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় রচনা খুব হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

১৫। **পাপীর নব জীবন লাভ।**— শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵০ মাত্র। কয়েকটী প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া চণ্ডী বাবু দেখাইয়াছেন, কি প্রকারে পাপীর নব জীবন লাভ হয়। ঘটনা কয়েকটী বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। চণ্ডী বাবুর ভাষা আরো মধুর। যে উদ্দেশ্যে পুস্তক খানি লিখিত, তাহা সফল হইলে আমরা বড়ই আনন্দিত হইব।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র।*

(বাল্য-জীবন।)

সমাজ বন্ধনে বা ধর্ম্ম বন্ধনে, যশোলিপ্সার বা স্বীয় স্বভাবগুণে, যে প্রকারেই হউক, ভারতের রাজাগণ বিদ্যানুশীলন জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে গুণীর গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাদিগকে সমাদরে পোষণ করিতেন। উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং কালিদাস প্রভৃতি মহা কবিগণ তাঁহার তথাবিধ সমাদরের অবশ্যম্ভাবী রত্ন। আজিকার দিনে ভারতবাসী কাঙ্গাল সুতরাং উদরান্ন সংস্থানের জন্য জীবনের যাহা অমূল্য সময়, তাহা ব্যয় করিয়া থাকে। যাহাকে পরিবার প্রতিপালন জন্য অহোরাত্র চিন্তিত থাকিতে হয় সে কি আর কবির কল্পনা-সৃজিত পুষ্পোদ্যানে মনোসুখে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়? কিন্তু পুরাকালে এ রকম ছিল না। তখন রাজা দেশের ছিলেন। সুতরাং দেশীয়ের উন্নতি সর্ব্বাংশে কামনা করিতেন। তাই আজও আমরা স্বভাব-সুন্দরী শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। তাই আজিও ভারতের ঘরে ঘরে রত্নের ভাণ্ডার বিরাজিত। তাই আজিও পাশ্চাত্য সভ্যতার দারুণ নিষ্পেষণে ভারতবাসী সেই সাধের রত্ন ভাণ্ডারের জোরে সাহিত্য জগতে সম্মানিত হইতেছেন। মুসলমানদিগের শাসন সময়েও ভারতের রাজগণ এই চির প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতেন। নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় স্বার্থ সাধন জন্য যদিও বাঙ্গালার ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার একটী চির-প্রচলিত গুণ ছিল। তিনি যথার্থ গুণীর গুণ বুঝিতে পারিতেন এবং বুঝিয়া তাহাকে সম্যকরূপ উৎসাহিত করিতে ত্রুটি করিতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সেই মহানুভবতার স্বরূপ আমরা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন মহাশয়দিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সমসাময়িক কবি ছিলেন এবং উভয়েই নিজ প্রতিভা-বলে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে স্বীয় স্বীয় নাম চিরকালের জন্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কোন্ বাঙ্গালী হৃদয় ভক্ত রামপ্রসাদের কালী কীর্ত্তন শুনিয়া অন্তত ক্ষণ কালের জন্যও জীবনের দাসত্ব ও দুর্ব্বিসহ যাতনা ভুলিয়া ঈশ্বর প্রেমে মত্ত না হয়? শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত কিম্বা অশিক্ষিত বাঙ্গালীর কয় জন আছে যে, একটি না এ-কটি, অন্তত এক পদও প্রসাদের সঙ্গীত প্রসাদী-সুরে গান না করে? এমন বাঙ্গালী কে আছে যে গুণাকর ভারতচন্দ্রকে না জানে? প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গৃহে অন্নদামঙ্গল অধীত হয়। প্রায় প্রত্যেকেই, না জানিয়া না শুনিয়া ভারতের অনেক কথা নিজ নিজ কথাবার্ত্তার মধ্যে প্রচলিত করিয়াছে।

* শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় রায়গুণাকরের যে গ্রন্থ সমূহ প্রকাশ করিবেন, তাহাতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। ন, স।

চাষা হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকল বঙ্গবাসীই ভারতের সুন্দর, ভারতের বিদ্যা ও ভারতের হীরামালিনীর বিষয় অবগত আছে। যিনি স্বীয় গুণে সমস্ত অধিবাসীর হৃদয়ে এমন আসন পাতিতে জানেন, তিনি যে মহাশয় লোক, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা অদ্য সেই মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহানুভব কৃতী পুরুষদিগের, জীবনচরিত পাঠ করিতে সকলেই উৎসুক হইয়া থাকেন। যাঁহারা স্বীয় প্রভাববলে জগতে পরিচিত ও আদৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু পুরাকালের কাহিনী জানার পক্ষে বিষম অন্তরায় আছে। যেহেতু তৎকালিক ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। সুখের বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় যে যে মহাত্মা কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় নাম ধামের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা হইতেই তাঁহাদের বিষয়ে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ—যাঁহাদের প্রেমগানে সমস্ত বঙ্গবাসী মাতিয়াছিল — তাঁহারা প্রায় সকলেই আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া আমরা তাঁহাদের কবিতা বাছিয়া লইতে পারি। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রও তাঁহার প্রণীত সত্যপীরের কথায় নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হত কংশ, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখুটি খ্যাত, দ্বিজ পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দ পুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোর কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥

* * *

গোষ্ঠির সহিত তায়, হরিহোন বরদায়
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রৌদ্র চৌগুণা।

ইহা ছাড়া কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সম্পাদিত প্রভাকরে ভারতচন্দ্রের যে জীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন।

বাঙ্গালাদেশের জমীদারগণ আজ কাল যে দশায় উপস্থিত হইয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সময়ে কিন্তু তাহা ছিল না। তখন সকলেই প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং প্রত্যেকেরই কিছু কিছু লাঠিয়াল ছিল, কারণ তখনকার দিনে বাঙ্গালার লাঠিই ব্রহ্মাস্ত্র। অন্য অস্ত্র যে ছিল না, এমন নহে। ঢাল, সড়কি, বন্দুক, কামান, তরবারিও ছিল। কিন্তু তাহা সংখ্যায় খুব কম। বিশেষ বাঙ্গালী লাঠিতে বড় মজবুত ছিল। যাহার অধিক সংখ্যক লাঠিয়াল থাকিত, তাহারাই প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন। বাঙ্গালার সুবেদারগণ নিয়মিত কর ও উপহার পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তৎকালে সুবাদারের দরবারে প্রত্যেক ভূস্বামীর এক এক জন প্রতিভূ থাকিত এবং তাহারাই নিজ নিজ প্রভুর বিষয়ে নানা কথা কহিয়া সুবাদারের সরকারে সেই জমীদারদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিত। সামান্য সামান্য বিষয় শাসন সম্বন্ধে জমীদারগণই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এমন কি, সামান্য বিষয় লইয়া নিকটবর্ত্তী দুই জমীদারে ঝগড়া বিবাদ হইলে সুবেদার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত ভুরসুট পরগণার মধ্যে পেঁড়ো নামে এক গ্রামে চতুর্দ্দিকে গড় বেষ্টিত এক ভবন ছিল। অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ ভবনে এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীবংশ পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের সময়ে ভূমি সংক্রান্ত নানা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থান বর্দ্ধমান জেলার অধীন ছিল, তাহার কোন কোন গ্রাম এক্ষণ অন্য জেলা ভুক্ত হইয়াছে, এবং অন্য জেলার কোন কোন গ্রাম বর্দ্ধমান জেলা ভুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গলার অন্যান্য জেলা সম্বন্ধেও এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং উক্ত ভুরসুট পরগণার অন্তঃর্গত পেঁড়ো গ্রাম যাহা বর্দ্ধমান জেলার অধীন ছিল, তাহা এক্ষণে হুগলি জেলার অধীন হইয়াছে। এবং হুগলীর অন্তঃপাতী আমতার সন্নিকটে যে স্থান এইক্ষণে পেঁড়ো বসন্তপুর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাই গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি। উক্ত জমীদারদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষে যিনি পেঁড়ো গড়ে বাস করিতেন, তাঁহার নাম রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইঁহারা বিষয় বিভবের জন্য রাজা ও রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণের ঔরষে গুণাকর ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে (১১১৯ সনে) শুভক্ষণে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। ইঁহারা মুখোপাধ্যায়বংশ ভরদ্বাজ গোত্র।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের ৪ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভারতই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। প্রথম চতুর্ভুজ রায়, দ্বিতীয় অর্জ্জুন রায় এবং তৃতীয় দয়ারাম রায়। নরেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রই সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের ভ্রাতাদিগের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কারণ ভারত ভ্রাতাদিগের সঙ্গে বাস করেন নাই। সেই সমস্ত বিষয় আমরা তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ সকল পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে ক্রমে পর পর পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব অতএব আমরা দেখিতে পাই, ভারতচন্দ্র শিশুকালে যথেপ্সিত সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত নির্ব্বিশেষ যত্ন সহকারে লালিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে গ্রাসাচ্ছাদন জন্য তাঁহাকে যে প্রকার পরের উপাসনা করিতে হইয়াছিল, শিশু জীবনে তাঁহাকে তাহার কিছুই করিতে হয় নাই। মাতার আদরে, পিতার সোহাগে, স্বভাবের শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলের অবস্থা সকল সময়ে সমান থাকে না। আজ যিনি রত্নসিংহাসনের অধিকারী, বিধাতার বিধানে হয়ত কাল তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। গুণাকর ভারতের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

কথিত আছে যে, অধিকারভুক্ত ভূমির সীমা সম্বন্ধীয় কোন বিবাদ সূত্রে গুণাকরের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য কহিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের বয়ঃক্রম খুব কম। সুতরাং মহারাণীই সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। মহারাণী একে বিধবা, তাহাতে আবার তাঁহার সন্তান অত্যন্ত শিশু, এই দুর্ব্বাক্য বিধবার প্রাণে সহ্য হইল না। কিন্তু পরাক্রমশালী পেঁড়ো গড়ের অধিপতিদিগকে নিষ্পেষণ করাও সোজা কথা নহে। মহারাণী রাগে অভিমানে অভিভূত হইয়া আপনার দুগ্ধ পোষ্য বালক কীর্ত্তিচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামা

বিশ্বস্ত রাজপুত সেনাপতিদ্বয়কে আহ্বান করিলেন এবং তাহারা উপস্থিত হইলে শিশুকে দেখাইয়া বলিলেন যে "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ শিশুটিকে বিনাশ কর, নয়, এই রাত্রির মধ্যেই ভূরস্থট দখল করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর," তাহা না হইলে আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। বিশ্বাসী সেনাপতিদ্বয় রাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত দশ সহস্র সৈন্য লইয়া ঐ রাত্রেই ভূরস্থট আক্রমণ করিল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ অল্প সংখ্যক লোক লইয়া কোন ক্রমেই এত অধিক সেনার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। কাজে কাজেই তিনি স্বীয় পরিজন সমভিব্যাহারে সেই রাত্রেই পলায়ন করিলেন। কয়েকটি স্ত্রীলোক মাত্র ঐ দুর্গে রহিল। বিনা যুদ্ধে বর্দ্ধমান সেনাপতি ভূরস্থট দুর্গ দখল করিল এবং তাহা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর অধিকার ভুক্ত করিয়া লইল। আর যাহারা গত কল্য মনোসুখে পেঁড়ো গড়ে বিচরণ করিতে ছিলেন, আজ তাঁহারা পথের ভিকারী হইলেন। এই সংসারে ধন বলই বল। যাঁহারা নির্ধন, তাহাদিগকে প্রায় কেহই জিজ্ঞাসা করে না। সম্ভ্রান্ত এবং পরাক্রমশালী রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ এই ঘটনায় একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কোনরূপে কায় ক্লেশে নিতান্ত দৈন্যদশায় পরিজন সমভিব্যাহারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বোধ হয়, ভারতচন্দ্র ভ্রাতাদিগের প্রতি বড় অনুরক্ত ছিলেন না। যখন তাঁহারা পিতাপুত্রে এই প্রকার বিপদে পতিত হইলেন, তখন তিনি পলায়ন পূর্ব্বক নিজ মাতুলালয়ে প্রস্থান করিলেন। মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তঃপাতি গাজিপুরের নিকট নওয়াপাড়া নামে এক গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামে তাঁহার মাতামহের বাস। তিনি মাতুল গৃহে গমন করিলে পর তাঁহার মাতুল তাঁহাকে তাজপুরের টোলে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন।

আজ কাল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে যে প্রকার গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, নগরে নগরে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। এখন যেমন বিদ্যাশিক্ষা উপজীবিকার প্রধান অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, তখন তাহা ছিল না। এখন যেমন সকলেই ইচ্ছা করিলে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, তখন সেরূপ পারিত না। ব্রিটিস শাসনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিকে রাজস্ব সম্বন্ধীয় মুসলমানদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য অত্যাচার সমস্ত মন্দীভূত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি উচ্চশিক্ষা, (high education) সাধারণ শিক্ষার (Mass education) স্রোত প্রবল বেগে বহিতেছে। আজি কালি শিক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। নহিলে অন্নের সংস্থান হয় না। ভারতচন্দ্রের সময়ে এ প্রকার ছিল না। এক্ষণ যেমন পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত মাষ্টার বাবু পেণ্টুলনের উপর চাপকান আঁটিয়া "অভার কোট" চড়াইয়া গলায় "কলার" বাঁধিয়া জামাইষষ্ঠীর জামাই বাবুর মত ছেলে পড়াইতে যান, তখন তেমন ছিল না। তখনকার গুরুমহাশয়গণ নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন। বিশাল আর্কফলা সংযুক্ত পণ্ডিতগণের পড়াইবার স্থান এইক্ষণকার মত রাজপ্রাসাদ ছিল না, পরিত্যক্ত, আবর্জ্জনা বিশিষ্ট ঠাকুর

দালানই তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত। তখনকার লোকগণ বিদ্যাশিক্ষা করিত ধর্ম্ম শিখিবার জন্য, সুতরাং এ সমস্ত বাবুগিরিতে তাহাদের মন ছিল না। তখনকার গুরুশিষ্যের এক বিশেষ বন্ধন ছিল, যাহা জীবনে কখনও ভগ্ন হইত না। আমাদের ভারতচন্দ্র এমনি একটা টোলে এই প্রকার পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রথম পাঠ পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তথাকার শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া ভারতচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে অবস্থানকালে তাজপুরের নিকটবর্ত্তী সারদা নামক গ্রামে কেশরকুনি আচার্য্য বংশে নরোত্তম আচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের যে জীবনী এক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে তাঁহার স্ত্রী ভিন্ন তাঁহার শ্বশুরের আরও একটি কন্যা ছিল। তাঁহার শ্বশুর ঐ কন্যাকে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামের এক ভট্টাচার্য্যের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার শ্বশুর কুলের আর কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার শ্বশুর বংশ কুলাংশে কিছু হীন ছিল। ভারতচন্দ্র যে তাঁহার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না, কারণ তখন তাঁহার বয়ঃক্রম খুব কম। বোধ হয়, তাঁহার শ্বশুর উচ্চবংশীয় বুদ্ধিমান সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া কোনরূপে তাঁহার মাতুলদিগকে বাধ্য করিয়া আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। যদি কেহ মনে করেন যে, ভারত মেয়েকে অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখিয়া নিজে উৎযোগী হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদিগের ইহাও এক বার ভাবা উচিত যে, তাহা হইলে তিনি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী জটাজুটধারী সন্ন্যাসী হইতে পারিতেন না। যাহা হউক, উক্ত বিবাহ তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের মনঃপুত হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের সময়ে সংস্কৃত ভাষা সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহ পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী ছিল না। কারণ তখন মুসলমান রাজা; সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে রাজ ভাষাই আদরণীয় হইয়া থাকে। তখন দেশে পারসীভাষা বিশেষ প্রচলিত ছিল। রাজ দ্বারে যাহারা প্রতিপত্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদিগকে পারসীভাষা যত্নের সহিত শিক্ষা করিতে হইত। সুতরাং অধিকাংশ লোকেই পারসী শিক্ষা করিত। যেমন আজ কাল ইংরেজী না জানিলে কোন কর্ম্মই চলে না, সমাজ নীতি, রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি বিষয়ক কোন প্রবন্ধ আজ কাল বুঝিতে হইলে ইংরেজী জানা চাইই। এই প্রকার ভারতের সময়ে পারসীভাষা জানা খুব আবশ্যকীয় ছিল। ভারতচন্দ্র পারসীভাষা শিক্ষা করেন নাই বলিয়া তাঁহার অগ্রজগণ তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ চটা ছিলেন, পরন্তু ভারত নীচবংশের মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতাগণ সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভারতচন্দ্রকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। বিশেষত সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ স্ব স্ব যজমানদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। ভারতচন্দ্রের কোন যজমান ছিল না, কারণ তাঁহারা ভূস্বামী ছিলেন। ভ্রাতাদিগের

তিরস্কার শ্রবণে ভারতচন্দ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃ ভবন পরিত্যাগ করিলেন।

হুগলী জেলার অন্তঃর্গত বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিমে দেবানন্দপুর নামে এক গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামে কায়স্থ কুলোদ্ভব মান্যবর রামচন্দ্র মুন্সী বাস করিতেন। যাঁহারা পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতেন, তাঁহারা মুন্সী উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। রামচন্দ্র মুন্সীরও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞতার কথা লোকপ্রসিদ্ধ ছিল। ভারতচন্দ্র পিতৃ-ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং সবিনয়ে স্বীয় মনোরথ ব্যক্ত করিয়া তৎসন্নিধানে পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে চাহিলেন। উক্ত মুন্সী বাবুরা অত্যন্ত সাধু ও সদাচারী ছিলেন। তাঁহারা এই ব্রাহ্মণকুমারের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সযত্নে নিজালয়ে রাখিলেন। এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন ও রীতিমত পারস্য ভাষা অধীত করাইলেন।

ভারতচন্দ্র এই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষার কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না। যে সমস্ত ভাব তাঁহার মনো-মধ্যে প্রবেশ করিত, তিনি তাহা যত্ন পূর্ব্বক ছন্দোবদ্ধ করিতেন এবং আপনি পাঠ করিয়া তাহা অবিলম্বে ধ্বংশ করিতেন। রীতিমত মনোযোগ পূর্ব্বক কোন বিষয়েরই বর্ণনা করিতেন না, কিম্বা বর্ণনা করিতে চেষ্টাও করিতেন না। অনেক ভাব আপন মনে উদয় হইয়া আপনিই লয় পাইত। তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ত হইতেন না। কখনও কখনও এই বিষয়ে মনে মনে কিছু কিছু আন্দোলন করিতেন। তাহা না হইলে শুদ্ধ বিদ্যা-ভ্যাসে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি অন্যান্য বালকদিগের ন্যায় নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করিতেন না। ব্রাহ্মণ সন্তান, সুতরাং তাঁহাকে নিজ হস্তেই রন্ধন করিতে হইত। দিবসে একবার মাত্র ভাত রাঁধিয়া সেই ভাত দুই বেলা আহার করিতেন।

ভারতচন্দ্র যে কিরূপ কষ্টে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা এই সমস্ত পাঠেই অব-গত হওয়া যায়। বোধ হয়, অভ্যাস গুণে এই সমস্ত ক্লেশ তাঁহার ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইত না। যাহা হউক, তাঁহার অধ্যবসায় এবং শিক্ষাস্পৃহা বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ। যদি তিনি পিতৃ পৈতামহিক সুখ সচ্ছন্দতা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া এইরূপ দুঃখ কষ্টে পতিত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা আজি তাঁহার মধুর লেখনী বিনির্গত এই সরস মধুর পদ বিন্যাস দেখিয়া মোহিত হইতে পারিতাম না। তাহা হইলে বোধ হয় এমন রত্ন সমুদ্রের অতলস্পর্শ বারিরাশির নিম্নে চির জীবনের জন্য শয়ান থাকিত; কখনও ভাসিত না, সুতরাং কেহ দেখিত না, কেহ তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইত না। ভারতও চিরকালের জন্য তাঁহার ভ্রাতাদিগের ন্যায় অন্ধকারের গর্ভে লীন থাকিতেন। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, ভারত এই প্রকার কষ্ট দারিদ্র্যে পড়িয়া নিজ জীবনে সকল প্রকার দুঃখ, কষ্ট অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাই তিনি জগৎকে হাসাইতে পারিয়াছি-লেন। তাই তিনি নিজের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে জগৎকে মোহিত করিতে সক্ষম

হইয়াছিলেন। এইরূপ কষ্টে পড়িয়া ভারতচন্দ্র কখনও হীনতেজা হন নাই। শুধু যে দিবসে একবার রান্না করিয়া দুবেলা আহার করিতেন, এমন নহে, কোন কোন দিন বা ব্যঞ্জন পাকই করেন নাই। একটা বেগুন পোড়াইয়া কিম্বা আলু ভাতে দিয়া তদ্দারাই দুবেলা আহার করিতেন। এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

এই প্রকারে ভারতচন্দ্র মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে থাকিয়া পারসী ভাষা রীতিমত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতের কবিত্বের প্রথমবিকাশ জনসমাজে প্রথম দৃষ্ট হয়। একদা মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে সত্যপীরের সিন্নি হয়। "সত্যপীরের সিন্নি" কি ব্যাপার, বোধ হয়, তাহা প্রিয় বঙ্গবাসীকে বুঝাইতে হইবে না, কেন না বঙ্গে ইহা সর্ব্বপ্রচলিত। যদি কেহ এমন থাকেন যিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ,তিনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতচন্দ্র রচিত "সত্যপীরের কথা" পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। তবু তাঁহাদের বিদিতার্থ সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সত্যপীর, নারায়ণের এক রূপকল্পনা। ইহাতে সমস্ত বিধিমত আয়োজনাদি হইলে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে। তৎপরে সত্যপীরের কথা কথিত হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে সমবেত লোকসমষ্টি মহানন্দে প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকে। এখানে যাহাকে "সত্যপীর" বলিয়া লিখিত হইল, বাঙ্গলার কোন কোন অংশে তাহাকেই "সত্যনারায়ণ" বলিয়া বলা হইয়া থাকে। এবং "সত্যপীরের সিন্নি" স্থানে স্থানে "সত্যনারায়ণ সেবা" বলিয়া উক্ত হয়। ফলত "সত্যপীরের সিন্নি" এবং সত্যনারায়ণের সেবা" উভয়ই এক। বোধ হয়, মুসলমানদিগের সংস্পর্শে হিন্দু শব্দ সত্যনারায়ণের সেবা স্থলে সত্যপীরের সিন্নি বলিয়া কথিত হইয়া থাকিবে। মুন্সীবাবুদিগের বাড়ীতে যে সত্যপীরের সিন্নি হয়, তাহার কথা বলিবার ভার বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণকুমার ভারতচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়। এবং পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য উক্ত বাবুরা অপর এক ব্যক্তির উপর ভারার্পণ করেন। ভারতচন্দ্র তাহা শুনিয়া কহিলেন "মহাশয় আপনাদিগকে পুঁথি সংগ্রহের কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না, কারণ আমার কাছেই পুস্তক রহিয়াছে। আমি তাহা আনিয়া পাঠ করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি নিজ ঘরে গিয়া ত্রিপদিচ্ছন্দে এক সত্যপীরের কথা রচনা করেন এবং তাহা আনিয়া পাঠ করেন। গ্রন্থের শেষে ভারতের "ভনিতা" ও পরিচয় থাকাতে সমবেত যাবদীয় লোক সেই বালকের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভারতচন্দ্রকে ভূয়োঃ ভূয়োঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি লিখার জন্য তিনি বিশেষরূপ যত্নের সহিত উহা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই তৎকালে যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। যদি ইহাতে কোনরূপ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহা অল্প সময়ে নিষ্পন্ন বলিয়া ও বালকের রচনা বলিয়া সহজেই উপেক্ষিত হইতে পারে।

ইহার কিছু দিন পরে বোধ হয় সত্যপীরের দ্বিতীয় বার পূজা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রকে আর একবার "সত্যপীরের কথা" পাঠ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এইবার

তিনি পূর্ব্বরচিত ত্রিপদীচ্ছন্দের কবিতা পাঠ না করিয়া চৌপদী ছন্দের দ্বিতীয় কবিতা পাঠ করেন। আমরা স্থানান্তরে তাহার কিয়দংশ অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার যে অসাধারণ ক্ষমতা এবং উত্তরকালে যে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন, তাহা সকলেই তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। উক্ত চৌপদীর সর্ব্বশেষ চরণে আছে "ব্রত-কথা সাঙ্গ পায় সনে রৌদ্র চৌগুণ"। এই সনে রৌদ্র চৌগুণা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে এই কবিতা ১১৩৪ সনে লিখিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ভারতচন্দ্র যখন এই কবিতা লেখেন, তখন তিনি পঞ্চদশ বৎসর বালক মাত্র। পঞ্চদশ বৎসরের বালক যে এমন কবিতা লিখিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সে যে, কালে এক অসাধারণ ব্যক্তি হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? আজ কাল যে সমস্ত লোক বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা লেখেন, তন্মধ্যে বাবু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ শিশু কাল হইতেই কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যে তাহার—

"তোমারি তরে মা সঁপেছি দেহ"

ইত্যাদি কবিতা পাঠ করিয়াছিল, সেই মনে করিয়াছিল যে, এই বালক এক দিন বাঙ্গলা সাহিত্য জগতে উচ্চ আসন লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এবং অধিক দিন নয়, ১০। ১১ বৎসরের মধ্যেই তিনি তাহা সম্মানের সহিত লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন, "Child is the father of the man"—মনুষ্য জীবনে যে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, শিশু জীবনেই তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক ভারতচন্দ্রের কবিতা তাঁহার পরজীবনের মোহনকারী, ভাবময়, রচনা সমষ্টির পথপ্রদর্শক হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্র এইরূপে মুন্‌সীবাবুদের বাটীতে থাকিয়া পাঁচবৎসর কাল পারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি যে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার পিতা কিম্বা ভ্রাতার সাহায্যের দরকার হয় নাই। কারণ সেই সময়ে পুত্রের শিক্ষাবিষয়ে পিতাকে কষ্টস্বীকার করিতে হইত না। যিনি অধ্যাপনা করিতেন, তিনি নিজ ব্যয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। এখন যেমন পুত্রকে শিক্ষা দিতে হইলে পিতার কষ্টের সীমা থাকে না, হয়ত পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয় সমস্ত অতি কষ্টে নির্ব্বাহ করিয়া, সমস্ত সুখ, সমস্ত সচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণান্ত পরিশ্রমের উপার্জ্জিত অর্থরাশি পিতা মাতা পুত্রের শিক্ষার্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে তাহার কিছুই করিতে হইত না। এ সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। ধিক এমন সভ্যতা! পূর্ব্বে টোলের ব্যয়ভার প্রায়ই রাজা জমীদার অথবা ধনীব্যক্তিগণ আপনাদের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া—কাহাকে বলিতে হইত না, কাহাকে অনুরোধ করিতে হইত না,—সকলেই স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনা আপনি গ্রহণ করিতেন। কেন না তখন বিদ্যা-দান ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইত। অদ্যাপিও নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর এবং বঙ্গের অন্যান্য অনেক স্থানে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই প্রকার টোল করিয়া থাকেন। এবং আজও অনেকানেক ব্যক্তি তাহার সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা পূর্ব্বকালের তুলনায় অতি সামান্য। বোধ হয়, পাশ্চাত্য নীতির সংঘর্ষে হিন্দুর এই বহুকাল-প্রচলিত পবিত্র প্রথা একেবারেই উঠিয়া যাইবে। কারণ তাহাতে আর লোকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই। যাহা হউক, ভারতচন্দ্র এইরূপ, অনুমান বিংশতি বর্ষ বয়ক্রম কালে পারস্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুন্সী বাবুরা তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া ছিলেন এবং যখন তিনি বাটী প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের শুভ কামনা করিতে করিতে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি স্বভাব গুণে মুন্সীদিগের হৃদয়ে এমন স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই ভারতের অভাব বোধ করিতেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাগণ ভারতের সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

কিছু দিন গত হইল নরেন্দ্রনারায়ণ পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য বর্দ্ধমান রাজ সরকার হইতে কিছু ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া ইজারা লইয়াছিলেন। কিন্তু কর প্রেরণ সম্বন্ধে নানা রূপ গোলযোগ হইতে লাগিল। কারণ খাজানা আদায় করা সেই দিনে বিষম ব্যাপার। প্রজা নিয়মিত খাজানা দেয় না, অথবা দিতে সমর্থ নহে। সুতরাং কর প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু কাল বিলম্ব হইলে বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর কর্ম্মচারীগণ ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করে। তাহাতে তাঁহাদের ইজারা মহল মাঝে মাঝে কাড়িয়া নেওয়ার প্রস্তাব হয়। নরেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ ভাবিলেন যে, ভারতচন্দ্র সর্ব্বাংশে গুণী এবং বিদ্বান, অতএব তিনি যদি বর্দ্ধমান রাজ-সংসারে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের বিষয় রাজার গোচর করেন এবং তাঁহাদের খাজানা রাজসরকারে দাখিল করেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই সমস্ত গোলযোগের দায় হইতে এড়াইতে পারিবেন। নরেন্দ্রনারায়ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভারতচন্দ্রকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলে, ভারতচন্দ্র সহজেই বর্দ্ধমান গমন করিতে সম্মত হইলেন। এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার পিতার প্রতিভূস্বরূপ বর্দ্ধমান রাজদরবারে প্রেরিত হইলেন। তথায় তিনি কিছুকাল সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।

মধ্য জীবন।

বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা।

আমরা বলিয়াছি যে, ভারতচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা অনুসরণ পূর্ব্বক কিছুকাল বর্দ্ধমানে থাকিয়া তাঁহাদের ইজারা সম্বন্ধীয় রাজস্ব রীতিমত আদায় করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে নির্ব্বিবাদে কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু পরিশেষে রাজস্ব আদায়ে সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ ঘটিল এবং তাহাতে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রোষ পরবশ হইয়া ভারতচন্দ্রের পিতার ইজারা মহাল কাড়িয়া লইলেন। এই বিষয়ে ভারত আপত্তি উত্থাপন করিলে রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্রকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজ পরিবার দ্বারা এইরূপে সুসম্ভ্রান্ত ও অপমানিত হওয়াতে রাজবংশ ও রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতের

মনে যে দারুণ বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়াছিল, উত্তর কালে তাহাই বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীল অংশ-উৎপত্তির প্রধান কারণ।

ভারতচন্দ্রের পিতা কেন যে উপযুক্ত সময়ে রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হন নাই, এবং তজ্জনিত ভারতের এই প্রকার অবমাননা আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করিব। অনুমান ১৭৩৫ কি ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে প্রেরিত হন। তখন সুজা খাঁ বঙ্গদেশের নবাব। অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের সূচনাতে লিখিত আছে "সুজা খাঁ নবাব সুত সরফরাজ খাঁ" ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রের বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয় মুরসিদ খুলি খাঁর মৃত্যুর পর সবে নবাব সুজা খাঁ বাঙ্গলার গদিতে আরোহণ করিয়াছেন। এমন সময় ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে প্রেরিত হন। সুতরাং সুজা খাঁয়ের অধিরোহণের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গলার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা যথাযথ রূপে চিত্রিত করা আবশ্যক। নতুবা এ সমস্ত কথা বুঝান অসম্ভব।

ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, মুরসিদখুলি খাঁ বাঙ্গলার নবাবদিগের মধ্যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। শুধু যে তাঁহার ক্ষমতা অপরিসীম ছিল, এমন নহে। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা ও ন্যায় বিচারের গুণে তিনি সকলের চিত্ত অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য অনেকানেক সদ্গুণ ছিল, কিন্তু সে সমস্ত এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মুসলমানদিগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী তাঁহার আরও একটি গুণ ছিল। হিন্দুরা অবশ্য তাহা দোষাবহ বলিয়া মনে করিত। সেটী এই। অনাদায়ী খাজনা আদায়ের জন্য যত রূপ অত্যাচার সম্ভব হইত, তাহা করিতে ক্রটি হইত না। আজ কাল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যত বড় বড় জমীদার কিম্বা ভূস্বামী দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের অধিকাংশেরই পূর্ব্ব পুরুষেরা ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে স্ব স্ব জমীদারী লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন ভূস্বামীদিগের অধিকাংশই এইক্ষণ নিঃস্ব হইয়াছেন। যাঁহারা আজও আপনাদিগের জমীদারী অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে এমন ভাগ্যবান লোক খুব বিরল, যাঁহাকে মুসলমানের যম যাতনাময় কারাগারে কিছুকাল অবস্থান করিতে না হইয়াছিল। মুরসিদ কুলি খাঁর সময়ে অনেক জমীদার এই প্রকার কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, সম্রাট ঔরংজেবের সময় হইতে রাজ্য লইয়া রাজবংশের যে ঝগড়া সৃষ্টি হয়, তাহা ঔরংজেবের অসদ্ দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া যে মারামারি কাটাকাটি হইয়াছিল, আজ এক জন সম্রাট হইলেন কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ছিন্ন মস্তক ভূমে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, এইরূপ কত জন সম্রাট হইয়াছিলেন, কতজন বিনষ্ট হইয়াছিলেন—তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এক জনের মৃত্যু ও অন্য এক জনের অধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশেও নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

এইরূপে সমস্ত দেশ অশান্তিময় হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাবকেও অবশ্য নিজ পদ সুদৃঢ় রাখিবার জন্য যথোপযুক্ত উপহারাদি প্রেরণ করিতে হইত। সম্রাটের বিরুদ্ধে কেহ দণ্ডায়মান হইলে তাহাকে

নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। এ সমস্ত ঘটনা সুসম্পন্ন করিতে হইলে অবশ্যই বিস্তর অর্থের আবশ্যক। অর্থ অবশ্য গাছে জন্মে না, অথবা মাটী দ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। সুতরাং নবাব তাঁহার অধীনস্থ তালুকদার জমীদারের ঘাড়ে এই সমস্ত ব্যয়ভার নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহের ভার অর্পণ করিতেন। জমীদারগণ অবশ্য নিজ ঘর হইতে এ সমস্ত অর্থের সংকুলান করিতেন না। অনেকের হয়ত তদুপযোগী অর্থই ছিল না। অনেকের হয়ত ছিল, কিন্তু নিজের অর্থ কয়জনে অনর্থক ব্যয় করিয়া থাকে। বিশেষ ইহাতে তাঁহাদের লাভের পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছিল। এক গুণ অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা চতুর্গুণ প্রজার ঘাড়ে চাপাইতেন।

যে সকল ব্যক্তি হীনবল—শারীরিকই হউক আর মানসিকই হউক, চিরকালই তাহারা সবল কর্ত্তৃক পেষিত হইয়া থাকে। আজ কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা জগৎ-ময় রাষ্ট্র হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী সভ্যতা কি দরিদ্রের বা দুর্ব্বলের যাতনা হ্রাস করিতে সক্ষম হইয়াছে? হ্রাস করিবে, দূরে থাকুক, পারিলে আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিতে যত্ন পায়।

প্রজা দরিদ্র। এত বেশী অর্থ দিতে সহজে স্বীকার পাইত না। দিবার সংস্থানও ছিল না। সুতরাংই অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা। বিষম অত্যাচারে প্রপীড়িত দরিদ্র বঙ্গের প্রজাগণ মান ভয়ে, অধিকাংশ স্থলে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, নিজে উপবাসী থাকিয়া, পরিবারের যথোচিত কষ্ট দিয়াও এ সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিত। কিন্তু তাহা সহজে ঘটিয়া উঠিত না।

ব্রিটিস শাসন কালে এ সমস্তের যুগান্তর প্রলয় সংঘটিত হইয়াছে। ইংরেজ গবর্ণরগণ প্রথমে প্রথমে মুসলমান রাজাদিগের ন্যায় জমা বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ইহাতে সমূহ ক্ষতি ভিন্ন লাভ অনুমাত্রও নাই, তখন তাঁহারা অন্য প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ইংরেজরাজপ্রতিনিধি দেখিলেন যে, জমীদারগণ বেশী কর আদায়ের জন্যই বিশেষ মনোযোগী, ভূমির উৎকর্ষতা সাধনপক্ষে তাঁহাদের কিছুমাত্রই মন নাই। তাহার কারণও ছিল। বন্দোবস্তী মিয়াদ পূর্ণ হইলে হয়ত অন্য ব্যক্তি বেশী জমা দ্বারা তাঁহাদের জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া নিতে পারে, এই ভয়ে তাঁহারা ভূমির উন্নতি সাধন জন্য মনোযোগী হইতেন না। সুযোগ্য রাজ-প্রতিনিধি ভাবিলেন, যদি চিরকালের জন্য জমীদারদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে ভূমির প্রতি তাঁহাদের যত্ন বৃদ্ধি পাইবে, উপযুক্ত সময়ে করও আদায় হইবে এবং যে সমস্ত গোলযোগ হইতেছিল, তাহা হইবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল।

আজ কাল জমীদারগণ ভূকর ব্যতীত প্রজার নিকট হইতে যে কর লইয়া থাকেন, মুসলমানদিগের শাসন সময়ে ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার কর লইতেন। যাহারা তৈল তৈয়ার করিত, তাহারা তৈলের কর দিত। যাহারা মাটীর হাঁড়ি বানাইত, তাহারা হাঁড়ির কর দিত। এইরূপে বেনে, কামার, ছুতর, গয়লা, নাপিত, রজক, তাঁতি প্রভৃতি কাহারও অব্যাহতি ছিল না। এই সকল করের জ্বালায় প্রজার তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রজার

উপর আরও নানা প্রকার অত্যাচার হইত। প্রজাগণ অনেক সময়ে ঋণগ্রস্ত হইত। সুতরাং তাহারা উপযুক্ত সময়ে সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিত না। তাই সময় মত রাজস্ব আদায় হইয়া উঠিত না। সুতরাং ইজারাদারগণও সময় মত তাহাদের খাজানা আদায় করিতে পারিত না।

যখন ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমান রাজ সরকার হইতে তাঁহার ভূমি ইজারা লয়েন, তখন বাঙ্গলার এই প্রকার দুর্দশা। তাঁহারা একে নিঃস্ব ছিলেন, তাহার উপর আবার সময় মত খাজানা আদায় হইয়া উঠিত না, তাহাতেই তাঁহাদের রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে কাল বিলম্ব হইত। ইজারাদারদিগের মধ্যে যাহারা ধনী ছিল, তাহারা নিজ নিজ ঘর হইতে টাকা দিয়া জমীদারের প্রাপ্য খাজানা আদায় করিত। পরে মহাল হইতে আপনার টাকা নিজ বাহু বলে সুদে মূলে আদায় করিয়া লইত। নরেন্দ্রনারায়ণ তাহা করিতে পারিতেন না, সুতরাংই ভারতের ভাগ্যে এই প্রকার বিপদ উপস্থিত হইল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রোষপরবশ হইয়া ভারতচন্দ্রের পিতার মহাল অনাদায়ী টাকার জন্য কাড়িয়া লইলেন। এবং ভারতচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বর্দ্ধমানরাজ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত গোলযোগের জন্য ভারতচন্দ্রের পরিবার প্রতি আন্তরিক ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং এই সুযোগে পূর্ব্বঝাল মিটাইবার জন্য ভারতচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন। আমাদের ইহা মনে হয় না। যদি বর্দ্ধমান রাজ তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকিতেন, তাহা হইলে কখনও ভারতচন্দ্রের পিতাকে মহাল ইজারা দিতেন না। যদি বলেন, রাজা প্রথমে ইজারা দিয়া কলে কৌশলে নরেন্দ্রনারায়ণকে আপনার কাবুতে ফেলিয়া আক্রোশ মিটাইবেন, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার এইপ্রকার অভিপ্রায় ছিল। তাহা হইলে বর্দ্ধমানের রাজাকে নিতান্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমরা তাঁহাকে এত দূর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বলিয়া মানিতে অনিচ্ছুক। সোজা কথায় এই মনে করিলেই সব গোল চুকিয়া যায়; যেমন আরও ১০ জন ইজারাদার অনাদায়ী টাকার জন্য কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করিত, ভারতের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভারতচন্দ্র আপনার অমায়িক ব্যবহার ও সরলতার গুণে পরকে আপনার করিতে জানিতেন। যে একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত, সেই তাঁহার সরস, মধুর বাক্য শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইত। এই গুণে তিনি দেবানন্দপুরের মুন্সী বাবুদের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এই গুণের জন্য তিনি মহারাষ্ট্রের সুবেদার শিব ভট্টের নিকট আশ্রয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই গুণের জন্যই তিনি দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ পাল চৌধুরীকে আপনার বাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই গুণ বলেই তিনি কারাগারের যম যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। যে একবার তাঁহার সহবাসে আসিত, সে কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে তিনি অনেক লোককে আপনার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে

কারাধ্যক্ষ এক জন এবং নাপিত রঘুনাথ অন্যতম। রঘুনাথ তাঁহার ব্যবহারে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিত। তাই সে সমস্ত সুখে জলাঞ্জলী দিয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল।

একদা নিভৃতে কারাধ্যক্ষকে পাইয়া ভারতচন্দ্র আপনার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। বলিলেন, রাজা অনর্থক তাঁহাকে এই প্রকার কষ্টে ফেলিয়াছেন। ফলত তাঁহার পিতার কিছুমাত্রই দোষ নাই। যে রাজস্বের জন্য তাঁহাদের ইজারামহল কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তৎপরিমাণ টাকা যাহার যাহার নিকট পাওনা আছে তাঁহাদের নাম ধাম বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, রাজ কর্ম্মচারীগণ ইচ্ছা করিলেই সহজে টাকা উশুল করিতে পারেন। তার পর তিনি সকাতরে কারাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহার বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ভারতচন্দ্রকে বলিলেন যে, বর্দ্ধমান রাজার অধিকার অতি বিস্তৃত। তুমি পলায়ন করিয়া এমন জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, যেখানে তোমার খোজ পাওয়া যাইবে না। ফলত তুমি যদি এই রাজার অধিকারে বাস কর এবং রাজা ইহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন, তাহা হইলে তোমার ও আমার সমূহ বিপদ সংঘটিত হইবে। তুমি অচিরে আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং আমার প্রতিও কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইবে।

ভারতচন্দ্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে, আমি এই দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিব। কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না। তার পর সমস্ত ঠিক ঠাক হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঘুনাথ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত। ভারতচন্দ্রের এই প্রকার দুর্দ্দশাতে রঘুনাথ আন্তরিক ক্লিষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণ কারাধ্যক্ষের সহায়তায় ভারত মুক্তি লাভ করিবেন শুনিয়া সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। পরে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে চলিয়া যাইবেন শুনিয়া রঘুনাথ তাঁহার অনুগামী হইতে স্বীকৃত হইল। ভারতচন্দ্র একমাত্র বিশ্বাসী ভৃত্য রঘুনাথকে সঙ্গে করিয়া বিবিধ স্থানে সন্ন্যাসীর বেশে পরিভ্রমণ করিয়া, দীর্ঘকাল পরে, ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন।

যখন ভারতচন্দ্র কটকে উপস্থিত হইলেন, তখন উড়িষ্যার অবস্থা অতি শোচনীয়। উড়িষ্যাদেশ তখন বিশাল রণক্ষেত্র হইতে সবে একটুকু অবসর গ্রহণ করিয়াছে। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, চৌথ আদায়ের জন্য মহারাষ্ট্রীরা কি গণ্ডগোল না বাধাইয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের পর নিজে রঘুজি ভুঁসলা ও তৎপরে রাজা জীনাজি ভুঁসলার আক্রমণে দেশময় গণ্ডগোল ছাইয়া ফেলিয়াছিল। লোক সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তারপরে কিরূপে সন্ধি পত্র দ্বারায় বাঙ্গলার নবাবগণ দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তারে ইতিহাসে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই সন্ধি পত্র দ্বারা এইরূপ অবধারিত হয় যে, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বার্ষিক ১২০০০০০ বার লক্ষ টাকা চৌহত প্রদান করিবেন। এবং শিব-ভট্ট শাস্ত্রী নামক প্রসিদ্ধ গোঁসাই

বণিক সেই চৌকত গ্রহণ করিবার জন্য মহারাষ্ট্রাদিগের প্রতিভূ স্বরূপ কটকে স্থাপিত হন। শিবভট্ট অনুমান ১১৫৮ সনে উড়িষ্যায় স্থাপিত হয়েন। ইহার সহিত তুলনা করিলে সহজেই দেখা যায় যে, অনুমান ৩৯ বৎসর বয়ক্রমকালে ভারতচন্দ্র শিবভট্টের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার অনুচর রঘুনাথ সমভিব্যাহারে কটকে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্র সুবাদার শিবভট্ট শাস্ত্রীর নিকট আপনার দুঃখ কাহিনী সবিনয়ে ও সবিস্তারে বর্ণন করেন। শিবভট্ট অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। ব্রাহ্মণের ঈদৃশ দুঃখকাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ভারতচন্দ্র পুরুষোত্তমে বাস করিবার জন্য ইচ্ছা জানাইলে সুবাদার মঠধারী ও পাণ্ডাদিগের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, "ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যে পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবেন, সেই পর্য্যন্ত কেহ যেন তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ কর গ্রহণ না করে। ইনি বিনাকরে তীর্থবাসী হইবেন। যখন যে মঠে ইচ্ছা, তখন সেই মঠে থাকিতে পারিবেন। প্রতিদিন একটি "বলরামী আটকে" প্রাপ্ত হইবেন। সকলেই যেন তাঁহাকে বিশেষরূপ সম্মান করে।"

জগন্নাথ এইক্ষণে হিন্দুর দেবতা, কিন্তু প্রাচীনকালে উহা বৌদ্ধদিগের মন্দির ছিল. এই বিষয়ে অনেকানেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ ঐ মন্দিরে "বুদ্ধ." "ধর্ম্ম" ও "সংঘের" উপাসনা করিত, তাহা এইক্ষণে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ যখন ঐ মন্দিরসংস্থাপন করে, তখন অনেকানেক মঠ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাতে সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীরা বাস করিত এবং ঈশ্বরোপাসনা করিত। এখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া আবার হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন হিন্দুরা সেই সমস্ত মঠ দখল করিয়া লয় এবং নিজেরাও বৌদ্ধদিগের অনুকরণে অনেক মঠ প্রস্তুত করে। অধিকাংশ মঠেই এইক্ষণ শিবলিঙ্গ ইত্যাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও শ্রীক্ষেত্রে এক মঠ স্থাপন করেন, তাহার নাম গোবর্দ্ধন মঠ। আমাদের ভারতচন্দ্র সেই গোবর্দ্ধন মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। "আটকে" সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদ আছে এবং তাহা সেই সেই দেবতার নামানুযায়ী আটকে বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ভারতচন্দ্রকে বলরামের প্রসাদ দিবার জন্য শিবভট্ট আদেশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রসাদ পুরুষোত্তম যাত্রীরা নিজ ব্যয়ে খরিদ করিয়া লইয়া থাকে। কিন্তু শিবভট্টের অনুগ্রহে ভারত তাহা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র এইরূপে বিশ্বাসী অনুচর রঘুনাথের সহিত মনের আনন্দে গোবর্দ্ধন মঠে বাস করিতে লাগিলেন এবং বিনাব্যয়ে ঈশ্বর প্রসাদ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ মঠে অবস্থানকালে অনেক বৈষ্ণবের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া এতদূর প্রীতি লাভ করিলেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ মঠে অবস্থানকালে ভারতচন্দ্র ভক্তি রত্নাকর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

ভারত বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও বৈষ্ণবদিগের সহবাসে, এবং সংসারে থাকিয়া যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন, সেই জন্য, সংসারের প্রতি তাঁহার আর মন রহিল না। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। তৎপর ভৃত্য রঘুনাথকেও বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে তিনি পুরুষোত্তমে কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। বৈষ্ণব সাজিয়া সংসারকে ভুলিয়া, পিতা মাতার স্নেহকে তুচ্ছ করিয়া, জীবন-সঙ্গিনী প্রেয়সীকে বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইয়া ভারত চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর ঈশ্বর প্রেমগানে মত্ত হইলেন। আমরা ভারতের বাল্যজীবন পর্য্যালোচনা করিয়াছি, মধ্য জীবনে কবিত্বের আভাষ পাইয়াছি, বিষয় কর্ম্মের পরিচালনে নিপুণতা সন্দর্শন করিয়াছি। আবার এইক্ষণে সংসারত্যাগী, জটাজুটধারী, গেরুয়াবসনপরা ঈশ্বরপ্রেমে ঢল ঢল-মুখ ভারতচন্দ্রকে দেখিতেছি। বৈষ্ণবেরা চিরকাল কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। আজ কাল যদিও নেড়ী বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক, তথাপি ভক্ত বৈষ্ণবও ২।১টি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহাদের মুখ দেখিলেই ধর্ম্মের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নব্য সভ্যতা স্রোতে, হিন্দু অহিন্দুতে মিশামিশী হইয়া ধর্ম্মের বিশাল জগত মাতোয়ারা ভাব সকল গিরি-গহ্বরে লুকাইতেছে। যতই বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে, ততই যেন জগতে হৈ. হৈ রৈ রৈ এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যথার্থ ধর্ম্ম—লোক ভুলান ধর্ম্ম নহে—লোপ পাইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে বৈষ্ণবেরা যথার্থ ধার্ম্মিক ছিল। এক প্রাণে এক মনে যখন তাহারা ঈশ্বরের প্রেম কীর্ত্তন করিত, তখন যে তাহাদের কথা শুনিত, সেই মাতিত।

ভারতচন্দ্র ও প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। আর যে কখনও তিনি সংসারী হইবেন, সংসারে আসিয়া লোকের উপাসনা করিবেন এবং হৃদয়মুগ্ধকর কবিতা-মালা বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গভূষণ স্বরূপ সৃজন করিবেন, তাহা বোধ হয় তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

যাহা হউক, বঙ্গভাষার বড় সৌভাগ্য যে, আবার ভারতচন্দ্র সংসারী হইয়াছিলেন। যদিও অনেকানেক সমালোচক ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ সমূহকে নিন্দা করিয়া নানা কথা কহিয়া থাকেন, তথাপি কেহই ভারতের প্রশংসা করিতে কসুর করেন নাই। ফলত বিদ্যাসুন্দর হইতে ২।৩টি কবিতা উঠাইয়া দিলে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী যে অতুলনীয়, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। রসমঞ্জরী তাঁহার নিজের নহে, অনুবাদ মাত্র। আমরা উপযুক্ত স্থলে এই সকল বিষয়ের সমালোচনা করিব। ভারত কি উপায়ে আবার সংসারী হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। চৈতন্য প্রথমে এই ধর্ম্ম বিশেষরূপে বঙ্গদেশে প্রচার করেন, যাঁহারা চৈতন্যের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই চৈতন্যের ধর্ম্মভাব সকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চৈতন্যের হৃদয় বিশ্বব্যাপী প্রেমের আধার ছিল। এত প্রেম না থাকিলে কি তিনি জগত্‌কে মাতাইতে পারিতেন! চৈতন্যের শিষ্যেরা নিরামিষাশী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাহারা

প্রভুর প্রসাদ পরমানন্দে উপভোগ করিত এবং প্রভুর গুণকীর্ত্তন করিয়া জীবন কাটাইত। তাহারা সরল হৃদয় বিষ্ণুভক্ত। আজকাল অবশ্য নানা প্রকার ঘৃণিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা আমাদের বর্ণনার বিষয় নহে। চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মে মানব জাতির বর্ণ বিভাগ ছিল না। সকলেই সকলের অন্ন গ্রহণ করিত। তাহারা অনেকে দল বাঁধিয়া আখড়া অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিত এবং সকলে তথায় বাস করিত। হিন্দুরা যখন দেখিলেন যে, প্রায় অর্দ্ধেক লোক বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা চৈতন্যকে বুদ্ধের ন্যায় নারায়ণের অবতার বলিয়া প্রচার করিলেন এবং চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম ভুক্ত করিয়া লইলেন।

বৃন্দাবন ধাম ভারতবর্ষের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম ক্ষেত্র। ভারতের প্রধান প্রধান বৈষ্ণবেরা জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে কাটাইতেন। বৃন্দাবন যে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মক্ষেত্র, তাহার অনেক নিদর্শন আছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজাদিগের নির্ম্মিত মন্দির সকল এই সমস্তের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আজিও তথায় অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। আজিও বহুদূর হইতে তীর্থ যাত্রীরা বৃন্দাবনে গমন করিয়া থাকে। শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণও বৃন্দাবন তীর্থ গমন করিতে অভিলাষী হইয়া ভারতচন্দ্রকে এই বিষয় অবগত করায়। ভারতচন্দ্র তাহাদের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং অবিলম্বে বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করত বৃন্দাবনধামে গমন মানসে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এখন আর সংসারী নহেন। পথিমধ্যে যেখানে যেখানে বৈষ্ণবদিগের "আখড়া" প্রাপ্ত হয়েন, সেইখানে সকলে মিলিয়া প্রভুর প্রসাদ ভক্ষণ করেন এবং কীর্ত্তন করেন। এই প্রকারে চলিতে চলিতে কিছু দিন পরে তাঁহারা জেলা হুগলির অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। খানাকুলে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরে অনেক বৈষ্ণব বাস করিত। তাহারাও অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের ন্যায় প্রভুর প্রসাদ ভক্ষণ করিত ও সদাসর্ব্বদা কীর্ত্তন করিত। যখন ভারতচন্দ্র ও তাঁহার সমভিব্যাহারী বৈষ্ণবগণ গোপীনাথ জীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবেরা মনোহরসায়ি কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র তাঁহার সঙ্গীদিগের সহিত গোপীনাথ জীর প্রসাদ ভোজন করিয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কথিত আছে যে, গুণাকর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ভাবে ভোর হইয়া ক্রমাগত প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

যখন ভারতচন্দ্র কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে এই প্রকার বিভোর হইতেছিলেন, তখন আর এক ঘটনার সূত্রপাত হইতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খানাকুল কৃষ্ণনগরে তাঁহার এক শ্যালীর বিবাহ হয়, ভৃত্য রঘুনাথ তাহা জানিত। বোধ হয়, সন্ন্যাসীর জীবন রঘুনাথের অসহ্য হইয়াছিল। অথবা বঙ্গদেশে আসাতে তাহার পরিবারদিগের কথা মনে হইয়াছিল, এই জন্য সে আর মাতৃভূমি ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল না। বোধ হয়, সে ভারতচন্দ্রকে সন্ন্যাসীর জীবন পরি-

ত্যাগ করিয়া সংসারী হইতে অনুরোধ করিয়া থাকিবে, কিন্তু ভারতের তাহাতে অনুমাত্রও স্পৃহা নাই দেখিয়া অন্য কোন রূপে তাঁহাকে সংসারী করিতে চেষ্টা করিতেছিল। রঘুনাথ ভারতচন্দ্রকে আন্তরিক ভালবাসিত, সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারী হইতেও তাহার মন ছিল না। তাই সে ভারতকেও সংসারী করিতে সুযোগ খুঁজিতে ছিল। রঘুনাথ তাহার প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া অন্য প্রকার ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতির বাড়ী বাহির করিল। এবং ভারতচন্দ্রের শ্যালী ও শ্যালীপতিকে তাঁহার কথা সবিস্তারে অবগত করাইল।

ভারতচন্দ্রের শ্যালী ভগ্নীর জন্য বড় দুঃখিত ছিলেন, কারণ ভারত বিবাহের পর আর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। এইক্ষণ ভারতচন্দ্র খানাকুলে আসিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার শ্যালী নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতে স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার স্বামীও ভারতের জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, সুতরাং তিনি অগৌণে তাঁহাদের পাড়ার ভট্টাচার্য্যদিগকে সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভারতের তথাবিধ বেশ ভূষা দর্শনে তাঁহারা প্রথমে তাঁহাকে চিনিতেই পারিলেন না। তৎপরে গান সমাপ্তির পর ভট্টাচার্য্যেরা ভারতচন্দ্রকে সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভারত প্রথমে সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। তখন ভট্টাচার্য্যেরা নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং রূপ লাবণ্য যুক্তা পূর্ণযৌবনা স্ত্রীর দুঃখের কাহিনী যথাযথ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলেন। ইহাতে ভারতের মন কিছু নরম হইল। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ভট্টাচার্য্যেরা বিবিধ শাস্ত্রসম্মত যুক্তিদ্বারা তাঁহার পৌত্রিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে লইয়া ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী ভগ্নী দুঃখে ব্যথিত হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে ভারতচন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাকে এমনি আবদ্ধ করিলেন যে, ভারত কোন রূপেই তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। সুতরাং আবার সংসারী হইলেন। তাঁহার শ্যালী ও শ্যালীপতি ইহাতে এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বসন পরিত্যাগ করাইয়া উত্তম ধৌত বস্ত্র পরাইলেন। তাঁহারা ভারতচন্দ্রের প্রতি এমনি যত্ন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলেন। পরে তাঁহারা নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে সংসারে দৃঢ়তর আসক্তি জন্মাইতে লাগিলেন। ভারতচন্দ্র এইরূপে আবার সংসারী হইলেন।

ভারতচন্দ্র আবার সংসারী হইলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই পিতা কিম্বা ভ্রাতার নিকট যাইতে সম্মত হইলেন না। কারণ ভ্রাতাদিগের জন্য তিনি নানা প্রকার ক্লেশ

ভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের উপর বড় চটা ছিলেন। যখন তাঁহার শ্যালীপতি তাঁহাকে পিতৃ ভবনে যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন যে "আমি আপনাদের বিশেষ অনুরোধে তীর্থ ভ্রমণ, যোগ সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয় কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই গৃহে যাইব না। সুতরাং তাঁহারা ভারতকে পিতৃ ভবনে পাঠাইতে নিরস্ত হইলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারতচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করিলেন। তাঁহার শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্য বহুকালের পর "হারা নিধি" জামাতাকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং মহা সমাদরে তাঁহাকে গৃহে লইলেন। আচার্য্যের ভবন এক আনন্দের বাজার হইয়া উঠিল। তনয়া আজ বহু কাল পরে জগতের সার, সতীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা, স্বামীকে দেখিবেন, মনে করিতেই যেন তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। যাহাতে স্বামীর মন আকর্ষণ করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রথমে কি কথা কহিবেন তজ্জন্য মন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎস খুলিয়া গেল। ফলতঃ চির-বিরহিণীর স্বামী সন্দর্শন যে কি ব্যাপার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—বিশেষত সেই বিরহিণী যদি সতী হয়। তখনকার দিনে হিন্দু ললনার পতি আজি কালির মত বিশেষ বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হইত না, পরন্তু হিন্দু ললনার সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। এহেন পতিকে হারাইয়া আচার্য্য তনয়ার যে কি ভাবে কাল কর্ত্তন হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। এবং যখন সেই হারা নিধি ফিরিয়া পাইলেন, তখন আর তাহার আহ্লাদ রাখিবার স্থান রহিল না। আচার্য্য-পত্নীও কন্যার দুঃখের অবসান ভাবিয়া আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি জামায়ের আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাড়াতাড়ি পাড়া প্রতিবাসীর মেয়েদিগকে এই সুখের কাহিনী বলিয়া আসিলেন। পাড়া প্রতিবাসীও আনন্দে বিভোর হইয়া ভারতচন্দ্রকে দেখিতে তদ্দণ্ডে নরোত্তম আচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

তারপর নিশীথে পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার স্ত্রীর প্রথম সন্দর্শন হইল। ভারত স্ত্রীর অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন। অপিচ তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণ ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে এমন প্রীতিলাভ করিলেন যে, চিরকাল প্রেমময়ী স্ত্রীর সঙ্গে থাকিয়া স্ত্রীকে সুখী করিবেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু স্ত্রীর সচ্ছন্দতা সম্পাদন করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক, সুতরাং তিনি অর্থ সংগ্রহে সচেষ্ট হইলেন। কিছুকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া মনের আনন্দে স্ত্রীসংসর্গে আমোদ প্রমোদ করিলেন। তারপর অর্থ সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন। সুতরাং শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া যাইবার সময়ে শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন যে "মহাশয়! আপনি কখনও আমার স্ত্রীকে আমার পিতার নিকট পাঠাইবেন না। যে পর্য্যন্ত আমি উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইহাকে স্বতন্ত্র রূপে না

রাখিতে পারি, সেই পর্য্যন্ত আপনার কাছেই রাখিবেন।"

আমরা এক্ষণে যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে তখনও কিছু-কাল বিলম্ব আছে। ইংরেজগণ তখন বণিক সম্প্রদায় মাত্র। ইংরেজদিগের ন্যায় ফরাসী পর্তুগিজ ও অন্যান্য বণিক সম্প্রদায় তখন বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। সমুদ্রে অনেকেই ডুবে, কিন্তু রত্ন অল্প সংখ্যকের কপালেই লাভ হয়। ইংরেজগণ অধ্যবসায় গুণে নানা কুকীর্ত্তি দ্বারা ভারতের সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা আজকাল প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট। ফরাসী, পর্তুগীজ এবং অন্যান্য সকলের কপালে যা ছিল, তা লইয়াই তাঁহারা দেশে ফিরিয়াছেন। যাহা হউক, সে সমস্ত ইতিহাসের কথা। আমরা যে সময়ের বিষয় লিখিতেছি, তখন ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের বাণিজ্যের এক কুঠী ছিল। ফরাসডাঙ্গায় প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রীয় পালধি বংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসীদিগের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকের লোকেই জানিত। এবং তিনি বদান্য ও দানশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ভারতচন্দ্র উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সমস্ত দুঃখের কথা সবিস্তারে বলিলেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

দেওয়ানজী, ভারতের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক অবগত হইয়া, ভারতের বিশেষ উপকার করিতে চেষ্টিত হইলেন। ভারতকে আস্থা প্রদান পূর্ব্বক কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি নিজে উপযুক্ত সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। সেই সময়ে চৌধুরী বংশের জাতি সম্বন্ধীয় কোন অপবাদ থাকাতে ভারতচন্দ্র তাঁহার বাসায় না থাকিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ভবনে অবস্থান করিলেন এবং প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় চৌধুরী বাবুর নিকট আসিয়া উমেদারী করিতে লাগিলেন। একদা চৌধুরী বাবু ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "ভারত! আমি তোমাকে ফরাসীর ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি কিন্তু তাহাতে তোমার গুণরাশি মানব সমাজে অপ্রকাশিত থাকিবে। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে এবং তিনি মধ্যে মধ্যে টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়া থাকেন। এবার তিনি এখানে আসিলে আমি তোমাকে তাঁহার নিকট অর্পণ করিব। তিনি যথার্থ গুণগ্রাহী সুতরাং তাঁহার নিকট থাকিলে তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে।" ভারতচন্দ্র সেইখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতীক্ষায় কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। একদিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় মহারাজাকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে আসনে উপবেশন করাইয়া বিবিধ প্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন। তৎপর ভারতচন্দ্রকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও বংশাবলীর পরিচয় প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহার দুঃখের

কাহিনী যথাযথ বাক্যে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিবার জন্ত মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন,—"আমি এইক্ষণ কলিকাতায় যাইতেছি, কালীঘাটে কালী দর্শন করিয়া কৃষ্ণনগর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ক্ষুদ্র তরী।

ওই ক্ষুদ্রতরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
ছুটিয়া পাগল প্রাণ ওরি পিছে ধায়!
অনন্ত লহরী সঙ্গে
তরঙ্গিনী কত রঙ্গে
তরল রজত স্রোত-পুলকে গড়ায়!
ওই ক্ষুদ্রতরী খানি বুকে ভেসে যায়!
কঠিনা কাষ্ঠের তরী
নদীবক্ষ ভেদ করি
প্রতি দাঁড় বিক্ষেপণে ছুটিয়া পলায়,
পশ্চাতে রাখিয়া দাগ—যতদূর যায়!

১

ওই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল প্রাণের প্রাণ ওরি পিছে ধায়!
জীবন প্রবাহে নদি,
দাগ রেখে যায় যদি
তবুও জলের দাগ জলেই মিশায়!
আবার লহরী রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়!
কঠিনা কাষ্ঠের তরী
এই বক্ষ ভেদ করি
তোব লো হৃদয়সনে ভেসে ভেসে যায়,
বিদীর্ণ হৃদয় নাহি মিশে পুনরায়!

২

ওই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল করিল প্রাণ —কে গো ওই নায়?
প্রতি দাঁড় বিক্ষেপণে
যে আঘাত লাগে মনে,
যে তরঙ্গ ওঠে মনে বলা নাহি যায়;
নদীর নির্জ্জীব জল—সম্ভবে কি তায়?
জলময় নদী বক্ষ
এ আঘাত লক্ষ লক্ষ
মুহূর্ত্তে কাঁপায়ে জল মুহূর্ত্তে মিশায়!
বিদ্যুৎ আঘাতে বুক বিলোড়িয়া যায়!

৩

ওই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পাগল করিল প্রাণ, কেগো ওই নায়?
তরল সলিল রাশি
সরল রজত-হাসি
আঘাতে কাঁপিয়া নদী হাসে পুনরায়,
সন্ধ্যার সৌন্দর্য্যমালা পরিয়া গলায়!
কিন্তু ও আঘাত গুলি
যে তরঙ্গ দি'ছে তুলি
প্রতপ্ত শোণিত স্রোতে—সহন না যায়,
সমস্ত হৃদয় কাঁপে আগার গোড়ায়!
মনের যে সুখ আশা
প্রাণের যে ভালবাসা
অন্তরের সে পিপাসা ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রায়,
কম্পিত জীবন-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়।

৪

ওই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়,
পশ্চাতে রাখিয়া দাগ—কেগো ওই নায়?
স্বর্ণভানু অস্তাচলে
কি শোভা জলদ দলে

সোণার আঁচল খানি গগনের গায়,
শীতল মৃদুল সান্ধ্য অনিলে উড়ায়!
ও তরীর আগে ভাগে
আকাশে ও শোভা জাগে
মোর মত পিছে থেকে দেখ পুনরায়,
ধ্বক্ ধ্বক্ জলে বহ্নি গগনের গায়!

৫

ওই ক্ষুদ্র তরী খানি ধীরে ধীরে যায়
ফিরে না নয়ন দুটী—কেগো ওই নায়?
কঠিন মাঝীর প্রাণ
ঘন দেয় দাঁড়ে টান
মনে করি, করি মানা, সরে না জিহ্বায়,
কাতর নয়ন দুটী ওই দিকে চায়!
বাসনা সতত প্রাণে
থাকে তরী ওই খানে
নয়নের পথে পথে ভাসিয়া বেড়ায়,
সায়াহ্ন পবনে ওই নদী নীলিমায়!

৬

ওই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
ফিরে না নয়ন দুটী, কেগো ঐ নায়?
দেখিব বলিয়া যারে
চাহিতেছি বারে বারে,
এখন তাহারে আর দেখা নাহি যায়,
নয়ন তরণী মাঝে গ্রাম অন্তরায়!
দেখিয়াছি শেষবার,
লও প্রিয়ে উপহার
শেষ অশ্রুবিন্দু এই,—কি দিব তোমায়?
সকলি দিয়াছি আগে,—বিদায় বিদায়,—
যাই তবে প্রিয়তমে
ভাবি নাই এ জনমে,—
সকলি দিয়াছি আগে—দিব যে তোমায়
এত দিনে শেষ অশ্রু—অন্তিম বিদায়!

৭

ওই ক্ষুদ্র তরীখানি ধীরে ধীরে যায়,
পুণ্যময় সেই দেশ লাগিবে যথায়!
ত্রিদিব সৌন্দর্য্য রাশি
যাইতেছে ভাসি ভাসি
সায়াহ্ন সমীরে ওই নদী নীলিমায়,
পুণ্যময় সেই দেশ লাগিবে যথায়!
পুড়ে হলো ভস্ম ছাই—
হৃদয়ের কিছু নাই,
নয়নের শেষ অশ্রু—অন্তিম বিদায়!
এ জনমে দেখা নাহি হবে পুনরায়!!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বাসবদত্তাকার সুবন্ধু।

সংস্কৃত সাহিত্যে যে তিন খানি সুপ্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য আছে, বাসবদত্তা তাহাদের অন্যতম। ইহার রচয়িতা সুবন্ধু। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি যে ত্রয়োদশটী শ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্রয়োদশতম শ্লোকে নিজের নাম ও বর্ণনীয় গ্রন্থের স্বরূপ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ
প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রবন্ধ বিন্যাসবৈদগ্ধনিধি
নিবন্ধম্॥

বাসবদত্তার আখ্যায়িকা অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন স্বকীয় ভুবন বিখ্যাত বার্ত্তিকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (পাণিনি ২য় আহ্নিক, ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় পাদ)। বৌদ্ধদিগের লিখিত পুস্তকাবলীতেও এই নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি স্বপ্রণীত মালতী মাধব নাটকে উক্ত বাসবদত্তা আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষরাজ প্রণীত রত্নাবলী নাটকে এবং সোমদেব ভট্ট কৃত কথা-

সরিৎসাগর নামক সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। রত্নাবলী ও কথা সরিৎসাগরের আখ্যায়িকার সহিত সুবন্ধুর আখ্যায়িকার সবিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। রত্নাবলীর বাসবদত্তা মগধরাজ প্রদ্যোতের দুহিতা। কথা সরিৎসাগরের বাসবদত্তা উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেনের তনয়া ও বৎসরাজের পত্নী।

সুবন্ধু কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নিশ্চয়রূপে তাহা বলা সুকঠিন। বাসবদত্তার জনৈক টীকাকার নরসিংহ বৈদ্য কবিবরের নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্টে বলিয়াছেন যে, সুবন্ধু সংবৎ-প্রবর্ত্তয়িতা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের জনৈক সভাসদ ছিলেন। তদীয় মৃত্যুর অনতিবিলম্বে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

সা রসবত্তা বিহতা, নবকা বিলসন্তি;
চরতি নো কং কঃ?
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি, ভুবি,
বিক্রমাদিত্যে ॥ ১০ ॥

বল্লালমিশ্র স্বরচিত ভোজপ্রবন্ধে সুবন্ধুকে ধারাধিপতি ভোজের সভাসদ বলিয়াছেন। ভোজরাজের সভার যে পঞ্চশত পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে বররুচি, বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট, সুবন্ধু ও কবিরাজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভোজপ্রবন্ধ আখ্যায়িকাগ্রন্থ মাত্র। অতএব ঐতিহাসিক প্রমাণ স্থলে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

জনশ্রুতি বলে যে, বররুচি সুবন্ধুর মাতুল ছিলেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে এই জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়া সুবন্ধুকে বররুচির ভাগিনেয় ও সংবৎকার বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরী-রচয়িতা বাণভট্ট স্বকৃত হর্ষচরিতের প্রারম্ভে বাসবদত্তার উল্লেখ ও সুবন্ধুর কবিত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্ ॥

'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক সুপ্রসিদ্ধ দ্ব্যর্থকাব্যপ্রণেতা কবিরাজ নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারায় সুবন্ধুর,বাণভট্টেরও স্বকীয় দ্ব্যর্থকাব্যরচনে অদ্বিতীয় ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সুবন্ধু বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতিত্রয়
বক্রোক্তিমার্গনিপুণা—শ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা ॥
৪১ শ্লোক, ১ম সর্গ।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা নামক নাটিকাকার রাজশেখর স্বীয় গ্রন্থে অন্যান্য কবির সহিত সুবন্ধুরও নাম করিয়াছেন।

ভাসো রামিলসৌমিলৌবররুচিঃ শ্রীসাহসাঙ্কঃ কবি
র্মেণ্ঠো ভারবিকালিদাসতরলাঃ স্কন্ধ সুবন্ধুশ্চ যঃ।
দণ্ডীবাণদিবাকরৌগণপতিঃ কান্তশ্চ রত্নাকরঃ
সিদ্ধা যস্য সরস্বতী ভগবতী কে তস্য সর্ব্বেঽপিতে ॥
অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গ-দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরয়োঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত কবিবৃন্দ রাজশেখরের পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে তিনি তাঁহাদিগকে কখনই স্বকৃত গ্রন্থে উল্লেখ করিতেন না।

শারঙ্গধর কর্ত্তৃক ১৩২০ সংবতে শারঙ্গধরপদ্ধতি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়। তৎকৃত পদ্ধতিতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকানেক কবিদিগের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। সুবন্ধুর বাসবদত্তা হইতেও তাহাতে অনেক শ্লোক

উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক বেবার বলেন যে, ইহাতে ২৬৪ জন বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রায় ছয় হাজার শ্লোক আছে।

এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সুবন্ধু শারঙ্গধর, কবিরাজ, রাজশেখর ও বাণভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী। শারঙ্গধর খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। 'রাঘবপাণ্ডবীয়' রচয়িতা কবিরাজকে অধ্যাপক বেবার দশম শতাব্দীর কবি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যের মতে রাজশেখর শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক কবি। সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মলবারে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপরান্ত পর্য্যন্ত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। বাণভট্ট কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ ছিলেন। এই হর্ষবর্দ্ধন খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ৬২৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কবি বাণভট্ট স্বীয় প্রভু কান্যকুব্জপতির জীবনী 'হর্ষচরিত' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। বাণভট্ট আবার স্বীয় হর্ষচরিতের প্রারম্ভে বাসবদত্তা-প্রণেতা সুবন্ধুর সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা, হস্ত লিখিত পুস্তকেরই সবিশেষ প্রচলন ছিল। হস্ত লিখিত পুস্তক প্রচলিত হইতে অন্যূন শতবর্ষের অতীত হওয়া অসম্ভব নহে। এই সমস্ত কারণে আমরা সুবন্ধুকে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভের বা পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলিয়া অনুমান করি। সুবন্ধু কোন্ দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

বাসবদত্তা আদ্যন্ত শ্লেষোক্তি পরিপূর্ণ। কবি ইহাতে রচনার পরিপাট্য সবিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল নহে। কোন কোন স্থলের অর্থ-গ্রহ বহু আয়াসেও হয় না। যদি শিবরাম ত্রিপাঠীকৃত 'কাঞ্চন দর্পণ' নামক টীকা না থাকিত, তবে ইহা পণ্ডিত সমাজেও পঠিত হইত কি না সন্দেহ। বোধহয় দুর্ব্বোধ বলিয়াই বাসবদত্তার তত প্রচলন নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তর হল্ সাহেব কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত টীকার সহিত ইহা মুদ্রিত করেন। ইহার অবতরণিকা ভাগে তিনি স্বকীয় পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (৮ম)

(জন্মোৎসব ও বাল্য জীবন।)

চৌদ্দশত ছয়শকের মাঘ মাসের শেষে জগন্নাথ পত্নী শচী দেবীর গর্ভ সঞ্চার হইল। কথিত আছে যে, গর্ভাবস্থায় শচী জগন্নাথ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন জগন্নাথ স্বপ্ন দেখিলেন যেন কোন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি
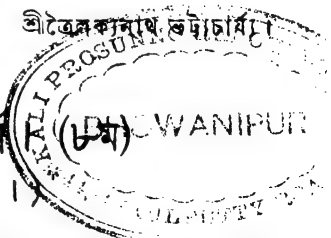
তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার সহধর্ম্মিনীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। শচী দেবীও দেখিতেন যেন আকাশমণ্ডলে দিব্য মূর্ত্তি লোক সকল তাহার বন্দনা করিতেছেন! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া উভয়ে অনুমান করিতেন যে, এবারে বুঝি কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্তে এরূপ অলৌলিক ঘটনাপুঞ্জ ভূরি ভূরি বিবৃত হইয়াছে। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সমুদায় মহাপুরুষের সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত ঘটনাবলী দেখা যায়। এই সকল ঘটনার মূলে কতটুকু সত্য আছে, মীংমাসা করা বড় কঠিন। তবে ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মহাপুরুষগণের পর জীবনের অলোকসামান্য ঘটনার আলোকে বসিয়া তাঁহাদের জীবনেতিহাস লেখকগণ এই সব যে নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্রমে ক্রমে শচীর গর্ভ ত্রয়োদশ মাসে পরিণত হইল, তথাচ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। তদ্দর্শনে পিতা মাতার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে অধিককাল আর সন্দিগ্ধাবস্থায় থাকিতে হইল না। ফাল্গুন মাসের পৌর্ণমাসীর সান্ধ্য রজনীতে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। দৈব যোগে সেই দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, পুরবাসীগণ চারিদিকে হরিধ্বনি করিতেছিল, এবং আনন্দ কোলাহলে চারিদিক আন্দোলিত হইতেছিল। এই শুভক্ষণে জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে,ভাবী জীবনে চৈতন্য প্রভু হরিনাম প্রচার করিবেন বলিয়া, হরিনামের কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আবির্ভূত হইলেন এবং নিষ্কলঙ্ক গৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক জগতের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট হইবে, সকলঙ্ক চন্দ্রের আর প্রয়োজন নাই ভাবিয়া রাহু যেন আকাশের চন্দ্রকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাহার লগ্ন গণিয়া সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গে মহাপুরুষের বত্রিশটী চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন যে, এই বালক হইতে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলেরই উদ্ধার সাধন হইবে।

বালকের জন্মগ্রহণের পর জগন্নাথ গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হইল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলে নানা উপহার লইয়া বালকটিকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। নর্ত্তক, বাদক, ভাটে আঙ্গিনা পরিপূর্ণ হইয়া গেল, এবং চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল হইতে লাগিল। মিশ্র পুরন্দরও যথাসাধ্য দান ধ্যান করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্নের পত্নী, শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবী এবং অন্যান্য প্রবীণা পুরনারীগণে পরিবৃতা হইয়া ধান্য দূর্ব্বা গোরচন দিয়া বালকের রক্ষা বন্ধন করিলেন ; নবীনারা হাস্য পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, এবং অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবী নানা প্রকার বহুমূল্যে দ্রব্য সম্ভার লইয়া দোলারোহণে বালককে দেখিতে আসিলেন। তৎকালে সকলেরই ভূত প্রেত ডাকিনীতে বিশ্বাস ছিল, তাহাদিগের উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরন্ধ্রীগণ পরামর্শ করত শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। 'নিমাই' নামের সহিত ভূত প্রেতে কি সম্বন্ধ, তাহার

কোনি ব্যাখ্যা মহিলাগণ আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ নামে ভূতের ভয় থাকিবে না। যাহা হউক, পুরন্ধ্রীগণ কয়েক দিন পর্য্যন্ত শচী গৃহে অবস্থিতি করিয়া, পুত্র-মাতা মঙ্গল জলে স্নান করিলে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, চৈতন্যের পর-জীবনের ভক্তগণ এই সময়েই মনোবলে তাঁহার অবতার ভাবের কথা জানিতে পারিয়া স্ব স্ব রুচি অনুসারে নানা রূপ মহোৎসব করিয়াছিলেন। না পারিবেনই বা কেন? কারণ, তাঁহারা সকলেই স্বর্গের দেবতা, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কলিযুগের যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও চৈতন্য চন্দ্রের লীলার সাহায্য করিবার জন্য মানব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' এইরূপে অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলেই গ্রহণের উপলক্ষ করিয়া নানা দান ধ্যান ও নাম কীর্ত্তন করিয়া গৌরচন্দ্রের জন্ম-মহোৎসব করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিশেষ লিপিচাতুর্য্য দেখা যায়। কারণ দেশের প্রথানুসারে সকলেই গ্রহণের সময় যথাসাধ্য দানাদি ও হরি সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চৈতন্য-ভক্তগণ এই ঘটনাকে চৈতন্যের অবতারত্ব স্থাপন জন্য অনুকূল ব্যাপার করিয়া বিলক্ষণ ভাবুকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নচেৎ ইহার মূলে যে কোন সত্য আছে, তাহা অনুমান করা যায় না। কারণ, যদি অদ্বৈতাদি ভাবী ভক্তগণ এই সময় হইতেই অবতারের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে গয়া গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা নিমাই পণ্ডিতকে কেন সেরূপ চক্ষে দেখিতে পান নাই, তাহা বুঝা যায় না।

জনক জননীর হৃদয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শুক্ল পক্ষের ন্যায় বালকচন্দ্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অঙ্গকান্তির গৌরত্ব নিবন্ধন স্ত্রীগণ শিশুটীকে গৌরাঙ্গ ও কখন 'গৌরচন্দ্র' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; আর তাঁহারা হাতে তালি দিয়া হরি ধ্বনি করিলে বালক হাসিত এবং ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, 'হরি নাম শুনিতে পাইলে শিশুর ক্রন্দন থামিত,' এজন্য মহিলাগণ গৌর হরি নামেও অভিহিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এক দিন জনক জননী গৃহ মধ্যে লঘুপদ চিহ্ন সকল অঙ্কিত রহিয়াছে এবং তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র ও মীন চিহ্ন শোভা পাইতেছে দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মিশ্র একজন বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন, তিনি অনুমান করিলেন যে, ঘরে বাল গোপাল দেববিগ্রহ রহিয়াছেন, বোধ হয় তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে ঐরূপ পদ চিহ্ন ফেলিয়া থাকিবেন। এই সময়ে শচী দেবী পুত্রকে স্তন পান করাইতেছিলেন। তিনি পুত্রের পদতলে হটাৎ ঐ সকল চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং জগন্নাথকে তাহা দেখাইলে তিনি নীলাম্বরকে ডাকিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্যায় বড় পারদর্শী ছিলেন, তিনি গণিয়া বলিলেন যে, 'নারায়ণের পদচিহ্নে চিহ্নিত এই পুত্র হইতে জগৎ উদ্ধার হইবে'। এই বলিয়া শুভদিন দেখিয়া যথা বিধি বালকের নাম করণ করিলেন, এবং বিশ্বম্ভর এই নাম রাখিলেন।

ক্রমে ক্রমে শচীনন্দন জানু চক্রমণ ও পদচক্রমণ করিতে শিখিলেন। এই সময়ে

একদিন শচীদেবী খই ও সন্দেশে বাটী পূর্ণ করিয়া বালককে আহার করিতে দিয়া আপনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; কিন্তু বালক খাদ্যদ্রব্য ফেলাইয়া দিয়া মৃত্তিকা খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে শচী তাহা দেখিতে পাইয়া বালকের হস্ত হইতে মৃত্তিকা কাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৎস মাটী খাইতেছ কেন? বালক যাহা উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া শচী অবাক্ হইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন—'মা', বিবেচনা করিয়া দেখ সকলই মাটীর বিকার মাত্র; খই, সন্দেশ, অন্নাদি যত কিছু আহারীয় দ্রব্য সকলই মৃত্তিকার অবয়বান্তর। তবে মাটী খাইতেছি বলিয়া কেন ক্ষুণ্ন হইতেছ?' শচী আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে 'এ জ্ঞান যোগ তোরে কে শিখাইল? মাটীর বিকার অন্নাদি খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, কিন্তু মাটী খাইলে রোগ জন্মে, শেষে শরীর নষ্ট হয়; আবার দেখ মৃত্তিকা বিকৃত হইলে যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাতে কত জল রাখা যায়, কিন্তু শুধু মৃত্তিকায় জল দিলে কর্দ্দম উৎপন্ন হয়।' তখন শচী-কুমার বলিলেন যে, 'মা! আগে কেন একথা আমাকে শিখাইয়া দাও নাই; তাহা হইলে তো আর মাটী খাইতাম না।'

একদিন একাতৈথিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বাল গোপাল মন্ত্রে নাকি দীক্ষিত ছিলেন; পাক সমাপ্ত করিয়া যাই স্বাভীষ্ট দেবে নিবেদন করিলেন, অমনি দুর্দ্দান্ত নিমাই কোথা হইতে আসিয়া স্তূপীকৃত অন্নের এক গ্রাস খাইয়া ফেলিল। জগন্নাথ ও শচী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হায় হায় করত দৌড়িয়া যাইয়া বালককে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয় বার পাক করিতে সম্মত করিলেন। এদিকে বালককে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। সেবারেও অন্ন প্রস্তুত হইলে ঠিক সেইরূপ হইল; কোন প্রকারে কেহ বালককে নিবারণ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে, তৃতীয় বার পাক সমাপ্ত হইলে গৌরাঙ্গ প্রভু যোগ নিদ্রায় পিতা মাতা প্রভৃতি সকলকে মুগ্ধ করিয়া গোপাল বেশে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া উদ্ধার করিয়া ছিলেন।

কোন সময়ে নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বালক বিশ্বম্ভর একাকী গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দুইজন চোর বালকের গাত্রালঙ্কার অপহরণের বাসনায় তাঁহাকে মিঠাই সন্দেশ দিবার ও স্বীয় বাটীতে পৌছাইয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এখানে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, লোক দুইজন বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাদের গন্তব্য স্থানের পথ হারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতেই আসিয়া উপনীত হইয়াছিল এবং বহির্বাটীতে বালককে নামাইয়া দিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছিল।

জগদীশ ভাগবত ও হিরণ্য পণ্ডিত নামে জগন্নাথের দুইজন আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন। একাদশী দিনে তাঁহারা নানা প্রকার দ্রব্য সম্ভার আনয়ন করত কৃষ্ণ পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া আসিয়া নিমাই ব্যাধি ছলনা করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন যে, পূজার

অগ্রে ঐ সব নৈবিদ্য তাঁহাকে খাইতে না দিলে তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য হইবে না। বালকের রোদনে বাটীর সকলে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে, ঐ কথা প্রতিবেশী-দ্বয়কে জানাইতে বাধ্য হইলেন। সরলমতি প্রতিবেশী দুইজন অগত্যা দেবতার অগ্রেই বালককে নৈবিদ্য দিয়া শান্ত করিতে ত্রুটি করিলেন না।

কথিত আছে যে, এই সময়ে বালক নিমাই অতিশয় দুষ্ট স্বভাব ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাড়ার বালকগণের অগ্রণী হইয়া, দলবদ্ধ হইয়া, নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতেন; কখন পাড়াপড়সীর ঘরের দ্রব্য চুরি করিয়া লইতেন, কখন দলের মধ্যে অবাধ্য বালককে প্রহার করিতেন, কখন ভাগীরথী তীরস্থ সৈকত ভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে এক পদে দাঁড়াইয়া মার্কণ্ড খেলা খেলিতেন, কখন দলে দলে জল মধ্যে পড়িয়া সন্তরণ দিতেন ও অপর লোকের স্নানাহ্নিকে অশেষ প্রকারে বাধা দিতেন। শচী জগন্নাথ সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনিতে পাইতেন। একদিন শচীমাতা পুত্রকে ডাকিয়া নানারূপ তাড়না ও তিরস্কার করিলেন। ইহাতে শচীদুলাল ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত ক্রোধ ভরে গৃহস্থিত হাঁড়ি ভাড় যাহা কিছু পাইলেন, সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; কিন্তু ক্রোধ প্রশমিত হইলে স্বীয় দুষ্কার্য্য জন্য লজ্জিত হইলেন। যাঁহারা চৈতন্য-চরিত্রের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, অন্যান্য অসামান্য ও দৈবগুণাবলীর মধ্যে ক্রোধ তাহার জীবনের একটী কলঙ্ক চিহ্ন স্বরূপ ছিল; কোন প্রকারেই তিনি এই দুর্জ্জয় ও নিষ্ঠুর রিপুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লোভে সমর্থ হন নাই। বাল্যকালে মাতার ও গৃহ সামগ্রীর উপর তাঁহার ক্রোধের সুতীক্ষ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত, যৌবন সময়ে ইহারই বশে গুরু লঘু জ্ঞান ও পাত্রাপাত্র ভুলিয়া গিয়া বৃদ্ধ অদ্বৈতের মুখে জ্ঞান পক্ষে বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান শুনিয়া ভয়ানক প্রহার করিয়াছিলেন এবং সময়ান্তরে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়া যাইতেছিলেন এবং শেষ বয়সে যখন ভগবৎ প্রেমে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন, তখনও লঘুপাপে ছোট হরিদাসের প্রতি এমন কঠিন ও গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে, বেচারা সেই মনোদুঃখে প্রয়াগের ঘাটে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বম্ভর পাড়ার বালকের দলপতি হইয়া গঙ্গার ঘাটে স্নানোপলক্ষে যাইয়া অশেষবিধ দৌরাত্ম্য করিতেন। এই সময়ে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ফুলের সাজী হাতে লইয়া ও নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভাগীরথি জলে শিব পূজা ও ব্রতার্চ্চনা জন্য গমন করিত। কন্যাগণ ঘাটের ধারে সারি সারি বসিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত মহাদেব নির্ম্মাণ করত পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিবেন, কোথা হইতে দুরন্ত নিমাই আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসিতেন, ও বলিতেন যে 'আমার পূজা কর, আমি তোমাদের উত্তম উত্তম বর দিব; তোমরা জান না যে গঙ্গা, দুর্গা ও মহাদেব সকলেই আমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য।' এই বলিয়া চন্দনের বাটী হইতে চন্দন লইয়া আপন কপালে দিতেন, ফুলের মালা লইয়া

গলায় পরিতেন, এবং আল চাল, কলা, সন্দেশ ও উপকরণাদি লইয়া ভোজন করিতেন। যদি কন্যাগণ বলিত যে, 'ছি' নিমাই! তুমি আমাদের গ্রাম সম্পর্কে ভাই হও, আমাদের সহিত এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিও না।' তাহাতে বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিতেন যে, 'আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের এই বর দিতেছি যে, তোমাদের পরমসুন্দর, যুবা, রসিক ও ধনবান্ স্বামী হইবে এবং এক একজন সাত সাতটী পুত্র সন্তান প্রসব করিবে।' যদি কোন কন্যা তাঁহার অন্যায় লুণ্ঠন হইতে আপন নৈবেদ্য রক্ষা করিয়া পলায়ন করিত, তবে তাহার উপর বিশ্বম্ভরের ক্রোধের সীমা থাকিত না; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অভিসম্পাত করিতেন যে "তাহার বুড়া ভর্ত্তার সহিত বিবাহ হইবে, ও অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয়ই যে সাতটী সপত্নীর উপর পড়িবে।" অতিবাচাল্যতা সংকাকে এই সকল উক্তি করাতে কন্যাগণ মনে করিত, 'বুঝিবা ইহার কথা সত্য হইবে; হয় তো এ ছোড়া কি দৈব বল পাইয়াছে, নতুবা এমন কথা কেন বলিবে।' এই বিবেচনায় কন্যাগণ বিশ্বম্ভরকে সন্তুষ্ট না করিয়া কোন ব্রতানুষ্ঠান করিত না। এই সময়ে এক দিন নবদ্বীপে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম্নী এক কন্যা দেবতা পূজার জন্য গঙ্গা স্নানে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ইনি বাস্তবিক বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, লীলার সাহায্য জন্য মানবী রূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, লক্ষ্মীকে দেখিয়া জগন্নাথতনয় সাভিলাষ মনে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া কহিলেন যে "আমাকে পূজা কর, আমি তোমাকে ঈপ্সিত বর দিব।' কথিত আছে যে, এই সময়ে উভয়ের মনের সাহজিক প্রীতি উদিত হইয়াছিল। লক্ষ্মী দেবী পূজার ছলে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তিনি আস্তে আস্তে চন্দন টুকু গৌরের অঙ্গে মাখিয়া দিলেন, ফুলের মালা গাছটী গলায় দিয়া দিলেন এবং হাতে সন্দেশাদি উপকরণ খাইতে দিয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। এই প্রস্তাবের মূলে কত টুকু সত্য আছে, জানি না, কিন্তু ইহাতে যে সরল ও অকৃত্রিম বাল্য প্রেমের একটী সুন্দর ছবি প্রকাশ হইয়াছে, যাহার মধুরতা আস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রকারান্তরে বৈষ্ণব-কবিগণ এই প্রস্তাবে গৌরচন্দ্রের ভাবী পরিণয়ের একটু অলৌকিকত্ব ও চমৎকারিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তখন দেশ মধ্যে Courtship কাহাকে বলে, জানা ছিল না; সচরাচর পিতা মাতা বর কন্যা মনোনীত করিয়াই বিবাহ দিতেন, কিন্তু মহাপুরুষ বিশ্বম্ভরের বিবাহ সেরূপে হইতে পারে না, তাই এই অলৌকিক ও চমৎকারিত্বের অবতারণ।

বিশ্বম্ভরের অশেষ দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে শুনিতে পিতা মাতা তিতবিরক্ত হইয়া উঠিলেন। একদিন শচী মাতা বালককে ধরিয়া প্রহার করিবার মানসে ধরিতে গেলেন। বালক লাফাইয়া নিকটস্থ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে পরি-ত্যক্ত হাঁড়ির উপরে যাইয়া বসিয়া থাকিলেন। শচী বলিলেন যে, অশুচি স্পর্শে তুমি অশুচি হইয়াছ; গঙ্গা স্নান না করিয়া আসিলে গৃহে প্রবেশ করিতে পাইবে না, তচ্ছ্রবণে বালক উত্তর করিল যে, "ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোন স্থানই অস্পৃশ্য হইতে পারে না; ব্রহ্মের বর্ত্তমানতায়

সকল স্থানই মহাতীর্থময়!" পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে এই তত্ত্ব-জ্ঞান পূর্ণ উপদেশ শুনিয়া পিতা মাতা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বহু যত্নে শিশুকে শান্ত করিয়া গৃহে লইলেন।

এই সময়ে শুভদিন দেখিয়া জগন্নাথ বিশ্বম্ভরের বিদ্যারম্ভ করিয়া দিলেন। অতি অল্প দিনেই বালক বর্ণ পরিচয় কলা বানান শিক্ষা করিয়া দিন দিন জ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ব্রজাঙ্গনা।

(খাম্বাজ, একতালা।)

১

উছলি পড়িছে, সারা দিন রাত,
ঝর ঝর ঝর চোখের জল।
আপনার প্রাণ নহে আপনার,
সজনি, কারে কি বুঝাস্ বল?

২

প্রেমের বাঁধুনী ফেলিব খুলিয়া,
বুকেতে আবার বাঁধিব বল?
মেঘের পানেতে চাহিয়া যখন
রাখিতে পারি না চোখের জল!

৩

ফুটিলে কুসুম, ছুটিলে সমীর,
উছলিলে, সখি, যমুনা-জল,
কি যেন স্বপনে হারাই আপনে,
মনেতে থাকে না এ যে ধরাতল!

৪

উঠিলে চাঁদিমা, কাঁপিলে জোছনা,
কোথায় ডুবিয়া ভাসিয়া যাই!
আমার—আমার, কে আছে আমার,
কোথাও কাহারে খুঁজে না পাই!

৫

—নীরব নিশুতি, ফুটিছে তারকা,
বাজে দূরে বাঁশী, চলরে—চল!
রমণী হইয়া, প্রেমে না মরিয়া,
রমণী-জনমে কি আছে ফল?

৬

ভাবিয়া আকুল, কাঁদিয়া ব্যাকুল,
অথচ জানিনা কিসের ফল!
ছাড়াতে পারিনা, ছাড়িতে চাহিনা,
এমন সুখের দুখ কোথা বল?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

শাক্যসিংহের প্রতি সঙ্খোদনা ও শুদ্ধোদনের স্বপ্নদর্শন।

মহাত্মা শাক্য সিংহ দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল সুখে অন্তঃপুর বাস করিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্য-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আসিতেছিল, ক্রমে তাহা পরিপুষ্ট হইল। বৌদ্ধ যতিগণ বলিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থেও লিখিত আছে, দেবগণ বোধিসত্ত্বের দীর্ঘকাল অন্তঃপুর-বাস সন্দর্শন করিয়া ভীত, ত্রস্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এইরূপ পরস্পর পরামর্শ স্থির করিলেন যে, "সঙ্গীত তূর্য্যনিনাদিতে [illegible] রূপৈ-ধর্ম্মমুচ্চৈঃ সঙ্খোদিত ব্যাঃ।" অর্থাৎ অন্তঃপুর মধ্যগত ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে তূর্য্য নিনাদ দ্বারা সঙ্খোদিত করা আবশ্যক হইতেছে।

একদা তিনি অন্তঃপুর মধ্যে রমণী-

জনের বেণু বীণাধ্বনি সমন্বিত সংগীত শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক মহদাশ্চর্য্য ঘটনা হইল। জনৈক সুন্দরী বেণু নিনাদ করিতেছিলেন, তাঁহার বেণু নিনাদ হইতে সেই বৈরাগ্যোদ্দীপক গাথা নির্গত হইল। রমনী তাহা জানিলেন না, কেবল রাজপুত্র তাহা শুনিলেন। রমণী আপন মনে বংশী নিস্বনে গান করিতেছেন, কিন্তু শাক্য সিংহ তাহার অন্যথা শুনিতেছেন। তিনি শুনিতেছেন, বাঁশী তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিতেছে—

"পূর্ব্বস্তে অয়ু কৃতু প্রণিধী অভূষি বীরা
দৃষ্টেম্মাং জনত সদা অনাথ ভূতাং।
শোবিষ্যজর মরণং তথান্য দুঃখান্
বদ্ধিত্বা পদ মজরং পরম শোকম্॥"
"তৎসাধো পুরবরত ইতঃ শীঘ্রং
নিক্রম্যা পরম ঋষিভিস্ব চীর্ণং।
আক্রম্য ধরণিতল প্রদেশং
সম্বুদ্ধ্যা অসদৃশ জিনজ্ঞানম্॥"
"পূর্ব্বে তে ধন রতন বিচিত্রা
ত্যক্তা ভূৎ কর চরণ প্রিয়াতনা।
এষোহয়ং তব সময়ো মহর্ষে।
ধর্ম্মোঘং জসি বিভক্ত অনন্তম্॥"
"শীলংতে শুভ বিমল মখণ্ডং
পূর্ব্বস্তে বরগত তম ভাষী।
শীলে না নতি সদৃশু মহর্ষে!
মোচেহি জন্ত বিবিধ কিনেশৈঃ॥"

* * *

"তাং পূর্ব্বাং গিরবরমনুচিন্ত্যা
নিক্রম্যা পুরবরত ইতঃ শীঘ্রং।
বুদ্ধিত্বা পদম মৃত মশোকং
তর্পিবো অমৃত রসেনতৃষার্ত্তান্॥"

"তথ প্রণিধী পূবীমে বহুকল্পাং লোকে প্রদীপা জর মরণ গ্রসিতে অহু লোকে ত্রাম্ভু ভবিষ্যে। স্মর পুরিস প্রণিধী নরসিংহ পতে! অভ্যুদয়ু সময়ো তমিহা দ্বিপদেন্দ্রা নিক্রমায়॥" *

* * *

"ইয়মীদৃশ গাথ নিশ্চরী তূর্য্য সঙ্গীতিরন্তাত্ত নারীনাম্।
যং শ্রুত্ব মিদং বিচর্জিয়া চিত্ত প্রেমিতি বরাগ্য বোধয়েতি॥"

অর্থাৎ হে বীর! পূর্ব্বে জন সমূহকে অনাথ প্রায় দেখিয়া, তাহাদের জরা মরণ ও অন্যান্য দুঃখ দেখিয়া, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এইরূপ প্রণিধান করিয়াছিলেন যে, আমি ইহাদের নিমিত্ত অজর অমর ও অদুঃখ পদ (প্রকাশ করিব)।

হে সাধো! সেই জন্যই আমরা বলিতেছি, এই পুরশ্রেষ্ঠ হইতে শীঘ্র নিক্রান্ত হও এবং এই পৃথিবীতে পরমর্ষিগণের আবরিত অনুপম বুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ কর।

পূর্ব্বে তুমি বিচিত্র ধনরত্নাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলে। হে মহর্ষে! এই আপনার যোগ্য সময়, এই নিয়ম, এক্ষণে আপনি এই জগতে অনন্ত বা অনশ্বর ধর্ম্ম বিতরণ করুন।

তোমার শীল (চরিত্র) শুভ, মলরহিত ও অখণ্ড। পূর্ব্বে তুমি বরশত বা শত প্রার্থনা প্রদান করিয়াছিলে। হে মহর্ষে!

* ললিতবিস্তর গ্রন্থে এইরূপ অনেক গুলি বৈরাগ্যোদ্দীপক গাথা লিখিত হইয়াছে। প্রস্তাব কর্কশ হইবে বলিয়া সে সকল লিখিত হইল না। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সেই সকল গাথায় বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা, সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা, বৈরাগ্যের শুভকাল নির্ব্বাচনের উপায়, তাহার পূর্ব্ব সাধন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, শাক্যসিংহ সংগীত শ্রবণ প্রসঙ্গে ঐ সকল দেবগাথা শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই ত্যাগ ধর্ম্ম গ্রহণের সংকল্প ধারণ করিয়াছিলেন।

তোমার সদৃশ শীলবান অন্য কেহ নাই। এক্ষণে তুমি জগৎকে বিবিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত কর।

পূর্ব্বের সেই বর—সেই কথা—স্মরণ করুন। এই পুরবর হইতে শীঘ্র নির্গত হউন। অক্ষয়, অব্যয় ও অশোক অমৃত (মোক্ষ) পদ বুদ্ধিগম্য করিয়া তৃষ্ণার্ত্তদিগকে অমৃত রসে তৃপ্ত করুন।

পূর্ব্বে তোমার বহু কল্পব্যাপী প্রণিধান (গাঢ় সংকল্প) হইয়াছিল। হে নরসিংহ পতে! জর মরণগ্রস্ত এই লোক আমি অনুভব করিব—বুদ্ধিগম্য করিব। অতএব, হে মনুষ্যেন্দ্র! তোমার নিষ্ক্রমণ সময় এই।

নারীদিগের তূর্য্য নিনাদ হইতে এইরূপ গাথা সকল নির্গত হইল—যে সকল গাথা শুনিয়া ভগবান্ শাক্য-সিংহ এই অনিত্য অধ্রুব জগৎ ত্যাগ করিয়া চিত্তকেশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের জন্য অতিশয় প্রেমযুক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত গাথা রবে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

সেই রাত্রিকালের নিবিড় আনন্দের সময় বুদ্ধদেব তূর্য্য সংগীতির পরিবর্ত্তে গাথা সংগীত শুনিতে পাইলেন। বংশী গাথা গান করিল, বীণাও গাথা গান করিল, মৃদঙ্গও গাথা ধ্বনি ব্যক্ত করিল। শুনিয়া শাক্য-সিংহের মুখবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ক্রমে অন্তঃপুর নিস্তব্ধ হইল। পুরাঙ্গনাগণ নিদ্রিত হইল, বুদ্ধদেব অমনি ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে কর্ত্তব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সেই দিনে সেই রাত্রেই তিনি সংসার ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প ধারণ করিলেন।

ঐ দিন নিশাশেষে রাজা শুদ্ধোদন স্বপ্ন দেখিতেছেনঃ—"অর্দ্ধ রাত্র অতীত, জগৎ নিস্তব্ধ, জীবগণ নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময়ে কুমার সিদ্ধার্থ অঙ্গাভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পরিব্রাজক বেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন। সমস্ত দেবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন।

বহুকাল হইতেই রাজার মনে সন্দেহ সঞ্চিত হইতেছিল, আজ সেই চির সন্দিগ্ধ বিষয় স্বপ্নগোচর হইল। যেমন তিনি দেখিলেন, তাঁহার কুমার রাজাধন স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভয়ভীত হইয়া চকিত দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিলেন। শুষ্ক হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, কষ্টস্বরে কঞ্চুকীকে ডাকিলেন। বলিলেন, কঞ্চুকি, আমায় শীঘ্র বল, কুমার কোথায়, কুমার অন্তঃপুরে আছে কি না, জানিয়া আইস।

কঞ্চুকী বলিল, মহারাজ? কুমার অন্তঃপুরে আছেন, ইহা আমি জ্ঞাত আছি।

রাজা মনে মনে স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুখ যেন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল, হৃদয়ে শোক-শল্য প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার কুমার গৃহে থাকিবে না, রাজা হইবে না, রাজভোগ স্বীকার করিবে না, নিশ্চিত সন্ন্যাসী হইবে। তাই আমি এই সকল পূর্ব্ব নিমিত্ত দেখিতেছি।

অনন্তর তিনি মনে মনে বিচার করিয়া অবশেষে এইরূপ স্থির করিলেন যে, আজ হইতে কুমারকে আর উদ্যান ভূমে অথবা গ্রামান্ত সীমায় যাইতে দেওয়া হইবে না। কুমারকে এই পুরবর মধ্যে ও স্ত্রীগণ মধ্যে

ক্রীড়ারত রাখিতে হইবে, তাহা হইলে আর তাহার নিষ্ক্রম প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইবে না।

পরদিন প্রভাতে রাজা শুদ্ধোদন কর্ম্ম-করদিগকে কুমারের জন্য গ্রৈষ্মিক, বার্ষিক ও হৈমিন্তিক এই ত্রি-ঋতু যোগ্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্ম-করেরা রাজাজ্ঞাক্রমে গ্রীষ্মকালের জন্য সুশীতল গৃহে, বর্ষাকালের জন্য সাধারণ এবং হিমকালের জন্য সুখোষ্য গৃহ প্রস্তুত করিল। পুর প্রবেশের সোপান সকল এরূপ কৌশলে প্রস্তুত করা হইল যে, সোপানে পদক্ষেপ মাত্রেই যেন তাহার শব্দ অর্দ্ধ যোজন পর্য্যন্ত গমন করে এবং সোপা-নারূঢ় পুরুষ যেন উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়। এরূপ সোপান প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কুমার জন সাধারণের অগোচরে পলায়ন করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন যে, কুমার মঙ্গল দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি মঙ্গল দ্বারে মহৎ লৌহ-কবাট সংলগ্ন করাইলেন। এরূপ কবাট প্রস্তুত করান হইল যে, তাহার এক এক কবাট পাঁচ শত বলবান্ পুরুষ ব্যতীত উদ্ঘাটিত ও অবঘাটিত করা যায় না এবং তাহার শব্দ অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কুমার এই দুর্গম্যাপুরে বাস করিতে লাগি-লেন এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য, ও সুন্দরী ললনা সদা সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল।

শ্রীরামদাস সেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

হৃদয়-পাখী।

আবদ্ধ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায়!
কি হেতু, কিসের লাগি,—কিবা বাসনায়?
যতনে তনু-পিঞ্জরে
রাখিয়াছি সমাদরে;
সুমধুর প্রেম-ফল,
সুবাসিত সুখ-জল,
অতি প্রিয় সম্বোধনে দিতেছি তাহায়।
তবু এ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায়!
কি হেতু, কিসের লাগি,—কিবা বাসনায়?

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

গান।

(১)

মাথা খাও, বিনোদিনি, মিছে আর কেঁদো না;
মোর বুকে মুখ রাখি,
পুঁছিয়ে ও চারু আঁখি,
ভুলে যাও প্রিয় সখি পরাণের বেদনা।

(২)

হের ওই নীলাকাশে
নবীন জলদ ভাসে,
হের শ্যাম তীর আঁটা-তটিনী উছলি যায়;
প্রফুল্ল যৌবনে ভরা,
নির্ঝরিণী মনোহরা,
পুরিছে—পোরেনা সুখে গিরি বুকে সদা ধায়।

(৩)

আপনা পাশরি সবে,
ঢালে প্রাণ প্রেমোৎসবে,
সবারি আননে আজি ফুটিয়া উঠিছে হাসি;
তুমি কেন একাকিনী,
লীলাময়ী বিনোদিনি,
তরুণ অধরে রাখ, দারুণ বিষাদরাশি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

নদীর বিমল বুকে ঢলিয়া পড়েছে চাঁদ,
যেন নদী পাতিয়াছে চাঁদ ধরিবার ফাঁদ।
সে আলো হৃদয়ে ধরি ছোট ২ বীচি গুলি,
হাসি হাসি নাচি নাচি গরবে যেতেছে চলি।
হাসিয়া খেলিয়া চাঁদে চুমিয়া চলিয়া যায়,
আবার মাতার বুকে মিশায় আপন কায়।
পুন কত ক্ষুদ্র বীচি নদীর নীলিমা ভাঙ্গি,
ফুলিয়া চলিয়া যায় সাগর সম্ভাষ মাঙ্গি।
হৃদয়ে কতই আশা চিন্তা আসি দেয় দেখা,
হৃদয় কালিমা মাঝে যেনরে চাঁদের লেখা।
একা চিন্তাকুল যুবা জাহ্নবীর তীরে বসি।
চক্‌চকে জ্বলি'ছিল নদীর হৃদয়ে শশী।
আঁধার হৃদয় তার নিরাশার কুয়াসায়,
ভাবী দিন ভাবি মনে দিন দিন ক্ষীণকায়।
দিগন্ত জুড়িয়া ঘোর আঁধার কালিমা ঢাকা,
উজ্জ্বল বয়সে তার নিয়তি মসিতে মাখা।
কতই কাঁদিয়াছিল দুঃখ সাগরেতে ভাসি,
হেনকালে নিরখিল গঙ্গার হৃদয়ে শশী।
সে চাঁদ কোথায় গেছে কোথা সে জাহ্নবী জল,
হৃদয়ের দুঃখোচ্ছাস কোথায় লভেছে স্থল।
কিন্তু আজি নদী জল হৃদয়ে চাঁদেরে ধরি।
সে দিনের সেই স্মৃতি দিয়াছে হৃদয়ে ভরি,
সে দিন গিয়াছে চলি সে দুঃখ গিয়াছি ভুলি,
ফুটেছে জীবন-নদে নব নব বীচি গুলি।
কিন্তু সে দিনের তরে এখনো কাঁদিছে প্রাণ,
দুঃখেতে ভাসিয়া যারে করেছি বিদায় দান।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

ফুলবালার সমাধি

(১)
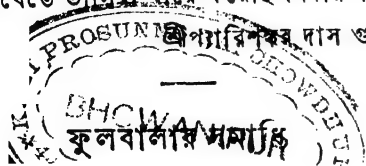
গহন বিজনে নিবিড় কাননে
ফুটেছিল একটী ফুল বন আলো করে,
বিমল শিশির মাখা, নবীন পল্লবে ঢাকা
আবরি রাখিত সদা প্রেম চন্দ্রাননে।
আমিও যে সঙ্গীহারা, হয়েছি পাগল পারা,
প্রাণের লুকান কথা বুঝাই বা কারে,
এক দিঠে চেয়ে আছি সে বন প্রান্তরে।১।

(২)

নিদাঘ সায়াহ্ন ওই গগনের কোলে
রবি যে কেমন হয়ে পড়িতেছে ঢলে।
সকলি বিষাদ মাখা, বিষাদে জগৎ ঢাকা,
ধীরে ধীরে সুধাইতে গেনু তার কাছে,
বল সখি এ বিজনে কেবা তোর আছে?
পাতার আড়াল থেকে, বলিল সে থেকে থেকে
"এ সংসারে কেহ মোর নাই
যে দিকে ফিরিয়া চাই,
কেহ নাই, কেহ নাই,
এ সংসারে কেহ মোর নাই"
শুনিয়া দারুণ কথা, পরাণে বাজিল ব্যথা,
বলিলাম সখি তবে কিসের লাগিয়া,
নিতি নিতি পরিমল দাওগো ঢালিয়া?
এবিজনে কেবা তোর আছে?

(৩)

মর মর মৃদু বাণী আধ ফুট অধরে
কি অমৃত মমচিতে বরষিল চকিতে,—
"ভেবেছিনু মনে মনে, কাটাইব এ বিজনে
একা এ জীবন মম পৃথিবীর কাননে।

(৪)

কখন কেহ বা যদি আসে পথ ভুলিয়া,
খেলিতে খেলিতে মোরে বুকে লয় তুলিয়া;—
হাসিব প্রেমের হাসি
ঢালিব সুরভি রাশি
পূরিব সোহাগে তার জীবনের কাননে
কিন্তু তা হয় গো কোথায়?
পাছে কেহ দলে যায়
প্রাণে এ ভয় সদায়

কুসুম কোমল আমার হৃদয়
রবি করে দহে নিরদয়
রাশি রাশি তীক্ষ্ণ আলোর মাঝারে
পাছে এ হৃদয় টুকু ঝলসিয়া যায়?
কায কি সেথায় মোর?
তাই বনের মাঝারে মনের হরষে
চির দিন আমি নাচিব গাইব,
প্রভাত কিরণে ফুটিয়া উঠিব,
মলয় পবনে পরিমল দিব
ঢালিয়া ঢালিয়া।"

(৫)

কুসুম বালার শুনি প্রাণের বারতা
বলিলাম ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরো দুটী কথা,
ফুল সখি এবিজনে কেবা তোর আছে?
সাঁঝের বেলা একাকিনী পড়িবে যখন ঢলে
মনে কি করিবে কেও ভবে?
শুকাইয়া দলগুলি ঝরিবে যখন
ধূলায় লুটাবে আর বাতাসে উড়াবে,
যতনে কেহ কি তোরে তুলিবে তখন?
--কেহনা—কেহনা—

(৬)

সহসা সে মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি বিদরিয়া
হুহুকরে কেঁপে উঠ্‌লো সে কোমল হিয়া
মরমের স্তরে স্তরে একথা পশিল
ম্রিয়মান ছিন্ন বৃন্ত ঢলিয়া পড়িল,
ফুলবালার খেলা ধূলা অবসান হলো!
ছিন্নবৃন্ত প্রেম ফুল তার
ঢলিয়া পড়িল ছার খার
কেহ তারে তুলে না লইল
ভূমিতলে পড়ে সে রহিল!
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ,
পাখীরা গাহিল গান,
বাতাসে সমাধি হোলো কুসুম বালার
এ সংসারে কেহ নাহি তার। ... কাই।

দুঃখ পরাজয়ের মন্ত্রণা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রকৃত ধর্ম্ম অন্তরে। কিন্তু উহা অনেক সময়ে অন্তরে আধিপত্য করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। যে পরিমাণে উহা বাহির হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তরে আধিপত্য করিতে অধিকার পাইবে, সেই পরিমাণেই মনুষ্য সমাজ নীতিতে উন্নত হইবে। অসাধারণ জ্ঞানী মনুষ্যগণ চিরকালই নির্ম্মলচিত্ত, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য সমাজে অনেক দুর্নীতি দেখা যায়। ধর্ম্ম যে পরিমাণে বাহির হইতে অন্তরে আসিবে, সেই পরিমাণেই উক্ত দুর্নীতি অপসরণের উপায় হইবে। ধর্ম্ম যে আপনার কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় কার্য্য করিতে পারে না, প্রত্যুত উহার বল অনেক সময়ে বাহিরে ব্যয়িত হয়, ইহা উদারণ দ্বারা নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সুনীতি দ্বারাই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা হয়, কিন্তু বৈদিক কালে অনেকাংশে ধর্ম্মের বল বাহিরেই প্রযুক্ত করা হইত। অন্তরে জ্ঞানানলে অজ্ঞানাহুতি রূপ যজ্ঞের পরিবর্ত্তে বাহিরের যজ্ঞ কুণ্ডেই বাহিরের পদার্থ ঘৃতকে আহুতি দেওয়া হইত। এ প্রকার যজ্ঞের উপকারিতাও ছিল বটে, যথা প্রাচীনকালে দুষ্প্রাপ্য অগ্নি রক্ষিত হইত, এবং যজ্ঞজ ধূমদ্বারা মেঘের উৎপত্তি করাইয়া বৃষ্টি দ্বারা শস্যোৎপত্তির সাহায্য

হইত। কিন্তু যে পরিমাণে ধর্ম্মবল বাহিরের যজ্ঞে ব্যয়িত হইত, সেই পরিমাণে মনুষ্যের অন্তঃকরণ তাহার কার্য্য হইতে বঞ্চিত থাকিত, সুতরাং অনেক দুর্নীতিপরায়ণ লোকও অনেক সময়ে যজ্ঞকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকিয়া মনে করিত যে, আমরা ধার্ম্মিকই বটে, কেননা আমরা অনেক সময় ধর্ম্ম কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। পরে ধর্ম্মবল অন্তর রাজ্য হইতে আরও অধিক দূরে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। যজ্ঞোপলক্ষে ধর্ম্মকার্য্য-জ্ঞানে অনেক পশুবধ প্রথা প্রচলিত হওয়ায় কালে পৃথিবী পশুরক্তে প্লাবিত হইল। অবৈধ কাম-ক্রোধাদি-পশু বধের পরিবর্ত্তে বাহিরের পশুদিগকেই বধ করা হইতে লাগিল। ত্রেতাযুগেই এই প্রকারের পশু বধ করার প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। পশুবধের প্রাবল্য সময় মহাপুরুষ বুদ্ধদেব সাধারণ মনুষ্য সমাজকে ইহা দেখাইয়াছিলেন যে, মনুষ্যের অন্তঃকরণ প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্য, সুনীতেই প্রবৃত্ত ধর্ম্ম। দ্বাপর যুগেও অনেক পরিমাণে ধর্ম্মকে বাহিরের বস্তুর সহিতই ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তখন তুলসীচন্দন, তিলক ধারণ, হরিমন্দির মার্জ্জন, উপবাস, আতপান্ন ভক্ষণ, তুলসীর মালা ধারণ, হরিমন্দির প্রদক্ষিণ, বিষ্ণুদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ, কোন শিল্পকার্য্য করার ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ (অন্তরে ভক্তি থাকুক আর না থাকুক, কেবল জিহ্বাসঞ্চালন দ্বারা নামোচ্চারণ) ঐ ভাবে মালা সাহায্যে নামজপ প্রভৃতি করিয়া দুর্নীতি-পরায়ণ লোকেরাও মনে করিত যে, আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম কার্য্য করিতেছি। বর্ত্তমান কালেও ঐ দশা। এখন অনেক সময়েই শুনা যায় যে, অমুক ব্যক্তি হবিষ্যান্ন করেন, আতপ তণ্ডুল ভিন্ন অন্য তণ্ডুল ব্যবহার করেন না, নামাবলী দ্বারা অঙ্গ বেষ্টিত রাখেন, গোপীচন্দন বা অন্য প্রকার বস্তু দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে তিলক ধারণ করেন, সর্ব্বদাই মাল্যধার হস্তে করিয়া হরিনাম জপ করেন, ঠাকুর বাড়ীর অঙ্গনে প্রতি দিনই গড়াগড়ি দেন, প্রতিদিনই তুলসীমূলে জল সেচন করেন এবং উপবাসাদি আরও নানা প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব তিনি সাধু, সুতরাং পূজনীয় ব্যক্তি। কিন্তু তিনি যে পরদারগমন করেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেন, এবং অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া স্বার্থ সাধন করেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই মিথ্যা কথা বলেন, এ সকল কথা ধর্ত্তব্য বলিয়াই গণ্য হয় না। পাঠক মনে করিবেন না যে, আমি সাকারবাদের বা কোন ধর্ম্মমতের নিন্দার জন্যই এই প্রস্তাব লিখিতেছি। হিন্দুশাস্ত্রে বারম্বার কথিত হইয়াছে যে, অন্তরের নির্ম্মলতা সাধনই প্রকৃত ধর্ম্ম এবং চিত্ত সমল থাকিলে কোন কালেই মুক্তি লাভ হইতে পারে না। আর সুনীতি ব্যতীতও যে সকল বাহ্যানুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে, তাহা কেবল অল্পজ্ঞ লোকের উপকারের জন্য। আমি এই মাত্র বলিতে চাহি যে, ধর্ম্মবল সমস্ত অপ্রয়োজনীয় বহির্ব্বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া কেবল যদি মনুষ্যের অন্তঃকরণেই কার্য্য করে, তাহা হইলেই উহা উহার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করে। যদি লোকে বুঝিতে পারে যে, সুনীতিই ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা, তাহা হইলে জগতে এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক সজ্জনের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা জন্মে। জগতে এখন সজ্জনের সংখ্যা

অতি অল্প, কিন্তু ধর্ম্মবল তাহার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অনবরত কার্য্য করিতে থাকিলে সাধুসংখ্যা যে ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ইহা যুক্তি যুক্ত ভাবেই আশা করিতে পারা যায়। অনেক লোকেরই একটা মতভ্রম রহিয়াছে যে, বাহিরের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হয়, এবং ধার্ম্মিক শব্দের বাচ্য হওয়া যায়। অন্তরের ধর্ম্মই যে প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা তাহারা আদৌ ভাল করিয়া বুঝে না। সক্রেটিশ বলিয়াছেন, সুনীতিই দর্শন শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় এবং সুনীতিই ধর্ম্ম। জর্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, সুনীতিই ধর্ম্ম। এই দুই মহাত্মাই অত্যন্ত ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, অতএব ইহাঁদিগের কথা যে অত্যন্ত আদরণীয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি একথা বলি না যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বাহিরের অনুষ্ঠান মাত্রই পরিত্যজ্য। আমি এই মাত্র বলি, যে সকল অনুষ্ঠান নিতান্ত অপরিহার্য্য, কেবল তাহাই মাত্র গ্রহণ করা উচিত।

এখন মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। দুঃখকে পরাজয় করিতে হইলে ধর্ম্মবল অন্তর রাজ্যেই প্রযুক্ত করিতে হইবে। এখন নানাপ্রকার অপ্রয়োজনীয় বাহিরের বিষয়ে উহার বল নানাভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়াতে অন্তর রাজ্যে তাহা অতি দুর্ব্বল ভাবে কার্য্য করিতেছে। তাই জগতে অধার্ম্মিক লোকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে। তাই ধনী লোক, দস্যু ও চোরের উৎপাতে, অসহায়া যুবতী লম্পটের উৎপাতে, অবোধ লোক প্রবঞ্চকের উৎপাতে এবং দরিদ্র ও দুর্ব্বল লোক সবল ও ধনী লোকের অত্যাচারে এত ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। প্রকৃতভাবে লোকের অন্তরে ধর্ম্মজ্ঞান সঞ্চারিত না করিলে তাহাদের বাহিরের কার্য্যও ধর্ম্মানুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অতএব সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা সুনীতিকে সকলের সাধারণ ভূমি জ্ঞান করিয়া তাহাতে সকলই নির্ব্বিবাদে কার্য্য করত জগতের মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন। একটা উপাসনা প্রণালী থাকিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। নরহন্তা দস্যুও ত উপাসনা করিয়া থাকে। সে অগ্রে কালীপূজা করিয়াই তাহার ভয়ানক কার্য্য সাধনোদ্দেশে বহির্গত হয়। জগতের প্রকৃত জ্ঞানীলোক মাত্রই ইহা স্বীকার করিবেন যে, সুনীতিই ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পূজা। অতএব এই পূজা সর্ব্বত্রই প্রচলিত করিতে মনুষ্য মাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত।

দুঃখ পরাজয় করিবার জন্য মানুষ্য চিরকালই চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সকল চেষ্টার মূলেই প্রকৃত ধর্ম্মভাব থাকা আবশ্যক।

শ্রীকিশোরীলাল রায়।
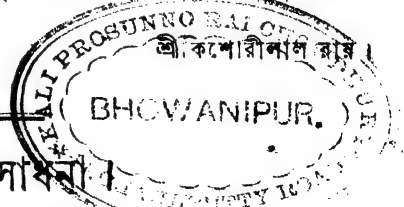
কবি এবং সাধনা।

কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়ার, মিল্টন, হোমর এবং বাল্মিকী কবি কেন? আর তুমি, আমি, রামা দাদা, ভোলাখুড়ই বা কবি না কেন? পৃথিবীর সার্দ্ধ-শতাধিক কোটী সংখ্যক লোকের মধ্যে অঙ্গুলির অগ্রে গণনীয় কএকটী মাত্র লোকই বা "কবি"

এই দেবদুর্ল্লভ স্বর্গীয় নামে ভূষিত হইলেন কেন? আর সমগ্র জন সমাজেরই বা সে অমৃতে বঞ্চিত হইবার কারণ কি? হৃদয় লইয়া যাঁহারা বসতি করেন—কবির একটী চিত্রও যাঁহাদের চক্ষুতে একবার মাত্র প্রতিফলিত হইয়াছে—তাঁহারা এপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে বাধ্য। 'কবি এবং কবিতা' শির্ষক প্রবন্ধে কবিতা কাহাকে বলে? কবি কে? —মোটা মুটি এই কথা বুঝাইতেই চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কবিতা সাধন-সাপেক্ষ কি না, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। সুতরাং কবি কোন্ গুণে "কবি." আর জনসাধারণ, কি জন্য, এই সমুচ্চ আখ্যা পাইতে অনধিকারী, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। স্থূল ভাবে, সেই কথারই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কবিত্ব হৃদয়মাত্রেরই গুণ বিশেষ। যে স্থানে সুনির্ম্মল সরসীর জল, সেখানেই শৈত্য। যেখানে বিকসিত গোলাপস্তবক ঊষার আলোকে, শিশির বিন্দু-শোভিত হইয়া,বায়ুভরে দুলিতেছে, সেখানেই সুরভি, সেখানেই সৌন্দর্য্য। যেখানে হৃদয়-কমল বিকসিত, সেখানেই কবিত্ব-মকরন্দ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। সুতরাং একথায় প্রমাণিত হইতেছে, মানুষ মাত্রই কবি। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, লতা, গুল্ম, তরু রাজির হৃদয় আছে কি না? তাহারাও কবি কি না? একথা আমাদের বিচার্য্যও না, আর বলিতেও পারি না। কেবল বলিতে পারি,—তাহারা কবি না হইলেও, বিশ্বকবির এক ২টী সুন্দর কবিতাছন্দের জীবন লহরী। ঐ ক্ষীরোচ্ছ্বসিত স্বর্গনন্দাকিনীসন্নিভ ছায়াপথাঙ্কিত, মধুর শরৎ-কৃষ্ণা যামিনীর বিশাল প্রসারিত নীল নভোবক্ষে, ঐ যে তারারাজি হাসিতেছে—যাহাদের সংখ্যা অগণ্য—অনন্ত!—ঐ যে বায়ু-তাড়িত মেঘমালা ভাসিতেছে!—ঐ যে নিশীথ অনন্ত নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, তাহারাই নীরব গম্ভীরে ঘোষিতেছে, সুগায়ক কবি তাহাতে আপনার স্বর মিলাইয়া বলিতেছেন—

"জলদ অক্ষর রুচি, তারকা কণক কুচি
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে।"

ঐ উদয়াস্তের নিয়তি বন্ধনে ভ্রাম্যমান, মনোহর ছবি রবি শশী দেখিয়াও উন্মত্ত করিব প্রাণ গাইয়াছে—

"ছন্দে ওঠে রবি শশী, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।

বস্তুত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটী মাত্র কবিতাতরঙ্গ—সেই আদি কবি মহাকবির কবিতা গ্রন্থ। তুমি আমি ও সেই কবিত্বের একটী একটী লহরী। কিন্তু সে কথা এখানে থাক্। বলিতেছিলাম—"মানুষ মাত্রই কবি।" যে সৌন্দর্য্য বোঝে—ঊর্দ্ধস্থিত আকাশের নানাছবি, প্রকৃতির বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া, যাহার চক্ষু স্থির হয়, হৃদয় উদ্বেলিত হয়, প্রাণ চিন্তা-সাগরে ভাসিতে থাকে, সে কবি। মানুষকে যত হীনাবস্থায় কল্পনা করিতে পার কর, দেখিবে, সেখানেও মানুষ এগুণে বঞ্চিত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আ্যাভিরণের গভীর অরণ্যানি হইতে যে ধীবর প্রকৃতির অসভ্য মনুষ্য ধৃত হইয়া, ইয়ুরোপ-গৌরব প্যারিস নগরে আনীত হইয়াছিল, পরীক্ষায় দৃষ্ট হইয়াছে,—উদ্যান বক্ষস্থিত চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত, স্বচ্ছ সরসী বক্ষে অপূর্ব্ব লহরী ভঙ্গি দেখিয়া, তাহারও মুখচ্ছবিতে চিন্তার গম্ভীর ছায়া নিপতিত হইত। বালরবির রক্তিম কিরণজাল, যখন

তুষার-মণ্ডিত পত্রাবলীতে পতিত হইয়া, মুক্তা-শোভিত সুবর্ণ পল্লব শোভা প্রকাশ করিত, আনন্দের স্বর্গীয় জ্যোতি, সেই হতভাগ্য বন্দীর মলিন মুখকে তখনও বিষাদ আঁধারে ডুবাইয়া রাখিত না। জানি না, এ জগতে এমন হতভাগ্য আছে কি না,—যখন গভীর নিশার গাঢ় অন্ধকার মাখা, ভীতি-প্রকটক মহা নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, দূরস্থ বাঁশরীর বেহাগ রাগ, স্বপ্নবৎ, কর্ণে শত সহস্র ধারার সুধা ধারা ঢালিতে থাকে,—যখন সেই সুধার গরল মাখিয়া, চিরজীর্ণ ভগ্ন হৃদয়ের ছিন্ন তার খণ্ড গুলি একটী২ করিয়া জাগাইয়া তোলে,—তখনও যাহার প্রাণ জাগিয়া মৃতবৎ অচেতন। জানি না,—এমন দস্যু আছে কি না,—বহু দিন পরে প্রণয়িনীর পবিত্র জ্যোতি-মাখা মুখ, আত্মজ শিশুর সুকোমল কান্তি, স্মৃতির বক্ষে পদার্পণের পরেও, যাহার পোড়া স্মৃতি আগ্নেয় উত্তাপে গলিত ধাতু প্রপাতের ন্যায় বেগে না যাইয়া থাকিতে পারে। দস্যুবর নেপোলিয়নের কঠিন হৃদয় কিন্তু রমণী প্রেমের নিকট পরাজয় মানিয়াছিল। শিশু ফুল পাইলেই হাত বাড়াইয়া ধরে, প্রদীপ দেখিলেই তাহার দিকে দৌড়াইয়া যায়, এ আকর্ষণ কার? সৌন্দর্য্যের? সৌন্দর্য্য-বোধ ব্যতীত সৌন্দর্য্য মৃত। এ আকর্ষণ সৌন্দর্য্য-বোধ-উদ্বোধিত সৌন্দর্য্যের। অতএব শিশুও কবি। কারণ, শিশুরও সৌন্দর্য্য-বোধ আছে। অতি অসভ্য পুরুষ রমণীও জগতের সৌন্দর্য্যের আদর্শ পত্র পুষ্পের আদর জানে। ভুমিয়-সরলা যখন প্রভাতের কিরণ-তরঙ্গে আপনার অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ফুটন্ত ফুল, নব কিশলয়-জড়িত কলিকা গুচ্ছ, কোমল লতাগ্র ছিঁড়িয়া বন-দেবী সাজে, নিকটস্থ প্রাণপতি যখন সেই অপূর্ব্ব শোভা মাধুরী দেখিয়া, ভাবে গদ গদ হয়, তখনও কি বলিব—এই প্রাকৃতিক দম্পতি সৌন্দর্য্যের ভাবগ্রাহী নয়—এদের হৃদয়ে কবিত্বের উচ্ছ্বাস নাই? অন্ধ সুস্বর শুনিয়া, মূক এবং খঞ্জ সুদৃশ্য দেখিয়া, ভাবে ভোর হয়, একথা কে না জানে? রমণী-হৃদয় মাত্রই কবিত্বের খনি, এসম্বন্ধে অনেক কথা না বলিলেও চলে। তবেই দেখিতেছি, প্রতি মানুষই কিছু কিছু কবি। কিন্তু কিছু কিছু কবি বলিয়াই সম্পূর্ণ কবি নয়। একথা গুলি দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মানুষ মাত্রের অন্তরেই কবিত্বের অঙ্কুর নিহিত আছে এবং কোন না কোন ভাবে তাহা যথা কথঞ্চিৎ উন্মেষও হইয়া থাকে। এই কথঞ্চিৎ উন্মেষ অতি স্বাভাবিক। জগতের ভাষার ইতিহাস, এ বিষয়ের প্রধান সাক্ষ্যদাতা। মানুষের প্রাথমির ভাষা—প্রথম হৃদয়ের ভাষা—গাথাময় এবং অস্ফুট কবিত্বাত্মক। বেদ ও জেন্দাবেস্ত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং লোক-প্রচলিত গাথাদি প্রমাণ স্থানীয় হইয়া, একথা জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছে। অদ্যাপি আমমাংসভোজী নগ্নকায় অসভ্য, প্রেত-পুরুষের উদ্দেশে, যে সকল মন্ত্রাদি পাঠ করে, তৎ সমুদয়ও ঐরূপ। কিন্তু জনসাধারণের কবিত্বের পর্য্যাবসান এই স্থলেই। অথবা গাথা বা বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষের হৃদয়ের ধন। যাহাই হউক, মানুষ মাত্রই যে কিছু কিছু কবি, এ বিষয়ে ভুল নাই। মনুষ্য হৃদয় মাত্রেই কবিত্বের অঙ্কুর নিহিত আছে, এ কথা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক। বৃক্ষ মাত্রেই পুষ্পাঙ্কুর নিহিত আছে। প্রায় সকল গাছেই

কোন না কোনরূপ ফুল ফোটে। তথাপি সকল বৃক্ষই পুষ্প বৃক্ষ বলিয়া উদ্যানে গৃহীত হয় না কেন? সকল গাছের মধ্যে, গোলাপ, যুঁই, বেল, চামেলীর এত আদর কেন? এরাই বা ফুলগাছ নাম পাইল কেন? আর বড় বড় তাল, তমাল, বট, অশ্বথ জঙ্গলে বসিয়া দিবানিশি কাঁদে কেন? বিছুটি, বেত, আলকুশীর তো কথাই নাই। বেল, গোলাপ এইজন্য ফুল গাছ যে, ফুলই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য,—ফুলের পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণ সৌন্দর্য্য সেই খানে। এই বেল, গোলাপ, যুঁই, চামেলী যে জন্য ফুল গাছ বলিয়া পৃথিবীর উদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, জগতের প্রসিদ্ধ কবিগণও, সেই জন্যই কবি বলিয়া জনসমাজে উচ্চ আসন পাইয়াছেন। যাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, প্রধান কার্য্য কবিত্ব,—কোকিল পাপিয়া, ভীমরাজের মত গান গাইয়া জগৎ মাতাইতেই যাঁহাদের আগমন, গাইতে গাইতেই কবি কীটস্‌এর ন্যায় যাঁহাদের অন্তর্দ্ধান, যাঁহাদের হৃদয় কবিত্ব-কুসুমের পূর্ণ সৌন্দর্য্যের রঙ্গ ক্ষেত্র,—তাঁহারাই কেবল 'কবি' এই পূজনীয় নামে এজগতে পূজার যোগ্য। তাই,—কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়ার এবং মিল্টন, বাল্মিকী এবং হোমর কবি, আর তুমি আমি কবি নই।

এ পৃথিবীতে বেল, গোলাপাদি ছাড়াও জবা, টগর, কিংশুকাদির মত অনেক কবি আছেন। তাঁহাদের কথা এখন থাকুক। এখন কেবল একটী কথা বলিবার আছে। প্রতি মানুষের প্রাণে, কবিত্বের যে স্বাভাবিক অঙ্কুরটুকু আছে, কোন উপায়ে শিশির কিরণ বর্ষণ করিয়া তাহা ফুটান যায় কি না? কথাটী কঠিন। অনেক টানা হেচড়া করিলে কিছুটা ফোটে না, এমন নয়। কিন্তু সে পরিশ্রমটা না করাই ভাল। এই টানা হেচড়াতেই কষ্ট-কবির সৃষ্টি, শাব্দিক কবির উৎপত্তি। অনেক মানুষ এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়াই আপনিও মজেন, অপরকেও মজান। বলপূর্ব্বক কবি হইতে গিয়া, আপনার স্বাস্থ্য ও ধনক্ষয় এবং পাঠকের পাঠের রুচি নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহার দৃষ্টান্ত আধুনিক বঙ্গসমাজে ভূরি ভূরি বিদ্যমান। এখন লেখক হইলেই—কবি। দুদশ পংক্তি মিলাইয়া সকলেই কবি-সাজ পরিবার চেষ্টায় আছেন। ইহাদের পরিণাম যে ঘোর আঁধারে ঢাকা, এ কথাও কি আবার বলিতে হইবে? জীবনের লক্ষ্য ঠিক করিয়া, ধীরভাবে সেই পথে চলিলেই সহজে কৃতকার্য্যতা লাভ হয়। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুসারে মানব মাত্রেরই জীবনপ্রবাহ বিভিন্ন পথগামী। এই বিভিন্নতাতেই জনসমাজের অস্তিত্ব ও বৈচিত্র্য রক্ষা পাইতেছে—ক্রমোন্নতির স্রোত প্রবাহমান থাকিতেছে। প্রকৃত সাম্যবাদী এই বৈষম্য রক্ষা করিয়াই শ্লাঘা বোধ করেন এবং প্রকৃত উন্নতিবাদী ইহাকেই উন্নতির সোপান মনে করেন। এজগতে তৃণ এবং গ্রহ নক্ষত্রের প্রয়োজন সমান। যে আপনার প্রকৃত পথে চলে, তাহা দ্বারাই জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয়। জগৎ এবং ঈশ্বরের চক্ষে ফল সমান। এইজন্য যাঁহার প্রাণ কবিতার ভাবে পূর্ণ, তিনি গদ্যে কিম্বা পদ্যে, অর্থাৎ হৃদয়ের উপযোগী ভাষাতে কবিতা লিখুন, বাণিজ্য ব্যবসায়, দর্শন, বিজ্ঞান দূরে ঠেলিয়া ফেলুন। যাহার চক্ষু ঐ ঐন্দ্রজালিক পবিত্র দৃষ্টিশক্তি বিহীন, কবিতা

লেখা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা। কবিত্ব আদবেই সাধন-সাপেক্ষ নয়। তবে যাঁহার হৃদয়ে এই অলৌকিক বিশেষ শক্তি আছে, সাধনে তাঁহার কবিত্ব আরো পরিষ্কৃত, আরো উজ্জ্বল, আরো মধুর হয়। অসাধনে হীনপ্রভ হয়। শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

হতাশ-কাহিনী।

'I affirm with the greatest seriousness that the union of the soul with this terrestrial body is never better than the dissolution or separation of them."—*Plato.*

"Though he slay me, yet will I trust in Him." "Islam means in its way Denial of Self,—Annihilation of Self."—*Carlyle.*

ধূ ধূ করে পথ—সীমা নাই, রেখা নাই, গাছ নাই, পালা নাই—কিছুই নাই;—কেবল অনন্ত,—কেবল আঁধার, কেবল—শূন্য,—কেবল দারুণ নীরবতা। আমি কেমনে জীবন ধারণ করিব—কেমনে একাকী চলিব, তা কিছুই বুঝিতেছি না। একা পথ ধরিয়াছি—ধরিয়াই বিপদে পড়িয়াছি। এপথে আর মনের মানুষ যুটিতেছে না—কেহ সাথী নাই, কেহ অবলম্বন নাই—অকূল পাঁতার,—বিষম পাঁতার। যারা কাছে ছিল, তারা যেন কোন স্বার্থ-আঁধারময় কুজ্ঝটিকায় লুকাইয়াছে! যাহারা আসিতেছিল, তারা পথ ভুলিয়াছে,—কে জানে কোথায়, তাদের হাসিমাখা মুখ লুকাইয়াছে! তারা এ কলঙ্কের মুখ দেখিবে না,—তারা এপথের সাথী হইবে না। ভালবাসা নিবিয়াছে,—আসক্তি ডুবিয়াছে,—খেলার মত্ততা ছুটিয়াছে—এখন অবশ হৃদয় লইয়া অনন্তের তীরে বসিয়া দিবানিশি ভাবিতেছি—কেমনে এই অকূল পাঁতার পার হইব! সম্মুখে যে দুই একটী ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা জ্বলিতেছিল, দেখিতে দেখিতে চোখের নিমেষে হায়, তাহা নিবিয়া গিয়াছে! কোথায় গেল, কোথায় গেল, বলিয়া ক্রমাগত খুঁজিতেছি, কিন্তু কিছুতেই খোঁজ পাইতেছি না। স্বর্গের চাঁদ অস্তমিত হইয়াছে—পুণ্যপ্রভা ডুবিয়াছে। পশ্চাতে কেহ নাই, সম্মুখে কেহ নাই। কাকে ধরিয়া চলিব, বা কার জন্য আশ্বস্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করিব? অতীত যাহা, তাহা ফিরিবে না, ভবিষ্যতে যাহা, তাহা আজই আসিবে না। আদবেই আসিবে কি না, তাহাই বা কে জানে? আমি অকূল-অনন্ত অসীম পাঁতারে পড়িয়া দিবানিশি ভাবিতেছি,—আমি ধরি কি?—আমি করি কি?

আমি চাই কি?—একটু হৃদয় চাই, একটু ভালবাসা চাই। এমন একটু হৃদয় চাই, যাতে আমার দুঃখের কান্না, সুখের হাসি, রোগের জ্বালা, শোকের বিষ ঢালিয়া শান্তি পাই। এমন একটু হৃদয় চাই, যাতে আমার এই চিন্তা-পীড়িত মাথাখানি রাখিয়া শীতল করিতে পারি। এমন একটু হৃদয়ের নিরাড়ম্বর গভীর ভালবাসা চাই, —যার চোখে চোখ রাখিলে প্রাণ জুড়ায়, শরীর শীতল হয়; আমি এমন একটী প্রেমের প্রতিমা চাই, যার কাছে প্রাণের কথা বলিলে প্রাণের অভাব দূর হয়,—যার কাছে মর্ম্ম কথা ব্যক্ত করিলে কথা সজীব হয়, চিন্তা বাঁচে, ভাব রক্ষা পায়। প্রাণের ভাব, স্বর্গের চিন্তা-শিশু-

গুলি ভালবাসা-জলসেচনের অভাবে সব একে একে ঢলিয়া পড়িল! আমি বাঁচি কি লইয়া? এমন একটী বন্ধু, এমন একটী ভাই, এমন একটী ভগ্নী, এমন একটী গুরু, এমন একটী স্ত্রী, এমন একটী পুত্র, এমন একটী কন্যা চাই—যাঁদের লইয়া আমি অনন্তের পথে সরল মনে নির্ভয়ে চলিতে পারি। চাই—একটী আদর্শ পরিবার। এমন একটী পরিবার—যাতে এই সকলের মিলন হইয়াছে। সকল যেখানে একাত্মক। সব সেখানে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। কোথায় বলত? মায়ের হৃদয়ে! আমি মায়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চাই। আমি মা-শূন্য পরিবার,—স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগ্নী লইয়া এই অকূল পাথারে কি করিব! তারা যে মরণের কথাই বলে! তারা ত বিপথই দেখাইয়া দেয়। তাই আমি সব ছাড়িয়াছি, অথবা আমাকে সব ছাড়িয়াছে। আমি মাকে চাই, আর মা-ময় প্রকৃতি চাই! মাতৃহীন শিশু কেমনে সংসার করিবে, তা বল? যার সংসার নয়, তার আর কে আছে? তাই বুঝি আমি একাকী।

মা-ময় প্রকৃতি, কথাটা বড় সহজ, কিন্তু সাধন বড়ই কঠিন। মাকে কে পাইবে?—যে পৃথিবীকে তুচ্ছ করে?—যে পৃথিবীর ভালবাসা ভুলিয়া থাকে?—না, কখনই নয়। পথ—এই সংসার,—এই অনন্ত প্রকৃতি, এই অকূল সংসার-পাথার। এই অকূল পাথার উত্তীর্ণ হইলে তবে ত মায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে প্রকৃতিকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ করে—মা তার নিকট হইতে অনেক দূরে—অনন্তের পরে অনন্ত; তারও পরে, তারও পরে।

আমি বলিতেছিলাম—আমি অনন্ত সংসার-পাথারে একাকী। সত্যই তাই। সেই জন্যই মা আমার অনেক দূরে। সে শুভ্র জ্যোতি দেখি না, সে স্বর্গের কান্তি ছুঁইতে পাই না। আমার ন্যায় পৃথিবীর পৌণে ষোল আনা লোকের এই অবস্থা। তাই পৃথিবীতে এত অবিশ্বাস রাজত্ব করিতেছে। মাকে যে দেখে নাই, সে কেমনে বলিবে যে, মা আছেন? তাই ত লোক নাস্তিক, তাই ত লোক সন্দেহবাদী। হিন্দু নাস্তিক, মুসলমান নাস্তিক, খ্রীষ্টান নাস্তিক, বৌদ্ধ নাস্তিক, ব্রাহ্ম—আরো নাস্তিক। নাস্তিক অপেক্ষাও ইহারা নাস্তিক। ইহারা মাকে না দেখিয়াও মায়ের কথা বলে,—সুতরাং ইহারা মিথ্যাবাদী নাস্তিক। কেন বলিতেছি বলত? মাকে দেখিতে হইলে প্রকৃতি-সাধনে সিদ্ধিলাভ করা চাই। কে প্রকৃতিকে আপন বুকের ভিতরে পূরিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃতিকে আপন শোণিতে মিশাইতে পারিয়াছে? কে প্রকৃতিকে লইয়া দিবানিশি চলাচলি করিতেছে? কে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভগ্নীত্ব সাধনের জন্য দিবানিশি চেষ্টা করিতেছে? কার আদর্শ বন্ধু আছে, আদর্শ ভাই আছে, আদর্শ ভগ্নী আছে, আদর্শ স্ত্রী আছে, আদর্শ শিক্ষক আছে? যাহা কিছু আছে সে ত স্বার্থের গোলাম;—হৃদয়-শূন্য, ভালবাসা শূন্য মৃতজীব। মৃতদের কথা বলিও না। কে আদর্শ পরিবারে লালিত পালিত হইতেছে? কেহই নয়। আদর্শ কিছুই নাই,—পরিবারে এই কথা, সমাজে এই কথা, দেশে এই কথা, রাজ্যে এই কথা। ভালবাসাটা স্বার্থসিদ্ধির একটা উপায় স্বরূপ হইয়াছে। স্বর্গের পথে, কই কোন্ ভালবাসা সাহায্য করে? কে সহায়? কে আশ্রয়? যাকে তুমি বন্ধু বলি-

তেছ, সে তোমারই সর্ব্বনাশের জন্য গোপনে গরল-মাখা শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিতেছে। যাকে তুমি ভাই বলিতেছ, সে তোমার সততার উপর চড়িয়া তোমার শোণিত শোষণেরই চেষ্টা করিতেছে। যাকে তুমি স্ত্রী বলিতেছ, সে গোপনে হৃদয় প্রাণ অন্যের হাতে সঁপিয়া দিতেছে। হৃদয়ে কলঙ্ক, সমাজে কলঙ্ক, দেশে কলঙ্ক। কলঙ্কের বীজই চতুর্দ্দিকে! তুমিও কাকে প্রাণ দেও নাই, তোমাকেও কেহ প্রাণ দেয় নাই। প্রাণ-বিনিময় স্থগিত হইয়া গিয়াছে;—সে ব্যবসা আর চলে না। সে বিনিময়ের বাজারে তালা বন্ধ রহিয়াছে। পাষাণ-হৃদয়-যবনেরা যে নূতন স্বার্থ-বাজার বসাইয়াছে, সেখানে কেবল গরলের মেলা বসিয়া গিয়াছে। সেখানে হিংসা এবং অহং পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হায়, পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থা!

কিন্তু একটা অবস্থার দুই দিক দেখা উচিত। অন্য তোমার হইয়াছে কিনা, এই কথা ভাবিবার পূর্ব্বে, ভাই, ভাবিয়া দেখত তুমি অন্যের হইতে পারিয়াছ কি না?—আপনাকে অন্যে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছ কি না? যদি না পারিয়া থাক, তবে অন্যকে পাইবার আশা কিসের? অন্যকে পাইবে, সে আশা কেন? দেও নাই, তাই পাও নাই। আমিও দেই নাই, তাই আমিও পাই নাই। যদি প্রাণ তোমাকে দিতে পারিতাম, তবে তুমিও তোমার প্রাণ আমায় দিতে,নিশ্চয় দিতে। আমি যদি দেশের হইতাম, তবে দেশও আমার হইত। আমি যদি প্রকৃতির হইতাম, তাহা হইলে প্রকৃতিও আমার হইত! কিন্তু হায়, তাহা ত হইল না! কই, পারি কই? অনিমেষ নয়নে ঐ চাঁদ-ভরা, নক্ষত্র ভরা আকাশের পানে, ঐ অতুল শোভা-ভরা বাগানের পানে চাহিয়া চাহিয়া আত্ম হারা হইয়া যাইতে পারি কই? কই, তোমাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে দিবানিশি আমা-হারা হইয়া থাকিতে পারি কই? কই, দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া করিয়া আমিত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি কই? পারি নাই—আমাকে ডুবাইতে পারি নাই। পারি নাই, বলিয়াই পাই নাই। আমি ভালবাসা শূন্য, লক্ষ্য শূন্য, হৃদয় শূন্য—তাই এ ভীষণ পাথারে একাকী। বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। আমারও যে দশা, তোমারও সেই দশা, সমাজেরও সেই দশা। আমিও আপন মহত্ব ভুলিয়া অন্যের মহত্বের পূজা করিতে পারি না; এ যে পোড়া সমাজে, পোড়া দেশে আশ্রয় লইয়াছি, এ সমাজে, এদেশেও সে আদর্শ পাই না। নিরাশার সঙ্গীত চতুর্দ্দিকে। আদর্শ সমাজও পাই না, আদর্শ মানুষও পাই না। আমি ধরি কি, আমি করি কি?

হিন্দুসমাজ, মুসলমান সমাজ, খ্রীষ্টীয় সমাজ,—সব নাস্তিক—কারণ কোন সমাজেই আদর্শ পরিবার নাই। সব সমাজেই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। আদর্শের মূল কোথায়? আদর্শ-স্বরূপা মা যে পরিবারে নাই,—সে পরিবার আদর্শ নয়। যেখানে মা—যেখানে বিভিন্ন পথাবলম্বী ভাই ভগ্নী সব একীভূত—সব মিলিত, সেই আদর্শ পরিবার। কিন্তু সে স্বর্গের চিত্র এ হতভাগ্য দেশে নাই। হিন্দুর ঈশ্বর মরিয়া গিয়াছেন—তাই হিন্দু সমাজের অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! ধর্ম্মের নামে নাস্তিকতা, কপটতা, প্রবঞ্চনা প্রশ্রয় পাইতেছে;—মেকি টাকা চলিয়া যাইতেছে। যাদের একবিন্দু ধর্ম্মে

মতি নাই, একবিন্দু ভালবাসা নাই। পাষাণ দিয়া যাহারা হৃদয় বাঁধিয়াছে, তাহারাই আজ হিন্দুধর্ম্মের পাণ্ডাগিরি করিতেছে! মুসলমানের মহম্মদ ও আল্লা বিস্মৃতিতে ডুবিয়াছে;—তাই সে সমাজে কেবলই কাট্টা কাট্টি রক্তারক্তি চলিতেছে। খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট আঁধারে মুখ ঢাকিয়াছেন,—তাই খ্রীষ্টানের বুকে বিনয়ের পরিবর্ত্তে কেবলই শোণিত-পিপাসা বাড়িতেছে। কি জানি কেন, এই ভারতে ধর্ম্ম এখন একটী পোষাকের মত হইয়া উঠিয়াছে! তার পর হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব ও খ্রীষ্টানত্ব ঘনীভূত হইয়াছে যে পবিত্র (?) ধর্ম্মসমাজে, তাহারও শোচনীয় অবস্থা দেখ। দশ জন লোক, এক মুষ্টি লোক, কেহ কারও মুখ দেখিবে না। একের মহত্ত্ব অপরের অসহ্য, একের ঐশ্বর্য্য অপরের চক্ষের শূল। সকলেই স্বস্ব প্রধান:—আপন লইয়া ব্যতিব্যস্ত। বরং বাহিরের লোকের প্রশংসা করিব, তবুও ভিতরের লোকের গুণ স্মরণ করিব না। কেশব চন্দ্রের জন্য স্মরণার্থ সভা করিব না, বরং খ্রীষ্টের জন্য করিব!—কত উদারতা! এখানে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর নামে প্রভুত্ব, একাধিপত্যই বিস্তৃত হইতেছে। ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই। কেহ কাহাকে দেখে না, কেহ কাহার মহত্ত্ব বুঝে না। কেহ কাহাকে ধরে না। আপনি উঠিয়া আপনিই মরে। কেহ কাহাকে কোল দেয় না। আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ কদিন চলিতে পারে? অন্যের সাহায্য ভিন্ন কে অগ্রসর হইতে পারে? সংসারের পথেও কেহ পারে না, ধর্ম্ম পথেও পারে না। এই উভয় পথেই পরস্পরের সাহায্য চাই। সাহায্য ভিন্ন জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্ম্মী, একিছুই হওয়া যায় না। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম ভিন্ন বিশ্বাসও পাওয়া যায় না;—এ সকলের অভাবে বিশ্বাস কল্পনার জিনিষ থাকে। পথই এই। প্রকৃতিই পথ। প্রকৃতির সাহায্য পদে পদে চাই। লোকের সাহায্য, লোকের পদে পদে চাই। লোকের মহত্ত্ব স্মরণ না করিয়া মানুষ মানুষই হইতে পারে না। * চাই না?—বিনয় ও বিশ্বাসের পূর্ণ বিকাশ খ্রীষ্টের সাহায্য ভিন্ন কে বিনয়ী হইতে পারে? প্রেম-শিরোমণি চৈতন্যের সাহায্য ভিন্ন কে প্রেমিক হইতে পারে? ইহাদের জীবন ধারণের অবশ্য গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। মিল, ক্যাণ্ট, বেস্থাম, ডারউইন, হক্সলী, স্পেন্সার—এ সকলের অভ্যুদয়ে জগতের মহা উপকার হইয়াছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ, মিল্‌টন, সেলি, কীট্‌স—এ সকলের দ্বারাও কত উপকার হইয়াছে। প্রকৃতির সকলের সৃষ্টিতেই সকলের উপকার হইতেছে। সকলেই কি শিল্পী হইতে পারে? সকলেই কি কবি হইতে পারে? সকলেই কি দার্শনিক হইতে পারে?—না, তা নয়। একজন যাহা, অপরে তাহা হইতেই পারে না। যে আমেরিকায় যাইবে, তাহাকে কলম্বসের নিকট কৃতজ্ঞতা-কর দিতেই হইবে। যে বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইতে চাহিবে, তাহাকে খ্রীষ্ট ও চৈতন্যের নিকট মস্তক অবনত করিতেই হইবে। এক একজন মহাপুরুষ এক এক দিক আবিষ্কারের জন্য জন্মেন, অথবা এক এক বিভাগের পূর্ণ বিকাশ, বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ—এক একজন। মহাপুরুষ? কর্ণ তুলিও না। মহাপুরুষ সকলেই। আপন আপন

* He is himself made higher by doing reverence to what is really above him."—*Carlyle.*

বিশেষত্বে সকলেই মহা পুরুষ। কিন্তু এক বিষয়ের বড় ছোট গণনা করা যায়। সকল শিল্পীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সকল কবির মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি, ইহা বলা যায়। সকলেই কিন্তু কাপড় কাচিবে না, সুতরাং ধোপার আদর থাকিবে। সকলেই কবিতা লিখিবে না, সুতরাং কালিদাস ভবভূতিপ্রভৃতি কবির আদর থাকিবে। সকলেই ধার্ম্মিক হইবে না, সুতরাং খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ,মহম্মদ এবং চৈতন্যের আদর থাকিবে। সকলেই বিজ্ঞানের চর্চ্চা লইয়া মাথা ঘুরাইবে না, সুতরাং হক্সলি এবং টিণ্ডেলের আদর থাকিবে। এক এক বিভাগের আদর্শ, এক একজন। এক এক বিষয়ের পূর্ণ বিকাশ এক এক জন। যত বিভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল বিভাগের এক একজন আদর্শ মহা পুরুষ—অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত লোকের অভ্যুত্থান হইতে পারে, এবং জগতে তাহা হইয়াছে। তাঁহারাই আদর্শ। আদর্শ কিছু সকলে সব বিষয়ে হইতে পারেন না। এক এক বিষয়ে এক এক জন—আদর্শ। আদর্শ পুরুষের অভ্যুত্থান এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়ম-বহির্ভূত নয়। এক কাজ করিতে করিতে, এক পথে চলিতে চলিতে,হঠাৎ একজন সকলের উপরে উঠিয়া গেল। পৃথিবীর কথাই বলিতেছি। এব একপথ অনুসরণ করে—কত শত সহস্র লোক। কিন্তু সেই পথে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ একজন। অনেকে নৌকা পথে চলিয়াছে, কিন্তু সকলেই আমেরিকা আবিষ্কার করে নাই, কত জন কতবার আতা-পতন দেখিয়াছে, কিন্তু সকলে কিছু মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যাহা তুমি আমি প্রত্যহ করি, প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতর হইতে ও কবি কত কি বাহির করেন। এক এক সময়ে সমাজে এক এক প্রকার বায়ু(atmosphere) প্রস্তুত হয়, সেই বায়ুতে ডুবিয়া মজিয়া এক এক জন মহাপুরুষ ভুষ করিয়া, কার ইঙ্গিতে যেন জাগিয়া উঠেন। দেশের অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। এক এক জনের দ্বারা এক একটী সত্যের বাকস্ খুলিয়া যায়। ইহাকেই অবতার বলে। বায়ু প্রস্তুত হইলেই মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইবে। সেইবায়ু—অভাবমূলক। অভাব, অভাব, কেবল অভাব—এই রূপ বায়ু যখন উঠে—তখনই কোন খ্রীষ্ট, কোন বুদ্ধ,কোন ম্যাটসিনি,বা কোন গ্যারিবল্ডির অভ্যুত্থান হয়।* ইহাদিগের মহত্ত্বকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা সৃষ্টি বিধানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝে না। যাহারা মহতের মহত্ত্ব বুঝে না,তাহারা অতি নীচ।† কেবল বুঝিলেও কিছু হয় না। মহত্ত্বকে জীবনগত করা চাই। যাহারা তাহা না পারে,তাহাদের পতনের দ্বার উন্মুক্ত। অভাব হইতেই প্রকৃতি,—প্রকৃতি থাকিলেই অভাব আছে। প্রকৃতি ত আর পূর্ণ নয়। অভাব ছিল বলিয়াই তাহা পূরণের জন্য জগতের নানা বিভাগে মহাপুরুষগণের উৎপত্তি। যাহা কিছু এই জগতে আছে, সকলই কোন না কোন অভাব পূরণের জন্য বা কোন সত্য আবিষ্কারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সেই জন্য, সকলের মধ্যেই কিছু কিছু মহত্ত্ব, কিছু কিছু বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এক বিষয়ে সকলেই আদর্শ নয়। খ্রীষ্ট জগতে একজন,

* "Nature, when she adds difficulty, adds brain."—*Emerson*,

† "No sadder proof can be given by a man of his own littlness than disbelief in great men."—*Carlyle*.

বুদ্ধ একজন, ম্যাটসিনি একজন। যে অভাব-বায়ুতে ইঁহাদের জন্ম, সে অভাব-বায়ু আর প্রবাহিত হইবে না, সুতরাং তাঁহাদের ন্যায় লোকের আর অভ্যুত্থান হইবে না। অভ্যুত্থান হইবে যাহার—সে নূতন। নূতন মহত্ত্ব, নূতন আদর্শ জগতের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে চাই। অভাব নিত্য নূতন, প্রকৃতিও নিত্য নূতন। সেই জন্যই দিনে দিনে, যুগে যুগে নূতন মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইতেছে। তাঁহারা কে বড়, কে ছোট, সে বিচার চলে না। এক বিভাগের লোকদের মধ্যে কেবল তুলনা চলে, কিন্তু ভিন্ন২ বিভাগের লোকের মধ্যে তুলনা অসম্ভব। এই যে দুর্দ্দিন, এই যে অভাব-সাগর, এই যে প্রেমহীনতা, এই যে অকূল পাথার সম্মুখে এবং পশ্চাতে—ইহার ভিতর হইতেও নূতন মহত্ত্ব পূর্ণ বীরের অভ্যুত্থান হইবে। আদর্শ ভিন্ন মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না। আদর্শ চাই ই। আদর্শ প্রেম চাই, আদর্শ ভালবাসা চাই, আদর্শ মানুষ চাই। এমন আদর্শ সম্মুখে থাকা চাই, আমি যখন প্রলোভন এবং পাপে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, তখন যে আমাকে তুলিতে পারে,—যাকে আশ্রয় করিয়া, যার মুখের দিকে চাহিয়া রক্ষা পাইতে পারি। একই বিষয়ে আমাপেক্ষা যে উন্নত, সে ই সে বিষয়ে আমার আদর্শ। পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং মা। কিন্তু মাকে ধরিবার সিঁড়ি, এই অনন্ত প্রকৃতি। সন্তানকে ধরিলে মাকে পাওয়া যায়, আবার মাকে দেখিলে সন্তান আপনার ভাই হয়। মা ভিন্ন ভ্রাতৃমিলন অসম্ভব। প্রকৃতি-মিলন ভিন্নও মাতৃ-মিলন অসম্ভব। মিলন চাই ই। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সকলেই সকলের আদর্শ। সুতরাং মিলন চাই ই। মিলনের জন্য আদর্শ ধরা—চাইই। এক সময়ে মার পথে ভাই সহায়; অন্য সময়ে, মা প্রকৃতির সহিত মিলনের সহায়। হয় প্রকৃতি, নয় মা। একজনকে চাইই। মা ও প্রকৃতিকে যদি আদর্শ রূপে মানুষ না ধরিতে পারে, তবে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আদর্শ যখন সম্মুখ-স্খলিত, তখনই মানুষের পতন। এই কথার সপক্ষে সমস্ত সমাজ সাক্ষ্য দিতে বিদ্যমান। সৎ সংসর্গে স্বর্গ, অসৎ সংসর্গে নরক, এটী একটী প্রাচীন কথা। আদর্শ না পাইলে মানুষের পতন অনিবার্য্য। এই দুর্দ্দিনে আদর্শ মানুষের প্রকৃত অভাব। অথবা আদর্শ বুঝিতে পারে, এমন লোকের আরো অভাব। তাই সমাজের এত দুর্দ্দশা। ঈশ্বর-প্রাণ মানুষ দেখি না। সমাজের বড়ই অভাব। অভাবের সাগর উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহার ভিতর হইতে যে আবার কোন আদর্শ পুরুষের অভ্যুত্থান হইবে না, কে বলিতে পারে? ইতিহাস পাঠ বৃথাই হইবে, যদি বর্ত্তমান শতাব্দীর দূষিত বায়ু পরিশোধনের জন্য আবার নব আদর্শ অভ্যুত্থিত না হয়।

কিন্তু আমি এখন ধরি কি? আদর্শ মানুষের যখন সৃষ্টি হইবে, তখন হইবে; আমি এখন ধরি কি,—এখন করি কি? যে প্রেম সাগরে ডুবিলে মানুষ হওয়া যায়, সে সাগরে ডুবিতে পারি না; কারণ আমার প্রকৃতি সাধন হয় নাই। আদর্শ বন্ধু নাই, আদর্শ গুরু নাই, আদর্শ ভাই নাই, আদর্শ ভগ্নী নাই। সত্যই নাই। যা আছে, তাতে আমার দিন চলে না। আদর্শ স্ত্রী নাই, আদর্শ পুত্র নাই—আমার গভীর ভালবাসার সে সব কিছুই নাই। অথবা আমি কাহারও ভিতরের আদর্শ চিত্র

ধরিতে পারিতেছি না। এই সমস্ত সৃষ্টিকে আমি অকূল পাথার করিয়া তুলিয়াছি। সকল থাকিতেও আমার যেন কেহ নাই —আমি কাহারও মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যখন কারও নই, তখন কে আর আমার হইবে? একাকী আসিয়াছি—একাকীই অকূল পাথারে পড়িয়া কাঁদিতেছি। কই—সে ভালবাসা কই,—যার জন্য ধন প্রাণ মান সকল ডুবাইতে পারি? কই, সে প্রেম কই—যার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিতে পারি? প্রেম অনন্তের পথ দেখায় কই?—সে অনন্ত কই? ডুবিতে ডুবিতে আরো ডুবি কই?—মজিতে মজিতে আরো মজি কই? আমিত্ব ডুবে না ও পরত্ব ঘুচে না, স্বার্থ নিবে না। তবে আর কি হইবে? দেখি, দেখি, দেখি,—আরো দেখি, আরো দেখি, আরো দেখি—এমন করিয়া অনিমেষ নয়নে কাহাকেও ত দেখিতে চাই না। আমাকেও ত কেহ তেমন করিয়া দেখে না। শুনি শুনি, আরো শুনি, আরো শুনি—এমন করিয়া কই, আমিত কাহারও সুধা-বিনিন্দিত মধুর কথা বা সঙ্গীত শুনিতে চাই না। দেখিতে দেখিতে, শুনিতে শুনিতে পাগল হই কই? আকাশের চাঁদ, বাগানের ফুল, ফুলের সুষমা, পাহাড়ের ঝরণা, ঝরণার মধুরিমা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হই কই? অন্যের মহত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে তৃষ্ণা-কাতর হই কই? দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনার স্বার্থ, যশ মান ভুলিয়া বিশ কোটী হৃদয়ে হৃদয় মিলাইতে পারি কই? আমি অহং-বর্জ্জিত হই কই? আমাতেই আমি জীবিত রহিয়াছি। তাই আমি আজ যেন একাকী অকূল পাথারে পড়িয়া কাঁদিতেছি। নচেৎ এই ধন ধান্য পূর্ণ ধরা আমারই হইত, ভাই ভগ্নী সকল, আমাকেই ধরিয়া বসিত, আমার সহায় হইত। আমি যখন কাহারও নিকট ধরা দেই নাই,—আমাকে যখন আমি বিক্রয় করিতে পারি নাই, তখন নিরাশ ক্রন্দনই আমার চির সম্বল। আমি আর কিছু আশা করিতে পারি না। কেহ আমার ধারে আসিও না; আমি একাকী এই পাথারে পড়িয়া কাঁদি। আমি যখন গরলের পরিবর্ত্তে সুধা মাখা কোল দিতে পারি নাই—হিংসায় হিংসা, স্বার্থে স্বার্থ, নিন্দায় নিন্দা দিয়াই যখন ব্যবসা চালাইয়াছি;—অপ্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম দিয়াছি, প্রহারের বদলে প্রহার করিয়াছি, তখন আমার আর আশা কোথায়? আমি যখন একটী প্রাণেরও অতলস্পর্শ অনন্তত্বে আত্মমজাইতে পারি নাই—তখন আমার কথা আর মুখে তুলিওনা। প্রবঞ্চক, কপটী, প্রেম-কৃপণ হতভাগা নাস্তিককে কেহ ছুঁইও না। মুখে ও ভিতরে যার দুইরূপ, তার পরিণাম আর কি হইবে! এই অকূল সংসার-পাথারে ক্রন্দনই আমার সম্বল। তবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাই। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যাই। অনন্ত প্রেমসাধন, তা এই প্রেম-কৃপণের হইবে না। এই অনন্ত প্রকৃতি সাধনে এই হতভাগা সিদ্ধি পাইবে না। এই স্বাধীনতার যুগে আমি আত্ম হারাইয়া অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে ডুবিতে পারিব না। সুতরাং মাতৃদর্শন আমার কপালে নাই। অবিশ্বাসই আমার পরিণাম! অপ্রেমই আমার শ্মশানের সম্বল! অভক্তিই আমার চিতার আরাম! আমি কাঁদিতে আসিয়াছি—কাঁদিয়াই যাই। আমি মরিয়া যাইলে—তোমরা সকলে আমার শ্রাদ্ধের

দিনে একবার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের বিশ্ব-বিজয়িনী (?) সঙ্গীত তুলিয়া আনন্দের ধ্বনি করিও। তাহাতেই আমার মুক্তি, এবং বৈকুণ্ঠ মিলিবে। হতভাগার পরিণাম আর কি হইবে?

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। পকেট ফৌজদারি আইন।—প্রথম খণ্ড,—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১৷৹। অতি অল্প মূল্যে পরিষ্কার অক্ষরে, ক্ষুদ্র আকারে, কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় আইন সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই শরৎ বাবুর উদ্দেশ্য। প্রথম খণ্ড— তাহার নমুনা। ইহাতে দণ্ডবিধি ও সাক্ষ্য বিষয়ক আইন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ অতি পরিষ্কার। আইন-ব্যবসায়ীগণের পক্ষে এ পুস্তক বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় যতগুলি আইন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে এই সংস্করণই ভাল বলিয়া বোধ হইল।

২। জীবন-সহায়।—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ কর্তৃক লিখিত, মূল্য ৵৹। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশে গ্রন্থখানি পূর্ণ। গ্রন্থকার জীবন পথে অগ্রসর হইবার সময় নিজে যে চিন্তাগুলি দ্বারা সাহায্য পাইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কথাগুলি বড়ই সুন্দর,—জীবনে এ গুলিকে পালন করিতে পারিলে যে আরো সুন্দর হয়, সে সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার ঠিক বলিয়াছেন—"লোকের দোষের কথা যতক্ষণ আলোচনা ও চিন্তা করে, ততক্ষণ অসৎসংসর্গ করা হয়।" আমাদের দেশে জীবন অপেক্ষা কথার ছড়াছড়ি ব'ই বেশী হইয়াছে—এই সময়ে এই ক ..় কথাগুলিকে কেহ জীবনে পালন করিয়া দেখাইলে বড়ই ভাল হয়। উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত না হইলে তাহার কোনই মূল্য নাই—তাহা ফাঁকা কথা মাত্র।

৩। জাগ্রত জীবনও সুখ কিসে?—শ্রীললিতমোহন চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রদত্ত দুটী বক্তৃতার সারাংশ। বক্তৃতা দুটী সুন্দর হইয়াছে। ললিত বাবুর চেষ্টা বড়ই প্রশংসার্হ।

৪। মাণিকদহ হিত সাধিনী সভার পঞ্চমবার্ষিক কার্য্য বিবরণ। এটী ফরিদপুর সুহৃদসভার একটী শাখা সভা। এই সভাটীর কার্য্য এত সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে যে, কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পল্লীগ্রামে এরূপ একটী সভাকে ধারণ করিয়া ফরিদপুর গৌরবান্বিত হইতেছেন। ঈশ্বর এই সভার মঙ্গল করুন।

৫। ফরিদপুর সুহৃদসভার ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। এই সভা ষষ্ঠ বৎসর অতিক্রম করিয়া সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই কার্য্য বিবরণে স্বায়ত্ত-শাসন নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় বিবিধ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অল্পে অল্পে সভাটী দেশের নানা প্রকার হিতকর কার্য্যে হস্তাপেক্ষ করিতেছেন। "slow but sure"—এই কথাটি এই সভার কার্য্য প্রণালীর ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট।

৬। ঈশ্বর স্তোত্র বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলার যোগ্য নয়। যাঁহারা যত্ন করিয়া পুস্তকখানি সাধারণের কল্যানের জন্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ।

৭। নীতিমালা।—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র নাগ প্রণীত। মূল্য ৶০। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। প্রতাপ বাবুর এপুস্তকখানি সহৃদয়তার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

৮। আত্মচিন্তা।—মূল্য ৵০। ক্ষুদ্র পুস্তক, ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপা। কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চিন্তাগুলিও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। এইশ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এই খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গ্রন্থকার শেষ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"Gold dust" নামক পুস্তক অবলম্বনে ইহা লিখিত। এরূপ স্থলে পুস্তকের নাম "আত্ম চিন্তা" না রাখিয়া আর কিছু রাখিলেই ভাল হইত।

৯। Thirsting after God.—by Sitanath Datta. Price two annas. পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোক আপন আপন জীবনের প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার উপকারিতা আমরা মোটেই বুঝি না। ভগবানের নিকট নির্জ্জনে যে কথা বলিয়াছি, লোকের নিকট তাহা বলিয়া লাভ কি, বুঝি না। প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ায় লোক কিছু অস্বাভাবিক হয় না কি?

১০। Whispers from the inner life,—by Sitanath Datta, price four annas. সীতানাথ বাবুর এ পুস্তক খানি অতি সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত কথার সহিত আমরা না মিলিতে পারি, কিন্তু একথা বলিতেই হইবে যে, তিনি একজন ধর্ম্ম-পিপাসু চিন্তাশীল লেখক এবং ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট অনেক ঋণী।

১১। উদ্গীথা।—শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রণীত। প্রিয়নাথ বাবু এক জন ধার্ম্মিক কবি। ধর্ম্ম ভিন্ন তাঁর কথা নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন তাঁর কবিতা নাই। তাঁহার সরস মধুর কবিতার নমুনা দেখুন—.

"যেথা নাহি অন্ধকার, দিবালোক নাই,
ভূত ভবিষ্যৎ নাই, অধ ঊর্দ্ধ ঠাঁই;
মঙ্গল জ্যোৎস্না এক ফুটে অনিবার,
রয়েছে মহিমা ধ্রুব করিয়া বিস্তার।
বাজি' যেথা আনন্দের অনাহত নাদ
দিতেছে অনন্ত হতে অভয় সম্বাদ,—
অকাল সেখানে সব, সবি অনাকাশ,
কেবল অনাদি জ্ঞান রয়েছে প্রকাশ,
সেই বিন্দু, সেই লক্ষ্য, সেই দিকে গতি,
আত্মবান্ ছুটে নিত্য সেই লক্ষ্য প্রতি।"

চিন্তা কত মহান, ভাব কত উদার, লেখা কত মধুর!

১২। The Depreciation of Silver;—by an Indian, Price two Rupees. গ্রন্থকার আট বৎসর ক্রমাগত অধ্যয়ন করিয়া বহু গবেষণার পর এই গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। মুদ্রা-বিভ্রাটে ভারতের যে ভয়ানক অনিষ্ঠ হইতেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই গুরুতর প্রশ্নের শীঘ্র মীমাংসা না হইলে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। একজন ভারতবাসী এরূপ দক্ষতার সহিত এই বিষয়টী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন, ইহা অনেকেরই বিশ্বাস না হইবার কথা। গ্রন্থকার এ পুস্তকে যেরূপ গভীর পাণ্ডিত্য, গবেষণা এবং চিন্তার পরিচয় দিয়াছিন, তাহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছে;—তাঁহার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুখ হইয়াছি।—তাঁহার দ্বারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

উদাসীন, ভারতসম্বাদ ও তিনটি দৃশ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। অন্যান্য পুস্তক আগামীতে সমালোচিত হইবে।

মহা-মিলন।

"বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণ,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,
তোমাতে আমাতে হই, অসীম সুন্দর।" রবীন্দ্রনাথ।

(১)

মিলিব মিলিব, মনে করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই মিলিতে পারিতেছি না। সে আসে আসে, কিন্তু কাছে ঘেসে না। সে ভাল করিয়া হৃদয়ে বসিতে না বসিতে কোন্ অন্ধকার রাজ্যে যেন চলিয়া যায়! তাতে আমাতে কতই দূরত্ব রহিয়া গিয়াছে! একটু হাসিয়া, একটু চাহিয়া, একটু মধু ঢালিয়া, সে আবার কোথায় লুকাইয়া যায়। এমন করিয়া কি ঘরকন্না করা চলে?—হায়, এমন করিয়া কি ভালবাসার রাজ্য বিস্তার হয়?—হায়, এমন করিয়া কি মেলা যায়? কিন্তু সে কিছুতেই আমার বশ নয়,—কিছুতেই সে আমার কথা শুনে না! কিন্তু আমি কিছুতেই তার বশ নই। তবে বুঝি মিলন আর পৃথিবীতে ঘটিল না!

আমি বলি, যদি মিলিবে, তবে তুমি তোমার ঐ বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদ, ঐ গৌরব-আস্ফালন, ঐ উকি-ঝুকি-চাহনি, ঐ সভ্যতা-বস্ত্রখানি, ঐ অহঙ্কার-গরিমা, ঐ লজ্জা আর ভয়, সব দূরে ফেলিয়া এস। তোমার মাথার ঐ বিদ্যার বোঝা, তোমার শরীরের ঐ ঐশ্বর্য্য-ভূষণ, তোমার চোখের ঐ কূট চাহনি, সব ফেলিয়া এস—সরল প্রাণে, খোলা হৃদয়ে, উলঙ্গ শরীরে এস। তা সে কিছুতেই শুনে না! পৃথিবীর দিন এমনি করিয়াই শেষ হইতেছে। হতাশ সঙ্গীত ফুরাইতে না ফুরাইতে,—ভাল করিয়া হৃদয়ে বসাইতে না বসাইতে, কে জানে কেন, প্রাণের প্রতিমাগুলি আঁধারে লুকাইয়া যাইতেছে! হায়, তবে মিলন কেমনে হইবে? হায়, তবে মেশামিশি কেমনে ঘটিবে?—আমি তা কিছুই বুঝি না।

তুমি রাজা, তুমি জজ বা মেজেষ্ট্রেট,—আমি দীন দুঃখী গরীব প্রজা—আমার হৃদয়-ঘরে তোমার পদনিক্ষেপ অসম্ভব। তুমি বিদ্বান, তুমি জ্ঞানী,—আমি মূর্খ অজ্ঞান—এ দরিদ্রের গৃহে তুমি আসিবে কেন? তুমি সুন্দর, তুমি মনোহর, তুমি পুণ্যাত্মা,—আমি কুৎসিৎ নরাধম পাপী,—আমার দিকে তুমি চাহিবে কেন, আমার ঘরে বসিবে কেন? এঁকে, ওঁকে, তাঁকে, যাঁকে ধরিতে চাই, যাঁর দিকে চাই, চমকি হাসি হাসিয়া সেই আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়। বামনের চাঁদস্পর্শের সাধ মিটে নাই, মিটিবে না। চতুর্দ্দিকে দৈবন্যের কোলাহল—কেহ কাকে চায় না, কেহ কাকে ধরে না, কেহ কাকে ঘরে তুলে না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হতাশ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে—তোমার দিকে নয়ন গেল! কি জানি কেন, তোমাকে প্রাণ চাহিল! কি জানি কেন, তোমার জন্য প্রাণ অস্থির হইল! কি জানি কেন, তোমাকে ঘরে আনিবার জন্য সাধ যাইল! কিন্তু তুমি ত

তাহা বুঝ না। আমার পরাণের পিপাসা, হায়, তুমি ত বুঝিলে না; তুমি কিছুতেই ঘেসিবে না। আসিবে আসিবে বল, কিন্তু এস কই?—তুমি কেবল তুমিত্ব লইয়া এস কই?--তুমি ভিতরে খাটী যাহা, তাহা লইয়া এস কই? আমি কপটতা ত চাহি না, পোষাক পরিচ্ছদ ত চাহি না—আমি প্রতারণা, ছলনা, ঠকের হৃদয় ত চাহি না। আমি চাই—সরলতা-মাখা ছানার পুতুল, স্বর্গের কুসুম—তোমার হৃদয়খানি। আমি চিন্তা চাই না, বিদ্যা চাই না, অহঙ্কার চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না—আমি চাই তোমার সরল হৃদয়খানি। কিন্তু তা পাই কই?—তুমি কিছুতেই তোমার আস্‌বাব ছাড়িয়াআসিতে রাজি হইলে না। তবে আমি করি কি?

মিলন কি কথার কথা? হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, শরীরে শরীরের মিলন সোজা কথা নয়। মধুর মিলন দেখ,—নদী মিলিয়াছে সাগরের সহিত;—প্রভাত-কিরণ-মাখা শিশিরবিন্দু মিলিয়াছে—ফুলের হৃদয়ে। সাগর নদীর ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়াছে, ফুল সৌরভ ভুলিয়াছে, শিশির স্নিগ্ধতা ভুলিয়াছে। দেখ, স্বার্থ গিয়াছে, তাই মধুর মিলন হইয়াছে। আবার ঐ দেখ, শারদ-জ্যোৎস্না-মাখা বায়ু মৃদু মৃদু বহিয়া নদীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ দেখ, সুস্নিগ্ধ মধুর প্রভাত-মিলনে বসন্ত-কানন-কোকিল আত্মহারা হইয়া কেমন গাইতেছে। ঐ দেখ—পাহাড় আপন বুক বিদারণ করিয়া কেমনে ঝরণাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছে। এ সকলই যেন আপনাকে ভুলিয়া অপরের জন্ত প্রাণ ঢালিতেছে। বায়ু বহিয়া বহিয়া ফিরিতেছে, চাঁদ উঠিয়া উঠিয়া নিবিতেছে, কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, ঝরণা কুল কুল রবে চলিয়া চলিয়া সাগরে ডুবিতেছে। কাহারও ক্লান্তি নাই, কাহারও মান অভিমান নাই, কাহারও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে মন নাই। পরের জন্যই যেন সকলে ব্যস্ত। কিন্তু তুমি, হায়,—তুমি ভ্রমেও, তোমার মানটুকু, সভ্যতাটুকু, বিদ্যাটুকু, জ্ঞানটুকুর মমতা বিসর্জ্জন দিয়া এ তৃষিত, এ পিপাসিত জনের প্রতি চাহিবে না! হায়,তবে আমি করি কি? তুমি কিছুতেই তোমার উন্নত অবস্থাটুকু, লজ্জাটুকু,—পোষাকটুকু, পরিচ্ছদটুকু ছাড়িয়া আসিতে পারিবে না! মিলন কি সোজা কথা? হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, জীবনে জীবন—মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। সে কি সামান্য কথা? উচু-নীচু বোধ, দূর-দূর-আরো-দূরে-আরো-দূরে রাখে যে প্রবঞ্চনা-পোষাক বা অহঙ্কার, এ সকল থাকিতে মিলন অসম্ভব। তাই ত মিলন নাই। তাই ত জগৎপুরে বিচ্ছেদের হাহাকার! তাই ত মানুষ বসিতে না বসিতে চলিয়া যায়! তাই ত মানুষ অসময়ে মরণকে স্পর্শ করিয়া নিবিয়া যায়! তাই ত আমার প্রাণ আজ অস্থির ও চঞ্চল। মিলনই যদি না ঘটিল, তবে এ পোড়া পৃথিবীতে থাকিয়া ফল কি, লাভ কি? কে বলিবে, ফল কি, লাভ কি?

(২)

মানুষ মানুষকে বড় ভয় করে। মানুষের নিকট মানুষের বড়ই অবিচার। দীন বৈরাগী, কোন্ কালে রাস্তা দিয়া যাইবার সময় একদিন একজন পথিককে গালি-গালাজ দিয়াছিল, তারপর তার কত অনুতাপ অশ্রুপাত হইয়াছে, তারপর সে

কত জনকে মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিয়াছে, কিন্তু আজও দীন বৈরাগীর কথা উঠিলে লোকে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলে—"সেই ত দীনা, তাকে জানি।" মানুষ মানুষের সামান্য অপরাধও ভুলিতে পারে না। আবার অন্য দিকে, একজন লোক জলে ডুবিয়া মরিবার সময়, জগাই সাধু তাহাকে বাঁচাইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে জগাই গোপনে কত লোকের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, গোপনে কত খুন করিয়াছে, কিন্তু আজও জগাই সাধু বলিয়া জগতে পূজিত। এইরূপ, মানুষ মানুষের বাহ্যরূপ দেখিয়া মজে। জগতে সর্ব্বত্রই এইরূপ অবিচার চলিতেছে। প্রকাশ্যে একটী অপরাধ কর—চিরকালের জন্য মানুষের চক্ষে তুমি ঘৃণিত বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। পৃথিবীর বিচার এমনই। একটী সামান্য জঘন্য কাজ করিয়া কত লোক যে চিরকালের জন্য মানুষের নিকট হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে,—কত লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিয়াছে, তাহার গণনা হয় না। এই অবিচারের ভয়ে, মানুষ মানুষের নিকট হৃদয় খুলিতে চায় না। এই অবিচারের ভয়ে সদা মানুষের প্রাণ সশঙ্কিত। এই অবিচার সহ্য করিতে না পারিয়া, হায়, কত লোক কবি কীট্‌সের ন্যায় অসময়ে জীবন-লীলার মমতা ছিঁড়িতেছে। এই অবিচারের ভয়ে মানুষ কত বাহ্য পোষাক দিয়া হৃদয়ের গরল চাপা দিয়া রাখিতে চায়। ভিতরে তোমার শত সহস্র গলদ, ভিতরে তুমি পাপের কীট, কিন্তু বাহিরে ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া সাবধান থাকিও, তোমার আর কোন ভয় নাই। যাহারা সামাজিক শাসনের পক্ষপাতী, তাহারা প্রকারান্তরে এইরূপে মানুষকে কপটাচারী হইতে পরামর্শ দেয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজের প্রধান কথাই এই "যাহা ইচ্ছা কর; কিন্তু কাহাকেও জানিতে দিও না।" এই জন্য আজকাল লোক বড়ই চতুর হইয়া উঠিতেছে। লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই হইল। ফাঁকি দেওয়া এখনকার দিনে একটা ব্যবসার মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা নয়, তাহাই সাধারণের নিকট প্রতিপন্ন করিতে সতত চেষ্টা করিতেছে। এখনকার দিনে, চরিত্র-প্রতিপন্ন করিতে হয়, আদালত সাহায্যে। এখনকার দিনে, চরিত্র প্রতিপন্ন করিতে হয়, লোকের খোসামুদী দ্বারা। তুমি ভিতরে যাহাই হওনা কেন, লোকে তোমাকে ভাল বলিতেছে ত? তবে আর তোমার কোন ভয় নাই। যেন-তেন-প্রকারেন লোকের মুখের প্রশংসা পাইলেই হইল! খোসামুদীর বাজার চারিদিকে বসিয়া গিয়াছে; প্রতারণা, ছলনা, চাটুকারিতা, চরিত্র-বিনিময়ে লোকেরা কিনিয়া ঘরে ফিরিতেছে। আজ কালকার দিনে খাটী মাল আর বিকায় না। যাদের খাটী মালের ব্যবসা, তাহাদের ঘরে কান্নাকাটী, হই-চই পড়িয়াছে। খুব মিথ্যা-বিজ্ঞাপন দেও, খুব আন্দোলন-ঢাক পিটাও, তবেই তোমার পচা মাল চলিয়া যাইল! খুব খোসামুদী কর—তবেই এযাত্রা তুমি রক্ষা পাইলে। প্রশংসা পাইলেই হইল, তা যদি বড় লোকের হয়, তবে ত আর কথাই নাই। পসার জম্‌কানের জন্য ক্রমাগত খোসামুদী, বাহির-চটক-ভাব বা প্রতারণা চলিয়াছে। এই সময়ে খাটী মাল পাওয়া বড়ই কঠিন। চাপা দেও, গলদ চাপা দেও,

শরীর ঢাকো,—বশ, আর চাই কি? এই জন্যই লোকেরা আসে আসে, কিন্তু বসে না। বসিলেও, যে আসে, ঠিক তাকে পাই না। আসিয়াই সে যেন কেমন হইয়া যায়। সে যেন কি ঢাকিতে, কি চাপা দিতেই ব্যস্ত। কি জানি কেন, সে সর্ব্বদা কি যেন লুকাইয়া আমাকে ফাঁকি দিতেই চায়। তার চাহনিতে কেবলই কপটতা,—তার ভালবাসায় কেবলই স্বার্থকণ্টক বা খোসামুদী। সে কিছুতেই সরল প্রাণ বিনিময় করিবার জন্য সোজা হইয়া, উলঙ্গ হইয়া, পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া আমার হৃদয়ে বসিতে আসিবে না! হায়, তবে আর কি হইল?

একবারের অধিক, লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তুমি সঙ্গত সভায় যাও না কেন? সঙ্গত সভা? মিলনের সভা?—না। অসঙ্গত বা অমিলের সভা। একটী লোকের সহিত যে প্রাণে প্রাণে মিলিতে পারে নাই, একটী লোক যার প্রাণের জিনিস হইয়া যায় নাই,—একটী সরল প্রাণে যে ডুবিতে পারে নাই;—সে দশ জন, বিশ জন লোকের মধ্যে ঝাপ দিবে, ডুবিবে, মজিবে?—অসম্ভব কথা। না, আমি প্রবঞ্চনা করিতে, নাম কিনিতে ঐ প্রবঞ্চনার সভায় যাইব না। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম; পুণ্যের নামে পাপ, মিলনের নামে অমিলবাদ, সাম্যের নামে বৈষম্য কিনিতে আমি যাইব না। আসল মত ঢাকিয়া, বাহির-চটক অহং-মত প্রচার করিতে, তোমাদের মনতুষ্টার্থ, আমি যাইব না। প্রবঞ্চনা বলিলাম? আমার রক্ত মাংস ছিঁড়িয়া খাইও না। প্রবঞ্চনা বই কি? স্বাধীন মতের যে লোকেরা আদর করিতে পারে না, ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধা বা আস্থা যাহাদের জন্মে নাই;—যাহারা লোকের সামান্য ত্রুটী ভুলিতে পারে না;—যাহারা উদার বিশ্বজনীন প্রেমের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে; ভ্রাতৃ প্রেমের নামে ভ্রাতৃ-শত্রুতা-গরল হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে, তাদের সম্মুখে ঠক হইয়া যাইব?—বরং অজানিত, গহন বনে একাকী ডুবিয়া মরিয়া যাই, সেও ভাল, তবুও ঐ প্রবঞ্চনায় আমি যোগ দিব না। অন্যের মতের প্রতি উপহাস করিবার জন্য যে বসিয়া রহিয়াছে, তুমি কখনই আশা করিতে পার না যে, সে তোমার নিকট তার মনের খাটী জিনিস বাহির করিয়া দিবে! খাটী জিনিস বাহির করে কয় জন? সরল প্রাণের খাটী কথা বলে কয় জন?—কেবল বাহির লইয়া ব্যবসা, কেবল প্রবঞ্চনার বিনিময় বইত নয়? মিলনের জন্য চেষ্টা করিতেছ, একথা বলিলে বলিতে পার। চেষ্টা সর্ব্বদাই প্রশংসার জিনিস। কিন্তু ইহাকে কিরূপ চেষ্টা বলে যে, তুমি অন্যের হৃদয়ে বসিবে না, অন্যকেও তোমার হৃদয়ে বসিতে দিবে না? অন্যের মতের প্রতি একটুও শ্রদ্ধা করিবে না? অন্যকে একটুও ভালবাসিবে না? অথচ মুখে বলিবে, চেষ্টা করি। এ কিরূপ চেষ্টা? বিশ পঁচিশ বৎসর কেবল সঙ্গত করিতেছ, কিন্তু ফলের বেলা দেখি—শূন্য।—মিলনের বেলায় দেখি, কেবলই শূন্য হাহাকার করিতেছে। বাহ্য মিলন আমি চাই না। আমাকে বাহ্য মিলনের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিও না। একটু দূরে, একটু নির্জ্জনে, একটু হৃদয়পুরে প্রেম-সাধন করিয়া লই, যদি সিদ্ধ হই, তবেই মুখ দেখাইব। বৃথা হই-চই করিতে আমাকে

যাইতে বলিও না। একটী হৃদয়েও যাহার ডুব দেওয়া ঘটে নাই, সে কেমনে ঐ হই-চই, ঐ হুজুগে ভালবাসার বাজারে হুজুগ কিনিতে যাইবে? না—আমি তা পারিব না।

যাদের দোষভুলিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে, তাদের নিকট হইতে একটু দূরে থাকাই ভাল। আমি দূরে দূরে থাকিয়া, তোমার ঐ সরল হাসি, ঐ সরল হৃদয়পটে অঙ্কিত বিশেষত্বময় মহত্ত্ব গ্রহণ করিব। কাছে ঘেসিলে তুমি কি যেন চাপিতে, ঢাকিতেই চেষ্টিত হও। ঢাকিবেই বা না কেন? পৃথিবীতে যে অবিচার!! আমি ত তোমার মতের সম্মান করিতে শিখি নাই। আমি ত তোমার দোষ ভুলিতে পারি নাই। আমার কাছে তোমার সরল মত বলিলে, তোমার মত-শিশুগুলি অযত্নে অনাদরে ঢলিয়া পড়িবে। ছোট কলমের চারা, চায় একটু জল। মানুষের স্বর্গের মতগুলি, চায় একটু বন্ধুর আদর, একটু বন্ধুর উৎসাহ-বারি। তা ভিন্ন মত সজীব হয় না, বাঁচে না, হৃদয়ে থাকে না। উপেক্ষায়, অনাদরে মত বাঁচে না। হায়, আমার কত স্বর্গের মত যে এইরূপে অনাদরে মরিয়া গিয়াছে, তার সংখ্যা হয় না! এইজন্য এখন একটু সাবধান হইয়া বসিতেছি। তাই এখন যাঁর তাঁর কাছে মন খুলিতে পারিতেছি না। একদিনে একবারেই ত সকলে বন্ধু হয় না। সসীম প্রেম দপ্ করিয়া বিশ্বপ্রেম রূপ ধরে না। একটু একটু, বিন্দু বিন্দু—শেষে অনন্ত। কেহ যদি মতের আদরই না করিল, তবে বলিয়া লাভই বা কি? অন্যের উপকার হইবে? আমি তা বুঝি না। আমি বুঝি—কেবল নিজের উপকার। অন্যের উপকার আমি করিব,—এ অহঙ্কার সর্ব্বনাশের মূল। আমি নিজে কাহারও কিছুই করিতে পারি না। আমার সকল মতগুলি মরিয়া যাইলে পৃথিবীর কোন উপকার হইবে বলিয়া আমি জানি না। আমি মতগুলিকে সজীব রাখিতে চাই। মতগুলি একটু যত্ন, একটু উৎসাহ-বারিতে যদি সজীব থাকে, তবেই মঙ্গল হইবে। আজ হউক, কাল হউক, পাঁচ শত বৎসর পরে হউক—সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণে নরনারীর জীবন লাভ হইবেই হইবে। এখন আমি কেবল বাঁচিতে চাই। আমি কেবল অমর হইতে চাই। তোমার মঙ্গল, জগতের মঙ্গল, এসব কল্পনার খেলা লইয়া বড়মানুষ হইতে চাই না। যাহা আমি নই, তাহার বড়াই করিব কেন? আমি না বাঁচিলে এ সব আঁধার, স্বপ্ন। আমি না বাঁচিলে জগতের মঙ্গলসাধন আকাশ-কুসুম। আমার মতগুলিকে রক্ষা করা, এবং আমাকে সজীব রাখা, একই কথা। মত ভিন্ন মানুষ নাই। মত যার আছে, সে ই বাঁচিয়া আছে। যাহার স্বাধীন মত নাই, সে শ্মশানে ভস্ম হইয়া গিয়াছে!

কি সর্ব্বনেশে, কি ভয়ানক অহংজ্ঞান!! কি ভয়ানক মান অভিমানমূলক অহঙ্কার!!!

এই মতগুলিকে সজীব রাখিবার জন্য একটু নির্জ্জন, একটু স্বজন চাই। একটু জীবন, একটু মরণ চাই। একটু আঁধার একটু আলো চাই। একটু সূর্য্যের উত্তাপ, একটু মেঘের বারি চাই। নির্জ্জন ত পাইয়াছি;—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গভীর হইতেও গভীর নিস্তব্ধতাময় হইয়া গিয়াছে,—যে দিকে চাই, হু হু করে কেবল গম্ভীর নিস্তব্ধতা! গভীর হইতেও গভীর। চতু-

দ্দিকে ধূ ধূ করিয়া শ্মশানের আগুন মরণের শেষ-কাহিনী লিখিতেছে। তুমি নাই, সে নাই। কেহ মরিয়াছে, কেহ দূরে পলায়ন করিয়াছে! কিন্তু প্রতারণা-শূন্য স্বজন কিছুতেই পাই না। সে আসে আসে, বসে না; সে কথা বলে বলে, বলে না। কি জানি কেন, সে আমার মতের প্রতি একটু উৎসাহ-বারি ঢালে, ঢালে, ঢালে না। সে বড়ই অন্যমনস্ক। সে বড়ই চতুরতা শিখিয়াছে। সে বড়ই মানুষের ভয়ে ভয়ে চকিতের ন্যায় না ঘেসিয়া, না মজিয়া উঠিয়া যায়। তার প্রাণ সরলতা মাখা পাই না; সে আজও দেহ ঢাকিয়া, প্রাণ ঢাকিয়া আমার ধারে বসিতে চায়। মানুষের এতই ভয়। আমার ভয়ে সে আমার কাছে প্রাণ খুলে না। একজনও খুলে না! কি সর্ব্বনাশ! একজনও প্রাণ-বিনিময় করে না। মত-শিশুগুলিকে বাঁচাইবার জন্য একটু স্বজনের প্রয়োজন, একটু ভালবাসার প্রয়োজন, একটু স্নেহ-বারির প্রয়োজন। তা কিছুতেই পাই না। এই সংসার আঁধার হইয়াছে, তাতে কোনই ক্ষতি নাই, কিন্তু মরুভূমি হইল কেন? এই বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবী নীরব হইল, তায় একটুও ক্ষতি নাই, কিন্তু একটু সরল হৃদয় পাই না কেন? একটু ভালবাসা চাইই। একখানি পা রাখিবার স্থান চাইই। কেবল একবার দেখিব। কেবল একবার মিলিব। এমন ভাবে মিলিব যে, একবার ডুবিলেই অমনি প্রেমের অনন্ত-রাজ্য উন্মুক্ত-দ্বার হইয়া যায়। যে একটু আবরণ রহিয়াছে, যে একটু প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, ঐটুক উড়িয়া গেলেই হয়। তবেই আমি জগতের হইতে পারি। তবেই আমাকে জগতে মিলাইতে পারি। আমার প্রেমের চাবি খুলিয়া দিতে, আমার মত-শিশুগুলিকে বাঁচাইয়া তুলিতে, আমাকে অনন্ত প্রেমসাগরের কূলে লইয়া যাইতে—কেবল একটী প্রেম-প্রতিমা চাই! আমি অনেকক্ষণের জন্য চাই না—একবার, এক মুহূর্ত্ত, তবেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। কিন্তু মানুষ এমনই ভীত এবং চতুর—খোলা প্রাণ লইয়া, স্বচ্ছ দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া, পদ্মপত্রের শিশিরকণার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া, কেহই আদর্শ প্রতিবিম্ব দেখাইতে কাছে ঘেসে না। সে আসে বটে, কিন্তু মানুষের ভয়ে ভয়ে সে প্রাণ খুলে না! সামাজিক শাসন, লোকের শাসন, বন্ধুত্বের কি ভয়ানক অনিষ্ট সাধিতেছে! পৃথিবী প্রবঞ্চনার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে! ভালবাসা—স্বপ্ন, অলীক, আঁধার! মিলন—বিচ্ছেদ-বাণ নিক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত;—সমাজ, হিংসা বিদ্বেষের দাবানলে ভস্মীভূত। সংসারে তবে আর বুঝি আমার থাকা হইল না! সেও আসিবে না, আমিও যাইব না। আমার অহংজ্ঞান, এবং তার অহংজ্ঞান—বড়ই মিলনের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। মিলনের প্রধান শত্রু অহংজ্ঞান। এইটুকু না ভুলিলে মিলন অসম্ভব।

(৩)

"We must be lovers, and at once the impossible becomes posible."

আয় প্রকৃতি, তবে নিঃস্বার্থ প্রেম লইয়া তুই আমার কাছে আয়। আয় আঁধার, আয় আলোক, আয় চাঁদ, আয় সূর্য্য, আয় তোরা সকলে আমার কাছে আয়। আয় প্রকৃতি, তুই তোর অঙ্গাভরণ লইয়া আমার কাছে আয়! আঁধার, তুই আমাকে ঢাক্, আমার অহংজ্ঞান নির্ব্বাণ কর। স্বর্গের জ্যোতি, তুই জগতের উজ্জ্বল রূপ সম্মুখে ধর।

আঁধারে আমিত্ব ডুবাইয়া, আলোকে ইহজগৎ এবং পরজগৎকে দেখিব। দেখিতে দেখিতে, মরণের অতীত হইয়া যাইব! ইহকাল ও পরলোক এক প্রেমে বাঁধা পড়িবে। চাঁদ, তুই তোর ঐ অমিয়া ধারা, ঐ আপন-পর-ভুলানে স্নিগ্ধ মধুর ধারা, ঐ প্রেম-জ্যোস্নায় আমার হৃদয়কে স্বচ্ছ করিয়া দে! তুই যেমন জগতের, আপন ভুলিয়া জগতের, আমাকেও তেমনই করিয়া জগতের করিয়া দে! আয় সূর্য্য, তোর ঐ জ্বলন্ত উত্তাপে আমাকে জীবন্ত শক্তিবলে মাতাইয়া তোল্। জীবনী শক্তি—একমাত্র তোরই আছে। বাঁচা, আমাকে বাঁচাইয়া তোল্। জগৎ আমার নাই বা হইল, কেহ আমার ধারে নাই বা আসিল;—আমি তোদের প্রেমে দীক্ষিত হইয়া ঐ জগতে যাইব,—ঐ জগতে নামিব, ঐ জগতে সুধা ঢালিব! ভাল মন্দ সব ভুলিব। বিষ্ঠা চন্দন সমান হইবে। আয় চাঁদ, আয় সূর্য্য—তোদের ঐ আপন-পর-ভুলানে, ভালমন্দ-সমান-জ্ঞানের তত্ত্ব-সুধায় আমাকে মাতাইয়া দে। সাধে কি প্রকৃতির মিষ্ট হাসি আমার ভাল লাগে?—অবশ্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সাধে কি প্রকৃতি আমাকে টানিতেছে? কে যেন তাকে এমনই করিয়া আমাকে টানিতে ব'লে দিয়াছে! হাসি, হাসি, তোদের ঐ মিষ্ট হাসি সুধুই হাসি নয়। ঐ হাসির মূলে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ। তোদের ঐ সৌন্দর্য্য, ঐ মধুরিমা উদ্দেশ্য-শূন্য নয়। মানুষকে কোন গভীর তত্ত্বে লইয়া যাইবার জন্যই তোদের এত মুখভরা হাসি! জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য; প্রেম-বিহ্বল করিবার জন্য তোদের এত নাচুনি, আর এত হাসি। গোলাপের হাসি-ভরা সৌন্দর্য্য, চাঁদের সুধামাখা হাসির কোমলতা, পাপীয়ার মধুভরা সঙ্গীতের কমনীয়তা, উৎসের জীবন ভরা মৃদু মৃদু তান, মেঘ-ভরা আকাশের ক্ষণবিদ্যুৎ—হায়, সকল মিলিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল! আমি কি থাকিতে পারি?—থাকা হইল না। প্রাণ অস্থির হইয়াছে। হৃদয় ছট ফট করিতেছে। কি যেন আরো চাই, আরো চাই, কিন্তু পাই না। ইচ্ছা হয়, ছুটিয়া ছুটিয়া ঐ অনন্ত গগনে উঠিয়া, ঐ চাঁদকে, ঐ বিদ্যুৎকে আলিঙ্গন করিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শীতল করি। অনন্ত না ছুঁইলে আমার প্রাণ আর বোঝ মানে না। অনন্ত আলিঙ্গনের জন্য প্রাণ পাগল হইছে। আমি প্রকৃতির সহবাসে মজিয়া কি যেন হইয়া গিয়াছি! সাধ, সাধ, অনন্ত সাধ। পিপাসা, পিপাসা, অনন্ত পিপাসা। সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। না—কেবল তাতেও তৃষ্ণা মিটে না। জগতের অতীত স্থানেও প্রাণ ধাইতে চায়। জরা মরণের পরপারে ঐ যে আত্মময় জগৎ, ও জগতেও যাইতে চাই। তবে আমি ইহজগতে যাই, তবে আমি পরজগতে ডুবি। তবে আমি অনন্ত জগতে একবিন্দু মিলাইয়া যাই। শিশির-কণা সাগরে মিশিয়া যাউক। ভালবাসা না পাইয়া ভালবাসিব, রূপ না দেখিয়া মজিব, পরিচয় না লইয়া আসন পাতিব,—যে মরণের পরপারে, তাকেও সমান ভাবে প্রাণে রাখিব, আমি এই চাই! ভালবাসা পাইয়া যে ভালবাসে, রূপ দেখিয়া যে মজে, পরিচয় লইয়া যে আদর করে, সে স্বর্গীয় প্রেমের শাস্ত্র বুঝে নাই। এ জগতে শ্রেষ্ঠ প্রেমিক—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা-ভরা ঐ

প্রকৃতি। কেহ তাদের চায় না, কেহ তাদের ভালবাসে না, কিন্তু তারা সকলের,—তাদের হৃদয় সকলের জন্যই যেন অস্থির !! চেয়ে চেয়ে,শুধু চেয়ে চেয়ে সারাদিন, সারা রজনী—আসে আর যায়। এত ভালবাসা, এত উদার প্রেম—আর কার আছে? প্রকৃতির অহংজ্ঞান অনন্তে বিলীন!

কিন্তু লোকে বলে প্রকৃতি জড়! প্রকৃতি জড়-প্রেমিক? যদি তাই হয়, তবে আমারও জড় হইবার সাধ। আমি চেতনা চাই না, আমি জীবন চাই না। জীবন-মমতা-শূন্য না হইতে পারিলে এমন নিঃস্বার্থ প্রেমিক হওয়া যায় না, তাইত প্রকৃতি জড়। আমিও জড় হইয়া অহংকে জগতের করিব। জড় যদি এত মধুর,এত জীবনপ্রদ; এত প্রেম-বিহ্বল, তবে জড় হওয়াই মহত্ত্ব! জড়ই মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব। কেন বলিতেছি? জড়ের নিজের কোনই ইচ্ছা নাই। তার হাসি, তার ইচ্ছাকৃত নয়। তার ক্রন্দন, ভীতি-প্রযুক্ত নয়। তার ভীবিবিকামর রূপ, অহঙ্কার-প্রসূত মোটেই নয়। কাহারও ইঙ্গিতে সে যেন চলে, সে হাসে, সে কাঁদে, সে ভীষণ রূপ ধরে। মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব তখনই, যখন সে ইচ্ছাকে ডুবাইয়া সেই মহতী ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে ও চলিতে পারে। মানুষ ক্ষুদ্র তখনই, যখন নিজের শক্তিতে দণ্ডায়মান, নিজের ইচ্ছায় চলে; মানুষ মহৎ তখনই, যখন সেই মহতী ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া সে দাঁড়ায়, সে চলে। জড়ের ইচ্ছা নাই, তাই জড় মহত্ত্বের খনি। প্রকৃতি জড়, তাই প্রকৃতি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-মহত্ত্বের প্রতিকৃতি! আর মানুষ চেতনা পাইয়াও অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচ, যখন সে নিজ ইচ্ছায় চলে। আর যখন ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলাইয়া, জড়ের ন্যায়, অনুবর্ত্তী হয়, তখন মানুষ মহান হইতেও মহান। মানুষ তখন প্রকৃতির রাজা;—মানুষ তখন জগতের নেতা! ঐ দেখ ইচ্ছাকে ডুবাইয়া খ্রীষ্ট, নানক, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য জগতে কি আধিপত্য, কি রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন! ইচ্ছা-বিসর্জ্জিত, অহংজ্ঞান-নির্ব্বাপিত মানুষই প্রকৃত প্রেমিক। জড়ের ন্যায় প্রেমিক আর নাই।—না; জড়, জড় নয়।—জড়ের মূলে, আরো মূলে, আরো মূলে যাও—সেখানে আদিশক্তি অথবা প্রেমরূপিনী মা রহিয়াছেন। জড়, জড় নয়,—জড় মায়েরই শক্তি, মায়েরই রূপ—মায়েরই প্রেমের লীলা! মানুষ যখন অহংজ্ঞান (egotism) বিসর্জ্জন দিয়া, এমনই করিয়া লীলাময়ীর হাতের পুতুলের ন্যায় হয়,—তখন মানুষ,—সমস্ত পৃথিবীর পাদচারণার জন্য, ঐ প্রকৃতির ন্যায়,আপন বক্ষ পাতিয়া দেয়। মানুষ তখন জগতের হয়। মানুষ এবং জগৎ, একই হইয়া যায়। অহং তখন অনন্ত-বিস্তৃত। ইহকাল পরকাল, তখন একাকার। কারণ সবই একে স্থিতি করিতেছে।

জড় প্রকৃতির দাস হইয়া, ঐ জড়ের ন্যায়, অহংজ্ঞান-বর্জ্জিত হইতে,এবার বাসনা করিয়াছি। ঐ চাঁদ যেমন সারা রাত্রি জগতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শুধু হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়, আমিও সেইরূপ ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শুধু চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইয়া চলিয়া যাইব! আমি সাগরে ভাসিব,আমি পাষাণে মজিব, আমি চাঁদে জ্বলিব, আমি ফুলে ডুবিব, আমি বিশ্বজগতে বিসর্জ্জিত হইব। এক মুহূর্ত্ত যদি ডুবিতে পারি, আর কিছু চাই না। আমি

সব তুচ্ছ করি—এক বার যদি এই প্রকৃতির ভিতরে ডুবিতে পারি, একবার যদি ক্ষুদ্র 'অহংকে' অনন্ত বিশ্বে বিস্তৃত করিতে পারি। প্রকৃতিই জীবন্ত ভালবাসার ছবি। একবার প্রকৃতিতে ডুবিতে পারিলে অমনই গভীর নিঃস্বার্থ প্রেমের উদয়। একটু প্রেম পাইলে—আর চাই কি? এক বিন্দু প্রেমে সব অসম্ভব সম্ভব হইবে। প্রেম ভিন্ন মানুষের আর কি আছে! ভালবাসা, কেবল ভালবাসা ভিন্ন জড় এবং চেতনের প্রাণের আরামের বস্তু আর কিছুই নাই।

(৪)

"চোখ মেলিলে আঁধার দেখি, চোখ
বুজিলে সলক হয়।
পাগলা কানাইর মরণ করে, নাইকো
কোন ভয় ভয়।"

প্রকৃতি ত শুধুই প্রকৃতি নয়। ডুবিতে ডুবিতে, মজিতে মজিতে—এ কোথায় আসিলাম? এ অনন্তপুর। এখানে সব চিদাকাশ, সব অতলস্পর্শ। চাঁদের হাসি অনন্ত মিষ্ট, সূর্য্যের রশ্মি অনন্ত জীবনপ্রদ, কোকিলের স্বর অনন্ত মধুর, ফুলের বাস—অনন্ত স্নিগ্ধ, সাগরের জল—অনন্ত শীতল। এ অনন্তপুরে গুণের পরিমাণ হয় না। তাপমান ও পরিমাণ-যন্ত্র এ রাজ্যে মিথ্যার খেলা। যে না ডুবিয়াছে, সে পরিমাণ করিতে পারে। কিন্তু যে প্রকৃতির ভিতরে নিমগ্ন, আত্মবর্জ্জিত, পরিমাণ করাকে সে বাতুলের ক্রীড়া বলিয়া জ্ঞান করে। পরিমাণ কিছুরই হয় না। শারদ-পৌর্ণমাসির রজনীতে আকাশে চাহিয়া দেখিয়াছি—দেখিতে দেখিতে পৃথিবী ভুলিয়াছি, আপনাকে ভুলিয়াছি—সব ভুলিয়াছি, তবুও ঐ জ্যোতির পরিমাণ করিতে পারি নাই। সে সৌন্দর্য্য যেন অনন্তেরই প্রস্রবণ। হায়, কোন্ সৌন্দর্য্যের বা পরিমাণ আছে? যার যেমন চোখ, সে তেমনই দেখে। যার যেমন হৃদয়, সে তেমনই ভাবে। বাস্তবিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—সীমাবদ্ধ মোটেই নয়। ক্ষুদ্রের কাছে সে ক্ষুদ্র, মহতের কাছে সে অতি মহৎ। সীমার কাছে সে সীমা, অনন্তের কাছে সে অনন্ত *। সাগরের জল পাত্রে ধর—তাহার আকৃতি আছে, সাগরে ফেলিয়া দেও, সে অকূলে মিশিয়া গিয়াছে! চাঁদের জ্যোতিকে পাত্রে ধর, সে আকৃতি পাইয়াছে, আকাশে ছাড়, সে অনন্ত হইয়া গিয়াছে। চক্ষুমুদ্রিত করিয়া চাঁদের দিকে তাকাও, চাঁদ যেন আকাশে নাই, জ্যোতি নিবিয়াছে; একটু চক্ষু খোল, একটু একটু চাঁদের আলো যেন ফুটিতেছে, দেখিবে। চক্ষুকে আরো ফোটাও, আরো ফোটাও, ঐ দেখ, চাঁদের জ্যোতি আকাশেরও উপরে কোন্ অদৃশ্য জগৎ ছাইয়া অনন্তে ভাসিতেছে। † যার যেমন চক্ষু, সে তেমনই দেখে। সীমা দৃষ্টিতে নাই—সবই চিদাকাশ, সবই অনন্ত। অনন্ত—স্বয়ং ঈশ্বর। অনন্ত সুন্দর প্রকৃতি, অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত রূপ। ‡ অনন্তের কাছেই

* "Nature always wears the colours of the spirit." *Emerson.*

† এমারসন বলিয়াছেন—"Standing on the bare ground,—my head bathed by the blithe air, and uplifted into infinite space,—all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball;—I am nothing; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am part or particle of God."

‡ Truth and Goodness and beauty, are but different faces of the same All."
Emerson.

মানুষ প্রেম ভিক্ষা পায়! মানুষকে যখন মানুষ ভালবাসিতে পারে না, তখন অনন্ত প্রকৃতিতে নিমগ্ন হইয়া মানুষ প্রেমিক হইয়া ফেরে। অথবা যখন মানুষের হৃদয় অহঙ্কারে স্ফীত, মুখ মলিন, জীবন মৃতের ন্যায়, তখনই প্রকৃতি মানুষকে ডাকিয়া এই গভীর তত্ত্ব শিক্ষা দেয়।

বিশ্বের অন্তরালে যে অনন্ত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতরে যে প্রেমের অনন্ত উৎস খেলিতেছে, কার আদেশে কে জানে, তাহাতে মানুষ ডুবিলে তবে আনন্দ এবং প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া সংসারে ফেরে। প্রকৃতিতে মজিয়া মজিয়া মানুষ যখন প্রেমে মাতোয়ারা হয়, তখন এই সংসার তার নিকটে স্বর্গের ন্যায়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম-মাতোয়ারা যাঁহারা, তাঁহারাই জগতে পূজ্য। প্রকৃত প্রেমিকের নিকট—ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, জীবন মরণ সমান। ভেদাভেদ সেখানে থাকে না। মায়ের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। মায়ের মঙ্গল ইচ্ছার জয় সতত সে প্রতি ঘটনায় দেখে। তাঁর প্রাণ মরণের ওপারে ছুটিয়াছে;—তাঁর প্রাণ জীবন মরণের অতীত।

প্রকৃতিকে কখনও ভালবাসে নাই, এমন মানুষের কথা শুনা যায় না। অতি অসভ্য জাতিও প্রকৃতি রপূজা করে। প্রকৃতিতে মোহিত এবং স্তম্ভিত সকলেই,—অল্প বা অধিক পরিমাণে। ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন—"ক্ষুদ্র কারাগৃহের গবাক্ষপথ দিয়া অনন্ত নীলিমাময় আকাশ এবং অনন্ত উর্ম্মিমালাময় সাগর আমার নয়নগোচর হইত, তাহাতেই আমি শান্তি এবং সুখ পাইতাম; এবং মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাখী গৃহে আসিয়া কি যেন অমৃত বা অনন্তের সংবাদ কাণে ঢালিয়া দিয়া চিন্তাকাতর প্রাণকে মাতাইয়া যাইত।" আমি বলি, কেবল তাহা নয়;—ধীরে ধীরে ঐ অনন্ত প্রকৃতিতে ডুবিয়াই ম্যাট্‌সিনি প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন! অস্ত্রাঘাত-শোণিতপাতে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,—দেশের শত শত লোকেরা চক্রান্ত করিয়া ভিক্টর ইমানিউএলকে সিংহাসনে বসাইতেছে—প্রাণতুল্য গ্যারিবল্ডিও প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছেন—কিন্তু তবুও প্রেমাবতার ম্যাট্‌সিনি দেশের মঙ্গল, স্বদেশী ভ্রাতাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন! এই গভীর প্রেমের শিক্ষাগুরু,—ঐ অনন্ত আকাশ, ঐ অনন্ত সাগর এবং ঐ অনন্ত সংবাদ-বহনকারী ক্ষুদ্র পাখী, মনে রাখিবে। প্রকৃতি সেবায় ম্যাট্‌সিনি স্বদেশ-বৎসল। কথিত আছে, প্রকৃতিসাধন-রত লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসর অনাহারে থাকিয়া মেঘনাদ-বধের ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কথাটা প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইবে,—লক্ষ্মণ দ্বাদশ বৎসর প্রকৃতি-সেবায় রত থাকিয়া সিদ্ধ হইয়া অমর হইয়া গিয়াছেন—ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শস্থল হইয়াছেন। শাক্যসিংহ রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অনেক বৎসর অরণ্য বাস করিয়া সিদ্ধ বা বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তার অর্থ—ঐ অনন্ত প্রকৃতির নিকট প্রেমতত্ত্ব শিখিয়া, অহং-বিসর্জ্জন দিতে পারিয়া, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া তিনি মানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট মরণকালে শত্রুদের জন্যও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শত্রুদের মঙ্গলের জন্য দেহপাত করিয়াছিলেন। ইহাপেক্ষা গভীর প্রেমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নাই। এই খ্রীষ্ট—সর্ব্বদাই পর্ব্বতে, জঙ্গলে বাস করিতেন। অনন্ত প্রকৃতি ইঁহারও দীক্ষা-গুরু। অনন্ত প্রকৃতির নিকট প্রেম পাইয়াই যিশু, খ্রীষ্ট

হইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির মূলে এক অনন্ত অধিনশ্বর মহাপুরুষ বিদ্যমান। মানুষ যখনই সংসার কোলাহল ভুলিয়া প্রকৃতির নিকট যায়, তখনই জড়-প্রকৃতির ভিতর হইতে সেই অনন্ত সুন্দর পুরুষ বাহির হইয়া মানুষকে আলিঙ্গন করেন। মুশা তখন বর প্রাপ্ত হন। জন যখন দীক্ষাব্রত উদ্যাপন করেন, খ্রীষ্ট তখন আকাশের আলোক পাইয়া প্রেম-দীক্ষিত হইয়া, অরণ্য হইতে ফিরিয়া সংসারের জন্য দেহপাত করিতে সমর্থ হন। তিনি তখন জগতের, জগৎ তখন তাঁহার। জীবন ও মরণ—তখন তাঁহার নিকট উদ্দেশ্যসিদ্ধির রূপান্তরিত দুটী অবস্থা মাত্র। মরিয়াও তখন তিনি জীবিতের ন্যায়, বাঁচিয়াও তখন তিনি মৃতের ন্যায় ইচ্ছা-বর্জ্জিত জড়-প্রকৃতিক। তুমি প্রেকৃতিতেও ডুবিবে না, মানুষকেও সম্মান করিবে না, অথচ সেই মহাপুরুষকে দেখিবে, প্রেমিক হইবে, এ কেমন কথা? যাও, হৃদয়ে অরণ্য সৃজন কর, পৃথিবীর কোলাহল ডুবাইয়া দেও।—যাও, নির্জ্জন গভীর জীবন্ত প্রকৃতির ভিতরে যাও—সেখানে কেবল বায়ু সো সো বহিতেছে, আকাশে কেবল চাঁদ ফুট্ ফুট্ জ্বলিতেছে, বৃক্ষে কেবল পাতা সর সর শব্দ করিতেছে, পাখী কেবল গভীর তান ধরিতেছে, সাগরে কেবল উর্ম্মিমালা দুলিয়া দুলিয়া তানে তানে উঠিতেছে, পড়িতেছে। যাও, এমন সুন্দর, এজন মন-মুগ্ধকর স্থানে অন্তত একটী রাত্রি বাস করিয়া এস, তারপর দেখিব, তুমি কেমন নাস্তিক, কেমন অবিশ্বাসী, কেমন অপ্রেমিক! প্রকৃতির মধ্যে যে অনন্ত, চিৎ-শক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে লোক কখনও বিশ্বাসী হইতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসী না হইলে প্রেমিক হইতে পারা অসম্ভব। অবিশ্বাসী প্রেমিক, একটীও নাই। অবিশ্বাসীর প্রেম, কল্পনার প্রেম; মৃত জীবের শ্মশানের ভস্মের সহিতই তাহা বিলীন হইয়া যায়! বিশ্বাসীর প্রেম অনন্ত কাল স্থায়ী, অবিনশ্বর—ইহকাল পরকাল ছাইয়া তাহা জ্বলে,—তাহা অনন্ত জগতে অনন্ত-বিস্তৃত। এইরূপ প্রেমিকই পূজ্য। এইরূপ প্রেমিকই ধন্য। এইরূপ প্রেমিকই মিলনের মহাশাস্ত্র বুঝিয়াছে। একে প্রেম, একে বিশ্বাস, একে প্রাণ না সঁপিলে কিছুতেই সেরূপ প্রেমিক হওয়া যায় না। প্রকৃতি সাধনে সিদ্ধ হইলে মানুষ সেই প্রেম, সেই বিশ্বাস—সেই অনন্ত, সেই চিদাকাশ, সেই সদানন্দকে বুকে পায়। বুকের ধন বুকে বসে। শাক্য তখন বুদ্ধ হন, যিশু খ্রীষ্ট হন, মুশা যোগী হন, নিমাই চৈতন্য হন। মানুষ মরিয়া তবে বাঁচিয়া উঠে। মরার অর্থ—অপনাকে ভোলা। অহংবোধ তখন উড়িয়া যায়। "আপনার স্থান" তখন বিশ্ব গ্রাস করে। আমিত্বের বীজ তখন জগতবৃক্ষে পরিণত। মানুষ তখন আপনা-ভুলিয়া জগতের হইয়া গিয়াছে। জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে; দেশে দেশে তখন মহামিলন হয়। ইহকাল পরকাল, তখন একসূত্রে গ্রথিত। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাভেরী তখন একই সাগরে মিশিয়াছে। দেশ কাল, আকাশ পাতাল সব একীভূত! সংসার তখন স্বর্গে উঠিয়াছে, স্বর্গ তখন সংসারে নামিয়াছে। প্রেমের অবতার প্রেম বিলাইতে তখন জগতে অবতীর্ণ হয়। মানুষ তখন প্রেমে হাসে, প্রেমে গায়,

প্রেমে নাচে, প্রেমে যায়। সুন্দর নাই, কুৎসিত নাই, বিষ্ঠা নাই, চন্দন নাই,—শত্রু নাই, মিত্র নাই—জীবন নাই, মরণ নাই, আপন নাই, পর নাই,—সব একাকার। যাকে পায়, সেই বৈকুণ্ঠবাসী মানুষ। তাকেই তখন কোল দেয়। যাকে পায়, তাকেই ধরে। ধরে আর মায়ের রূপ দেখে। মায়ের রূপ দেখে আর সকলকে ধরে। এক রূপ সকল ঘটে—এক রূপ জগন্ময়। জগন্নাথ যখন শ্রীক্ষেত্রে আবির্ভূত। জাতিভেদ তখন উঠিয়া গিয়াছে। বৈষম্য ভেদাভেদ ঘুচিয়াছে। বিচ্ছেদ তখন তিরোহিত হইয়াছে। অধীনতা-নরক তখন ডুবিয়াছে। সকল ঘটে একের বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া, প্রেমিক তখন ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া, প্রেম বিলাইয়া ভক্তি কিনিয়া চলিয়া যায়। তখন সংসারে কেবল মধুর মিলন-সঙ্গীত গীত হয়, সাম্যের বিজয়-ভেরী নিনাদিত হইতে থাকে,—সংসারে স্বর্গের তন্ত্রী বাজিয়া উঠে! সেইই বৈকুণ্ঠ, সেই ই স্বর্গ, সেই ই মুক্তি! জগন্নাথের রূপ দেখিয়া মানুষ তখন তন্ময়ত্ব লাভ করে; আমিত্ব তখন নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ঘরে ঘরে মিলন এবং শান্তির স্বস্তিবাচন হইতে থাকে! সবই সবল, সবই উলঙ্গ, সবই তখন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে;—পিতা পুত্রের মিলন হইয়াছে;—ভ্রাতৃ প্রেম, ভগ্নী প্রেম, বন্ধু প্রেম সব অবতীর্ণ হইয়াছে! সব অসম্ভব সম্ভব হইয়া গিয়াছে। শৃগাল ব্যাঘ্র, সর্প নকুল—একত্রে বাস করিতেছে। হিংসা বিদ্বেষ সব তিরোহিত হইয়াছে! পৃথিবীতে স্বর্গ এবং মিলনের রাজ্য অবতীর্ণ হইয়াছে। মানুষ তখন উন্মাদের ন্যায় অস্থির হইয়া জগতের পরিত্রাণের জন্য ছুটিতেছে। পরস্পর পরস্পরকে তুলিতেছে, আপন পর তখন সমান হইয়া গিয়াছে!!

আপনি সিদ্ধ না হইলে, আপনাকে ডুবাইতে না পারিলে, পরোপকার করা ভণ্ডামী বই আর কিছুই নয়। জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎলাভ করে নাই, অথচ যে জাতিভেদ তুলিয়া দিতেছে, সে মহাভণ্ড,—প্রকারান্তরে যে এক জাতিভেদের স্থলে অন্য জাতিভেদের সৃষ্টি করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান সময়ে তাহাই হইতেছে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতিভেদ তুলিয়া, নববিধানী, সাধারণী ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করিতেছে। এ সকল ভণ্ডামীরই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই। ভিতরে ভক্তি নাই, অথচ নামাবলী গায় দিলেই যেমন প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না, বিশ্বপ্রেমে রঞ্জিত না হইয়া জাতিভেদ তুলিয়া দিলেই সেইরূপ প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায় না। ভিতরে গলদ থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। সকল চেষ্টা পরাস্ত হইয়া গিয়াছে—আরো যাইবে, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ মানুষ লাভ করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইতে না পারে। শোকে সে অধীর হইবে, শ্মশান দেখিয়া সে ভয় পাইবে,—যে প্রকৃত প্রেম পায় নাই। জাতিভেদের অঙ্কুর তাহার মজ্জায় মজ্জায় বিদ্ধ। ঘৃণা বিদ্বেষ—ভেদাভেদ-বোধ তার শোণিত-বিন্দুতে ২ অনুপ্রবিষ্ট! সে কি করিবে? সে সরলতা পায় না—সে ভয়ে ভয়ে চলে, ভয়ে ভয়ে আসে। সে মিলনের স্থান হাজার খুজিয়াও পায় না। আপনাকে লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত। জগতে এইরূপ ভণ্ডামীপূর্ণ, অসরল, অপ্রেমের খেলাই চতুর্দ্দিকে।

প্রেম নাই—অথচ রাজনীতির আন্দোলন,—ভালবাসা নাই, জাতিত্ব গঠনের চেষ্টা। হায়, কি শোচনীয় অবস্থা! একজন লোকও অন্ততঃ একজন লোকের প্রাণে মজিয়া যাইতে পারিল না!! পারিবে কেন? প্রেম-মণির সংস্পর্শ ভিন্ন কখনও মানুষ মহামিলন-শাস্ত্র বুঝিতে পারে না। অবিশ্বাস হাড়ে হাড়ে জড়িত। প্রেমশূন্য, তাই সকলে। যতদিন মানুষ অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার এই প্রকৃতি-সাধনে সিদ্ধ হইবে না, এই প্রকৃতির অন্তরালে লুক্কায়িত যে বিশ্বপ্রেম শক্তি বিদ্যমান, তাঁকে স্পর্শ করিতে না পারিবে, তাবৎ কিছুতেই কিছু হইবে না। অবিশ্বাস যতদিন, অপ্রেম ততদিন। অপ্রেম যতদিন—অসরল ও ঘৃণা বিদ্বেষের অধীন মানুষ ততদিন। ঘৃণা বিদ্বেষ যতদিন, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ততদিন। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই যতদিন—জাতিত্ব গঠন অসম্ভব ততদিন,—অধীনতা ততদিন। অধীনতা যতদিন, রাজনীতি বালকের খেলা ততদিন। সেই শক্তি-সাধনে জয়ী হইতে না পারিলে সব ব্যর্থ। কোন কালে প্রেম ভিন্ন জাতিত্ব গঠন হয় নাই। কোন দিন প্রেম ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয় নাই। কোন দেশ প্রেম ভিন্ন উন্নত হয় নাই। মহামিলনের মহাশাস্ত্র—এই প্রেম। প্রেমময়ীকে স্পর্শ কর—দেখিবে—মাটী সোণা হইয়া গিয়াছে,—সব একাকার হইয়া গিয়াছে। হায়, মানুষ আর কতকাল প্রেমময়ীকে ভুলিয়া মরণের কোলে পড়িয়া কাঁদিবে? কে বলিবে, কতকাল।।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৯ম)

পৌগণ্ডলীলা বিদ্যাবিলাস।

কিছু দিন পরে জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয়-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্বম্ভরের কর্ণ বেধ ও চূড়া-করণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র দিন দিন বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ও সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাল্য চাঞ্চল্য ও দৌরাত্ম্য বুদ্ধির তিরোধান হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলিয়া পিতা মাতা বড় একটা শাসন করিতেন না, অথবা করিলেও বালক তাহা শুনিত না, সেজন্য আরও তিনি প্রশ্রয় পাইতেন। তবে অগ্রজ বিশ্বরূপকে, বড় ভয় করিতেন। পিতা মাতার সম্মুখে বা অন্য পাড়া প্রতিবাসীর বাটীতে কোন দৌরাত্ম্য করিতেছেন, এমন সময় যদি বিশ্বরূপ সেখানে যাইতেন, বা কেহ তাঁর আগমনের কথা বলিত, অমনি সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইতেন।

'পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়;
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়।'

চৈঃ ভা ১ খণ্ড ৬ অধ্যায়।

গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া নিমাই কিরূপ দৌরাত্ম্য করিতেন ও প্রতিবাসী-গণ উপক্রুত হইয়া কিরূপে জগন্নাথের নিকট অভিযোগ করিতেন, তার ছবি চৈতন্যভাগবতকার অতি সুন্দর রূপে

আঁকিয়া গিয়াছেন, এই দেখুন—

"শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব।
ভালমতে না পারি করিতে গঙ্গাস্নান;
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান।
আরও বলে "কারে ধ্যান কর এই দেখ!
কলি যুগে মুক্তি নারায়ণ পরতেক।"
কেহ বলে মোর শিব লিঙ্গ করে চুরি;
কেহ বলে, মোর লয়ে পলায় উত্তরী।
কেহ বলে পুষ্প দুর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন
বিষ্ণু পুজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন;
আমি করি স্নান এথা বৈসে সে আসনে;
সব খাই পড়ি তবে করে পলায়নে।
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া,
ডুব দিয়া লয়ে যায় চরণে ধরিয়া।
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোবায় গীত পুঁথি।
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার,
কাণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার।
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কাঁদে চড়ে,
"মুক্তিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে।"
স্নান করি উঠিলেই বালি দেয় অঙ্গে,
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে।
স্ত্রী বাসে পুরুষ বাস করয়ে বদল,
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল।
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে,
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কি মতে?"

বালিকারা ক্রোধ ভরে শচী দেবীর নিকটে যাইয়া কি বলিয়া ভৎসর্না করিতেছেন, দেখুন—

'কোপ মনে সকলেতে বলেন বচন,
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করণ।
বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ;
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ।
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল,
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল।
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল,
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে;
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার?
পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার;
সেই মত তোমার পুত্রের ব্যবহার।
দুঃখে মাত্র বাপেরে বলিব যেই দিনে;
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা সনে।
নিবারণ কর ঝাঁট আপন ছাওয়াল;
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম নহিবেক ভাল।

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৫অধ্যায়।

শচীদেবী সেই সকল বালিকাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতেন যে, নিমাই আসিলে তাহাকে দণ্ড করিবেন ও বাঁধিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে সে আর ওরূপে উবদ্রব করিতে পারিবে না, এবং নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া বালিকাদিগকে বিদায় করিতেন। মিশ্রচন্দ্রও প্রতিবেশীগণকে নানারূপ মিষ্ট বাক্য দ্বারা বিদায় করিতেন ও বলিতেন যে, নিমাই যেমন আমার পুত্র, সেইরূপ আপনাদেরও ছেলে, আমার শপথ, তাহার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

একদিন মিশ্রবর জাহ্নবী জলে বিশ্বম্ভরের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে পাইয়া ক্রোধ ভরে হাতে যষ্টি লইয়া শাসন করিতে চলিলেন। দূর হইতে চতুরচূড়ামণি নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া বালকগণের কাণে কাণে, পিতার সমক্ষে, তিনি স্নানে আইসেন নাই, এই কথা বলিতে বলিয়া অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিলেন। জগন্নাথ বালকগণকে

জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ব্ব শিক্ষিত মতে উত্তর করিল যে, 'কই আজ তো নিমাই স্নানে আইসেন নাই! এই দেখুন, আমরা সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি!' ইহা শুনিয়া মিশ্র আরও কোপাবিষ্ট হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে এদিক ও দিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং কোথাও পুত্রের দেখা না পাইয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, 'ভয় পাইয়া নিমাই পলায়ন করিয়াছে। আপনি আজ যান, আর যদি চঞ্চলতা করে, তবে আমরা তাহাকে ধরিয়া দিব। মিশ্র অগত্যা বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলে। মিশ্র দেখিলেন, অন্যান্য দিনের ন্যায় বিশ্বম্ভর হস্তে লিখন সামগ্রী লইয়া পাঠশালা হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া জননীর নিকট তৈল চাহিতেছেন; তাঁহার অঙ্গে কালির-বিন্দু সকল শোভা পাইতেছে, স্থানে স্থানে ধূলা লাগিয়াছে, পূর্ব্ব পরিধেয় বস্ত্র সেইরূপ রহিয়াছে এবং শরীরে স্নানচিহ্ন মাত্র নাই। পিতা পুত্রকে স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বম্ভর! দেখ তোমার নামে প্রতিবাসীগণ কত দৌরাত্ম্যের কথা বলে; কেন তুমি লোকের প্রতি ওরূপ দুর্ব্ব্যবহার কর; আর কেনই বা দেবতা পূজার দ্রব্যাদি অপহরণ কর? দেবতা বলিয়া কি তোমার ভয় নাই?

পুত্র উত্তর করিলেন,—

প্রভু বলে বলে আজ আমরা নাহি যাই স্নানে
আমার সঙ্গে যত শিশু গেল আগুয়ানে।
সকল লোকের তারা করে অনাচার!
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার;
সত্য তবে করিব সবার অনাচার।
সেই বিষ্ণু জানে দোষ নাহিক আমার।

ইহা আছুরে ছেলের জেদের কথা। সঙ্গী বালকগণ ও দর্শকমণ্ডলী তাঁহার চতুরতার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

'সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চতুর!
ভাল এড়াইলে আজি মারন প্রচুর।

ধর্ম্মসংস্কারক ও প্রেমিক চূড়ামণি চৈতন্যদেবের বাল্য জীবনের এই মিথ্যা মিশ্রিত চাতুরী সম্বন্ধে পাঠক মহাশয় কি মত প্রকাশ করিবেন, জানি না। মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে আচার ব্যবহারের প্রতি যেন একটু দৃষ্টি রাখিয়া মত প্রকাশ করেন, আমাদের এই অনুরোধ। বিশেষ বাল্য জীবনের কথা, সেটাও মনে রাখা উচিত। আসল ঘটনা কি, তাহা জানি না। বৃন্দাবন দাস মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এখানে বিবৃত হইল। তিনি ও বৈষ্ণবমণ্ডলী এই ঘটনাটীকে অন্য চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহারা ইহার মধ্যে অলৌকিকত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব দেখিয়াছেন। শচী জগন্নাথের মুখে গ্রন্থকার এইরূপ বলিতেছেন,—

"এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে।
যে যে কহিলেক কথা সবই মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে?
এবুঝি মানুষ নহে শ্রীবিশ্বম্ভর,
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর?
কোন্ মহাপুরুষ বা কিছুই না জানি!"

এই সময়ে পরিবার মধ্যে এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া পড়িল; কাল মেঘে সূর্য্যালোক

আচ্ছন্ন করিল। জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ পরিণয়ের কথা শুনিয়া গৃহ সংসার পরিত্যাগ করত সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন ও সন্ন্যাস গ্রহণের স্থলের বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবের ৭ম সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই নিদারুণ ঘটনায় পিতা মাতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; বিশ্বম্ভরও ভ্রাতৃ বিরহে অনেক ক্রন্দন করিলেন। কথিত আছে যে, তিনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণও বিশ্বরূপের বিরহে অনেক বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রতিবাসী আত্মীয়গণ নানা প্রকারে শচী জগন্নাথকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, তাহারা বলিতেন যে, যে কুলে একটী পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সে গোষ্টির সকলেই উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন; তাহাতে খেদ করা উচিত নহে। বিশেষত, বিশ্বম্ভরের ন্যায় চারি পুত্র বিদ্যমান, তাহার দুঃখের বিষয় কি? এই ঘটনা বিশ্বম্ভরের চরিত্রেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনিয়া দিলে। ভ্রাতার সন্ন্যাসের পর নিমাইকে আর কেহ পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চলতা করিতে দেখিতে পাইত না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বাল চাপল্য ক্রীড়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীর ও শান্তভাবে সর্ব্বদা পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিতেন ও তাঁহাদের সেবা সুশ্রুষায় তৎপর থাকিতেন। তিনি বলিতেন;—

"ভালহৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল,
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।
আমিত করিব তোমা দোঁহার সেবন।"

চৈঃ চঃ আদিঃ ১৫ পর।

এই সময়ে এক দিন গৌরচন্দ্র বিষ্ণু নৈবেদ্যের তাম্বুল চর্ব্বন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতা মাতা আস্তে-ব্যস্তে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে এক অদ্ভুত কাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, বিশ্বরূপ আসিয়া যেন আমাকে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার পিতা মাতা অনাথ, বিশেষত আমি বালক, আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস করিতে পারিব না, গৃহস্থ থাকিয়া পিতা মাতার সেবা করিব। তখন বিশ্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। আর এক দিন মাতাকে একাদশী তিথিকে অন্ন ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

মানুষের চির দিন কখন সমান যায় না, সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ, জগতের নিয়ম। অল্পে অল্পে শচী জগন্নাথের পুত্রবিরহ-শোক মন্দীভূত হইয়া আসিল। এ দিকে বিশ্বম্ভরও অধিক মনোযোগের সহিত অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তি এত সুতীক্ষ্ণ ছিল যে, একবার যে সূত্র পড়িতেন বা ব্যাখ্যা শুনিতেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না, ক্রমে ক্রমে তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা ও মেধা শক্তির কথা সর্ব্বত্রে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবাসীগণ সকলেই একবাক্যে পিতা মাতার নিকট গৌরের অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তির প্রশংসা করিতেন।

'সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে,
তুমিত কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে।
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে,
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবানে।

শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে ;
তার ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে।'
চৈঃ ভাঃ

এই প্রশংসাবাদ শ্রবণে জননীর মনে আনন্দ ধরিত না। কোন্ জননীর তাহা না হয়? কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ইহা শুনিয়া অতি ভীত ও শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে এই ভয় হইল যে, বিশ্বরূপও শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বম্ভরও কি তাই করিবে? এই মনোভাব তিনি একদিন সহধর্ম্মিনীকে জানাইলেন:—

'শচীপ্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর ;
এই পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর।
এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্ব শাস্ত্র ;
জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র।
সর্ব্বশাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর
অনিত্যসংসার হৈতে হইলা বাহির।
এই যদি সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈবে গুণবান্ ;
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান।
এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন ;
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ।
'অতএব ইহার পড়ার কার্য্য নাই ;
মূর্খ হয়ে ঘরে মোর রহুক নিমাই।
চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৬ অধ্যায়

শচীদেবী স্বামী অপেক্ষা অনেক উদারভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—

'শচীবলে মূর্খ হয়ে জীবেক কেমনে?
মূর্খেরে কন্যা নাহি দিবে কোন জনে।

অবশেষে পিতার মতই প্রবল হইল। জগন্নাথ বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, সেই দিন হইতে তাঁহার পাঠ বন্ধ হইল, তিনি আর পড়িতে পাইবেন না। গৌরচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অগত্যা পড়া বন্ধ করিলেন। পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু পাঠ বন্ধ করায় হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকার জন্য নিমাইয়ের দুষ্ট সরস্বতী আবার স্কন্ধে চাপিল। আবার তিনি অশেষ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। এবার কিছু দুষ্টামির মাত্রাও বাড়াইয়া দিলেন। সম্মুখে যাহা দেখিতেন, তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন ; পূর্ব্বে কেবল দিবাভাগে ক্রীড়াদি করিতেন, এখন রাত্রিতেও আর বাটীতে থাকিতেন না। পাড়ার দুষ্ট বালক জুটাইয়া কত রকমের নূতন নূতন খেলা খেলিতে লাগিলেন। দুইটী বালক একত্রিত হইয়া কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বৃষের ন্যায় হইতেন ও অন্ধকার রাত্রে লোকের কদলী বাগানে বা কার বাড়ীতে যাইয়া গাছপালা ভাঙ্গিতেন। গৃহস্বামী গরু বিবেচনায় লগুড় হস্তে তাড়াইতে আসিলেই খল খল করিয়া হাসিয়া পলায়ন করিতেন। আবার গৃহস্থ ঘরে কপাট দিয়া শয়ন করিয়া আছে, বাহির দিক দিয়া শৃঙ্খল টানিয়া বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেন। রাত্রে তাহাদের শৌচ প্রস্রাব করা দায় হইত। একদিন জগন্নাথ কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন, নিমাই পাড়ার বালকগণে পরিবৃত হইয়া খেলিতে খেলিতে বাটীর নিকটস্থ গর্ত্ত মধ্যে উচ্ছিষ্ট হাণ্ডীর উপর যাইয়া বসিলেন ও তাহার কালী লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। জননী এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া সেখানে আগমন করত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন ; ও আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, উচ্ছিষ্ট হাণ্ডী স্পর্শে মানুষ যে অশুচি হয়, এ জ্ঞানও

কি তোমার এতদিনে জন্মিল না। গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন :—

'প্রভু বলে তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে;
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিবে কি মতে ?
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান;
সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান।"

তাঁহার জননী তাঁহাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে বলিলেন, বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন যে, যে হাঁড়িতে বিষ্ণুর অন্ন পাক হইয়াছে, তাহা স্পর্শে কি কখন কেহ অশুচি হইতে পারে। বিশেষত আমার সংস্পর্শে কিছুই অশুচি থাকিতে পারে না। মাতা স্নানের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, শচীনন্দন বলিলেন যে,—

—যদি তোরা না দিস্ পড়িতে,
তবে মুঞি নাহি যাঙ্ কহিল তোমাতে।

ইহা শুনিয়া প্রতিবাসীগণ সকলেই শচী জগন্নাথকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন যে, লোকে কত যত্ন করিয়া আপন পুত্রকে পড়ায়, আর এবালক পড়িবার জন্য এত যত্নবান্। ছেলে মূর্খ করিতে আপনাদের এমন কুবুদ্ধি কে দিয়াছে ? বালকের তো কিছুমাত্র দোষ দিতে পারি না।

তখন সকলে গৌরাঙ্গকে সান্ত্বনা করিয়া স্নান করাইলেন এবং জগন্নাথ আসিলে সকলে অনুরোধ করিয়া ও বুঝাইয়া পুনরায় বালকের পাঠারম্ভ করিয়া দিলেন, নিমাই মহা উৎসাহ সহকারে পুনর্ব্বার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে উপনয়নের বয়স নিরীক্ষণ করিয়া মিশ্র মহাশয় শুভ দিন দেখিয়া বালকের যজ্ঞোপবীত দিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে একটী মহোৎসব হইল। গৌরের চূড়াকরণের সময় হইতেই আর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বোধ হয়, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, উপনয়নের পর বিশ্বম্ভরের অধ্যয়ন ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এত দিন পর্য্যন্ত তিনি ঘরে বসিয়া পড়িতেন, এক্ষণে গোষ্ঠী মধ্যে যাইয়া পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবদ্বীপের গঙ্গাদাস পণ্ডিত একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার টোলে অনেক শিষ্য পড়িত। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ টোলে পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মিশ্রমহাশয় পুত্র সঙ্গে পণ্ডিতজীর নিকটে গমন করিলেন ও পুত্রকে টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই গঙ্গাদাস নিমাইয়ের আশ্চর্য্য মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং সকল শিষ্যের শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলেন। বালকেরা কেহই তাঁহার সঙ্গে ফাঁকিতে আঁটিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে গৌরচন্দ্র সকল শিষ্যের চালক হইয়া উঠিলেন। এই টোলে তাঁহার ভাবীধর্ম্মবন্ধু মুরারিগুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি পড়িতেন। তাঁহাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গের এই খান হইতেই বন্ধুত্ব জন্মে। তখন নবদ্বীপে এই নিয়ম ছিল যে, পাঠান্তে টোলের পড়ুয়াগণ দল বাঁধিয়া স্নান করিতে যাইতেন এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর তর্ক বিতর্ক চলিত। গৌরাঙ্গ-প্রমুখ গঙ্গাদাসের ছাত্রগণকে আর কোন টোলের ছাত্রেরা বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। নিমাই এক ফাঁকির বিবিধরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকলকে

ঠকাইয়া দিতেন। প্রথমে একরূপ অর্থ করিয়া বুঝাইয়া, আবার সেই অর্থ খণ্ডন করত অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে বিপক্ষ বালকেরা বড়ই অপমানিত বোধ করিত। দুষ্ট নিমাই ইহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; নানারূপ ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা তাহাদিগের সহিত কলহ করিতেন; তাহাদের গায়ে বালি জল দিতেন ও বিবিধ প্রকার নির্যাতন করিতেন। ফলত, তাঁহার দলস্থ পড়ুয়াদিগকে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

'প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব চঞ্চল;
পড়ুয়াগণের সহ করয়ে কোন্দল।
কারে বলে তোর গুরু কিবা বুদ্ধি তার?
কারে বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার।
এই মত অন্নে অন্নে হয় গালাগালি;
তবে জল ফেলাফেলি তবে দেয় বালি।
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে;
কর্দ্দম ফেলিয়া কার গায়ে কেহ মারে। চৈঃ ভাঃ

পুনশ্চ—

"পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়;
এই মতে প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়।
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই;
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই।
প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি;
এক ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি।
যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ারগণ;
তারা বলে কলহ করহ কি কারণ?
জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কেমন বুদ্ধি।
বৃদ্ধ পাঁজি টীকার কে জানে দেখি শুদ্ধি?
প্রভু বলে ভাল ভাল এই কথা হয়;
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়।
কেহ বলে এত কেন কর অহঙ্কার,
প্রভু বলে জিজ্ঞাসহ যে চিত্ত তোমার।
ধাতু সূত্র বাখানহ বলে সে পড়ুয়া;
প্রভু কহে বাখানি যে শুন মন দিয়া।
সর্ব্বশক্তি সমন্বিত প্রভু ভগবান্,
করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ।
ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা বচন;
প্রভু বলে এবে শুন করি যে খণ্ডন।
যত বাখানিল তাহা দূষিল সকল।
প্রভু বলে স্থাপ এবে কার আছে বল?
ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা বচন;
প্রভু বলে শুন এবে করিব স্থাপন।"

চৈঃ ভাঃ আদি ৭ অধ্যায়

এই সময়ে গৌরচন্দ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। স্নানান্তে বাটীতে আসিয়া বিষ্ণু পূজা করিতেন, পরে আহারাদি করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তক লইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন এবং সহস্তে পুস্তকাদি লিখিতেন ও টীপ্পনি দিতেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের এই রূপ বিদ্যামত্তা ও বিদ্যোপার্জ্জনে গাঢ় নিপুণতা দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, পূর্ব্ব হইতেই, বিশ্বম্ভর সম্বন্ধেও তাঁহার চিত্তে একটা আতঙ্ক জন্মাইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া অলক্ষিত ভাবে ঐ ভাব ছায়া তাঁহার মনে পড়িত; অনেক চেষ্টা করিয়াও মন হইতে তাহা দূর করিতে পারিতেন না। ইহার মধ্যে এক দিন স্বপ্ন দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সাশ্রু নয়নে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন নিমাই শিখা মুণ্ডন করিয়া অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছেন, ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া দুই

নয়নের জলে ভাসিতেছেন, অদ্বৈতাদি সকলে যেন নিমাইকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন ও নিমাই যেন নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। শচী স্বামীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, যে বিশ্বম্ভর যেরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে পুঁথি ছাড়িয়া তিনি যে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, তাহা সম্ভবপর নয়। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি বা কানভট্ট শিরোমণি ও স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি এক জন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। বিদ্যারম্ভ কালে তিনিই বলিয়াছিলেন যে, আগে 'খ' কি অন্য বর্ণ না বলিয়া 'ক' কার উচ্চারণের আবশ্যকতা কি? রঘুনাথ যখন পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, সেই সময় তিনি যে বাটীতে থাকিতেন, সেই গৃহের স্বামী নবদ্বীপের প্রথম নৈয়ায়িক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম বিশারদ তাঁহাকে একদিন তামাক খাইবার জন্য আগুন আনিতে বলিয়াছিলেন। রন্ধনশালায় ভট্টাচার্য্য-পত্নী পাক করিতেছিলেন, বালক রঘুনাথ তাঁহার নিকট অগ্নি চাহিলে, তিনি হাতায় পূর্ণ প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার দিতে গেলেন। বালকের হাতে কোন পাত্র ছিলনা; সে আপন প্রত্যুৎপন্নমতিবলে অমনি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এক অঞ্জলি ধূলা লইয়া তদুপরি অগ্নি দিতে বলিল। ভট্টাচার্য্য বালকের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, এই রঘুনাথ শিরোমণি একদিন এক জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া বাঁশতলায় একটী মাদুর পাতিয়া তদ্গত চিত্তে পুঁথি দেখিতেছিলেন। পিঠে কাকে মলত্যাগ করিয়াছে, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। গৌরচন্দ্র বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে স্নান করিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে আপন আর্দ্রবস্ত্রের জল ২। ৪ ফোঁটা রঘুনাথের পৃষ্ঠে দিলে তাঁহার চৈতন্য হইল ও তিনি গৌরাঙ্গের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন যে—'কি হে নিমাই, ব্যাপারটা কি?'

নিমাই উত্তর করিলেন 'পিঠে যে কাকে বাহ্যে করে দিয়েছে, তাও কি মনে নাই?'

রঘু। পড়া শুনা করিতে হইলে একটু মনোযোগ না দিলে হবে কেন? তোমার মত ভেসে ভেসে বেড়ালে কি পড়া হয়?

বিশ্বম্ভরও একটু অহঙ্কারব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন 'তোমার চিন্তার বিষয়টা জানিতে পারি না কি?

রঘু। তুমি তাহার কি বুঝিবে?

নিমাই। বলইনা কেন, শুনিতে হানি কি?

রঘুনাথ তখন সেই প্রশ্নটী ব্যাখ্যা করিলেন ও তাহাতে যে পূর্ব্ব সাক্ষ্য হইতে পারে, তাহাও বলিলেন। আবার ঐ পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসাও বলিয়া দিলেন। এইরূপ সপ্তম মীমাংসা পর্য্যন্ত বলিয়া যেখানে সন্দেহ ছিল, তাহা বিবৃত করত গর্ব্বের সহিত বলিলেন যে "কি মীমাংসা কর, দেখিব।" বিশ্বম্ভর অম্লান বদনে কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর দিলে রঘুনাথ অবাক্ হইয়া গেলেন। তদবধি তিনি বিশ্বম্ভরের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইতেন।*

* এই গল্পটী কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই। নবদ্বীপের কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম।

এই সময় হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে নিমাইয়ের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি হইতে লাগিলে। তিনি এখন কেবল যে পড়িতেন, তাহা নহে; টোলে অন্যান্য ছাত্রদিগকে পড়াইতেও লাগিলেন। মুরারি গুপ্ত তাঁহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট পাঠ লইতে লজ্জা বোধ করিতেন; সে জন্য গৌরাঙ্গ কত প্রকারে গুপ্তকে ব্যঙ্গ করিতেন।

'প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়;
লতা পাতা নিয়া গিয়া রসী কর দৃঢ়।
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি;
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহে ইথি।'

চৈঃ চাঃ আঃ ৯ঃ অঃ।

বাক্যযন্ত্রণায় মুরারি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার নিকট পাঠ চাহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে পরিবার মধ্যে একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, যদ্দারা বিশ্বম্ভরের ভাবী জীবনের গতি আর এক রূপ আকার ধারণ করিল। এই বৃত্তান্ত পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

শ্রীজগদীশ্বর

কি হ'ল আমার?

আহা কি হ'ল আমার?
ছিল যে হৃদয় মম, নির্ম্মল দর্পণ সম,
অকলঙ্ক—অতিস্বচ্ছ—অতি পরিষ্কার!
কোন চিন্তা কোন দিন, করে নাই বিমলিন
এমন গভীর—ঘন—গাঢ় অন্ধকার!
কোন দিন এত বেগে, গর্জ্জে নাই মেঘে মেঘে
এত বজ্রে ভাঙ্গে নাই এ হৃদয় আর,
আহা কি হ'ল আমার?

১

আহা কি হ'ল আমার?
বুঝিয়া বুঝিনা যেন, কি হ'ল কি হ'ল কেন
পরাণে পড়িল এসে ছায়া খানি কার!
কার এ বিশাল ছায়া, কার এ বিরাট কায়া,
দেব কি দানব মায়া বুঝিনা তাহার!
সমস্ত হৃদয় যোড়া, বুক ভরা আগা গোড়া
ঢাকিয়া ফেলেছে বিশ্ব জগৎ সংসার!
আহা কি হলো আমার?

২

কি হ'ল আমার? আমি দেখি না আমারে,
সমস্ত হৃদয় রাজ্য ভরা দেখি তারে!
নাহি প্রাণ নাহি মন, কত করি অন্বেষণ—
ডুবিয়া গিয়াছি তার ছায়া অন্ধকারে!
যে দিকে—যে দিকে চাই, চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই—
তাহারি প্রতিমা-মাখা যারে দেখি তারে।
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমারে?

কার ও মধুর মুখ বিধুর শোভায়
পূর্ণিমার রে'তে ফোটে আকাশের গায়?
কার ও নয়ন বাঁকা, কমলে রয়েছে আঁকা,
অমর অমৃত মাখা স্নেহ মমতায়?
জলন্ত হৃদয়ে মম, শীতল চন্দন সম
সরস পরশ কার বহে মলয়ায়?
কেগো এ আকুল প্রাণে, শ্যামা কোকিলার গানে
মধুর মদিরা ঢালে সংগীত সুধায়?
সায়াহ্ন মধ্যাহ্ন কিবা, কিবা নিশি কিবা দিবা
পর্ব্বতে পাষাণে বনে তরু লতিকায়,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু, অকূল সমুদ্র সিন্ধু,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভরা কাহার ছায়ায়?
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমায়?

কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ ?
সশঙ্কে—সভয়ে হায়, এত যত্নে কার পায়
আপনি সাধিয়া দিছি আত্ম-বলিদান ?
মনের মহত্ত্ব যত, দিয়াছি জন্মের মত,
ভুলিয়া গিয়াছি হায় মান অপমান,
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ ?

৫

কেগো দেবি—হৃদয়ের রাজ রাজেশ্বরী
পাতিয়াছ সিংহাসন, আচ্ছাদিয়া প্রাণ মন
মৃত এ আশারে হায় শবাসন করি ?
এ দগ্ধ শ্মশান দেশে, এই ভস্ম অবশেষে
কে গো এ অনল মাখা আনন্দ লহরী ?
কি আছে কি দিব আর, দেবযোগ্য উপহার,
যাও এ শ্মশান রাজ্য যাও পরিহরি,
যাও এ সরল বুকে সর্ব্বনাশ করি !

৬

যাও সর্ব্বনাশ করি, নাহি পারি আর
এমন আগ্নেয়ী মূর্ত্তি পূজিতে তোমার !
সশঙ্কে—আতঙ্কে—ত্রাসে, এত উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাসে,
এত অশ্রুজল আর এত হাহাকার,
পারিনা—পারিনা হায়, নিত্য এত লাঞ্ছনায়
অর্পিতে চরণে হেন পূজা উপহার !
পারি না আগ্নেয়ী-মূর্ত্তি পূজিতে তোমার !

৭

আনন্দ উল্লাসময় সরল হৃদয়,
নাহি ছিল কোন চিন্তা নাহি ছিল ভয় !
আপনি আপন মনে, সমস্ত হৃদয় সনে
আপনি বেসেছি ভাল আপন হৃদয় !
পরাণে লাগেনি দাগ, করি নাই আত্মত্যাগ—
করিনি শান্তির সনে অশ্রু বিনিময় !
কিন্তু আজি কার ছায়া, কার এ বিরাট কায়া,
কার এ বিশাল মূর্ত্তি জ্যোতিঃ মণিময় !
এত দয়া এত স্নেহ, কার এই দেবদেহ
লইল হৃদয় রাজ্য করি পরাজয়,
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল হৃদয় ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব—টোল ও চতুষ্পাঠী।)

বঙ্গদেশের টোল সমূহে সংস্কৃতের কিরূপ অনুশীলন হইতেছে, টোল সমূহে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অবস্থা কিরূপ ও তাহাতে সংস্কৃত চর্চ্চার কতদূর সহায়তা করিতেছে, শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃতের বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনোদিত হওয়া সম্ভবপর কি না, টোলের ছাত্রমণ্ডলী কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি পুস্তক সচরাচর পাঠ করিয়া থাকেন, এবং কি কি বিষয়ের সবিশেষ চর্চ্চা হওয়া প্রার্থনীয়, এই সকল বিষয়ে অদ্য সংক্ষেপে কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকবর্গ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন এই বিষয়ের ভার উপযুক্ত লোকের হস্তে ন্যস্ত দেখিলে সুখী হইতাম ইতি পূর্ব্বে নব্য-ভারতে* মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় টোলের লেখা পড়া শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভরসা করিয়াছিলাম, তিনি পুনর্ব্বার আমাদিগকে এই অনালোচিত ও অনাদৃত বিষয় সম্পর্কে অনেক সারগর্ভ কথা লিখিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরি-

* নব্যভারত—দ্বিতীয়খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

চয় প্রদান করিবেন। অনেককাল সোৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইলাম। তাহাতেই লেখকের এই যৎসামান্ত উদ্যম। উপযুক্ত লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ যাহাতে এই চির-অনাদৃত-বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, এবং টোলগুলির অস্তমিত গৌরব একেবারে লুপ্ত না হইয়া, যথোচিতরূপে ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া দেশ মধ্যে সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারেরও যথাযোগ্য সহায়তা করে—ইহাই লেখকের ঐকান্তিক বাসনা। ভগবান্ তাহার এই বাসনা কি কালক্রমে কার্য্যে পরিণত করিবেন না? ধনী, জ্ঞানী, স্বদেশে হিতৈষী মহোদয়েরা টোলগুলির সংস্কার ও উন্নতি কল্পে মনোযোগী হইলে তাহার বাসনা পরিপূর্ণ হইবে।

টোলের শিক্ষাপ্রথা ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে প্রথমত প্রচলিত হয়, তাহা নিশ্চয় রূপে বলিবার উপায় নাই। কারণ প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথা ভারতভূমে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সময় হইতে ইহা আবহমানকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীনকালে গ্রন্থ-লিখন-প্রথা প্রচলিত ছিল না। যখন অভ্রভেদী হিমালয়ের পদপ্রান্তস্থিত পুণ্যসলিলা সিন্ধুনদীর পবিত্র-বারি-বিধৌত পুণ্যভূমি পঞ্চনদপ্রদেশে অপরিজ্ঞেয় কোন কারণে আর্য্যগণ প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন পুরঃসর ভারতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, বেদের সুমধুর সঙ্গীতে আপনাদের অভীষ্ট দেবতাগণের গুণকীর্ত্তনে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেন, অমৃত্যনিস্যন্দিনী অপূর্ব্ব গীতিরচনা দ্বারা পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীবর্গের পর্য্যন্ত মন প্রাণ আকৃষ্ট করিতেন, তখন লিখনপ্রণালী সৃষ্ট হয় নাই। ভাষার পরিপুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন না হইলে লিপিনৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। দেবভাষা সংস্কৃত তখন কবিশ্রেষ্ঠ ভাবাবেশ মুগ্ধ মহর্ষিগণের কণ্ঠে কণ্ঠে বিচরণ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল, ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হইতেছিল। মহর্ষিগণ স্ব স্ব রচিত সঙ্গীতাবলী স্ব স্ব শিষ্যবর্গ ও স্বগণদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। সেই সকল সঙ্গীতাবলী একত্র সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান সংহিতাকার ধারণ করিয়াছে। বেদ একজনের রচিত গ্রন্থ নয়। ইহা বহু কবির বিরচিত সঙ্গীতাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র। বেদের অপর নাম শ্রুতি। যাহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করা যায়, তাহারই নাম শ্রুতি। সমুপযুক্ত ছাত্রবর্গকে যে মুখে মুখে বেদ শিক্ষা দেওয়া হইত, বেদের 'শ্রুতি' নামও তাহার অন্যতর প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের মতানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদি তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহাদের বংশধর ও শিষ্যবর্গ দ্বারা কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া একবিধ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় সমুপযুক্ত ও সুবিজ্ঞ ঋষিগণ দ্বারা উক্ত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ সংগৃহীত হইয়া ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইতে লাগিল।০ এই রূপেই বেদ চারি প্রধান ভাগে বিভাজিত

হইয়া, প্রতিভাগ আবার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের প্রদত্ত উপদেশানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ঋগবেদ শাকল ও বাস্কল, এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। শেষোক্ত শাখা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঋগবেদ সংহিতা শাকল শাখার অন্তর্ভুক্ত শৈশিরীয় প্রশাখার গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। সামবেদ সংহিতার কৌথুমীয় শাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে, রাণায়নীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে বলিয়া শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায় বাহাদুর স্বকৃত সামবেদীয় ছান্দোগ্য-উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ কৌথুমীয় শাখার অন্তর্গত বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত;—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয়, কাঠক, আত্রেয়, হারিদ্রবিক, এই চারি শাখায় বিভক্ত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ (বাজসনেয়ী) সংহিতা কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই দুই শাখায় বিভক্ত।—অথর্ব্ববেদসংহিতা শৌনক ও পিপ্পলপাদ শাখাদ্বয়ে বিভক্ত। শেষোক্ত শাখা কাশ্মীরে প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন শাখা গুলি যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহর্ষিগণ দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা তাঁহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় মহর্ষিগণ বেদ-গায়ক হইতে বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপাদির একমাত্র অনুষ্ঠাতা বলিয়া কালক্রমে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের যশঃ সৌরভ দিগদিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বেদবেদাঙ্গের নিগূঢ় রহস্য অবগতির জন্য দলে দলে শিক্ষার্থী জ্ঞান পিপাসু ছাত্রবর্গ তাঁহাদের নিকট একত্রিত হইতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ শিক্ষার্থী শিষ্যমণ্ডলীর উপযুক্ততা যথোচিতভাবে পরীক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে সকল্প ও সরহস্য বেদ বেদাঙ্গে উপদিষ্ট করত তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। এই সকল ছাত্রবর্গ আবার স্ব স্ব অধীত বিষয়ে মৌখিক উপদেশ প্রদান করিয়া স্ব স্ব দলবল বৃদ্ধি করিতে যত্নপর হইলেন। এই প্রকারে বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। উপদেশের যতই বহুল প্রচার হইতে লাগিল, ছাত্রবর্গের স্মৃতি শক্তিও সেই পরিমাণে পরিচালিত হইতে লাগিল। সহজে স্মরণ রাখিয়া ছাত্রবর্গ যেন বিভিন্ন বিষয়ে কৃতবিদ্য হইতে পারে, এই জন্য অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের স্বল্পাক্ষর গ্রথিত সূত্র সকল বিরচিত হইয়া ছাত্রমণ্ডলীর বহ্বায়াসের লাঘবতা বিধান করিতে লাগিল। কালক্রমে অতি সংক্ষিপ্ত সূত্র সকল দুর্ব্বোধ্য হইতে আরম্ভ হইলে, তাহাদিগকে সহজে লোকের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ভাষ্য, অনুভাষ্য টীকা প্রভৃতি বিরচিত হইয়া সংস্কৃত ভাষার কলেবর ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাই বলিয়াছি, অতি প্রাচীন বৈদিকসময় হইতেই টোলে শিক্ষার প্রথা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বুদ্ধদেবের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব সময়েও ভারতে শিক্ষার ভূয়সী উন্নতি বিহিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার সংস্থাপিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

মাহাত্ম্য ও যশঃপ্রভা বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষা কার্য্যেরও ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধমঠ সকলে সহস্র সহস্র ছাত্র সমবেত হইয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে বিদ্যা শিক্ষা করিত। অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই পরম প্রীতির সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। বেহার প্রদেশে নালন্দা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী নামে মহা সমৃদ্ধিশালী নগরী বিদ্যমান ছিল। সহস্র সহস্র ছাত্র তথায় সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইত। এমন কি ভারতবর্ষের প্রান্তবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ হইতে শিক্ষার্থীগণ সমাগত হইয়া নানাবিষয়িনী শিক্ষা লাভ করিত। ফাহিয়ান ও হিয়াংসাঙের নাম কে না জানেন? বহু আয়াস স্বীকার করিয়া উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় বৌদ্ধধর্ম্মের পুণ্যবতী প্রসূতি ভারতভূমিতে যথাক্রমে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে আগমন পুরঃসর বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হিয়াংসাঙ্ কয়েক বৎসর ভারতে অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে সমর্থও হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃতির যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য বৌদ্ধদের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম তিরোহিত হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল প্রচার আরব্ধ হইল। পুরাণ, উপপুরাণাদি বিরচিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের নব জীবন প্রতিষ্ঠাপিত করিল। মুসলমানদিগের আধিপত্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়া, কালের কুটিল গতির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। সংস্কৃত সাহিত্য টোলের পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর্গের শরণাপন্ন হইয়া জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট পুস্তকের অভ্যন্তরে নিভৃতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার গতি সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্ধ হইয়া পার্সীর অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইল। সংস্কৃত-মৃতপ্রায় হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান দাসত্বের দুর্দ্দিনে টোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা পাইল। গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের ভারতবর্ষের আগমনের সময়ে ও তাহার পরে, স্থানে স্থানে নানাশাস্ত্রাধ্যাপকগণ প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছাত্রমণ্ডলীকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান কালের উচ্চতম বিদ্যালয়াদিতে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে, গ্রীকদিগের ভারতে আগমনের সময়েও সেইরূপ শিক্ষা প্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল।

মনুসংহিতায় ও নারদ স্মৃতিতে গুরু-শিষ্যের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। বিদ্যাশিক্ষা তখন ধর্ম্মের অঙ্গভূত বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদহীন ব্রাহ্মণ সকলের নিকট নিন্দিত ও ঘৃণনীয় হইতেন। সমাজে মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তির লাঞ্ছনার পরিসীমা ছিলনা। সকল্প ও সরহস্য বেদ যিনি শিষ্যকে উপনয়নানন্তর শিক্ষা দিতেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ,—তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥
মনুসংহিতা (২য় অধ্যায়, ১৪০)।

শিষ্যদিগের বেদ বেদাঙ্গাদি শিক্ষার্থ ষট ত্রিংশৎ বা অষ্টাদশ বা নবম বর্ষ গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। নয় বৎসর গুরুকুলে বাস করিয়া শিষ্যকে অন্তত একটী বেদ শিক্ষা করিতে হইত। প্রাচীন কালে ভারতের গুরুশিষ্যের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর সহিত টোলের শিক্ষা প্রণালীর কতদূর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখুন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানকালীন অন্তেবাসীদিগের কিরূপে বাস করিতে হইত, গুরু ও তৎপরিজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইত, গুরু শিষ্যকে কিরূপ স্নেহ করিতেন ও শিষ্যের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতেন—এই সকল উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে আলোকিত, উদ্ধত, অবিনীত, অশিষ্ট ও যথেচ্ছাচারী ছাত্রমণ্ডলী এবং বেতনভুক কোটচাপকান চস্‌মালঙ্কৃত স্বার্থপর ও অনুদার শিক্ষকমণ্ডলীর শ্রোতব্য ও অনুকরণীয় কিনা, সুবিজ্ঞ পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ছাত্র জীবনের বিভিন্ন চিত্রদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর বিচার করুন।

ষটত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকংব্রতং
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা, গ্রহণান্তিকমেব বা॥
মনুসংহিতা (৩য় অধ্যায়, ১)

ব্রহ্মচারী ছয়ত্রিশ, আঠার বা নয় বৎসর কাল গুরুর গৃহে বাস করিয়া বেদত্রয় (ঋক, সাম ও যজুঃ) অধ্যয়ন করিবেন। অথবা যাবৎ পরিমিত কালে বেদ তিনটী শিক্ষা করিতে পারেন, ততকাল গুরুকুলে বাস করিবেন।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥
(৩য় অ২)

বিদ্যাস্নাতক ব্রহ্মচারী স্বধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া যথাক্রমে তিনটী, দুইটী বা একটী বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষাচর্য্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতং।
আসমাবর্ত্তনাদ্ কুর্য্যাদ্ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥

উপনীত ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন (পিত্রালয়ে—প্রতিনিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত) গুরুর গৃহে থাকিয়া প্রতিদিন (হোমকাষ্ঠ, ভিক্ষান্নের আহরণ, অধঃশয্যায় শয়ন, এবং গুরুর (জলাদি আহরণরূপ) হিতকর কার্য্য করিবেন। ২য় অধ্যায়, ১৮৮

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়সকলকে পরাজয় করিয়া স্বীয় তপস্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত নিম্ন কথিত নিয়ম গুলির অনুষ্ঠান করিবেন। ২য় অ, ১৭৫

নিত্যংস্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্ দেবর্ষিপিতৃতর্পণং।
দেবতাভ্যার্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥
২য় অ, ১৭৬

প্রতিদিন স্নানানন্তর শুদ্ধভাবে দেবতা ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করিবেন, ইষ্ট দেবতার পূজা করিবেন, এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

উদকুম্ভং সুমনশে গো-শকৃৎ-মৃত্তিকা-কুশান্।
আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহ শ্চরেৎ॥১৮২

প্রত্যহ জল কলস, পুষ্প, গোময়,মৃত্তিকা, কুশা, প্রভৃতি গুরুর যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন।

বেদযজ্ঞৈরহীনাশং প্রশস্তাশং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচর্য্যাহরেদ্ ভৈক্ষংগৃহেভ্যঃপ্রযতোঽন্বহং॥১৮৩
যে সকল গৃহস্থ বৈদিক যাগ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের গৃহ হইতে ব্রহ্মচারী প্রত্যহ পবিত্র চিত্তে সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করিবেন।

ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং, নৈকান্নাদী ভবেদ্‌ব্রতী

তিনি প্রত্যহ এক জনের অন্ন ভোজন করিবেন না, কিন্তু বহুলোকের গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ১৮৮

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্ বিহায়সি।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥১৮৬

তিনি দূরস্থিত বৃক্ষ হইতে সমিধ-কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া কুটীরের চালে রাখিবেন, এবং নিরালস্যভাবে সায়ং ও প্রাতঃকালে তদ্দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন।

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধংমাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানিযানিসর্ব্বানিপ্রাণিনাঞ্চৈবহিংসনং॥১৭৭
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণো-রুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥১৭৮
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভং উপঘাতং পরস্যচ॥১৭৯

ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবে না, (কর্পূর-চন্দনাদি) গন্ধ দ্রব্য ভক্ষণ বা বিলেপন করিবে না, মাল্য ধারণ করিবে না, (গুড় প্রভৃতি) সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিবে না, স্ত্রীসংসর্গ করিবে না যে সকল বস্তু শুক্ত (স্বভাবতঃ মধুর কিন্তু কোন কারণ বশতঃ অম্ল) তাহা ভক্ষণ করিবে না। এবং প্রাণীহিংসাও করিবে না। সর্ব্বাঙ্গে তৈল প্রদান করিবে না, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে, এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যেও প্রবৃত্ত হইবে না। পাশা খেলা, লোকের সহিত বৃথা কলহ, পরের দোষ কীর্ত্তন, মিথ্যা কথন, কুভাবে স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন করিবে না, পরের অনিষ্টাচরণ পরিত্যাগ করিবে।

চোদিতো গুরুণা নিত্যং অপ্রচোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নং, আচার্যাস্য হিতেষুচ॥১৯১

গুরু অনুমতি করুন আর নাই করুন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন।

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধিন্দ্রিয় মনাংসি চ
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্ বীক্ষ্যমানো গুরোর্মুখং॥
শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন, (অনুমতি ব্যতিরেকে উপবেশন করিবেন না।) ১৯২

নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযত।
আস্যতাম্ ইতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ॥

সদাচার সম্পন্ন শিষ্য (বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া উত্তরীয় হইতে) দক্ষিণ বাহু বহিষ্কৃত করিয়া রাখিবেন, গুরু 'উপবেশন কর' বলিলে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিবেন। ১৯৩

হীনান্ন-বস্ত্র-বেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরু-সন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য, চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ।১৯৪

গুরু সমীপে শিষ্য গুরুর অপেক্ষা হীন অন্ন ভোজন ও অপকৃষ্ট বসন ভূষণ পরিধান করিবেন। রাত্রিশেষে গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে শিষ্য গাত্রোত্থান করিবে, পূর্ব্বরাত্রে গুরু শয়ন করিলে শিষ্য পশ্চাৎ শয়ন করিবে।

প্রতিশ্রবণ সম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো, ন চ ভুঞ্জানো, ন তিষ্ঠন্, ন পরাঙ্মুখঃ

শয়ন বা উপবেশন করিয়া, ভোজন

করিতে করিতে, দণ্ডায়মান বা পরাঙ্মুখ হইয়া গুরুর আদেশ গ্রহণ অথবা গুরুকে সম্ভাষণ করিবে না। ১৯৩

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥

গুরুর নিকটে শিষ্য সর্ব্বদা নিম্নতরশয্যা বা আসনে শয়ন ও উপবেশন করিবেন। গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে উপবেশন করিলে শিষ্য পাদপ্রসারণাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে না। ১৯৮

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥১১৯

বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে শয্যায় শয়ন এবং যে আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন, বিদ্যাহীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সমাগত হইলে তাহাকে শয্যাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিবে।

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি-ভাষিত-চেষ্টিতং॥১৯৯

শিষ্য পরোক্ষেও আচার্য্যাদি উপাধি ব্যতীত গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না, এবং পরিহাসচ্ছলে গুরুর গমন কথন চেষ্টাদির অনুকরণ করিবে না।

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌতত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥

যেখানে গুরুর বিদ্যমান ও অবিদ্যমান দোষ কীর্ত্তিত হয়, শিষ্য সে স্থলে উপস্থিত থাকিলে হস্তাদি দ্বারা আপনার কর্ণ আচ্ছাদন করিবে, অথবা তথা হইতে অন্যত্র গমন করিবে। ২০০

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নং আপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥২৪১

নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ।
ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙ্ক্ষন্‌গতিমনুত্তমাং॥২৪২

ব্রাহ্মণ জাতীয় অধ্যাপকের অভাবে ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন দ্বিজ (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) হইতে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। অধ্যয়ন কালে যথোচিত অনুগমন শুশ্রূষাদি করিবেন। কিন্তু মোক্ষাভিলাষী ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়াদি গুরু অথবা সাঙ্গবেদ শাস্ত্রের অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ গুরুর গৃহে যাবজ্জীবন বাস করিবে না।

বেদপ্রদানাৎআচার্য্যংপিতরংপরিচক্ষতে। ১৭১
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥২৩৩

বেদাধ্যয়ন করান বলিয়া আচার্য্য পিতা বলিয়া কথিত হন। আচার্য্যের প্রতি ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যিনি পিতা মাতা ও আচার্য্যের যথোচিত সম্মান করেন, তিনি সমুদয় ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত ফললাভ করেন; যিনি উঁহাদিগকে অনাদর করেন, তাঁহার সকল কর্ম্ম বিফল হয়।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে, সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃক্রিয়াঃ॥

শিষ্য কিরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে গুরু তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে—তৎসম্বন্ধে মনু কহিতেছেন;—

আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যাদশ ধর্ম্মতঃ॥১০৯

আচার্য্যের পুত্র, সেবা শুশ্রূষাদি পরিচর্য্যাকারক, জ্ঞানান্তর দাতা, ধার্ম্মিক, মৃত্তিকা ফলাদি দ্বারা শুদ্ধ, আত্মীয়, অধ্যয়নের গ্রহণ ধারণে সমর্থ, ধনদানে সমর্থ, সচ্চরিত্র ও জ্ঞাতি—এই দশ জনকে ধর্ম্মানুসারে অধ্যয়ন করাইবে।

ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্রবিদ্যা ন বপ্তব্যা,শুভং বীজমিবোষরে॥১১২

যে শিষ্যের অধ্যাপনে ধর্ম্ম বা অর্থ না থাকে, অথবা যাহার নিকট অধ্যাপনানুরূপ শুশ্রূষা না পাওয়া যায়—ঈদৃশ ছাত্রে বিদ্যাদান ক্ষার মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ন্যায় নিষ্ফল।

যমেব তু শুচিং বিদ্যাঃ নিয়তং ব্রহ্মচারিণং।
তস্মৈমাংব্রূহিবিপ্রায়নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥১১৫

যে ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ স্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যারূপ নিধির প্রতিপালক সেই সাবধান বিপ্রের হস্তে আমাকে (বিদ্যাকে) সমর্পণ কর।

যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্ গুপ্তে চ সর্ব্বদা
স বৈ সর্ব্বং অবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলং॥

যিনি সত্যবাদী, যাহার মন রাগদ্বেষাদি রিপুগণের বশবর্ত্তী নয়, যাহার বাক্য ও মন নিষিদ্ধ বিষয় হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত,—সেই ব্যক্তি বেদশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সমুদয় ফল প্রাপ্ত হয়। ১৬০

অহিংসয়ৈবভূতানাং কার্য্যংশ্রেয়োঽনুশাসনং।
বাকচৈব মধুরা শ্লক্ষা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥

ধার্ম্মিক অধ্যাপক শিক্ষার্থী শিষ্যকে প্রয়োজনাতিরিক্ত দুর্ব্ব্যবহার করিবেন না, শিষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, শিষ্যের প্রীতিজনক অনুচ্চ মধুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিহীন ব্রাহ্মণ কিদৃশী ঘৃণার আস্পদ ছিলেন, পাঠকবর্গ দেখুন। যিনি বেদ অধিক বা অল্প পরিমাণে আচার্য্য কি উপাধ্যায়ের * নিকট অধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য অর্থ শাস্ত্রাদি উপার্জ্জনে যত্নবান হইতেন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে অবিলম্বে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য নিষ্পাদনেও সক্ষম নহেন। তাহার পুরুষত্ব বা গৌরব নাই. কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় তিনি নাম মাত্র মনুষ্য।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদং অন্যত্র কুরুতে শ্রমং
স জীবন্নে শূদ্রত্বং আশু গচ্ছতি মান্বয়ঃ॥১৬
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চবিপ্রোঽনধীয়ান,স্ত্রয়স্তে নামবিভ্রতি॥১৫৭

বেদাভ্যাসই দ্বিজাতির ইহলোকে শ্রেষ্ঠতম তপস্যা। বেদবিহীন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥

আমরা নারদ স্মৃতি হইতে পূর্ব্বলিখিত শ্লোক সমূহের পরিপোষক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রাচীন ভারতে ছাত্রজীবনের মনোহর চিত্রটী সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। এই আদর্শ চিত্রে দৃষ্টিপাত পুরঃসর সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ বর্ত্তমান সময়ের ছাত্র জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ করুন।

"আ-বিদ্যাগ্রহণাচ্ছিষ্যঃ শুশ্রূষেৎ প্রয়তোগুরুং।
তদ্বৃত্তি গুরুদারেষু গুরুপুত্রে তথৈব চ॥
ব্রহ্মচারী চরেদ্ ভৈক্ষং, অধঃশায্যনলঙ্কৃতঃ।
জঘন্যশায়ী সর্ব্বেষাং পূর্ব্বোত্থায়ী গুরো গৃহে॥
নাসংদিষ্টঃ প্রতিষ্ঠেত তিষ্ঠেদ্ বা গুরুণা ক্বচিৎ।
সংদিষ্টঃ প্রতিকুর্ব্বীত শক্তশ্চেদ্ অবিচারয়ন্॥
যথাকালং অধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ।
আসীনোঽধো গুরোঃপার্শ্বে ফলকে বা সমাহিতঃ॥
স্রোতোবহেব সর্ব্বত্র বিদ্যা নিম্নানুসারিনী।
নিম্নবর্ত্তী ভবেৎ তস্মাদ্ তদর্থী সর্ব্বদা গুরোঃ॥

* যিনি অর্থ লইয়া বেদের একাংশ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, তিনিই উপাধ্যায় পদবাচ্য।
একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্যর্থং, উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥ ১৪১

অনুশাস্যশ্চ গুরুণা ন চেদ্ অনুবিধীয়তে।
অবিধিনাথবা বদ্ধা রজ্জ্বা বেণুদলেন বা॥
ভৃশংন তায়েদ এনং নোত্তমাঙ্গে ন বক্ষসি।
অনুশাস্যাথ বিশ্বাস্যঃ—শাস্যো রাজ্ঞান্যথা গুরুঃ॥
আচার্য্যঃ শিক্ষয়েদেনং স্বগৃহে দত্তভোজনং।
ন চান্যৎকারয়েৎকর্ম্ম পুত্রবচ্চৈনং আচরেৎ॥
সমাবৃত্তশ্চ গুরবে প্রদায় গুরুদক্ষিণাং।
প্রতীয়াৎ স্বগৃহান্—এষা শিষ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥'

নারদ-স্মৃতি (১৪২—৪৩ পৃষ্ঠা)

এই শ্লোক কয়টী পূর্ব্বোক্ত মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত অংশের সংক্ষিপ্ত সার মাত্র। কেবল ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে শিষ্যশাসন এবং গুরুশিষ্যের পরস্পরের ভাব মনুসংহিতার উদ্ধৃত অংশাপেক্ষা স্পষ্টতর ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুরুর আদেশ কি অধ্যয়ন অবহেলা করিলে শিষ্য দণ্ডনীয় হয়। অনতিনির্দ্দয় ভাবে দণ্ডনীয় শিষ্যকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া বা বংশ খণ্ড দ্বারা মস্তক ও বক্ষস্থল ভিন্ন শরীরের অন্যান্য স্থানে গুরু প্রহার করিবেন। এইরূপ নাতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া গুরু শিষ্যকে আশ্বস্ত করিবেন এবং শিষ্যের প্রহারজনিত ক্লেশ দূর করিবেন। নতুবা শিষ্যশাসনজনিত অপরাধ গুরুতর হইলে তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারেন। অধ্যাপক শিষ্যকে স্বগৃহে পুত্রের ন্যায় অন্নাদি প্রদান পূর্ব্বক পরিপালন করিবেন এবং যথোচিত শিক্ষা প্রদান করিবেন। শিষ্য দ্বারা গুরু অন্য কোন কার্য্য সম্পাদন করাইবেন না।

বিজ্ঞ পাঠক! ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে কি বর্ত্তমান কালে কোথাও পিতা পুত্রের ভক্তি স্নেহ দেখিতে পান? ইংরেজী বিদ্যালয়ে ত এই ভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেতনভুক শিক্ষক কিসে ছাত্রের ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, কিসে সে মানুষের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রবলে গণনীয় হইবে, সেই বিষয়ে কি ভাবিয়া থাকেন? এগারটা হইতে চারিটা বেলা পর্য্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্রে সম্বন্ধ। বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষার ফলে ছাত্রশিক্ষকের পূর্ব্বতন মধুর সম্পর্ক ও দুচ্ছেদ্য বন্ধন কি অন্তর্হিত হইয়াছে? আজ কাল সর্ব্বত্র কি দেখিতে পাই? শিক্ষক ও ছাত্র বিদ্যালয়ের নিয়মিত সময় ভিন্ন সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সৌহার্দ্দভাব বর্দ্ধিত করিতে একটুকুও ইচ্ছুক নহেন। পরস্পরের [illegible]ব বিনিময়ে পরস্পর উপকৃত হইতে সম্মত নহেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এজন্যই বিশেষ সদ্ভাব নাই। সেই প্রাচীন ভারতের গুরু শিষ্যের ভক্তিসম্বলিত পিতা পুত্র ভাব নাই। সেই ভক্তি ও সেই স্নেহ নাই। পর্ণকুটীরে যৎসামান্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুশিষ্য যে ভাবে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করিতেন, সুরম্য প্রাসাদোপরি সুসজ্জিত আসনে পরম সুখে উপবিষ্ট হইয়াও আমরা সেই পবিত্র ভক্তি স্নেহময় ভাব দেখিতে পাইতেছি না। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে স্বার্থপরতা, যথেচ্ছাচারিতা, অনুদারতা প্রভৃতি অপনীত হইয়া কবে আবার সেই মধুর পিতা পুত্রের ভক্তি স্নেহময় ভাব আগমনপূর্ব্বক গুরুশিষ্যকে দুচ্ছেদ্য অকৃত্রিম প্রণয় পাশে আবদ্ধ করিবে? কবে আমাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হইয়া উদারতা ও একতা সংস্থাপিত হইবে? কবে আমরা আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্রে সুদীক্ষিত হইয়া প্রকৃত হিতৈষণারূপ মহাব্রতে ব্রতী হইব? কবে আমরা মুখসর্ব্বস্বতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধনার বলে সিদ্ধি লাভ করিতে শিখিব?

ষটত্রিংশৎ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ কি কঠোর সাধনাই করিতেন, কি কষ্টকর তপশ্চর্য্যাই করিতেন! সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি লাভ কথনও সম্ভবপর নহে। তাই এই ঘোরতর দুঃসহ সাধনার দেদীপ্যমান জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য, চৈতন্যদেব, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বাচস্পতি মিশ্র, মল্লিনাথ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র সাধক শ্রেষ্ঠ আমাদের দর্শনপথে পতিত হন। এবম্বিধ সাধনা না করিলে তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না। ভারতের অবিনশ্বর জলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে পদে পদে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সত্যের পথে আমাদের পথপ্রদর্শক হইতে সমর্থ হইতেন না। স্বস্ব অসাধারণ জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে তাঁহারা ভারতবাসীর হৃদয়াভ্যন্তরে এত কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করত সভ্য জগতের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেন কি না, সন্দেহ স্থল। চিরপূজিত সাধকগণ, আবার তোমরা ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে যোগ ভক্তি কর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা দেও, আবার আমাদিগকে তোমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাও, আবার আমাদিগকে প্রকৃত সাধন শিক্ষা দিয়া সিদ্ধিলাভ কিরূপে করিতে হয়, উপদেশ দেও।

পূর্ব্বোল্লিখিত আদর্শ ছাত্রজীবনের মধুর ভাব এখনও টোল সমূহে অনেক পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ভাব সম্পূর্ণরূপে এখনও টোলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। ছাত্রদিগকে অন্নপানাদি দ্বারা এখনও টোলের পূজ্যপাদ পণ্ডিতমণ্ডলী প্রতিপালন পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিয়া থাকেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে সেই পূর্ব্বতন পিতাপুত্র ভাব টোলে এখনও বর্ত্তমান আছে। সেই ভক্তি, সেই স্নেহ এখনও অনাদৃত টোলগুলি হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। টোলের ছাত্রগণ এখনও প্রত্যহ পাঠ আরম্ভ ও শেষ হইবার সময় পূর্ব্বের ন্যায় গুরুকে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া থাকে। অধ্যাপকগণ এখনও স্ব স্ব টোলে শিষ্যদিগকে নিজব্যয়ে আহারাদি দিয়া থাকেন। যিনি তাহা না পারেন, তিনি টোলই খোলেন না। পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ পণ্ডিতমণ্ডলীর যথাযোগ্য সমাদর করিতেন, রীতিমত অর্থাদি প্রদান পুরঃসর উদারপ্রকৃতি নিঃস্ব পণ্ডিতগণের যথোচিত সাহায্য করিতেন। তাঁহারা প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। প্রকৃত গুণ ও পাণ্ডিত্যের যথোচিত সমাদর করিতেন। অনেকে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ও পণ্ডিতবর্গের যথোচিত উৎসাহ দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ও সংস্কৃত চর্চ্চার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।—বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে নবদ্বীপের রাজগণ বিদ্যানুশীলন জন্য ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বোধ হয়, নবদ্বীপ অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের টোলের পণ্ডিতবর্গ মুসলমান রাজত্বের মধ্য ও শেষ ভাগে ও নবদ্বীপের গুণগ্রাহী রাজগণ হইতে যথোচিত অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পরম যত্নে অতিশয় উৎসাহ সহকারে ছাত্রগণকে

অধ্যয়ন করাইয়া নবদ্বীপকে বঙ্গদেশে সংস্কৃতানুশীলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান করিয়া তুলিয়াছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গের নামে এখনও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র অনুশীলনের জন্যই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতের নানা স্থান হইতে ছাত্রমণ্ডলী সমবেত হইয়া নবদ্বীপকে সরস্বতীর প্রিয়তম লীলাভূমি রূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। নবদ্বীপ সরস্বতীর প্রিয়তম নিকুঞ্জকানন। সেখানে মহামহোপাধ্যায় ধার্ম্মিক, নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত চূড়ামণিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপকে প্রকৃত তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছেন। তার্কিক ও নৈয়ায়িক কুলতিলক 'তত্ত্বচিন্তামণি'-রচয়িতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় মিথিলাদেশকে স্বীয় জন্মগ্রহণে পবিত্রীকৃত করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের জনক। বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের শিষ্যবর্গের মধ্যে মণিমিশ্র ও যজ্ঞপতি উপাধ্যায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন ও মণিপ্রভা নামে একখানি গ্রন্থ উভয়ে একত্রিত হইয়া রচনা করেন। যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের প্রিয়তম শিষ্য পক্ষ মিশ্র 'চিন্তামণি'র সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্য "আলোক" প্রণয়ন করেন। পক্ষধর মিশ্রের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য নবদ্বীপবাসী রঘুনাথ শিরোমণি স্বকীয় অলৌকিক স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভাবলে মিথিলা হইতে "ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণি ও আলোক বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করেন এবং ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ে নবদ্বীপের অবিসংবাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। তিনি 'তত্ত্বচিন্তামণির' "দীধিতি" নামক বিবৃতি রচনা করেন। রঘুনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ তৎকৃত 'দীধিতি'র ও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা প্রণয়ন করেন। মথুরানাথের শিষ্য ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ দীধিতির একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ভবানন্দের প্রিয়তম শিষ্য জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য 'দীধিতি'র বিশদীকরণে যত্নপর হইয়া আরো দুইখানি টীকা রচনা করেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন গৌতম সূত্রের বিবৃতি এবং ভাষা পরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী প্রণয়ন করেন। এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক গ্রন্থ লিখিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর গৃহে গৃহে ইঁহাদের নিয়ত অর্চ্চনা হইতেছে। যতকাল সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল ইঁহারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর ভক্তিশ্রদ্ধার পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে সবিস্তারিতরূপে শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর বাবুই লিখিতেছেন। নবদ্বীপের টোল ও পণ্ডিতবর্গের প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, তাহা সংগৃহীত করিয়া তাঁহাকে নব্যভারতে প্রচারিত করিতে দেখিলে আমরা নিরতিশয় সুখী ও কৃতজ্ঞ হইব। চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব সময়েই নবদ্বীপে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যপ্রভায় ভারতবর্ষকে (বিশেষত বঙ্গদেশকে) পবিত্রীকৃত ও সমুদ্ভাসিত করিতেছিলেন। সেই সময় হইতেই নবদ্বীপের বিদ্যার ও প্রতিভার বিমল জ্যোতিঃ

দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নবদ্বীপের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রেমিক চূড়ামণি চৈতন্যদেব অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও অলৌকিক প্রতিভা বলে তৎকালীন প্রায় সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া আপনার প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে সময় বঙ্গের বড় গৌরবের সময়। বাঙ্গলার ইতিহাসে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর অংশ আর আছে কিনা,সন্দেহ স্থল। একদিকে ধর্ম্মবীর প্রেমিকচূড়ামণি বঙ্গদেশকে অভূতপূর্ব্ব বিশ্বজনীন প্রেমরসে মাতাইয়া, পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্থাপন করত ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, অপরদিকে নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাতে স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভা প্রয়োগ করিয়া নবদ্বীপে সমবেত নানা প্রদেশবাসী ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করত ভারতকে চমকিত করিতেছেন। একদিকে চৈতন্যদেব জাতি নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতিকে প্রেমসূত্রে বন্ধন করিয়া স্বকীয় মহত্ত্বের ও বিশ্বজনীন প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, অপরদিকে স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের শিথিলীকৃত ভিত্তিকে শাস্ত্রের দুচ্ছেদ্য নিগড়-বন্ধনে সংযত করিয়া জাতি-বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিতেছেন এবং চৈতন্যদেবের উদার ভাবের প্রতি শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ পুরঃসর ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-দিগকে অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিতেছেন। বঙ্গের ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতর অংশ সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও বঙ্গবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দার্শনিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সময় সমস্ত বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, এই নাটক-নভেল পরিপূর্ণ বঙ্গদেশে তাহা জানাইতে বা জানিতে কেহ চায় না, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। কবে আমরা জাতীয় অতীত গৌরবের ইতিহাস লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইব? বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে কত কত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যপ্রভা ক্ষণকাল স্বল্পপরিমিত স্থানে বিস্তার করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে? কে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের গৌরব করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করে? এই সে দিন নবদ্বীপের প্রধান-স্মার্ত্ত পণ্ডিতচূড়ামণি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও অভিধান-প্রণেতা পণ্ডিতশিরোমণি তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। কই, তাঁহাদের জীবনচরিত ত এপর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না! তাঁহাদের জীবনীতে কি আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নাই? আমাদের দেশে এত পুস্তক প্রণীত, সম্পাদিত, অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। প্রণেতা, সম্পাদক, অনুবাদক ও প্রকাশকগণ নানা উপায়ে ও কৌশলে এত অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহই কি এসকল বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাসের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারেন না? কেহই কি বঙ্গদেশেরও সমগ্র ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে বা সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইতে পারেন না? আমরা স্বার্থপর-

তার দাসানুদাস। পরপদলেহন আমাদের ঘৃণিত জীবনের এক মাত্র উপজীবিকা। আমরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনার অবসর পাই কই? দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে সচেষ্ট হওয়ার সময় পাই কই? আমরা মুখসর্ব্বস্ব। বক্তৃতার স্রোতে, সংবাদপত্র-লিখনের-প্রবাহে সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিতে পারি। আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপযোগী ধৈর্য্য, উদ্যম, উৎসাহ ও দৃঢ়তা কই? আমরা ভূমণ্ডলে অধম জাতি। আমাদের জিহ্বায় ও লেখনীতে বল আছে বটে, কিন্তু কার্য্য করিবার শক্তি অণুমাত্রও নাই।

বঙ্গদেশের টোল সমূহে ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রেরই বাহুল্যরূপে অনুশীলন হইয়া থাকে। বেদ, উপনিষদ্, জ্যোতিষ, কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কার, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ এবং অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপনা আছে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কাব্য, অলঙ্কার ও ছন্দ শাস্ত্রের অনুশীলন হয় না। ব্যাকরণের ফাঁকি সিদ্ধান্ত বিচারাদিই বিশেষরূপে অধীত হইয়া থাকে। অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে দুরূহ প্রশ্নোত্তর শিক্ষাদান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। শিষ্যবর্গও কিসে নিমন্ত্রণাদিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তাহা শিক্ষা করিতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রকৃতরূপে কোন শাস্ত্রেই সম্যকরূপে ব্যুৎপন্ন হইতে যত্নপর হন না। বর্ত্তমান সময়ে টোলের ন্যায় পবিত্র বিদ্যামন্দিরে প্রায় সর্ব্বত্রই বোধ হয় বিদ্যা ও জ্ঞানের এইরূপ নিরতিশয় অবমাননা ও লাঞ্ছনা হইতেছে। টোলের পণ্ডিতদিগের অধিকাংশই এবম্বিধ অকিঞ্চিৎকর বিদ্যার অভিমানে স্ফীত, প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান লাভে একান্ত উদাসীন। তাঁহারা গর্ব্ব ও দম্ভের এক একটী সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। সর্ব্বদাই পরনিন্দায় জিহ্বা ও কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান অপেক্ষা বাচালতা ও ভণ্ডামিরই বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই বোধ হয়, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা যথোচিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছেন না। তাঁহারা অর্থলোভে না করিতে পারেন, এমন কার্য্য কিছু কম আছে। দেশীয় রাজা নাই, তাঁহারা কাহার দ্বারে সাহায্য প্রার্থী হইবেন? কাজে কাজেই পেটের জ্বালায় তাঁহাদিগকে অনেক অশাস্ত্রীয় ও বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মহারাজকে হিন্দু বলিয়া সমাজে গ্রহণ করিতে গিয়া বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ কি পর্য্যন্তই না অপদস্থ ও অবমানিত হইয়াছেন!! স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ পয়সার লোভে বিভিন্ন সময়ে একই কার্য্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়া অনেক সময়ই, ধর্ম্ম, নীতি ও সততাকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। এক সভায়, কি এক স্থানে এক ব্যবস্থা দিয়া গেলেন, প্রায় তাহার কালী শুকাইতে না শুকাইতেই অন্য স্থানে অন্য সভায় গিয়া তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিলেন। এদিকে ত তাঁহাদের একই সময়ে এরূপ সম্পূর্ণ বিসদৃশ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অপর দিকে তাঁহারা আপনার মত ভ্রমাত্মক বলিয়া জানিয়াও সরলভাবে ভ্রমসংশোধন না করিয়া প্রাণপণে তাহা সমর্থন করিতে থাকেন। পক্ষপাতিতাও একপ পূর্ব্বাপেক্ষা

স্বার্থান্ধতার বিকাশের দরুণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা দ্বারা দশটাকা প্রাপ্তির আশা আছে, তিনি দোষ করিলেও তাহার দণ্ড নাই, তিনি মূর্খ হইলেও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিমন্ত্রিত ও আহুত হইতে থাকেন। মিথ্যাচরণ দ্বারা স্বীয় স্বার্থের উদ্ধার হইলে, তাঁহারা তাহাতেও পরাঙ্মুখ নন। নিমন্ত্রণে যাইয়া টোল না থাকিলেও ছাত্র-বিদায় গ্রহণ করিতে যত্ন করেন, পথ খরচ যাহা লাগে তদপেক্ষা অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। সময় সময় এবম্বিধ মিথ্যাচরণের নিমিত্ত যথেষ্ট অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়দোষ হইতেও তাঁহার নির্ম্মুক্ত নহেন। অনেক সময় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় অতিশয় বীভৎস ও লজ্জাজনক কার্য্য করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান নিজে করুন আর নাই করুন, দীর্ঘ ফোঁটা কপালে দিয়া লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান্ হইয়া থাকেন। অন্যকে অধার্ম্মিক পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা পুরঃসর আবশ্যক বোধ হইলে সমাজের বহিষ্কৃত করিয়া অধর্ম্ম ও ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম, তাহা অতিরঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিত নহে। সকলেই যে উপরি উল্লিখিত দোষ-দুষ্ট, তাহা নহে। অনেক মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে এবং চরিত্র বলে তাঁহারা সর্ব্বাংশেই আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার সমুপযুক্ত পাত্র। এরূপ মহচ্চরিত্র পণ্ডিতদিগকেও অন্যান্য পণ্ডিত-কুলকলঙ্কগণের ও প্রাকৃত জনের ন্যায় সভাস্থলে বিচারাদিতে ক্রোধান্ধ এবং ধৈর্য্যচ্যুত এবং অর্থ প্রাপ্তির জন্য পরের উপাসনা ও তোষামোদ করিতে দেখা যায়। অযথা নিন্দা ও দোষ কীর্ত্তন করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর্গ যেন লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে তাহার ধৃষ্টতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করেন। প্রবন্ধলেখক তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে। যাঁহারা সমাজের অগ্রণী ও নেতা, তাঁহাদিগের সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, পরোপকার রত, ধর্ম্মপরায়ণ, অপক্ষপাতী,সমদর্শী ও স্বদেশহিতৈষী হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। পূজনীয় পণ্ডিত বর্গ! আপনাদের দুর্গত অবস্থার কারণ আপনারাই স্বয়ং। আপনাদের মধ্যে থাকিয়া পণ্ডিতকুলকলঙ্কগণ আপনাদিগকে কলঙ্কিত ও হিন্দু-সমাজকে অধঃপাতিত করিয়াছে ও করিবে। যত্নপূর্ব্বক আপনারা তাহাদের দোষ গুলি সংশোধনান্তর আবার হস্তস্খলিত হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। লোকের হৃদয় স্বীয় গুণে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করুন। নতুবা আপনাদের অবস্থা ক্রমশ হীন হইবে এবং আপনাদিগকে জন সমাজে আরো উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম দিনে দিনে আরো অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর্গের আদর্শ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন, আপনারা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গরিমা ও চরিত্র বলে তাঁহাদের হইতে হীন হইয়াছেন কি না? পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তি কলাপ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সমুপযুক্ত বংশধর হইতে যত্নবান্ হউন। অবশ্যই আপনাদের অবস্থা পরি-

বর্ত্তিত হইবে। অবশ্যই আপনাদের গৌরব সমস্ত দেশ গৌরবান্বিত হইবে। শিষ্য-দিগকে ও আপনাদের উপযুক্ত ছাত্র হইতে শিক্ষা দিন্। যেন তাঁহাদের দ্বারা সমাজ কোনও রূপে কলঙ্কিত না হইয়া পরিশোধিত হয়। যেন পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া ভারতবাসী পুনরায় ধর্ম্মগত-প্রাণ হইয়া উঠেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, টোলে সাহিত্য ভিন্ন ব্যাকরণ শাস্ত্র বহুকাল পর্য্যন্ত অধীত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বোপদেব-প্রণীত মুগ্ধবোধ ও পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য প্রণীত দুর্গসিংহের বৃত্তি সহ-কলাপ ব্যাকরণ পঠিত হয়। কলাপ ব্যাকরণের সন্ধি বৃত্তি, চতুষ্টয় বৃত্তি, আখ্যাত, ও কৃদ্বৃত্তির পঞ্চম প্রকরণ পঠিত হয়। কলাপ পরিশিষ্টের সন্ধিপ্রকরণে এবং নাম প্রকরণের মাত্র ধাতু সূত্র গোপীনাথ প্রণীত টীকা সহিত অধীত হয়। নমস্কার-বাদের শ্লোকটীরও সন্ধি, বৃত্তিকারক এবং ধাতুসূত্রের পঞ্জিকা ও কবিরাজ পঠিত হইয়া থাকে। অধীত বিষয় গুলির বিচারাদিতেই ছাত্রদিগের মনোযোগ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভের পক্ষে দৃষ্টি প্রায়ই থাকে না। কলাপ ব্যাকরণের কৃদ্বৃত্তির ষষ্ঠ প্রকরণ, কলাপ পরিশিষ্টের নাম প্রকরণ, ষত্বণত্ববিধান, কারক, সমাস, স্ত্রাধিকার প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় গুলি একেবারেই পঠিত হয় না।

সাহিত্য ভিন্ন ব্যাকরণ পাঠেই ছাত্রদি-গের বহু সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সাহিত্য পাঠ, ব্যাকরণের সঙ্গে আবশ্যকীয়ও মনে করেন না। এই জন্যই তাঁহারা কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ও ভবভূতি অপেক্ষা মাঘ ও শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অনুচিত প্রসংশা করিয়া, তাঁহাদিগের সহৃদয়তা এবং ভাবুকতার অভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহাদের মুখে—

উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থগৌরবং,
নৈষধে পদলালিত্যং, মাঘে সন্তিত্রয়োগুণাঃ ॥
উদিতে নৈষধেবাক্যে ক মাঘঃ কচ ভারবিঃ ॥

প্রভৃতি উপহাসাস্পদ বাক্য প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত ছন্দ অলঙ্কার কি পদার্থ, তাহাও নাকি জানেন না!! কি লজ্জার কথা! সাহিত্য অনাদর করিয়া তাঁহারা এই রূপে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত কলেজের পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে কলিকাতায় উপাধির পরীক্ষা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ও ব্যয়ে প্রতিবৎসর গৃহীত হইতেছে। তদ্দ্বারা টোলে সাহিত্যাদির পাঠনা রীতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। সংস্কৃত লিখন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে কাব্য, নাটক, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র টোলে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকার সারস্বতসমাজ দ্বারাও পূর্ব্ববঙ্গের টোলগুলির পাঠনা রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখনও অনুবাদ এবং সংস্কৃতে কথোপকথনাদির চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ভাষায় ব্যুৎপত্তিজন্মিবার পক্ষে উক্ত বিষয়দ্বয় সবিশেষ উপযোগী, সংশয় নাই। কোন কোন পরীক্ষক নাকি সময় সময় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। ইহা সত্য হইলে বড় দুঃখের বিষয়।

স্মৃতিশাস্ত্রের নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি

অধীত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকা সহিত জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগ ও শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেক (মঘা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত) শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেক সংসর্গ প্রকরণ পর্য্যন্ত, এবং রঘুনন্দন প্রণীত তিথি-উদ্‌বাহ-প্রায়শ্চিত্ত-শুদ্ধিশ্রাদ্ধ-মলমাস ও একাদশী তত্ত্ব মাত্র পঠিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র গুলির আলোচনা একেবারেই নাই। বাদার্থের দুই এক খান পুস্তক অধ্যয়ন পূর্ব্বক স্মৃতির ছাত্রগণ স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করে। ইহাতেও বিচারমল্লতার উৎকর্ষ সাধনেই অধিক মনোযোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিসে সভায় প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিয়া স্বকীয় প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবে, গুরুশিষ্য উভয়েরই সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানের দিকে প্রায়ই দৃষ্টি থাকে না। সুতরাংই অধীত বিষয়ে ছাত্রদিগের সবিশেষ ব্যুৎপত্তিও জন্মে না। প্রাচীন সংহিতাদি সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়েরা এতদূর অজ্ঞ যে, স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দনের সংগ্রহে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের যে যে বচনাদি শিক্ষা করেন, তদ্‌ভিন্ন সংহিতাপ্রণেতাদিগের বচনাদিতে অপ্রামাণিক বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেও ক্রুটী করেন্ না। মূলগ্রন্থে অনাদর করিয়া তাঁহারা কতিপয় সংগ্রহাদির অধ্যয়নেই পরিতুষ্ট থাকেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব মধ্যে সাত আটখান পড়িলেই যথেষ্ট শিক্ষা হইল বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার শ্রাদ্ধবিবেক ও দায়ভাগের টীকায় স্বীয় পাণ্ডিত্য ও নৈয়ায়িকতা সবিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকেই তর্কালঙ্কারের টীকা ভিন্ন উপরি উল্লিখিত অন্য গ্রন্থাদিতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যকীয় বোধ করেন না।

স্মৃতি শাস্ত্রের ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রের মূলগ্রন্থাদির অনুশীলনও ইতিপূর্ব্বে একেবারেই ছিল না। তীর্থাভিধেয় উপাধিপরীক্ষাগ্রহণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে তাহা কিয়ৎপরিমাণে পঠিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে। বিশ্বনাথকৃত বৃত্তি সহিত গোতম প্রণীত ন্যায়সূত্র, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কৃত বিবৃতি সমেত কণাদের বৈশেষিক সূত্র, জগদীশকৃত শব্দশক্তি প্রকাশিকা, গদাধরপ্রণীত শক্তিবাদ প্রথমাদি ব্যুৎপত্তি বাদ, হরিদাসের টীকা সমেত উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি; রঘুনাথ কৃত দীধিতি এবং জগদীশ ও গদাধর প্রণীত তৎটীকা সহ গঙ্গেশোপাধ্যায়-বিরচিত তত্ত্বচিন্তামণির অনুমিতি খণ্ড—এক্ষণে টোলে পঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে স্মৃতি, ন্যায় ও সাহিত্য ভিন্ন বেদান্ত, সাঙ্খ্য মীমাংসা, প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদের কতিপয় প্রধান প্রধান পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের কীদৃশ অনুশীলন টোল সমূহে হইতেছে, সেই বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। এই পাঠ্যের তালিকা মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের নাম দেখিতে পাইতেছি না। সংস্কৃতজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়েরাই আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থী অল্পসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। উপাধি পরীক্ষায় আয়ুর্ব্বেদ পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

এক এক বিষয় শিক্ষার্থ ছাত্রদিগের

পূর্ব্বে দশ বার বৎসর ব্যয় হইত। এখন সেই স্থলে পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, টোলে বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই অনধ্যায়কাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ছাত্রগণ সেই সময়ে পাঠ বন্ধ করেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ের ন্যায় টোলের পাঠবন্ধের দিন নির্দ্দিষ্ট নাই। আমরা অনধ্যায় কাল সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গের কৌতুহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তাহা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। শব্দকল্পদ্রুমে অনধ্যায় শব্দ দৃষ্টিগোচর হইল না। অতএব ইহা টোলে অধ্যাপক ও ছাত্র ভিন্ন অনেকের নিকট নূতন বোধ হইবে। অনধ্যায় কাল পূর্ব্বকালে বেদাধ্যয়নে মাত্র প্রয়োজ্য ছিল। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্ম (স্মৃতি) শাস্ত্র ভিন্ন সমুদয় বিষয়ের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

অনধ্যায়স্ত নাঙ্গেষু নেতিহাস পুরানয়োঃ।
নধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বন্যেষু পর্ব্বস্বেতানি * বর্জ্জয়েৎ ॥

(পরাশরভাষ্যকৃত কূর্ম্মপুরাণ বচন।) রাজ্যাধিপতির অশৌচ হইলে, রাহুগ্রস্ত থাকিতে থাকিতে চন্দ্রসূর্য্যের অস্ত গমনে তিন দিন অনধ্যায়। "ত্র্যহংন কীর্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাগেশ্চ সূতকে" (তিথিতত্ত্বধৃত মনুবচন)। দীর্ঘকালব্যাপী বা সম্পূর্ণ গ্রহণে, বায়ুতে বায়ুতে প্রবলতম ঘর্ষণে, উল্কাপাতে, ভূমিকম্পে, বেদ কি আরণ্যক কোন গ্রন্থের পাঠ সমাপন হইলে, সন্ধ্যাসময়ে কি প্রাতঃকালে মেঘগর্জ্জনে, শ্রাদ্ধভোজনান্তর, কাহারও দান প্রতিগ্রহণান্তর, শ্রাবণ অগ্রাহয়ণ ও চৈত্রের শুক্ল প্রতিপদে—একদিন অনধ্যায় বলিয়া জানিবে। "সন্ধ্যাগর্জ্জিত-নির্ঘাত-ভূকম্পোল্কানিপাতনে। সমাপ্য বেদং, দ্ব্যনিশং আরণ্যকমধীত্য চ ॥ পঞ্চদশ্যাং, চতুর্দ্দশ্যাং, অষ্টম্যাং, রাহুসূতকে। ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং, প্রতিগৃহ্য চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য) "সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ। চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্ব্বিদ্যা, যশো, বলং ॥" (দুর্ব্বাসা) ভগবতী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজা শ্রীপঞ্চমীর উৎসব দিনে অনধ্যায় হওয়াই স্বাভাবিক। "অনধ্যায়স্তু কর্ত্তব্যো মহে দৈবে চ পার্থিব।"

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী হইতে আশ্বিনের শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত অনধ্যায়। অকাল বৃষ্টি ও অকাল গর্জ্জনেও অনধ্যায় হয়। "প্রবোধনাৎ সমারভ্য যাবৎ দুর্গামহোৎসবঃ। অকালবৃষ্টৌ নাধ্যেয়ং অকালগর্জ্জিতে তথা ॥" (আচার্য্য চূড়ামণি কৃত সম্বৎসরপ্রদীপ) শ্রাবণ অগ্রহায়ণ ও চৈত্রের শুক্ল প্রতিপদ (ঋতুসন্ধি) অনধ্যায়। প্রতিপদ ও অষ্টমী অল্পক্ষণ থাকিলেও সে দিন অনধ্যায় হয়।

"সাচ যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাঙ্গেয়-শরতাড়িতা। প্রতিপৎ-পাঠ-শীলানাং বিদ্যেব তনুতাং গতা" ॥ (মহাভারত) "প্রতিপল্লেশ মাত্রেণ কলামাত্রেণ চাষ্টমী। দিনং দূষয়তে সর্ব্বং, সুরা গব্যঘটং যথা ॥" (নির্ণয়ামৃত)

আষাঢ়ী-আশ্বিনী-অগ্রহায়ণী মাঘী ও ফাল্গুনী শুক্লা এবং কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ও চৈত্র মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া অনধ্যায় বলিয়া পরিগণিত।

---

* চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা। পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র। রবি-সংক্রান্তিরেব চ ॥ এই পাঁচটী পর্ব্বদিনে বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অপর সমুদয় শাস্ত্রের অধ্যয়নও নিষিদ্ধ।

প্রেকোচৈচা দ্বিতীয়াস্তাঃ, প্রেতপক্ষে গতে তু যা। যা চ কোজাগরে জাতে চৈত্রাবল্যাঃ পরে তু যা। চাতুর্ম্মাস্যে সমাপ্তে চ দ্বিতীয়া যা ভবেত্তিথিঃ পরাস্বেতাস্বনধ্যায়ঃ পুরাণৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। (তিথিতত্ত্বে রাজমার্ত্তণ্ড ধৃত বচন)

"চৈত্রকৃষ্ণ-দ্বিতীয়ায়াং তিস্বষ্বেবাষ্টকাস্বচ মার্গে চ ফাল্গুণে চৈব আষাঢ়ে কার্ত্তিকে তথা। পক্ষয়ো মাঘমাসস্য দ্বিতীয়াং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (মলমাসতত্ত্বে ভীমবচন)

"আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মাঘী ফাল্গুণী চ দ্বিজোত্তম! দ্বিতীয়া শুক্লপক্ষস্য অনধ্যায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ফাল্গুণস্যাশ্বিনস্যাপি কার্ত্তিকাষাঢ়য়োরপি। কৃষ্ণপক্ষদ্বিতীয়ায়াং অনধ্যায়ং বিদুর্বুধাঃ॥"

বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া আশ্বিনের শুক্লা নবমী, কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী ভাদ্রের শক্র ধ্বজ পাত যে ভরণী নক্ষত্রে হয়, ও মাঘী শুক্লা সপ্তমী অনধ্যায় বলিয়া পরিগণিত।

"মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং ভরণ্যামপি চৈবহি।
তথাক্ষয় তৃতীয়ায়াং শিষ্যান্নাধ্যাপয়েদ্বুধঃ।
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং রথ্যাখ্যায়াস্থ বর্জ্জয়েৎ॥
(নারসিংহপুরাণ)

ভাদ্রীও চৈত্রী শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী ত্রেতাযুগ উৎপত্তির দিন, একাদশী ও দ্বাদশী, আষাঢ়ের শুক্লা দশমীও একাদশী, শ্রাবণের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপর যুগ উৎপত্তির দিন—অনধ্যায় বলিয়া জানিবে।

"অয়নে বিষুবে চৈব শয়নে বোধনে হরে।
অনধ্যায়স্তু কর্ত্তব্যোমন্বাদিষু যুগাদিষু॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত নারদ বচন)

ত্রয়োদশী, চতুর্থী, সপ্তমী, ও দ্বাদশীর রাত্রে অধ্যয়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে উক্ত তিথিগুলির রাত্রির প্রথম প্রহর মাত্র অনধ্যায়।

"ত্রয়োদশ্যা শ্চতুর্থ্যাশ্চ সপ্তম্যা দ্বাদশী তিথেঃ।
প্রদোষেঽধ্যয়নংধীমান্‌নকুর্ব্বীত,—যথাক্রমং
সারস্বতঃ গাণপতঃ সৌরশ্চ বৈষ্ণব স্তথা॥"
(তিথিতত্ত্ব)

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই এত অনধ্যায় সময় মধ্যে পণ্ডিতমণ্ডলী ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ কি অলসভাবে বসিয়া থাকিতেন? শাস্ত্র চিন্তায় দিনরাত্রি যাপন করিতেই যাঁহারা ভাল বাসেন, তাঁহারা কি নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে পারেন? পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। সকলকেই পুস্তকাদি লিখিয়া লইতে হইত। বর্ত্তমান কালের ন্যায় পূর্ব্বে পুস্তকাদির বহুল প্রচার ছিল না। এক্ষণে আমাদিগকে পুস্তকের অভাবে কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা টীকা টীপ্‌পনী এমন কি অনুবাদ ও প্রশ্নোত্তর পর্য্যন্তও অনায়াসে অল্পমূল্যে ও অল্পায়াসে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইতেছি। কিন্তু টোলের ছাত্রগণ ও অধ্যাপকবর্গ এখনও মুদ্রিত পুস্তক অতি অল্পই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের এখনও অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকই মুদ্রিত হইয়াছে; রাশীকৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ পণ্ডিতবর্গের গৃহ ও চতুষ্পাঠী সুশোভিত করিতেছে। অনধ্যায় সময়ে তাঁহারা গ্রন্থ লিখন ব্যাপারে নিরত থাকিতেন ও থাকেন বলিয়া অনুমিত হয়।

কথিত আছে যে নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথ যখন তৎকালীন সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধানতম স্থান মিথিলার মহামহোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্রের টোলে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহাকে অধীত যাবতীয় পুস্তক গুরুদেবের চতুষ্পাঠীতে রাখিয়া শূন্যহস্তে গৃহে আসিতে হইয়াছিল। মিথিলা হইতে অন্যত্র গ্রন্থাদি

নীত হইলে বা কালক্রমে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতবর্গের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কোন ছাত্রকেই কোন গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া আসিতে দিতেন না। রঘুনাথও এই চিরন্তন প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া অধীত প্রিয়তম গ্রন্থাদি রাখিয়া আসিলেন বটে. কিন্তু যাবতীয় অধীত বিষয় অবিকল তাঁহার স্মৃতিপটে এত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল যে তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিয়াই তত্ত্বচিন্তামণি ও আলোক নামক তাহার সুপ্রসিদ্ধ বিবৃতিখানি অনায়াসে লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি অলৌকিক প্রতিভাবলে নবদ্বীপকে ন্যায় ও তর্কশাস্ত্র অনুশীলনের সর্ব্বপ্রধান স্থানরূপে পরিণত করিয়া, মিথিলার গর্ব্ব সবিশেষ খর্ব্বীকৃত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মিথিলা হইতে দলে দলে ছাত্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের যশঃ-সৌরভ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়া নবদ্বীপকে সরস্বতীদেবীর প্রিয়তম বিলাসক্ষেত্রে পরিণত করিল। এই কিম্বদন্তীর মূলে কতদূর সত্য নিহিত রহিয়াছে, বলিতে পারি না। কিন্তু এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে পুস্তকের অভাবে টোলের ছাত্রবর্গকে কতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হইত, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণিত হইতেছে। অতএবই অনুমান হয় অনধ্যায়ের অধিকাংশ সময় টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ গ্রন্থ লিখন ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিতেন।

আমরা অতঃপর নবদ্বীপাদি স্থানের টোলের প্রধান প্রধান কতিপয় পরলোকগত ও জীবিত পণ্ডিতকুলতিলকগণের নাম ও বিরচিত—গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ইহারা সকলেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের দরুণ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। মহাজন দিগের নামকীর্ত্তনে ও পুণ্য আছে। তাঁহাদের নাম ভিন্ন আমরা অন্য কিছু জানিতে পারি নাই। লেখকের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে যোগ্যতর সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাম জানিয়া তাঁহাদের জীবনী ও ক্রিয়াকলাপাদি লিপিবদ্ধ করণান্তর লোক সমাজে প্রচারিত করিতে পারেন, অথবা কৌতুকী হইয়া সংগ্রহে যত্নবান হইতে পারেন এবং ভবিষ্যতে ইহাদের নামমাত্রে পর্য্যবসিত অস্তিত্বের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ জীবনী ও সাময়িক চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই কি না—এই আশা এই সামান্য প্রবন্ধ লেখককে অল্প সংখ্যক প্রধানতম পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

শঙ্কর তর্কবাগীশ, শ্রীরাম শিরোমণি, হরমোহন তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত হরিনাম তর্ক সিদ্ধান্ত—ইহারা অতি প্রসিদ্ধ নবদ্বীপবাসী নৈয়ায়িক। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় বর্ত্তমান কালে নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। শ্রীযুক্ত হরিনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয় মূলাযোড় সংস্কৃত কালেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যের মুক্তিবাদের টীকাকার। ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন (বিবাদ ভঙ্গার্ণব নামক স্মৃতি সংগ্রহ প্রণেতা) ও রামদাস তর্কলঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। রামধন তর্কপঞ্চানন ইনি বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোঁকদীগ্রামে, ব্রজ-

কুমার বিদ্যারত্ন,বর্দ্ধমানে ভাটপাড়ায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন, গুপ্তিপাড়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। মুরসিদাবাদে বৈদ্যকুলতিলক চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ গঙ্গাধর মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী নামকটীকা, মহিম্ন-স্তব ও চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

দেবীতর্কালঙ্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, লক্ষ্মীনাথ ন্যায়ভূষণ, রামলোচন ন্যায়ভূষণ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন নবদ্বীপের অতি প্রসিদ্ধ স্মার্থ পণ্ডিত। দেবী তর্কালঙ্কার কৃত স্মার্থ শিরোমণি রঘুনন্দনের গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম আদৃত ও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রণীত স্মৃতির অনেক পত্রিকা (পাতারা) প্রচলিত আছে। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন চৈতন্যদেবের ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় উক্ত গ্রন্থের প্রতিবাদচ্ছলে চৈতন্যচন্দ্রোদয়াঙ্ক প্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। গুপ্তিপাড়ায় রামধন বিদ্যালঙ্কার এবং কলিকাতায় ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও ভারতচন্দ্র শিরোমণি প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে ধাম্রকার চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন (ইঁহার পত্রিকা চান্দ্রী পাতারা নামে প্রসিদ্ধ) ও দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌম, অভয়ানন্দ, গোলোক সার্ব্বভৌম, কাঠাদিয়ার কমল সার্ব্বভৌম, ইচাপুরার তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি, জপসার চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ, পয়সার্গার সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, রাজনগরের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশ, বজ্রযোগিনীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন, সাৎরাপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কার ভোজেশ্বরের কালীনাথ তর্কভূষণ—সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও করিয়াছেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কুরাপাড়ার কালীকান্ত শিরোমণি, দীনবন্ধু ন্যায়পঞ্চানন (পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ইঁহার ছাত্র) ভোজেশ্বরের শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ শিরোমণি, কুরসাইলের শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রধান বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

বৈয়াকরণের মধ্যে কুরাপাড়ার নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, শুভঢ্যার কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম, অমরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী শাক্তার শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার, পয়সার্গার পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ, ইদিলপুরের রঘুনাথ চক্রবর্ত্তি (অমরকোষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকা প্রণেতা), উজিরপুরের হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ, এবং কোটালিপাড়ের শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, ত্রিপুরা জিলার শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কভূষণ ও বোয়ালিয়ার শ্রীযুক্ত মাধব তর্কচূড়ামণি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলাপ ব্যাকরণের অংশ বিশেষের টীকা রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয় মনোদূত নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জে উজিরপুরের গৌরীনাথ

তর্কবাগীশ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি (ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, পূজ্যপাদ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন) কলসকাঠির কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম ও শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ বিদ্যালঙ্কার, মানপাশার কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, কোটালিপাড়ার তারিণীচরণ শিরোমণি (কবিতা রচনে ইহার সবিশেষ নৈপুণ্য ছিল), গোবিন্দ ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার এবং বারপাইকার তারিণীচরণ শিরোমণি—নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত। রামকিঙ্কর ন্যায়ভূষণ ও রামকেশব ন্যায়ালঙ্কার বাখরগঞ্জে প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কোটালীপুরের মধুসূদন সরস্বতী ভাগবৎ পুরাণের ও শ্রীমদ্ভগবৎগীতার টীকা রচনা করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রথম প্রস্তাবে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ও অন্যান্য স্থানের অনেক পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছি। সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যোগে যে গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে টোলের তীর্থাভিধেয় উপাধীর পরীক্ষা বৎসর বৎসর গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়া টোলসমূহের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সদনুষ্ঠানের জন্য তিনি বস্তুতই বঙ্গবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পরীক্ষা কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে ও অপক্ষপাতিতার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পূজনীয় ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বকৃত টীকার সহিত কাব্যপ্রকাশ নামক মম্মটভট্ট প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ, রত্নপ্রকাশাদি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত কাব্যপ্রকাশের সুবিস্তৃত ও নৈয়ায়িক-বিচারাদি পরিপূর্ণ একখানি টীকা আছে।

সেরপুর নিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে কাব্য ও অলঙ্কার অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তিনি স্বকৃত ভাষ্যসহ ছন্দোবদ্ধে তত্ত্বাবলী নামক বৈশেষিক দর্শন, সতী পরিণয়, আনন্দ তরঙ্গিনী, চন্দ্রবংশ ও শিক্ষা নামক বাঙ্গলা পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

প্রধান পণ্ডিতগণের মধ্যে যে কয়েক জনের নাম উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বঙ্গদেশে সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রেরই সমধিক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। অন্যান্য শাস্ত্র (স্মৃতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, পুরাণ ও আয়ুর্ব্বেদ) অনেক কম আলোচিত ও অধীত হইয়া থাকে। বেদ, উপনিষদ, জ্যোতিষ ও অন্যান্য দর্শনের চর্চ্চা বঙ্গদেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রের পুস্তকাদি অনেক খুঁজিয়াও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণের গৃহে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

সম্প্রতি পণ্ডিতগণকে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। অর্থের অভাবই ইহার একমাত্রকারণ। পণ্ডিতগণ বড়লোকের বাড়ী [illegible] যাহা কিছু

পাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন শিষ্যও যজমান দিগের প্রদত্ত অর্থই তাঁহাদের প্রধান সম্বল। ছাত্র পড়াইয়া তাঁহারা কিছুই গ্রহণ করেন না। বরং ছাত্রদিগের আহার ও অধ্যয়নের তৈল প্রভৃতির খরচ নিজ হইতে বহন করিয়া থাকেন। একে পরিবারের ভরণ পোষণাদির ব্যয়, তাহাতে আবার ছাত্রদিগের অধ্যাপনার ব্যয়—এই দ্বিবিধ ব্যয়ভারে পণ্ডিতগণ জর্জ্জরিত ও নিষ্পীড়িত হইতেছেন। পণ্ডিতবর্গের মধ্যে স্বচ্ছল অবস্থার লোক অতি অল্পই আছেন। জমিদারী ও তালুকদারী তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা কিছু কিছু পুরস্কার পাইয়া থাকেন বটে, তাহাও তাঁহাদের ব্যয়ভার সংকুলনে যথেষ্ট নহে। কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে অর্থলোভে নানাবিধ বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। অর্থের জন্য তাঁহাদিগকে সময় সময় পরোপাসনায় ও তোষামোদে নিযুক্ত থাকিয়া আত্মসম্মাননা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহারা অনেক সময় ধর্ম্মে ও পাণ্ডিত্যে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের চিরন্তন রক্ষক, হিন্দুসমাজের প্রকৃত নেতা তাঁহারা সময়ক্রমে আপনাদারে ধর্ম্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও উচ্চপদ ভুলিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত অধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কি পরিতাপের বিষয়!! হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার তাঁহারাই মূল কারণ।

ইংরেজী শিক্ষা যে প্রকার বহু ব্যয়সাধ্য তাহাতে উহা বিস্তারিতরূপে দেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া সম্ভব পর নহে। এক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজীশিক্ষায় দেশীয় অতি অল্প লোকই শিক্ষিত হইয়াছে। নিঃস্ব লোকের পক্ষে এরূপ বহুব্যয়সাধ্য শিক্ষা দ্বারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে সুশিক্ষিত করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইংরেজী শিক্ষার বলে যাঁহারা শিক্ষিত-লোকের অবিসম্বাদিত নেতা ও পরিচালক, তাঁহাদের অনুচর সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক কম। তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা সমাজ মধ্যে এক্ষণ পর্য্যন্ত ও সংস্থাপিত হয় নাই বলিলেই হয়। সমাজের অধিকাংশ লোক এক্ষণে ও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও অন্নচিন্তায় পরিক্লিষ্ট। তাই বলিতেছিলাম যে পণ্ডিতগণই হিন্দু সমাজের নেতা। হিন্দু সমাজে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা এক্ষণ পর্য্যন্তও সংস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু দিনে দিনে পণ্ডিতগণের হস্ত হইতে ক্ষমতা চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বকালের ন্যায় সম্মানিত ও পরিপূজিত হইতেছেন না অর্থলোভে দুষ্কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। হিন্দুসমাজ স্তম্ভিত ভাবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহসী হইতেছে না। কিন্তু পণ্ডিতগণের কার্য্য কলাপের প্রতি তাহাদের বিরাগ ও ঘৃণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সময় থাকিতে পণ্ডিতদিগের সাবধান হওয়া উচিত। নতুবা হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের শিথিল বন্ধন শিথিলতর হইয়া তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

পণ্ডিতগণের মধ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরই যেন অধিক বলিয়া বোধ হয়। বাহ্যিক শুদ্ধির দিগে তাঁহাদের যেপরূপ দৃষ্টি, চিত্ত শুদ্ধির প্রতি সেইরূপ যত্ন ও মনোযোগ

প্রদত্ত হইলে—তাঁহারা প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইবেন। নতুবা তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। সরলতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, নিরহঙ্কার, সমদর্শিতা, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় অকৃত্রিম ভক্তি, প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রানুশীলন, নিঃস্বার্থপরতা, আত্মাভিমান, চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি না থাকিলে সমাজের নেতা হইতে কেহ পাবে না। পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সকল গুণের নিতান্তই অসদ্ভাব দেখা যায়। অন্তঃকরণে ভক্তি থাকুক আর নাই থাকুক সন্ধ্যা পূজাদি প্রাত হিক অনুষ্ঠান করিলেই তিনি সম্মানিত হইবেন। যে সকল মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হয়, যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়—তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতেছেনা. তাহাদের নিগূঢ়মর্ম্ম কিছুই জানি না. ময়না পাখীর ন্যায় সেই সকল প্রত্যহ আবৃত্তি করিতেছি—তাহাতে আমার কিছুই ফল হইতেছে না, তথাপি আমি গোঁড়া হিন্দু বলিয়া আদৃত ও সম্মানিত হইতেছি। ইষ্টদেবতার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে সময়ে আমার মন পরের সর্ব্বনাশের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে। অভ্যস্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া পূজা সমাপ্ত করিতেছি। আমি গোঁড়া হিন্দু, কিন্তু ব্রাহ্মণ কি পূজনীয় লোককে অভিমানে স্ফীত হইয়া সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিতেছি না, মিথ্যা কথা আমার জিহ্বাগ্রে সদা বিরাজ করিতেছে, ভ্রমেও সত্য কথা বলি না। পরের অনিষ্ট বই ভ্রমেও ইষ্ট করি না। অনায়াসে-মদ্যপানে উন্মত্ত হইতেছি, বেশ্যালয়ে গমন করিতেছি, পরের দ্রব্য সুযোগানুসারে বলে ছলে অপহরণ করিতেছি। চিত্তের পবিত্রতা আমার কাছে আকাশ কুসুম। আমার মধ্যে ধর্ম্মভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম কিছুই নাই। আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, শাস্ত্রজ্ঞান কি পাণ্ডিত্য নাই —কিন্তু আমি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের অযথা নিন্দা করিতেছি, ব্রাহ্মদিগকে জারজ গর্দ্দভ প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট বিশেষণে সুশোভিত করিয়া স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছি। অর্থ লইয়া আমি অহিন্দুকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিতেছি, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য অম্লান-বদনে অনুষ্ঠান করিতেছি, দুইপক্ষ হইতেই টাকা লইয়া দুই দিগেই পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিতেছি। আমি কৌলীন্য প্রথানুসারে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দশটী বিবাহ করিয়াছি, আমার ঘরে অবিবাহিতা ভগ্নী ও কন্যাগণ বয়স্থা হইয়াছে তাহাদের বিবাহে যত্ন করিতেছি না, তদনুষ্ঠানে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে তাহা বুঝিতেছি, তথাপি শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ পুরঃসর তাহার প্রতিবাদ করিতে বিমুখ হইতেছি না। এত দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যত রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করিতেছি, আমার সমুদয় পাপ ধ্বংশ হইয়া যায় আমার প্রাত্যহিক হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান দ্বারা।

প্রত্যহ সন্ধ্যাপূজাদি অনুষ্ঠান করিলেই আমি সমস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকি। অথবা আমার নিকট এসকল দোষ কি পাপ নয়, কিন্তু আমার মজ্জাগত গুণ। আমি গোঁড়া হিন্দু আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলে সাধ্য কি? হিন্দু সমাজের অগ্রণী পণ্ডিতগণ আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলি-

বেন না। আমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না। কারণ এই সকলের সমাজে কোনও শাসন নাই। আমি সৃষ্টিছাড়া জীব নই। সমাজ মধ্যে যাহা দেখিতেছি, তাহারই অনুষ্ঠান ও অনুকরণ করিতেছি মাত্র। আর যে পণ্ডিতগণ আমাকে শাসন করিবেন, তাঁহাদের মধ্যেও এ সকলের অসদ্ভাব নাই। তবে আর আমার ভয় কি?

হিন্দু সমাজে অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া সমাজ ও ধর্ম্মকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। সে সকলের সংস্কার পণ্ডিতমণ্ডলী ভিন্ন অন্যের করণীয় নহে। ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া পণ্ডিতগণ সমাজকে ও দেশকে উদ্ধার করিয়া বঙ্গবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হন ইহা আমাদের ঐকান্তিকী বাসনা। পণ্ডিতগণের মধ্যে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূরীভূত করিয়া তাঁহারা সমাজের উদ্ধার সাধনে বদ্ধ পরিকর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্যই অভীপ্সিত ফল লাভ হইবে। নতুবা দেশের ও সমাজের মঙ্গল সুদূর পরাহত। দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ সংহিতাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণকেও ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতাদিগের পদানুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কবে আমরা সেই দিন আগত দেখিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব? কবে পণ্ডিতগণ স্বার্থপরতা ও লোভের হস্ত এড়াইয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল কার্য্য সাধনে যত্নপর হইবেন? কবে তাঁহাদের টোলে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীগণ দলে দলে সমবেত হইয়া তাঁহাদের চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ করিবেন? কবে দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ও দেশহিতৈষী ধনকুবের ও রাজাগণ টোলের পণ্ডিতগণের যথোচিত সাহায্য করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পাঠীগুলিতে পূর্ব্বতন আর্য্যর্ষিগণের পবিত্র আশ্রমে পরিণত করিবেন?

কবি কুলতিলক কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের প্রথমাঙ্কে মহর্ষি কণ্বকে কুলপতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। টীকাকারগণ কুলপতি শব্দের অর্থ এই রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।—
“মুনীনাংদশসাহস্রং যোঽন্নদানাদি-পোষণাৎ
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥”

মহর্ষি কণ্বের সেই পবিত্র আশ্রমের কথা ভারতবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। মালিনী তীরবর্ত্তী সেই পুণ্যময় আশ্রমে মহর্ষি কণ্ব যজনযাজন অধ্যয়ন, ও অধ্যাপনাদি কার্য্য পরম্পরার অনুষ্ঠানে সময় অতিবাহিত করিতেন। শারদ্বত—প্রমুখ শিষ্যবর্গে পরিবেষ্টিত মহর্ষি কণ্বের অধিষ্ঠিত রমণীয় ও পবিত্র আশ্রমের দৃশ্য কল্পনা করিতেও মনে কত আনন্দ উদিত হয়। এ সময়ে বঙ্গভূমে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি মহর্ষি কণ্বের ন্যায় অধ্যাপক শারদ্বতের ন্যায় নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় শিষ্যের অভ্যুদয় একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রতি অধ্যাপক ও ছাত্র সেই পবিত্র আদর্শসম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবান্ হউন। প্রতি টোলে ও চতুষ্পাঠিতে মহাকবি সৃষ্ট সেই পবিত্রতম মনোমুগ্ধকর কাল্পনিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিয়া চরিতার্থ হই।*

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

* সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে বরিশাল ব্রজমোহন ইংরেজী বিদ্যালয়ের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রবন্ধ সঙ্কলন সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র।*

অন্ত্য জীবন।

কৃষ্ণনগর—অন্নদামঙ্গল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালী দর্শন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারতচন্দ্রও তাঁহার আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করিয়া কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন। কৃষ্ণনগরের সমৃদ্ধিশালী রাজাদিগের বাটী দর্শন করিয়া গুণাকরের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা তিনি অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যথাযথ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—উত্তরে 'মুরসিদাবাদ,' পশ্চিমে 'গঙ্গাভাগীরথীখাদ' দক্ষিণে 'গঙ্গা সাগরের ধার' ও পূর্ব্বে 'ধূল্যাপুর' পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ও সুবিখ্যাত 'চৌরাশি পরগণার' অধিকারী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহুমূল্য রত্নাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। চারি পাশে মহারাজের পুত্রগণ, মন্ত্রিগণ সভাসদ্‌গণ, পারিষদ্‌গণ, অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারীগণ ও আত্মীয় স্বজনগণ যথোপযুক্ত আসনে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তারপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আপন সভাসদ নিযুক্ত করিলেন। ভারতচন্দ্রের মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল। ৪০৲ টাকা বেতন তখনকার দিনে যথেষ্ট ছিল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের একজন প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। যে পঞ্চব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গলার সিংহাসন হতভাগ্য সিরাজোদ্দৌলার হস্ত হইতে কৌশলময় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। শুধু একজন এমন নহেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কৃষ্ণচন্দ্র শিশুকাল হইতেই নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা রঘুরামের মৃত্যুর সময় কৃষ্ণচন্দ্রের বয়ক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। রাজা রঘুরাম আপন বৈমাত্রেয়ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। নবাবও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তারপর রাজা রঘুরামের মৃত্যু হইলে জমিদারী প্রাপ্ত হইবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহা তদীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিশেষ পরিচায়ক। নিষ্ঠুর প্রকৃতি, নীচমনা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট হইতে যে প্রকারে পিতৃ পৈতামহিক ঋণ জাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তদীয় সুচতুরতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ইহাভিন্ন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিখ্যাত কীর্ত্তিচিহ্ন সকল অদ্যাপি তাঁহার নাম কীর্ত্তন

---

* "রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র" প্রবন্ধ আমার লিখিত নহে। ইহা আমার অনুরোধ ক্রমে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত রায় লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী নব্য ভারতে প্রকাশ করিবার জন্য আমি সম্পাদক মহাশয়কে দিয়াছিলাম, এজন্যই প্রবন্ধের শেষে আমার নাম মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

করিতেছে। ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসন যাহা কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ যাত্রী প্রত্যেক ব্যক্তিরই নয়ন গোচর হইয়া থাকে সেই কৃষ্ণগঞ্জ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় নামে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে প্রায় দুই মাইল দূরে ইচ্ছামতী ও অঞ্জনা নদী দ্বয়ের সহিত মিলিত প্রবাহশালী জলাশয় বেষ্টিত প্রকাণ্ড ভবনের যে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। যখন বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্রাদিগের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল তখন কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরের রাজবাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ভবন নির্ম্মাণ করেন এবং তথায় এক নগর স্থাপন করিয়া তাহার নাম শিবনিবাস প্রদান করেন এবং চতুর্দ্দিকের জলাশয়ের নাম কঙ্কনা রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ইহার পর হইতে ঐ নগরেই বাস করিতে লাগিলেন, মহারাষ্ট্রা দিগের উৎপাত নিবারিত হইলেও ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ইহা ভিন্ন তিনি আরও অনেকানেক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বাস্তবিকই রাজার সভা ছিল। তাহাতে অনেকানেক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের সমাবেশ ছিল। বিশেষতঃ তিনি বিদ্বানের প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। যেমন অন্যান্য রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালিক গুণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না তেমনি বিদ্যজ্জন-সম্মিলনী গঠন পক্ষে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তিনি যখন যেখানে বিদ্বান্ গুণশালী ব্যক্তি অবলোকন করিয়াছেন তখনই তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাই ভারতচন্দ্র অতি সহজে উক্ত মহাত্মার সভাসদ রূপে বরিত হইতে পারিয়াছিলেন।

আজকাল ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় রাজত্বশূন্য অনেক ব্যক্তি শুধু রজত-কাঞ্চনের শুভ্ররক্তিমাচ্ছটায় রাজা মহারাজা উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশ অন্তঃসার শূন্য রাজা মহারাজাতে পরিপূর্ণ করিতেছেন। অনেকের হয়ত রাজা হইবার জন্য কি কি সরঞ্জাম এবং দ্রব্যাদির প্রয়োজন তাহার কিছুই জানা নাই। আজি কালির কর্ত্তারা শুধু শুভ্রশরীর মহাপুরুষ দিগকে স্বীয় ইষ্ট দেবজ্ঞানে তাঁহাদের পূজোপকরণ ষোড়শোপ-চারে প্রস্তুত করিয়াই আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন তাহা ভিন্ন রাজোপযোগী সদগুণের নাম মাত্রই নাই। এ সমস্ত কালের দোষ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে অবশ্য কেহই এমন রাজা বলিয়া মনে করিবেন না, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বাঙ্গালী চিরকালই উপাধি প্রিয়। আজিও কতশত বঙ্গের কুসন্তান প্রতিবেশীর দুঃখ বিমোচনে অনুমাত্রও যত্নবান না হইয়া অর্থ শূন্য আড়ম্বর পূর্ণ উপাধি লাভে অনর্থক বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও শুধু রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধির জন্য বাঙ্গালার সিংহাসন মুসলমান দিগের হস্ত হইতে ইংরেজ হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের উপরিলিখিত এই একটি দোষ ছাড়া আর সমস্তই গুণছিল। এত গুণ ছিল বলিয়াই তিনি বাঙ্গালীর নিকট পূজ্য। তাই আজিও বাঙ্গালী তাঁহার মহামহিমাময় নাম শুনিলে আহ্লাদে অভি-ভূত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কত সাধু

লোককে পোষণ করিতেন তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। তাঁহার আশ্চর্য্য সভা মণ্ডপ কত গুণী লোকের আবাস নিকেতন ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আর তাঁহার দরবারই বা কত শোভার আধার ছিল। কখন বা নর্ত্তকীগণ মনোহর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া নর্ত্তন করিতেছে। কোথায়ও বা সুশোভিত চন্দ্রাতপের নীচে সুশোভিত রত্নাসনবিহারী মহারাজার সম্মুখে গায়কগণ তাঁহারাই স্তুতিগান করিতেছে। কখন বা পণ্ডিতাগ্রগণ্য সভাসদগণ সুললিত ছন্দোবদ্ধ বিশিষ্ট বাক্যপরম্পরাসম্বলিত গল্প দ্বারা মহারাজার মন সন্তুষ্ট করিতেছে। কোথাও বা পারিষদগণ স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় সুন্দর সুমিষ্ট কথা দ্বারা রাজাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিতেছে। কখনও বা রাজা প্রজামণ্ডলীর দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাদের দুঃখ বিমোচনের জন্য সচেষ্ট হইতেছেন। কখন বা প্রোক্ত বুদ্ধিমান সুচতুর দেওয়ান রঘুনন্দন রাজ্যের উন্নতির কথা, সুগভীর মন্ত্রনার কথা-সকল যথাযথ রূপে রাজাকে কহিতেছেন। কখনও বা অর্থগ্রাহী ব্রাহ্মণ সকল অর্থ ভিক্ষা করিবার জন্য রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেছেন। মহারাজ সমস্তই নিজে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। যাহার যাহা অভিলাষ সমস্তই পূর্ণ করিতেছেন। হায়! তেমন দিন কি আর বাঙ্গলায় আসিবে? যদি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুসলমানের পরিবর্ত্তে ইংরেজ বাঙ্গলার সিংহাসনে স্থাপন না করিয়া স্বীয় ক্ষমতাবলে বাঙ্গালার সিংহাসন হিন্দুর সিংহাসন করিয়া লইতেন তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গালীর ভাগ্যে আজি কালির এই বিষম অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত না। কিন্তু যাহা ভবিতব্য তাহা খণ্ডান কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বঙ্গবাসীর দুঃখের কষ্টের জীবন শীঘ্র ফুরাইবার নহে। সুখ তাহাদের কপালে নাই। নহিলে এমন সুযোগ থাকাসত্ত্বেও কেন চতুর চূড়ামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন করিবেন। বিধাতা উচ্চ বিমানে অটুট আসনে বসিয়া

'দুঃখিনী ভারত ভাগ্যে অভ্রান্ত ভাষায়
লিখিছেন বজ্রাঘাত ভবিতব্যতার।'

তাই বাঙ্গালীর দারিদ্র যাইবার নহে।

ভারতচন্দ্র রায় এইরূপে বিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ নিযুক্ত হইলেন। তখনকার রাজাদিগের দরবার বা কাছারী সকালে বিকালে হইত। এখন যেমন ইংরেজ রাজাদিগের প্রথা অনুসারে বাবুদিগকে কোনরূপে ভাতে ভাত মুখে গুঁজিয়া মাথার ঘাম পায়ে পড়িলেও ঠিক ১০টার সময়ে আফিসে যাওয়া চাইই নতুবা জবাবদিহিতে পড়িতে হয়, তখন তেমন ছিল না। তখন যাহারা রাজসরকারে চাকরী করিত তাহাদিগের আহারান্তে বিশ্রাম করিবার বিলক্ষণ সময় ছিল। সুতরাং এখনকার দিনের অস্থি চর্ম্মসার বাবুর ন্যায় বাতাসে দুলিয়া পড়িত না বরং বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। ভারতচন্দ্র ও সকালে বিকালে অন্যান্য সভাসদদিগের ন্যায় রাজ দরবারে হাজির হইতেন, এবং তদনুযায়ী সর্ব্ব বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তাঁহার কিছুকাল অতিবাহিত হইল। তার পর ভারতচন্দ্র কখন কখনও দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সমস্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত

প্রীতি লাভ করিতেন। রাজার পাঠ সমাপনান্তর অন্যান্য সভাসীন ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত পাঠ করিতেন এবং তাঁহারাও ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কখনও বা ভারতচন্দ্র কোন কোন কবিতা নিজেই পাঠ করিয়া সমস্ত সভাসদ ও পারিষদগণে বেষ্টিত রাজাকে শুনাইতেন। রাজা সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভারতচন্দ্রকে গুণাকর উপাধি প্রদান করিলেন। ভারতচন্দ্র এই সময় হইতে গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় নামে পরিচিত হইলেন।

ভারতচন্দ্র এইরূপে গুণাকর উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগরে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ছন্দানুসারে তৎপ্রণীত চণ্ডীর অনুকরণে অন্নদামঙ্গল নামে এক গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করিলেন। ভারতচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ভারতচন্দ্রের রচিত কবিতা সকল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইল। এইরূপে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের সৃষ্টি হয়।

অন্নদামঙ্গল ধর্ম্মগ্রন্থ। অন্নদার মাহাত্ম্য পৃথিবীতে প্রচার করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

অন্নদামঙ্গল গুণাকরের সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম অংশই অন্নদামঙ্গল। বোধ হয় ভারতচন্দ্র শুধু এই টুকুই রচনা করিয়া এই গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন এবং পরে বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ রচনা করিয়া ইহার সঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রথা অনুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্রকে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছিল ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কবিকঙ্কণকে অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়াই কি তাহাতে তাঁহার নিজের কিছুই নাই? তাঁহার মত এত সুন্দর মধুর পদবিন্যাসের সঙ্গে এত সুন্দর অলঙ্কার লহরী প্রায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কাহারও কবিতাতে দৃষ্ট হয় না। প্রথমে তিনি দেব দেবীর বন্দনাতে গ্রন্থ সূচনা করিয়া পরে সৃষ্টি রহস্য সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন। আমরা এইস্থলে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের সারভাগ বিবৃত করিব।

দক্ষের সতীনামে একটী কন্যা জন্মে। দেবর্ষি নারদ দক্ষকে বুঝাইয়া সেই কন্যাটিকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দেন। শিবের সেই অপরূপ বেশ দেখিয়া দক্ষ প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন। কোন্ পিতা বৃদ্ধ জামাই দেখিয়া দুঃখিত না হন? তাই দক্ষ বৃদ্ধ জামাইয়ের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। শিব ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া সতীকে লইয়া নিজ আলয় কৈলাসধামে গমন করিলেন। তাহাতে দক্ষের ক্রোধানল আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি শিবের অপমান করিবার জন্য এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতে অন্যান্য সমস্ত দেবগণের নিমন্ত্রণ হইল কিন্তু শিবের নিমন্ত্রণ হইল না। দক্ষকন্যা সতী এই মহা যজ্ঞের কথা নারদের মুখে শুনিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন বাপকে বুঝাইয়া যাহাতে নিজের স্বামীরও নিমন্ত্রণ হয় এবং নির্ব্বিঘ্নে পিতৃকৃত যজ্ঞ সম্পন্ন হয় তাহা করিবেন। কারণ শিব দেব দেব মহাদেব সুতরাং শিব শূন্য যজ্ঞই হইতে পারে না। পাপদক্ষ তাহা জানিত না। শিব কিন্তু

সতীকে দক্ষালয়ে পাঠাইতে একেবারেই নারাজ। তখন সতী দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি দেখাইয়া শিবকে ভয় দেখাইয়া পিত্রালয়ে যাইতে শিবকে স্বীকৃত করিলেন। সতী দক্ষালয়ে গমন করিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিয়া শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। পতির নিন্দা সতীর প্রাণে সহিল না। সুতরাং তিনি দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তারপর শিব সতীর দেহত্যাগ শ্রবণে দক্ষালয়ে গমন করিলেন এবং দক্ষ যজ্ঞ নাশ করিয়া দক্ষের জীবন সংহার করিলেন। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি শিবের স্তুতি করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া দক্ষের জীবন দান করিলেন। কিন্তু দক্ষের মনুষ্য মুণ্ড না হইয়া ছাগমুণ্ড হইল। ইহা সতীর অভিশাপ।

তারপর প্রেমে পাগল শিব সতীর দেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিধি বিষ্ণু ষড়যন্ত্র করিয়া, সতীর দেহ বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে সতীদেহ খণ্ড পড়িল সেই সেই স্থান মহাপীঠ নামে হিন্দুর মহাতীর্থ হইল। এইরূপে পীঠের উৎপত্তি হইল। তার পর সতীর দেহ আপন স্কন্ধে নাই দেখিয়া শিব মহাধ্যানে হিমালয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া মহাযোগে উপবেশন করিলেন।

তারপর আকাশবাণীতে সতীর হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবতাগণ শিববিবাহের উদ্যোগ করিলেন। এখানেও নারদ মহামুনি ঘটকালীতে প্রবৃত্ত। হিমালয় বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। নারদও অমনি লগ্নপত্র করিয়া বিদায় হইলেন। কিন্তু যাঁহার বিবাহ তিনিত ধ্যানে নিমগ্ন। কিছুতেই তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় না। অবশেষে মদন শিবের ধ্যান ভঙ্গ করেন কিন্তু হর কোপানলে পুড়িয়া মদন ভস্ম হইয়া গেল। তারপর রতীর ক্রন্দন। রতীর প্রতি আকাশবাণী। শিবের বিবাহ। এখানেও শিবের বৃদ্ধ বয়স দেখিয়া নারীগণ শিবের নিন্দা করিতে লাগিল। শিব এই খানে সতীর প্ররোচনায় মোহনবেশ ধারণ করিলেন। সতীর নাম আর সতী নহে। হিমালয় তাঁহার নাম উমা রাখিয়াছেন সুতরাং এখন সতী উমা নামে পরিচিতা। তারপর হরগৌরীর বৈবাহিক জীবন বর্ণন। তাঁহারা সংসারী হইয়া কিরূপে দাম্পত্য প্রণয়ে কিছুকাল কর্ত্তন করিলেন কিরূপে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বচসা হইত সে সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তারপর শিব অন্ন ভিক্ষা করিতে পৃথিবী ঘুরিলেন কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে কোথাও অন্ন মিলিল না। তারপর বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে গেলেন, লক্ষ্মী তাঁহাকে অন্ন দিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি অন্নের সন্ধান বলিয়া দিলেন। তারপর শিব নিজ গৃহে গমন করিয়া, অন্নপূর্ণা হইতে অন্ন ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে উমার অন্নপূর্ণা নাম জারি হইল। এই সমস্ত বর্ণনা কবিকঙ্কনের চণ্ডীর অনুকরণ।

তারপর শিব কাশীনির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অন্নপূর্ণার পুরী প্রস্তুত করিলেন। তারপর সমস্ত দেবতা মিলিয়া এক সঙ্গে অন্নদার স্তব করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অন্নদাপুরীতে অন্নদার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

তারপর শিব অন্নদার পূজা করিলেন। অন্নদাও সন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বরদান করিলেন। এইরূপে অন্নদার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর অন্নদার মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য ব্যাসের অবতারণা। কিরূপে ব্যাসদেব হরির উপাসনা সার জানিয়া হরকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন; কিরূপে হর-কোপানলে পড়িয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়াছিল; কিরূপে হরি ব্যাসকে হরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া হরি হর এক সপ্রমাণ করিয়াছিলেন; কিরূপে ব্যাস ও হরিকে ছাড়িয়া হরের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং হরিকে তুচ্ছ করিতে লাগিলেন, সুতরাং হর ব্যাসের ভিক্ষা মানা করিলেন; তারপর কিরূপে অন্নপূর্ণা ব্যাসকে অন্ন দান করিলেন ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। হর কিরূপে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হরি ও হরে কোন প্রভেদ নাই বরং দুইই এক তাহা ব্যাসকে বুঝাইয়া দিলেন তাহাও সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ব্যাস কাশী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নিজে এক কাশী নির্ম্মাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন কিন্তু অন্নদার মায়াতে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন ব্যাস নিতান্ত শোকে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন অন্নপূর্ণা দয়া করিয়া যাহা মূল তৎসন্ধান ব্যাসকে বলিয়া দিলেন এবং ব্যাস চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে কাশীতে আসিতে পারিবেন এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই সমস্ত ভারতচন্দ্র কাশীখণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

তারপর বসুন্ধরে অন্নদার শাপ। হরিহোড়ের জন্মবৃত্তান্ত। হরিহোড়ে অন্নদার দয়া ও বরদান। নলকুবেরের শাপ ও নলকুবেরের প্রাণত্যাগ। ভবানন্দ মজুমদারের জন্ম বৃত্তান্ত এবং অন্নদার ভবানন্দ ভবনে গমন ইত্যাদি ভারতচন্দ্রের স্বকপোল কল্পিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্নদামঙ্গল ধর্ম্ম গ্রন্থ এবং অন্নদার মহিমা জগতে প্রচার করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। গুণাকর সে বিষয়ে কত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু কি তিনি অন্নদাকে অন্যান্য হিন্দুর ন্যায় এক ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন? না, তাহা নহে। তিনি অন্নদাকে বিশ্ব জগতের আদি এক ঈশ্বর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র প্রথমেই বলিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমাপ্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি।

যিনি সকলের সার যাঁহার মায়াতে সমস্ত সংসার উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহার তুলনা নাই, উপমা নাই। যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না এবং যাঁহার সমান আর কেহই নাই। কেবল যিনি নিজেই নিজের সমান আর যিনি নিজেই নিজকে সৃজন করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন তিনি আর কেহই নহেন তাঁহাকেই ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রচারিত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণাকে জগতের একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু কি ইহা বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন? না তাহা নহে। অন্নদার সর্ব্বভূতে সমান দয়া। তাঁহার সকলেই সমান।

তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥
হরিহর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে।

যিনি ঈশ্বর তাঁহার সবই সমান। তাঁহার শত্রু নাই মিত্র নাই। তিনি যেমন পুণ্যাত্মাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি তেমন পাপীকেও উদ্ধার করেন। তাই তিনি পতিতপাবন। তাঁহার শত্রু মিত্র ভেদ নাই। তিনি সকলের কষ্ট বিমোচন করিতে সদাই ব্যতিব্যস্ত।

তার পর অন্নদা দয়া করিয়া ব্যাসকে যে আকাশবাণীতে অভয় প্রদান করিয়া শান্তনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজেই নিজের স্বরূপ কহিয়াছিলেন।

ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর॥

এইরূপে ভারতচন্দ্র অন্নদাকেই এক ঈশ্বর রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এত গেল ধর্ম্মাংশ। ধর্ম্মাংশেতেও আমরা দেখাইয়াছি যে ভারত শুধু এক ঈশ্বরকেই পূজা করিতে প্রচার করিয়াছেন। ভারতে যে কেহ জ্ঞানী এবং গুণী জন্মিয়াছেন সকলেই এক ঈশ্বরেরই পূজা করিয়াছেন। তবে অনেকে আজি কালিকার মত নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা বলিতেন সাকার দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন হইলে পর এক ঈশ্বরে চিত্ত সংস্থাপন করিও নহিলে উপাসনাতে মন নিবিষ্ট হইবে না। এক ঈশ্বরকে জানাই হিন্দু ধর্ম্মের চরম কথা। এবং এই চরম কথাই অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে বুঝান হইয়াছে। আজি কালির ধর্ম্মের সহিত প্রাচীনকালের ধর্ম্মের তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে জ্ঞানীগণ চিরকালই এক ঈশ্বরবাদী।

কাব্যাংশেও ভারতের গ্রন্থ উৎকৃষ্ট। একের পর অন্যের সংঘটন এবং মধুর পদবিন্যাস সমস্তই চমৎকার। ক্রোধে অভিভূত দক্ষ শিবের নিন্দা করিতেই ব্যস্ত। শিবকে যাহা খুসী তাহা বলিয়াই গালি দিতেছে। কবি কিন্তু কেমন কৌশল ভরে শব্দ বিন্যাস ও শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যাহাতে বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইবে দক্ষ বাস্তবিক নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করিতেছে। দক্ষের অবশ্য স্তুতি করা ইচ্ছা ছিলনা, সে শিব নামে একবারে চটিয়া অধীর। যেরূপে ইচ্ছা সেরূপে শিবকে গালি দিতেছে। আপাততঃ দক্ষের কথা শুনিলে শিবকে যে গালি দিতেছে তাহাই বোধ হয়। কিন্তু কবির কৌশলময়ী লেখনীতে পড়িয়া তাহাই স্তুতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকিলে এ সমস্ত হয় না। আমরা সেই অংশটকু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি মানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।

গরল খাইল, তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥
সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচার ময় ॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥
যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজে দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায় ॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥
বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী নহে ব্রহ্মচারী
একি মহাপাপ হর ॥

ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব লিপি কৌশল যেখানে সেখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উমা সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময় দেবর্ষি নারদ ধীরে ধীরে বীণা বাজাইতে বাজাইতে তথায় উপনীত হইলেন। এবং উমাকে সেই শুভ্র শরীর শুভ্র শ্মশ্রু মহামুনি প্রণাম করিলেন। ইহাতে পার্ব্বতী কৃত্রিম রোষভরে যেরূপে মাতার নিকটে গিয়া নারদের বিষয় অবগত করাইলেন তাহা অতি চমৎকার। তারপর শিবের বিবাহ এবং শিব ও উমার ঝগড়া আরও চমৎকার এসমস্তে যদিও ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কনের ছায়া মাত্র তথাপি ইহার প্রত্যেক স্থলেই তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমরা মোহিত হই।

ভারতচন্দ্রের আর একগুণ ছিল। তিনি চলিত রীতির সমালোচনা ও চলিত কথা-বার্ত্তা তাঁহার গ্রন্থে সর্ব্বদাই ঢুকাইতে চেষ্টা করিতেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে বিবাহ স্থলে বর উত্তরমুখ হইয়া বসিবে এবং যিনি কন্যা দান করিবেন তিনি পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন কিন্তু প্রচলিত প্রথাতে দেখা যায় যে কন্যাকর্ত্তা উত্তরাস্য ও বর পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়া থাকে। এব্যতিক্রমের সুন্দর মীমাংসা আমরা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাই। মহাদেব বিবাহ করিতে গিয়া ভুলক্রমে কন্যাকর্ত্তার আসনে উপবেশন করিয়াছেন। স্বয়ং বিধাতা এবিবাহের বরযাত্র সুতরাং তিনি এই বিধান করিলেন যে এই হইতে এই নিয়মই সংসারে প্রচলিত হইবে। তাই এই নিয়ম জগতে প্রচলিত হইল।

ব্যাসের অবতারণাতে আমরা ভারতচন্দ্রের আরও কৌশল দেখিতে পাই। ব্যাসকে না আনিলে ভারতচন্দ্র হরিহর যে এক এবং অভেদ এই মহা সত্য বুঝাইতে পারিতেন না। অপিচ অন্নপূর্ণাই যে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই অন্নপূর্ণা; এই হরি অন্নপূর্ণা এবং অন্নপূর্ণাই হরি; এই হর অন্নপূর্ণা এবং এই অন্নপূর্ণাই হর বাস্তবিক সবই এক, ভক্ত যেরূপে ইচ্ছা সেরূপে ভাবুক মূল যে এক; সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে যে এক ঈশ্বর বিরাজিত তাহা বুঝাইতে পারিতেন না। মহা মহিমাময়, সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বস্থান বিহারী পরমঈশ্বরকে বুঝাইবার জন্যই ব্যাসদেবের অবতারণা। আমরা

ব্যাসের অবতারণাতে আরও একটি বিষয় দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্র নিজ জীবনে বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন। পরে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। আবার বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শাক্ত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র বোধ হয় ব্যাসের অবতারণাতে তাঁহার নিজ জীবনের এই সমস্ত কার্য্যের ব্যাখ্যা ইঙ্গিতে আমাদিগকে কহিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া বিষ্ণুকেই সার ভাবিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি পুরাণ আগম ইত্যাদি পাঠ করিয়া যখন ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলেন তখন জানিতে পারিলেন যে যেই শক্তি সেই বিষ্ণু আর যেই বিষ্ণু সেই শক্তি তাই তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছাড়িয়া শাক্ত হইতে কিছুই কষ্ট বোধ করেন নাই।

শিব নামাবলী ও হরি নামাবলীর বিষয়ে যে দুইটী কবিতা ভারত লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পড়িয়া প্রত্যেক ভক্ত হিন্দুর মনেই আনন্দ জন্মে। তারপর গঙ্গা ও ব্যাসের কথোপকথন এবং পরস্পর কৃত পরস্পরের নিন্দা বর্ণনা করিয়া ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে মহাভারতের অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন।

ফলতঃ ভারতচন্দ্রের রচনা যে মোহনকারী ও ভাবময় তাহার বহুল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। পাঠক যদি ভারতের রচিত অন্নদার মোহিনীরূপ ও অন্নদার জরাতীবেশে ছলনা পাঠ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন। যদি দারিদ্র্য বর্ণনা দেখিতে চান তাহা হইলে হরি হোড়ের কাষ্ঠাহরণ বিবরণ পাঠ করুন।

তারপর ভবানন্দ মজুমদারকে দেবতার অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে বোধ হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই ভারতচন্দ্রকে বলিয়া দিয়া থাকিবেন অথবা হয়তঃ ভারতচন্দ্র নিজেই এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমরা ভারতচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা দেখিতে পাই। যে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্র দুঃখের দিনে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে যে ভারতচন্দ্র দুটি মিষ্ট কথা কহিয়া সন্তুষ্ট করিবেন ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। এই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভবানন্দ মজুমদারেরই বংশধর এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এই ভবানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ভবানন্দ তাঁহার সময়ের মধ্যে বাঙ্গলাতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ মানসিংহ, মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গলায় আগমন করেন। তখন ভবানন্দই মহারাজ মানসিংহকে সঙ্গে করিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে গমন করেন। এই মহারাজ মানসিংহের সহায়তায় দিল্লীর দরবারে ভবানন্দ পরিচিত ও জমীদারীর সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এইরূপে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। শাপগ্রস্ত নলকুবের রাম সমাদ্দারের ঔরসে ও সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে ভবানন্দ নামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং নলকুবেরের পত্নীদ্বয় চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভবানন্দ তাঁহাদিকেই বিবাহ করেন। এই ভবানন্দ ও তাঁহার পত্নীদ্বয়ের দেব অংশে জন্মকল্পনা শুধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মন সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে রচিত অথবা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের

আদেশেই রচিত হইয়াছিল। যদি ইহা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে মহারাজ স্বীয় বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এইরূপ বংশ গৌরব বৃদ্ধিকরার ইচ্ছা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যেরই অভিলষিত।

ভারতচন্দ্রের সময়ে বঙ্গদেশ কৌলিন্যের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সমাজে এ কুপ্রথা কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে কিন্তু তৎকালে উহার তীব্র আক্রমণে প্রায় প্রত্যেকেই কঠোর যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতেন। অশিতিবর্ষীয় বৃদ্ধও মৃত্যুর প্রাক্কালে একটি দশম বর্ষীয়া কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়া ইহ সংসার হইতে পাপ দেহ লইয়া বিদায় হইতেন। অন্যপক্ষে পঞ্চদশবর্ষীয় বালক আপন দিদিমার সদৃশ কুলীন কন্যাকেও বিবাহ করিতেন। এই রূপে প্রত্যেক কুলীন সন্তান প্রায় ৪০।৫০ টি কন্যাকে বিবাহ করিতেন। কোন কোন স্থলে ৫।৭টি সহোদরার একই সময়ে একবারে বিবাহ হইত। অভাগিনী কুলীন কন্যাগণ স্বামী বিহনে জীবন্মৃত প্রায় অবস্থান করিতেন। কারণ সকলের ভাগ্যে বৎসরে একবারও স্বামী সন্দর্শন ঘটিয়া উঠিত না। অনেক স্থলে কুলীন কন্যাগণ বঙ্গে পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিয়া নিজ জীবন ও বঙ্গদেশ কলঙ্কিত করিতেন। এ দুর্দ্দশা এখন আর বড় নাই যদিও কিছু থাকে তাহা কালে একেবারেই বিলুপ্ত হইবে।

ভারতচন্দ্র এই কৌলিন্যের উপর কটাক্ষপাত করিয়া অন্নদাকে ভবানন্দ ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাও স্বার্থ-ঘটিত। এক পক্ষে কৌলিন্যের বিষম উৎপাত বর্ণন, অন্যপক্ষে নিজ স্বামীর পরিচয়। আমরা সেই স্থানটি পাঠকদিগকে উপহার দিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। অন্নদা ঈশ্বরী পাটুনীকে নিজ পরিচয় দিতেছেন—

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুণ॥
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥

যাঁহারা করুণা অসীম শুধু তিনিই বলিতে পারেন যে, যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।

ভারতচন্দ্র যেখানে সেখানে বলিয়াছেন যে ঈশ্বরী অর্থাৎ অন্নপূর্ণা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া মানবকে দেখা দিলেন। ভাগ্যবান পুরুষের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বরদান করিলেন। ভারতচন্দ্র যেখানে সেখানে আকাশ বাণীতে নানা কথা কহাইয়াছেন। এ সমস্ত কারণে আমরা ভারতচন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না যেহেতু ভারতচন্দ্র যে সময়ে

বিদ্যমান ছিলেন তখন সকলেই এ সমস্ত বিশ্বাস করিতেন। ভারতচন্দ্র স্বয়ং অবশ্য এ সমস্ত বিশ্বাস করিতেন। আজিও অনেক গোঁড়া হিন্দু এ সকল বিশ্বাস করিয়া থাকেন সুতরাং এই বিষয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ শেষ করিয়া তাহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন। তৎপর কৃষ্ণচন্দ্র এই পুস্তক গান করিয়া শুনাইবার জন্য নিলমণি সমাদ্দার নামক এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিলেন। বোধ হয় নিলমণি সমাদ্দার গান গাহিতে খুব পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা যেমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকে পরিপূর্ণ ছিল তেমন তাহাতে খ্যাতনামা গায়ক বাদকেও পূর্ণ ছিল। নিলমণি সমাদ্দার প্রত্যহ ঐ গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ গান করিয়া রাজাকে শুনাইতে লাগিলেন।

শ্রীরজনীকান্ত [illegible]।

বিলাতের পল্লীজীবন।

মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিতে হইলে প্রথম এই কথা মনে হয়—কি বিষয়ে লিখিব। আজি কালি লেখকেরও অভাব নাই, লিখিবার বিষয়েরও অভাব নাই। পত্রিকার সম্পাদক দিগের সমস্যা এই—কোন্ লেখকের লেখা ছাপাইব; লেখক দিগের সমস্যা এই—কোন্ বিষয়ে লিখিব। আমার এই দ্বিতীয় সমস্যা হইতে কষ্ট পাইতে হয়; যাহা হউক, সৌভাগ্য ক্রমে কাল একখানি বিলাতী কাগজ পড়িতে ছিলাম, সেখানি মাসিক পত্রিকা—তাহাতে দেখিলাম একজন তাঁহার স্পেনদেশে ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপাইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় পত্রিকা গুলিতে প্রায়ই এই রকম ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখা থাকে, পড়িতেও আমোদ হয়। আমি ভাবিলাম আমিও ত ঐরূপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে পারি, এবং তখন এই প্রবন্ধটী লিখিব বলিয়া স্থির করিলাম। আমার আর একটি কথাও মনে আসিয়াছিল, তাহা এস্থলে লিখিলে ভাল ভিন্ন মন্দ হইবে না। কথাটী এই—বিলাতের কাগজে নানা দেশের বর্ণনা থাকে, তাহাতে পাঠক দিগের অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে; শুদ্ধ কেবল নিজদেশ দেখিলে, শুদ্ধ কেবল নিজ দেশের আচার ব্যবহার জানা থাকিলে মনের যে একটী সঙ্কীর্ণতা থাকে, অন্য দেশ দেখিলে, অন্য দেশের আচার ব্যবহার জানিতে পারিলে সে সঙ্কীর্ণতা অন্ততঃ কতক পরিমাণে দূর হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু হায়! আমাদিগের দেশের লোকের পক্ষে অন্য দেশ দেখিবারও যো নাই সুতরাং অন্য দেশ দেখিয়া তাহার বর্ণনা লেখারও যো নাই। কেন? তাহাও কি আবার বলিতে হইবে? বিদেশ ভ্রমণের বিরুদ্ধে আমাদিগের বঙ্গে যতটা কাঠিন্য আছে ভারতের অন্য কোন দেশে ততটা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিছু দিন হইল একজন পঞ্জাবী হিন্দুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন যে তাঁহার জাতীয় লোক আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থে যাইয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে

থাকিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে না। ইহা ব্যতীত, পশ্চিমাঞ্চলের ইতরশ্রেণীর হিন্দুরা মরিসস্ দ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে যাইয় কর্ম্মোপলক্ষে বাস করে একথা সকল লোকেই জানেন। যাহা হউক, আমি এক্ষণে বর্ণনীয় বিষয়ে ফিরিয়া আসি। লণ্ডনের লোকদিগের মধ্যে এই একটী প্রথা আছে যে তাহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার সহরের বাহিরে কোন স্থলে যাইয়া দিন কতক কি মাস থানেক বাস করিয়া আসে—ইহা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কারণ লণ্ডনের ধূম ধূলিময় বায়ু অনবরত সেবন করিলে শীঘ্রই আয়ুক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা, আর তাহা ছাড়া লণ্ডনে ক্রমাগত ইষ্টকময় মরুভূমি দেখিতে দেখিতে লোকের চক্ষু জ্বলিয়া যায়, কিছুদিন বাহিরে সবুজ মাঠ, গাছপালা দেখিলে চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হয়। সত্য বটে লণ্ডনে মাঝে মাঝে ঘেরা জায়গা আছে, আর তাহার মধ্যে অনেক গাছ পালা থাকে, কিন্তু লণ্ডনের তুলনায় এই সকল স্থান গুলি মরুভূমিতেবারিবিন্দুবৎ—আমাদিগের দেশে সকল লোকে বোধ হয় জানেন না যে এক লণ্ডনের অধিবাসী সংখ্যা সমুদয় স্কট্‌লণ্ডের অধিবাসী সংখ্যার সমান। চক্ষু ঠাণ্ডা করিবার নিমিত্ত আর খোলা বাতাস সেবন করিবার নিমিত্ত—দুইটাই জীবন রক্ষার পক্ষে মহৎ বিষয়। আমি মাঝে মাঝে নিজ লণ্ডনের বাহিরে পাঁচ মাইল তফাতে একটী পল্লীতে যাইতাম। এই পল্লীতে প্রথম যে উপলক্ষে যাই, তাহা আমাদিগের দেশের লোকের পক্ষে নূতন বোধ হইবে। আমি এক দিন কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের ল্যাবরেটরীতে (বিজ্ঞানের বিষয় গুলি হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা দেখিবার ঘরকে ল্যাবরেটরী বলে) কাজ করিতেছি, এমন সময় আমাদিগের অধ্যাপক আসিয়া বলিলেন 'তুমি Hay gathering এ যাবে'—আমি বলিলাম 'হাঁ'। Hay gathering শব্দে 'খড় কুড়ান' বুঝায়। খড়কুড়ান বিলাতে একটী আমোদের জিনিষ, বিষয়টা কি শীঘ্রই বলিতেছি। উপরে যে পল্লীর কথা বলিয়াছি সেখানে আমাদিগের অধ্যাপকের খানিকটা জমি ও সে সঙ্গে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর ছিল; তিনি সেখানে আমাদিগকে খড় কুড়ানের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা তাঁহার কয়েকটী ছাত্র, যথা সময়ে (বিকাল বেলা) যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি তাঁহার বাড়ীর লোক সব উপস্থিত আছেন, আরও হয়ত কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন। খড়কুড়ান ব্যাপারটা এই যে কতকগুলি খড় কাটা রয়েছে, তা চাও এক জায়গায় জড় কর (আসল উদ্দেশ্য প্রথমে বোধ করি তাই ছিল;) আর না হয় লোকের গায় ফেলিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগের পাছে পাছে দৌড়াইয়া বেড়াও। কোন রকমে সময়টা আমোদে কাটিয়া দেওয়া। আমাদিগের দেশের লোকে মনে করিতে পারেন যে ছেলে ছোকরারাই ঐ রকম দৌড়াদৌড়ি করে; কিন্তু ঠিক তাহা নহে, অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেও ঐরূপ আমোদে যোগ দিয়া থাকে। যাহা হউক, এইরূপে দৌড়াদৌড়ি ও কথাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে আহারাদির সংস্থানও থাকে, যেমন চা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। প্রথমবার এই খড়কুড়ান নিমন্ত্রণে উক্ত পল্লীতে যাই, তাহার পর সেখানে ঘর দুই লোকের সহিত আলাপ হয়; তাঁহা-

দিগের সহিত সময় সময় দেখা করতে যাইতাম। প্রথম আলাপীর সহিত কিরূপে পরিচয় হয়, তাহা বলি। আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীতে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি লেক্‌চার (উপদেশ বক্তৃতা) শুনিতে আসিতেন; তিনি অনেকদিন আগে বিএ পাস করেন, পরে কর্ম্ম উপলক্ষে কলেজ ছাড়িয়া যান, ধর্ম্মযাজকের ব্যবসায় অবলম্বন করেন, অনেকদিন সংসারাশ্রমে কাটান; কিন্তু এম্ এ ডিগ্রি লওয়ার ইচ্ছা তাঁহার মনে উপস্থিত হয়। বঙ্গবাসীগণ, তোমরা এই কথাটা একবার কাণ দিয়া শোন; তোমাদিগের মধ্যে কয়জনের ছত্রিশ বৎসর বয়সে উনিশ কুড়ি বৎসরের ছাত্রের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা হয়? উক্ত ব্যক্তির সহিত আমার ক্রমে ক্রমে আলাপ হইল—তিনি আমায় তাঁহার বাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তখন উল্লিখিত পল্লীতে ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহার বাড়ী যাইয়া অন্যান্য লোকের সহিত আলাপ হয়। বলা বাহুল্য যে আমার আলাপীরা সকলেই আমার বিশেষ সমাদর করিতেন; তাহার কয়েকটী কারণ ছিল—এক ইংরেজজাতি লোককে যেরূপ সন্তুষ্ট করিতে জানে সেরূপ আমরা জানি না, তাহার পর আবার আমি বিদেশীয়, ভারতবর্ষীয়, ব্রাহ্মণ; ইহা ভিন্ন, আর এক কারণ আমি ইউনিভার্সিটীর উপাধিধারী। বিলাতে ইউনিভার্সিটিউপাধিধারীদিগের অনেক সম্মান, কারণ সাধারণতঃ লোকে অল্প বিস্তর লেখা পড়া শিখিয়া কার্য্য কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়, অর্থোপার্জ্জন অবহেলা করিয়া উচ্চ শিক্ষায় জীবন দেয় এরূপ লোক কমই সেখানে। হায়! আমাদিগের দেশের লোক যদি এম্ এ বি এ পাস করিয়া কেরাণীগিরির উমেদার না হইতেন, তাহা হইলে এদেশেও উচ্চশিক্ষার সমাদর থাকিত।

আমার ধর্ম্মযাজক বন্ধুটী একবৎসরের ছুটী লইয়া বার্কশায়ারে একটী ক্ষুদ্র নগরে গমন করিলেন। আমিও ঘটনাক্রমে আবার সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, আর সেই সময় বিলাতের আসল পল্লীজীবন দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লণ্ডনের লোকে বৎসরের মধ্যে একবার সহরের বাহিরে যাইয়া বাস করিয়া আসে। বিলাতের বড় মানুষেরা শীতকালে ফ্রান্সের দক্ষিণে কিম্বা ইটালীতে এই রকম কোন একটা গরম জায়গায় যাইয়া বাস করেন; বিলাতের মধ্যবিত্ত লোকেরা শীতকালে কাজ করে আর গ্রীষ্মকালে বেড়াতে যায়। আমিও একবার গ্রীষ্মকালে সহরের বাহিরে বেড়াতে যাব ভাব্‌লাম, আমার বন্ধু যেখানে যাইয়া বাস করিতেছিলেন আমি সেখানে গেলাম। তিনি আমার জন্য অগ্রে হইতেই থাকিবার জায়গা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন; খরচ কম লাগিবে বলিয়া একটী কফি হাউসে আমার জন্য ঘর ভাড়া করিয়া রাখেন। কফি হাউস শব্দে কফি খাইবার বাড়ী বুঝায়। কফি কি জিনিষ তাহা অনেকেই জানেন, এক রকম ছোট ছোট ফল, তাহার গুঁড়া গরম জলে ভিজাইয়া দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা যেমন করিয়া খাইতে হয় উহাও সেইরূপে খায়। কফি হাউসে যে শুদ্ধ কেবল কফি পাওয়া যায়, তাহা নহে; চা মদাদি পানীয়, রুটী, মাখম, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য এ সবও পাওয়া যায়।

মিষ্টান্ন শব্দে বঙ্গের পাঠক যেন সন্দেশ-মিঠাই মনে না করেন; বিলাতী মিষ্টান্ন অন্য রকমের—উইলসন সাহেবের প্রসাদাৎ কলিকাতাবাসীদিগের নিকট বিলাতী মিষ্টান্ন অনেক ঘরে চলিত হইয়াছে, সুতরাং বিলাতী মিষ্টান্ন বিষয়ে এ স্থলে সবিস্তার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি যে কফি হাউসে যাইয়া উঠিলাম তাহার নীচের তালায় ঐ সমস্ত জিনিষ বিক্রয়ের ঘর। উপর তালায় থাকিবার ঘর, খেলা করার ঘর, ইত্যাদি। বিলাতী দোকানের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে জিনিষ বিক্রয়ের নিমিত্ত অনেক জায়গায় মেয়েরা নিযুক্ত থাকে; বিচক্ষণ দোকানদার সুশ্রী দেখিয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত করে, দোকানে কাচের দ্বার, কাচের বাসন প্রভৃতি যেমন অলঙ্কারের কাজ করে, সুশ্রী স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ এক প্রকার অলঙ্কারের ন্যায়। যাহা হউক, ইহা হইতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে এই সকল স্ত্রীলোকেরা দোকানে কাজ করে বলিয়াই অসচ্চরিত্র হইবে—তাহার কোন অর্থ নাই। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোক যেরূপ একটী অদ্ভুত পদার্থের ন্যায় গণ্য হয়, বিলাতে সেরূপ নয়। সেখানকার লোকদিগের সভ্যতা, ধরণ ধারণা সব অন্য রকম, সেখানে হাটে বাটে মাঠে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করিয়া থাকে। পুরুষও যেমন একটী চেতন পদার্থ মাত্র বিলাতে মেয়ে মানুষও সেইরূপ একটী চেতন পদার্থ মাত্র। আমাদিগের দেশে এখনও স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারিত হইতে পারে না; কারণ আমাদিগের সমাজের অবস্থা এখনও তাহার উপযোগী হয় নাই। এই কফি হাউসে আমি যাইয়া স্থাপিত হইলাম। বাহির হইতে হইলে কিম্বা নীচে কোন কাজে আসিলে দোকান ঘরের মধ্যে আসিতে হইত। কফি হাউসের কর্ত্রী একজন বৃদ্ধা, দোকান নায়িকা তাহার কন্যা ইহার বয়স তরুণ, দেখিতে মন্দ নয়। নীচে সব খরিদদার আসিত তাহারা বোধ হয় ইহার সঙ্গে অনেক ঠাট্টা তামাসা করিত, কারণ সাধারণতঃ এরূপ ঠাট্টা চলিয়া থাকে। যাহা হউক এবিষয়ে আমি অভিজ্ঞ নহি, আমি ওরূপ আমোদে কখনও যোগ দিই নাই বলিলেও হয়। দোকান ঘরে আর একটী বিষয় দেখি—ভোর বেলা যে সকল শ্রমজীবীরা কাজ করিতে যাইত, তাহারা এখানে আসিয়া চা কি কফি আর সে সঙ্গে হয়ত একটু রুটী কিম্বা মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য খাইয়া যাইত। লণ্ডনে শ্রমজীবীদিগের নিকট সকালে এই জিনিষ বিক্রয়ের জন্য রাস্তার জায়গায় জায়গায় লোক বসিয়া থাকে। হয়ত একটা মোটা কাপড় টাঙ্গাইয়া তাহার নীচে জিনিষ পত্র রাখে, কিম্বা এমনি খোলা জায়গাতেই রাখে; ইহা ছাড়া আসল দোকান ত আছেই। নিকটস্থ পল্লী সমূহ হইতে যাহারা হাটের দিন এই সহরে জিনিষ পত্র ক্রয় বিক্রয় করিতে আসে, তাহারা কেহ কেহ এই কফি হাউসে আসিয়া থাকে; আর তাহা ছাড়া সহরের ছেলে ছোকরারা সন্ধ্যা বেলা দশ জনে মিলিয়া এখানে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করে। তাহারা কি কি করে তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কারণ তাহাদিগের সহিত আমি মিশি নাই—তবে বোধ হয় মদ খাওয়া বিলিয়ার্ড খেলা তাহাদিগের ঐসময়ে নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ধর্ত্তব্য। লণ্ডনে মাঝে মাঝে মদের দোকান আছে আর

সেই সঙ্গে একটা বিলিয়ার্ড ঘর আছে—এই বিলিয়ার্ড ঘরে ছেলে বুড়ো জড় হয়ে খেলা ধুলা করে। বঙ্গীয় পাঠক! ছেলে বুড়ো খেলাধুলা এই কয়টী কথা শুনিয়া চমকাইয়া যাইবেন না—ইয়োরোপীয় সভ্যতার কোরাণ অনুসারে আমোদ আহ্লাদের সময় নবীন ও প্রবীণ দুই দলই যোগ দিতে পারে। এস্থলে বিলিয়ার্ড জিনিষটা কি তাহা দুই এক কথায় বুঝাইয়া দিলে ক্ষতি হইবে না—একটা লম্বা টেবিল, সবুজ কাপড়ে মোড়া, তার চারিধার উচু করে গড়া; ইহার উপর গোটাকতক হাতির দাঁতের বল (বর্ত্তুল) লম্বা কাঠি দিয়ে রকম রকম করে আঘাত করা—এই হলো বিলিয়ার্ড খেলা। কফি হাউসে একদিন একজন তরুণ বয়স্ক লোক আমার ঘরে এসে উপস্থিত। তাহাকে ছোকরা বলিলেও বলা যায়; একটু মদ খেয়েছে বোধ হলো, কথাবার্ত্তায় ঠিক ভদ্র-লোক বলে বোধ হলো না। আমি বিদেশীয় লোক, তাই হয়ত আমার সঙ্গে দুচারটে কথা কইতে এসেছিল; কিম্বা এমনিই সে ঘরে এসেছিল। সে আগড়ম বাগড়ম অনেক কথা বলতে লাগলো, আমি বেচারী শুন্‌ছি। সে প্যারিস গেছে, সে ইজিপ্ট দেখেছে ইত্যাদি অনেক কথা বল্‌লে। তার সব কথা গুলো আমার তত বিশ্বাস হলো না, কারণ লোকটা কিছু 'গাম বড়িয়ে' গেছের বলে মনে হলো। হিন্দুদিগের পক্ষে অমরপুরী যেরূপ, মুসল-মানদিগের পক্ষে হাউরি রাজ্য যেরূপ, পূর্ব্বতন খৃষ্টানদিগের পক্ষে জেরুজেলম যেরূপ—ইংরাজদিগের পক্ষে প্যারিস সেই-রূপ। প্যারিস না দেখ্‌লে ইংরেজেরা জন্মই বৃথা বলিয়া মনে করে। সেদিন দেখ্‌-লাম ইংরাজদিগের পঞ্চানন্দ তাঁহার স্বজা-তীয়গণকে বিদ্রূপ করিয়া এক ছবি খুঁদি-য়াছেন—তাহার মর্ম্ম এই:—এক যুবতী গদ্‌গদ ভাবে আহ্লাদে আটখান হয়ে তাঁর সখীকে বল্‌ছেন শুনিছিস্ লো, এতদিনে আমার প্যারিস যাওয়া হবে, বাবাকে কুকুরে কাম্‌ড়িয়েছে তাই তিনি সেখানে পাষ্টেরের কাছে চিকিৎসা কর্‌তে যাবেন। প্যারিস যেখানে ইংরেজ-জাতির পক্ষে এতই দেবদুর্ল্লভ স্থান, সেখানে যে ঐ লোকটী প্যারিস দেখেছে একথাটা বিশেষ করে বলবে তা আর আশ্চর্য্য কি। শুদ্ধ তাহা নহে—ইনি আবার প্যারিস না বলিয়া প্যারি বলিলেন; তাহার কারণ এই যে ফরাসিরা তাহাদিগের রাজধানীর নাম শেষোক্তরূপে উচ্চারণ করে; আর ইংরেজদিগের মধ্যে যে সকল লোক প্যারি-স নিজচখে দেখেছে ইহা অন্যলোকের হৃদয়ঙ্গম করিতে চায়, তাহারাও ঐ রকম করিয়া উচ্চারণ করে। আমি এক্ষণে যাঁহার বর্ণনা করিলাম তাঁহার মত লোক বিলাতে অনেক আছে—লোকে এই সকল ব্যক্তিকে Snob (স্নব) বলে। বিলাতী সমাজে অনেক প্রকৃতির লোক আছে, তাহার মধ্যে স্নব একটী। স্নবের ইতিবৃত্ত লিখিতে গেলে অনেক কথা বল্‌তে হয়-সুতরাং এবিষয়টী বন্ধ করা যাক্।

কফিহাউসে দিনকতক বাস করিয়া পরে আমি নিকটে একটী হোটেলে গিয়া থাকিলাম; এখানে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকা যায় বলিয়া কফিহাউস ছাড়িলাম। হোটেলটীও একটী স্ত্রীলোকের অধীনে, তবে ইনি কফিহাউস কর্ত্রী অপেক্ষা ভদ্রতা বিষয়ে দুই এক ধাপ উঁচু, মানে কিছু বেশী

সম্ভ্রান্ত। ইনি নিজে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, ইঁহার চাকরাণীরাও বেশ পরিষ্কার কাপড় পরে, জিনিষপত্র গুলিও বেশ মাজা পোঁছা—বলা বাহুল্য যে এখানে থাকিবার খরচও আবার সেইরূপ অধিক মাত্রার। এক্ষণে নগরটীর বর্ণনা আরম্ভ করি। ধরিতে গেলে ইহা একটী রাস্তা নিয়ে, আশ পাশ যায়গায় অনেক-গুলো ঘর আছে বটে; কিন্তু নগরের নগরত্ব একটী রাস্তার উপর নির্ভর। এই রাস্তার দুধারে অনেকগুলি ঘর, কোনটা বা দোকান কোনটা বা কেবল বসতবাটী দোকানগুলির মধ্যে একটীর উল্লেখ এস্থলে করিতেছি, এটী আমার বন্ধুর একজন আত্মীয়ের দোকান, তাঁহার শ্বশুরের ভাইয়ের দোকান। তাঁহার শ্বশুর ভদ্রলোকের মত থাকেন, আর ইঁহার ভাই দোকানের কাজ করেন। আমাদিগের দেশে হইলে লোকে ইহা লইয়া কত কথা বলে, কিন্তু বিলাতে এরূপ ঘটনা আখছার দেখা যায়। প্রথম যে দিন আমি এই দোকানে যাই সে দিন আমি অবশ্য আশ্চর্য্য হই, মানে আমার বন্ধুর আত্মীয়দিগকে দোকানদার বেশে দেখে একটু চমকে উঠি; কিন্তু শেষে এই সকল লোকদিগের সহিত যখন আলাপ হয় তখন আর দোকানের গন্ধ পেলাম না। তখন তাঁহাদিগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র-লোকের মতই বোধ হলো, এমন কি শুন্-লাম তাঁহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহা-দিগের নগরের মেয়র পর্য্যন্তও হয়েছেন। (আমাদিগের দেশে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান যেমন বিলাতে সেইরূপ মেয়র)। ফলতঃ সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা বিলাতে লজ্জার বিষয় নহে, তাহা এক্ষণে মজুর খাটিয়াই হউক আর মহারাণীর প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিয়াই হউক। আমাদিগের দেশে ভিক্ষা করিলে জাতি যায় না, কিন্তু দোকান রাখিলে জাতি যায়। বিলাতে সেরূপ নহে; বিলাতে পার্লেমেণ্ট সভাতেও অনেক দোকানদার সভ্য আছে; এমন কি একজন শ্রমজীবিও সভ্য হইয়াছিল, উক্ত দোকানে কি কি দেখিলাম? নানা রকম মসলা, মাংস, ঔষধ ইত্যাদি যাহা সচরাচর আমরা মুদির দোকান, মাংস বিক্রেতার দোকান, আর ডিস্‌পেন্‌সারি এই তিন জায়গা হইতে লইয়া থাকি, তাহা সব ঐ দোকানে পাওয়া যায়। অবশ্য নগরটী ছোট বলিয়াই তিন জায়গার জিনিষ এক জায়গায় রাখা হইয়া থাকে। বড় সহর হইলে উহা বিভাগ হইয়া তিনটী আলাদা দোকান হয়। এই বাড়ীতে আমার এক দিন নিমন্ত্রণ হয়, অন্যান্য কথার মধ্যে ইংরেজদিগের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করার কথা উঠে। গৃহস্বামী বলিলেন যে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়িবার পূর্ব্বে আমা-দিগের যত টাকা আছে তাহা একবার খরচ করিয়া দেখিব—মানে যে রকমেই হউক রাখিবার চেষ্টা করা হইবে। ভারতবর্ষ রাখিয়া ইংরেজ জাতির কি লাভ বিলাতে সময় সময় এই প্রশ্ন উঠে, কেহ বলেন কোন বিশেষ লাভ নাই; আবার কেহ বলেন ভারতবর্ষ নইলে ইংরেজের বাণিজ্য মারা যাইবে, আবার কেহ বা বলেন যে এখন লাভ থাকুক আর নাই থাকুক অনেক লাভ হইতে পারে, ভারতের জমি স্বর্ণ প্রসবিনী, তাহাতে টাকা বুনিলে শত গুণ ফল ধরিবে। এই বাড়ীতে লণ্ডনের তুলনায় একটী নূতন জিনিষ দেখিলাম—লণ্ডনের ঘর গুলি মধ্যে ছাদে কড়ি (আড়া) দেখা যায় না—এই

বাড়ীতে অন্ততঃ একটা ঘরে কড়ি দেখিয়াছি। শুনিলাম বাড়ীটী অলিবার ক্রমওয়েলের সময়ের, পুরাতন কালের গাঁথা সেই জন্য মধ্যে কড়ি দেখা যায়। নগরের আর একটী অঙ্গ এখন বর্ণনা করি। এক দিন সন্ধ্যাবেলা আমি ঐ বাড়ীর একজন লোকের সঙ্গে একটী জায়গায় গেলাম--দেখি একটী মাঝারি রকম ঘর—অনেক গুলি খবরের কাগজ রয়েছে—আর কতক গুলি লোক চুপ করিয়া একটী টেবিলে বসিয়া পড়িতেছে। ঘরটীকে নীরব-কুঠরী বলা যাইতে পারে এতই সেখানে চুপচাপ। কোন কোন পাঠক হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে ঘরটী খবরের কাগজ পড়িবার জন্য; আর কথা কহিলে পড়ার অসুবিধা হইবে বলিয়া অত চুপ চাপ। আমাদিগের দেশেও প্রত্যেক নগরে নগরে অধিবাসীদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া ঐরূপ এক একটী খবরের কাগজ পড়ার ঘর হওয়া উচিত। ভাল ভাল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা পড়িলে লোকের যত সাংসারিক জ্ঞান জন্মে যতটা মাথা খোলে, তত আর কিছুতেই নহে—এক কেবল দেশ ভ্রমণ ছাড়া। বিলাতে এইরূপ সংবাদ পত্রের ঘর ও সাধারণ পুস্তকাগার প্রভৃতি স্থাপনা দ্বারা সাধারণ লোকদিগের অনেক উপকার হইয়া থাকে, এমন কি সে দিন একটা কাগজে দেখি অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় সাধারণে৷ জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশে সহরে সহরে নগরে নগরে বক্তৃতা দিবার জন্য লোক পাঠাইতেছেন। আমাদিগের দেশে ভিন্ন ভিন্ন সভা হইতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনাদি বিষয়ে সাধারণের জন্য বক্তা নিযুক্ত হইলে কাজটা কিরূপ হয়? একদিন রবিবারে আমি উক্ত নগরে একটী গির্জ্জায় উপাসনা ও বক্তৃতা শুনিতে ও দেখিতে যাই। যাঁহারা এদেশের বড় বড় নগরে বাস করেন তাঁহারা অনেকে জানেন গির্জ্জায় কি কি করা হয়—বাইবেল পড়া ও তাহা হইতে বক্তৃতা, গীত এবং বাদ্য। এ সকল বিশেষ করিয়া বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। গির্জ্জার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে ধর্ম্মযাজক দ্বারা বাস্তবিক অনেক উপকার হইতে পারে। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন যাইয়া সারগর্ভ উপদেশ পাইলে লোকের রীতি নীতি অনেক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে আমাদিগের বড় অভাব। গুরু পুরোহিতের ব্যবসায় আমাদিগের দেশে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, অথচ অন্য কেহ তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করে নাই—অর্থাৎ সদুপদেশ দেওয়ার লোক বড় কম। আমার অর্থ অবশ্য এরূপ নহে যে এদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম কিম্বা পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচলিত হউক; আমি এই মাত্র বলি যে লোককে সৎপথে মতি দেওয়ার জন্য সমাজে উপদেষ্টার প্রয়োজন। রবিবার দিন বিলাতে সব লোকেই তাহাদিগের ভাল কাপড় পরিয়া বাহির হয়। এই দিনটা কেহ বা বিশ্রামে, কেহবা ধর্ম্মালোচনায়, কেহ বা আমোদ আহ্লাদে কাটায়। কচিৎ কেহ ঐ দিনে অন্য দিনের ন্যায় দস্তুর মত কাজ করে। চাকরাণীরা অনেকে রবিবার দিন বিকাল বেলা ছুটী পায়; এই সময় তাহারা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে। রবিবার দিন অবশ্য 'মিষ্টান্তঃকরণের' সহিত দেখা করার দিন। মিষ্টান্তঃকরণ,—অন্যার্থ, যাহার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইবার কথা এক রকম

স্থির হইয়াছে। দুঃখের বিষয় অনেক সময় এই রকম কথা বার্ত্তা ঠিক হইয়াও সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়; তখন কোন কোন যুবতী তাঁহার মিষ্টান্তকরণের নামে কথা ভঙ্গের নালিশ করেন, আর ক্ষতি পূরণ বাবদ কিছু অর্থও লাভ করেন। ইহারই নাম সভ্যতা! হায়! মানব! তুমি কেন সভ্যতার ভাণ কর? মানুষ যত খল, মানুষ যত কপট সংসারে অন্য কোন জন্তু তাহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক খল কপট কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু হে টাইমন! তুমি তাহা বলিয়া স্বজাতির প্রতি বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিও না—তাহাতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষতি আর তোমার স্বজাতিরও যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি।

একে একে আমি নগরের প্রধান কয়টী জিনিষ বর্ণনা করিয়াছি এক্ষণে একবার নগরের বাহিরে যাই। নগরের মধ্যে দস্তুর মত ঘর বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরে, সীমান্তে সব গরিব দুঃখীদের বাড়ী; এই সব কাঠের তৈয়ারি, আর খড়ের মত কোন জিনিষ দিয়ে ছাওয়া। আমাদিগের ঘর না থাকিলে গাছ তলায় থাকিতে পারা যায়, কিন্তু বিলাতে ঘর না থাকিলে শীতে মারা যাওয়ার কথা। আমাদিগের কাপড় না থাকিলে আলগা গায়ে থাকা যায়; বিলাতে আলগা গায়ে থাকিলে কফ হাঁপানি যক্ষাকাশ হয়। আমাদিগের দেশে খাওয়ার না থাকিলে, না হয় এক দিন উপবাসই করিলে, বিধবারা অনেকে এদেশে একাদশী করিয়া থাকেন; বিলাতে জঠরপ্রদেশে অন্ন না থাকিলে শীতে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া মরিবে। এ সব কথাই সত্য—অথচ দেখ বিলাতে, সভ্য বিলাতে, অর্দ্ধেক লোকে পেতে পায় না, শুতে পায় না, পরতে পায় না! শুদ্ধ যে দরিদ্রদিগের দোষেই এ রকম হয় তাহা নহে; লোকের অর্থ পিপাসার জন্যও এ রকম হয়। আমার হাতে হাজার টাকা আছে, তোমার হাতে একশো টাকা আছে—তুমিও দোকান করেছ, আমিও দোকান করেছি। আমার সঙ্গে পাল্লাপাল্লি দিলে তুমি পারিবে কেন। আমি চাই তুমি দোকান ঘরে যা লাভ কর তা আমার হাতে আসুক। আমি পাল্লাপাল্লি দিয়ে তোমায় উঠিয়ে দিলাম—তোমার দোকান গেল, তোমার উপজীবিকা গেল—আমার দোকান বাড়্‌লো; আমার ঘরে টাকা ধরে না। ম্যাঞ্চেষ্টরের তাঁতিরা এই রকমে ভারতবর্ষীয় তাঁতিদিগকে মারিয়াছে। বিলাতের ধনীরাও এই রকমে গরিবদিগকে মারিয়াছে। লোকে তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে—সেই জন্য য়ুরোপীয় অনেক দেশে সোশিয়ালিজ্‌ম্ দেখা দিয়াছে অর্থাৎ ধনিকুল ধ্বংশ করিবার সংকল্প কেহ কেহ করিতেছেন। জনমেজয়ের যেরূপ সর্পকুল ধ্বংশ করার সংকল্প অভিজ্ঞতার কাজ হয় নাই—কারণ সর্পেরা ভেক খাইয়া ফেলে আর তাহাতে আমাদিগের ভেকারব কম সহ্য করিতে হয়—হেন্‌রি জর্জ্জ ও হাইডম্যান প্রভৃতিরও ধনিকুল ধ্বংশ করিবার সংকল্পও সেইরূপ সুপরামর্শের কার্য্য নহে, কারণ ধনের যেমন অপব্যয় আছে তেমনি আবার সদ্ব্যয়ও আছে। সমাজে যাহাতে ধনের সদ্ব্যয় হইতে পারে লোকের তাহাই চেষ্টা দেখা উচিত।

নগরের বর্ণনা একরকম শেষ হইল। এক্ষণে সংক্ষেপে আর একটী কথা বলি। আমাদিগের দেশে যেরূপ কাহারও

কাহারও বড় বড় বাগান (আম কাঁঠালের) আছে; বিলাতেও সেইরূপ ধনীদিগের বড় বড় বাগান আছে। ইহাকে পার্ক বলে। এই নগরে থাকিবার সময় একদিন আমি এইরূপ একটা পার্ক দেখিতে গিয়াছিলাম —আমার বন্ধুদিগের সঙ্গে। বড় বড় অনেক গাছ দেখিলাম বটে—কিন্তু সে সব বিলাতি গাছ তাহাদিগের কাঠ হইতে পারে কিন্তু খাওয়ার উপযুক্ত (আম কাঁঠালের মত) ফলের গাছ বোধ হয় দেখিনি। পার্কে বড় বড় মাঠ দেখিলাম, খরগোষ দেখিলাম, আর আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে তাহাতে পার্কে এক জায়গায় বসিবার নিমিত্তও উপযুক্ত স্থান আছে। এইরূপ পার্কে বেড়ান, হাওয়া খাওয়া, খেলা করা, আর খরগোষ শীকার করা—এই সব কাজ হইতে পারে। বিলাতের পল্লীগ্রামের লোক বুদ্ধিবিষয়ে যে অনেকটা আমাদিগের দেশের পল্লীগ্রামের লোকের মত তাহা এক কথাতেই প্রতীত হইবে। এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে বিলাতী পল্লীগ্রাম-বাসীদিগের কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে লণ্ডনের রাস্তাগুলি সোণা দিয়ে বাঁধান। উপরে একটি বিষয় লিখিতে ভুলে গেছি—বিষয়টী এই যে বর্ণিত নগরের একদিকে একটা বড় লোহার কারখানা আছে চাষের নিমিত্ত যত অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র দরকার হয় তাহা এখানে তৈয়ার হয়। ইহা ছাড়া আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই নগরে মাঝে মাঝে (বৎসরে কতবার ঠিক বলিতে পারি না) বাজিকরেরা আসিয়া বাজার, দোলনায় দোলায় এবং এক প্রকার কৃত্রিম ঘোড়া কি কিসে চড়ায়; আর বৎসরের মধ্যে একবার একটি মেলা হয়। বোধ হয় সেই মেলার উদ্যোগের সময় সময় আমি ঐ নগর ছাড়ি। আর একটি কথা মনে হইল। একদিন আমরা অর্থাৎ আমার বন্ধু, তাঁহার আত্মীয় কয়েকটী স্ত্রীলোক, এবং আমি বেড়াতে বেড়াতে একটা জায়গায় যাই, এ জায়গাটা নগর হইতে কিছু দূরে। যে রাস্তাটী দিয়ে যাই সেটী অনেকটা আমাদের দেশের রোডসেসের রাস্তার মত—ধূলিময়, পাশে জঙ্গল; প্রায় দুতিন মাইল গিয়ে একটা ময়দা তৈয়ার করার কল দেখ্‌লাম, কলটী জল দিয়ে চালান। একটা খালের জল স্রোতে বয়ে একটী চাকার বেড়ে কতকগুলি তক্তার উপর লাগছে—তাহাতে চাকা ঘুরছে আর চাকার সঙ্গে জলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গুলি নড়ছে। বিলাতী মাঠের কথা বিশেষ কিছু বলা হয় নি। মাঠে দুই প্রকার ছোট হ'লদে ফুল দেখা যায় (অন্যান্য ফুল ও অবশ্য আছে); বটারকপ আর দ্বিতীয়টী ড্যাণ্ডিলাইয়ন গাঁদা ফুলের জাতীয়। একদিন রাস্তায় একটী ফুল দেখি—রাঙ্গা টুক টুকে তার নাম পপি, এই শ্রেণীর একটা গাছ হইতে অহিফেন ওরফে আফিম তৈয়ার হয়। বিলাতি মাঠে নানা রকম গাছ দেখা যায়—ওক, বীচ, এবং লাইম ইহাপেক্ষাও বড় বড় গাছ বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়। আইবি লতাও হইতে পারে আর গাছও হইতে পারে; আইবি লতা দিয়ে অনেকে বাড়ীর দুয়ার সাজাইয়া রাখে। উইলো আর একটী প্রসিদ্ধ গাছ, নানা রকমের, পাতা লম্বা লম্বা সরু সরু। হলি ও মিজলটো ক্রীষ্টম্যাসের সময় ব্যবহৃত হয়; মিজল্‌টো এক রকম পরগাছা, পাতা গুলি কতকটা অঙ্গুলির মত আর (আমার যতটা স্মরণ হয়) পুরু। হলি

মাঝারি রকমের গাছ, পাতাগুলি ত্রিভঙ্গ মুরারি, কাঁটাওয়ালা। বিলাতের রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর নাই। অবশেষে একটী কথা বলি, বর্ণিত নগরে আমি সে সকল লোকের, কি উঁচু কি নীচু, সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাঁহারা সকলেই আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন; ইংরেজ জাতি আসলে এক রকম ভালই বলিতে হইবে।

এক্ষণে হে পাঠক! এই লম্বা বর্ণনার পর তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। মিস্ সেডলে বিদ্যাভ্যাসের পর যখন স্কুল ছাড়িয়া যান, তখন তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন, তাহা ঠিক পান নাই; আমিও এখন হাসিব কি কাঁদিব, তাহা ঠিক পাইতেছি না। যাহা হউক, এই প্রবন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা তোমাকে আমোদ ও জ্ঞান উভয় বস্তু দান করিবার উদ্দেশ্যে;—যদি কোন স্থলে ত্রুটী পাও, তবে রাগ করিও না। কারণ তাহা হইলে এ গরিব বেচারী আর এপ্রকার প্রবন্ধ লিখিতে তত সাহস পাইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
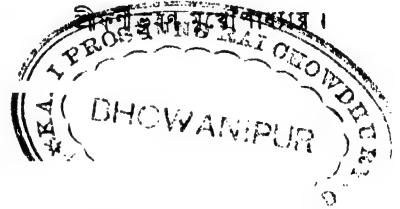
সাবিত্রী।

সমালোচন।

আমার এই সমালোচনার সাবিত্রী, পৌরাণিক সতী সাবিত্রী নহেন। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী নামে লাইব্রেরীর ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী, এবং উক্ত লাইব্রেরী হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী-রচনা একত্রে মুদ্রিত হইয়া সম্প্রতি—'সাবিত্রী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে,—এ সেই সাবিত্রী। সম্পাদক বাবু গোবিন্দলাল দত্ত ইহার প্রকাশক। গোবিন্দ বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "এ পুস্তকখানি প্রকাশে একটী কীর্ত্তি স্থাপিত হইল।" সাবিত্রী লাইব্রেরীতে বৎসর বৎসর অনেক কৃতবিদ্য লোক সমবেত হয়েন, এক একটা ভাল প্রবন্ধ পড়া হয়, এ সকলি বাঙ্গলা সাহিত্যের বিকাশের একটী সুন্দর অনুষ্ঠান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পাদক যখন এত অল্প দিনের মধ্যেই এটাকে একটা কীর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, তখন ভয় হয় যে, পরিতৃপ্তির সুখ, ভবিষ্যতের উন্নতির পক্ষে বাধা না জন্মায়। এইরূপ আত্মমাহাত্ম্য-বোধে এদেশের অনেক কথা অঙ্কুরে ভাঙ্গিয়াছে; বাহাবার করতালিতে অনেক দেশানুরাগ, আত্মানুরাগে ডুবিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই একথাটার উল্লেখ করিলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গোবিন্দ বাবু ব্রাহ্মসমাজের মলিনমুখ, ও ভারতসভার শুষ্ক হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। কৃতকার্য্যের মাহাত্ম্য দেখার অপেক্ষা, করণীয় কর্ত্তব্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি থাকা ভাল, একথা ত সকলেই জানে।

যাঁহাদিগের প্রবন্ধ সাবিত্রীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল এবং সুলেখক বলিয়া বঙ্গদেশে বিখ্যাত। যদিও বাঙ্গালা দেশে এরূপ শ্রেণীর লোক খুব অধিক নাই, তাই বলিয়া এত অল্পও নহে যে, কোন এক বৎসরেও বীরেশ্বর পাঁড়ের মত লোক দিয়া প্রবন্ধ পড়াইতে হয়। যে সভায় হরপ্রসাদ

বাবু প্রভৃতি আপনাদের পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন অভিব্যক্ত করেন, সেখানে "হিন্দুরীতি নীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে" র মত একটা অসার প্রবন্ধ না পড়াইলেই বুঝি ভাল ছিল। এতবড় বিষয়টা যিনি হাতে লইবেন, তাঁহার সমাজ বিজ্ঞানে খুব দখল থাকার প্রয়োজন। কিন্তু প্রবন্ধটা পড়িলেই প্রতীত হয় যে, লেখক সমাজ বিজ্ঞানাদি কখন চোখেও দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। উপযুক্ততর লেখক যে বঙ্গ সমাজে আছে, অন্তত বৎসরে একজন করিয়াও যে মিলিতে পারে, একথা আমরাও জানি, গোবিন্দ বাবুও জানেন।

গোবিন্দ বাবু ভূমিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, সভাস্থলের প্রধান প্রধান প্রতিবাদকারীদিগের প্রতিবাদের কয়েকটী সংক্ষিপ্ত উত্তরও ইহাতে প্রকাশিত হইল। কই? আমরা ত খুঁজিয়া তাহা পাইলাম না। কূল হারাইলে কাশ্যপ গোত্র বলিতে হয়, সুতরাং আমরাও বলি, বুঝি মুদ্রাকরের গুরুতর অপরাধে তাহা দেখা গেল না। এ গ্রন্থের প্রকাশিত অনেক গুলি প্রবন্ধেরই সভাস্থলে ও সভার বাহিরে খুব উপযুক্ত উপযুক্ত প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে, তবুও একবার এই সমালোচনার সময় কিঞ্চিৎ বিচার করা যাইবে।

১ম প্রবন্ধ।—বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য। লেখক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রবন্ধটী খুব সুন্দর কিন্তু বড় ছোট। এ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে একটা প্রকাণ্ড বই হয়। "বাঙ্গালা সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে" যে সকল "আরও অনেক কথা বলিতে হয়" যে সকল বিপ্লবের ইতিহাস লিখিতে হয়; তাহা লিখিবার উপযুক্ত পাত্র হরপ্রসাদ বাবু। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যাঁহারা প্রাচীন তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত ও সুলেখক, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহাদের অগ্রণী। কিন্তু তিনি ইংরাজী লেখক, গরিব বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। আর একজন এবিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন, তিনি দগ্ধ বঙ্গে দগ্ধ ভস্মগুলি রাখিয়া পূর্ণ যৌবনেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলিব কি যে, ইনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়? তাহার পরেই পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। যে কারণে এত বিদ্যা থাকিতেও রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সেই কারণ আংশিক রূপে হরপ্রসাদ বাবুতেও আছে। সেই অতিরিক্ত আফিসের কার্য্যে হরপ্রসাদ বাবুও ব্যস্ত। কাজেই আপাতত আর তিনি পূর্ব্বের স্কুল কলেজের চাকুরীর সময়ের মত সাহিত্য-সেবা করিতে পারিতেছেন না। হরপ্রসাদ বাবুই লিখিয়াছেন যে, সাহিত্য জীবী ভিন্ন, সখের ব্যবসায়ীর দ্বারা, সাহিত্য উন্নতি তেমন হইতে পারে না। এই কারণেই আমরা অনেক চিন্তাশীল লেখকদিগের দ্বারা যথারীতি উপকৃত হইতে পারিতেছি না। ইহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।—"আমাদের অভাব" লেখক বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটী অসম্পূর্ণ। কিন্তু তিনি যতটুকু লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথায় আমরা অনুমোদন করি। আমাদের দেশে এ সময়ে, এই সকল কথার খুব আলোচনা হইবার দরকার।

৩য় প্রবন্ধ।—"হিন্দুপত্নী এবং বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য"। লেখক সুপ্রসিদ্ধ বাবু চন্দ্রনাথ বসু। এই প্রবন্ধটার দুইদিক্ আছে। ১ম।—বিবাহ সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদেগের মত ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা; ২য়।—সেই প্রাচীন সমাজের প্রাচীন উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানের বর্ত্তমান সমাজেও উপযোগীতা। ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরা ইংরাজী চোখে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন বলিয়া, এদেশের সকল প্রকার আচার ব্যবহারই তাঁহাদের পক্ষে চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়ায়। আজি ৩। ৪ বৎসর হইল একজন ঋষিচরিত্র বৃদ্ধ পণ্ডিত, তাঁহার একজন সমবয়স্ক পবিত্রচিত্ত সুপণ্ডিত সমাজ-সংস্কারকের নিকট কিছু আম তেঁতুলের আচার পাঠাইয়া দিবার সময় লিখিয়াছিলেন,—"এগুলি গ্রহণ করিবে, এবং মনে করিও না যে, আমাদের দেশের সকল আচারই কিছু মন্দ।" কিন্তু আমার মনে হয় যে, সাহেবেরা যদি চাট্‌নী ভক্ত হইত, তবে যাঁহাদের "পেটে ছেড়া, মেজাজ টেড়া, ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে" তাঁহারা সে আচারকেও "ন্যাষ্টি" বলিতেন। ধূতি চাদর হইতে ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত সকলি প্রায় অসভ্য যুগের মৃত অবশিষ্ট ভাবিয়া অনেকে তাহা গঙ্গাসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছেন। ঘাতের প্রতিঘাত আছে। তাই আবার অনেকে, যাহা কিছু প্রাচীন—যাহা কিছু দেশীয়, সকলই ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই উভয় দলই *Mathew Arnold* এর ভাষায় সমান রকমের *Philistine*। অন্তর্দৃষ্টি ও ন্যায় বিচার উভয় দল হইতেই নির্ব্বাসিত। গ্রীক্-দার্শনিক প্রবরের সোণার মধ্য পথ দিয়া কেহ বড় চলিতে চায় না। চন্দ্রনাথ বাবুর রক্ষণশীলতাও যেন খানিকটা *Philistinism* এ দাঁড়াইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বাবু প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে, পাণি গ্রহণ প্রয়োজনীয় বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রকারেরা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আজি কালিকার পৃথিবীতেও গৃহস্থাশ্রম লইতে হইলে, সমাজের সেবা করিতে হইলে যে সেই পাণিগ্রহণ সর্ব্বত্র সকল লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি বলেন নাই; সুতরাং আগ বাড়াইয়া তাহার কিছু সমালোচনা করিতে চাইনা।

চন্দ্রনাথ বাবুর দ্বিতীয় কথা, "হিন্দু বিবাহ ধর্ম্মের জন্য এবং সমাজের জন্য" এবং আরও বলেন যে, "বোধ হয়, হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহই ধর্ম্মচর্য্যা, সমাজ-সেবা ও পরোপকারের জন্য দার পরিগ্রহ করে নাই ও করেনা।" শেষ অংশটুকু *philistinism* এর দুরন্ত দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিবাহ বিষয়ক এইরূপ মত ও উপদেশের কথা ছাড়িয়া দি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বের অখ্রীষ্টিয়ান, *Stoic* কুলোজ্জল মার্কাস অরিলাস এন্টোনিনাসের কথা কি চন্দ্রনাথ বাবুর মত পণ্ডিত ব্যক্তি ভুলিয়া গেলেন? জাতিয়ত্বের কি যে একটা কুৎসিৎ ধূয়া পড়িয়াছে, যে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেই এইরূপ অন্ধতায় মগ্ন হইতে দেখিতেছি। এরূপ দৃষ্টি জন্মিলে দেশের সাহিত্য উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার একটা ঘোর দুর্দ্দশা ঘটিয়া পড়িবে।

আর এক কথা "হিন্দু বিবাহ" ধর্ম্মের জন্য, একথার অর্থ কি? ধর্ম্মের অর্থ, সাধারণ সীমায় দাঁড়াইয়া বুঝিতে গেলে এইরূপ

বুঝি যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য যাহা, আদর্শ যাহা—কর্ত্তব্য যাহা, তাহারই সাধনের উপায় সাধন। কতকগুলি কার্য্য এমন আছে, যাহা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম, সে গুলি জীবন বিজ্ঞানের মীমাংসায় স্থিরীকৃত হয়। এবং এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, যাহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেগুলিও মতগত সূক্ষ্ম কথার বিচার ছাড়িয়া দিলে ব্যবহারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এরূপ স্থলে যাহা কিছু জীবনের প্রকৃত কার্য্য, অর্থাৎ যাহা করিলে সমাজান্তর্ভুক্ত জীবন সুখে জীবিত থাকিতে পারে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। তবে সুধু বিবাহ কেন, আমাদের সকল কার্য্যই এমনি করা চাই, যাহাতে ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সমাজ সেবার জন্য যে আমরা বিবাহ করি, এমন নহে। মানুষ যে সমাজ বদ্ধ হইয়াছে, সে আত্মরক্ষার চেষ্টায় এবং পরে বিবাহ দ্বারা সেই সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। বিবাহের প্রথম প্রয়োজন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও ইন্দ্রিয়সংযম। ইহাকে যদি অধর্ম্ম কার্য্য বলা হয়, তবে বিবাহ অধর্ম্মের জন্যেও বটে। তবে আত্মোন্নতি এবং সমাজ সেবা যখন জীবনের কার্য্য, তখন দার পরিগ্রহ করিয়াই কি, আর না করিয়াই কি, তাহা করিতেই হইবে। তবে যদি একথা বলা যায় যে, স্ত্রী জাতির মধ্যে এমন সকল গুণ আছে, যাহা আমাদের লাভ করা উচিত, এবং না করিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না, তাহা হইলেও সিদ্ধান্ত হয় না যে, বিবাহই প্রয়োজনীয়। আমরা মাতা, ভগ্নী প্রভৃতির নিকট হইতে স্ত্রীজাতি-সুলভ অনেক গুণ হৃদয়ে লাভ করিতে পারি; এবং বন্ধুত্ব সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া, অনেকানেক স্ত্রীলোকের হৃদয়গত মহত্বও সঞ্চয় করিতে পথ পাইতে পারি। আমার এই শেষ কথায় যদি কেহ অপবিত্রতার আশঙ্কা করেন, তবে আমি তাঁহাকে যে কি ভাষায় তিরস্কার করিব, তাহার অনুসন্ধান জন্য অভিধানের পৃষ্ঠা উল্টাইব। আর যদি এমন সৌভাগ্য কাহারও হয় যে, তিনি গুণবতী পত্নী লাভ করিয়া এ শিক্ষার পথ সহজ করিতে পারেন, সেত খুবই ভাল কথা। আর যদি এই কথাই বলা হয় যে, বিবাহ না করিলে পরসেবা আদবেই হয় না, তবে তাঁহাকে একবার চক্ষু খুলিয়া ইউরোপের ভগ্নী সম্প্রদায়ের কার্য্য দেখিতে পরামর্শ দিব। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর একথা খুব ঠিক যে, যদি বিবাহ করিতেই হইল, তবে যাহাতে পরিবার ও সমাজ সুখী হয়, এইরূপ ভাবেই বিবাহ করা উচিত। বিবাহের এই আদর্শ হিন্দু ঋষিদিগেরও বটে, অহিন্দু ঋষিদিগেরও বটে, একথাও মনে রাখা উচিত।

চন্দ্রনাথ বাবুর তৃতীয় কথা, কন্যা নির্ব্বাচন। তিনি বলেন, যে "বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবার জন্য" এবং যে বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যাও সমাজ সেবার জন্য, তাহাই মঙ্গল জনক"। "যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহার্থ স্বয়ং কন্যা নির্ব্বচন না করাই ভাল।" সিদ্ধান্তটী ঠিক হইয়াছে কি? সমাজসেবা ও পারিবারিক মঙ্গলসাধন যাহাতে হয়, তাহা ত করাই চাই, কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিগত সুখ একেবারে উপেক্ষিত হইবে কেন? চন্দ্রনাথ বাবু হয়ত বলিবেন যে, ব্যক্তিগত সুখকে আমরা নষ্ট করিতে চাই না; কিন্তু যৌবনোন্মত্ত নাকি ভ্রমে পড়িতে পারেন,

সেই জন্য পরের হাতে ভার দিলে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে। একথা ঠিক হয় কি? আমার অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি, রুচি ও গতি কাহার সহিত মিলিত হইলে উন্নত হইবে, এবং লক্ষ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইবে, একথা পরে সম্যকরূপ কি বুঝিতে পারে? কোন্ স্ত্রীলোক আমার সহিত মিলিত হইলে আমি সুখী হইতে পারিব, একথা বুঝিতে পারা দূরে থাকুক, কোন পুরুষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিবে, এই অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়টীও কি কেহ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন? তাহার পরে দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রনাথ বাবু বালিকা বিবাহ দিতে চান। বালিকা বয়সের তরল বুদ্ধি ও ক্রীড়াপ্রিয়তার মধ্যে হইতে সেই পাত্রীর ভবিষ্যৎ হৃদয়স্ফূর্ত্তির ছবিটী ঠিক আঁকিয়া যিনি মিলন করাইয়া দিতে পারেন, তিনি মনুষ্য নহেন, দেবতা। কিন্তু এরূপ বর্ষীয়ান্ দেবতা ত আমি কখনও চক্ষে দেখি নাই। তবে চন্দ্রনাথ বাবু বলিবেন যে, বালিকা, পরিবারে মিশিয়া থাকিয়া, স্বামীর সঙ্গে এক সঙ্গে থাকিয়া, স্বামীর হৃদয়ের অনুরূপ হইয়া উঠিবেন। একথাও জীবনবিজ্ঞান বিরোধী। চন্দ্রনাথ বাবুত নিজেই বলিয়াছেন যে, স্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্কা থাকিলে স্বামী তাঁহার সহিত মিশিবেন না, তবে কেমন করিয়া স্ত্রী স্বামীর মনের মত হইয়া উঠিবেন? যদি বলা হয় যে, একত্রে মিশিলে কোন ক্ষতি নাই, তবে পরিহাসাদি করিবেন না। একথারও বিচার করা যাউক। আমরা ত বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ভগ্নীর সঙ্গে একত্র থাকি, একত্র খাই, সেই ভগ্নী ঠিক আমার মনের মত জন্মিয়া উঠেন কি? যদি বল যে, সেখানে, ভগ্নী সম্পর্ক বলিয়া হৃদয় বিনিময়ের সেই ভাবটী ফুটিয়া উঠে না, আর স্ত্রীর প্রতি প্রণয়ের চক্ষু থাকে বলিয়া ধীরে ধীরে হৃদয় এক হইয়া যায়। একথা বলিলেও বিপদ আছে। ভগ্নীকে যেরূপ চক্ষুতে দেখিতে হয়, পরিণীতা বালিকাকে যদি সেরূপ চক্ষে না দেখিয়া প্রণয়ের ভাবে দেখিতে হয়, তাহা হইলে, অপ্রাপ্ত বয়স্কার প্রতি যেরূপ ভাবে ব্যবহার করা উচিত, তাহার পক্ষে বাধা পড়ে; এবং অধিকন্তু একটী বালিকা, যাহার হৃদয়ে আজও কোন বিবাহের ভাব ফোটে নাই, তাহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিলে যে জীবনের নৈতিক দুর্গতি কত হইতে পারে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। যুবতীর দিকে যুবক প্রেমের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করুন, ক্ষতি নাই, তাহাতে যদি ভ্রান্তি জন্মে, চিত্তবৈকল্য হয়, তাহাও প্রার্থনীয়, কিন্তু বালিকাকে প্রেমময়ী করিয়া গড়িবার চেষ্টা করা কোন প্রকারে উচিত নয়।

চন্দ্রনাথ বাবু ব্যক্তিগত সুখের যে প্রকার বিরোধী, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বাস্তবিক সেরূপ নহেন। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ফলিত জ্যোতিষ মানিতেন; উভয় পক্ষের জন্ম পত্রিকাদি দৃষ্টে মিলনের শুভফল গণনা করিতেন, তাহার পর বিবাহ দিতেন। সে কথটা চন্দ্রনাথ বাবু মোটেই উল্লেখ করেন নাই। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, তৃতীয় ব্যক্তি দেবতা না হইলে অন্য দুইটী হৃদয় মিলাইয়া সুখী করিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু এযুগে যখন আমরা ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত মানি না, তখন কেমন করিয়া সম্পূর্ণ পরের উপর বিবাহের জন্য নির্ভর করিব? আমি আত্মীয় ও অভিভাবকের নির্ব্বাচন ভাল মনে করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে বর কন্যার পরস্পর নির্ব্বা-

চনও চাই। এবং ইহা করিতে হইলে আর কোন মতে অবিকশিত হৃদয় ও বুদ্ধি সম্পন্না ১৩ বৎসরের বালিকার সহিত ৩০ বৎসরের পুরুষের বিবাহ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ বালিকাকন্যার বিবাহ—আদৌ সিদ্ধ হইতে পারে না।

বালিকা কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর আর এক যুক্তি আছে। তিনি বলেন, যে, কন্যাকে যখন পরিবারের সঙ্গে মিশিতে হইবে, তখন বাল্যকাল হইতে না মিশিলে, অশান্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যে হিন্দু ঋষিরা বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাত দেখিতে পাই না। তাহা যদি হইত, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হয় নাই কেন? শূদ্রাদি জাতি যে এখন বাল্যবিবাহ দেয়, সেটা ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে; কিন্তু পূর্ব্বে কোথায়ও এ রীতি ছিল না। ক্ষত্রিয় গৃহে এখনও সর্ব্বত্র যুবতী বিবাহ হয়; বঙ্গদেশ বাদে অন্যান্য দেশে অধিকাংশ ভদ্র শূদ্রজাতি যুবতী বিবাহ দেয়; উড়িষ্যার করণজাতি, যাহারা অন্য নামে কায়স্থ, তাহাদের মধ্যেও যুবতী বিবাহ হয়। সে সকল স্থলে পারিবারিক অশান্তির কথা ধরা হয় নাই কেন? আর এক কথা আছে; বঙ্গদেশ ভিন্ন আর ভারতবর্ষের কুত্রাপি এ রীতি প্রচলিত নাই, যে, বিবাহিতা বালিকা কন্যা শ্বশুর গৃহে বাস করিবে। যে যে জাতিতে বাল্যবিবাহ হয়, সেই সেই জাতিতে দেখা যায় যে, পুনর্বিবাহ-সংস্কার না হইলে কন্যা বরগৃহে নীতা হয় না। মান্দ্রাজ বলুন, মহারাষ্ট্রা দেশ বলুন, উত্তর পশ্চিম বলুন, আর উড়িষ্যাই বলুন, সর্ব্বত্রই এ রীতি প্রচলিত। কেবল রঘুনন্দনের অনুশাসনে যাহা হইয়াছে, তাহাই প্রাচীন ঋষিদিগের উদ্দেশ্য বলায় ভ্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মণের গৃহে বালিকা বিবাহের কারণ অন্য কিছু। সংক্ষেপত এ রীতি ব্রাহ্মণ জাতিকে জাতিভেদের গণ্ডী দিয়া অটুট রাখিবার জন্য হইয়াছিল। একজন গ্রীক্ ভ্রমণকারী লিখিয়া গিয়াছেন যে, পঞ্জাব অঞ্চলে এক রাজ্যে (ইতিহাস খানা হাতে নাই) ব্রাহ্মণ গৃহে যদি কাল রংএর কি কুৎসিৎ রূপের সন্তান জন্মিত, তবে তাহাকে বধ করা হইত। অনার্য্য সংস্পর্শ দুর করিবার জন্যই এ চেষ্টা হইয়াছিল। বাহুবল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের গৃহে এ আইন, জারী না করিলেও, চলিয়াছিল। কিন্তু সে প্রাচীন সমাজ ও কার্য্যবিভাগ আর নাই, কাজেই সে বাল্যবিবাহ রীতি একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য কেবল প্রচলিত হইতে পারে না। যাহাতে কন্যা পরিবারের লোকের বাধ্য হইয়া থাকিতে পারে, ইহার জন্য মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া চাই। নচেৎ ঘরে পূরিয়া রাখিলেই যে বাধ্য হইবে ও সকলের মনের মত হইবে, ইহা জানা যায় নাই। চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ দুইটীতে আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তাহার সমালোচনা করিবার অবকাশ ও সুবিধা হইতেছে না।

৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ দুইটী বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কবিত্বের জোৎস্নাময় সরল ও পরিস্ফুট ভাষা,—তীব্র অথচ মধুর ব্যঙ্গোক্তি পরিপূর্ণ লিপিচাতুরী; এ সকলি অতি প্রশংসার যোগ্য। নবজাত বলিয়া ভাল হউক আর মন্দ হউক, দেশীয় সাহিত্যকে যে আদর করিতেই হইবে, ইহা সঙ্গত নয়; তাহার দোষ খুব দেখান চাই, দেশের

রুচি খুব পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া চাই। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ। ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টের হটকারিতা ও চিন্তাহীনতা, *Mathew Arnold* প্রমুখ যোগ্য-ব্যক্তিগণের দ্বারা সর্ব্বদাই নিন্দিত হইতেছে; এবং তাহার শুভফল ফলিতেছে ও ফলিবে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর লেখায় আর্ণল্ড প্রভৃতির ন্যায় গাম্ভীর্য্য নাই। সুতরাং ইহাদ্বারা যে সহজের কোন উপকার হইতে পারে, তাহা আমি বুঝি না। আর রবীন্দ্র বাবু এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। আমাদের দেশে যাহারা নির্ধন, অথচ শিক্ষিত, তাহারাই সংবাদ পত্রাদির সম্পাদক। সুতরাং দেশে কোন অনিষ্টপাত হইলে তাহারা কাগজে লেখা ভিন্ন আর কি করিতে পারে? যদি তাহাদের অর্থ-স্বচ্ছলতা থাকিত, অথচ কেবল চিৎকারই করিত, তবে তাহাদিগকে হৃদয়হীন বলিতে পারিতেন। আমাদের দেশের ধনীগণ নিদ্রিত বলিয়াই কোন কার্য্য হইতে পারিতেছে না। তথাপি সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি গত বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষের সময় কাগজে আন্দোলন করিয়া অল্প অল্প চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় কাগজওয়ালাদিগকে 'হৃদয়হীন' কেমন করিয়া বলিব? আর এক কথা। ডাক্তার ও উকীল ব্যবসা করেন, পয়সার জন্য। তাঁহারা মূলধন হাতে লইয়া পরোপকার করিতে বসেন নাই; এবং করিতেও পারেন না। তবে উৎপীড়িতের পক্ষে, উকীল কেমন করিয়া কেবল বায়ু আহার করিয়া, বক্তৃতা করিতে আসাম, শ্রীহট্ট বেড়াইবেন? দেশের জাতীয়-ধনভাণ্ডার চাই, যাহা হইতে উকীলকে টাকা দিয়া কার্য্য করান যাইতে পারে। উকীল সেই ফণ্ডে টাকা দিতে পারেন, এইমাত্র। তবে মনমোহন ঘোষ মহোদয়ের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সে ত খুব ভালই। সেরূপ সকলের সংসারিক সুবিধা আছে কিনা, তাহা জানা চাই। আমরা আমাদের টাকা ঘরে পূরিয়া রাখিব, আর উকীল, উকীল হইয়াছেন বলিয়াই অর্থশূন্য হইয়া পরোপকার করিয়া বেড়াইবেন, ইহা ঠিক নহে। যাহা হউক, মোটের উপর রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ দুইটী সুপাঠ্য।

৭ম প্রবন্ধ।—সোণার কাটী রূপার কাটী ও সোণায় সোহাগা। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত সুশিক্ষিত লোকের মত এত সঙ্কীর্ণ, দেখিলে দুঃখ হয়। কোট পেণ্টালুন পরিলে যদি কোন ক্ষতি থাকে, তবে তাহা দেখাইলে ভাল হইত। নচেৎ সে ইংরাজী জিনিস, আমাদের দেশে ছিল না, এবং ইংরাজ আমাদের কিছু অনুকরণ করে না, অতএব তাহা পরিত্যজ্য; এটা বৃথা সঙ্কীর্ণ জাতীয় অভিমানের কথা। পোষাকে জাতীয়ত্ব নষ্ট হয় না; এসকল বিষয়ে লোকের স্বাধীন রুচি যেরূপ হয়, সেইরূপ করিলে কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখি না। বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু লালমোহন ঘোষ, ও বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইঁহারা সকলেই ইংরাজী পোষাক পরেন; কিন্তু তাঁহাদের মত স্বদেশহিতৈষী কয়জন ধুতি চাদরওয়ালা আছেন, তাহা জানি না। স্বদেশের জন্য যিনি সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সুরেন্দ্র বাবু কাঁটা চামচে আহার করেন; আর আমরা কতজন ঘরে বসিয়া জেঠাম করি; কিন্তু হাতে খাই বলিয়াই কি আমরা বড় হইলাম! যদি

সাহেবেরা বলে যে, ইহারা আমাদের অনুকরণ করিতেছে, অতএব ইহারা অসভ্য। এরূপ মূর্খের মত কেহ কিছু বলিলে ক্ষতি কি? বাণিজ্যে ও দেশভ্রমনে অনেক নূতন পরিবর্ত্তন দেশে হইয়াই থাকে। সাহেবেরা যদি আমাদের ভাল অনুকরণ না করে, তবে বুঝিব, তাহারা সঙ্কীর্ণ। সভ্যতার পরিচয়, ব্যবহারে, ও বিদ্যায়; পোষাকে নয়। আমি ধুতি চাদর ভালবাসিতে পারি; কিন্তু যে ভাল বাসে না, সেই যে সাহেব হইতে চায়, এ কথা অত্যন্ত মিথ্যা।

৮ম প্রবন্ধ।—হিন্দু বিধবার বিবাহ। অক্ষয় বাবুর এই সুন্দর প্রবন্ধটীর সহিত আমার অধিক স্থলেই মতের মিল আছে। তবে যে সকল কথার সহিত মিল নাই, চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ সমালোচনাতেই তাহা বলিয়াছি। যাঁহার প্রকৃত বিবাহ হয়, তিনি ত স্বামী বিয়োগে ব্রহ্মচর্য্য করিবেনই। তবে বয়স হইয়া বিবাহ হইলেই যে একেবারে ঠিক বিবাহ হইয়া যায়, তাহা নয়। সুতরাং সে সকল স্থলেও বিধবা অবশ্য বিবাহ করিবে। অক্ষয় বাবু বিধবা বিবাহ নিষেধ করেন নাই; তবে বিধবার জীবনের একটা আদর্শ দেখাইয়াছেন। আদর্শটী যে খুব সুন্দর ও ধর্ম্মসঙ্গত, তাহাতে কোন ভুল নাই।

অসার ৯ম প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

অবশিষ্ট প্রবন্ধ তিনটী স্ত্রীলোকের লেখা। যে দেশে স্ত্রীলোকে এমন সুন্দর লেখা পড়া শিখিয়াছেন, সে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দীর্ঘজীবিনী হইয়া অন্ধকারময় বঙ্গের অন্তঃপুরের উজ্জ্বলতা বিধান করুন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আয়, ঘুম, আয়।

১
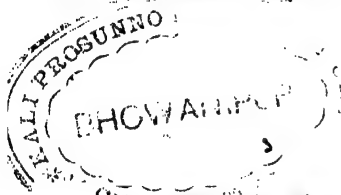
আয়, ঘুম, আয়।
চেয়ে আছি সারা-রাত, বুকে দুটি দিয়ে হাত,
দীর্ঘ-শ্বাসে বুক ভেঙ্গে যায়;
অশ্রুজল কপোলে গড়ায়।

আয়, ঘুম, আয়।
একটি একটি ক'রে সুনীল আকাশ পরে
কত তারা ফুটিল রে হায়!
লতিকা সমীরে দুলে; ফুল-দল পড়ে খুলে,
তটিনী উছলি পড়ে পায়।
আয়, ঘুম, আয়।

৩

আয়, ঘুম, আয়।
বাঁধ্ মোরে বাহুডোরে, এজগত যাক্ স'রে।
বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে, গেয়ে,—
সুখে দুখে প্রেমে, কল্পনায়।
বুকে মাথা রাখ্ ভুলে, অকূলে দেখারে কূলে,
ঢাক্ স্নেহ-ছায়।
আয়, ঘুম, আয়।

৪

আয়, ঘুম, আয়।
যুথিকা শুকায়, ঢাকিস্ পাতায়;
—ঢেকেদে আমায়!
বিষণ্ণ তারকা মেঘে দিস্ ঢাকা;
—ঢেকে দে আমায়।

ধরণী লুকায়, তটিনী লুকায়,
তোর কুয়াসায়;
—ঢেকে দে আমায়!
জগতের দূরে, তোর মেঘ-পুরে,
নিয়ে যা আমায়!

তোর ছায়া মত, স্বপ্ন-মায়া মত
ক'রে দে আমায়!
শ্রান্ত আমি জগত-রেথায়।

শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল।

নব্যবঙ্গ।

(৫ম প্রস্তাব।)

সমাজ এবং সমাজ শক্তির কথা আলোচনা করিতে গিয়া, এই দুইয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিলে, বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সমাজ কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া, বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া গড়ে নাই। মানব-প্রকৃতির এক গূঢ় মূল মন্ত্রবলে ইহা আপনা আপনিই গঠিত হইয়াছে, এ সকল সুপ্রাচীন তত্ত্ব লইয়া, আবার একটা ঘোরতর নূতন তর্ক-যুদ্ধের অবতারণা করিলে, কাহারও ধৈর্য্যে কুলাইবে না। সুতরাং এমন কাজে নিরস্ত থাকাই ভাল। তবে বিবেচ্য এই যে, যে শক্তি মানুষকে সমাজ-বদ্ধ করিয়াছে, তাহা সকাম কি নিষ্কাম? অর্থাৎ স্বার্থ সাধন জন্য কিম্বা হৃদয়ের আবেগ বশত, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কিম্বা ধর্ম্মসাধন জন্য, সংসার কিম্বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে, মানবসমাজ-বদ্ধ হইয়াছে? অনেক অন্ধকারের স্তূপীকৃত স্তর পার হইয়া, চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের সূক্ষ্ম অনুমানের কারণ যতদূর পৌঁছিতে পারিয়াছে, তদ্দ্বারা এই পর্য্যন্ত অবধারিত হইয়াছে যে, প্রয়োজন বা স্বার্থসাধন জন্যই মানুষ ধীরে ধীরে সমাজ-বদ্ধ হইয়াছে। এই অনুমানের প্রধান সমর্থক প্রমাণ, বর্ত্তমান যুগের বর্ব্বর-সমাজ। বস্তুত এই বর্ব্বর সমাজই যে এইরূপ অনুমানের উৎপাদক কারণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বর্ব্বরদিগের মিলনের বাহ্যিক পদ্ধতি ও ব্যবহারাদি দেখিয়াই, পণ্ডিতগণ, এরূপ একটা সাধারণ অনুমানে উপস্থিত হইয়াছেন। এই এরূপ আনুমানিক বা কাল্পনিক আদিম অসভ্য মানুষের বিবরণে কত শত শত ইতিহাসের বহুতর পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং তাহা সমস্ত শিক্ষিত মণ্ডলীরই মুখস্থ ও অভ্যস্ত আছে। সুতরাং নূতন প্রবন্ধ-লেখক বা গ্রন্থকারের তদ্বিষয়েও আর বাক্যাড়ম্বর করিবার কিছুই নাই। তৎপরে বর্ত্তমান সময়ের বর্ব্বর জাতির ইতিহাসে হাত দিতে যাইয়া কেবল কোন ব্যবসায়ী নকল-নবিশের ব্যবসায় অনধিকার প্রবেশ করা হইবে মাত্র, তদ্ভিন্ন বিশেষ কোন লাভ হইবে না। কাজে কাজেই এ সকলকে সাধারণ পরিজ্ঞাত বিষয় মনে করিয়া লওয়াই উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এই সকল ইতিহাসাদি বা ঘোরতর কল্পনা জড়িত অনুমান দ্বারা সত্য কতদূর নির্ণীত হইতে পারে, তাহাও অবধারিতরূপে বলিয়া উঠা সুকঠিন। সুতরাং এইরূপ কাল্পনিক অনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পথ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বজন-

সম্মুখস্থ সভ্যাসভ্য সাধারণ মানব-প্রকৃতি এবং সমাজতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে চেষ্টা করাই সুসঙ্গত এবং অতি সহজতর উপায়।

একবারে সদ্ভাব-শূন্য বা হৃদয়-শূন্য মানুষের কল্পনা, কখনও কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পায় না। এমন কি, পশুদিগের মধ্যেও আমরা, কত মত সদ্ভাব ও হৃদয়ের ব্যাপার দেখিতে পাই। ব্যাঘ্রের মত সিংস্র জন্তু বোধ হয় আর নাই। কিন্তু ব্যাঘ্রওত একেবারে হৃদয় এবং সদ্ভাব-শূন্য নয়? অধিক আর কি বলিব? পশুর মধ্যে মস্তিষ্কের অভাব যত অধিক, হৃদয়ের অভাব তত বেশী বোধ হয় না। স্ত্রী পুত্র এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা পশুর প্রাণেও দেখা যায়। পিপীলিকা, উঁই, মৌমাছী, প্রভৃতিও সামাজিক জীব। পাখী-দের কেমন সুন্দর পারিবারিক বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। কাক ও বানরদেরও এক একটা সমাজ আছে। এখন কি বলিব, এই সকল কীট, পোকা, পশু, পক্ষী, একটা গভীর প্রয়োজন-সিদ্ধি বা স্বার্থ-সাধন জন্য মস্তিষ্ক খাটাইয়া, পরিবারবদ্ধ অথবা দলবদ্ধ হইয়াছে? ভেড়ারা, একটাকে গর্ত্তে পড়িতে দেখিলে, সকলেই লাফাইয়া গর্ত্তে পড়ে। ইহারও মধ্যে কি ভেড়াদের মস্তি-ষ্কের ক্রিয়া এবং একটা নিগূঢ় স্বার্থ রহি-য়াছে? আমরা দেখিতেছি, হৃদয়ের অতি নিঃস্বার্থ সদ্ভাবের আবেগেই এজগতে এক জন আর এক জনের সঙ্গে মিশে। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বার্থ সাধন জন্য মিশিতে গেলে মিশা হয় না। হইলেও অধিক সময় স্থায়ী হয় না। এইরূপ অস্থায়ী মিশার ফলে পরিবার বা সমাজ হইতে পারে না। মিল

নের মূলমন্ত্রই নিষ্কাম বা নিঃস্বার্থ সদ্ভাব। কিন্তু একথা গুলি হইতেছে পশু পক্ষীর সম্বন্ধে। পশু পক্ষীর প্রাণে আবার সদ্ভাব কি? বাঘের প্রাণে সদ্ভাব থাকিলে, মানুষ, গোরু ও মহিষ ধরিয়া ধরিয়া খায় কেন? কুকুরেরা, কুকুর দেখিলেই পেউ—খেউ করিয়া ধায় কেন? কিন্তু হৃদয়ের অভিমানী মানুষকেও এই সকল কথা উল্টাইয়া বলা যাইতে পারে। তবে কিনা প্রতিপক্ষ নিতান্ত মূক বা বোবা। নতুবা বাঘ এবং কুকুরেরাও মধ্যে মধ্যে আপনাদের প্রকাণ্ড সভা ডাকিয়া, মানব-চরিত্রের বিবিধ কুচ্ছা রটনা করিতে পারিত এবং স্বজাতির দোষী ব্যক্তিকে মানুষ বলিয়া গালি দিত। দুঃখের বিষয়, তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্ট কোন মোক্তারনামা বা ওকালতনামাও পাওয়া যায় নাই। পরন্তু মানুষজাতির এইরূপ পক্ষপাতজড়িত মতামতকে তাহারা, বোধ হয়, বিশেষ মূল্যবানও মনে করে না। নতুবা মানুষজাতির এমন দশ আদেশ, অহিংসা পরমধর্ম্ম ও মার্লি মার্লি কল্-সীর কাণা তাই বোলে কি প্রেম দেব না, ইত্যাদি মহামূল্য উপদেশ প্রচারের পরেও বাঘেরা, সুবিধামত দেখা পাইলেই, আজও ধরিয়া ধরিয়া মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিত না। যাহা হউক, এখন দেখা যাইতেছে, পশুপক্ষ-সমর্থনে নিরস্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে উচিত।

সকল প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ ছাড়িয়া, শুধু মানুষের চরিত্র এবং সমাজ পর্য্যালো-চনা করিলেই, সমাজবন্ধনের মূল মন্ত্র কি, জানা যাইতে পারে। ঘটনাবশত দুইটী মানুষের কিছু সময় বা দিনের জন্য একত্র চলা ফিরা অথবা আলাপাদি হইলেই, বাহিরের কিম্বা ভিতরের কোন বাধা না

থাকিলে, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্টতার বৃদ্ধি ও মিলনের একটা কারণ উপস্থিত হয়। এই কারণের নাম, অনুরাগ বা প্রাণের টান। এই প্রাণের টান যে, মানুষ সামাজিক এবং সভ্য হওয়াতেই মানুষের প্রকৃতিতে সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নয়। চাঁদ কিম্বা কুসুমের সৌন্দর্য্যে, সেই সর্ব্বাদিম বর্ব্বর-সম মানুষেরও প্রাণ মুগ্ধ হইত। কারণ, ইহার ব্যভিচার অদ্যাবধি কোথায়ও দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং এটা একটা স্বীকার্য্য সত্য। এইরূপ মানুষের গুণবত্তা বা চরিত্রগত সাধুভাবাদির প্রতিও অনুরাগ, মানব-প্রাণের স্বাভাবিক ভাব। একজন মানুষ, যখন আপনার মনের আদর্শানুযায়ী গুণবত্তা ও সাধুতাদি অপরের মধ্যে দেখে, তখন সে, সকল অর্থ, সকল স্বার্থ ভুলিয়া দীপ-মক্ষিকার মত ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করে। ইহা করিতে মানুষ ব্যগ্র, ইহা না করিতে পারিলে মানুষ অসুখী। বাহিরের ঘটনা বা প্রয়োজনাদি কেবল মানুষকে মানুষের কাছে আনিয়া পৌছায়। কিন্তু প্রাণে প্রাণে এক করিয়া, হরিহরের মত মিলাইয়া দেয় না। এই মিলন ব্যতীত সমাজ দাঁড়ায় না। এই অন্ধ অনুরাগ বা প্রাণের টান স্পষ্টরূপে বুঝাইতেই পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আবার সমাজ-ভিত্তিতে অবতরণ করিলেও স্পষ্টই দেখা যায়, একটা সার্ব্বকালীন এবং সার্ব্বজনীন বিশ্বাস ও অনুরাগই সমাজ-স্থিতির প্রধান উপাদান। এই অনুরাগেরই একটী উচ্ছ্বাস,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এই অনুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়াই, সমাজের বীরপুত্রগণ, অকাতরে শত্রুর তরবারির মুখে শির অর্পণ করেন। ইহারই ফলে সমাজ-হিতের জন্য সকল স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন করিয়াও, কত শত শত মহাত্মা আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করেন। বিশ্বাস, এই অনুরাগের পূর্ব্বাভাস মাত্র। কিন্তু এই অনুরাগই, সমাজ বন্ধনের মহামন্ত্র। সামাজিকের মনে এই অনুরাগ-বৃদ্ধির উপযোগীতাই সমাজের শক্তি। অর্থাৎ যে সমাজ, সামাজিকগণের মনে আপনার প্রতি এবম্বিধ অনুরাগ অক্ষত রাখিতে ও বৃদ্ধি করিতে যত সমর্থ, সেই সমাজ সেই পরিমাণে বলশালী। এই উপযোগীতা বা সামর্থ্য কি, তাহাই এখন বিচার্য্য।

প্রকৃতি যাহা চায়, যে ব্যক্তি বা বস্তু হইতে তাহা আয়ত্বাধীন হয়, সেই ব্যক্তি বা বস্তুতেই মানুষের অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। যাহা যত অধিক পরিমাণে প্রকৃতির এই প্রার্থনা পূরাইতে সমর্থ, সুতরাং তাহা তত অধিক পরিমাণে মানুষের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার উপযোগী। আবার যাহা কেবল একটী অভাব নয় কিন্তু জীবনের শত সহস্র বা তদধিক সংখ্যক অভাব পূর্ণ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট, মানব-চক্ষে তাহা যেমন মহামূল্য পদার্থ, তেমনই তাহার কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি মানব প্রাণের বিপুল অনুরাগ সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য মানুষ, এমন কি স্বার্থ আছে, যাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে না? এক একটী সমাজ, সামাজিকের পক্ষে এইরূপ মহামূল্য বস্তু। অতএব দেখা যাইতেছে, যে সমাজ সাধারণ ভাবে সামাজিকগণের প্রত্যেকের প্রবৃত্তির সমুচিত প্রার্থনা পূরাইতে যত সমর্থ, তাহা তত পরি-

[illegible] শক্তিশালী। তাহা হইলেই, সমাজ এই [illegible] গঠিত হওয়া উচিত, যেন তাহার [illegible] প্রতি ব্যক্তি, ইচ্ছা মত বেশ মাথা [illegible] দিয়া, আপনার অবিকৃত প্রকৃতির [illegible] অবাধে প্রাণ মন হৃদয় খুলিয়া বেড়াইতে পারে। যেন সুসঙ্গত অভিলাষ পূরণের অভাবে তাহার নির্ম্মল প্রাণে এক-টীও দাগ না বসে। সুতরাং সামাজিক নিয়ম গুলির মূলে এই রূপ উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজনীয়, যেন তদ্দারা সামাজিকগণের প্রত্যেকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অন্তর্হিত হইতে পারে। এমন উদার ভিত্তির উপরে নিয়মাবলী দাঁড় করা বিধেয়, যেন মানবের জ্ঞান ও হৃদয়ের প্রসারানুসারে তাহা চিরদিনই অভাব পূরণের উপযোগী থাকে। সুতরাং এই ভিত্তি, সার্ব্বভৌম, সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বকালিক হওয়া চাই। স্থান, কাল, পাত্র ইহার কোন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই এই ভিত্তিকে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। বর্ত্তমান যুগের সভ্য সমাজ গুলি, বিশেষত আমাদের সমাজের প্রকৃতি দেখিলেই, বোধ হয়, যেন অভাব-পক্ষ সমর্থন করাই ইহার কার্য্য ও উদ্দেশ্য। বিবিধ প্রকার কড়াকড়ি নিয়মের এবং ছাঁদন বাঁদন দিয়া হাত, পা বন্ধ করিয়া, শাসনের উপরে শাসন ভার চাপাইয়া, সামাজিকের কতকগুলি প্রবৃত্তিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলাই, একটা প্রধান এবং মুখ্য কাজ। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে এক-জন স্বেচ্ছাচারী বা অর্দ্ধ স্বেচ্ছাচারী রাজা এবং তৎপরে সমাজপতি প্রভৃতি ও অভ্রান্ত আপ্তবাক্য কিম্বা বেদ বাক্যাদি [illegible] ঘাটিতে ঘাটিতে দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে। তৎপশ্চাতে কত রাশি রাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন রহিয়াছে। কিন্তু ভাব পক্ষে এই রূপ সাধারণ আয়োজন অল্পই আছে। সুসভ্য দেশে রাজকীয় ব্যয়সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সুবিধাজনক বা সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নয়। সমাজের প্রতি নর নারী যাহাতে অভি-লাষানুযায়ী সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জীবনের লক্ষ্য পথে স্থির ও শান্ত ভাবে চলিতে পারে, এমন বন্দোবস্ত কোথায়ও নাই। সর্ব্বত্রই শিক্ষা বহু-ব্যয় সাধ্য এবং কঠিন কঠিন নিয়-মের আবর্জ্জনা দ্বারা একরূপ কণ্টকাকীর্ণ। সকল দেশে এবং সকল সমাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে শিক্ষাপথ ক্ষুরধারের মত সাতিশয় দুরূহ। এজন্য সমাজের উচ্চ অঙ্গের লোকেরাই যাহা কিছু শিক্ষা এবং ক্ষমতা একচাটিয়া রূপে অধিকার করিয়া বসে। অর্থাৎ প্রকৃতি যাহাকে ধনবল, জন-বল ও সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক দিয়াছে, সে-ই বিদ্যা উপার্জ্জনে সমর্থ হয়। অপর ব্যক্তির এই সকল নাই বলিয়াই যেন সে পৃথিবীতে জন্মিয়া একটা বিষম অপরাধ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার জন্য সমাজ কোনই বিধান করেন নাই। কিন্তু সে যখন আপনার অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞতার দরুণ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির উত্তেজনায় হঠাৎ একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে, তখন অমনি চারিদিক্ হইতে সমাজের নানা শাসন নানা আকারে আসিয়া, যেন তাহাকে পেষিত করিতে থাকে। এই রকম শিল্প বাণিজ্যের জন্যও সুসভ্য দেশ সমূহে যে রাজকীয় যত্ন চেষ্টা আছে, তাহাও কোন প্রকারেই প্রচুর নয়। ধর্ম্মোপদেশ দানাদি কার্য্য, যাহা কিছু সামাজিক মানবের আধ্যাত্মিক হিতকর ব্যাপার, তাহাও যাজক মণ্ডলীর ব্যবসায় মাত্র হও-

য়াতে, নানাবিধ কুসংস্কার ও আপ্ত বাক্যাদি পরিপূর্ণ হইয়া, বিপরীত ফলই উৎপাদন করিয়া থাকে। বস্তুত সমাজগুলির গঠন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে, কেবল কতকগুলি নিষেধ-সুচক বা বাধাদায়ক কড়াকড়ি নিয়মই চোখে ভাসিতে থাকে। ইহারই সাধারণ নাম শান্তি-রক্ষা। এই শান্তি-রক্ষা যে অদরকারী তাহা মনে করি না, কিন্তু বাধাদান কার্য্য দ্বারাই ইহা রক্ষা না করিয়া, বাধা দূরীকরণ রূপ কার্য্য এবং উন্নতি-সাধন দ্বারা রক্ষা করিলেই ভাব পক্ষে কিছু করা হয়। নর, নারী, অল্প বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সকলেরই মন, প্রাণ ও শরীরের অবস্থা উন্নত করিয়া দিবার জন্য সমভাবে সমাজের চেষ্টা ও উদ্যোগ থাকা উচিত। কিন্তু এরাজ্যে—এযুগে কি দেখিবে? দেখিবে. একজন যেন সমাজের নিতান্ত 'সু' ও আর একজন নিতান্ত 'কু'। তুমি নারী, যাও—তোমার জ্ঞান ধর্ম্ম কোন বিষয়েই উন্নত হইবার অধিকার নাই। তুমি সমাজের নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার দশা, ঐ নারীর দুর্দ্দশার চেয়েও অধম। তুমি গরিব ভদ্র লোকের সন্তান, তোমার সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক থাকিলেও, তাহার চর্চ্চা করিতে এজগতে তোমার জন্য কোনরূপ সুবিধা করা হয় নাই। দরিদ্র যুবক, তোমার পক্ষে এ ভব-সংসার বিষম কারাগার। তোমার হৃদয়ের প্রীতি, ভক্তি ও স্নেহের পুতুলগুলি দিনরাত্রি অশ্রুমুখে তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। তুমি তাহাদের অসহায় জীবনের সহায়, অন্ধের নড়ী, কাঙ্গালের মাণিক। দিবা নাই, রাত্রি নাই, গুরুতর দুর্ভাবনায় তোমার মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, প্রাণ বিষাদ-ভরে আকুল, চক্ষু ছল ছল, অপমানে মুখ মলিন, যেন তোমার ক্ষুদ্র শিরে একটা হিমালয় চাপা পড়িয়াছে। তুমি সংসার সাগরের ভীষণ তরঙ্গে পড়িয়া, হাবুডুবু খাইতেছ, কখনও ডুবিতেছ, কখনও ভাসিতেছ। বিপদে পড়িয়া ব্যাকুলপ্রাণে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া কত হাঁক ছাড়িতেছ। জগৎ শূন্য, আকাশ নিস্তব্ধ, কে তোমার মর্ম্মভেদী চীৎকারে কাণ দিবে? কে তোমার মলিন কণ্ঠ দু'বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, কেন কাঁদ? কি দারুণ দুঃখে তোমার মর্ম্ম শিথিল? এস, তোমার দুঃখ এবং আমার সৌভাগ্য সমান ভাগ করিয়া দু জনেই ভোগ করি? তুমি গায়ের রক্ত শোষণ করিয়াও একমুষ্টি অন্নের যোগাড় করিতে পার না, কিন্তু আমার দশ মুষ্টি অন্ন আছে. এস তোমাকে তাহার ভাগ দিব? বস্তুত কত কোটী কোটী হৃদয় যে এইরূপ গুরুভারে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে, কেহ কি কখনও গণিয়া দেখিয়াছে? প্রাকৃতিক উপযুক্ততানুপযুক্তানুসারে একটা বৈষম্য চিরদিনই জগতে থাকিবে, ইহা ষোল আনারূপে সত্য কথা। কিন্তু এখন যে বৈষম্য দেখা যায়, ইহা সে বৈষম্য নয়। ইহাতে তাহাতে আকাশ পাতাল তফাৎ হইবে। তাহা কখনই এইরূপ হৃদয় বিদারক ও ভীষণ হইবে না। সে বৈষম্যে কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না। তাহা সাম্যের প্রতিকৃতি মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান জনসমাজে যে ভীষণ বৈষাম্য দৃষ্ট হয়, ইহা তদ্রূপ প্রাকৃতিক বৈষম্য নয়। ইহা কেবল সামাজিক কুপ্রথার বিষময় ফল। প্রাকৃতিক উপযুক্ততা এখানে আদবেই কেহ দেখে না। যে কোন উপায়ে কতকগুলি অর্থ বা কতকটা ক্ষমতা

সঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহার পাথরে পাঁচ কীল। একজন অতি অপদার্থ লোক, পড়িয়া পাওয়া কিম্বা পিতৃ পিতামহ-সঞ্চিত ধনরাশির অধিকারী বলিয়া, অনায়াসে সমাজের শিরোদেশে স্থান পাইতেছে। সমাজের বিচারে তাহার সাত খুন মাপ। সে লম্পটের শিরোমণি, বঞ্চকের গুরু ঠাকুর, বিলাসীর চরম আদর্শ, মাতালের সরদার, অধর্ম্মের প্রতিকৃতি, পাপের আশ্রয়-ভূমি এবং মূর্খতা ও অজ্ঞানের জীবন্ত অন্ধকারমূর্ত্তি হইলেও, সমাজে তাহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিশাল।

কেবল ধনেরই নয়, পড়িয়া পাওয়া ক্ষমতার অধিকারী হইলেও, অধিকারী, যতই কেন অধম ও নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক হউক না, তাহার সেই নরকতুল্য দেহই, দেবতুল্য বোধে জনসাধারণের পূজ্য ও আরাধ্য হয়। তাহার অঙ্গুলী সঙ্কেতে কোটী কোটী হৃদয় নাচিতে, হাসিতে, কাঁদিতে বাধ্য হয়। তাহারই হাতে আবার কত লোকের ধন, মান ও জীবনের ভার সঁপিয়া দিয়া সমাজ হাঁ করিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে। সমাজ-মধ্যে এইরূপ বিবিধ কুসংস্কার এবং কুপ্রথা বর্ত্তমান যুগের সমস্ত সভ্য দেশেই দেখা যায়। সর্ব্ব দেশেরই লোকের এই বিষম জীবন-সংগ্রামের ঘর্ষণও প্রতিঘর্ষণে চরিত্রে ধর্ম্মহীনতা এবং শুষ্কতা আসিয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডাদির মত সুসভ্য দেশের কত সামাজিক কুৎসা শুনিয়া সময় সময় কাণে হাত দিতে হয়। ইয়ুরোপের—সর্ব্বত্র "নিহিলীষ্ট," "সোসিয়ালীষ্ট" প্রভৃতি কত শত শত নূতন নূতন সমাজও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের আবির্ভাব হইতেছে। কত লোক, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া হিংস্র জন্তুর ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। গত ফরাশিবিপ্লবের মত কত নরকরুধিরবর্ষী বিপ্লবাগ্নিময় আগ্নেয়গিরি আজও সমাজের অন্ধকার-কুক্ষিতে লুক্কায়িত আছে, কে জানে? এই সকল সামাজিক দুর্ঘটনার মূলে যেন কেবলই মানুষের অতৃপ্ত বাসনার একটা জ্বলন্ত দাবানল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, যেন শত শত সামাজিক কুপ্রথামূলক অত্যাচারের বিষ-ঢেউ খেলিতেছে, যেন শত শত নিপীড়ন, নির্য্যাতন, নিরাশা, বিষাদ, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু ও রোদন একত্র জমাট বাঁধিয়া একটা ভীষণ প্রলয়ের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ দোষ—এ দায়িত্ব কাহার? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক ব্যক্তির পাপের জন্য সে নিজে যেমন দায়ী, তাহার সমাজও কড়া ক্রান্তি হিসাবে সম পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে দায়ী। তুমি বেতন না দিয়া কেবল তোমার ভৃত্যদিগকে সামান্য সামান্য দোষে নিপীড়ন ও শাসন কর, তোমার আশ্রিতদিগকে আহার না দিয়া কেবল তাহাদের উপরে হুকুম চালাও, তোমার চিকিৎসাধীন রোগীগণকে ঔষধ পথ্য না দিয়া কেবল দিন রাত তাহাদিগকে গালি দেও এবং প্রহার কর, আর মনে মনে তুমি আশা কর, তাহারা সকলে মিলিয়া তোমাকে বুকে বসাইয়া পূজা করিবে, প্রেম করিবে, মান্য ও শ্রদ্ধা করিবে। তোমার শিক্ষাধীন ছাত্রদিগকে শিক্ষা না দিয়া, তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে সুশিক্ষিত ও নীতিবানের মত ব্যবহার পাইতে চাও। পুত্র কন্যাগণকে স্নেহ না করিয়া, প্রতিপালন না করিয়া, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত না হইয়া পিতা মাতার মত তাহাদের নিকট হইতে প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম পাইতে

কর। বস্তুত এ সকল কথা জগতে প্রচারিত হইলে, লোকে তোমাকে কি বলিবে? বলিবে, তোমার বুদ্ধির পায়ে নমস্কার। আমরাও বলি, হে সমাজ, তোমার বুদ্ধির পায়ে, হৃদয়ের পায়ে নমস্কার। প্রতি নিহিলিষ্ট, প্রতি সোসিয়ালীষ্ট, প্রতি ধর্ম্মদ্রোহী, প্রতি ব্যভিচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণের জন্য তুমিই কার্য্যত এবং ধর্ম্মত দায়ী। তোমার গঠন এমনই কুৎসিত যে, দেব প্রকৃতি মানুষ তোমার আশ্রয়ে দিন দিনই পশু হইতেছে। বস্তুত জগতের সমস্ত সমাজই বহুল পরিমাণে সংস্করণীয়। এ বিষয়ে চিন্তাশীলগণের চিন্তা আর এখন নিদ্রিত নাই। হয়, মহাপ্লাবনে এপৃথিবী শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, নতুবা এমন দিন সম্মুখে আসিবে, যে দিন একটা উদার বিশ্বজনীন প্রেমের ভিত্তির উপরে এই পুরাতনের খোলস-নির্গত এক নবীন সমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। যেখানে, কেবল নৈসর্গিক বৈষম্য ব্যতীত লোকে লোকে আর কোন বৈষম্যে থাকিবে না, নর নারী, ছোট বড় সকলেই অনন্ত জীবন পথের সুসম্বল সকল অবাধে সমভাবে সঞ্চয় করিতে পারিবে। সুশিক্ষার সুন্দর আলোকে আর সামাজিক কোন প্রাণীই বঞ্চিত থাকিবে না; কোন মানুষই পড়িয়া পাওয়া বা পূর্ব্ব-পুরুষ-সঞ্চিত ধন রাশির উপরে বসিয়া মূর্খতা ও আলস্যের কোলে ঘুমাইতে পারিবে না। পিতৃসঞ্চিত ধন হইতে সুশিক্ষিত হওয়াই সন্তানগণের অধিকার কিন্তু তদ্দারা বিলাস সাধন করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিতে কাহারও কোন স্বত্ব নাই। সমাজের কৃতী সন্তানগণ তাঁহাদের ধন ও ক্ষমতার ফল সমাজতার হস্তে অর্পণ করিলে সমাজে কেহই সুশিক্ষা এবং সম্বলহীন হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইবে না। বস্তুত, মানুষকে মানুষ করিতে হইলে, আগে তাহাদের মাথার গুরুভার, বুকের পাথর চাপা দূর করিতে হইবে। অসভ্যগণকে জীবনের সমস্ত প্রয়োজনই নিজ হস্তে সমাধা করিতে হয়, এইজন্য অসভ্য জীবন দুঃখময় ও উন্নতিহীন। কিন্তু সুসভ্য সমাজে সর্ব্ব বিষয়েই চারিদিক হইতে সাহায্য পাওয়া যায়, তজ্জন্য ইহা মানবের প্রার্থনীয় এবং উন্নত ও সুখমূলক বলিয়া বর্ণিত হয়। সমাজের স্তরে স্তরে নামিয়া বিচার করিলে, মানবের দুঃখ দুর্গতি দেখিলে, বাস্তব পক্ষেই এখনকার সুসভ্য সমাজগুলিকে অর্দ্ধসভ্য বলিতেও লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইতে থাকে। এখানেও পশু পক্ষীর মত জীবন সংগ্রামেই মানুষকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। প্রাকৃতিক শক্তি সকল ক্রমে ক্রমে আয়ত্বাধীন হওয়াতে, বিজ্ঞানের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হওয়াতে, এই জীবন, ভার দিন দিনই কমিতেছে বটে, কিন্তু তথাপি সমাজরূপ গৃহ যতদিন সুসংস্কৃত হইয়া শরীর, মনের ও আত্মার প্রকৃত স্বাস্থ্য সুখের উপযোগী না হইবে, ততদিন মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি সুদূরপরাহত থাকিবে। আগে মানুষকে মাথা তুলিতে ও নিঃশ্বাস ছাড়িতে দেও, তৎপরে ধর্ম্মোপদেশ বল, অধ্যাত্মতত্ত্ব বল, সকলেই সুফল ফলিবে। ধর্ম্ম কথা কি আর জগতে কম হইয়াছে? বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, এবং চৈতন্য এবং রামমোহন কি আর এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই? আর্য্য ঋষিগণ কি এই পৃথিবীর জন্যই তাঁহাদের জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া যান নাই? এই সকল সামাজিক দুঃখ গ্লানি দূর

করিয়া মানুষকে স্বাধীন এবং উন্মুক্ত-স্বভাব কর। মোহমুক্ত না হইলে ধর্ম্মের জ্যোতি মানব-প্রাণে স্থান পাইবে কেন? এইরূপে সমাজ যতই মানবের উন্নতির সোপান স্বরূপ হইবে, ততই তাহা মানুষের প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসার বস্তু হইবে।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সিদ্ধান্ত বিন্দুসার।

আত্মা।

আমি ভূমি নহি, জল নহি, তেজঃবায়ু আকাশ বা ইন্দ্রিয় নহি, তাহাদিগের সমষ্টিও নহি, সুষুপ্তি, স্বপ্ন বা জাগ্রত সকল অবস্থাতেই আমি এক, আমি সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়। ১।

আমার বর্ণ নাই, আশ্রম নাই, ধর্ম্ম নাই, ধ্যান ধারণাযোগ নাই, আমি নিরাশ্রয় নিরভিমান সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।২।

আমার মাতা নাই, পিতা নাই, দেব নাই, লোক নাই, বেদ নাই, যজ্ঞ নাই, তীর্থ নাই। সুষুপ্তিকালে সকল বৃত্তি নিরস্ত হইলে আমি জাগিয়া থাকি, আমি সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।৩।

সাংখ্য, শৈব, পাঞ্চরাত্র, জৈন বা মীমাংসা দর্শনে আমাকে পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট অনুভূতি ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইলেই আমাকে জানা যায়। আমি সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।৪।

আমার ঊর্দ্ধ অধঃঅন্তঃবাহ্য মধ্য তির্য্যক পূর্ব্ব বা পশ্চিম নাই। আকাশের মত অখণ্ড ভাবে আমি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। আমি সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।৫।

আমি শুক্ল কৃষ্ণ রক্ত পীত কুব্জ পীন হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহি। আমার রূপ জ্যোতি বা আকার নাই। আমি সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।৬।

আমার শাস্তা বা শাস্ত্র, শিষ্য বা শিক্ষা, তুমি বা আমি, বা বিশ্ব সংসার নাই। আমি স্বপ্রকাশ ও বিকার শূন্য সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।৭।

আমার জাগরণ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কোন অবস্থা নাই, বিশ্ব, তৈজস বা প্রাজ্ঞ আমার কোন উপাধি নাই, অবিদ্যাজনিত সত্ত্ব রজ তম আমার কোন গুণ নাই। আমি সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।৮।

আমি সর্ব্বব্যাপী স্বতঃসিদ্ধ ও নিরাশ্রয়। আমা ভিন্ন জগতের সকলই অসত্য। আমিই সর্ব্বাবশিষ্ট শিব ও অদ্বিতীয়।৯

নিরঞ্জনাষ্টক।

ব্রহ্ম।

স্থান নাই, মান নাই, বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রতা নাই, রেখা নাই, ধাতু নাই, বর্ণ নাই।

যাহার দ্রষ্টা নাই, দৃশ্য নাই, শ্রবণ নাই, শ্রাব্য নাই সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি।১।

যিনি বৃক্ষ নহেন, মূল নহেন, বীজ নহেন, পত্র নহেন, পাত্র নহেন, লতা পল্লব নহেন, যিনি পুষ্প নহেন, গন্ধ নহেন, ফল নহেন, ছায়া নহেন, সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি।২।

যাঁহাদের বেদ নাই, শাস্ত্র নাই, শৌচ সন্ধ্যা নাই, জাপ্য নাই, ধ্যান ধ্যেয় নাই,

হোম যজ্ঞ নাই, দেব পূজা নাই, সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি।৩।

যাঁহার অধঃ বা উর্দ্ধ নাই, যিনি শিব বা শক্তি নহেন, পুরুষ বা স্ত্রী নহেন, যাঁহার লিঙ্গ মূর্ত্তি নাই, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু বা রুদ্র নহেন, সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি।৪

যাঁহার অংশ নাই, যিনি কালস্বরূপ নহেন, গুরু বা শিষ্য নহেন, গ্রহ বা তারা নহেন, মেখলাও নহেন, সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি। ৫।

যিনি শ্বেত, পীত, রক্ত, নেত, হেম বা রৌপ্য নহেন; যাঁহার কোন বর্ণ নাই, যিনি চন্দ্র সূর্য্য বা অগ্নি নহেন, যাঁহার উদয় বা অস্ত নাই, সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি। ৬।

স্বর্গ, নগর বা ক্ষেত্রে যাঁহার গৃহ নহে, যিনি জাতির অতীত ভেদ ভিন্ন নহেন, যিনি তুমি আমি সকল হইতে ভিন্ন, সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি।৭।

যিনি গম্ভীর বা ধীর নহেন, যাঁহার বন্ধন বা নির্ব্বাণ নাই, যিনি সংসার সার, যাঁহার পাপ পুণ্য নাই, যিনি ব্যক্ত বা অব্যক্ত নহেন, যিনি অভেদ ভিন্ন, সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জনকে নমস্কার করি।৮।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

অবরোধ প্রথা।

আমাদের দেশের অবরোধ প্রথা লইয়া অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। কেহ বলেন, হিন্দু রমণীরা পিঞ্জরাবদ্ধা পক্ষিনীর ন্যায় অবস্থিতি করে, স্বাধীনতার বায়ু সেবন করিয়া তাহারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, উচ্চ গগণে বিহার করিয়া স্বর্গীয় দৃশ্য সকল দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। কেহ বলেন, তাহারা কারাবাসীদের ন্যায় জানানা রূপ জেল খানার প্রাচীরের ভিতর অবস্থিতি করে এবং তাহাদের ন্যায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবন যাপন করে। কেহ বলেন, স্ত্রী পুরুষে যে কি সম্বন্ধ, তাহা হিন্দুরা অবগত নহে। রমণীরা বাঁদির ন্যায় পরিশ্রম করে, এবং নানা প্রকারে পুরুষের মন যোগাইয়া থাকে। কেহ কেহ ইউরোপ ও আমেরিকার দৃশ্য দেখাইয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, দেখ, সে সকল দেশের কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। তথায় রমণীগণ স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে। নর নারী একাত্মক হইয়া সেখানে বিহার করে। প্রকাশ্য স্থলে স্ত্রী পুরুষে একত্রে ভোজন করে, একত্রে নৃত্য করে, একত্রে হাস্য পরিহাস করে, অপর পুরুষের সহিত বায়ু সেবন করিতে গমন করে, কেমন তাদের স্বাধীনতা, কেমন তাদের মনের স্ফূর্ত্তি। আমরা অনুকরণ করিতে বড় পটু। বিশেষত দূরদর্শিতার স্বল্পতা প্রযুক্ত আমরা ইংরাজগণকে অতি উচ্চ স্থানে বসাইয়াছি। সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞানে তাহাদের পারদর্শিতা দেখিয়া, আমরা ইংরাজদিগকে গুরু স্বরূপ মান্য করিতেছি। তাহারা সকল বিষয়ই আমাদের নেতা হইয়াছে। তাহারা উন্নত, তাহারা সভ্য। সুতরাং, সকল বিষয়েই তাঁহাদের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমরা একে একে তাহাদের ভোজন প্রণালী, পরিধেয় ও সামাজিক ব্যবহার অনুকরণ করিতেছি। এই

অযথা অনুকরণের কুফল আমরা কোন কোন বিষয়ে ভোগ করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের মধ্যে সুরাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই দেবীর সমক্ষে আমাদের অনেকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলির স্বরূপ জীবন দান করিয়াছেন। বিজাতীয় খাদ্য আহার করিয়া কেহ কেহ অকাল মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি আমাদের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের বোধের উদয় হইবে না? মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া উন্নতমনা দ্বারকানাথ মিত্র কি বলিয়াছিলেন, তাহা একবার সকলের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। সে কয়েকটী কথা উজ্জ্বল অক্ষরে হৃদিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কথাগুলি এই;—"আমাদের ব্যবস্থা-শাস্ত্র-প্রণেতা মনু যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অনুযায়িক কার্য্য করিলে লোকের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে। এই সকল নিয়ম অবহেলা করাতেই আমি এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। যদি আমি এ যাত্রায় রক্ষা পাই, আমার চাল চালন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইবে।" যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, মনুষ্যের পান, ভোজনাদির ব্যবস্থা হওয়া উচিত, সেইরূপ সমাজের গঠন অনুসারে জাতি বিশেষের আচার ব্যবহারের প্রণালী সংবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এখন দেখা যা'ক, স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ কোন্ ভাবে গঠিত। যজ্ঞ উপবীত হইবার পর আর্য্যবালক গুরুগৃহে গমন করিলেন। তথায় অন্যূন দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলেন। আর্য্য বালিকাও পিতার ভবনে অবস্থিতি করিয়া সমধিক জ্ঞান লাভ করিলেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর, পণ্ডিত যুবকের সহিত গুণবতী রমণীর উদ্বাহ কার্য্য সমাধা হইল। মণি কাঞ্চনে মিলিল। এ মিলন পার্থিব মিলন নহে, ইহা আধ্যাত্মিক মিলন। সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী কহে। রমণী পুরুষের সহিত একত্রিত হইয়া নানা প্রকার সৎকার্য্য করিবেন। দীন ব্যক্তিকে দান, অতিথি সেবা, তীর্থ দর্শন, ব্রত, পূজা, উভয়ে একত্রে সমাধা করিবেন। এই ভিত্তির উপর হিন্দু সমাজ গঠিত। প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে, সে সময়ের রমণীগণ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন সকল ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, যাঁহারা সংসার কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া পরব্রহ্মের আরাধনায় জীবন যাপন করিতেন। কোন কোন রমণী শিষ্যগণকে ধর্ম্ম শাস্ত্রে উপদেশ দিতেন, কেহ কেহ বুধবর্গের সভায় উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রালাপ করিতেন এবং কাহার কাহার রচিত সূত্র বেদের অন্তর্গত হইয়া আর্য্য রমণীর গৌরব ঘোষণা করিতেছে। আর্য্য সমাজের এ অবস্থায় স্ত্রীস্বাধীনতা শোভা পাইত। পুরুষ নারীর মর্য্যাদা বুঝিত এবং নারীও পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিত। এখন বিবেচনা করা উচিত, প্রাচীন কালের স্ত্রী-স্বাধীনতা কি ভাবের ছিল। আমাদের পূজনীয় আর্য্য মহাত্মারা নারীদিগকে লইয়া কুৎসিৎ স্থানে গমন করিতেন না, তাহাদের হাত ধরা ধরি করিয়া নৃত্য করিতেন না, তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিতেন না এবং তাহাদিগকে বিলাসের দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। ধর্ম্ম আলোচনায় এবং

সৎকার্য্য সমাধানেই স্ত্রী ও পুরুষ একত্রিত হইতেন। এ দৃশ্য কি মনোহর! কিন্তু, হায়, ভারতের দুর্দ্দিন উপস্থিত হওয়াতে আর্য্যসমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের গঠন শিথিল হইয়া পড়িল। যাবনিক অত্যাচারে ভারতবাসীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। শাস্ত্র চর্চ্চা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে যে উচ্চভাবের স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল, তাহাও বিলোপ প্রাপ্ত হইল। ইহার উপর আবার বর্গীরা দেখা দিল। লোকের ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় কি রমণীগণকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব হইতে পারে?

এখন দেখা যাউক, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, আমরা রমণীগণকে কি প্রকার স্বাধীনতা দিয়া থাকি এবং ইহাপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কিনা। কি পুরুষ কি স্ত্রী, প্রকৃত শিক্ষা কাহারও হয় না। পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার ঐহিক সুখ বর্দ্ধন করিবে, এই উদ্দেশ্যই পিতার মনে জাগরূক থাকে। সুতরাং যে বিদ্যা লাভ করিলে আয় বৃদ্ধি হয়, পিতা তাঁহার পুত্রগণকে সেই বিদ্যাই শিক্ষা করান। বালকের মন যাহাতে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হয়, তৎপক্ষে কেহই যত্নবান হয়েন না। পূর্ব্বে ব্যাপক কাল গুরু গৃহে বাস করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার যে নিয়ম ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন এক দিনেই সকল কার্য্য শেষ হইয়া যায়। দ্বিজের যে দিন যজ্ঞ উপবীত ধারণ হইল, সেই দিনেই তাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, শাস্ত্র-পাঠ, ধর্ম্মালোচনা সমাধা হইয়া গেল। পর দিন সে জলে দণ্ড ভাসাইয়া গৃহী হইল। তাহার পর কেহ কেহ তোতা পাখীর ন্যায় কিছু কাল সন্ধ্যা আওড়াইল, কেহ তাহাও করিল না। এ দিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বালকদের মনে পাশ্চাত্য ভাব বদ্ধমূল হইতে লাগিল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে কি আছে, তাহা তাহারা অবগত হইল না, হিন্দু সমাজের মর্য্যাদা তাহারা বুঝিল না, পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের দিকে তাহাদের মন আকর্ষিত হইল, সুতরাং তাহা অবলম্বন করিবার জন্য তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বালকগণ কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিল। কেহ উকীল, কেহ ডাক্তার, কেহ বিচারপতি, কেহবা কেরাণী হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। সুরা তাহাদের পানীয়, গোমাংশ তাহাদের খাদ্য, এবং নাটক ও উপন্যাস তাহাদের পাঠ্য পুস্তক। আমরা স্বীকার করি যে, কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে মিতাচারী লোকও আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের রমণীগণের প্রকৃত শিক্ষা হয় না, বা হইবার সম্ভাবনাও নাই। পিতা মাতারও শাস্ত্র জ্ঞান নাই যে, কন্যাকে ধর্ম্ম কথা শুনাইবেন। পূর্ব্বে কথকতা প্রণালী বহুল রূপে প্রচলিত থাকাতে রমণীগণ রামায়ণ মহাভারত-বর্ণিত সদুপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চভাব লাভ করিত। এখন সে পদ্ধতিটী লুপ্তপ্রায়। প্রাচীনা রমণীগণ উপদেশ পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা জানিত। কন্যা কিম্বা বধূর কোন ত্রুটী দেখিলে তাহা আওড়াইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত। এখানকার রমণীগণ সে সকল উপদেশ পূর্ণ বাক্য গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বিদ্যাবতী

হইয়াছেন। নানা রসের নাটক ও উপন্যাস পড়িতে শিক্ষা করিয়াছেন। এখন কি আর সে কেলে লোকের বাজে কথা তাঁহাদের ভাল লাগে? প্রাচীনা রমণীগণ অনেকগুণে বিভূষিতা ছিলেন। গৃহ কার্য্য করা তাঁহারা গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের প্রস্তুত করা খাদ্য দ্রব্য লোকে খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলে তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্যা বিবেচনা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে, রমণীরা এবিষয়ে উদাসীন। বিলাসিতা তাঁহাদের মধ্যে এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, গৃহ কাজ করা অনেকের নিকট দাস্যবৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহারা নবেল ও নাটক পড়িবে, সখীগণের সহিত তাস খেলা করিবে এবং কখন বা সক করিয়া কারপেটের একটী টুপি কিম্বা মোজা প্রস্তুত করিয়া তাহার গুণপনা দেখাইবে। বৃদ্ধানারীগণ পরদুঃখে কাতরা। গৃহের লোকের লোকের কথা দূরে থাক্, প্রতিবাসীদের মধ্যে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহারা সেবা শুশ্রূষা করিয়া আপনাদিগকে ধন্যা বিবেচনা করেন। ওলাউঠা রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতেও তাঁহারা ঘৃণা বোধ করেন না। বসন্ত রোগীর বীভৎস দৃশ্য তাঁহাদিগকে ভীত করে না, তাঁহারা অনায়াসে রোগীর গায়ে হাত বুলাইয়া দেন, স্ফোটকের পুঁজ বিধৌত করেন। নবীনা বিলাসিনীদের মধ্যে কি এ দৃশ্য নয়নগোচর হয়? যদি হয়, তাহা অতি বিরল।

আমরা দেখিলাম যে, বর্ত্তমান সময়ে কি পুরুষ কি স্ত্রী, কাহারো প্রকৃত শিক্ষা হয় না। আমরা ইহাও দেখিলাম যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে উভয়েরই মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। এই প্রকার স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে কি ফল ফলিতেছে, তাহাও একবার দেখা যাউক। আমাদের কৃতবিদ্য যুবকগণ ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইংরাজী বেশ, ইংরাজী আহার, ইংরাজী চাল চলন তাঁহারা ভালবাসেন। এবং ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গ রমণীরা তাঁহাদের সহিত এক ভাবাপন্ন না হইলে তাঁহারা সুখী হইতে পারেন না। সুতরাং রমণীগণকে উপদেশ দিয়া তাহাদের উন্নত ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কোন কোন রমণী তাঁহাদের প্রলোভনে ভুলিয়া বিবি সাজিতেছেন, এবং বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, স্বামীর সহিত অখাদ্য খাইয়া ও সুরাপান করিয়া পবিত্র আর্য্যকুলকে কলঙ্কিত করিতেছেন। যাঁহারা স্বামীর কথায় প্রাচীন রীতি নীতি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের দুরাবস্থার একশেষ হইয়া থাকে। পুরুষ নিজ বাটীতে স্ত্রী সহ বিজাতীয় আমোদ প্রমোদ করিতে না পারিয়া অপর স্থানে মনের সাধ পূর্ণ করেন। উইলসনের যজ্ঞশালায় গো-মেধ যজ্ঞ হইতেছে। তথায় প্রসাদী মাংস ভক্ষণ করেন ও দেব-ভোগ্য অমৃত-রূপী সুরাসেবন করেন। পরে রঙ্গভূমিতে বারবিলাসিনীর অভিনয় দর্শন করেন, অথবা কোন বারাঙ্গনার গৃহে নৃত্য গীত করিয়া যামিনী যাপন করেন। আবার তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, আমাদের সমাজ কি অবনত অবস্থায় পতিত, এ সমাজের মধ্যে থাকিয়া দাম্পত্য সুখ লাভ করা যায় না! পুরুষ কৃতবিদ্য, রমণী মূর্খা। পুরুষ উন্নত, স্ত্রী

অবনত। এরূপ মিলন নিতান্তই বিসদৃশ. ইহা কাচ কাঞ্চণের মিলন, ইহাতে কি প্রকারে প্রণয়-সুখ লব্ধ হইতে পারে? যাঁহারা বিবেচক, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, যে রমণীগণ প্রাচীন ধারা অবলম্বন করিয়া আছেন এবং মূর্খা বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা উল্লিখিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এবং এ সকল গুণবতী রমণীগণকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করা কোন মতে উচিত নহে। আমরা দেখিয়াছি, কত কৃতবিদ্য ব্যক্তি যথেষ্ঠ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু উইলসনের যজ্ঞশালা বা প্রমোদ উদ্যানে অযথা ব্যয় করিয়া এপ্রকার রিক্তহস্ত হন যে, তাঁহাদের পরিজনগণ উত্তমরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, এবং বলিতে কি, তাঁহাদের পুত্রগণের উত্তম রূপ শিক্ষাও হয় না। কেবল যে বঙ্গেতেই এ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, এমন নহে। অন্যান্য প্রদেশেও এই সংক্রামক কেতা দেখা দিয়াছে। দাক্ষিণাত্যেও দেখা গিয়াছে, কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি বক্তৃতার চোটে সভাগৃহ কাঁপাইতেছেন, আবার সুরা দেবীর কাছে নতশীর হইয়া পথের ধারে পড়িয়া উন্নত ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন! কিছু দিন হইল, এতদ্দেশীয় কোন পত্রিকায় আমরা দেখিয়াছিলাম যে, গুজরাটের কতকগুলি রমণী সুরা পান আরম্ভ করিয়া উন্নত ভাবের পরিচয় দিতেছেন। আসাম প্রদেশের আভ্যন্তরিক ভাব আমরা অবগত নহি। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে, পুনায় একটী দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তথাকার এক জন বড়ুয়া আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সাহেবী পোষাক দেখিয়া আমরা তাঁহাকে কোন মেটে ফিরিঙ্গি বিবেচনা করিয়াছিলাম। পরে জানিলাম যে, তিনি এক জন আসামদেশীয় হিন্দু। তিনি এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি, কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আছেন; "রয়েল ফেমিলি হোটেলে" (Royal family Hotel) অবস্থিতি করিতেছিলেন। লোকটীকে ভাল বলিতে হইবে। কারণ আমরা কয়েক জন বঙ্গবাসী এখানে অবস্থিতি করিতেছি, ইহা অবগত হইয়া তিনি আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচয় লওয়াতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পরিজনগণ বিশুদ্ধ হিন্দু এবং যখন তিনি বাটীতে গমন করেন, তখন প্রকৃত হিন্দু সাজিয়া তিনি তথায় উপস্থিত হয়েন। এ ব্যাপারটী কি সামান্য শোচনীয়? একেত জাতীয় ভাব উৎসন্ন দিলাম, তাহার উপর লোকের ভয়ে কপটতাচরণ অবলম্বন করিলাম! বঙ্গদেশের নগরবাসী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে এরূপ ভাবের লোক যে অনেক আছেন, তাহা সকলেই জানেন।

বর্ত্তমান সময়ে নব্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে এই ভাবটী দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা অতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের যাহাতে বল বিক্রম হয়, তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্য তাঁহারা বিশেষ রূপে মাংস আহার ও তৎসহ সুরা পানের জন্য লোলুপ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা একান্ত উচিত যে, বঙ্গবাসীদের হীনবীর্য্য হইবার অন্যবিধ কারণ আছে। তাহাদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা নাই। তাহাদের মানসিক পরিশ্রম অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

ইহার উপর আবার তাহারা স্ত্রৈণ। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে গমন কর, দেখিতে পাইবে প্রতি পল্লিতে এক এক কুস্তির আড্ডা। ব্যায়াম চর্চ্চা প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্য কর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন অনেকের অশ্বারোহণ করার অভ্যাস আছে। এতদ্দারা যে শরীর সবল হয়,তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বঙ্গদেশবাসীরা বীর্য্যহীন বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি, কিন্তু তথাকার সামান্য ব্যক্তিরাও বিলক্ষণ বলশালী। মোটা ভাত ও কলাইয়ের ডাল খাইয়া তাহাদের শরীর পটু হয় কেন? শারীরিক পরিশ্রমই তাহার কারণ। আমরা বাবু হইয়াছি। চাকরের সাহায্য ভিন্ন আমাদের কোন কাজ সমাধা হয় না। কোন স্থান হইতে কোন দ্রব্য উঠাইয়া আনিতে হইলে আমাদের অপমান বোধ হয়। আমরা এই পুনা নগরে দেখিতে পাই, কত ভদ্রলোক বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া স্বহস্তে আনিতেছেন। ইংরাজেরা কি করে? তাহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভ্রমণ করে, ব্যাড্‌মিনটন (Bad minton) এবং লন্‌টেনিস (Lawn Tennis) খেলা করে এবং স্বহস্তে আপন আপন গৃহস্থিত উদ্যানে, কোদাল পাড়ে ও বৃক্ষাদি রোপণ করে। আমরা আগে ভাগেই ইংরাজদের যাহা মন্দ, তাহাই অনুকরণ করিয়া বসি. কিন্তু যাহা অনুকরণ করিলে মানুষের মত হইতে পারি, সে দিকে দৃষ্টিও নাই। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম যে, কি যুবক কি যুবতী, উভয়েরই মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে যে উন্নত ভাব ছিল, তাহা আর এখন নাই। এখন এরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া কঠিন। অবশ্য, অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী-ধারী ছাত্রের হস্তে তাঁহাদের কন্যাকে সমর্পণ করেন বটে, কিন্তু এই পাত্রের স্বভাব ভবিষ্যতে যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা কে বলিতে পারে? চারিদিকে সুরার প্রাদুর্ভাব ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের ইংরাজী চাল চলনের দিকে ঝোঁক দেখিয়া, কেহ আর উদ্বেগ-শূন্য হইতে পারেন না। কন্যাটীকে ভাল পাত্র দেখিয়া দিলেন, তবুও মনে আশঙ্কা, পাছে সে অত্যাচারী হইয়া উঠে। যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই, যখন প্রাচীন চাল চলনের দিকে লোকের আকর্ষণ ছিল, তখন আর এরূপ আশঙ্কার কারণ বড় একটা ছিল না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন একটী সুশিক্ষিত পাত্রের হস্তে কন্যাটীকে অর্পণ করিয়া কেহ উদ্বেগশূন্য হইতে পারেন না—সর্ব্বদা ভয়, পাছে অত্যাচারী স্বামীর হাতে তাঁহার প্রিয় কন্যাটীর দুরবস্থা হয়, তখন কি রমণীগণকে স্বাধীনতা দেওয়া শ্রেয়? স্ত্রী যখন তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা নহেন, তখন এ দূষিত সমাজে অন্যান্য রমণীগণ কি প্রকৃত মর্য্যাদা পাইবার আশা করিতে পারেন? এখন দেখা যাউক, হিন্দুরমণীগণ কি ভাবে অবস্থিতি করে, এবং ইহা তাহাদের পক্ষে কষ্টকর কি না। আমরা এখানে পল্লীগ্রামের চিত্র অঙ্কিত করিব। পল্লীর মধ্যে, আমাদের রমণীগণ প্রতিবাসীর বাটীতে গমনাগমন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, এমন সকল ব্যক্তির সহিত একত্রে অবস্থিতি জন্য হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। কেহ জেঠা, কেহ

খুড়া, কেহ দাদা বলিয়া অভিহিত হয়েন। তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার রমণীগণের কোন বাধা নাই। কোন প্রতি-বাসীর পীড়া হইলে, এবং তাঁহাকে সেবা করিবার কেহ না থাকিলে, রমণীগণ আবশ্যক মত তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এমন কি, আবশ্যক হইলে, কোন কোন রমণী প্রতিবাসীর বাটীতে ক্রমান্বয়ে ১০।১৫ দিন রন্ধনাদি গৃহ কার্য্য করিয়া থাকেন। কোন বাটীতে ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, রমণীগণ সেই বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য সমাধা করেন। কেহ তরকারী প্রস্তুত করিতেছেন, কেহ রন্ধন করিতেছেন, কেহ পরিবেশন করিতেছেন। এই প্রকারে আপন আপন সাধ্য অনুসারে সকল কার্য্য সমাধা করিতেছেন। যেন সকলই এক পরিবারভুক্ত। অপরের বুঝিয়া উঠা ভার, কে পরিবার ভুক্ত, কে নয়। এপ্রকার ক্রিয়া উপলক্ষে, ভিন্ন গ্রামস্থিত আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াও সকল কার্য্যে সহায়তা করেন। ভিন্ন পল্লীতে যাইবার পক্ষে রমণীগণের কোন বাধা নাই। তবে, অল্প-বয়স্কা বৌ ঝির যাইতে হইলে, কোন প্রাচীনার সহিত যাওয়া আবশ্যক। আমাদের রমণীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, দেব-মন্দিরে গমন করিতেছেন, কোন স্থানে যাত্রা হইতেছে, তথায় যাইতেছেন—কথকতা শ্রবণ করিতে গমন করিতেছেন। আত্মীয় স্বজনের সহিত অতি দূর দেশে তীর্থ দর্শনেও গমন করিতেছেন। তবে যেখানে অধিক জনতা হয়, নানা প্রকার লোক একত্রিত হয়, সেখানে রমণীদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, পর্দ্দার দ্বারা একটী ব্যবধান করা হয়। ইহা যে আবশ্যক, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? এ অবস্থায়, আমাদের রমণীগণের যে কোন প্রকার অসুবিধা হয়, এমন বোধ হয় না। তবে, যাহাতে তাহারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানে অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ দৃশ্য, নগরে দেখা যায় না বটে। তথায় রমণীদের এপ্রকার স্বাধীনতা নাই। তাহা না থাকিবার কারণও আছে। নগরে, নানা দেশের লোক এক পল্লীর মধ্যে বাস করে, কে কোন্ স্বভাবের লোক, তাহা জানা যায় না। বিশেষত কে কত দিন থাকিবে, তাহার কোন স্থিরতা থাকে না—সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন। সুতরাং কাহারো সহিত স্থায়ী হৃদ্যতা হইয়া উঠে না। যাঁহারা নগরের স্থায়ী বাসী, তাঁহাদের মধ্যে হৃদ্যতা থাকিবার কোন বাধা নাই। পল্লীগ্রামের ন্যায় তাঁহাদের রমণীরাও মনের আনন্দে কালক্ষেপ করিতে পারেন। আমরা আমাদের কন্যাগণকে যতদূর স্বাধীনতা দিই, বধূদিগকে ততদূর দিই না। আমার বিবেচনায় ইহা উচিত নহে। বধূ যখন আমার বাটীতে আসিল, তখন তাহাকে কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে। পুত্রের কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কথা বলা দূরে থাকুক, তাঁহাদের মুখ দেখিলে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাপগ্রস্ত হয়েন। এ দূষিত রীতিটী যে কি প্রকারে প্রচলিত হইল, তাহা বলিতে পারি না। ইহা যত শীঘ্র বিদূরিত হয়, ততই ভাল।

দাক্ষিণাত্যে, হিন্দুরমণী কি ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ অঞ্চলে রমণীদের স্বাধীনতা আছে। নারীদের ঘোমটা

নাই। তাহারা অনাবৃত মস্তকে থাকে, এবং এই ভাবে স্থানান্তরে গমন করে। সকল গৃহস্থের বৈঠকখানা নাই। তবে, সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটী স্বতন্ত্র ঘর থাকে, তাহাতে পুরুষগণ বন্ধুবর্গকে অভ্যর্থনা করে। কিন্তু এ ঘরে, রমণীগণের আসিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কর্ত্তা, বন্ধুগণকে লইয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে, কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক লইলে, গৃহিণী আসিয়া তাঁহার স্বামীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যান। কিন্তু, তিনি অপর কাহারো সহিত কথা কহেন না। যাঁহার সহিত হৃদ্যতা আছে, তাঁহার সহিতই কথা কহিবার প্রথা আছে। গৃহস্বামী বাটীতে নাই, এমন সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেন। শ্বশুর, ভাসুর, বধূগণের সহিত কথা কহেন। গুরুজন সমক্ষে, স্বামীর স্ত্রীর সহিত কথা করিবার পদ্ধতি নাই। পুরুষগণ আহার করিলে পর, রমণীরা ভোজন করিয়া থাকেন। রমণীগণ আহার করিতেছে এমন সময়ে কোন পুরুষ তথায় উপাস্থিত হইলে, তাহারা বঙ্গীয় রমণীর ন্যায় জড় সড় হইয়া আহার বন্ধ করে না। স্বামী যে পাত্রে আহার করেন, স্ত্রীর সেই পাত্রে আহার করিবার নিয়ম আছে। ইংরাজদের অনুকরণ করিয়া কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র লইয়া একত্রে আহার করিয়া থাকেন এবং গাড়ী চড়িয়া সস্ত্রীকে বায়ু সেবন করিতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করা আদাদের উদ্দেশ্য নহে। এ অঞ্চলের লোকের বাবুগিরি নাই। বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারো বাটীতে ভৃত্য কিম্বা দাসী নাই। পুরুষগণ দ্রব্যাদি আহরণ করেন, রমণীগণ সমুদায় গৃহকার্য্য করেন। আমরা কয়েকবার ব্রাহ্মণ গৃহে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। রমণীগণের পরিশ্রম ও যত্ন দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। ১৫। ১৬ জন ভোজন করিতে বসিলাম, ক্রমে ক্রমে খাদ্য দ্রব্য আসিতে লাগিল। গৃহিণী আমাদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও রন্ধন কার্য্য শেষ হয় নাই, অন্যান্য রমণী লুচি ও জিলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। এবং ব্রাহ্মণগণের আবশ্যক মত টাট্‌কা টাট্‌কা জিনিষ পাতে পড়িতেছে। এখানকার ব্রাহ্মণগণ দোকানের প্রস্তুত করা দ্রব্য আহার করেন না। সে সকল বাটীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার লোক অনেকক্ষণ বসিয়া আহার করেন। প্রথমে অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করেন, তাহার পর লুচি কিম্বা রুটী ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি এবং শেষে কড়ি * কিম্বা দধির সহিত অন্ন ভোজন হইয়া থাকে। গৃহিণীর পরিবেশন করা আবশ্যক, তাহা না হইলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অপমান বিবেচনা করেন। এমন কি, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহাদের গৃহিণীকেও স্বহস্তে পরিবেশন করিতে হয়। পুনা নগরে অনেক গুলি দেব মন্দির আছে। তথায় প্রায়ই দেবতার সমক্ষে কথকতা হইয়া থাকে। কথক মহাশয় কাষ্ঠাসনে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ, মনের আনন্দে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। তবে স্ত্রীলোকেরা এক দিকে বসে এবং পুরুষগণ আর এক

* কড়ি—ঘোল ও লঙ্কা হিঙের সহিত গরম করা।

দিকে বসিয়া থাকে। দেবালয় ভিন্ন, গৃহে গৃহেও শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। বাটীর সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, গৃহের রমণীগণ বসিয়া চাউল বাছিতে বাছিতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। যখনই কোন দেবালয়ে যাওয়া যায়, তখনি দেখা যায় যে, তাহা লোকে পরিপূর্ণ। কেহ দেবতাকে প্রণাম করিতেছে, কেহ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, এ অঞ্চলের লোক সর্ব্বদাই তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকে। অনেকে সস্ত্রীক হইয়া তীর্থের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া আসে। বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে, স্ত্রী ও পুরুষ একত্রিত হইয়া দেবমন্দিরে গমন করত দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়া আসেন। এই ব্যাপারটী অতি সমারোহের সহিত সমাধা হইয়া থাকে। প্রথমে একদল বাদ্যকর ঢোল, শানাই প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, তাহার পর স্ত্রীলোকের দল অনাবৃত মস্তকে, নানা প্রকার সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া গমন করে এবং শেষে পুরুষের দল গমন করিয়া থাকে। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহাদের সহিত সুসজ্জিত অশ্ব ও আশাশোটাধারী লোক গমন করিয়া থাকে। বিবাহ উপলক্ষে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েই বরযাত্রে গমন করিয়া থাকে। ইহা যে সমধিক আনন্দজনক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিন বৎসর পূর্ব্বে, পুনা নগরে আমরা একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। অনুসূয়া বাই নাম্নি একজন রমণী এখানে আসিয়া কথকতা করিয়াছিলেন। তিনি এখানে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনেক সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে ধর্ম্ম ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে পণ্ডিতা রমা বাই এখানে ছিলেন। তাঁহার যত্নে স্থানীয় স্ত্রী বিদ্যালয়ে একটী সভা আহূত হয়, এবং সেই সভাতে অনুসূয়া বাইকে কথকতা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। অনেকগুলি পুরুষ ও স্ত্রী নিমন্ত্রিত হন। আমরাও তথায় উপস্থিত ছিলাম। সভা-গৃহের একদিকে পুরুষগণ বসিলেন। আর একদিকে স্ত্রীলোক সকল উপবেশন করিলেন। কোন পরদা নাই, কোন ব্যবধান নাই। মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটু স্থান মাত্র ছিল। এখানকার একজন বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রী, নিমন্ত্রিতা রমণীগণকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে লাগিলেন। সকলে উপবেশন করিলে পণ্ডিতা রমা বাই সকলের সমক্ষে দাঁড়াইয়া অনুসূয়া বাই সম্বন্ধে কিছু বলিলেন, এবং শ্রোতাগণকে তাঁহার পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনুসূয়া বাই কথকদের ন্যায় সম্মুখে পুঁথি রাখিয়া বিশুদ্ধভাবে ও মধুর স্বরে ধর্ম্ম কথা শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিশ্রাম দিবার জন্য, পণ্ডিতা রমা বাই মধ্যে মধ্যে কোন কোন শাস্ত্রীয় শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অনুসূয়া বাই এ অঞ্চলের নানা স্থানে গমন করিয়া সাধারণকে ধর্ম্ম কথা শুনাইয়া থাকেন। এ ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমাদের প্রাচীন কালের কথা মনে পড়ে। আমরা এ অঞ্চলের বন্ধুগণকে ধন্যবাদ দিই যে, তাঁহারা এখনো আর্য্যভাব অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। এ অঞ্-

লের কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণ এ প্রকার স্ত্রী স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রমণীগণকে বিবি করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন।

আমরা বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা আলোচনা করিলাম, বঙ্গ মহিলাগণ কি প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলাম এবং দাক্ষিণাত্যে, রমণীগণের অবস্থা কিরূপ, তাহা বিবৃত করিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বঙ্গ মহিলাকে অধিক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কিনা? দাক্ষিণাত্যে রমণীগণ যে ভাবে অবস্থিতি করেন, তাহা যে সন্তোষজনক, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। এবং তাহা বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে সুখের বিষয় হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজ মধ্যে হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। দাক্ষিণাত্য প্রাচীন কালের ভাব রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আমরা সে ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, এ অঞ্চলের লোক স্ত্রীকে যথার্থ সহধর্ম্মিণী রূপে গণনা করেন। সস্ত্রীক হইয়া তাহারা ব্রত ও পূজা করিয়া থাকেন। সস্ত্রীক হইয়া তীর্থে গমন করেন। সর্ব্বদাই দেবালয়ে গমন করিতেছেন, সর্ব্বদাই কথকতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ভাবে অনুরঞ্জিত, সুতরাং এ অঞ্চলের রমণীগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, তাহা এখানকার সমাজের উপযোগী। কিন্তু,বঙ্গীয় সমাজের দিকে তাকাইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তথায় স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ অন্য প্রকার। স্ত্রীকে লইয়া ধর্ম্ম কার্য্য করিবার ইচ্ছা কাহারো নাই। রমণী, সম্ভোগের সামগ্রী হইয়াছে। তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে, তাহার সহিত গাড়ি চড়িয়া ভ্রমণ করিতে হইবে, একত্রে নাট্যাভিনয় দেখিতে হইবে, একত্রে পান ভোজন করিতে হইবে! আমাদের অধিকাংশ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যে ভাবে সময় অতিবাহিত করেন, তাহাতে পবিত্র ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। আমরা এ প্রজ্জলিত পাবকের মধ্যে আমাদের গুণবতী সরল রমণীগণকে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, আমাদের রমণীগণ বিদ্যাবিহীনা,সুতরাং আমাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের মিলন সুখময় হয় না। এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সুশিক্ষিত যুবক,আর এক জন মূর্খা অথবা সামান্য শিক্ষিতা রমণী। কিন্তু,আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, যে কৃতবিদ্য যুবক সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া অত্যাচারের এক শেষ করিতেছে, তাহা অপেক্ষা আমাদের মূর্খা অথচ গুণবতী রমণীগণ সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ কিনা? আমরা দেখিয়াছি, এই মূর্খা রমণীর উপদেশ বাক্যে কত প্রকৃত জ্ঞানহীন "কৃতবিদ্য যুবক" পরিত্রাণ পাইয়াছেন। কেবল পুস্তক পড়িলে বিদ্বান হওয়া যায় না,—সচ্চরিত্র হওয়া চাই, ধার্ম্মিক হওয়া চাই। যাঁহারা আমাদের রমণীগণের অবস্থা দেখিয়া কাতর হন, এবং তাহাদিগকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান, সমাজকে সুনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। কি পুরুষ কি স্ত্রী, যাহাতে তাহারা শাস্ত্র জ্ঞানে জ্ঞানী হয় এবং ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হয়, তৎপক্ষে সকলের প্রয়াস পাওয়া উচিত। যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে

আমরা অনেক আশা করিয়া থাকি। কোথায় তাঁহাদের সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া লোকে চরিত্রবান হইবে, না তাঁহাদের কদাচরণ বিলোকন করিয়া তাহাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। কোন সামান্য ব্যক্তি কোন অন্যায় ব্যবহার করিলে লোকের দৃষ্টি তাহার প্রতি নিপতিত হয় না। কিন্তু, যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহাদের আচরণ সকলে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করে এবং তাহা অনুকরণ করিতে প্রয়াস পায়। সুতরাং তাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ হওয়াতে যে কেবল তাঁহাদের নিজের হানি হয়, তাহা নহে, অপরাপর ব্যক্তিরও অনিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা আশা করি যে, তাঁহারা আপনাদের দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধারণের সমক্ষে উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতে যত্নবান হইবেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখন ও বলিতেছি যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি উচ্চমনা চরিত্রবান ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা স্বদেশের যথার্থ হিত সাধাণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের দল যত বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যনীতির প্রতি লোকের অনুরাগ দেখা যাইতেছে। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত তত্ব সাধারণের গোচর করিতেছেন। কোন কোন শাস্ত্রাধ্যাপকও উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন। আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যব্যবহার সমর্থন করিয়া কত বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ্য পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন এবং পুস্তক প্রচার করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার যত্নে কত স্থানে কত ধর্ম্ম ও নীতি সভা সংস্থাপিত হইয়া সাধারণকে আর্য্য ভাবে অনুরঞ্জিত করিতেছে। ধর্ম্মের জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান হয়, তাহাই মঙ্গলজনক। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীনকালের ন্যায় গুরুগৃহে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই। এখন আমাদের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা এখন অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে সক্ষম নহি। আমাদের মন পার্থিব সুখের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। আমাদের অর্থ উপার্জ্জন করা চাই। প্রাচীন কালে ধর্ম্ম যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখন আর তাহার সে আসন নাই। যাহা হউক, সে আক্ষেপ করা বৃথা। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যত দূর উন্নতি লাভ করা সম্ভব, তাহারই চেষ্টা পাওয়া এখন উচিত। প্রতি পল্লিতে একটী একটী ধর্ম্মশিক্ষালয় সংস্থাপিত হউক। অধ্যাপকগণ ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক উপদেশ দিতে আরম্ভ করুন। কি স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েই এই উপদেশ শ্রবণ করুন। লোকে বালককে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিবে। কিন্তু তাঁহারা পরিণাম চিন্তা করিতে পারেন না। বালকদিগের মন ধর্ম্মভাবে উদ্দীপ্ত না হওয়াতে পিতার আশার মূলে কুঠারাঘাত হয়। অনেক পুত্র উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়া পিতাকে গ্রাহ্য করে না। কেহ কেহ সুরাপায়ী হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও পিতার গলগ্রহ হইয়া পড়ে। আর্য্য শাস্ত্রে উত্তম রূপ শিক্ষা পাইলে আমাদের বালকদের পরিণাম কখনই এরূপ হইতে পারে না। তাই বলি, অর্থকরী বিদ্যার সহিত

বালকগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা একান্ত উচিত। ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে পুত্রগণ যেমন উদ্ধত ও কদাচারী হইতেছে, কন্যাগণও তেমনই বিলাসপ্রিয়া হইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্বামীর উচিত, পুত্র কন্যাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করেন। পল্লিস্থ সকলে একত্রিত হইয়া একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিলে অধিক ব্যয় পড়িবে না, অথচ পরিণামে যে কত সুফল ফলিবে, তাহা এখন স্থির করা যায় না। এতদ্ভিন্ন বৃথা গল্পে সময় না কাটাইয়া তাঁহারা যদি পুত্র কন্যাগণকে লইয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে কোন ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করেন ও তাহার অর্থ বালক বালিকাগণকে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলেও অনেক উপকার দর্শিতে পারে। কথকতা ধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট উপায়। গৃহস্থগণ পর্যায়ক্রমে আপন২ বাটীতে কথকতা দিতে পারেন। প্রত্যেক গৃহস্বামী যদ্যপি তাঁহার ক্ষমতানুসারে ১০। ১৫ দিন কিম্বা এক মাস করিয়া তাঁহার বাটীতে কথা দেন, তাহা হইলে পাড়ার স্ত্রী পুরুষ ইহা শ্রবণ করিয়া সমধিক উপকার লাভ করিতে পারে।

আমাদের সমাজ ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত হউক। যে সকল অত্যাচার ও ব্যভিচার ইহার মধ্যে দেখা যাইতেছে, তাহা তিরোহিত হউক। রমণীর প্রকৃত মর্য্যাদা পুরুষে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হউন। স্ত্রী, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গিনী ও সহায়, ইহা ভাল রূপে বুঝুন। সমাজ যখন ধর্ম্মে অনুরঞ্জিত হইবে, তখন আমরা আমাদের রমণীগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু যাঁহারা আমাদের রমণীগণকে বিলাসের দ্রব্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সহিত পার্থিব সুখ ভোগ করা জীবনের সার্থকতা বিবেচনা করেন, এমন সকল পুরুষের সমক্ষে আমাদের সরলা ও গুণবতী রমণীকে অর্পণ করিতে আমরা প্রস্তুত নাহি। তাহাতে দেশের বিষম অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাতীয় মহাসমিতি

প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন নব্যভারত গুরুতর কর্ত্তব্যভার মস্তকে লইয়া বঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন কতজন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গোপনে কত কথাই না বলিয়াছিলেন,—কত উপহাস,—কত টিট্‌কারীই না করিয়াছিলেন! মহাত্মা লর্ড রিপণের সময় হইতে যে মৃত ভারতের নবজীবন লাভ হইয়াছে, এ কথা যখন আমরা লিখিয়াছিলাম, তখন এ কথাটী অনেকেরই ভাল লাগে নাই। এমন কি, অনেকে 'নব্যভারত' নামেই বিরক্ত হইয়াছিলেন!! স্বদেশপ্রেমিক অনেক সহৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তিও তখন নব্য ইটালীর (Young Italy) কথা উপমা স্থলে তুলিয়া উপহাস করিতে একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। নব্যভারত প্রকাশিত হইবার পূর্ণ তিন বৎসর পর যখন উদারচরিত কটন সাহেব 'নবভারত' (New India) নাম দিয়া ভারতের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন-যুগের মহাকাহিনী *, আপন

* "My object in writing this book (New India) is to draw attention to the great changes which are taking place in India—changes political, social, and religious &c." *H. J. S. Cotton.*

সরল, তেজপূর্ণ, উদার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন, তখন ভারতের মহা মহা পণ্ডিতগণও স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হইলেন!! কটনের 'নবভারতে' যে সকল কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে, 'নব্যভারত' শির্ষক প্রবন্ধে তিন বৎসর পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এ কথা ইংরাজ-ঘেসা শিক্ষাভিমানী বঙ্গবাসী স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত!! সে অতীত কাহিনী এসময়ে তুলিলাম কেন?—একথার একমাত্র উত্তর এই,—তিন বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে আশার কথা ক্ষীণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম, আজ অংশত তাহারই অনুরূপ চিত্র ভারতে অভিনীত হইতেছে। বর্ত্তমান আনন্দের দিনে, অতীত স্মৃতি জাগাইয়া আজ মহানন্দে নৃত্য করিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে। নব্যভারতের আজ আনন্দের দিন, ভারতের আজ উল্লাসের দিন। চারি বৎসর পূর্ণ না হইতে এমন সকল শুভ ঘটনা ভারত-ইতিহাসে ঘটিতে চলিল যে, আমরা একেবারে আনন্দে বিহ্বল হইয়া গিয়াছি! জাতীয় মহামিলন প্রত্যক্ষ দেখিয়া যে আনন্দিত হয় নাই, সে বিলাসের দাস। ভারতের এই ঘটনা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন ভারত ইতিহাসের একটী সামান্য ঘটনা নহে। যদিও আমরা আবেদন-প্রেরণের তত পক্ষপাতী নহি, যদিও আমরা আপন-উন্নতি, জাতির আভ্যন্তরিক উন্নতিকেই এরূপ সভার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত মনে করি, কিন্তু তবু এই ঘটনাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারি না। একতার বিশ্ববিমোহিনী তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছে,—সাম্যের বিজয়ভেরী নিনাদিত হইতেছে;—হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন; যুবা, বৃদ্ধ; বম্বে, মাদ্রাজ, বঙ্গ এবং পঞ্জাব আজ এক মহাক্ষেত্রে ভাই ভাই মিলিয়া পাশে পাশে দাঁড়াইয়া আবার নবযুগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে, আবার দেশের উন্নতি ঘোষণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; এ দৃশ্য ভারতের একটী উজ্জ্বল দৃশ্য; এরূপ দৃশ্য ভারতে আর কখনও ঘটে নাই। ভারত আশার স্বপ্নে আবার মাতোয়ারা,—আবার মৃত জীবনে নবশক্তির অভ্যুত্থানে ভারত আনন্দ-বিভোরা! ধন্য ভারত, ধন্য ইংরাজি শিক্ষা, ধন্য ব্রিটিস শাসন!

এতগুলি শিক্ষিত লোক জাতিবর্ণ ভুলিয়া, মান অভিমান দূরে ঠেলিয়া, দেশহিতকর মহাযজ্ঞে আজ স্বার্থাহুতি দিতে ভাই ভাই প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছেন, স্বর্গের এ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াও যাঁহারা কুটিলভাবে ঘৃণার চক্ষে এই উজ্জ্বল ঘটনার প্রতি সঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বৃথা গালিগালাজ দিয়া অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় হস্তকে কলুষিত করিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলি যে, তাঁহারাও আমাদের ভাই, আজ তাঁহারা যে দূরে রহিয়াছেন, ইহাতে ঘৃণা অপেক্ষা দুঃখ করিবার অনেক কারণ আছে। দশজন মিলিল ত আর দুজন কেন দূরে রহিল! হায়, একতার মধুর তন্ত্রী বাজিল ত আবার পর-পর- ভাব, আবার একটু ঘৃণা বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল কেন? একথাটী প্রত্যেক চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তিরই চিন্তা করা উচিত। এবং যাঁহারা এই মহাযজ্ঞে মান অভিমান রূপ স্বার্থ আহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর একটু অগ্রসর হইয়া উদার।

প্রেম-বাহু বেষ্টন দ্বারা বিপথগামী ভ্রাতাদিগকে এই মহা আলিঙ্গন ও এই মহা কোলাকুলির ক্ষেত্রে মিলাইতে হইবে। বড়কেই ডাকিব, ছোটর আদর করিব না,—ধনীর সম্মান করিব, দরিদ্র নাই বা আসিল,—জ্ঞানী প্রতিভাশালীর গুণ গাইব, মূর্খ দূরে রহিলই বা—এ অনুদার ভাব, একলঙ্কের কালিমা হিতৈষীদিগের হৃদয়ে স্থান পাইলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। একটু স্থান পাইয়াছে বলিয়া আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি। ঘৃণায় ঘৃণা, প্রহারে প্রহার, নিন্দায় নিন্দা প্রচার করিতেই যদি মতি থাকিয়া যাইল, তবে আর কি হইল! তবে আর এ মহাযজ্ঞের আয়োজন কেন? তবে আর এ হই-চই, এ নাচুনি, এ আস্ফালন কেন? কেবল উদারতা, কেবল গভীর প্রেম—কেবল স্বার্থত্যাগ, এ মহাযজ্ঞের অবলম্বন;—যদি এ সকল জীবনের অবলম্বন না হয়, তবে এই মহা আন্দোলনরূপ ব্যাপার বৈষম্যের কোলাহলে ডুবিয়া যাইবে, কেহ চিহ্নও দেখিবে না। তাই বলি, মিশিয়াছ ত আরও মিশিতে থাও,—ভেদাভেদ ভুলিয়া প্রাণে প্রাণে ডুবিয়া যাও। ভারতের আকাশে আবার একতার জয় ঘোষিত হউক।

আমাদের আরো একটী দুঃখের কারণ আছে, তাহা বলিয়া রাখাই ভাল। আনন্দের দিনে দুঃখকে স্মরণ করা একান্ত উচিত। আমাদের আর একটী দুঃখ এই—এই মহাসভায় এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেহই, দেশের দুর্দ্দশা অপনয়নের জন্য, গবর্ণমেণ্টের নিকট কেবল আবেদন প্রেরণ করা ভিন্ন, আর কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলেন না! গবর্ণমেণ্ট ত অনেক করিয়াছে—এই হতভাগ্য দেশের জন্য আমাদের নিজেদের কি কিছুই করিবার নাই? গবর্ণমেণ্টের মুখ-তাকান ভিন্ন আর কি গত্যন্তর নাই?—এ কথার আলোচনা এ মহাসভায় হইল না!! আমাদের এ দুঃখ রাখিবার আর ঠাঁই নাই। অন্যান্য সভায়ও যেমন হইয়া থাকে, এ সভায়ও তাহাই হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের খোসামুদী করা আমাদের দেশের সমস্ত সভাগুলি সংস্থাপনের যেন একমাত্র উদ্দেশ্য! লর্ড ডফারিণকে অপদার্থ লোক বলিয়া যেখানে সেখানে গালিগালাজ দিতেছি, কিন্তু আবার তাঁহারই দ্বারে দলবল লইয়া অভিনন্দন দিতে সাজিয়া উপস্থিত হইতেছি! তাঁহার মুখের তীব্র ভর্ৎসনা না শুনিলেই নয়! আমরা আশা করিয়াছিলাম, এতগুলি ভারতের কৃতবিদ্য ব্যক্তির সম্মিলন যেখানে, সেখানে আমরা অনুরূপ কার্য্যের পরিচয় পাইব! কিন্তু সে আশা গিয়াছে! "ইহা কর, তাহা কর"—গবর্ণমেণ্টকে এবম্প্রকার উপদেশ দিবার জন্যই যেন এই মহাসমিতির মহা অধিবেশন হইয়াছিল! অন্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করার অপেক্ষা সহজ কার্য্য আর কিছুই নাই, এবং ইহাপেক্ষা মূর্খের কার্য্যও আর হয় না। আমি কিছু করিব কি না, সে কথা ভাবিবও না, কেবল বলিব—তুমি ইহা কর, তুমি তাহা কর! কেমন সোজা ব্রত!! আমার কি কর্ত্তব্য আছে, তাহা একবারও ভাবিয়া কার্য্যে গা ভাসাইব না;—তোমার বিবেকবুদ্ধির স্ফুটনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিব! কেমন মূর্খের কাজ!! আমাদের একমাত্র দুঃখ এই—যাহা আপামর সাধারণ সকলেই করে,—এই মহা সমিতির মহা মহা কৃতবিদ্যগণ তাহাই করিলেন!! গবর্ণমেণ্টকে সংশো-

ধনের সংবাদ-শুনানই যেন এই মহাসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য!! এই ক্ষণস্থায়ী যৎসামান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এই মহাব্যাপার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা একটুও বুঝি না। বুঝি না বলিয়াই দুঃখ করিতেছি। মূর্খের দুঃখ করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে!!

এই সকল কথা বলার পরে কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, 'তুমি কি করিতে বল? একটার দোষ দেখাইতে আসিয়াছ, একটা পথ দেখাও না কেন? একথার উত্তর দিতে আমরা খুব প্রস্তুত নই, কারণ কে বা কবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে? কেবা কবে আমাদের উত্তর শুনিয়াছে? শুনুক বা না শুনুক, আজ বলিলেই বা দোষ কি? কাঙ্গালের প্রলাপ বিজ্ঞের কর্ণে পৌছিবে না, তা জানি; কিন্তু তবুও বলি না কেন? এক কথায় যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে— ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রে তুমি কি করিতে বল? একথার আমার উত্তর এই—সাধারণের সুশিক্ষা বিস্তার করিতে বলি এবং শিক্ষিতগণের চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হইতে বলি। সিবিলসর্বিসে চরিত্রবান দেশীয় অনেক লোক ঢুকিলে ভারতের মঙ্গল হইবে, অস্ত্র আইন উঠিয়া যাইলে কৃষকের শূকরের ভয় যাইবে, জুরীর বিচার সর্ব্বত্র চলিলে অপরাধীর প্রাণ বাঁচিবে, আইন দ্বারা আসাম কুলীর দুর্দ্দশা ঘুচাইলে পরম উপকার হইবে, এ সকল খুব ভাল কথা। কিন্তু সকলের পূর্ব্বে সুশিক্ষা ও চরিত্র চাই। সুশিক্ষ ও চরিত্র ভিন্ন মানুষ পশু। সমস্ত ভারতের যদি মিলনের কোন ক্ষেত্র থাকে, তবে তাহা এই সুশিক্ষারূপ ক্ষেত্র। যে শিক্ষার প্রভাবে আজ বাঙ্গালী পঞ্জাবী, হিন্দু মুসলমান মিলিয়াছে, এই শিক্ষা যদি আরো বিস্তৃত হয়, আরো উদার হয়, তবেই একতা এক দিন সম্ভব হইবে। এখন কেবল সুশিক্ষাই চাই। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন; স্বদেশী দুই দশজন ভ্রাতাও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে শিক্ষাতে অনেক দোষ আছে। এইরূপ একটী মহাসমিতি কেন ভারতের কল্যাণের জন্য সুশিক্ষার ভার হাতে লইবে না, আমরা বুঝি না। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কেমন সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এই মহাসমিতি পঞ্জাবের শিক্ষার ভার লইলে দোষ কি? দারিদ্র্য বল, আর চরিত্রহীনতা বল, ইহার মূল কারণ সুশিক্ষাহীনতা। কেবল সৎ শিক্ষা চাই। কুশিক্ষা মোটেই চাই না। যে শিক্ষায় মানুষ মানুষ হয়, সেই শিক্ষা চাই। সকল সংস্কার আপনিই সংসিদ্ধ হয়—এই শিক্ষা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মহীনতা ভারতকে বড়ই মলিন করিয়া ফেলিতেছে, ইহারও মূল কারণ সৎশিক্ষার অভাব। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, তাহা অর্থকরী বিদ্যা, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। তাহা ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত শিক্ষা। এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ভারতের মহা অনিষ্ট হইয়াছে। এখনও শিক্ষার ভার ভারতের নিজের হাতে গ্রহণ করা একান্ত উচিত। এই মহা সভা যদি এখন জাতীয় শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন, মনে হয়, ভারতের শুভদিন আরো নিকটবর্ত্তী হইবে।

আরো করণীয় কার্য্যের নাম করিতে পারি; কিন্তু তাহা বলিয়া আজ আর কোন ফল নাই। এই অভাবপূর্ণ বিশাল ভারত-

ক্ষেত্রে কার্য্য অনেক, কাজের লোকেরই কেবল অভাব। এত কার্য্য, এত অভাব থাকিতে যাঁহারা করণীয় কিছু খুঁজিয়া পান না, তাঁহারা যে কিরূপ হিতৈষী, তাহা বুঝি না। কেবল বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইলে দেশের উপকার করা যায় না। খাটিয়া খাটিয়া শরীর পাত করা চাই। খাটিয়া খাটিয়া হাজার হাজার লোকের মরিয়া যাওয়া চাই, তবে ত দেশ উদ্ধার হইবে। এত কাজ থাকিতেও এই মহাসভা আপন হাতে কোন কার্য্য সমাধার ভার রাখেন নাই বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। এ দুঃখ রাখিবার আর ঠাঁই নাই।

যতদিন একতার বলে স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হয়, রাজনীতি ততদিন কল্পনা। একতার মূলে শিক্ষা, শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম ও নীতি, নীতির মূলে চরিত্র, চরিত্রের মূলে স্বাধীনতা। সৎশিক্ষা নাই, সুনীতি নাই, চরিত্র নাই, কিন্তু স্বাধীনতা আছে, পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত নাই। নিহিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্টগণ তাহা হইলে এত দিন জগতে স্বাধীন হইতে পারিত! ফরাশীবিপ্লবের ইতিহাস তাহা হইলে রূপান্তরিত হইত! ওয়াসিংটনই বল, আর ম্যাট্‌সিনিই বল, গ্যারিবল্ডিই বল, গ্লাডষ্টোনই বল, আর ব্রাইটই বল, ইঁহারা নীতি ও চরিত্রের মহত্ত্বে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে ধর্ম্মের ও নীতির সমতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ও পারিতেছিলেন বলিয়াই আমেরিকা, ইটালি, ইংলণ্ড দারুণ ধর্ম্মহীনতারূপ বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়াও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে। হাজার হাজার লোকের ধর্ম্মহীনতার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের জলন্ত বিশ্বাস পৃথিবীর সমতা রক্ষা করিয়াছে। হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে একা ম্যাটসিনির শক্তি কার্য্য করিয়া জয়ী হইয়াছে। হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া বিশ্বাস ও চরিত্র বলে মহম্মদ পৃথিবীকে অধিকার করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্ম ও নীতি ভুলিয়া যে একতার কথা বলিতে চাও, তাহা এ জগতে অসম্ভব। তাহা কখনও হইবে না। মানুষকে চরিত্রবান না করিতে পারিলে একতা, শান্তি, সাম্য এবং স্বাধীনতা অসম্ভব ব্যাপার। এই সকল সাধনের মূলে সৎশিক্ষা। শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করা, প্রতি হিতৈষীর একান্ত উচিত কার্য্য। এক ভিন্ন দুটী পথ নাই। স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ লোকের শিক্ষার অভাবে এবং বর্ত্তমান ধর্ম্মভাবহীন শিক্ষার দোষেই ভারতে পশুত্বের অভিনয় হইতেছে। জীতেন্দ্রিয়তা এক অতুল মহাশক্তি। এই শক্তি সাধনে সিদ্ধি লাভে সযত্ন হও, সৎশিক্ষা বিস্তাররূপ ব্রত গ্রহণ কর। আবার স্বাধীনতা এবং তৎসহ রাজনীতির যুগ অভ্যুদিত হইবে। বৃথা হই চই দ্বারা ইংরাজনীতির সংস্কারের ব্রত পরিহার করিয়া একবার আপন আপন জাতির সংস্কার কার্য্যে, এই মহাসভা, সময় থাকিতে নিযুক্ত হউন। খোসামুদী ও আবেদন প্রেরণের হুজুগ ছাড়িয়া প্রকৃত কার্য্যস্রোতে গা ভাসাইয়া দিন। আবার ভারতে শুভ দিনের উদয় হইবে। নচেৎ আজ না হইলেও, দশ বিশ বৎসর পরে ইহার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা বা একতা—সুদূর পরাহত হইবে।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (১০ম)

পিতৃ বিয়োগ।

পুত্র ও পত্নীকে অকূল শোক সাগরে ভাসাইয়া জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতৃবিয়োগে বিশ্বম্ভর বিস্তর শোক ও ক্রন্দন করিলেন; পতিহীনা হওয়ায় শচীদেবীর দুঃখের সীমা থাকিল না। প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব আসিয়া অশেষ প্রকারে মাতা পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শাস্ত্র বিধি অনুসারে বিশ্বম্ভ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পুনরায় গৃহস্থালী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পতিবিয়োগে শচীদেবী নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। পিতৃহীন বালকের মুখ দে তাঁহার হৃদয়ের শোক সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত; গৌরের নিঃসহায় মনে করিয়া কতই কাঁদিতেন, এবং দিবা রাত্রি অনন্যমনা হইয়া পুত্র নিযুক্ত থাকিতেন; এক দণ্ড পুত্র মুখ না দেখিতে পাইলে মূর্চ্ছা যাইতেন। স্বর্গীয় পতির প্রতি শচীদেবীর প্রগাঢ় ভক্তি ও অকৃত্রিম সরল প্রণয় ছিল। এক্ষণে সে সমস্তই পুত্রেতে অর্পিত হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক পুত্র বাৎসল্য সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইল। এক্ষণে বিশ্বম্ভরই তাঁহার জীবন সাগরের একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্র; তাঁহার মুখ দেখিয়াই তিনি কথঞ্চিত জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভরও পূর্ব্ব ঔদ্ধত্য ও অধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিত চিত্তে মাতৃসেবায় তৎপর হইলেন। কত সময় একত্রে বসিয়া পুত্র মাতাকে কত আশ্বাসের মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইতেন; এবং কত প্রকারে প্রবোধ দিতেন।

"শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি॥"

জগতে যদি এইরূপ অকৃত্রিম প্রেম ও আশ্বাসের মিষ্ট কথা না থাকিত; তবে কে এই অশেষ দুঃখময় সংসারে রোগ শোক সহ্য করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইত?

জগন্নাথের পরলোক গমনে বিশ্বম্ভর ও শচীর ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্বন্ধে কষ্ট উপস্থিত হইল। হইবারই তো কথা। কারণ তাঁহাদের স্থায়ী ভূসম্পত্তি আদি কিছুই ছিল না; একমাত্র জগন্নাথ যাজনাদি ক্রিয়া দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে সংসারের যে অর্থ কষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশ্বম্ভর এ পর্য্যন্ত কখন কিছু উপার্জ্জন করেন নাই; এবং ধনার্জ্জনাদি যে করিতে হইবে, সে দিকে তাঁহার চিন্তাও ছিল না। ঘরে কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহার কি? তাঁহার জীবন যাপনের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা না পাইলে রক্ষা থাকিত না। পিতৃ শোকে অভিভূত হইয়া কতক দিন পর্য্যন্ত শান্ত ও স্থির ছিলেন; এক্ষণে কাল সহকারে যতই শোকের ও দুঃখের তীব্রতা হ্রাস হইতে লাগিল; ততই তাঁহার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপিয়া উঠিল। পিতৃবিয়োগে

মাতার অযথা আদর ও প্রশ্রয়, অগ্নিতে দাহ্যমান বস্তু সংযোগের ন্যায় তাঁহার দুষ্ট বুদ্ধির উত্তেজক হইতে লাগিল। পুত্রবৎসলা শচী পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের অযথা প্রার্থনা সকল প্রাণপণ চেষ্টায় পূর্ণ করিতেন; তথাচ কোন সময়ে কিছু মাত্র ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে দুর্দ্দান্ত নিমাই ক্রোধে অন্ধ হইয়া ঘর দুয়ার সকলই ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। এক্ষণে তিনি পরিণত বয়স্ক; তথাচ এই কুস্বভাবের হস্ত হইতে কিছুতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। এখানে তাঁহার রাগোদ্রেকের যে একটী অদ্ভুত আখ্যায়িকা দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ কুৎসিত স্বভাব হইয়াছিল। এক দিন বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নানে যাইবেন বলিয়া মাতার নিকট তৈল, আমলকি এবং বিষ্ণু পূজার জন্য পুষ্প চন্দন ও মাল্য চাহিলেন। শচী তৈলাদি সমুদায় অর্পণ করিয়া বলিলেন "বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, মালাকরের বাটী হইতে মাল্য আনিয়া দিতেছি।" 'আনিয়া দিতেছি' শব্দ শুনিয়া বিশ্বম্ভর ক্রোধে অধীর হইলেন এবং ভীম মূর্ত্তি ধারণ করত 'এখন তুমি মালা আনিতে যাইবে?' এই বলিয়া জননীকে তিরস্কার করিতে করিতে লগুড় হস্তে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং যত গঙ্গাজল রাখার কলস ও ভাণ্ড ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; তৈল ঘৃত, দুগ্ধ, চাউল, ডাইল, ধান, লবণ, বড়ী ও কার্পাস আদি ছড়াইয়া ফেলিলেন; যে সকল সিকা টাঙ্গান ছিল তাহা এবং বস্ত্রাদি যাহা কিছু পাইলেন, সব ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। যখন ঘরের মধ্যে অন্য কোন জিনিষ পাইলেন না, তখন গৃহের উপর ক্রোধানল প্রজ্জলিত হওয়ায় দুই হস্তে লগুড় প্রহার করিয়া ঘর দুয়ার ভাঙ্গিতে লাগিলেন; তৎপরে গৃহ প্রাঙ্গনে যে সকল বাস্তুবৃক্ষ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন; এবং তাহাতেও ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত না হওয়ায় অবশেষে দুই হাতে মৃত্তিকার উপর ঠেঙ্গা মারিতে লাগিলেন। ইহা জ্ঞানহীন বাতুলের কায নয় তো আর কি বলিব? কেহ ভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া নিষেধ করিতে সাহসী হইল না। শচীমাতা মহা ভীম মূর্ত্তি পুত্রের ঈদৃশ ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত দেখিয়া ভয়ে স্থানান্তরে লুকায়িত হইলেন। সুতরাং বিনা বাধায় বিশ্বম্ভর যাবতীয় গৃহদ্রব্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিলেন। কিন্তু এই সকল দুষ্কার্য্যের মধ্যে বিশ্বম্ভরের অনুকূলে বলিবার একটী কথা আছে; অর্থাৎ তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় জননীকে কখন প্রহার করেন নাই। এসম্বন্ধে তাঁহার জীবনাখ্যায়ক অনেক প্রশংসাবাদ লিখিয়াছেন——

'ধর্ম্ম সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম সনাতন;
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন।
এতাদৃশ ক্রোধাবেশে আছেন ব্যাপিয়া;
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া।'

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ৭অধ্যায়।

এইরূপে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী অপচয় করিয়া বিশ্বম্ভর যখন আর কিছু পাইলেন না, তখন ক্রোধাবেশে অঙ্গনে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; এবং ক্ষণ কাল মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে শচীদেবী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া মালাকরের বাটী হইতে সকল

অনর্থের মূল সেই মালা আনয়ন করিয়া স্নানের ও বিষ্ণু পূজার সমস্ত আয়োজন করত ধীরে ধীরে পুত্রের অঙ্গে হস্তামর্শ করিতে লাগিলেন; এবং গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া সুমধুর মিষ্ট বাক্যে পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন;—

'উঠ উঠ বাপ মোর হের মালা ধর;
আপন ইচ্ছায় গিয়া বিষ্ণুপূজা কর।
ভাল হৈল যত বাপ! ফেলিলে ভাঙ্গিয়া;
যাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া।'

চৈঃ ভাঃ

ধন্য অপত্য স্নেহ! ধন্য মাতৃ প্রেম! তুমিই জগতে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার! তুমি না আসিলে কি জীব প্রবাহ রক্ষা হইত? মাতৃস্নেহের প্রতিশোধ পুত্র কি চিরজীবনে দিতে পারে?

জননীর সুমধুর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া গৌরচন্দ্র লজ্জিতান্তঃকরণে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। এদিকে শচীমাতা সমস্ত ঘর দুয়ার পরিষ্কার করত রন্ধন সমাধা করিলেন; ও বিশ্বম্ভর স্নান করিয়া আসিলে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া মিষ্ট বাক্যে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেনঃ—

'এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিলা?
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার;
অপচয় তোমার; সে কি দায় আমার?
পড়িবারে তুমি এবে এখনি যাইবা;
ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা।'চৈঃভাঃ

জননীর মিষ্ট ভর্ৎসনা শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর মহালজ্জিত হইলেন এবং আপনার দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের বিষয় স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আর জননীকে বলিলেন 'টাকা কড়ির জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না; ভগবান্ কোন মতে চালাইয়া দিবেন।' বৈষ্ণবেতিহাস লেখকগণ এই স্থানে গৌরের অলৌকিকত্বের পরিচয় দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, গৃহের দ্রব্য অপচয় করার নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া বিশ্বম্ভর সেইদিন অপরাহ্নে অধ্যয়ন হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জাহ্নবী তীরে ক্ষণকাল একাকী অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করত নিভৃতে জননীর হস্তে দুই তোলা সুবর্ণ দিয়া গৃহ সামগ্রীর অভাব পরিপূর্ণ করিতে বলিলেন। এখন হইতে এইরূপে যখন ঘরে অনাটন দেখিতেন, তখনই কিছু কিছু স্বর্ণ আনিয়া মাতার হস্তে দিতেন। ইহাতে জননীর মনে যেরূপ ভাব হইত, তাহা নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতাংশ পাঠে বুঝা যাইবে। শচীদেবী পুত্র দত্ত স্বর্ণ পাইয়া চিন্তা করিতেছেনঃ—

'কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার?
পাছে কোন প্রমাদ ঘটায় জানি আর।
যেই মাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে;
সেই এই মত সোণা আনে বারে বারে।
কিবা ধার করে? কিবা কোন সিদ্ধি জানে?
কোন রূপে কার সোণা আনে বা কেমনে?
মহা অকৈতব আই পরম উদার;
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বার বার।
দশ ঠাঁই পাঁচ ঠাঁই দেখাইয়া আগে;
লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে।'

এই আখ্যায়িকার মূলে কত সত্য আছে, জানি না। পাঠকগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্ত নিজে নিজে করিবেন।

অধ্যাপনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পড়িতে বিশ্বম্ভরের অসাধারণ মেধাশক্তি ও শাস্ত্র দক্ষতার

কথা নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল; এবং তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। টোলের মধ্যে তিনিই সকল পড়ুয়াকে চালাইতেন। সকলের পাঠ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন, এবং ফাঁকির সিদ্ধান্তও খণ্ডন করিতেন। এখন গঙ্গাদাসকে আর বড় একটা পরিশ্রম করিতে হইত না। তিনি বিশ্বম্ভরকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে বিশ্বম্ভরও একটী স্বতন্ত্র টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে বড় চণ্ডীমণ্ডপ গৃহে তাঁহার টোল হইতে লাগিল। প্রত্যুষে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করিয়া টোলে পড়াইতে যাইতেন; শিষ্য সমবেত হইয়া মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান করিতেন; স্নান ও আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করত পুনরায় টোলে যাইতেন, এবং অপরাহ্নে ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত হইয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নালোকে শিষ্য পরিবৃত হইয়া কখন জাহ্নবীতীরে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রালাপ করিতেন; কত প্রকার দম্ভ সহকারে আপনার পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতেন; এবং বিপক্ষ পক্ষ দেখিলে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইয়া দিতেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল; দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং তিনি একজন দিগ্গজ অধ্যাপক মধ্যে পরিগণিত হইলেন। প্রায় সহস্রাধিক পড়ুয়া এক্ষণে তাঁহার টোলে পড়ে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় এক্ষণে তাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্র সাবকাশ থাকিত না।

এই সময়েদেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া নবদ্বীপে বিদ্যাধ্যয়ন করিত, এবং গঙ্গাবাস উপলক্ষেও অনেক দেশীয় লোক এখানে অবস্থিতি করিত। এইরূপে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক লোক তখন নবদ্বীপে বাস করিতেছিল। মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক চট্টগ্রাম বাসী নবদ্বীপের অন্যতর টোলে অধ্যয়ন করিতেন। অন্যান্য সদ্গুণের মধ্যে মুকুন্দ অতি সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। তিনি নিয়মিত সময় টোলে অধ্যয়ন করিয়া অবকাশ কাল অদ্বৈতপ্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে পরমার্থ চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন। একদিন নিমাই পণ্ডিত সশিষ্যে রাজপথে গমন করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে মুকুন্দকে দেখিয়া ডাকিলেন। মুকুন্দ পাশ কাটাইয়া অন্যপথে চলিয়া গেলে গৌরাঙ্গ বলিলেন যে "এবেটা আমার ফাঁকির ভয়ে অন্য দিকে পলায়ন করিল। উহারা বৈষ্ণবের শাস্ত্র ও পরমার্থ তত্ত্ব আলোচনা করে; আমার ঐ সকলের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই; আমি কেবল শাস্ত্র চর্চ্চা করি; তাহা এবেটার ভাল লাগিবে না; সেজন্য আমাকে এড়াইয়া গেল। আচ্ছা থাক্ দেখা যাবে।'

অন্য দিন মুকুন্দের দেখা পাইয়া গৌর সুন্দর তাঁহার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি আমাকে দেখিয়া পলাও কেন? অদ্য বিচার না করিলে ছাড়িয়া দিব না।"

মুকুন্দ মনে মনে করিলেন যে 'এব্যক্তি ব্যাকরণের অধ্যাপক; অলঙ্কার জানে না;

অতএব ইহাকে অলঙ্কারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরাজয় করিব।' এই ভাবিয়া তিনি কঠিন কঠিন অলঙ্কারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন শেষ না হইতে হইতে বিশ্বম্ভর অম্লানবদনে তাহার যথাযথ উত্তর করিতে লাগিলেন এবং অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মুকুন্দকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন। অবশেষে ঈষৎ হাস্য করিয়া মুকুন্দকে বলিলেন যে 'আজি ঘরে গিয়ে এবিষয় চিন্তা কর; কল্য আসিয়া আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিও।' ইহা শুনিয়া মুকুন্দ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং মনে মনে চিন্তা কবিতে লাগিলেনঃ—

"মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা ?
হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা।
"এমন সুবুদ্ধি ব্যক্তি ভক্ত হয় যবে;
তিলেক ইহার সঙ্গ নাহি ছাড়ি তবে।"

আর এক দিন মাধব মিশ্রের পুত্র ও চৈতন্যের ভাবী ধর্ম্ম বন্ধু গদাধরকে পথে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে গদাধর! ভাল তুমিত ন্যায় শাস্ত্র পড়, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি ?

গদাধর উত্তর করিলেন কি প্রশ্ন ?

বিশ্বম্ভর। মুক্তি কাহাকে বলে ?

গদাধর। আত্যন্তিক দুঃখ নাশের নাম মুক্তি।

তখন গৌরচন্দ্র তাঁহার সিদ্ধান্তে শত দোষ-দিয়া মুক্তি পদের অন্য ব্যাখ্যা স্থাপন করিলেন। ফলে এই সময়ে নগরে নগরে বেড়াইয়া লোকের প্রতি ফাঁকি জিজ্ঞাসা করা তাঁহার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শ্রীবাস অদ্বৈত প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহারা গৌরাঙ্গের পরম সুন্দর মূর্ত্তি ও অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান মধ্যে বিনয়ের অভাব দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইতেন।

এই সময়ে এক দিন জগন্নাথ নন্দন বায়ুরোগের ছলনা করিয়া বাটীর অঙ্গনে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। নিম্নলিখিত কবিতা পাঠে তাঁহার ব্যাধির লক্ষণ বুঝা যাইবে।

"এক দিন মহাবায়ু মান্দ্য করি ছল;
প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল।
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বলে;
গড়াগড়ি যায়, হাসি ঘর ভাঙ্গি ফেলে।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট মারে;
সম্মুখে দেখয়ে যাঁরে, তাঁহারেই মারে।
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভীকৃত হয়;
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোকে দেখি পায় ভয়।"

শচীদেবী আস্তে ব্যস্তে প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবদিগকে ডাকিয়া এই আকস্মিক দুর্ঘটনা অবগত করাইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ সঞ্জয় প্রভৃতি আত্মীয়গণ আসিয়া নানা রূপ প্রতীকার করিতে লাগিলেন; বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মর্দ্দন ও অন্যান্য সুশ্রূষা হইতে লাগিল। এই পীড়ার সময় গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন যে "আমি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-পতি; তোমরা আমাকে চিন না।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতে লাগিলেন যে, দানব ও ডাকিনী অধিষ্ঠান হইয়াছে; তাহাতে প্রলাপ বকিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞ লোকেরা স্থির করিলেন যে, বায়ু ব্যাধি হইয়াছে। কিছুতেই উপশম হইল না দেখিয়া অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে একটী দ্রোণ মধ্যে তৈল পরিপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখা

হইল। এইরূপ কিছু দিন করিতে করিতে ব্যাধি আরোগ্য হইল।

"বহুবিধ পাক তৈল দেন সবে শিরে;
তৈল দ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে।
তৈল দ্রোণে ভাসে প্রভু হাঁসে খল খল;
সত্য যেন মহা বায়ু করিয়াছে বল।
এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি;
স্বভাব হইলা প্রভু বায়ু পরি হরি।"

প্রথম পরিণয়।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিন গঙ্গাপথে বনমালী আচার্য্য নামক ব্রাহ্মণের সহিত গৌর চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময় বল্লভাচার্য্য দুহিতা লক্ষ্মীদেবীকে দেখিতে পাইলেন; এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্ব সিদ্ধ ভাবোদ্গমের পরিচয় দিতে লাগিলেন। চতুর বনমালী তাহা বুঝিতে পারিয়া সময়ান্তরে শচী দেবীর নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনার পুত্র বিবাহ যোগ্য বয়স্ক হইয়াছেন; তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন না কেন? নবদ্বীপের বল্লভ আচার্য্য কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই করণীয় ঘর; আর তাঁহার দুহিতা লক্ষ্মীও রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর সমান; আপনার বিশ্বম্ভরের উপযুক্ত কন্যা। যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি এই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেই।"

শচী উত্তর করিলেন যে,—'আমার বালক পিতৃহীন ও অতি শিশু; বিশেষত তাহার এখনও পাঠ সাঙ্গ হয় নাই। পড়া শুনা শেষ হউক ও বাঁচিয়া থাকুক তবে বিবাহের বিষয় চিন্তা করিব।'

শচীর উত্তরে ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; পথি মধ্যে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?'

বনমালী উত্তর করিল 'আর কোথায়? তোমাদের বাটীতে তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে? তা তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।'

গৌরচন্দ্র ইহা শুনিয়া বিনম্র ভাবে মৌন হইয়া থাকিলেন এবং ঈষদ্ হাস্য করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত জননীকে বলিলেন যে "বনমালী ঘটক কি বলিতে আসিয়াছিল? তাহাকে সম্ভাষণ করেন্ নাই, তাহাতে সে ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।"

শচী পুত্রের এই ইঙ্গিত বাক্যে তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া গোপনে বনমালীকে ডাকাইলেন ও বল্লভাচার্য্যের দুহিতার সহিত পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ সুস্থির করিতে অনুমতি দিলেন। বিপ্র ও তৎক্ষণাৎ বল্লভের নিকট আসিয়া সমস্ত বিবৃত করিল এবং গৌরাঙ্গের রূপ গুণের কথা বলিয়া বলিল যে 'এরূপ পাত্রে কন্যা দান করা সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

বল্লভাচার্য্য বনমালীর প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করত বলিলেন যে, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিছু দিতে পারিব না; কেবল পাঁচটী হরিতকী দিয়া কন্যা দান করিব।' এই উক্তি তাঁর বিনয়ের কথা বলিতে হইবে; কারণ ইহার পর দেখা যাইবে যে, তিনি কন্যাকে অষ্টাঙ্গে বিভূষিত করিয়া সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বনমালী এই শুভ সম্বাদ অচিরে শচীকে অবগত

করিলেন এবং শুভ দিন দেখিয়া উভয় পক্ষ বিবাহের অয়োজন করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে বল্লভাচার্য্য বিশ্বম্ভরকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া সুখী হইলেন। কথিত আছে, বিবাহের দিনে যখন চারি দিকে আনন্দ কোলাহল হইতেছিল, শচী দেবী তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীকে মনে করিয়া ক্রন্দন করিয়া ছিলেন। তদ্দর্শনে বিশ্বম্ভরের উল্লসিতাননেও বিষাদের কালিমা পড়িয়া ছিল। যাহা হউক, অধিকক্ষণ সে বিষাদ স্থায়ী হয় নাই। আনন্দ উৎসব মধ্যে বিশ্বম্ভরের প্রথম পরিণয় সম্পন্ন হইল। পুত্রের সহিত বধূকে দেখিয়া বিশ্বম্ভর-জননীর আনন্দের সীমা থাকিল না। এই সময়ে তিনি গৃহ মধ্যে কত কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে পাইলেন; কখন দেখিতেন যেন এক দিব্য জ্যোতির শিখা বিশ্বম্ভরের মস্তক ও বদন মণ্ডলে বিরাজ করিতেছে; আবার কখন বর বধূ উভয়ের অঙ্গ হইতে কমল গন্ধ নিঃসারিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেন। সরলমতি শচী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে, এই কন্যা লক্ষ্মী আশ্রিতা; ইঁহার আগমনেই এই সব শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

এই সময়ে চারিদিকে বিষ্ণুভক্তি শূন্য লোক সকল কেবল বাহিরের ক্রিয়া কলাপে ও মিথ্যা জাঁক জমকে রত রহিয়াছে দেখিয়া অদ্বৈতের বৈষ্ণবমণ্ডলী বড়ই মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহাদের আরও ক্ষোভের বিষয় এই হইল যে, তাঁহারা মনে করিয়া ছিলেন যে, বিশ্বরূপ যেরূপ ভক্তিপরায়ণ শিষ্ট শান্ত সাধু মহাত্মা ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ বিশ্বম্ভরও সেইরূপ হইবেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের জ্ঞান গরিমা ও গর্ব্বিত ব্যবহারে তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যথিত হইতে হইত; এবং কবে কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া জগতের দুঃখ দূর করিবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু ভক্তবর অদ্বৈতাচার্য্য এক-দিনের জন্যও নিরাশ্বাস হন নাই; তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, যখনই যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; তখনই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করিয়া সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়াছেন। এবারেও অচিরে তাহাই হইবে। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই শিষ্যমণ্ডলীকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতেন;—

"আর দিন কত সিয়া থাক ভাই সব;
এথাই পাইবা সবে কৃষ্ণ অনুভব।
করাইব সর্ব্ব কৃষ্ণ নয়ন গোচর;
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর।"

তখনও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখেই ভগবৎ শক্তির স্ফুলিঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; ও সেদিন অতি নিকট যে দিনের জন্য তাঁহারা আশা নেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন।

প্রত্যহ অপরাহ্ণে নগর ভ্রমণ করা বিশ্বম্ভরের অভ্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া নবদ্বীপের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া নিত্য নূতন পল্লীতে যাইয়া অশেষ প্রকারে হাস্য কৌতুক করিতেন। কোন দিন তন্তুবায় পল্লীতে যাইয়া বিনামূল্যে উত্তম উত্তম বস্ত্র সকল আনিতেন; কখন গোয়লাদিগের পাড়ায় গমন করত দধি দুগ্ধ ক্ষির সর ভোজন করিতেন, গোপগণ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকিত ও আপনাদের পক্ক অন্ন খাইতে অনুরোধ

করিত। কখন আবার শঙ্খ বণিক, গন্ধ বণিক, মালাকার, ও সর্ব্বজ্ঞদের বাটীতে যাইয়া বিবিধ আমোদ কৌতুক করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা তরকারী বিক্রেতা শ্রীধরের সহিতই তাহার অধিক হাস্য পরিহাস হইত। শ্রীধরের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঈশ্বরপুরীর আগমন।

এই মহাত্মার জন্মস্থান কুমারহট্টে; ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর সর্ব্ব প্রধান শিষ্য। দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে ইনি এই সময়ে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য একান্ত মনে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন সম্মুখে এক তেজঃপুঞ্জ সৌম্য পুরুষ উপবিষ্ট। পুরী কৃষ্ণ প্রেমরসে সর্ব্বদাই বিহ্বল ও প্রশান্ত চিত্ত। তাঁহার বেশ দেখিলে তাঁহাকে কেহ সাধুপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিত না। কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট লুক্কায়িত থাকিবার নহে। অদ্বৈতাচার্য্য পুরীর ভাব গতিক দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আগ্রহ সহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

"অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্ জন?
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন।"
"বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম!
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ।"

তখন মুকুন্দ দত্ত অতি সুমধুর স্বরে ও প্রেমের সহিত হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী তাহা শুনিতে শুনিতে অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করত পৃথিবীতে ঢলিয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। পুরীর নয়ন জলে অদ্বৈতের পরিধেয় বসন সিক্ত হইল এবং তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। পরে ঈশ্বরপুরীর পরিচয় পাইয়া অদ্বৈতের ক্ষুদ্র বৈষ্ণব দলের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে পুরীর বাসা নির্দ্ধারিত হইল; তথায় তিনি কয়েক মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মহা পণ্ডিত ছিলেন, জানিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট ভক্তি শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গদাধর পণ্ডিতকে সংসারবিরক্ত পরমভাগবত দেখিয়া পুরী স্বরচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন। একদিন বিশ্বম্ভর নগর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আপনার ভাবী অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্ব্বিত মস্তক আপনা হইতেই যেন তাঁহার চরণ তলে অবনত হইল। পুরী পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, ইহার নাম নিমাই পণ্ডিত, ইনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক। 'তুমিই সেই' বলিয়া পুরী তাঁহাকে সম্ভাষণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বম্ভরও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনাদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ভগবানের গূঢ় কৌশলে এইরূপে ভাবী গুরুশিষ্যে অলক্ষিতভাবে পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলনে যে কি উপাদেয় ফল ফলিবে, তাহা তখন না তাঁহারা, না পৃথিবী জানিতে পারিয়াছিল। এই হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপনা সমাপনান্তে বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করিতে যাইতেন। যাহার জ্ঞান গর্ব্বের নিকট সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত, যাহার উন্নত মস্তক আর কাহারও নিকট

অবনত হয় নাই, তিনি কেন মেষশিশুর ন্যায় শান্তভাবে একজন উদাসীন সন্ন্যাসীকে এত ভক্তি করিবেন, তাহা কে বুঝিবে? আবার যাহার দম্ভপূর্ণ বাক্যের তেজে সকলেই সশব্যস্ত হইত, তিনি পুরীর সহিত কি ভাবে আলাপ করিতেছেন, দেখুন—

'প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বর পুরী হরষিত;
প্রভু হেন না জানেন তবু বড় প্রীত।
হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত;
আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত।
সকল কহিবে কথা থাকে কোন দোষ;
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ।'
"প্রভু বলে ভক্ত বাক্যে কৃষ্ণের বর্ণন;
ইহাতে যে দেখে দোষ পাপী সেইজন।
ভক্তের কবিত্ব যে তেমত কেন নহে;
ঈশ্বর সর্ব্বথা প্রীত তাহাতে নিশ্চয়ে।
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন;
ইহাতে দোষিবে কোন্ সাহসিক জন?'

ঈশ্বরপুরী বিশ্বম্ভরের এই বিনয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, 'যদি আমার কবিতার দোষ থাকে, তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে।" গৌরচন্দ্র অগত্যা হাসিতে হাসিতে একটী কবিতার ধাতু প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ ধাতু আত্মনেপদ নহে, আপনি আত্মনে পদে প্রয়োগ করিয়াছেন কেন?''

ঈশ্বর পুরীও বিদ্যার বিচার করিতে ভাল বাসিতেন; গৌরচন্দ্র ঐ কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পুরী মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক ঐ ধাতু পরস্মৈপদী; কিন্তু আত্মনে পদেও তিনি লাগাইতে পারেন। পুনরায় বিশ্বম্ভরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঐ কথা তাঁহাকে বলিলেন। যদিও তাঁহার কথাব প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত হেতু ছিল, তথাচ গৌরাঙ্গ তাহাতে আর কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে কৃষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ঈশ্বর পুরী প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

সীতার বনবাস।*

সপ্তকাণ্ডময় রামায়ণ সমগ্র কাব্য জগতে কল্পতরু বিশেষ। ইহার শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, সমস্তই অমৃতবর্ষী। ভাষার চাতুরী, ভাবের মাধুরী, ভক্তির তেজ, স্নেহের শৈত্য, প্রেমের উৎস, সৌভ্রাত্রের উৎকর্ষ—সকলই ইহাতে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। দয়া, মায়া, সাম্য, ধৃতি, শান্তি, লীলা খেলা, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সোহাগ, অনুরাগ, শোকোচ্ছ্বাস, প্রেমোল্লাস,—ইহাতে নাই, এমন বস্তুই নাই। এমন পবিত্রতাময় জটিলতা শূন্য, নবরসে পরিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ জগতে দুর্লভ। সংসারের সকল চরিত্রের এরূপ সম্যক্ বিকাশ কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না, চরিত্র সংগঠনে ভাবা জগতে ইহা আদর্শস্থল। যত দিন ভাষার জীবনী শক্তি থাকিবে, ততদিন দেশে দেশে, যুগে যুগে, রামায়ণের অবিনশ্বরত্ব বিঘোষিত হইবে। সনাতন সংস্কৃত ভাষায় এই কল্পতরু রোপণ করিয়া কবিগুরু বাল্মীকি জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার

* পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক দৃশ্যকাব্য। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

অনতিবিকাশাবস্থায় কবিবর কৃত্তিবাস ইহা কাব্যাকারে প্রথম পরিণত করেন; সংস্কৃতানভিজ্ঞ আপামর সাধারণ আজি পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে। দুঃখের বিষয়, মূলের সহিত তিনি অনুসরণ করেন নাই, অনেক স্থলে স্বকপোল কল্পনার উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইদানীং গদ্যে রামায়ণের কয়েকটী অনুবাদ বাহির হওয়াতে সে ক্ষোভ মিটিয়াছে. অধিকন্তু, সম্প্রতি কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় তাহার অক্ষয়বন্ধ পদ্যানুবাদ দ্বারা বাঙ্গালার সাহিত্য ভাণ্ডারে একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন উপহার দিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"সীতার বনবাস" এই সপ্তকাণ্ডময় কল্পবৃক্ষের একটী পল্লবমাত্রকে আশ্রয় করিয়া বিরচিত। সমগ্র রামায়ণের মধ্যে সীতার বনবাসের তুল্য করুণরসাত্মক অংশ আর নাই। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম গ্রথিত করেন। অধুনা গিরীশ বাবু সেই আচার্য্যের পদানুসরণ করিয়া, তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া, রঙ্গালয়ে অভিনয়োপযোগী দৃশ্য কাব্যাকারে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া তাহা বাহির করিয়াছেন। বাঙ্গালা কাব্যে এরূপ ছন্দ এই প্রথম। কবিবর রাজকৃষ্ণ তাঁহার নিভৃত নিবাসের স্থল বিশেষে এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সূত্রপাত করেন সত্য, কিন্তু সমগ্র দৃশ্যকাব্যের ছন্দোবন্ধন ঐ সূত্রে গ্রথিত করার পক্ষে গিরীশ বাবুই, বোধ হয়, প্রথম প্রবর্ত্তক। ছন্দ ও অলঙ্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কবির অন্যতম কর্ত্তব্য; সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে কবিবর তাঁহার 'হর ধনুর্ভঙ্গ' নাটকের মুখবন্ধে ঐ ছন্দের সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্যক্ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ও অনেক বিলাতী কবির কাব্যে ঐ ছন্দের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। নটচূড়ামণি গিরীশচন্দ্রের লক্ষ্য অন্যবিধ; রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধন ও তাহার উপযোগিতানুপযোগিতা পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, সুতরাং এই ছন্দ অভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বুঝিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, একটা উদ্ভট উদ্ভাবনার জন্য কোন রূপ বাক্য ব্যয় করেন নাই। এই ছন্দ সাধারণ কাব্যামোদী পাঠকের নিকট সম্পূর্ণ তৃপ্তিপ্রদ না হইলেও, অভিনয়ের পক্ষে বাস্তবিকই বিশেষ সুবিধাজনক। উহার মৃদু মন্দ মন্থরগতি অভিনেতার অন্তরে সহজেই প্রবিষ্ট হয়, এবং আকুঞ্চন প্রসারণময় কেমন একটু সুর-লহরী শ্রোতার হৃদয়কে উল্লাস-বায়ু ভরে তরঙ্গায়িত করে। বাঙ্গালা কাব্যে এই ছন্দের উদ্ভাবন জন্য কবিবর ও নটরাজ উভয়ই সহৃদয় নাট্যামোদীবর্গের ধন্যবাদের পাত্র; অধিকন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু উহার সম্যক্ বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া সকলের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, অতএব তিনি সমধিক ভক্তিভাজন।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, রামায়ণে নাই এমন চিত্রই নাই। সমগ্র রামায়ণের মধ্যে সীতার বনবাস, অতি ক্ষুদ্রাংশ হইলেও, ইহাতে সেই সমস্ত চিত্রের অধিকাংশেরই ছায়া পড়িয়াছে। প্রজা পালন, অপত্যস্নেহ, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, স্বামীর সোহাগ, স্ত্রীর অনুরাগ, ভৃত্যের প্রভুপরায়ণতা, ক্ষত্রিয়ের বিক্রম—সমস্তই ইহাতে জলন্ত অক্ষরে চিত্রিত। গিরীশবাবু সে গুলি কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,

এখন তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক।

প্রজা পালন।—অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপন, প্রজাবর্গের সুখ, স্বস্তি, ধন, মান, শিক্ষা, দীক্ষা, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধানের উপায় নিরূপণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, —এই সমস্ত রাজার অনুক্ষণ চিন্তার বিষয়। কালের আবর্ত্তনে আজ কাল স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের ভাগ্যে এ সম্বন্ধ অতীতের অন্ধকূপে প্রোথিত হইয়াছে। আজ কাল নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, অর্থশোষণ, প্রজাপীড়ন, অকালমরণ ঘটিতেছে,— ক্ষুধিতের চীৎকারে, প্রবলের ফুৎকারে, নিপীড়িতের আর্ত্তনাদে, অত্যাচারের বিসম্বাদে দিগন্ত প্লাবিত হইতেছে, তথাপি তাহার প্রতিবিধানের দিকে লক্ষ্য নাই, শান্তি ও সুমঙ্গল সাধনের চেষ্টা নাই। ত্রেতায় গুণধর রামচন্দ্র অতুলনীয় রাজনীতিবিশারদ, অদ্ভুত প্রজাবৎসল;—প্রজাই তাঁহার রূপ, প্রজাই তাঁহার তপ, প্রজার শুভান্বেষণই তাঁহার সার ব্রত। প্রজার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য, প্রজার সন্দেহ দূর করিবার জন্য, তিনি প্রাণাধিক প্রিয় সহধর্ম্মিণীকেও বনবাস দিতে অকুণ্ঠিত। বিস্তৃত কোশল রাজ্যের চতুর্দ্দিকের প্রজাবর্গের অবস্থা নিরূপণ ও রাজার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রজার মতানুসন্ধানের ভার এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত। আজ কাল অপ্রিয় সত্যবাদী রাজার চক্ষুর শূল, আর ভণ্ড চাটুকার প্রিয় পাত্র—অন্তঃসার শূন্য উপাধি লাভের যোগ্য ব্যক্তি। রামচন্দ্রের নিকট তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব; তিনি দুর্ম্মুখ-মুখে "রাম-রাজ্য অসুখের নয়" শুনিয়া নিশ্চিন্ত নহেন,—সম্পূর্ণ বিরক্ত। তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"এ সংবাদ হেতু নিয়োগ করি না তোমা,
চাটুকারে পারে দিতে এহেন বারতা;
তব কার্য্যে অনুগত।
কহ দীনতা আছে কি রাজ্যে,
শস্যের অভাব, জলকষ্ট,
অকাল মরণ, কোন ঠাঁই?
দুর্জ্জন পীড়ন, শিষ্টের পালন
হতেছে ত রাজ্যময়?"

নিজের কর্ত্তব্য পরিচালন-দক্ষতায় তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। যে বংশে দিলীপ, অজ, দশরথ প্রভৃতি নৃপতিগণ অসামান্য দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রাজত্ব কালে তাহা কিছুমাত্র প্রতিহত—সে কুলগৌরব কিছুমাত্র বিনষ্ট হইতেছে কি না, ভাবিয়া তিনি অনুক্ষণ ব্যাকুল। প্রজাবর্গের কথাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহে কি সকলে
সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম?"

'দুর্ম্মুখ' যোগ্য রাজার যোগ্য কর্ম্মচারী। প্রভু সমক্ষে মিথ্যা বলা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ; সে সর্ব্ববাদীসম্মত সুযশের কথা না গাইয়া অকুতোভয়ে কহিল—

"অ শ্রু একথা কহে জনে জনে।"

রামচন্দ্রের মনে সন্দেহের আবিলতা মিশিল, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন, এবং লক্ষ্মণের স্বাভাবিক সৌভ্রাত্রসুলভ যশোগানে সুখী না হইয়া তাঁহাকে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া দুর্ম্মুখকে সত্য কহিবার

জন্য সমধিক অভয় প্রদান করিলেন। দুর্ম্মুখ অগত্যা সাধ্বী সতী সীতার কলঙ্কাপবাদ প্রভু সমক্ষে জ্ঞাপন করিল। সীতাগত-প্রাণ রামচন্দ্র সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় থাকিলেও, প্রজার কথায় তাঁহার বিশ্বাস টলিল; তিনি অকলঙ্ক রঘুকুলে কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া একেবারে বিফল হইলেন। এই কলঙ্ক-কালিমা হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য তিনি জানকীকে কৌশলে বনবাসিনী করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখিলেন না। যে জানকীর জন্য তিনি কৈশোরে বনে বনে পরিভ্রমণ, কপটতা সহকারে বালিরাজকে নিধন পূর্ব্বক বন্য পশুর সহিত মৈত্রী সংস্থাপন, দুর্লঙ্ঘ্য সাগর পার, দুর্ব্বার দশাস্য সংহার প্রভৃতি দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, লোক নিন্দার প্রবলতাড়নে সেই পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনীকে বনবাস দিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্ষোভ মিটিল না, লোক সমক্ষে সতীত্বের জলন্ত সাক্ষ্য না দিয়া তাঁহার প্রজা-নিন্দাশঙ্কা মন হইতে উন্মূলিত হইল না। তাই দীনা, ক্ষীণা, মলিনা, বল্কল-পরিধানা জনক নন্দিনীকে বহুকাল পরে নিকটে পাইয়াও আলিঙ্গন লাভে সুখী হইতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত হৃদয়-বেগ সম্বরণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সীতা যখন বহুকাল বিচ্ছেদের পর একবার প্রভুর "শ্রীমুখের বাণী" শুনিবার জন্য কাতরা, তখনও রামচন্দ্র আশা-ক্ষোভ-বিজড়িত স্বরে কহিলেন—

"প্রিয়ে! চাহে প্রাণ বাহু প্রসারিয়া
লই হৃদে হৃদয়ের নিধি,—
হৃদি-বেগ করি সম্বরণ;
ডরি প্রাণেশ্বরি, মন্দভাষী জনে।
লঙ্কা-পুরে দেখিল অমর নরে
অগ্নির পরীক্ষা তব;
মন্দ লোকে নিন্দা করে তায়,
কহে ছায়াবাজী, পরীক্ষা সে নয়,
আজি পুনঃ অযোধ্যানগরে
দেহ সে প্রমাণ সতী,
কর প্রাণেশ্বরি, রবিকুল মুখোজ্জ্বল।"

ধন্য প্রজা-বাৎসল্য!—ধন্য প্রজাপালন! প্রজাপরতন্ত্রতার এরূপ সুন্দর চিত্র দেব-লোকেও দুর্লভ। সাম্যবাদী পাশ্চাত্য নৃপতিকুল ইহা শিক্ষা করুন। কেবল তর-বারির জোরে রাজ্যশাসন হয় না, প্রজার সহিত সহানুভূতি না থাকিলে, প্রজার মন-স্তুষ্টি সাধন করিতে না পারিলে, রাজকার্য্য পরিচালনার দোষ গুণ প্রজার মুখে না শুনিলে রাজ্য সুশৃঙ্খল হয় না, রাজ্যে শান্তির সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখশূন্য, শান্তিশূন্য রাজ্য শ্মশান অপেক্ষাও ভীষণ।

সৌভ্রাত্র।—"আজ কাল 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই!"—ভাইয়ের মর্য্যাদা ভাই বুঝে না, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সহানুভূতি অতীতের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্যবাদী ধর্ম্মধ্বজী ভ্রাতারা জগতে অনন্ত অবিনশ্বর ভ্রাতৃ-ভাব স্থাপন করিতে অসাধারণ বাক্‌পটু, কিন্তু স্বগৃহে আপন সহোদরের ন্যায্য স্বত্ব হইতে তাঁহাকে কিরূপে বঞ্চিত করিবেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে ততোধিক কৌশলী ও চেষ্টাশীল। স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, ভক্তি-প্রীতি পরিহার করিয়া, আলাপ আলি-ঙ্গন বিস্মৃত হইয়া, সহোদরের ছিদ্রান্বেষণে ও ধ্বংস সাধনে অনুক্ষণ তৎপর। বিচিত্র রামলীলায় সে ভাব নাই; সর্ব্বজীবে সম-ভাব ও ভ্রাতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এক

সূত্রে গ্রথিত, একই আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আকর্ষিত। রাম লক্ষ্মণ এক মার সন্তান নহেন, তথাপি কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের চরণে "চির অনুগত দাস", সুখে দুঃখে-সম্পদে বিপদে-চিরদিন ছায়ার ন্যায় অনুগামী; জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠের চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, চিরদিন এক প্রাণ। আমরা লক্ষ্মণের মুখে শুনিতে পাই—

"প্রভু! আজন্ম সেবিনু শ্রীচরণ,
শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান, শ্রীচরণ হেরি'
বনবাসে পাশরিনু রাজ্য-সুখ,
শ্রীচরণ আশে কুটীর নিবাসে
লইনু নশ্বর শর করে
বিনাশিতে বিরাম দায়িনী নিদ্রা.
* * * (যবে)
ভাবিলাম অন্তিম আমার,
প'ড়েছিল মনে শ্রীচরণ—"

বস্তুত শ্রীরামের শ্রীচরণ ধ্যান ভিন্ন লক্ষ্মণের অন্য কোন ব্রত ছিল না। রামচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; কি রাজসভায়, কি অন্তঃপুর-বাটিকায়, কি রণাঙ্গনে, কি বিহার-বনে, তিনি কখন লক্ষ্মণ ছাড়া হইতেন না, লক্ষণের সহিত পরামর্শ না করিয়া কার্য্য করিতেন না। লক্ষ্মণ তাঁহার অনুমতি পালনে কখন দ্বিধাচিত্ত হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; তাই যখন জননী স্বরূপিণী জনক-নন্দিনীকে কৌশলে শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যবাসিনী করিতে, সোণার প্রতিমা জলে বিসর্জ্জন দিতে লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরামের মনে যুগপৎ ক্ষোভ ও অভিমানের উদয় হইল, তিনি বলিলেন—

"বুঝিনু বুঝিনু, ভাই, তুমিও লক্ষ্মণ
আজি ত্যজিলে পামরে ঘৃণায়,
সেই হেতু না শুন বচন।"

অন্য ভ্রাতার পক্ষে অবাধ্যতার জন্য অন্যরূপ তিরস্কারের, অন্যবিধ শাসনের প্রয়োজন হইত; কিন্তু লক্ষ্মণের অন্তরে ইহাতেই শেল বিদ্ধ হইল, ঘৃণা লজ্জায় সহস্র বৃশ্চিক তাঁহার মর্ম্মের পরতে পরতে দংশন করিতে লাগিল, তিনি যন্ত্রণায় কাতর-প্রাণ, বিকল চিত্ত হইয়া বলিলেন—

"দ্বিধা হও জননী মেদিনী,
বজ্রাঘাত হ'ক শিরে,
রে নয়ন! কর না রে বারি বরিষণ,
উপাড়ি পাড়ির বাণে;
পালিব হে আজ্ঞা তব,
বজ্রপাতি, ল'ব বুকে তোমার বচনে,
জ্যেষ্ঠ তুমি পিতৃ সম মম।"

ধন্য লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপরায়ণতা! যে লক্ষ্মণ বীরত্বের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, পিতৃ সম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুজ্ঞাপালনের নিমিত্ত তিনি হৃদয়োপরি বজ্রক্ষেপ সহ্য করিতেও অকুণ্ঠিত-চিত্ত। কবিবর রাজকৃষ্ণ প্রকৃত সহৃদয়ের ন্যায় বলিয়াছেন—

"সরযূ গো, কুল কুল রবে
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি-ভ্রাতৃস্নেহ-কথা
বহি' তুমি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে
শুনাইয়া যাও যত ভ্রাতৃদ্বেষিগণে।"

আমরাও তাঁহার সহিত এক প্রাণ হইয়া কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন রাম-লক্ষ্মণের এই ভ্রাতৃ ভক্তি, এই ভ্রাতৃ-স্নেহের কথা বায়ুভরে দিক্ দিগন্তে, দেশ বিদেশে প্লাবিত হয়, আর ভ্রাতৃদ্বেষী নরকুঠারগণ তাহা শিক্ষা করিয়া চরিত্র সংশোধনে ও পৃথিবীতে শান্তিসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়।

মাতৃভক্তি।—এই মায়াময় সংসারে মা ছাড়া আর সর্ব্বার্থসার সামগ্রী নাই; সম্পদে, বিপদে, সুখে দুঃখে, সহানুভূতি প্রকাশ

করে, সংসারে মা'র মত আর কেহ নাই। প্রাকৃতিক নিয়ম বশে যখন ইহসংসার দেখিবার জন্য জরায়ু মধ্যে স্থান লইলাম, তখন হইতেই মা অসহ্য জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, মা'র আহার বিহারের অনাচারে আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল; যখন সেই মায়া-মোহের অতীত অখিল সুখের আধার মাতৃজঠর হইতে ভূতলে পড়িলাম, মায়াপাশে স্ব-ইচ্ছায় জড়াইয়া গেলাম, তখনও সেই মাতৃক্রোড়,—মাই সেই মূর্ত্তিমতী মায়া। বয়সের প্রস্ফুটনে যখন বাক্-শক্তির প্রথম প্রস্ফুটন হইল, তখনও সেই অস্ফুটন আধ আধ 'মা' শব্দ মুখে;—ইহ জীবনের গতি পর্য্যালোচনে মাই একমাত্র সহচরী। আবার যখন মুমূর্ষু অবস্থা, দারুণ আধি-ব্যাধিতেই সকল শরীর নিপীড়িত, সংসারের আশা ভরসা চিরদিনের জন্য গমনোন্মুখ তখনও একবার শান্ত মনে, উদাস প্রাণে, কাতরস্বরে বিশ্বজনীন 'মা!—'শব্দ মুখে ডাকিয়া সেই যন্ত্রণার ক্ষণিক অবসান হয়। পুত্র, কলত্র, ভাই বন্ধু অধিক কি জন্ম-দাতা পিতাকেও বিস্মৃত হইতে পারি, ঈশ্বরের নাম মুখে না আনিতে পারি, কিন্তু অনন্ত প্রেম পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাসের মূল নিদান, 'মা' শব্দ ভুলিতে পারি না। ইহ-সংসারে আসিয়া যে মাতৃ-স্নেহ সুখ ভোগ করিতে না পারিল, মার অমৃতময় স্নেহ প্রস্রবণের সুশীতলতা যে না অনুভব করিতে পারিল, একবার প্রাণ ভরিয়া মা মাখা মাতৃ ভাষায় "মা" বলিয়া ডাকিতে না পারিল, তাহার জন্ম ধারণই বৃথা, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র,-গৃহ তাহার পক্ষে ভীষণ অরণ্য সমান! আর যে সেই স্নেহের বশ-বর্ত্তী হইয়া মার মনস্তুষ্টি সাধনে প্রাণপণে যত্ন না করিল, অপরিশোধ্য মাতৃ-ঋণের জন্য তাহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশে স্বইচ্ছায় বঞ্চিত থাকিল, সে মনুষ্য নামের অ-যোগ্য, তাহার ন্যায় নৃশংস ইহসংসারে আর নাই, তার মুখদর্শনেও পাপ আছে,—সে সং-সার-কাননে নররূপী দুর্দ্দান্ত পিশাচ। হিন্দুর গৃহে মা উপাস্য দেবতা; মার বিমলা-নন্দদায়ী দেবভাবে মত্ত হইয়া, মার পবিত্র পাদোদক পান করিয়া সে ইহসংসারে স্বর্গ সুখে সুখী, তাহার সহস্র পাপ তাহাতে বিনষ্ট। পবিত্র রাম চরিতে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেদীপ্যমান। "জননী * * * স্বর্গাদপি গরীয়সী" শিক্ষা দিয়াই রঘুকুল কেশরী রামচন্দ্র বিষ্ণুর অংশত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র; কোমলমতি লব-কুশও মাতৃ-পরায়ণের একশেষ। মাতৃ নাম গানে, মাতৃচরণ-ধ্যানে, তাহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়; আমরা লবের মুখে শুনিয়াছি—

"মাগো! যবে খেলি বনস্থলে,
ক্ষুধায় আকুল হইলে মা দুইজনে,
ভাবি নয়ন মুদিয়ে পা দুখানি তোর,
যায় ক্ষুধা দূরে,
প্রাণ ভরে ডাকি মা মা ব'লে,
খেলি পুনঃ হইয়ে সবল।"

যখন রামচন্দ্র লব-শরে বিপর্য্যস্ত হইয়া, বিক্রমের শেষ পরিচয়, হুংকার পাশুপত বাণ লবের উপর নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত, তখনও শিশুর অন্য কোন সহায় নাই, কেবল একমাত্র সম্বল,—

"অক্ষয় কবচ বুকে মার নাম ধ্যান।"

আবার যখন সেই শরের গতি-রোধ-শক্তি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া লব নিতান্ত

ভয়োৎসাহ, তখন কুশ সময় বুঝিয়া ভ্রাতার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিল—

"কেন দাদা হ'তেছ চঞ্চল ?
আমাদের মার নাম বল,
যুড়ি বাণ মার নাম স্মরি।"

বাস্তবিক, অটুট বিশ্বাসে, অচলা ভক্তিতে, সেই মহামন্ত্র জপ করিয়া লব যে ব্রহ্মজাল বিস্তার করিল, দুর্ব্বার দশাস্য বিজয়ী রামচন্দ্রও আর তাহা এড়াইতে পারিলেন না। প্রগাঢ় মাতৃভক্তির জলন্ত নিদর্শন ইহাপেক্ষা আর কি হইতে পারে? পাশ্চাত্য সভ্যেরা এই পবিত্রতাময়ী মাতৃ-মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন না. স্বয়ং কার্য্যক্ষম হইলে বন্য পশু পক্ষীর ন্যায়, আর মাতৃ-সাহায্য গ্রহণ করেন না, 'পিতার পরিবার' জ্ঞানে তাঁর গৃহসীমা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। আমাদিগের সমাজের অনুকরণপ্রিয় অনেক মহাত্মারাও আজকাল ঐ ভাব ধারণ করিতেছেন;— বাহিরে স্বদেশানুরাগের ধ্বজা তুলিয়া দিগন্তব্যাপী বক্তৃতার রোল তুলিতেছেন, সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু গৃহে পলিত কেশা, গলিত-বেশা, বৃদ্ধা জননী একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িতা,— তাঁর দিকে লক্ষ্য নাই। এই সকল কীর্ত্তি-ধ্বজীরা তাপস শিষ্য শিশু লব কুশের নিকট মাতৃ-মর্য্যাদা শিক্ষা করুন, পতিতা ভারত মাতার বিক্ষত বক্ষে এক বিন্দু তৈলসিঞ্চন করুন।

দাম্পত্য-প্রেম।- সংসার বন্ধনের গ্রন্থি—সংসার-সুখের একমাত্র আকর্ষণী শক্তি। পুরুষ-প্রকৃতির অটুট মিলনেই বিশ্বসংসার পরিচালিত;—একের অভাবে অন্যের অবস্থান অসম্ভব। শ্রদ্ধায় ভীতি, ভক্তির প্রীতি, প্রেমের বিলাসিতা, সেবার একাগ্রতা—একাধারে সাম্য বৈষম্যের এমন মোহন মিলন আর কোথাও নাই। পবিত্র হিন্দু সংসারে এই দেবভাব বিদ্যমান। শাস্ত্রের শাসনে, সমাজের বন্ধনে, পিতার শিক্ষায়, গুরুর দী কৃতজ্ঞতার আকর্ষণে, কর্ত্তব্যতার প্রবল জ্ঞানে, হিন্দুরমণী চিরদিন স্বামীর আশ্রিতা. স্বামী-সেবাই তাহার জীবনের সার ব্রত, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। সাম্যপ্রিয় প্রেমিকের নিকট এই আশ্রয়-আশ্রিত ভাব, এই অনাবিল নিঃস্বার্থতা দুর্লভ। প্রেমের বিনিময়ে সুখ নাই, সৌন্দর্য্য নাই, পবিত্রতা নাই—সে কেবল ব্যবসার চাতুরী মাত্র। "ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসি না। আমার এই প্রকৃতি,—তোমা বই আর জানি না।"—এই স্বার্থশূন্য, একাগ্রতাপূর্ণ, ভালবাসাই প্রেমের উৎকর্ষ। জনকনন্দিনী, শ্রীরামরমণী সীতা এই নিঃস্বার্থ অনুরাগময়, পতিভক্তি-পরায়ণ, স্ত্রী চরিত্রের আদর্শ। সুখে দুঃখে স্বামীর প্রতি সমান অনুরাগ, সমান ভক্তি, সীতা ব্যতীত অন্য নারী চরিত্রে দুর্লভ। বিনা অপরাধে, পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায় বনবাস দেওয়ার পরেও, শ্রীরামের নির্ম্মম ব্যবহারের নিমিত্ত সীতা কিছুমাত্র দ্বিধা-চিত্ত, কর্ত্তব্যপালনে বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন;—স্বামীর প্রতি তখনও অটল ভক্তি, কেবল নিজ মন্দ ভাগ্যের জন্য আপনার উপরেই ঘৃণা। যখন আদর্শ দেবর লক্ষ্মণ তাঁহাকে বনবাসিনী করিয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন রঘুনাথ পদে সীতার শেষ নিবেদন—

"যেন জন্ম জন্মান্তরে
হয় মম রাম সম স্বামী,
সীতা নারী না হয় তাঁহার।"*

স্বামীর গুণগান শ্রবণে সতীর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। রাজ্য ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া, স্বামী সহবাস সুখে বঞ্চিতা হইয়া, পতিপ্রাণা জনক-নন্দিনীর কোন ক্লেশ নাই;—বাল্মীকির আশ্রমে লব-কুশের শিশুমুখে রাম কাহিনীর শ্রুতি-বিমোহন গান শুনিয়া তাঁর সকল যন্ত্রণার অবসান। সদাই মুখে—

"গাও দুটী ভাই মিলে রাম-গুণ গান।"

একদা রাম-গুণ গান করিতে করিতে, সীতার বর্জ্জন প্রসঙ্গে, কুশ রামের পাষাণ-হৃদয়তার জন্য তাঁর প্রতি সন্দিহান, তখন মূর্ত্তিমতী সতী সন্তানকে অকপটে বুঝাইলেন—

"ওরে দুঃখিনী-সন্তান!
রাম কভু নহে ত পাষাণ;—
দয়াময় ভুবন-পাবন তিনি;
অভাগিনী জনক-নন্দিনী সীতা।"

বহুকাল পরে রাম-অনুচর হনুমানের মূর্ত্তি-দর্শনে পতিপ্রাণার অন্তরে রামের স্মৃতি প্রবল হইল। লব-কুশের মুখে সমর-বিজয়ের কথা শ্রবণে, এবং লব-করে শ্রীরামের অঙ্গ-ভূষণ ও কুশ-হস্তে হনুমানের বন্ধন দর্শনে সীতার অন্তরে অকস্মাৎ রাম-বিয়োগ আতঙ্ক উদয় হইল, সীতা অমনি মোহিতা। সীতার অন্তর-দর্শী হনুমান সেই মোহাপনোদনের মহা মন্ত্রৌষধি জানিত, সে বলিল, —"রাম-নাম কহ দোঁহে জানকীর কাণে, নহে প্রাণ ত্যজিবে জানকী।"

বহুদিন অদর্শনের পর, বনবাসের কঠোর যন্ত্রণা-ভোগের পর, স্বামীর চরণ দর্শনে সতীর হৃদয় আশা ভরে উৎফুল্ল। কিন্তু মন্দভাগিনী তখনও নাথের আলিঙ্গন-সুখ-লাভে সুখী হইতে পারিলেন না,—তখনও নাথের মুখে অগ্নিপরীক্ষার আজ্ঞা। পতিব্রতা বৈদেহী তাহাতেও বিকলচিত্ত নহেন;—দুঃখিনীর ধন দুটীকে "দয়ার নিদান রবি-কুল-রবিকরে" অর্পণ করিয়া অকুতোভয়ে পরমানন্দে পতির সমক্ষে মানব-লীলা সম্বরণ করিতে প্রস্তুত। তখনও স্বামীপদে অন্তিম প্রার্থনা—

"হে প্রভু! জন্ম জন্মান্তরে
যেন পাই (হে) তোমা সম স্বামী।
যেন সীতা নাম কেহ নাহি ধরে ভবে।"

স্বামীর সোহাগে যার নিরহঙ্কার, স্বামীর বিরাগে যে নির্ব্বিকার, স্বামীর নাম শ্রবণে যার সুখোদয়, স্বামীর অভাবে যার জীবন ক্ষয়, সেই মূর্ত্তিমতী সতী নারীরূপা ভগবতী। পতি ভক্তির ধ্রুব বিশ্বাসে সতীর ইচ্ছা শক্তি (will power) নিঃসংশয় কার্য্যকরী। যখন দুঃখিনী জনক-নন্দিনীর অঞ্চলের নিধিদুটী বাল্য-খেলা ছলে বনে বনে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগের অন্য কোন রক্ষক নাই—দুঃখিনীর অমোঘ আশীর্ব্বাদই তাহাদিগের একমাত্র রক্ষা-কবচ। সীতা ধ্রুব বিশ্বাসে বলিলেন—

"—যদি কেহ হয় বাদী,
প্রহারে দুঃখিত-সুতে,
ফিরিবে না দেশে আর;
পরাজয় হ'বেন শ্রীরাম,
যদি তিনি বাদী হ'ন রণে। সতী আমি,—
যদি পূজে থাকি ভগবতী কায়োমনে,
পতি পদে থাকে মতি,
মিথ্যা কভু না হবে বচন।"

বাস্তবিক সতীর বচন মিথ্যা হইল না। সীতার বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রও শিশু হস্তে পরাভূত হইলেন।

অভিমান প্রেমের অঙ্গ,—অনুরাগের পরিমাণ দণ্ড! যে প্রেমে অভিমান নাই, সে প্রেমানুরাগ অগাধ অতলস্পর্শী নহে।

জল তলে মৃৎপিণ্ড বিক্ষিপ্ত করিলে তাহার গভীরত্ব নির্ণীত হয়;—প্রেমের প্রস্রবনে অভিমানের বাধা ঠেকিলে তাহার প্রবলতা বুঝা যায়। পতিব্রতা জানকীর প্রেমেও আমরা সুবিমল অনুরাগ-জনিত অভিমানের ছায়া দেখিয়াছি। বন-বিহারিণী জানকী-সঙ্গিনী সরলতাময়ী অলিক্ষরা যখন, দুঃখ কথা প্রসঙ্গে, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হওয়ার সম্বাদ সীতা সমীপে জ্ঞাপন করিল, এবং তদুপলক্ষে সীতাকে লইতে অনুচর না আসার জন্য দুঃখ করিতে লাগিল, তখন অভিমানিনীর অন্তরাকাশ অভিমান মেঘে আচ্ছন্ন হইল, তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একা যজ্ঞ করিবেন রাম?—
কিম্বা কোন ভাগ্যবতী সতী
পাইয়াছে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পতি?"

অলিক্ষরার মুখে এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া সেই মেঘ আরো ঘোরতর রূপ ধারণ করিল, সীতা সমধিক ঔৎসুক্যের সহিত পুনরপি কহিলেন—"কহ বিধুমুখি,
কোন্ ভাগ্যবতী ব'সেছে রামের পাশে?"

তখন অলিক্ষরার মুখে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা-গঠিতা স্বর্ণ-সীতার বার্ত্তা শ্রবণে সে মেঘ কাটিল, প্রাবৃটান্তে শারদ কৌমুদীর সুবিমল রশ্মি দেখা দিল। অভিমানিনী বুঝিলেন, তাঁহার নিশ্চল, নিস্পন্দ, প্রশান্ত প্রেম-প্রবাহে শ্রীরামচন্দ্রই প্রকৃত কর্ণধার। তিনি উল্লাস ভরে কহিলেন—

"জন্ম জন্মান্তরে শ্রীরাম চরণে
যেন চিত রহে অচলিত।"

তিনি বুঝিলেন, রামচন্দ্রের প্রেমানুরাগের ইয়ত্তা নাই; রাম বিহনে তিনি যাদৃশী কাতরা, সীতা-বিহনে রামচন্দ্রও ততোধিক ব্যাকুল। তিনি সখিকে কহিলেন—"সখি কাঁদি নাই আমা হেতু—
দয়াময় রাম,
না জানি কাঁদেন কত দাসীর বিহনে।"

বলিতে বলিতে রামের অলৌকিক অনুরাগের পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার মনে প্রবল হইল, তিনি একে একে সব কথা সখীকে শুনাইলেন, দর দর ধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন এহেন করুণা-সাগরে রাম কোথা আর কোথায় তাঁর সীতা—এই চিন্তাই তাঁহার মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। রামসীতার এই পবিত্র প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়, ঘোর অপ্রেমিকের অন্তরেও অনুরাগ সঞ্চার হয়, পাপাচারিণী বারবনিতার মনেও পবিত্রতার উদয় হয়। ধন্য অমৃত-প্রসবিনী বাল্মীকির লেখনী!—ধন্য পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগরের অনুবাদ কৌশল!—ধন্য গুরু-শিষ্য গিরীশচন্দ্রের ছন্দোময় লিপিচাতুর্য্য!

ক্ষত্রির বিক্রম।—ক্ষত্রিয়ের তেজ, সাহস, ক্ষত্রিয়ের বিক্রম ভুবন-বিখ্যাত। আবাল-বৃদ্ধ বণিতা প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের শিরায় ২, ধমনীতে২, ক্ষত্রিয়-শোণিত প্রবহমান। শৈশবের ক্রীড়ায়, যৌবনের জীব লীলায়, বৃদ্ধের ভগ্নদশায়, কামিনীর কমনীয়তায় ক্ষত্রিয়ের অদম্য উৎসাহ, অকুতো সাহস সমভাবে বিরাজমান। বৈদেশিক ঐতিহাসিকের লেখনীতে একথা যতই বিকৃত হউক,—রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, রাজপুতের বীরত্ব,প্রতাপচন্দ্রের অসীমসাহসিকত্ব জগতে চিরদিন অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিখ্যাত সূর্য্যবংশ এই ক্ষত্রিয়বংশের আদি, লোকাভিরাম রামচন্দ্র সেই বংশে অবতংস। তাঁহার অসাধারণ তেজোবিক্রমের পরিচয়

লঙ্কা-সমরেতিহাসের পত্রে পত্রে বর্ণিত। রণক্ষেত্র তাঁহার ক্রীড়াভূমি, রণপাণ্ডিত্য তাঁহার বিলাস-সামগ্রী, রণকৌশল তাঁহার অবকাশ রঞ্জক, রণাকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য-নিবারক।

সীতার বনবাসের পর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান ইহার অন্যতম নিদর্শন। 'লন্ টেনিসের' ছুটাছুটী বা বিলিয়ার্ডের হুটাহুটী, 'পিয়েনো'র পিউপিউ-ধ্বনি বা 'ক্লাব-ডিনারে' গৃহ-রমণী, তাঁহার সীতা-নির্ব্বাসন-জনিত চন্ন-মতি সুস্থির করিবার উপকরণ নহে। "ধরিবে যজ্ঞের ঘোড়া বীর-পুত্র যেই" বলিয়া ঘোরা ছাড়া, তাঁহার প্রবল পরাক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী অনুসন্ধান করা, এই হৃদয়াগারের অন্তস্তলস্পর্শী আরাব-বিদূরক বিলাস-ক্রীড়া। বাস্তবিক বীর-পুত্র-হস্তেই তাঁহার ঘোড়া ধরা পড়িয়াছিল, তাহার সমুচিত ফলও ভোগ করিতে হইয়াছিল। সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণদান ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম—স্পর্দ্ধার বিষয়। শিশুর সমরে বীরভ্রাতা নিধন হইল, বীর সৈন্য প্রাণ দিল, নিজেরও 'শরভঙ্গ-দণ্ড তূণ শূন্য প্রায়, পাশুপত অস্ত্র ব্যর্থ, প্রাণরক্ষারও অল্প ভরসা, তথাপি রামচন্দ্রের মুখে—

"পৃষ্ঠ কভু না দিব সমরে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।"

বীর পুত্র লবের মুখেও সেই একই কথা। লব যখন রামের ব্রহ্মজালে বদ্ধ এবং সেই জাল হইতে মুক্ত হওয়ার পক্ষে সন্দিগ্ধ, তখন লব প্রবল নৈরাশ্যের সহিত কুশকে বলিল—

"বল জননীরে, পৃষ্ঠ নাহি দি'ছি রণে,
পড়িয়াছি সম্মুখ সমরে।"

লব-কুশের শিক্ষা-ভার উপযুক্ত গুরুর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি অদ্ভুত সংসার-তত্ত্বজ্ঞ,—ক্ষত্রিয়-পুত্রের পক্ষে সমর-কৌশল শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, সে কারণ অন্যবিধ শিক্ষার সঙ্গে তিনি লবকুশকে যুদ্ধনীতিও শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার ফল এই, অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরা পর্ব্বে দেদীপ্যমান। লব কুশ যে কালক্রমে অসাধারণ যুদ্ধ-বিশারদ হইবে, সসৈন্য রামচন্দ্রকেও পরাভব করিতে পারিবে, তাহা আমরা তাহাদিগের শৈশব-সংগীতেই বুঝিয়াছিলাম। উল্লাস ভরে মিয়া-মল্লারে যখন তাহাদিগের শিশু মুখে শিশুগান শুনি—

"ধরি ধনু করে শরে শরে,
চল বাঁধিগে সরযু ধারাগুলি।
চল গগনে পবনে রোধ করি,
শত শত কত বাঁধি করী,
চল গিরি তুলি, মাখি রণধূলী।"—

তখন এই দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালীর প্রাণেও ক্ষণেক নির্ভীকতার কিরণ পড়ে, সাহসের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, কি এক অব্যক্ত তেজে হৃদয় মাতোয়ারা হইয়া উঠে।

সীতার বনবাসের সকল কথা বলা হইল না। ইহার ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে, এমন রস যে, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। গিরীশ বাবু তাঁহার পুস্তকে চরিত্র বিন্যাসেও নিষ্ফল হয়েন নাই,—সরযু তীরে শত্রুঘ্ন সমীপে দুই জন দূতের প্রাকৃতিক পার্থক্য, যজ্ঞস্থলে সভাসদ-বেষ্টিত শ্রীরাম সমক্ষে লব-কুশের বালকত্বের ক্রম-বৈষম্য ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, যেন প্রত্যেক রঙ্গালয়ে এই কারুণ্য রস-পরিপূর্ণ দৃশ্যকাব্য খানি অভিনীত হয়।

গিরীশবাবুর যত্নে "ন্যাশন্যাল" ও "ষ্টার

থিয়েটারে” এখানির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু এক কারণে আমাদিগের নিতান্তক্ষোভ আছে। নির্ম্মল-স্বভাবা সীতা, সরলতার প্রতিকৃতি অলিক্ষরা বা সূর্য্যকুল-শিশু লব-কুশের অভিনয় কপটমতি বারবিলাসিনীর দ্বারা সম্পাদন, দর্শকের চিত্তাকর্ষক হইলেও, আমাদিগের নিকট নিতান্ত রুচি বিরুদ্ধ; অভিনয়কালে সরলতার পরিবর্ত্তে চটুলতা, মধুর হাসির পরিবর্ত্তে বিলাস রাশি, মৃদু মন্থর মধুরিমার পরিবর্ত্তে অপরূপ চলন-ভঙ্গিমা দর্শনে আমরা বাস্তবিক মর্ম্মাহত হই,—স্বর্গে নরক, সুধায় গরল, কুসুমে কীট ভাবিয়া আমরা দারুণ ভয় পাই। সীতার বনবাস গ্রন্থের আলোচনাই আমাদিগের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাহার অভিনয়-প্রসঙ্গে অধিক বাক্যব্যয় করিতে আমরা বিরত থাকিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

মনের কথা।

প্রাণময়ী প্রিয়দেবি! কত দিন হায়
ভাবিয়াছি একদিন বলিব তোমায়!
কিন্তু প্রিয়ে কত দিন
বৎসরে হইল লীন,
বলিব বলিব করি গেল সমুদায়!
শত যত্নে নিরবধি
শত অন্বেষণে যদি
মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত সেই নাহি পাওয়া যায়,
যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে
সে মুহূর্ত্ত নাহি থাকে
এ দগ্ধ জীবনে দেবি হায় হায় হায়,
বলনা কেমনে তবে বলিব তোমায়?

১

বল তবে, বল দেবি বলিব কেমনে,
এত যদি থাকে বাদ বিধাতার মনে?
রহিল জন্মের মত
সে ‘আশা’ বাসনা যত
ডুবিয়া পাষাণ বুকে অস্থি আচ্ছাদনে!
অবনীর গর্ভগত
অনল সিন্ধুর মত
প্রলয়ের মহাবহ্নি রহিল গোপনে,
ভাঙ্গিতে চূরিতে বুক ঘোর ভূ-কম্পনে!

২

রহিল জন্মের মত;—মিলিল না আর—
সে পুণ্য অমৃত যোগ জীবনে আমার!
কত যে ধরিয়া পায়
কাঁদিয়াছি হায় হায়
সরলা আছে কি আজি স্মরণে তোমার?
উন্মত্ত—ক্ষিপ্তের মত
আকুল আগ্রহে কত
টানিয়া আনিয়া বুকে করি হাহাকার
মনে আছে—চুম্বিয়াছি চরণ তোমার?

৩

সত্যবটে এ জীবনে সে মুহূর্ত্ত হায়
পেয়েছিনু বহুদিন তোমার দয়ায়!
কিন্তু কি বলিব দুখে
তোমারে লইলে বুকে
শীতের সুদীর্ঘ নিশি তিলেকে পোহায়!
চুম্বিতে ও বিম্বাধরে
রবি ওঠে রাগ ভরে
হেরিতে বদন-শশী শশী অস্ত যায়!
সতাই তোমার কাছে
সময়ের পাখা আছে
বলনা কেমনে প্রিয়ে বলিব তোমায়,
বলি বলি করি নিশি ভোর হয়ে যায়!

বলনা কেমনে দেবি বলিব তোমায় ?
কি জানি তোমাতে আছে
গেলেই তোমার কাছে
নয়ন নিমেষ ভোলে, বচন জিহ্বায় !
তোমারে লইলে কোলে
হৃদয় আপনা ভোলে
কেমন মধুর এক মদের নেশায় !
বলনা কেমনে দেবি বলিব তোমায় ?

৫

আজ—
এই যে পর্ব্বত তলে এই গারোদেশে,
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে !
আসিয়াছি দেশ ছাড়ি
তথাপি তিষ্ঠিতে নারি
সেই মোহ—সেই মূর্চ্ছা স্বপন আবেশে !
সেই যেন গলাগলি
মনে লয় বলি বলি,
বলিতে ভুলিয়া যাই মনে নাহি আসে !
তেমনি অবাঙ্ মুখে
চেয়ে থাকি শশিমুখে,
কিন্তু গো জাগিয়া দেখি সেই নিশি শেষে,
তুমি স্বর্গে—দেবপুরে,
আমি মর্ত্ত্যে—বহুদূরে
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে,
রয়েছি পর্ব্বত তলে এই গারো দেশে !

৬

দেবি !
কোথা পাব তব সম সুহৃৎ সুজনে,
প্রাণের অধিক প্রিয়
হৃদয়ের পূজনীয়
প্রেমের প্রতিমা হেন প্রিয় দরশন ?
ভূতলে স্বর্গের ছায়া,
মূর্ত্তিমতী দয়া মায়া,
মলিন পরের দুখে নলিন নয়ন !
সরল সত্যের চেয়ে,
স্বভাবে বালিকা মেয়ে,
বিনোদ বদন বিধু ভুলায় ভুবন !
পুণ্যময়ী সাধুশীলা,
লাবণ্যের নবলীলা,
এ জনমে মিলিবেনা তোমার মতন,
রহিল মনের কথা মনেই গোপন !

৭

দেবি !
এ জীবনে এস্বপ্ন কি ভাঙ্গিবে না আর ?
গিয়াছে প্রাণের আশা, গিয়াছে সকলি,
ভালবাসা আর নাই
পুড়িয়া হয়েছে ছাই,
হয়েছে নন্দন বন মহা মরুস্থলী !
সে ভস্ম মাখিয়া গায়
আসিয়াছি হায় হায়,—
উদাসী সন্ন্যাসী বেশে আসিয়াছি চলি !
তবু দেখি বুকে আঁকা,
তবু দেখি প্রাণে মাখা,
জাগ্রতে নিদ্রায় দেখি সেই গলাগলি !
সেই মোহ—সেই স্বপ্ন যেন 'বলি বলি।'

৮

দেবি !
দেবের হৃদয়ে কিগো বোঝ এ সকলি,
বোঝ এই মোহমূর্চ্ছা কি যে 'বলি বলি' ?
প্রাণের আগ্নেয় আশা
নীরব আগ্নেয় ভাষা
অদেখা আগুনে কেন চিরদিন জ্বলি,
বোঝ কি এ অগ্নিকাণ্ড—বোঝ কি সকলি ?

৯

দেবি !
দেখিয়াছ সন্ধ্যাকালে, গগণের নীল ভালে
উজলি উঠিলে রূপে নব তারাবলি,
আহা সে তারার পানে
কেমন আকুল প্রাণে

নীরবে শশাঙ্ক চেয়ে থাকে গো কেবলি!
বলিতে পারেনা নিত্য,
বিষাদে বিষণ্ণ চিত্ত
পড়েছ বিধুর বুকে কলঙ্কের কালী
অঙ্গার অক্ষরে লেখা কি যে 'বলি বলি'?

১০

দেবি!
দেখিয়াছ উপবনে প্রাণ দিতে বলি?
দেখেছ ফুলের কোলে
বসিয়া আপনা ভোলে,
মনের কথাটী আহা ভুলে যায় অলি!
কোথা গুঞ্জরণ তার
কোথা 'গুণ্ গুণ্' আর?
'আগুন্! আগুন্!' বলি শেষে যায় চলি!
সরলা! শুনেছ কাণে
সে করুণ ক্ষীণ তানে
অনন্ত শোকের সিন্ধু উঠে যে উছলি,
দিগন্ত ভাসায়ে যায় 'বলি বলি' বলি?

১১

দেবি!
দেখিয়াছ দগ্ধবক্ষ জলদ আবলি?
হারায়ে বিজলী হার
কি গম্ভীর হাহাকার,
কি গম্ভীর বজ্রনাদ ধরা টলমলি—
শুনেছ সে বজ্রভাষা,
দেখেছ আগ্নের আশা
অনন্ত আকাশে আহা উঠিয়াছে জ্বলি?
শুনেছ সে বজ্রনাদ—'বলি বলি বলি'?

১২

যদি—
শুনেছ দেবের কাণে, বুঝেছ দেবের প্রাণে,
দেবতার আঁখি দিয়ে দেখেছ সকলি,
কেন তবে চিত্ত হায়
মোহ যায়—মূর্চ্ছা যায়
জাগ্রতে নিদ্রায় দেখি সেই গলাগলি,
কেন গো আকুল চিত্ত—'বলি বলি' বলি?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

আর্য্যদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র। (প্রথম প্রস্তাব)

জ্ঞান ও ধর্ম্মের বাল্য-লীলাভূমি, সভ্যতার আদি প্রস্রবন, শৌর্য্য বীর্য্য গৌরবের প্রথম প্রবাহস্থল ভারতভূমিতে আর্য্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্বন্ধে কীদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিত তাহা অবগত আছেন। আর্য্য সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণার্থ আর্য্যদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতির জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম কেবল মাত্র ভারতবর্ষে নিবদ্ধ ছিল না। অতি প্রাচীন কালেই তাহা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ ও সায়ামে প্রবেশ করিয়া। তথাকার লিপিবদ্ধ নিয়মাবলীতে পরিণত হইয়াছে। ইংরেজগণ ভারতে আধিপত্য লাভ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ধর্ম্মপ্রবণ ভারতীয় হিন্দুগণের অন্তরে ও বাহ্যিক কার্য্যকলাপে আর্য্যদিগের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার এতদূর বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। তথাপি যতদূর সম্ভব বিদেশীয় রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। দেশীয় ভাবের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় ভাব ও চিন্তা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া, ধর্ম্মগতপ্রাণ

ভারতীয় হিন্দুদিগের মনে মহা আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার করিল। ইংরেজ রাজ পুরুষ-গণ ইহা অনবগত ছিলেন না। দায়াধিকার ও দত্তকাদিকার সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাবলী সমূলে উচ্ছেদ করিতে সাহসী হইলেন না। বিচারালয়ে হিন্দুধর্ম্মাভিজ্ঞ জজ পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয়া উক্ত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়া বিচারপতিদিগের সহায়তা করিতে লাগিলেন। নানাস্থানের পণ্ডিতবর্গ যথেচ্ছভাবে বিরোধী ব্যবস্থা দেওয়াতে, ইংরেজ বিচারকগণের বিচারে অর্থী প্রত্যর্থী পরিতুষ্ট লাভ করিতে পারিত না। উক্ত বিষয়দ্বয়ে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম প্রণেতৃগণের প্রকৃত মত অবগতির জন্য ইংরেজ রাজপুরুষ-গণ যত্নপর হইলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থ প্রয়োজন হইল। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা না জন্মিলে আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানিবার উপায় নাই দেখিয়া, কলিকাতা প্রধানতম বিচারালয়ের অধস্তন বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ নানা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর সার উইলিয়াম জোন্স মহোদয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। ইহা হইতেই বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইতে আরম্ভ হইল এবং উপমিতিক ভাষাবিজ্ঞান সৃষ্ট হইল। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতি পূর্ব্বে "বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা"ভিধেয় প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে। মহামতি জোন্স মহোদয়ের প্ররোচনায় সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয় কর্ত্তৃক বিবাদভঙ্গার্ণব বিরচিত হয়। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কোলব্রুক মহোদয় কর্ত্তৃক ইহা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া "কোলব্রুক সাহেবের ব্যবস্থাগ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব, এবং দায়ক্রম সংগ্রহ ভিন্ন বিবাদভঙ্গার্ণব অপেক্ষা কোন গ্রন্থই অধিকতর প্রামাণিক নহে। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থ হইতে অনেক অংশ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে নানা শাস্ত্রকারদিগের বিরোধী মত সকল উপস্থাপিত হইয়াছে। বিরোধী মত সকল অতি পরিষ্কাররূপে খণ্ডন করিয়া দায়ভাগের প্রাধান্য সংস্থাপন পূর্ব্বক গ্রন্থকার স্বকীয় অসামান্য বিদ্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাদভঙ্গার্ণব অমুদ্রিত অবস্থায়ই রহিয়াছে। কিন্তু তাহার ইংরেজী অনুবাদ দেশ বিদেশে প্রখ্যাতি লাভ করিয়া অনুবাদক কোলব্রুক সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে!!! আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানৈশ্বর্য্য স্বদেশহিতৈষিতার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিদর্শন আর কি হইতে পারে!! আমাদিগকে শত ধিক্!!—বিবাদভঙ্গার্ণব বিরচণের পর হইতেই দেশীয় জজ পণ্ডিতদিগের প্রভুত্ব খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয়।

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের কি কি গ্রন্থ এক্ষণেও বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তাহাদের প্রণেতা-গণের সময়াদি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে—তাহাই প্রকটন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মনু আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের অগ্রণী। তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কাঠক ও তৈত্তিরীয় শাখাদ্বয়েই উল্লিখিত আছে যে, মানবধর্ম্মশাস্ত্র অধর্ম্ম ও অনাচারের ঔষধ সদৃশ। যাস্কাচার্য্য প্রণীত নিরুক্তে, সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে, গৌতম

বৌধায়ন-বশিষ্ঠ-নারদ-বৃহস্পতি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রে, মহাভারতে, বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতায়, শূদ্রকরাজ-প্রণীত মৃচ্ছ-কটিক নাটকে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, ভারতীয় পুরাতত্ত্বের প্রধানতম শরণি তাম্র শাসনাদিতে—সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ হইতে মনুর প্রাধান্য সংকীর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি, সুদূরবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ, জাবা ও বালিদ্বীপেও মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা অবনত মস্তকে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রই মনুপ্রোক্ত বলিয়া জনপ্রবাদ আবাহমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সুদূর জাবা ও বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যাদির প্রচারও কিয়ৎ পরিমাণে হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতের কয়েক পর্ব্ব বালিদ্বীপে পাওয়া গিয়াছে *। ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের সকলের অগ্রে মনুর নাম গৃহীত হইয়া থাকে।

মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরা।
যমাপস্তম্ব-সংবর্ত্ত-কাত্যায়ন-বৃহস্পতি॥
পরাশর ব্যাস শাঙ্খলিখিত দক্ষ-গৌতম-
শাতাতপ-বশিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

স্কন্দপুরাণে ও নারদ সংহিতায় মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ সংস্করণের কথা উল্লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণে মনুর চারি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির-ভাষ্য ও টীকাকার এবং সংগ্রাহকগণ বৃদ্ধ ও বৃহৎ মনুসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের সর্ব্বত্র প্রচলিত মনুসংহিতা মনু-শিষ্য মহর্ষি ভৃগু কর্ত্তৃক উক্ত বলিয়া সংহিতার প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে অনেকানেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্ত্তমান মনুসংহিতাকে অপ্রামাণিক বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সংহিতার অন্ততঃ অধিকাংশ যে প্রামাণিক, তাহার কতিপয় প্রমাণ অতঃপর প্রদত্ত হইবে। উহা ডাক্তর জলি মহোদয় সকৃত হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা † গ্রন্থে বিবৃত করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

নারদস্মৃতি ভূমিকায় মনু-স্মৃতির উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়াম জোন্স স্বপ্রণীত মনুসংহিতার ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় ইহা অনুবাদিত করিয়া সর্ব্বপ্রথম জনসমাজে প্রচারিত করেন।—

ভগবান্ মনু সর্ব্ববিধ প্রাণী ও দেবতাগণের হিতার্থ একলক্ষশ্লোকাত্মক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে ১০৮০টী অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেন। উহাতে ২৪টী প্রকরণ (বিষয়) ছিল। দেবর্ষি নারদ উক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ মনু হইতে শিক্ষা করিয়া মনুষ্যদিগের অধ্যয়নার্থ দ্বাদশসহস্র শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন। মহর্ষি নারদ উহা মার্কণ্ডেয়কে শিক্ষা দেন। মার্কণ্ডেয় হইতে ভৃগুপুত্র সুমতি তাহা শিক্ষা করিয়া, পুনরায় চারি সহস্র শ্লোকে উহা পরিণত করেন। কিন্তু বর্ত্তমান মনুসংহিতায় ২৬৮৫ টী শ্লোক মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

পণ্ডিতবর সার উইলিয়াম জোন্স মনুসংহিতা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান

* Weber's History of Indian Literature (1878), page 189.

† Dr. Jolly's Tagore Law Lectures (1883) page 45-48.

করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেক প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতকে মহামতি জোন্স সাহেবের এইমতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। তাঁহারা ভারতের প্রাচীনত্বকে বিলুপ্ত করিয়া অনেক বিষয়ে গ্রীসের ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত করিতে চান। তাঁহারা সায়নাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের ভাষ্য-বিকৃতি-টীকা প্রভৃতি সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া শুধু ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে বেদ উপনিষদাদির স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিতে চান। তাঁহারা ভারতের ভাষা, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়াও বেদাদির অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া স্ব স্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সভ্য জগৎকে চমকিত করিতেছেন। আর ভারতের কুসন্তানগণ নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধভাবে এই অসাধারণ অবমাননা অবনতমস্তকে সহ্য করিয়া আসিতেছে!! ধিক্ আমাদের সভ্যতায়, ধিক্ আমাদের পাণ্ডিত্যে, ধিক্ আমাদের মুখসর্ব্বস্বতায়, ধিক্ আমাদের হিন্দু জাতিকে!

মনুসংহিতা কোন্ সময়ে রচিত বা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রচলিত সংহিতা যে প্রামাণিক,তদ্বিষয়ে শংসয় হইতে পারে না। বৃহস্পতি * লিখিয়াছেন যে, মনুবিরোধী কোন স্মৃতির কোন ব্যবস্থাই প্রামাণিক নহে। ভগবান্ কাত্যায়নও মনুসংহিতা দৃষ্টে স্বপ্রণীত সংহিতা প্রণয়ণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। মহর্ষি নারদ প্রণীত স্মৃতিও মনুসংহিতা অবলম্বনেই লিখিত, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সংহিতাত্রয়ের কোন খানিই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নয় বলিয়া পণ্ডিতবর ডাক্তর জলি অনুমান করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় অতি প্রাচীন ব্যবস্থা গ্রন্থ সমূহ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সঙ্কলিত ও প্রণীত হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার ফুবার সাহেব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় প্রামাণিক ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসার এবং ধমথৎ (Damathat) মনুসংহিতা অবলম্বনে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়; নতুবা মনুসংহিতার সহিত তাহাদের নানাবিষয়ক সাদৃশ্য থাকিত না। সায়াম দেশীয় ব্যবস্থাবলী ধমথৎ অবলম্বনেই বিরচিত।—(৩) মনুসংহিতা বা মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বিষ্ণু স্মৃতির ন্যায় কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কাঠকশাখার ধর্ম্মসূত্র অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বৈদিক গৃহ্যসূত্র গুলিই সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল, ইহা নিঃশংসয়িতভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গৃহ্যসূত্র গুলিতে বেদচতুষ্টয়ের বিভিন্ন শাখাবলম্বীদিগের অনুষ্ঠিত যাবতীয় আচার ও সংস্কার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রগুলি সাম্প্রদায়িক আচারাদিতে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির অনুমোদিত রীতি, নীতি, ব্যবস্থা, আচারাদি ক্রিয়া কলাপ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব বর্ণের প্রতিপালনীয়।—(৪) হিমালয়ের পদাস্তে অবস্থিত কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র যে মনুসংহিতা সবিশেষ প্রচলিত ছিল ও আছে, ইহা মনুসংহিতার বহুসংখ্যক টীকা ও ভাষ্যকারগণের দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। অষ্টম হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত

* বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যংহি মণোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥ ইতি বৃহস্পতিঃ

অপ্রতিহত ছিল। প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু কুলতিলক রাজন্যবর্গের যত্ন ও উৎসাহে অনেকানেক ধর্ম্মশাস্ত্র বিরচিত ও সংগৃহীত হইয়া দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই অনেক প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকার ও বহুসংখ্যক ভাষ্য ও টীকাকার অভ্যুদিত হইয়া দাক্ষিণাত্যকে সবিশেষ রূপে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃতের ও আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন পুনরায় আবদ্ধ হয়, তখন দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত গ্রন্থাদি আর্য্যাবর্ত্তবাসী রাজন্য ও পণ্ডিতবর্গের একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া উঠে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাষ্ঠা-রাজ মদনপাল দাক্ষিণাত্য হইতে মেধাতিথির মনুভাষ্যের কতিপয় হস্ত লিখিত পুস্তক আনয়ন পুরঃসর, স্বকীয় সভাপণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্ট দ্বারা লুপ্তপ্রায় মনুভাষ্যের জীর্ণোদ্ধার সাধন করেন। কাষ্ঠা নগরী দিল্লীর উত্তরে যমুনা তীরে অবস্থিত ছিল।

মান্যা কাপি মনুস্মৃতি, স্তদুচিতা ব্যাখ্যা হি মেধাতিথেঃ,
সা লুপ্তৈব বিধের্বশাৎ, ক্বচিদপি প্রাপ্যং ন যৎ পুস্তকং।
ক্ষৌণীন্দ্রো মদনঃ সহারণসুতো দেশান্তরাদাহৃতৈ
জীর্ণোদ্ধারমচীকরত্তত ইত স্তৎপুস্তকৈ লিখিতৈঃ॥

মেধাতিথি মনুভাষ্য ভিন্ন স্মৃতিবিবেক নামক একখান স্মৃতির সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মেধাতিথির অতি-বিস্তীর্ণ গ্রন্থ মেধাতিথির সমসাময়িক আচারাদির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি ইহাতে বহুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৩) মনুসংহিতার তৃতীয় টীকাকার গোবিন্দরাজ। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে মনুটীকা রচনা করেন। কুল্লুক ভট্ট স্থানে স্থানে গোবিন্দরাজের মত খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু গোবিন্দরাজের টীকার অনেক অংশ স্বকীয় মানবার্থমুক্তাবলীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বপ্রণীত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন *। তিনি কান্যকুব্জের অধীশ্বর গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মাধবের পুত্র বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দায়ভাগে গোবিন্দরাজের মনুটীকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দ রাজের টীকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জলি সাহেব স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) গোবিন্দ রাজের পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভোজরাজ যে মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৫) গোবিন্দরাজের পর নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ মানবার্থ-বিবৃতি বা মানবার্থ-নিবন্ধ নামে মনুসংহিতার স্থানের স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রণয়ন করেন। তিনি পশ্চিম ভারতের অধিবাসী বলিয়া অনুমিত হন। ইনি গোবিন্দরাজের নাম উল্লেখ ও তট্টীকা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডাক্তার বুলার মহোদয় কর্ত্তৃক যে নারায়ণী টীকার হস্তলিখিত পুস্তক দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ১৪৯৭ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। অতএব নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞকে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্মার্ত্ত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

* Dr. Jolly's Tagore Law Lectures, (1883) p. 9.

(৬) কুল্লুকভট্ট ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে মানবার্থ মুক্তাবলী রচনা করেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। মহা-মহোপাধ্যায় স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন তাঁহার সমকালীন পণ্ডিত ছিলেন। কুল্লুক-ভট্টের মনু-টীকা তিনিই প্রথম স্বকীয় তত্ত্ব-নামধেয় সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। যত মনুসংহিতা বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তকেই কুল্লুকভট্টের টীকা প্রামাণিক বোধে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অনুবাদকগণের তিনিই একমাত্র অবলম্বন। কুল্লুকভট্ট সংস্কৃতে সবিশেষ ব্যুৎ-পন্ন ছিলেন, সন্দেহ নাই।

(৭) ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঘবা-নন্দ (রামানন্দ) মানবার্থচন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন। তিনি স্বকৃত গ্রন্থের ভূমি-কায় কুল্লুক-নারায়ণ-গোবিন্দরাজ-মেধাতিথি প্রণীত ভাষ্য ও টীকা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়া-ছেন। রাঘবানন্দের টীকা অনাদৃত হইবার বিষয় নহে। তৎকৃত মানবার্থচন্দ্রিকার প্রাচীনতম হস্ত লিখিত পুস্তক ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে।

(৮) পণ্ডিতবর বুলার সাহেব কাশ্মীরে মনু-সংহিতার আর এক খানি টীকা প্রাপ্ত হইয়া ছেন। ইহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে কুল্লুকভট্টের টীকানুরূপ লিখিত হইয়াছে।

(৯) নন্দনাচার্য্য নামক দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক পণ্ডিত নন্দিনী নামক এক খানি আধুনিক টীকা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রণয়ন করি-য়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ইচ্ছানুরূপ মনু-সংহিতার শ্লোকাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অনেকানেক পণ্ডিতবর্গকে, অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মনুসং-হিতা ব্যাখ্যানে বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইয়াছে। প্রাচীন না হইলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ হইতে সর্ব্বত্র মনুর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বকালে প্রখ্যাপিত হইয়া, সাময়িক ও সার্ব্বদেশিক পণ্ডিত চূড়ামণি-গণ কর্ত্তৃক মনুসংহিতা এরূপ সমাদৃত হইত না। মনুসংহিতা সার উইলিয়াম জোন্স প্রথমত ইংরেজীতে অনুবাদিত করেন। হটন সাহেব পুনরায় তাহা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ-রূপে অনুবাদ করিয়াছেন। ডিলংসেন সাহেব ইহা আবার ফরাসী ভাষায় অনুবা-দিত করিয়াছেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

শ্মশানোপহার।

কি দেখিতে আসিলি মা ভারতে ভারতীরাণি!
কি দিয়ে পুজিব আজি ও কমল পা দুখানি ?
যা ছিল গেছে সর্ব্বস্ব
আছে শুধু ছাই ভস্ম
প্রাণভরা পরিতাপ, মুখে হাহাকার বাণী!
কি আছে কি দিব আর
বিনে এই অশ্রুধার,
শ্মশানের উপহার ধর ধর বীণাপাণি!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

অজ্ঞাতে।

(১)

বাঁশরীর শূন্য প্রাণে ঢালিছি সঙ্গীত গো
রাধা রাধা বলে ;
জ্যোছনার মুখ চেয়ে,
তরুকুঞ্জে গেয়ে গেয়ে,
নিস্তব্ধ নিশীথে গীতি কোথা যায় চ'লে ?

(২)

শুনে কি কিশোরী মোর, বাঁশরীর গীতি ধ্বনী ;
—যার তরে গাই ?
যমুনার কূলে কূলে,
বৃন্দাবন তরু মূলে,
রাতিদিন যার তরে বিষাদ ভাসাই—?

(৩)

শূন্য বাঁশরীর বুকে সঙ্গীত যেমন ধীরে
পড়িছে ঝরিয়া ;
সুনীল যমুনা জলে,
লহরীর লীলা স্থলে,
মৃদু কলধ্বনী যথা যেতেছে মিশিয়া ;—

(৪)

জ্যোছনা রঞ্জিত শূন্যে পাপিয়ার গীতি যথা
করে সন্তরণ ;
মলয় লুকায়ে যথা
পরশিয়ে কুঞ্জলতা,
ফুলময় কুঞ্জবনে হ'তেছে মগন ;—

(৫)

এ শূন্য হৃদয়ে মোর, পূরায়ে আকাঙ্ক্ষাশত,
বল গো কিশোরী,
অজ্ঞাতে তেমনি ধীরে,
আসিবে আসিবে কি রে ?
নিরাশ প্রেমের কথা যাব কি পাশরি ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

উৎসবান্তে।

সকলি উড়িয়া গেল, কি ফল হেথায় থাকি,
জীবনের কতটুকু এখন আছেরে বাকী।
চল ভাই, যাই যাই,
হেথা থাকি কাজ নাই,
কোথা যাই ভাবিয়া পাগল,
প্রাণে নাই একবিন্দু বল !
কেমন করিয়া আর এশূন্য কুটীরে রই,
কোন্ বা আশার বলে এ আলোক তেজিযাই !
জীবনের রঙ্গভূমি যেনরে শ্মশান-প্রায়,
উৎসবের অন্তে শুধু এই কথা মনে হয়।

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

মান।

আজি পূর্ণিমা, শরচ্চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। ঝমঝম করিয়া জোছনার রাশ-ভুবন ভরিয়া দিল। শিশির-সিক্ত শীতল বায়ু ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেছে। আকাশে দুএকটী পাখী ছুটাছুটী করিতেছে,—তার উপরে নীল গগণভেদ করিয়া ঐ একটী দুইটী তারা চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছে! আজিকার রাত্রি বড় মধুর,—"আজি মধুরে মিশাব মধু পরাণ বঁধু"—আমার অনেক দিনের বাসনা আজ পূরাইব—প্রাণভরা সাধ আজ মিটাইব—

এস এস বঁধু এস
আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

গুরুজনার মাঝখানে ঘোম্‌টা খুলিয়া নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখিতে পাই না।

বড় লজ্জা লজ্জা করে। দশজনে চাহিয়া থাকিবে—ছিঃ,ইতর চক্ষে দেখিবে,আমাদের চারি চক্ষের মিলন হইবে? নয়নে নয়নে যে তারের খবর চলিবে,অন্যে বুঝিবে, ? বড় লজ্জা করে, আমি তা পারিব না। পাশে লোক চাহিয়া থাকিবে, আর আমি তোমায় দেখিব,তাহাও পারিব না, আর মাঝ খানে খানিক আকাশ, খানিক বাতাস, খানিক ব্যবধান থাকিবে আর আমি তোমায় দেখিব, দূরবীণ কসিয়া তোমাকে দেখিতে হইবে, তাতে আমার আশ মিটিবে না। এমন মধুর জোছনায় এত ব্যবধান? নিত্য যাহা, আজ তাহা নহে। আজি প্রকৃতি অসামান্যা রূপবতী। এমন রাত্রি আর দেখি নাই। কখন যেমন করিয়া তোমাকে দেখি নাই, আজি তেমনি করিয়া দেখিব, আজি বুকটা জন্মের মত পূরাইয়া লইব;—এমন দিন আর পাইব না। তাই বলি, বঁধু কাছে এস, আরো কাছে, আরো কাছে, এই আধ খানা আঁচলে বস—

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি,
অনেক দিবসে, মনের মানসে
সফল করিয়া আঁখি।

তোমার জন্য অনেক সহিয়াছি, অনেক কাঁদিয়াছি। আজি সাত বৎসরের দুঃখ এক দিনের সুখে ডুবাইব।

তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি,
রন্ধন শালাতে যাই, ধুঁয়াতে যাতনা পাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।
মণি নও মাণিক নও, হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ,
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।

তোমার অভাবে সংসারে কর্ম্ম-স্পৃহা থাকে না। গুরুজনার ভয়ে করিতেও হয়। ভয়ে ভয়ে করি,কোন কাজটী ভাল হয় না। সবাই তিরস্কার করে, তখন তোমার উপর অভিমান করিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসি। তোমাকে সম্মুখে দেখিলে আমার গায়ে বল হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, এক নিমেষে কত কাজ করিয়া ফেলি। দাসীর কাজ করিতে, আমি রাজরাণী, কখন আমার সঙ্কোচ হয় না। তোমার অভাবে কোন কিছুই ভাল লাগে না। তোমার অগৌরবে সদাই চোখ ছলছল করে,সদাই কাঁদি। তিরস্কারেও কাঁদি, পুরস্কারেও কাঁদি। লোকে অভিমানী,অহঙ্কারী, দুর্ব্বল, ভীত, কত কি বলে। আমি কেন কাঁদি, তা তুমি জান, যে সব কথা এখন থাক্—পুরাণ কথা কহিয়া এ সুখের নিশা নষ্ট করিব না। অনেক দিনের পর পাইয়াছি, অনেক সাধ করিয়া আসিয়াছি। পায়ের তলে বাগানে শত ফুল ফুটিয়াছে, মাথার উপর আকাশে শত ফুল ফুটিয়াছে, তোমার কাছে বসিবার এমন সময়টী আর হবে না। আমি দেহ প্রাণের সাজ সজ্জা করিয়া অভিসারে আসিয়াছি, পৃথিবী নীরব, জন মানবের কোলাহল নাই। এই একদিন তুমি আর আমি একা হইয়াছি, তোমাকে একাকী পাইয়াছি—

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব,
হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব।
কাল কেশের মাঝে তোমা বঁধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ,
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে, তাহে পরবোধিব
পরিয়াছি কালপাটের জাদ।

বঁধু, আমার আশা অতি অল্প। যাহারা তোমাতে ডুবিতে চায়, তাহারা বড় লোক। বড় লোকের বড় কথা। আমি দীন হীনা কাঙ্গালিনী; আমার আশা অতি অল্প। তারা তোমার সঙ্গে পরাণে পরাণে মিশাইতে চায়। এক অঙ্গ হইয়া যাইতে চায়, তারা সোঽহং বলিয়া গর্ব্ব করেন। আমি পরাণে পরাণে বাঁধিতে চাই না। আমি বলিতে পারি না যে "পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি"। আমি তোমার চরণের দাসী—

তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁস

আমার সাধ, নিকটে বসিব, প্রাণ ভরিয়া মুখ খানি দেখিব, আর তোমার সেবা করিব। একে প্রীতি বল, ভক্তি বল, যাহা ইচ্ছা তাহা বল, জিনিষটা এই। আমার সারা প্রাণটা, সব দেহটা তোমাতে ভরা। জগতে আমার আর কেহ নাই—

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই,
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে
নিশ্চয় জানিও মুক্তি ভখিমু গরলে।
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ।

আমি দুদণ্ডের জন্য অভিসারিকা হইয়াছি। ঘরে পরে সবাই আমাকে লাঞ্ছনা দেয়, কেহ কলঙ্কিনী বলিয়া তিরস্কার করে, কেহ শ্যাম-সোহাগী বলিয়া উপহাস করে। আমার তাতে লজ্জা নাই, ভয় নাই। আমি তোমাতে মজিয়াছি। তোমাকে না দেখিলে আমার প্রাণ কেমন করে, তাই সুবিধায় অসুবিধায় ছুটিয়া আসি। কবে কি ঘটিবে জানি না, আর আসিতে পাইব কি না, জানি না। তাই আজি এমন সুন্দর শারদী পূর্ণিমায় তোমায় একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া যাই।

কই বঁধু, আমার দিকে মুখ ফিরাও। অমন করিয়া রহিলে কেন? আজি এত বিরসভাবে অন্যমুখে বসিয়া কেন? আমার উপর বিরক্ত হইয়াছ? দেহি পদ পল্লব মুদারং বলিয়া কি সাধিতে হইবে? ছি, লোকে দেখিলে বলিবে কি? আমি যে স্ত্রীলোক, ও সাজটা যে পুরুষের একচেটিয়া। আমি তোমাকে এতই ভালবাসি যে, ও কাজটা করিতেও আমার লজ্জা হয় না। বুকের মাঝে তোমার পা দুখানি রাত্রি দিন পূজা করিব, তবে কিনা লোকে দেখিলে বলিবে কি? আর তুমি নিজেই বা কি ভাবিবে? আমাকে বড় লালসাময়ী বলিয়া তোমার বোধ হইবে। আমি পরের স্ত্রী পরপুরুষ ভেটিয়াছি, শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি নদী গিরি কানন প্রান্তর মানি নাই। যেখানে যখন তোমার বাঁশরী বাজিয়াছে, তখন সেখানে ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইয়াছি; সর্পকে রজ্জু, শব-দেহকে ভেলা করিয়া নদী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, আমাকে লালসাময়ী বলিয়া প্রতিবাসীরা নিন্দা করিতে পারে। আমি সতী কি অসতী, তোমাতে সকলি বিদিত। তুমি যেমন আমাকে চিন, এমন আর কেহ চিনে না। তুমি যদি আমাকে লালসাচালিত বল, আমার এ ব্যথা রাখিবার আর স্থান নাই। যদি নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে থাকে, তাহা রাধিকার; যদি মানুষে কেহ সতী থাকে, সে রাধিকা। সতী কি কলঙ্কিনী, অপরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে পারে; কিন্তু তুমি জান, উত্তর-মুখ-নির্দ্দেশী শলাকার মত আমি একান্ত মনে তোমা-

কেই ভজনা করি। সাক্ষী ধ্রুবতারা, সাক্ষী ঐ অরুন্ধতী।

বঁধু, তোমার কি হইয়াছে? আজি তোমার কটাক্ষে এত তীব্রতা কেন, মুখে এত গাম্ভীর্য্য কেন? আমার উদ্দামতায় দমন করিতে? নিরাশার যাতনা আমাকে শিখাইতে? বুঝাইতে যে, যে যাহা চাহে সে তাহা পায় না; বুঝাইতে যে, মিলন কেবল অনন্তে সম্ভবে? তাই ভাল, তুমি যাহা শিখাইবে, আমি তাহাই শিখিব। অথবা তোমার কি চন্দ্রাবলীকে মনে পড়িয়াছে? কোথা সে বিধুবাবালা, ভাবিয়া কাতর হইতেছ? লজ্জা কি, মনের কথা বল না? আমি তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতে পারি, চন্দ্রাবলী যে তোমাকে ভালবাসে, সে জন্য আমি একটুও দুঃখিত নহি। আমি যাহাকে ভালবাসি, লক্ষ জনে তাহাকে ভালবাসে, এ ত গৌরবের কথা। এতে আমার হিংসা হয় না;—হইবে না। "তোমার গরবে গরবিণী, আমি রূপসী তোমার রূপে"—তোমাকে যত অধিক লোকে আদর করিবে, ততই আমার গর্ব্ব বাড়িবে। আমি যে কোহিনুর পাইয়াছি, চন্দন তরুভ্রমে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করি নাই, একথা বুঝিয়া আমার আত্মশ্লাঘা বাড়িবে। বল না, তুমি কি ভাবিতেছ?

"তুহু যদি লাখ গোপীসনে বিলসহ তাহে মুই পাই আনন্দ
সোমঝু অন্তরে কোটী সুখ হোয়ত যেহে নাহিক মন্দ।"

তোমাকে লইয়া শত জনে সোহাগ করুক, আমার মত সবাই শ্যামসোহাগী হউক, আমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

"আমার মত তোমার শতেক গোপিনী
তোমার মত বঁধু তুমিই গুণমণি,
দিনমণির আছে শত কমলিনী
কমলিনীর একা দিনমণি ওই।"

আমি আজ হৃদয়ের বসন খুলিয়া দিয়াছি। যে দুর্ব্বলা, যে অসতী,সে অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবরিত করুক। আমি সতী একান্তপ্রাণা, যমুনা পুলিনে নীলতরুমূলে গোপিলার বস্ত্র অপহরণ করিয়া তুমি শিখাইয়াছ, বিবসনা না হইলে, লজ্জাভয় মান সম্ভ্রম সমুদয় পরিত্যাগ না করিলে, তোমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিলে, তোমাকে পাওয়া যায় না। "লাজহীনা পবিত্রতা" কেবল তোমার মত দেবতা আদর করিতে জানে। লজ্জা পাপ হইতে। যেদিন মানুষ পাপে কলুষিত হইয়াছিল, সেইদিন কাপড়ে গা ঢাকিয়াছিল। আমি তাই হৃদয়ের বসন উন্মোচন করিয়াছি, গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখ সেখানে আর কেহ নাই,—

অতিশয় বিজন সে ঠাঁই
কোলাহল কিছু সেথা নাই
বাহিরের দীপ রবি তারা
ঢালেনা সেথায় করধারা
তুমিই করিবে শুধু দেব
সেথায় কিরণ বরিষণ।
কেবল আনন্দে বসি সেথা
মুখে নাই একটীও কথা
তোমারি সে পুরোহিত প্রভু
করিবে তোমারি আরাধনা,
নীরবে বসিয়া অবিরল
চরণে দিবে সে অশ্রুজল
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা
মুদিয়া সজল দুনয়ন।

বঁধু, এস এস, সেই অনাবৃত বুকের উপর মাথাটী রাখিয়া একবার শয়ন কর। দীপ্ত-

শিরার অভিষেক হোক। জ্বলিয়া পুড়িয়া বুকটা খাক হইয়া গেছে। তোমার অমৃতস্নাত শিরস্পর্শে একবার শীতল হোক।

তুমি দেবতা, আমি মানুষ, তুমি রাজা আমি প্রজা, তুমি ঈশ্বর আমি দীন হীন। আমার আকাঙ্ক্ষাকে কি দুরাকাঙ্ক্ষা বলিবে? আমার বাসনাকে কি ধৃষ্টতা বলিবে? তুমি যে বলিয়াছ, সমানের ভালবাসায় তুমি সন্তুষ্ট নহ; তুমি যে বলিয়াছ, তোমার চেয়ে যে নীচ তার ভালবাসাতে তুমি যত প্রীত হও, এমন কারো ভালবাসায় নহে। মুনিঋষি যোগী, সাধু শান্ত, সমানে সমানে সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রীভাবে তোমার উপাসনা করে, তুমি নাকি তাদের চেয়ে দীনহীন সন্তাপের উপাসনা অধিক ভালবাস? সেই জন্য না তুমি গোয়ালার ঘরে মাখন চুরি করে খেতে? সেই জন্য না তুমি বামনের পাতের ভাত কুড়িয়ে খেয়েছিলে? বঁধু, আমার ধৃষ্টতাই হউক, আর দুরাকাঙ্ক্ষাই হউক, আমি তোমাতে মজিয়াছি, তুমি আমাতে মজিবে, কখন আশা করি না। তবে আতুষী ফলের রঙে স্ফটিকের রসের মত যদি একবার আমার রাগে অনুরঞ্জিত হও, তবেই আমার কুসুম জন্ম সার্থক হইবে। আমাকে সবে শ্যাম-সোহাগী রাধা কলঙ্কিনী বলিয়া গালি দেয়, দিক্, যদি রাধানাথ বলিয়া একদিনের জন্য তোমায় কেহ ডাকে, তবে রাধার ভাগ্যের গৌরবের সুখের সীমা থাকিবে না। রাধানাথ, এসুখের নিশি আকাশের চাঁদকে দেখাইয়া দেখাইয়া রাধার নীলাম্বরের উপর তোমার চাঁদ মুখ খানি একবার শোভিত কর।

আমাকে জটিলা কুটিলা জিজ্ঞাসা করে, আমি কি দেখিয়া তোমাতে মজিলাম। কেন তোমাকে ভালবাসি। আমি কি পাড়াপড়সীর ভয়ে তোমাকে ভজিয়াছি? তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিবার আশায় তোমাতে মজিয়াছি? তোমার রূপ দেখিয়া সোহাগ করিয়াছি? তুমিত আমার স্বামী নহ। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেও তোমাকে ভালবাসি নাই। আমি কেবল রাগে তোমাকে বরণ করিয়াছি। আমার অহেতুকী ভালবাসা। তুমি লালসামগ্রী বলিয়া পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দাও, তবুও তোমাকে ভালবাসিব। তুমি সোহাগ করিয়া বুকে তুলিয়া লও, তবুও তোমাকে ভালবাসিব, তুমি তিরস্কার গঞ্জনা কর, শত রমণী লইয়া আমার সমক্ষে বিলাস কর, আমাকে লাঞ্ছনা কর, তবুও তোমাকে ভালবাসিব। রাধার মনমোহন, রাধার আত্মা ও দেহ তোমাতে তন্ময় হইয়াছে। রাধা আর মান অপমান বুঝে না।

নহে তান হের, নিগড় করিয়া
রেখেছি চরণার বিন্দ
কেবা নিতে পারে, নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ।

আমার মনের সহস্র বাসনা। হৃদয়বিহারী হরি, সে সব কথা তুমি জান; কোন্ সাধ পূরাইবে, তুমিই বলিতে পার, অথবা এজন্মের সাধ এজন্মে আর পূরিবেনা?

এজনমের সঙ্গে কি মোর জনমের সাধ
ফুরাইবে!
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর
পূরাইবে?

তোমার মনের কথা তুমি বলিতে পার। তাহা জানিতেও আমার ইচ্ছা নাই। আমার একটী আশা কেবল তোমাকে বলিয়া রাখি, ইচ্ছা হয় পূর্ণ করিও

ইচ্ছা হয় করিও না। আমি তোমার বিরহ আর সহ্য করিতে পারি না। দূরে দূরে থাকিয়া এক একবার মুরলী রবে প্রাণ পূরেনা। "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চির দিন কেন পাই না?" নিরাশা বিরহ নামা মেঘে তোমার মুখখানি ছাইয়া ফেলে, তোমার রূপে স্মৃতির পট মুছিয়া যায়। প্রাণের ভিতর সদাই আতঙ্ক, যেন তোমাকে হারাই হারাই—"হারাই হারাই হেন সদা কয়ে চিত।" আজ আমার বুকের উপর এমন একটী দাগ করিয়া দাও যেন আর কখন মুছে না। কলঙ্কিনী নাম ত হইয়াছে, এখন রাধা আর কাহাকে ডরে না। "কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হয়েছে আর কি কাহাকে ডর?" নূতন দাগে আর ভয় কি? নাথ বল, কি করিলে তোমাকে চিরদিনের জন্য পাইব,—"কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।"

বঁধু, তবুও কটাক্ষের তীব্রতা ঘুচিল না, একটী কথাও বলিলে না, অভিসারিকা রাধিকা কি আজ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যাইবে? রাধার চোখের অবিশ্রাম জলধারা আজিও কি ঘুচিবে না?

ভাগ্যে মিলায় ইহ শ্যাম রসবন্ত
ভাগ্যে মিলায় ইহ সময় বসন্ত
ভাগ্যে মিলায় ইহ প্রেম সঙ্গোতি
ভাগ্যে মিলায় ইহ সুখময় পতি
আজু যদি অভাগিনী তেজবি কান্ত
জনম গোঙায়ব একান্ত।

ঘুচিল না, ঘুচিবে না। চলিলাম, আবার দূরে, অতিদূরে চলিলাম। আমি বলিব না, "ক্ষুদ্র এই বনফুল পৃথিবী কাননে, কেন হে নিদয় হয়ে দলিলে চরণে?" আমি জিজ্ঞাসা করিয়া যাই, কুসুমদলনে, তোমার কুসুমসুকুমার চরণে ব্যথা পাও নাইত? অঞ্চলে চরণ মুছাইয়া যাই। বুঝিলাম—

"প্রাণের বাসনা হেথায় পূরেনা"

দগ্ধ মরুভূমে যে আশ্রয় ছায়া পাইয়াছিলাম, এতদিনে তাহাও ঘুচিল, এখন—

"শ্যাম শ্যামশ্যাম বলে, পশিব যমুনা জলে
ত্যজিব কালিন্দীনীরে প্রেমদায় এজীবন।"

'প্রতিপদ মিগমপি নিলদামি মাধব তব-
চরণে পতিতাহং
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধি রপি
তনুতে তনুদাহং"

অমৃতে যার গরল উঠে, মরণ ভিন্ন তার আর কিসে ভরসা আছে? সেই একদিন আর এই এক দিন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।
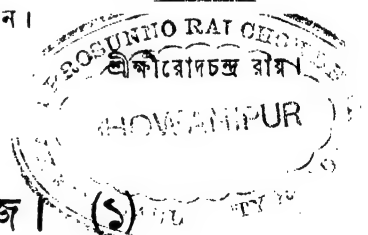
যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (১)

আমরা ইতিপূর্ব্বে স্বামী ও স্ত্রী নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিবাহপ্রথা অসংস্কৃত থাকাতেই বহুবিবাহপ্রথা সমাজে চলিতেছে। বহুবিবাহপ্রথা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা প্রতিপন্ন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি। বিধবা বিবাহ ও বিপত্নীক বিবাহও যে বহুবিবাহের অঙ্গ, ইহাও আমরা বলিয়াছি। এই সকল কুপ্রথা তুলিয়া দিতে হইলে, আদর্শ বিবাহ প্রথা যাহাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিতে সমাজে আদর্শ বিবাহ

প্রতিষ্ঠিত হইবে, কখনই আশা করা যায় না। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে বাল্য বিবাহ তুলিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এ পথে যে সকল অন্তরায় আছে, তাহার বিষয় একবার বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাল্যবিবাহ যে সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, একথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত। সর্ব্ববাদীসম্মত কুপ্রথা কেন সমাজে অবাধে চলিতেছে,—পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবল পরাক্রম কেন এই স্রোত সম্যকরূপে ফিরাইতে পারিতেছে না,—ইহার একমাত্র কারণ এই,—এই প্রথা তুলিয়া দিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, এ বিষয়ে এখনও গভীর মতভেদ রহিয়াছে। সমাজের সকল লোকের প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রাপ্তি না হইতে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিলে অনিষ্ট হইবে, কেহ কেহ বলেন। অন্যদিকে, কিছু দিন হইতে বঙ্গের কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মালাবারি মহোদয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা একখানি আইন প্রণয়ন করাইবার জন্য বাল্যবিবাহ ও তাহার কুফল সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এ দেশের লোকেরা আইনের দ্বারা সমাজ সংস্করণের বড় পক্ষপাতী নয়। এই জন্য অনেক ব্যক্তি মালাবারির এই মহদনুষ্ঠানের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নহেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিস্তৃত একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য প্রথা সম্বন্ধে বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকদিগের মত অতি দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা পাঠে জানা যায় যে, প্রায় সকলেই একবাক্যে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অনেকে আইনের তত পক্ষপাতী নহেন। সে যাহাই হউক, মহাত্মা মালাবারির দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে যে ভারতে একটী তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই; এবং এই রূপ আন্দোলনে যে কোন রূপ সুফল ফলিবেই ফলিবে, তাহা একরূপ নিশ্চয়। মহাত্মা মালাবারির নিঃস্বার্থ জীবন ধন্য! আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার দ্বারা এদেশের মহা উপকার হইতেছে এবং কালে আরো হইবে।

কিন্তু, এ পর্য্যন্ত যত লোকে বাল্যবিবাহের দোষ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই শারীরিক অপকারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। শরীরই যেন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। শরীরের সহিত ধর্ম্ম ও নীতির যোগ না থাকিলে যে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, একথাটী অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, পছন্দ-সই মিলন হইবে, এই আনন্দেই অনেকে উৎফুল্ল। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে ধর্ম্ম ও নীতি-শিথিলতার সম্ভাবনা আছে কি না, এ সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করেন না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য হইতে দূরে রাখিয়া যে সমাজ-সংস্করণ, তাহার দ্বারা কখনই মানবের চির-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজ সমূহে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু

সেখানেও, যে স্থলে জীবন্ত ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তির উপর যৌবন-বিবাহ প্রতিষ্ঠিত নয়, সে স্থলে যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই গুরুতর বিষয় আলোচনার সময় ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য পথে রাখা একান্ত উচিত। কিন্তু সমাজ এ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন।

একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গপ্রদেশে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছিল। সেই সময়ে অনেক ডাক্তারের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। ডাক্তারেরা সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসরের পর ও বালকের অষ্টাদশ বৎসরের পর সন্তান জন্মিলে, বলিষ্ঠ ও সতেজ হইবার সম্ভাবনা আছে। তদনুসারে যে একখানি আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে কন্যার বিবাহের ন্যূন বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর ও বালকের বিবাহের ন্যূন বয়স অষ্টাদশ বৎসর ধার্য্য হইয়াছে। এই সময়ে এ প্রশ্ন একেবারেই উঠে নাই যে, ১৪ ও ১৮ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে তখন কিছুই বিবেচনা করা হয় নাই। যে সমাজে এই আইন অনুসারে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেটী একটী ধর্ম্মসমাজ। ধর্ম্ম সমাজের কার্য্য সংসারের দিক ও বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিকের কোনই খোজ খবর নাই! সুতরাং এই সমাজের বিবাহে যে নানা প্রকার গলদ বাহির হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নাই। কোন প্রকারে বাল্য বিবাহের পোষকতা না হইলেই কি হইল? আর কি কিছুই চাই না? বয়সের ভিত্তির উপর এই গুরুতর বিষয়টীকে নির্ভর করাতে স্থানে স্থানে বড়ই অমঙ্গল ঘটিতেছে। এমন কি, কোন কোন স্থলে বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হইতে থাকে, বর-কন্যার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়ত ১১। ১২ বৎসর বয়সের সময় হইতেই আরম্ভ হয়, তারপর কোন প্রকারে কন্যার ১৪ বৎসর পূর্ণ হইলেই হয়!! অভিভাবকেরা একবারও ভাবেন না যে, ছার ১৪ বৎসর পূর্ণ হইলেই কি হইল, আর কি কিছুই দেখিবার নাই? আর একটী কথা। অপরিপক্ক-বুদ্ধি বালিকার চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে যখন বিবাহের প্রস্তাব উঠে, তখন সেটা কি বাল্য-বিবাহের রূপান্তরিত অবস্থা নয়? মনকে কলুষিত করিতে দিয়া ও অপরিপক্ক মনে এই সকল চিন্তা জাগাইয়া দিয়া তারপর বয়স পূর্ণ করাইবার জন্য ২।৪ বৎসর অপেক্ষা করিলেই বাল্যবিবাহ রহিত হয় না। বাগ্দান (Betrothal) প্রথা আরও দূষণীয়। সম্বন্ধের পর অনেক দিন অপেক্ষা করাতে যে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, তাহা একমুখে বলা যায় না। বিশেষত ধর্ম্ম ও চরিত্র-হীন মানুষ এরূপ বাগ্দানের অবস্থায় না করিতে পারে, এমন কাজই নাই।

আমাদের বিবেচনায়, বিবাহবন্ধন একটী সংসারের বন্ধন নয়, ইহা একটী ধর্ম্ম বন্ধন। কেবল বিজ্ঞান-সম্মত হইলেই ইহাতে মঙ্গল হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি সম্মত হওয়া একান্ত উচিত। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বর কন্যাকে রাখিতে হইলে, সমাজকে বিশুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম-বায়ুতে রঞ্জিত করা উচিত। বরকন্যাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত যে, ধর্ম্ম ভিন্ন জীবন নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন সুখ নাই,—

ধর্ম্ম-জীবন লাভই বিবাহের পণ, ধর্ম্মজীবন আরম্ভেই এই মধুর বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা। অবিশ্বাসপ্রধান সমাজে বিজ্ঞান-সম্মত যৌবনবিবাহে ভয়ানক দুর্গতি ঘটে! ধর্ম্ম ভুলিয়া বিজ্ঞান-সম্মত বিবাহ কোন ক্রমেই মঙ্গল-প্রসূ নয়। মানুষ ধর্ম্মপ্রধান জীব। ধর্ম্ম ও চরিত্রই মানুষের লক্ষ্য ও বিশেষত্ব। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইলে সন্তান বলিষ্ঠ হইবে, দীর্ঘজীবী হইবে, মানুষের পক্ষে এ অসার গণনাপেক্ষা, অধিক বয়সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিবাহিত হইলে ধর্ম্মের বন্ধন দৃঢ় ও অটল হইবে, পিতা মাতার আদর্শে সন্তান নীতি ও চরিত্রবান হইবে, মানুষের পক্ষে এ গণনা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এ চিন্তা অতি অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং যে কুফল ফলিবার, তাহা অবাধে ফলিতেছে। দেশ দিন দিন নীতি ও ধর্ম্মহীন, সুতরাং চরিত্রহীন হইয়া উঠিতেছে। বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিয়া যে সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, সে সমাজেও যে আদর্শ বিবাহ হইতেছে না, এ কথা বলিবার সময় আমাদের একটুও সঙ্কোচ হয় না। বাল্যবিবাহে ভারতে যে কুফল ফলিতেছে, ধর্ম্মশূন্য যৌবন-বিবাহে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে সহস্রাংশে তদপেক্ষা অধিক কুফল ফলিতেছে, একথা কোন ইতিহাসজ্ঞ অস্বীকার করিতে পারেন না। বাল্যবিবাহের বিরোধী দলের এ কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

আমরা জানি যে, বালবৈধব্য বাল্যবিবাহের একটী কুফল। বালবৈধব্য যে দেশের কি ভয়ানক অমঙ্গল করিতেছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে এজন্য নয় যে, দেশে ভ্রূণহত্যা, অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে বলিয়া। ভ্রূণহত্যা ও অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা যৌবনবিবাহে আরো অধিক। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কঠোর আইন থাকা স্বত্ত্বেও ভ্রূণহত্যার সংখ্যা ভারতবর্ষ অপেক্ষা কম নয়। আমরা বাল-বৈধব্য পচ্ছন্দ করি না এইজন্য যে, বাল্যকালে চরিত্রই গঠিত হয় না। এই অপবিত্র চরিত্রে এই গুরুতর ব্রত পালন করা লোকের পক্ষে অসম্ভব। মহা মহা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যৌবন-তাড়নায় যে স্থলে অস্থির, অল্পবুদ্ধি ও অস্থিরমতি বালিকারা সেই স্থলে অটল থাকিবে যে আশা করে, সে ঘোরতর মূর্খ। আইনের শাসন ও লোকলজ্জায় ধর্ম্ম রক্ষা করা যায় না। এই জন্য দারুণ চরিত্রহীনতা বালবিধবাদিগকে আক্রমণ করে। তারই শোচনীয় ফল ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি। সুতরাং ভ্রূণহত্যার পূর্ব্বে যে চরিত্রহীনতা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে অনিষ্টজনক। ধর্ম্মকে ভিত্তি না করিয়া যতদিন বিবাহ চলিবে, ততদিন বালবিধবা বা যুবতীবিধবা নিশ্চয় চরিত্রহীন হইবে। তবে দুই চারিটী ভালও থাকিবে,—থাকিতে পারে। কিন্তু সে তাহারা, যাহাদের ধর্ম্মে অটলমতি আছে। চরিত্র-হীন মানুষ পশু অপেক্ষাও যে ঘৃণিত, সে কথা আর বলিতে হইবে কি?

অগঠিত চরিত্রে মানুষ ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না। অগঠিত চরিত্রের মূলে ধর্ম্মের ভিত্তি নাই। ধর্ম্ম ভিত্তি নাই যাহার, সে মানুষই নয়। নিজেরা ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না, সুতরাং অন্যের দ্বারা তাহারা পরিণীত হয়। সে বিবাহ তাহাদের নিজেদের বিবাহ নয়। বাল্যকালে বিবাহের সময় তাহারা যে মন্ত্র উচ্চারণ করে, সে মন্ত্রের অর্থ পর্য্যন্ত তাহারা জানে না। অর্থ

জানে না, অথচ অন্যের কথায় মন্ত্র উচ্চারণ করে। তাহারা এইরূপে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মকে অবহেলার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্থ হয়। বিবাহের মূলে যে ধর্ম্মবন্ধন, এটাই তাদের ধারণা থাকে না। সুতরাং কিয়দ্দিবসের মধ্যেই বালবিধবা পুনর্ব্বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্ম্মে যে পতি পত্নীর মিলন হইল না, ইষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া যাহারা প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইল না—অন্যের অনুরোধে উপরোধে কেবল যাহারা মন্ত্র উচ্চারণ করিল, তাহারা কেন ধর্ম্মকে মান্য করিবে? কেন বিবাহ বন্ধনকে জীবন-সম্বল করিবে? কেন সমাজ-শাসনকে ভয় করিয়া আজীবন কষ্ট পাইবে? এই কারণেই বালবিধবা ও বাল-বিপত্নীকেরা আবার বিবাহিত হইতে চায়। এই প্রথার সূত্র ধরিয়া কালে যুবতী-বিধবা ও প্রৌঢ়-বিপত্নীকেরাও পুনঃ পুনঃ বিবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মটা যেন বিবাহের লক্ষ্যই নয়, দিন দিন এইরূপই হইয়া উঠিতেছে। এমনই অবস্থা ঘটিতেছে যে, সময় বুঝিয়া স্বেচ্ছাভালবাসাবাদীরা আপন মত উল্লাসে ও উৎসাহে প্রচারে ব্রতী হইতেছে!! একটুও লজ্জা নাই, একটুও সঙ্কোচ নাই।

বালিকার চতুর্দ্দশ বৎসর ও বালকের অষ্টাদশ বৎসর বয়সও বাল্যকাল। এ সময়েও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রখর হয় না, বিশ্বাস অটল হয় না;—এটাও নিতান্ত চঞ্চলতা বা পরিবর্ত্তনের সময়। এটাও আদর্শ বিবাহের সময় নয়। এসময়েও ধর্ম্মে আস্থা জন্মে না। ইহার পূর্ব্বে যদি বিবাহের সম্বন্ধ হয়, তবে সেটা যে সর্ব্বপ্রকারেই প্রকাণ্ড বাল্যবিবাহ অপেক্ষাও দোষের, সে কথা না বলিলেও অনেকে বুঝিবেন। অস্থায়ী চঞ্চল ভালবাসার আশায় মাতোয়ারা হইয়া কত যুবক যুবতী যে পড়াশুনার সহিত চির-কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। এই সময়ে রূপজ মোহ বড়ই বিঘ্ন ঘটায়। এই সময় আশা-কুহকে মানুষকে বড়ই মাতায়। এই সময়ে নানাপ্রকার বিষম অমঙ্গল ঘটে। একথা বিবাহবাদী সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে এমন কোন আচার ব্যবহার অবলম্বিত হইতে দেওয়া উচিত নয়, যাহা বিবাহের পর অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু এই ঔচিত্যানুচিত্য ১৪।১৫ বৎসরের ধর্ম্মশূন্য বালিকা বা ১৮।১৯ বৎসরের চরিত্রহীন বিবাহ-প্রার্থী বালক কি বুঝিবে? সুতরাং তাঁহাদিগকে যখন বিবাহের পূর্ব্বে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়, তখন যে কুফল ফলিবে না, কে বলিতে পারে? সুতরাং এরূপ স্থলে নির্ব্বাচন-প্রণালী গরল উৎপন্ন করে। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, সমাজ-শাসন বা লোকনিন্দা এসকল কোন-রূপ কার্য্যকরী হয় না। লোকের মনে ধর্ম্ম-ভয় না থাকিলে কিছুতেই অহিতাচরণ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না। লোক যখন দুর্দ্দমনীয় রিপুর উত্তেজনায় মাতিয়াছে, তখন তোমার আইন ও গ্লানি-রটনার কথা বা ভালবাসার অনুরোধ সে শুনিবে কেন? হায়, এইরূপ উত্তেজনায় কত লোক যে বিবাহের পূর্ব্বে কলঙ্কিত হইয়া সমাজকে অপবিত্র করিয়া ফেলিতেছে, কে গণনা করিতে পারে? পাশ্চাত্য সমাজ সমূহে বিবাহের পূর্ব্বে কত ভ্রূণ হত্যা হয়, কত জারজ সন্তান জন্মে, কে না জানেন? সে সকল দেশে জারজ সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের

জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদিগের দেশে যৌবন-বিবাহ বহুল-রূপে এখনও প্রচলিত হয় নাই বলিয়া এখনও তত কুফল ফলিতে দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে যে সকল জঘন্য চিত্র দেখিতে হইতেছে, ইহাতে দারুণ নিরাশা আসিয়া প্রাণকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, এখন হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে ভবিষ্যতে দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা কল্পনায়ও অঙ্কিত করা যায় না।

এই সকল নানা কারণে আমাদের বিবেচনায়,বিবাহের উপযুক্ততা বয়সানুসারে নির্দ্দেশ না করিয়া চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন-গঠনানুসারে নির্দ্দেশ করা উচিত। অভিভাবকের মতামতের উপর এ সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত। বর কন্যা সচ্চরিত্র না হইলে, প্রকৃত বিশ্বাসী না হইলে, সমাজানুমোদিত বিবাহ হইবে না, অভিভাবক সম্মতি দিবেন না, এরূপ নিয়ম প্রচলিত হইলে সমাজের কতক মঙ্গল হইবার কথা। পুত্র বা কন্যা যদি বুঝিতে পারে যে, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে২ প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে না পারিলে, পিতা বা অভিভাবক বিবাহ দিবেন না, তবে আশা হয়, কতক ধর্ম্মের দিকে তাঁহাদের মতি ফিরিতে পারে। ফিরুক বা না ফিরুক ধর্ম্মসমাজের লক্ষ্য অন্যবিধ হওয়া উচিত নয়। অর্থ ও বিদ্যা সম্বন্ধীয় উপযুক্ততা অনেকেই আজ কাল দেখিয়া থাকেন,কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, ধর্ম্ম ও চরিত্র সম্বন্ধীয় উপযুক্ততার প্রতি অল্প লোকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। সে দিন আমাদের দেশের কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, আমাদের স্কুল প্রভৃতিতে ধর্ম্ম ও নীতির চর্চ্চা না থাকায়, ধর্ম্ম ও নীতি যে মানুষের লক্ষ্য, একথাটাই বালকেরা ভুলিয়া যাইতেছে। আমাদের বিবেচনায়, কেবল স্কুলের প্রতি একথাটা সাজে না। আমাদের প্রতি কাজে, প্রতি কথায় প্রতিপন্ন করে যে, ধর্ম্মটা লক্ষ্য নয়। বিবাহের সময় বর কন্যার কুলমান, রূপ, অবস্থা, এবং স্থানে স্থানে বিদ্যার সংবাদও লওয়া হয়। কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে কোন সংবাদই নাই। এই সকল ঘটনায় দেশের সামান্য অনিষ্ট হইতেছে না। অতএব এই গুরুতর অনুষ্ঠানের সময় ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্ব লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ ত বিবাহই নয়, কারণ ধর্ম্মজ্ঞান তখন মোটেই হইতে পারে না। সে কালের ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা কল্পনার তুলিকায় যে অঙ্কিত নয়, তাহা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। আর যদি সেরূপ ধর্ম্ম জীবন কাহারও থাকে, তবে অভিভাবকেরা তাহার ইচ্ছানুরূপ বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, দিবেন। কিন্তু সে বিচার-ভার বরকন্যার উপর না রাখিয়া অভিভাবকের উপর রাখিতে হইবে। যুবক যুবতীর প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মে দীক্ষা না হইলে, যৌবন বিবাহকে ও সমাজের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের জন্য কি তবে কোন পথ নাই?—আছে বই কি? ঐ নরকের পথ—ঐ ব্যভিচারের পথ তাহাদের জন্য অবারিত-দ্বার রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উদ্ধারের জন্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এক অদ্ভুত আইন প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন!! তিনি মহাপণ্ডিতই হউন, বা তিনি একজন গণ্য মান্য ধনী ব্যক্তিই

হউন, তাহার ধর্ম্মজীবন গঠিত না হইয়া থাকিলে, অর্থ লোভে বা লজ্জার খাতিরে তাহার নিরীশ্বর বিবাহে কখনই যোগ দেওয়া উচিত নয়। নিরীশ্বর বিবাহ, কেন বলিতেছি? যাহারা পরিণীত হইতেছে, তাহাদের যদি ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে তুমি হাজার মন্ত্র উচ্চারণ কর, হাজার উপাসনা কর—সে সকলকে আমরা নিরীশ্বর বিবাহ বলিবই বলিব। ধর্ম্মটা পুরোহিতে সম্পন্ন করিয়া যাইবে, আর বরকন্যা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও ধর্ম্ম লাভ হইবে, এ বিশ্বাস এখনকার দিনে আর নাই। সেই পুরোহিত যিনিই হউন, তাঁহার পূজা ও আরাধনার স্তোত্র বিশ্বাসহীন দম্পতীর বিবাহকালে সহস্র বার কণ্ঠ-নির্গত হইলেও সে বিবাহ নিরীশ্বর বিবাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মকে এইরূপে উপহসনীয় করিয়া তুলিতে পুরোহিতদল একটুও কুণ্ঠিত নন্। টাকার লোভে, যশের লোভে, ভালবাসার মায়ায়, হায় হায়, এইরূপে ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বারা, পুণ্য পাপ কার্য্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া, দেশের যে কি দুরবস্থা আনয়ন করিতেছে, কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি তাহা শোণিতাক্ষরে লিখিতেছেন? ব্যভিচার এবং দুর্নীতি এইরূপে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে সমাজে চলিয়া যাইতেছে! কিন্তু কোন ধার্ম্মিক অভিভাবকের এসকল কার্য্যে অভিমত দেওয়া উচিত নয়। কোন ধর্ম্মপ্রধান সমাজের তাহা অনুমোদন করা উচিত নয়। অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্বেচ্ছাবিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং আইন অনুসারেই বাধ্য হইয়া বিপথগামী বর কন্যাকে সংযত হইতে হইবে। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন মানুষের হিতাহিত বোধ জন্মে না। পশুদের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই—তাহারা রিপুর উত্তেজনায় মা ভগিনী এ সকল গণনা করে না। তাঁহারা কেমন উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক!! পরদার তাহাদের নিকট দোষের নয়! মানুষও যখন ধর্ম্মহীন,—মানুষ তখন মাতৃ-সহবাস না করুক, ভগ্নী-সহবাস পর্য্যন্ত করে!! শুনিয়াছি, বর্ম্মার কোন রাজা সহোদরা ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন!! এতদূর পর্য্যন্ত মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনা গিয়াছে!! ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধের প্রতি বাহিরের লোকেরা অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, সম্বন্ধের পবিত্রতার প্রতি যে এই সমাজের লোকের একটা আস্থা দেখাইতে পারিতেছেন না, একথার বিরুদ্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। আজ যিনি দাদা, কাল তিনি স্বামী,—এটা যে ভয়ানক গর্হিত কার্য্য, ইহা এ সমাজের অনেকেই বুঝেন না। এইরূপ মধুর সম্বন্ধের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতার প্রতি উপেক্ষা করিতে করিতে শেষেই লোকের ততদূর অধোগতি হয়। একদিনে কিছু লোকের একেবারে সর্ব্বনাশ হয় না! যাহা হয়, ক্রমে ক্রমে হয়। ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে মানুষ যে নরকের কীট হইয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি? অথচ এরূপ ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ নিরাপদে সমাজে চলিতেছে। সমাজের কি দুর্দ্দশা!!

বড় আক্ষেপে এ সকল কথা লিখিতেছি। কোন সমাজ বিশেষের দোষ কীর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একান্ত বাধ্য হইয়া আমরা সত্য কথা বলিতেছি বলিয়া অনেক ভ্রাতার যে ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইব,

তাহা বুঝিতেছি। অনেকে যে আমাদের প্রতি খড়্গাহস্ত হইবেন, তাহা জানি; তবুও সত্যের অনুরোধে, দেশের এবং সমাজের মঙ্গলের জন্ম এ কথা না লিখিয়াই পারি না যে, কেবল বয়সের উপর বিবাহের ঔচিত্যানুচিত্য নির্ভর করিয়া যে সমাজ চলিতে চাহিবে, সে সমাজের পতন অনিবার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ এ সম্বন্ধে এ দেশের ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছেন। যে সমাজ নূতন আদর্শ বিবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান, সে সমাজকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত উচিত। বাল্যবিবাহের স্থলে যৌবনবিবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে এই বঙ্গপ্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এই গুরুতর সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যে গভীর চিন্তার প্রয়োজন, যে গভীর ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা বড় কম দেখিতেছি। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সমাজের কুপ্রথা সকল অল্পে অল্পে অলক্ষিত ভাবে এই পবিত্র সমাজে প্রবেশ করিতেছে। সে সকল সমাজে যাহা গর্হিত কার্য্য, এ সমাজে তাহাও চলিতেছে। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার ধর্ম্ম জীবন দেখা ত দূরের কথা, তাহারা যথাভাবে কথোপকথন করিতেছে কি না, যথা ভাবে একত্রে ভ্রমণ উপবেশন করিতেছে কি না, অভিভাবকের তাহাতে সম্মতি আছে কি না, এ সকলের প্রতিও দৃষ্টি অতি অল্প। স্থানে স্থানে দেখা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা এক বাড়ীতে অনেক দিন বাস করিয়াছেন, অথচ সমাজে তাহা দূষনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে স্বেচ্ছাক্রমে বর কন্যা একগাড়ীতে উঠিয়া যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছেন, অথচ সমাজ সে সম্বন্ধে কোনই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। এইরূপে দিন দিন নানা প্রকার কদর্য্য আচার ব্যবহার এই পবিত্র ধর্ম্মসমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বিলাতী চাল চলতি কি এক ভয়ানক আধিপত্য বিস্তার করিতেছে! চতুর্দ্দিক হইতে গালিগালাজ বর্ষিত হইতেছে, তবুও চেতনা নাই। বিবাহের নিমন্ত্রণ আসিল—বর কন্যার সহিত কোন পরিচয় নাই, তাহারা কত দিন সমাজে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাদের ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিয়াছে কি না, তাহারা চরিত্রবান কি না, তাহাদের বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি আছে কি না, এ সকল সংবাদ না লইয়াই সকলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন, এবং ব্রাহ্ম-আচার্য্য উপাসনার ভার গ্রহণ করেন। অমনিই ব্রাহ্ম বিবাহ নামে সেই বিবাহ-সংবাদ কাগজে উঠিয়া যায়। বিবাহের অল্প দিন পর হয় ত কত গলদ বাহির হইয়া পড়ে! লোক দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা পায়, লোকে বলে। কিন্তু এই সমাজের লোকেরা দেখিয়া, ঠেকিয়া তবু এসম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন। ব্রাহ্ম সমাজে দু দশদিন যাপন করিতে না করিতেই বিবাহের আয়োজন চলিল! বিবাহই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য! বিবাহটা অবশ্য কিছু দোষের নয়। কিন্তু ধর্ম্ম যদি বিবাহের লক্ষ্য না হয়, তবে তাহা যে পশুর আচার অপেক্ষাও ঘৃণিত, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। কি দুঃখের বিষয়, যে আদর্শ দেখাইতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে জীবন্ত ধর্ম্ম ভাবকে এইরূপ কার্য্যকালে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, নেতাগণ যে দেশের কি মহা অনিষ্ট করিতে-

ছেন, কে তাহা ভাবিতে বসিবে? এ সকল কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া লিখিতেছি। ব্রাহ্ম সমাজের সহিত এদেশের নিতান্ত ঘনিষ্ট যোগ। আমরা দেখিতেছি, ব্রাহ্মসমাজকে আদর্শ স্থলে রাখিয়া অনেক বিষয়ে এদেশ অগ্রসর হইতেছেন। এখানকার হরিসভা প্রভৃতি একসময়ের ব্রাহ্মসভারই অনুরূপ। এক সময়ে যেরূপ আচার পদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজে ছিল, এখনকার হিন্দুসমাজে সেইরূপ আচার ব্যবহার চলিতেছে। এখনকার ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ, আর ৩০ বৎসর পরে হিন্দুসমাজ যে, সেইরূপ হইবে, তাতে আমাদের সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের দোষজনক কথা গুলির আলোচনা না করিলে এই হতভাগ্য দেশ যে কালে বিপথে নীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা উচিত। যৌবনবিবাহ যে ভাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি প্রণালীতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া উচিত, নির্ব্বাচন-প্রণালীর মূলে ধর্ম্মজীবন না থাকিলে কি কি দুর্নীতি সমাজে প্রশ্রয় পাইতে পারে, এসকল বিষয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। যেরূপ দেখা যাইতেছে, আজ কাল হিন্দুসমাজেও বর কন্যার কিছু অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে। কতক পরিমাণে, স্থানে স্থানে, মনোনয়ন-প্রথাও অলক্ষিত ভাবে একটু একটু চলিতেছে। আর ৩০।৪০ বৎসর পরে এই দেশে ঠিক ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় বরকন্যার অধিক বয়সে যে বিবাহ চলিবে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, খুব গভীর ভাবে এবিষয়ের চিন্তা করা উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এই গুরুতর বিষয়ে যেরূপ উদাসীন, এরূপ উদাসীন থাকাও আর উচিত নয়। এই সময় হইতে সতর্ক না হইলে, পাশ্চাত্য সমাজ সমূহের জঘন্য রীতিনীতিতে এ সমাজ ডুবিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য সমাজের ধর্ম্মহীন জঘন্য হাবভাবগুলি এ পবিত্র সমাজের ধর্ম্ম ও নীতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। পবিত্র আর্য্যভূমি স্বেচ্ছাভালবাসার অপকৃষ্ট অঙ্গে ভূষিত হইয়া পশুর লীলাভূমি হইবে! ধর্ম্মের পুণ্য প্রবাহ পাপ মরুভূমিতে পরিণত হইবে!! [illegible] সাবধান, সাবধান!!

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর। (১)

ভারতচন্দ্র-রচিত অন্নদার মহিমা রাগরাগিণী সংযুক্ত হইয়া নীলমণি সমদ্দার কর্ত্তৃক রাজসভায় গীত হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। যদিও অন্নদামঙ্গল বিশেষ মনোযোগের সহিত লিখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা তৎকালিক রুচির অনুরূপ হয় নাই। আমরা অন্যস্থানে এ বিষয়ে কিছু বলিব। মহারাজা ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রচনা করিয়া ইহার সহিত সংযোজিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপে বিদ্যাসুন্দরের উৎপত্তি হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে; সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর মহাকবি বররুচি প্রণীত। অধুনা বররুচি প্রণীত বলিয়াই সংস্কৃত বিদ্যা-

সুন্দর বাঙ্গলায় পরিচিত। সেই সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, কিন্তু তাহা বাঙ্গলায় আধ-মরা ভাবে অবস্থিত। অধিকাংশ লোকেই তাহার বিষয় অবগত নহে। আজ কাল তাহার বিষয়ে ২।১ টী কথা মাত্র শুনা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সকলের পরিচিত। বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ সকলেই ইহার বিষয় অবগত আছে। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর হইতে গল্পটী সংগ্রহ করিয়া ভারতচন্দ্র তাহাতে নিজের সমস্ত উপকরণ সংযোজনে বিদ্যাসুন্দরকে নূতন করিয়া সাহিত্য সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সবিস্তারে তাহার সমালোচনা করিব। এক্ষণে বিদ্যাসুন্দরের গল্পটী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।
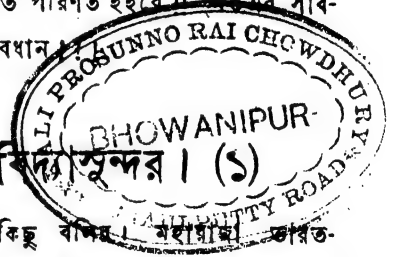
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাজা মানসিংহ মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গলায় প্রেরিত হন, এবং মহারাজা মানসিংহ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার সঙ্গে বর্দ্ধমানে সাক্ষাৎ করেন। ভবানন্দ তখন বাঙ্গলার কানন গোঁইয়ের পদে অধিষ্ঠিত। বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে মানসিংহ লোক মুখে বিদ্যাসুন্দরের কথা শ্রবণ করেন। মানসিংহ তখন কৌতূহলপরবশ হইয়া সুড়ঙ্গ দর্শনাভিলাষে ভবানন্দকে সঙ্গে করিয়া সুড়ঙ্গ স্থানে গমন করেন। তথায় ভবানন্দ বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করেন। ফলত ভারতচন্দ্র ভবানন্দকেই বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের বক্তা করিয়াছেন। এই প্রকারে বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ হয়।

বর্দ্ধমানের অধিপতি মহারাজা বীরসিংহের বিদ্যানামে একটী কন্যা জন্মে। কন্যাটী দেখিতে অতি পরিপাটী। মেয়েটী যেমন রূপবতী, লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ততোধিক গুণবতী হইল। তখন মেয়ে এই পণ করিল যে, যে তাহাকে শাস্ত্রের বিচারে জয় করিতে পারিবে, সে তাহাকে বিবাহ করিবে। ইহা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বিবাহিত হইতে মেয়ে একেবারে নারাজ। মেয়ে যখন এইরূপ পণ করিল, তখন সে বালিকা। রাজা বীরসিংহের মেয়ের রূপ-গুণের কথা ও তাহার এই প্রকার পণের কথা দেশময় রাষ্ট হইয়া গেল। কত শত রাজপুত্র মেয়েকে লাভ করিবার জন্য বর্দ্ধমানে নিত্য আসিতে লাগিল, কিন্তু বিচারে পরাজিত হইয়া ম্লান মুখে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই প্রকারে অনেক দিন কাটিয়া গেল। মেয়ে এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, এখন তাহার বয়ক্রম ষোল বৎসর। মেয়ের সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু বিষম পণের দায়ে কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিতেছে না। যে সমস্ত রাজপুত্র বিবাহার্থী হইতেছে, তাহারা রাজকুলের কুলাঙ্গার। এমন কুলাঙ্গার আজিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা বীরসিংহ মহা দায়ে পড়িলেন। এ দিকে মেয়েকে আর রাখা যায় না। এত বড় মেয়েকে আইবুড় দেখিতে পিতামাতার লজ্জা বোধ হয়; তাই রাজা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রাজ্যে রাজ্যে ভাট প্রেরণ করিলেন। কাঞ্চিপুরের মহারাজা গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দরের বিষয় লোক মুখে অবগত হইয়া কাঞ্চিপুরে ভাট প্রেরণ করিলেন। সুন্দরের রূপ গুণের কথা লোক-প্রসিদ্ধ হইয়া

উঠিয়াছিল। কারণ সুন্দর অন্যান্য রাজপুত্রের ন্যায় অলস ছিলেন না। তিনি রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাট মুখে বিদ্যার গুণের ও রূপের পরিচয় পাইয়া সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করিবার জন্য বড়ই অভিলাষী হইলেন। কিন্তু বাপকে বলিলে পাছে তিনি এত দূরে যাইতে না দেন, তাই তিনি রাত্রিতে গোপনে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করেন। কারণ কাঞ্চিপুর ও বর্দ্ধমান তখন "ছয় মাসের" পথ ব্যবধান। সুন্দর পড়ুয়ার বেশে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পঞ্চ হাতিয়ারওয়ালা বিদেশীকে পাহারাওয়ালারা কিছুতেই নগরের তোরণ অতিক্রম করিতে দিল না। তখন তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুধু পুস্তক ও শুক পক্ষীকে সঙ্গে লইয়া নগরে যাইতে চাহিলেন। তাহাতে পাহারাওয়ালারা পথ ছাড়িয়া দিল। সুন্দর বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিলেন। তিনি নগরের শোভা দেখিয়া মোহিত হইলেন। নানাবিধ গড় অতিক্রম করিতে বড়ই ক্লান্ত হইলেন। তাই সরোবরে স্নান করিয়া শিবপূজা সমাপনান্তর কিছু জলযোগ করিলেন। তৎপরে বিশ্রামার্থ সরোবর তীরে বকুল বৃক্ষের নীচে উপবেশন করিলেন। সুন্দরের অপরূপ রূপ দেখিয়া নাগরিক সকলেই বড় প্রীতি লাভ করিল। অবশেষে মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সুন্দর মালিনীর নিকট বিদ্যার বিষয় অবগত হইতে পারিবেন ভাবিয়া মালিনীর প্রার্থনা মত তাহার বাটীতে বাসা করিলেন। তারপর মালিনীরদ্বারা বাজার করাইয়া সেই সকল সামগ্রী রন্ধন ও ভোজন করেন এবং বিদ্যার বিষয় মালিনীর নিকট শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তারপর ফুলমালা প্রস্তুত করিয়া তাহা মালিনীহস্তে বিদ্যার নিকটে প্রেরণ করিলেন। এদিকে বিদ্যা মালা পাইয়া তৎ বিস্তারিত তথ্য মালিনী মুখে অবগত হইল। বিদ্যার এখন পূর্ণ যৌবন সুতরাং সে প্রেম কি তাহা বুঝিয়াছে। বিদ্যা সুন্দরের বিদ্যাবুদ্ধির কথা পূর্ব্বেই লোক মুখে শুনিয়াছিল, তাই সুন্দরকে দেখিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইল। মালিনীমাসী উভয়ের দর্শন সম্পন্ন করিল। বিদ্যা সুন্দরকে দেখিয়াই মোহিতা। সুন্দরও বিদ্যাকে দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন। তৎপরে সুন্দর কালীর সহায়তায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া রাত্রিযোগে বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

সুন্দরকে এইরূপ অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিদ্যা কিছু ভয় পাইল, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। তৎপরে উভয়ের শাস্ত্রালাপ চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহা নামমাত্র। যাহার হৃদয় প্রেমে আবদ্ধ, সে সহজেই নত হয়। বিচারে সুন্দরের জয় হইল। তারপর বিদ্যার সখীগণ রীতিমত বিদ্যাসুন্দরের গন্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিল। তৎপরে সুখে সমাসীন বিদ্যাসুন্দরের বাসর নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। এই প্রকারে প্রত্যহ সুন্দর রাত্রিযোগে সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার আলয়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিছুকাল এই ভাবে সুখে কাটিয়া গেল। তৎপরে বিদ্যা গর্ভবতী হইল, তখন আর এ সকল লুকান রহিল না। কাজেই সখীগণ রাণীকে এ সংবাদ জানাইল। কিন্তু সুন্দর-ঘটিত বিষয়ের কথা কিছুই বলিল না। রাণী এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে বড়ই ব্যাকুলিত হইলেন। তাড়াতাড়ি ব্যাপার

কি, জানিবার জন্য বিদ্যার মহলে উপস্থিত হইলেন। পরে যখন ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল, তখন কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং বিদ্যাকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

রাজা বীরসিংহও সুতরাং রাণীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তখন কোটালদিগের উপর বিষম তাড়না পড়িয়া গেল। কোটালেরা প্রাণভয়ে প্রাণপণে চোর ধরিতে প্রবৃত্ত হইল। বিদ্যার মন্দিরে সুড়ঙ্গ দেখিয়া তাহারা সকলেই স্ত্রীবেশ ধারণ করিল। কেহ কেহ সখী হইল এবং কনিষ্ঠ কোটাল বিদ্যা সাজিয়া বিদ্যার গৃহে অবস্থান করিল। সুন্দর এ সমস্ত তথ্য কিছুই অবগত নহেন, সুতরাং তিনি রাত্রিকালে অন্যান্য দিনের ন্যায় বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। কোটালেরা তাঁহাকে ধরিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। এই প্রকারে চোর ধরা পড়িল।

রাজা বীরসিংহ চোরের অপরূপ রূপ দেখিয়া ইহাকে শাস্তি দিতে নারাজ হইলেন; কিন্তু রাজধর্ম্মের বশীভূত হইয়া ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে চোরের পরিচয় জানিতে রাজা সভাসদ ও পারিষদগণকে হুকুম করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই চোরের পরিচয় জানিতে সক্ষম হইল না। তখন রাজা নিজে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। চোর তাহাতেও পরিচয় দিল না। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ভয় প্রদর্শনের জন্য চোরকে হত্যা করিতে আজ্ঞা করিলেন। চোর মশানে নীত হইল। কিন্তু কালীর অনুকম্পায় চোর নিষ্কৃতি পাইল।

এদিকে রাজা শুক মুখে ও ভাটমুখে চোরের পরিচয় পাইয়া স্বয়ং মশানে উপস্থিত হইয়া সুন্দরকে গৃহে আনিলেন। এবং তাঁহার করে বিদ্যাকে সমর্পণ করিয়া সাদরে নিজালয়ে রাখিলেন। সুন্দরের একটী পুত্র জন্মিল। সুন্দর কিছুকাল বর্দ্ধমানে থাকিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে কালী পৃথিবী হইতে আপন কিঙ্কর কিঙ্করী বিদ্যা সুন্দরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

ইহাই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। সহজ ভাষায়, সোজা কথায়ও এ উপাখ্যান বর্ণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতচন্দ্র কেমন কৌশল ভরে, কেমন সুচতুরতার সহিত এ উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। কেমন উজ্জ্বলভাবে চিত্র আঁকিয়াছেন। কেমন উপযুক্ত স্থলে সেই চিত্র সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা কেমন স্বাভাবিকী আমরা তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিব। তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র এক একটী উপস্থিত করিয়া তাঁহার কবিত্বের আভাস লোক সমাজে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব। বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিলে চারিটী চিত্র সহজেই নয়ন পথে পতিত হয়। ভারতচন্দ্র বিদ্যার চিত্র, সুন্দরের চিত্র, রাণীর চিত্র ও হীরামালিনীর চিত্র বড় উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা প্রথমে বিদ্যার চিত্র সমালোচনা করিব।

ভারতচন্দ্র বিদ্যার যে রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রথমে হীরামালিনীর মুখে। আমরা দেখিতে পাই, মালিনী বাজারের সামগ্রী সকল আনিয়া দিয়া সুন্দরের আহারের আয়োজন করিয়া দিল। সুন্দর রন্ধন করিয়া আহারান্তে মালিনীকে ডাকিলেন, এবং কথায় কথায় বিদ্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন

করিলেন। মালিনী সুযোগ পাইয়া বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিল। আমরা সে রূপ-বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত হই। তাঁহার সমস্তই সুকুমার। ভারতের এই বিদ্যার চিত্র পাঠ করিয়া আমাদের মনে এক অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। মনে হয়, বুঝি ইনি মানবী বেশে পরী। মনে হয়, বুঝি কোন অলৌকিক রূপলাবণ্যযুক্তা দেবী শাপ-গ্রস্তা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। মনে হয়, বুঝি কে যেন শরৎকালের দেবী প্রতিমা যত্নের সহিত বীরসিংহের ভবনে সংস্থাপন করিয়াছে। ফলত যে অঙ্গ যেরূপ হইলে মানবের নয়ন-বর্দ্ধন ও চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হয়, গুণাকর সেই অঙ্গ সেইরূপ করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন।

তারপর মালিনী যখন ফুলমালা লইয়া বিদ্যার নিকট উপস্থিত হইল, আমরা তখন বিদ্যাকে প্রথম দেখিতে পাই। বিদ্যা ইষ্টদেবতার পূজা করিবার জন্য আসনে উপবেশন করিয়াছেন, কিন্তু ফুল নাই। কারণ আজ এখনও হীরা ফুল লইয়া আইসে নাই। সুন্দর চিকণ মালা গাঁথিতে বড় দেরী করিয়াছেন। এদিকে বিদ্যা অধিক বেলা হওয়াতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতরা। কিন্তু পূজা না করিয়া কিছুই খাইতে পারেন না। হীরাও ফুল নিয়া আসিতেছে না। তাই বিদ্যা হীরার প্রতি কিছু কোপান্বিতা হইয়া বসিয়া আছেন। হীরা যখন ফুল লইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে দেখিয়াই বিদ্যা কহিলেন—

"শুনলো মালিনি কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হইল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে॥

* * * *

দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে বলিয়া শিখাব কালি॥"

ইহাতে বিদ্যার চিত্র সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহাতে বিদ্যার চরিত্র উত্তমরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। "মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা" বলাতে তাঁহার হৃদয়ের সুকুমারতা আমরা দেখিতে পাই। যদিও বিদ্যা মালিনীকে এই প্রকার তিরস্কার করিলেন সত্য এবং এই প্রকার তিরস্কার করাও স্বাভাবিক, তাই বলিয়া তিনি অন্যান্য রাজকুমারীর ন্যায় গর্ব্বিতা কিম্বা অভিমানিনী নহেন। ইহার পরক্ষণেই আমরা দেখিতে পাই যে, যখন মালিনী এ তিরস্কারে ভীতা হইয়া বিদ্যাকে অনুনয় করিল, তখনই বিদ্যা তাহার প্রতি সদয়া হইলেন।

ভারতচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বিদ্যার যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, বিদ্যা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কিছু গর্ব্বিতা হইয়াছেন। তখন তিনি বালিকা, সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা প্রকার অবস্থায় পড়িয়া মানবের স্বভাবত যে নম্রতা শিক্ষা হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। তাই তিনি সব রাজপুত্রকে তুচ্ছ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যখন মালিনীর সহিত পূর্ব্বলিখিত বাদানুবাদের চিত্রে ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, বিদ্যার আর সে ভাব নাই। এখন আর তিনি বালিকা নহেন। এখন তাঁহার

যৌবনের ষোলকলা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আর তিনি গর্ব্বিতা নহেন। এখন যৌবনের যাতনা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই যখন সুন্দর রচিত কৌটা হইতে "শর হেন ফুলশর ফুটিল" তখন—

শিহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হইল বিকল॥

তাই তখন বিদ্যা সবিশেষ তথ্য জানিবার জন্য হীরাকে অনুনয় আরম্ভ করিল। হীরা এইবার সুযোগ পাইয়া নিজের স্বভাবসিদ্ধ চাতুরীগুণে বিদ্যাকে আরও অনুগত করিয়া লইল। এবং অবশেষে সুন্দরের পরিচয় সে যেমন জানিত, তাহা বলিল। সুন্দরের রূপও তৎসঙ্গে সবিস্তারে বর্ণন করিল। এ বর্ণনায় বিশেষ বাহাদুরী আছে। একেইত বিদ্যা এখন আর প্রেমে উদাসিনী নহে, তাহাতে আবার মনোমত এবং রূপবান্ পাত্র পাইলে সে তাহা আর কিছুতেই অবহেলা করিতে পারে না। তাই বিদ্যা সুন্দরকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইল। শুধু যে সুন্দরকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল, এমন নহে, সুন্দরের রূপের ও গুণের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতেই সে মনে মনে সুন্দরে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল।

জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই॥

তাই বিদ্যা এই কথা বলিয়াছিল।

তারপর কোথায় সুন্দরের সহিত দেখা হইবে, তাহা স্থির করিয়া মালিনীকে বিদায় দিল। পরে বিদ্যা খুব মনোযোগের সহিত পূজা করিতে বসিল। কিন্তু এখন বিদ্যার চিত্ত সুন্দরময় হইয়াছে, সুন্দর ছাড়া আর কিছুই সে দেখে না; তাই—

সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥

দেবী কিন্তু তাহাতে বিদ্যার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন বরং আকাশবাণীতে তাহাকে বলিলেন—

"আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে।"

বিদ্যা ইহা শুনিয়া কিছু আশ্বস্তা হইল। মালিনী সাঙ্কেতিক স্থানে সুন্দরকে আনিয়া বিদ্যাকে সম্বাদ দিল। বিদ্যাও ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে সুন্দরকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। দুইজন দুইজনকে দেখিয়া একেবারেই মোহিত হইল। এইখানে ভারতচন্দ্র কেমন কৌশল ভরে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি ভাষা দ্বারা এসকল ভাব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পান নাই। কিন্তু যে তাঁহার রচিত—

অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥

যে ঐ দুই লাইন পাঠ করিবে, সেই উভয়ের ভাব সম্যক বুঝিতে সক্ষম হইবে। উভয়কে দেখিয়া উভয়ের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা ভারতচন্দ্র অতি সহজে অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন;—

মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দোঁহা হৃদয় লইয়া॥

তারপর বিদ্যা নিজালয়ে গমন করিলেন। কিন্তু উৎকণ্ঠায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। কি প্রকারে সুন্দরকে পাইবেন, সেই চিন্তায় বিদ্যা অধীরা। যখন বিদ্যার মনের এই ভাব, তখন কবি কেমন কৌশলভরে সুন্দরকে বিদ্যার আলয়ে হাজির করিয়াছেন। বিদ্যা সুন্দরকে এই ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কিছু ভীতা হইল। ভীতা হইয়া ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিতে

ভুলিয়া গেল, কিন্তু সুন্দর যাই তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন, অমনি সে ত্রুটি সারিয়া লইল। এ ভীতি ও তন্নিবন্ধন ভদ্রজনোচিত ব্যবহারের অভাব বঙ্গীয় কুলবালার পক্ষে খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। কারণ অসূর্য্যাম্পস্যাকুলবালা অপরিচিত পুরুষের নিকট হাজার মুখরা হইলেও সলজ্জা। ইহা বঙ্গের ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর রীতিমত বিচার হইল। বিচারে বিদ্যা পরাজিতা হইল। তাহার কারণ এই যে, বিদ্যা প্রথম সন্দর্শনেই মন প্রাণ সুন্দরে সমর্পণ করিয়াছিল। বিচারে সুন্দরের গুণের পরিচয় পাইয়া বিদ্যা বড়ই আনন্দিতা হইল। সখীরাও বিদ্যার সুখে সুখিনী হইয়া বিদ্যাসুন্দরের গন্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিল।

বিদ্যাসুন্দরের এই স্থান লক্ষ্য করিয়া বঙ্গের খ্যাতনামা একজন সুলেখক বিদ্যার চরিত্রে অনেক দোষ দর্শাইয়া বিষম বিকৃত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিদ্যা একজন অপরিচিত ব্যক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়া বড়ই কুকার্য্য করিয়াছে। তিনি আরও কত কি বলিয়াছেন। তিনি সুন্দরকে অপরিণামদর্শী লম্পট যুবক ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া, বিদ্যার তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ বড়ই দোষাবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা সুন্দরের চরিত্র সমালোচনার সময়ে সুন্দর যে লম্পট অপরিণামদর্শী যুবক নহেন, তাহা প্রমাণ করিব। বিদ্যাও সুন্দরে আত্মসমর্পণ করিয়া কিছুই কুকার্য্য করেন নাই। একেত বিদ্যা, সুন্দরের বিষয় পূর্ব্বেই লোক মুখে শুনিয়াছিল, এক্ষণে হীরা মালিনীর মুখে সেই সুন্দর বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন শুনিতে পাইল। একথা অবিশ্বাস করিবার কিছুই কারণ নাই। অন্য ব্যক্তি যে সুন্দরের নামে পরিচিত হইতে পারে, এ ভাবনা ভাবিবার তাহার দরকার ছিল না। কারণ বিদ্যার জ্ঞানের কথা লোক-প্রসিদ্ধ ছিল। অনেকানেক রাজপুত্র বিদ্যার নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া, অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া আর কেহই বিদ্যার সহিত বিচার করিতে সাহসী হইত না। মনে করুন, যেন অন্য ব্যক্তিই সুন্দর নামে পরিচিত হইয়া বিদ্যাকে বিবাহ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতেই বা বিদ্যার চরিত্রে কি দোষ স্পর্শে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বিদ্যা পণ করিয়াছে, যে তাহাকে বিচারে পরাজয় করিবে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে; সুতরাং সুন্দর যাহা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে যদি তাহা না হয়, অথচ বিচারে বিদ্যাকে পরাজয় করে, তাহা হইলেও ন্যায়ত ধর্ম্মত সেই বিদ্যার স্বামী। তারপর সুন্দর আসিয়া বিচারে বিদ্যাকে পরাজয় করিল, সুতরাং বিদ্যা তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিল। এ আত্ম সমর্পণে বিদ্যার কিছুই দোষ নাই, বরং স্বাভাবিক হইয়াছে। বিশেষত কালী আকাশবাণীতে বলিয়াছেন যে "আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে"—সুতরাং বিদ্যার যে সংশয় হওয়া খুব স্বাভাবিক, তাহা এই আকাশবাণীতে একেবারেই দূর হইয়া গেল। বিদ্যা হিন্দুর মেয়ে, আকাশবাণীতে তাহার অটল বিশ্বাস। সুতরাং বিদ্যার এই আত্ম সমর্পণে কিছুই দোষ দৃষ্ট হয় না। যিনি তবুও ইহাতে দোষ দেখেন, তাঁহাকে কিছুই বলিবার নাই। শ্রীরজনীকান্ত রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। জীবনময়।—কাব্য—শ্রীমদন-মোহন মিত্র প্রণীত; মূল্য ॥০। মদন বাবু একজন প্রকৃত কবি; অনেকদিন পূর্ব্বে তিনি কবিতাকদম্ব রচনা করেন। কবিতা-কদম্বে অনেক সরস কবিতা বিদ্যমান আছে। মদনবাবু আগরতলার রাজকবি পদ লাভ করিয়া অনেক দিন নীরবে ছিলেন। আবার তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে দেখিতে পাইয়া আমরা নিতান্ত আনন্দিত হইলাম। তাঁহার রচিত এই জীবনময় কাব্যের স্থানে স্থানে উচ্চদরের কবিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও সরল, রুচি পরিমার্জ্জিত, উদ্দেশ্য অতি মহৎ, রচনা মৌলিক। তাঁহার পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি।

২। প্রকৃতি।—শ্রীরেবতীমোহন রায় মৌলিক প্রণীত, মূল্য ।৵০ এখানিও পদ্যময় গ্রন্থ। গ্রন্থকারকে আমরা চিনি না। তিনি যিনিই হউন, তিনি যে একজন সুকবি, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। এই কবির ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। দীর্ঘ জীবন পাইলে, ইহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা অনেকাংশে উপকৃত হইবে। ইহার এই "প্রকৃতি" বাস্তবিকই প্রকৃতি। স্বভাবের মধুর বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। প্রকৃতির ভাবে-ভোলা কবির লেখা কত মধুর পাঠক দেখুন—

"বুঝিনা কিসের খেলা,
হয়ে থাকি ভাবে ভোলা
বসি তটিনীর পাশে শান্তরবি কিরণে,
উপরে তপন যায়, মিশিয়া নদীর গায়
উজলি সলিলরাশি দ্রব রৌপ্য কিরণে;—
নেচে নেচে ঢেউগুলি, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি
সায়াহ্ন আকাশ রাগে রঞ্জি নানা বরণে।
চেয়ে থাকি এক ধ্যানে, কত ভাব উঠে মনে;
নীরবে প্রাণের তার উঠে যেন বাজিয়ে।
সুদূরে নদীর তীরে, রবি ডোবে ধীরে ধীরে;
চেয়ে দেখি একদিঠে আত্ম হারা হইয়ে।"

"চাঁদের দেশে" কবিতাটী আরো মধুর—

"যাওরে পাখী উড়ে উড়ে,
নীল আকাশে ধীরে ধীরে,
ছড়ায়ে ডানা নিঝুম ঝোঁকে,
মেঘের সনে মিশে।

মেঘের সনে করে খেলা,
নিরাবিলি সন্ধ্যাবেলা
উড়ে উড়ে অমনি করে
চলে যাই অই চাঁদের দেশে।"

কবি যা লেখেন, তাই মিষ্ট, তাই মধুর— "বর্ষাজলে" নামক পদ্যটী দেখ। তারপর পাতা উল্টাইয়া গোলাপ নামক পদ্যটীর শেষাংশ দেখ—

"হৃদয়ে হৃদয়ে মিলায়ে দুজনে
খেলাব বিরলে প্রেমের খেলা;
রহিব চাহিয়ে অনিমিখ্ হয়ে
ধীরে ধীরে যাবে ডুবিয়া বেলা।"
"আঁধারের কোলে যাইব মিলিয়া
ডুবিয়া অতল সাগর জলে;
দুইটী রতন রহিব পড়িয়া
বিরলে অতল সাগর তলে।"

কবির ভাবের উচ্ছ্বাস যেন অনন্ত ছুঁইতে চায়। বীণা নামক পদ্যটীর এক স্থান রাখিয়া আর এক স্থান উদ্ধৃত করা যায় না—

"স্বরগ মরত আকাশ যুড়িয়া

ছড়ায়ে পড়েছে আনন্দ ধারা,
সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে, মধুর আবেশে,
হয়েছে ভূধর আপন হারা।
চাঁদের কিরণে সুনীল গগনে
মিশিয়ে গিয়াছে বীণার তান;
ফুটিছে কুসুম; ছুটিছে নিঝর
স্তবধ পবন শুনিয়া গান।
তারকা মণ্ডলী বাঁধুনি ছিঁড়িয়া
ফুটিছে আসিয়া গাছের তলে,
ছায়ায় ছায়ায় শিশির পাতায়
স্তবধ জোছনা আপনাভুলে।

* * *

বীণার ঝঙ্কারে হৃদয়ের তারে
বাজিয়া উঠিছে প্রাণের গান,
নিঝরের ধারে কুল কুল স্বরে
অনন্ত সাগরে মিশিছে তান।"

আর তুলিব না। ইহাতেও যিনি কবিকে চিনিতে পারিবেন না, তাঁহাকে আমরা বুঝাইতে অক্ষম।

৩। অদ্ভুত রামায়ণ।—শ্রীভোজদেব গোস্বামী প্রণীত, মূল্য ৵০। এখানি ব্যাঙ্গোক্তিপূর্ণ গ্রন্থ।—এখনও অসম্পূর্ণ, সুতরাং বিস্তারিত সমালোচনার সময় হয় নাই। লেখা মন্দ নয়।

৪। উন্মত্ত প্রলাপ।—প্রথম ভাগ—শ্রীহৃদয়নাথ গোস্বামী প্রণীত, মূল্য ।৵০। এখানিও পদ্যময় গ্রন্থ। পুস্তক খানির স্থানে স্থানে বড়ই মিষ্ট হইয়াছে। কালে ইঁহার হাতে অনেক অমৃতময়ী কবিতা নিঃসৃত হইবে, আশা করা যায়।

৫। লহরী।—শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত, মূল্য ॥০। আমাদের দেশে অল্প বয়স্কা বালিকা এরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, পূর্ব্বে আমাদের এ ধারণা ছিল না। উৎসর্গটী অতি পরিপাটী হইয়াছে। অন্যান্য কবিতার স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে।

৬। আর্য্য বিধবা।—শ্রীপ্যারীশঙ্কর গুপ্ত বিরচিত; মূল্য ৶০। পুস্তক খানির আরম্ভ অতি উচ্চদরের হইয়াছে। কিন্তু শেষাংশে লেখক ভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্যারীবাবুর অনেকগুলি মত যুক্তি-যুক্ত এবং উদার। এ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

৭। ভক্তি ও ভক্ত।—শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহোদয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত। মূল্য ॥৵০, দ্বিতীয় সংস্করণ। নারদকৃত ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তি সূত্র প্রথমে ব্যাখ্যাত করিয়া, গ্রন্থকার কতকগুলি ভক্তের জীবন-চরিত ও কয়েকটী ভক্তিভাবপূর্ণ সঙ্গীত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রের নিকট যে এ পুস্তক খানি অত্যন্ত আদৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। তজ্জন্য গ্রন্থ-কারকে শত শত ধন্যবাদ।

৮। কবিতা রত্নাবলী।—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০; উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশে এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইয়াছে। কাব্যালঙ্কার সম্বন্ধে উপক্রমণিকায় একটী সুন্দর পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা পাঠে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা আছে। কবিতা-রত্নাবলীতে যে সকল পদ্য সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি যে অতি সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রভৃতি আধুনিক কবিদিগের দুটী চারিটী উৎকৃষ্ট কবিতা তুলিয়া দিলে ভাল হইত। আশা করি, এ বিষয়ে তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের বাঙ্গলা স্কুলসমূহে মান্ধাতার আমল হইতে একই রকম পুস্তক অধীত হইয়া আসিতেছে, ইহা দুঃখের বিষয়। কবিতা-রত্নাবলীর ন্যায় গ্রন্থ যে পাঠ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবার নিতান্ত উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। (২য় প্রস্তাব)

অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রকারদিগের বিষয় কিছু বলিবার পূর্ব্বে, ধর্ম্ম কি,—ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মকে কি ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়াছেন,—কতখানি স্মৃতিশাস্ত্র আছে বলিয়া জানা যায়—এই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য, স্বপ্রণীত পরাশর স্মৃতির ব্যাখ্যানে ধর্ম্মশব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

'অভ্যুদয়—নিঃশ্রেয়সে সাধনত্বেন ধারয়তি ইতি ধর্ম্ম।.. দ্বিবিধো ধর্ম্মঃ,—শ্রৌতঃ স্মার্ত্তশ্চ।....তত্র বেদমূলো দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ শ্রৌতঃ, শৌচাচারাচমনাদিস্মার্ত্তঃ।

ধর্ম্মাঃ বহুবিধাঃ লোকে শ্রুতিভেদমুখোদ্ভবাঃ।
দেশধর্ম্মাশ্চ দৃশ্যন্তে কুলধর্ম্মাস্তথৈব চ॥
জাতিধর্ম্মাঃ বয়োধর্ম্মাঃ গুণধর্ম্মাশ্চ শোভনে!
শরীর-কালধর্ম্মাশ্চ আপদ্ধর্ম্মাস্তথৈব চ।
এতদ্ধর্ম্মস্য নানাত্বং ক্রিয়তে লোকবাসিভিঃ॥
ইতি মহাভারতে আনুশাসনিকে পর্ব্বনি।"

যদ্দ্বারা মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মোক্ষ সংসাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দুই প্রকার, শ্রৌতধর্ম্ম ও স্মার্ত্তধর্ম্ম। মনুষ্যলোকে আরো নানাধর্ম্ম প্রচলিত আছে। দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্ম (যেমন ব্রাহ্মণের যাজনাদি), বয়োধর্ম্ম (অষ্টমবর্ষে উপনয়ন) গুণধর্ম্ম (রাজার প্রজাপালন), শরীরধর্ম্ম (বৃদ্ধের বনগমনাদি), কালধর্ম্ম (সংক্রান্তিতে দানাদি), আপদধর্ম্ম।

সর্ব্বসমেত, লঘু মধ্যম বৃহৎ বৃদ্ধ প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র, একশতেরও অধিক হইবে। ইহার মধ্যে ১৯ খানা পণ্ডিত ভবানীচরণ বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছেন। ২৭ খানা পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর দুই খণ্ডে অতঃপর প্রকাশ করিয়াছেন। পৈঠিনসী নিম্নোক্ত ষট্‌ত্রিংশৎ স্মৃতিশাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন—

'তেষাংমন্বঙ্গিরো ব্যাস-গৌতমো লিখিতোযম
বশিষ্ঠ দক্ষসংবর্ত্ত-শাতাতপ পরাশরাঃ।
বিষ্ণ্বাপস্তম্ব-হারীতাঃ শংখঃ কাত্যায়নো ভৃগুঃ।
প্রচেতা নারদো যোগিবৌধায়ন-পিতামহাঃ।
সুমন্তুঃ কশ্যপো বভ্রুঃ পৈঠীনো ব্যাঘ্র এব চ।
সত্যব্রতো ভরদ্বাজো গার্গ্যঃ কার্ষ্ণাজিনিস্তথা
জাবালির্জমদগ্নিশ্চ লৌগাক্ষিঃ ব্রহ্মসম্ভবঃ।
ইতি ধর্ম্ম প্রণেতারঃ ষট্‌ত্রিংশদৃষয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

মহাভারতে আশ্বমেধিকে পর্ব্বে—

"উমা-মহেশ্বরাশ্চৈব নন্দিধর্ম্মাশ্চ পাবনাঃ
ব্রহ্মণা কথিতাশ্চৈব কৌমারাশ্চ শ্রুতাময়া।
ধূম্রায়ন-কৃতাধর্ম্মাঃ কণ্বা বৈশ্বানরা অপি।
ভার্গবা যাজ্ঞবল্ক্যাশ্চ মার্কণ্ডেয়াশ্চ কৌশিকাঃ॥
ভরদ্বাজকৃতা যে চ বৃহস্পতিকৃতাশ্চ যে।
কুণেশ্চ কুণিবাহোশ্চ বিশ্বামিত্রকৃতাশ্চ যে।
সুমন্তু জৈমিনিকৃতাঃ শাকুনেয়াস্তথৈব চ।
পুলস্ত্যপুলহোদ্গীতাঃ পাবকীয়াস্তথৈব চ।
অগস্ত্য-গীতামৌদ্গল্যাঃ শাণ্ডিল্যাঃ সৌলভায়নাঃ।
বালখিল্যকৃতা যে চ, যে চ সপ্তর্ষিভিঃ কৃতাঃ
বৈয়াঘ্রা-ব্যাসগীতাশ্চ বিভণ্ডককৃতাশ্চ যে।
তথা বিদুরবাক্যানি ভৃগোরঙ্গিরসস্তথা।
বৈশম্পায়ন-গীতাশ্চ যে চান্যে এবমাদয়ঃ॥"

মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন—

জাবালির্নাচিকেতশ্চ স্কন্দো লৌগাক্ষি-কশ্যপী।
ব্যাসঃ সনৎকুমারশ্চ শতর্জ্জুর্জনকস্তথা।'

ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতূকর্ণ্যঃ কপিঞ্জলঃ!
বৌধায়নঃ কণাদশ্চ বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ।
উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মণীষিণঃ।*

মহামতি ডাক্তার বুলারসাহেব, স্ব-প্রণীত হিন্দু-ব্যবস্থাবলী গ্রন্থে ৭৭ খানা বিভিন্ন স্মৃতি ও ৩৬ খানা স্মৃতির বিভিন্ন সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ১১৪ খানা ভিন্ন, কোকিল, গোভিল, সূর্য্যারুণ, শৌনক স্মৃতি প্রভৃতি আরো কতিপয় স্মৃতি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। পণ্ডিত জীবানন্দ যে ২৭খান স্মৃতি সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ৩ খান অত্রিসংহিতা, ২ খান বিষ্ণু সংহিতা, ২ খান হারীত সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২ খানা উশনঃসংহিতা, অঙ্গিরাসংহিতা, যমাপস্তম্ভ-সংবর্ত্ত-কাত্যায়ন বৃহস্পতি প্রণীতা সংহিতা, ২ খান পরাশর, ২ খান ব্যাস সংহিতা, শঙ্খলিখিত দক্ষ সংহিতা, ২ খান গৌতম, এবং ২ খান বশিষ্ঠসংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে, মনুসংহিতায় কি কি আছে, তাহা বলা হয় নাই। সম্প্রতি এখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি। মনুসংহিতা, দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে ১১৯, দ্বিতীয়ে ২৪৯, তৃতীয়ে ২৮৬, চতুর্থে ২৬০, পঞ্চমে ১৬৯, ষষ্ঠে ৯৭, সপ্তমে ২২৬, অষ্টমে ৪২০, নবমে ৩৩৬, দশমে ১৩১, একাদশে ২৬৬, দ্বাদশ অধ্যায়ে ১২৬ শ্লোক আছে।
"জগতশ্চ সমুৎপত্তিং (১) সংস্কারবিধিমেব চ,
ব্রতচর্য্যোপচারঞ্চ (২) স্নানস্য চ পরং বিধিং,
দারাধিগমনঞ্চৈব, বিবাহানাঞ্চ লক্ষণং,
মহাযজ্ঞবিধানঞ্চ, শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতং। ৩
বৃত্তীনাং লক্ষণঞ্চৈব, স্নাতকস্য ব্রতানি চ। ৪
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ, শৌচঞ্চ, দ্রব্যাণাং শুদ্ধিমেব চ,
স্ত্রীধর্ম্মযোগং (৫) তাপস্যং, মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ (৬) রাজ্ঞশ্চ ধর্ম্মমখিলং (৭) কার্য্যাণাঞ্চ বিনির্ণয়ং, সাক্ষিপ্রশ্নবিধানঞ্চ (৮) ধর্ম্মং স্ত্রীপুংসয়োরপি, বিভাগধর্ম্মং, দ্যূতঞ্চ, কণ্টকানাঞ্চ শোধনং বৈশ্যশূদ্রোপচারঞ্চ (৯) সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সম্ভবং, আপদ্ধর্ম্মঞ্চ বর্ণানাং (১০) প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা। ১১
সংসারগমনঞ্চৈব, ত্রিবিধং কর্ম্মসম্ভবং
নিঃশ্রেয়সং, কর্ম্মণাঞ্চ গুণদোষপরীক্ষণং। ১২
মনুসংহিতা (১ম অধ্যায়, ১১১—১১৭)

কালক্রমে মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাবলী হইতে লৌকিক আচার-ব্যবহার বিভিন্নতা ধারণ করিতে লাগিল। ভগবান্ মনুর ব্যবস্থাতে লোকের সম্মাননা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া উঠিল। সর্ব্বতোভাবে মনুর ব্যবস্থা প্রতিপালিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। অন্যান্য স্মার্ত্তকারগণ সময়োচিত ব্যবস্থাগ্রন্থ প্রণয়ন করত লোক সমাজে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, দেবর্ষি নারদ, গৌতম, বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি ও পরাশর সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মহামহোপাধ্যায় স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের গ্রন্থাবলী প্রায়ই অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত। কচিৎ অন্যান্য ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। অত্রি, বৃহস্পতি, বুধ, শঙ্খ, কাশ্যপ, কাম্বায়ন, শাতাতপ ও উশনা প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র, গদ্য বা পদ্য-গদ্যের সংমিশ্রণে লিখিত। এই সমুদয় স্মৃতির অনেকাংশে উত্তরকালে সংস্কৃত পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র হইতে সমুদ্ধৃত বলিয়া অনুমিত হয়। শঙ্খ, দক্ষ ও পরাশর প্রণীত প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্র উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

* দান খণ্ড—৫২৭—৫২৮ পৃষ্ঠা।

বলিয়া বোধ হয় না। কারণ এই স্মৃতিত্রয় হইতে সমুদ্ধৃত শ্লোকগুলি উত্তরকালীন সংগ্রহ ও নিবন্ধ গ্রন্থাদিতে অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়।

পরাশরস্মৃতি বা লঘুপরাশর, বৃহৎ-পরাশরস্মৃতি অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া অনুমিত হয়। তিনখানা হারীত সংহিতা বর্ত্তমান আছে। ব্যাস, বৃহস্পতি, উশনা, যম, অত্রি, অঙ্গিরা, প্রজাপতি, দেবল, শঙ্খলিখিতাদির নামে যে সকল স্মৃতিশাস্ত্র বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উক্ত স্মৃতিশাস্ত্র সমূহে সংগ্রহ ও টীকাকারদিগের সমুদ্ধৃত অংশগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। উক্ত মহর্ষিদিগের প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থগুলি নিদারুণ কালের কবলিত হইয়াছে—ইহা নিতান্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সংগ্রহ-টীকাকারাদির সমুদ্ধৃত অংশ হইতে বিলুপ্ত স্মৃতিগুলির কিয়দংশ উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কি এই মহামূল্য গ্রন্থরাশি বিলোপের মহতী ক্ষতি পরিপূরিত হওয়া সম্ভব? বিশেষতঃ টীকা ও সংগ্রহকার মহাশয়েরা অনেক সময়ই স্বীয় স্মৃতিশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত, অধীত গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতে গিয়া, পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। হস্তলিখিত গ্রন্থের অভাবে, তাঁহারা যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। ভাষ্যটীকা ও সংগ্রহকারগণের দ্বারা আমাদের আরো একটী গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। জনসমাজে তাঁহাদেব গ্রন্থাদির বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংহিতাকারদিগের প্রণীত গ্রন্থাদির বিরল প্রচার হইয়া উঠে। তাঁহাদের সংগ্রহ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই লোকে সন্তুষ্ট থাকিত। মূল গ্রন্থাদির অধ্যয়ন আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিত না। এমন কি, বর্ত্তমান কালে অনেক টোলের পণ্ডিত মহাশয়গণ, স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত তত্ত্বাদিধৃত বচন ভিন্ন সংহিতাকারদিগের অন্যান্য অংশ অপ্রামাণিক মনে করিয়া তাহাতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্তাচার্য্যগণ যে বিভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন সময়ে স্ব স্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থাদি দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোন স্মৃতিশাস্ত্রই খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে; ইহা বিজ্ঞানেশ্বর অপরার্ক প্রভৃতি ভাষ্যকারাদির সমুদ্ধৃত অংশ দৃষ্টে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থ ভিন্ন পরবর্ত্তীদিগের প্রণীত গ্রন্থ উদ্ধৃত করেন নাই। অনেকানেক ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন মনুভাষ্য প্রণেতা মেধাতিথির গ্রন্থেও পরিলক্ষিত হয়। মেধাতিথি অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত প্রচলিত স্মৃতি, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাতে মুণ্ডিত-কেশ বৌদ্ধদিগের, নানক নামক তৎকাল প্রচলিত মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে কোনরূপ মুদ্রা প্রচলিত থাকার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রথম ও তৃতীয় গারুড় পুরাণে এবং দ্বিতীয় অধ্যায় অগ্নিপুরাণে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ইহা, মনুসংহিতার পরেই,

সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা ভিন্ন ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ আর নাই। ইহার ভাষ্য ও টীকা করিয়া অনেক স্মার্ত্তাচার্য্য জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহার চারিখানি সুপ্রসিদ্ধ টীকা আছে। তন্মধ্যে মিতাক্ষরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভুবন-বিখ্যাত; বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরার মত অবনত মস্তকে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে ইহা অপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর নাই।

মিতাক্ষরা (বা ঋজু মিতাক্ষরা, প্রমিতাক্ষরা,—সম্মিতাক্ষরা টীকা) যোগর্ষি বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত। এই মহাপুরুষ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বর্ত্তমান নিজাম-রাজ্যের অন্তর্ভূত কল্যাণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা বিক্রমাঙ্কের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রন্থের শেষভাগে রাজার প্রশংসাসূচক কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া, গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। রাজা বিক্রমাঙ্ক দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টীয় ১০৭৬ হইতে ১১২৭অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মিতাক্ষরা অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। সুপণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব ইহার দায়াধিকার (সমস্ত পুস্তকের ⅓ কি ⅕ অংশ মাত্র) ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির দ্বিতীয় টিকাকার, কঙ্কানের অন্তর্গত শীলাহার রাজ অপরাদিত্য বা অপারর্ক। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১১০৮ অব্দের তাঁহার একখানা তাম্র শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাজা অপরাদিত্যের ভাষ্যে, বিলুপ্ত স্মৃতি গুলির অনেক বচন ও শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অপরাদিত্য প্রণীত ভাষ্যে মিতাক্ষরা বা বিজ্ঞানেশ্বরের নামোল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা মিতাক্ষরা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নয়,বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। উভয় গ্রন্থের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। স্মৃতি চন্দ্রিকা, চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি, মদনপারিজাত, দত্তক মীমাংসা, সরস্বতী বিলাস প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার অনেকাংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকিলেও, মিতাক্ষরার ন্যায় ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। যে যে স্থলে মিতাক্ষরা হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে, অপরাদিত্য উপনীত হইয়াছেন, শূলপাণিকৃত দীপকালিকায় এবং দায়ভাগে তত্তৎস্থলের অধিকাংশ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির তৃতীয় টীকা দীপকালিকা নামে পরিচিত। ইহা শূলপাণি বিরচিত। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্থানে স্থানে শূলপাণির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বঙ্গভূমিকে সমালঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শূলপাণি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার টীকা অতি সংক্ষিপ্ত; নারায়ণের মনুসংহিতার টীকার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

বিশ্বরূপ প্রণীত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকা, বিলুপ্ত হইয়া,নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মিতাক্ষরা, ভারতের সর্ব্বত্র এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহার মত এতদূর ভক্তিভাবে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়া আসিতেছে যে, মিতাক্ষরা ভাষ্য গ্রন্থ হইলেও, ইহার অর্থ বিশদীকৃত করিবার জন্য, অনেক স্মার্ত্তচূড়ামণিকে স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। মিতাক্ষরার প্রধান

টীকাকার বিশ্বেশ্বর ভট্ট। ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাষ্ঠারাজ মদনপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মেধাতিথির মনুভাষ্য, প্রথমত এই পণ্ডিতবরই পরিশুদ্ধ রূপে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মদনপালের আদেশানুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া, লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন। মিতাক্ষরার বিশ্বেশ্বর প্রণীত এই টীকার নাম সুবোধিনী। তিনি মদনপারিজাত, স্মৃতিকৌমুদী এবং মহার্ণব নামক অপর তিনখানি স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থত্রয় মহারাজ মদনপাল কর্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উক্ত গ্রন্থত্রয় মহারাজ মদনপালের সভাপণ্ডিত দ্বারা বিরচিত হইয়া, তাঁহার স্বকীয় নামে প্রচলিত হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর। সুবোধিনী বা বিশ্বেশ্বরীকে, টীকা না বলিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেই হয়। মিতাক্ষরার দুর্ব্বোধ্য অংশগুলি মাত্র তিনি বিশদীকৃত করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

হিন্দুর পবিত্রতম তীর্থস্থান বারাণসীতে নন্দপণ্ডিত নামক জনৈক ধর্ম্মাধিকারীও মিতাক্ষরার একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই টীকা, গ্রন্থকার পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথমাধ্যায়ের দ্বি-তৃতীয়াংশের টীকা মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নন্দপণ্ডিত, বিষ্ণুস্মৃতি ও পরাশর স্মৃতির টীকা, এবং দত্তকমীমাংসা নামক স্মৃতিগ্রন্থ বিরচন করেন। বিষ্ণুস্মৃতির বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকার নাম বৈজয়ন্তী। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে, ইহা বিরচিত হয়। বৈজয়ন্তীর উদ্ধৃতাংশ সহ বিষ্ণুস্মৃতি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতাগ্রণী ডাক্তর জলি মহোদয় কর্তৃক কলিকাতা এসিয়াটিকসোসাইটীর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছে।

মিতাক্ষরার তৃতীয় টীকা লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক বিরচিত। ইহা লক্ষ্মী-ব্যাখ্যান বা বালম্ভট্ট টীকা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি স্বপ্রণীত টীকা, তাঁহার পুত্র বালকৃষ্ণের নামে প্রচারিত করেন। অথবা উক্ত টীকার রচয়িতাই বালকৃষ্ণ, লক্ষ্মীদেবী নহেন। ইহাতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরচিত বীরমিত্রোদয়, নির্ণয়সিন্ধু এবং বৈজয়ন্তীর বচন ও প্রমাণ পরিগৃহীত হইয়াছে। বারাণসীতে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত, ইহার এক খানি হস্তলিখিত প্রতিলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়া থাকিবে।

পরাশর স্মৃতি (লঘুপরাশর), কলিযুগের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভে উক্ত হইয়াছে।

কৃতে তু মানবাধর্ম্মা,স্ত্রেতায়াং গৌতমাঃস্মৃতাঃ;
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ, কলৌ পারাশরাঃ
স্মৃতাঃ॥ * ২৪।

পরাশর স্মৃতির ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চূড়ামণি মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য)। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি বিজয় নগরের প্রবল পরাক্রান্ত বুক্করাজের সর্ব্ব প্রধান অমাত্য ছিলেন। বেদবেদাঙ্গাদিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত সায়ণাচার্য্য তাঁহারই সহোদর ছিলেন বলিয়া, তিনি স্বপ্রণীত পরাশর ভাষ্যের উপক্রমনিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপ্রণীত মাধবীয় দায়বিভাগ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে।

* পূজ্যপাদ পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত পরাশর-মাধব, ১১১ পৃষ্ঠা।

"শ্রীমতী জননী যস্য, সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥
—পরাশর-মাধব, তৃতীয় পৃষ্ঠা।

নন্দপণ্ডিত কর্ত্তৃক যে পরাশর-স্মৃতির অপর একখানি টীকা বিরচিত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে হরদত্ত নামক জনৈক স্মার্ত্তচূড়ামণি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রের উজ্জ্বলা নামক, এবং গৌতম স্মৃতির গৌতমীয় মিতাক্ষরা নামধেয় টীকা প্রণয়ন করেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি গৌতমীয় মিতাক্ষরা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বীর মিত্রোদয় প্রণেতা মিত্রমিশ্র, হরদত্তের ভাষ্য স্বপ্রণীত গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মিত্রমিশ্র সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরার অনুশাসনানুসারে বিচার কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগ, অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রচলিত। দায়ভাগের মতানুরূপই বঙ্গের বিচারপ্রণালী সম্পন্ন হইতেছে। দায়ভাগ, মিতাক্ষরার ন্যায় বঙ্গদেশীয় পরবর্ত্তী স্মার্ত্তাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ ভাষ্য-বিবৃতি টীকাদি দ্বারা সমালঙ্কৃত হইয়াছে। কমলাকর, স্বপ্রণীত বিবাদতাণ্ডবে, জীমূতবাহনকে বঙ্গীয় স্মার্ত্ত আচার্য্যদিগের শীর্ষস্থানীয় ও প্রাচীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। জীমূতবাহন ত্রয়োদশশতাব্দীতে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি স্বপ্রণীত দায়ভাগে গোবিন্দরাজকৃত মনুসংহিতার টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত জীমূতবাহন প্রণীত ধর্ম্মরত্ন নামক আর একখানি স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। † জীমূতবাহন, শূলপানি ও রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, সন্দেহ নাই। দায়ক্রম-সংগ্রহকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিবাদার্ণব-ভঞ্জন নামক আর একখানি স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার রঘুনন্দন, শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারাদি বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্তপণ্ডিতদিগের বচন প্রমাণাদি স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিবাদার্ণব সেতু এবং বিবাদভঙ্গার্ণব নামক গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে, ও বঙ্গে সংস্কৃতচর্চ্চা শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। দত্তকাধিকার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে, কুবের পণ্ডিতের দত্তক চন্দ্রিকার মত সর্ব্বত্র প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তিনি স্মৃতিচন্দ্রিকা নামে আর একখানি স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ (Tagore Law Professorship.) এর সংস্থাপয়িতা ভুবন বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয় সাত খানি দত্তকাধিকার সম্বন্ধীয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে স্বপ্রণীত দত্তকশিরোমণি সঙ্কলিত করেন।

মিথিলা ও বারাণসীতে নন্দপণ্ডিত প্রণীত দত্তকমীমাংসা, এবং দ্বৈতনির্ণয়প্রণেতা শঙ্করভট্টের মত ও বচন, প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। উভয়েই বারানসী তীর্থে বাস করিতেন। শঙ্করভট্ট

* জীমূতবাহন শূলপাণি স্মার্ত্তগৌড়াদয়ঃ প্রাচ্যাঃ।

† Dr. Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit Mss., (vol III., p. 297.

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, নন্দপণ্ডিত সপ্তদশশতাব্দীর প্রারম্ভে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শঙ্করভট্ট, সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ ময়ূখকার স্মার্ত্তশিরোমণি নীলকণ্ঠ ভট্টের জনক ছিলেন। নীলকণ্ঠকৃত ব্যবহার ময়ূখাবলী, মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়, ধর্ম্মসিন্ধু, নির্ণয়সিন্ধু, এবং সংস্কারকৌস্তুভের মত, পশ্চিম ভারতে প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। শঙ্করভট্ট, মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে স্বদেশ পরিত্যাগ পুরঃসর, বারাণসীতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। বীরমিত্রোদয় মিতাক্ষরার ভাষ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মিত্রমিশ্র ওর্চ্চা (বুন্দেলখণ্ড) রাজ বীরসিংহদেব বুন্দেলার নামে স্বীয় গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত করেন। এই বীরসিংহই, মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবর সাহের প্রিয়তম বয়স্য ও মন্ত্রী মহামতি আবুয়লফাজলের গুপ্তহন্তারক বলিয়া, ভারতের ইতিহাসে অপকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন!

মিথিলা প্রদেশে, মিতাক্ষরা ভিন্ন, বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত বিবাদ-চিন্তামণি, ব্যবহার চিন্তামণি, চণ্ডেশ্বর প্রণীত বিবাদ-রত্নাকর, রাজ্ঞী লক্ষ্মীদেবী প্রণীত বিবাদচন্দ্র, প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মিথিলার দুইজন বাচস্পতিমিশ্র, বিভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ষড়দর্শনের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র, খ্রীষ্টীয় দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অপর স্মার্ত্তচূড়ামণি বাচস্পতিমিশ্র, মিথিলারাজ হরিনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া স্বপ্রণীত শূদ্রাচার-চিন্তামণিতে, আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মিথিলারাজ হরিনারায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন *। চণ্ডেশ্বর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলারাজ হর্ষসিংহ দেবের প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত ছিলেন। রাজ্ঞী লক্ষ্মীদেবী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অভ্যুদিত হইয়া মিথিলাভূমিকে স্বকীয় বিদ্যালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে (মান্দ্রাজ) মিতাক্ষরা ভিন্ন দেবন্নভট্ট প্রণীত স্মৃতিচন্দ্রিকা মাধবাচার্য্যকৃত দায়বিভাগ, রাজা প্রতাপরুদ্রদেব সঙ্কলিত সরস্বতী বিলাস এবং বরদারাজ-প্রণীত ব্যবহার নির্ণয় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেবন্নভট্ট তেলেগুদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বকীয় সুদীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বকীয় সুদীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি রাজা অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ভাষ্য, স্থানে স্থানে স্বপ্রণীত স্মৃতিচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপরার্ক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মাধবাচার্য্য আবার স্বপ্রণীত গ্রন্থে স্মৃতিচন্দ্রিকার কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরপতি বুক্কণ রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। উড়িষ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিতাক্ষরার মতানুরূপ সরস্বতী বিলাস প্রণয়ন করেন। তিনি স্থানে স্থানে মিতাক্ষরার মতকে দূষণীয় ও অগ্রাহ্য বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। সানুবাদ সরস্বতী বিলাস প্রকাশক ফৌক্স সাহেব উক্ত গ্রন্থ

* Preface to Dr. Rajendra Lal Mitra's পাতঞ্জলং যোগসূত্রং page LXXVI.

১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বরদারাজ তামিল-দেশোদ্ভব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ ব্যবহার নির্ণয় রচনা করেন। সরস্বতীবিলাস ও ব্যবহার নির্ণয় এই উভয় গ্রন্থেই প্রাচীন স্মৃতি ও ভাষ্যাদি বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে দায়-দশশ্লোকী, রাজা সোমেশ্বর কর্ত্তৃক ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত অভিলষিতার্থ চিন্তামণি, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৃসিংহ কর্ত্তৃক বিরচিত প্রয়োগ পারিজাত, ষোড়শ শতাব্দীতে বৈদ্যনাথ দীক্ষিত প্রণীত স্মৃতিমুক্তাফল, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা শরভোজী কর্ত্তৃক বিরচিত ব্যবহার প্রকাশ প্রভৃতি কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থ পণ্ডিতবর ডাক্তর বার্ণেল সাহেবের সবিশেষ উদ্যোগে ও যত্নে বিদ্যমান আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। *

সমুদায় স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের মধ্যে অসহায়-প্রণীত নারদ-স্মৃতির ভাষ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা কালক্রমে পরবর্ত্তী লেখকদিগের অযত্নে পরিবর্ত্তিত ও পরিভ্রষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর কল্যাণ ভট্ট নামা জনৈক দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিত ইহা পরিশোধন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

দুষ্টং সহায়বিরচিতং নারদভাষ্যং কুলেখকৈ ভ্রষ্টম্।
কল্যাণেন ক্রিয়তে প্রাক্তনং তদ্বিশোধ্যপুনঃ॥

ডাক্তার জলি প্রকাশিত নারদস্মৃতি ১ম পৃষ্ঠা

অতঃপর তিনখানি [illegible] ও [illegible]-প্রচারিত সংগ্রহ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ কতদূর প্রামাণিক, দেশাচারাদির বা প্রামাণ্য কতদূর, ইত্যাদি বিষয়ে স্বতন্ত্র একটী প্রবন্ধ লিখিতে বাসনা রহিল।

দৌলতাবাদের রাজা মহাদেবের প্রধান অমাত্য হেমাদ্রি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত পুস্তক ব্রত, দান শ্রাদ্ধ, কাল ও পরিশিষ্ট এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। এপর্য্যন্ত ভারতের কুত্রাপিও সমগ্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। তিনি অপরার্কের যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি-ভাষ্য স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মুসলমান রাজাদিগের সময়েও যে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের প্রভাব খর্ব্ব হয় নাই, তাহার অন্যতম সাক্ষ্য দলপতি-প্রণীত নৃসিংহ-প্রসাদ। দলপতি (বাস্তবিক নাম কি উপাধি নিশ্চয় নাই) ষোড়শ শতাব্দীতে আমেদনগরাধীশ্বর প্রথম নিজাম-সাহের একতম মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নৃসিংহ প্রণীত প্রয়োগ-পারিজাত অবলম্বনে দ্বাদশ-সারে নৃসিংহপ্রসাদ প্রণয়ন করেন। ইহা সর্ব্বাংশে মদনসিংহদেব প্রণীত দ্বাদশ উদ্যোত এবং নীলকণ্ঠভট্ট প্রণীত ব্যবহার ময়ূখের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। সংস্কার, আহ্নিক, শ্রাদ্ধ, কালনির্ণয়, ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম্মবিপাক, ব্রত, দান, শান্তি, তীর্থ, ও দেবপ্রতিষ্ঠা, এই দ্বাদশ সারে (অধ্যায়ে) নৃসিংহপ্রসাদ বিভক্ত।

সম্রাটকুলতিলক আকবর সাহের রাজস্ব সচিব স্বনামখ্যাত টোডরমল্ল দ্বাদশ সৌখ্যে (অধ্যায়ে) ব্যবহার-সৌখ্য প্রণয়ন করেন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ব্যবহার-সৌখ্যের প্রথম অধ্যায় দিল্লিতে পাওয়া গিয়াছে।

* Dr. Burnell's catalogue of the Tanjore Pelace Library.

অপর কয়েক অধ্যায়, বিকানীরের মহারাজার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগারে সযত্নে পরিরক্ষিত হইতেছে।

অদ্য এখানেই প্রস্তাব শেষ করিয়া, পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনা হয়, ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিচারসম্পন্নতা কি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

পার্থিব-চিন্তা।

প্রদোষ সমীরণে দোদুল্যমান গোলাপ ফুলটী কি মনোহর নয়নানন্দকর শোভা ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কল্য প্রতপ্ত মার্ত্তণ্ড তাপে ইহার আর এ শোভা থাকিবে না। ফুলটী শুষ্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূপতিত হইয়া যাইবে। সংসার-উদ্যানে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি, সুন্দর প্রসূন স্বরূপ শোভা ধারণ করিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে আনন্দ বাড়িতেছে, কিন্তু যখন ভাবি, এ শোভা চিরস্থায়ী নহে; হয়ত আমার সম্মুখেই ঐ ফুল কালের অনন্ত গর্ভে লীন হইবে, তখন আর জ্ঞান থাকে না; সংসার, তমসাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়। সংসারের সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী। কষ্ট ভিন্ন কথা নাই। অশ্বত্থামার মত চিরজীবী হইলেই অনেক বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখে পড়িতে হয়। কবিবর গেটে, ৮৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ওই দীর্ঘজীবনের শেষ অঙ্ক অতীব কষ্টকর। প্রণয়িনী চিরদিনের মত চলিয়া গেলেন, একমাত্র পুত্র বিদেশে প্রাণত্যাগ করিলেন; একটী লাবণ্যবতী পৌত্রীর মৃত্যু হইল; আশ্রয়-পাদপ স্বরূপ পরম বন্ধু ডিউক কারল আগষ্ট, স্বর্গারোহণ করিলেন; এবং অকৃত্রিম বন্ধু প্রসিদ্ধ কবি সিলারের জীবনের শেষ অঙ্কের যবনিকা পতিত হইল। একটা মনুষ্যের হৃদয় আর কত প্রচণ্ড আঘাৎ সহ্য করিবে! এই দুঃসময়ে একদিন নৈসর্গিক শোভাবিশিষ্ট জিফেণ হেনের পার্ব্বতীয় প্রদেশের গৃহে, যেখানে তিনি ডিউকের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে যৌবনকাল অতীত করিয়াছিলেন, সেই গৃহের ভিত্তিতে তাঁহার লিখিত একটী কবিতা দৃষ্টে, পূর্ব্বকথা সকল স্মৃতিপথারূঢ় হইল! নেত্র হইতে জলকণা পতিত হইল; ভাবিলেন, পৃথিবী আমাকেও শীঘ্র বিদায় দিবেন। দীর্ঘ-জীবনের এই ফল! গেটে অনেকদিন জীবিত থাকিলেন এবং অনেক বিপদের সম্মুখে পতিত হইলেন। তাঁহার দুঃখময় জীবনের শান্তিভঙ্গ হইল। তিনি পণ্ডিত, জ্ঞানী;—সকলই স্তম্ভিত হইয়া সহ্য করিলেন। তাঁহার ফষ্ট, সুখের কাহিনী নহে, হৃদয়ের ছিন্ন ভাবের কথা। মিফিষ্টফিলিস দৈত্য, ফষ্টকে অনেক সুখ উপভোগ করাইল—বৃদ্ধাবস্থা হইতে যৌবনাবস্থা প্রদান করিল—অবশেষে তাঁহার প্রাণ প্রিয়তমা স্বর্গারোহণ করিলেন—অপ্সরীগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেল—ফষ্ট, মিফিষ্টফিলিসের সঙ্গে দুঃখিত চিত্তে অদৃশ্য হইলেন। গেটের জীবনেও তাহাই ঠিক্। সংসারে অনেক দিন থাকিতে হইলে সুখ বড় অল্প, কষ্টই অধিক। যে সুখের অবস্থা দেখিয়া শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে, সেই ধন্য।

মৃত্যু কষ্টকর নহে, পরম সুখকর। ধার্ম্মিকের জীবনে স্তরে স্তরে সুখের তরঙ্গ উঠিতেছে এবং পড়িতেছে। অবশেষে যেই তরঙ্গ মৃত্যু কালে একবারে বিলীন হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করে। সেই মৃত্যুই জীবনের শান্তি! ধার্ম্মিকগণ সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। গেটে মৃত্যু-কালে বলিলেন,—"আলোক" "অধিক আলোক"; তাহার পরেই জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হইল। বীরবর গারিবল্ডি কেপা-রেরার পার্ব্বতীয় প্রদেশের মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে তদ্গত চিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ভগবান শাক্যসিংহের প্রশান্ত আনন, মৃত্যু কালে আরো প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি শিষ্যবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতে করিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়, কে বলিতে পারে? মনুষ্য পার্থিব অবস্থা জানে; কিন্তু তাহার পর পরজীবন আছে কি না, কে বলিতে পারে? জ্ঞানীগণ চিন্তা করিয়া অনেক সারতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। সুপ্য-নহার বলেন, "উপনিষদের পরিশিষ্ট আমি রচনা করিয়া জীবনের মুক্তির উপায় স্থির করিব।" হিজেল, পৃথিবীর সারতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া জীবের মুক্তির জন্য চিন্তা করিয়া-ছিলেন। সকল তত্ত্ববিৎই ভাবিলেন; কিন্তু কে বলিতে পারিল যে, মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায়? সকলই সংশয়ময়—মনুষ্য-জীবন ঘোর অন্ধকারে আবৃত। উপনিষদের ঋষিকুমার শ্বেতকেতুকে একজন জ্ঞানী রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বেথ্য যথেমা প্রজাঃ প্রবোথ্যো বিপ্রতি পদ্যান্তা ইতি?" এই সকল প্রজা মরণের পর যেরূপে যেখানে যায়, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ? * ঋষিকুমার উত্তর করিলেন "নেতি হোবাচ" তাহা জানি না। সেই পূর্ব্ব পিতামহগণ, বিদ্যাবলে ও যোগবলে যাহা ঠিক করিয়া-ছিলেন, যে যে বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত সেই সকল কথার নূতন কোন অর্থই আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্বেতকেতু যে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, এখনও তত্ত্ববিৎ-গণের সেই প্রত্যুত্তর। দেবযান, পিতৃযান,—এ সকল আর্য্য ঋষিগণের গভীর চিন্তার ফল মাত্র। সন্তাপিত হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যুই শান্তি নিকেতন। ধার্ম্মিকগণেরও মৃত্যু, কিছু মাত্র ভয়ানক শক্রর কার্য্য করেনা। মৃত্যু সুখময় ও শান্তিময় পথে লইয়া যায়।

পণ্ডিতবর আমেল ঠিক্ বলিয়াছেন, মৃত্যুর জন্য কিছু মাত্র ভীত না হইয়া প্রস্তুত থাকা উচিত। যোদ্ধা যেমন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকে, সংসার ক্ষেত্রে মনুষ্যও ঠিক সেইরূপ দণ্ডায়মান থাকিবে। মৃত্যু-ভয় কিসের ভয়! বীরবর বোনা-পার্টের সেনানায়ক লানিস যুদ্ধ ক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় বিপক্ষ-গণের বৃহন্নালিক অভ্যন্তরস্থ প্রচণ্ড প্রতপ্ত সীসক গোলক প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহার পদ দ্বয় শরীর হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন করিল। সেনাপতি ভূপতিত হইলেন। বোনাপার্ট শোকে ব্যাকুল হইয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে যত্নবান হইলেন। লানিস কহিলেন, আমি মৃত্যুর জন্য দুঃখিত নহি, আমার প্রাণ রক্ষা হওয়া অসম্ভব। আমি কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণ দিলাম। ঈশ্বর করুন, আপনি যুদ্ধে বিজয়ী হউন। তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণ

* ভারতরহস্য ১ম ভাগ দেবযান প্রস্তাব দেখুন।

দিলেন। আমিও জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ দিব, তাহাতে আর ভয় কি ?

ন্যায়ের পথে চলিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিব। দণ্ডী যথার্থ বলিয়াছেন "ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদংনধীরা"। জ্যোতির্ব্বিৎ জিয়রডানো ব্রুণো, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য রোমের কাথলিক ধর্ম্ম যাজকগণের তাড়ণায় ভীত হয়েন নাই। তাঁহারা যখন ব্রুণোকে প্রচলিত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মত পরিত্যাগ করিতে শাসন করিলেন, তিনি তাহাতে ভয় পাইলেন না। অবশেষে পোপের আজ্ঞায় তাঁহাকে তৃণাবৃত করিয়া দাহন করা হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তজ্জন্য তিনি কিছু মাত্র ক্ষোভ করেন নাই। অনেকের নিকট মৃত্যু যাতনাদায়ক বলিয়াই বোধ হয় না। ভগবান চৈতন্য দেব উৎকলে প্রেম পূর্ণ হৃদয়ে রাধা কৃষ্ণ রূপ চিন্তা করিতে করিতে, একবারে উন্মত্ত হইলেন। নিশীথে সমুদ্রতীরে গমন করিয়া নীলজলে কৃষ্ণরূপ দেখিলেন। ভাবিলেন, ঐ আমার হৃদয়রঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ, আর আমার চিন্তা কি! আমি অভীষ্ট দেবকে পাইয়াছি। এই ভাবিয়া সাগর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। এ মৃত্যু কি কষ্টদায়ক? এ, প্রেমের ভিখারী প্রেমিকের মৃত্যু!

শ্রীরামদাস সেন।

সোণার মেয়ে।

কেরে পাগলিনী মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে
এমন পাগল করে পরাণ আমার!
আবেশে অবশ হই, কেন ভুলে কোলে লই,
কি জানি কি মনে পড়ে শশিমুখ কার!

১

কি জানি কি মনে পড়ে, পরাণ পাগল করে
তোরি নয়নের মত নয়ন তাহার!
সেই আঁধারের আগে, উষার আলোক জাগে;
সুন্দর সীমন্তে শোভে কাল কেশ ভার!

২

এলোমেলো চুল সেই, দুহাতে সরায়ে দেই
তেমনি যতনে, মনে লয় কতবার!
আরো যে কি মনে পড়ে, পরাণ কেমন করে
তোরি কপোলের মত কপোল তাহার!

৩

সোণার তবক মোড়া, তারি মত ঠোঁট যোড়া,
অমল অধর তার সুধার আধার।
তারি মত তোর কথা, গলিয়ে পড়ে মমতা,
এত মধু পবিত্রতা প্রিয় সরলার!

৪

হাসিতে মাণিক পড়ে, কাঁদিতে মুকু ঝরে,
তোরি মত মানময়ী মূরতি তাঁহার!
তুই সে চাঁদের আলো, প্রাণে তাই লাগে ভালো
পবিত্রতা পরিপূর্ণ প্রেম পূর্ণিমার!

৫

শৈশব সঙ্গীতে তোর, কি এক নেশার ঘোর,
কি এক অমৃত ঢালে হৃদয়ে আমার!
তুই সে "সোণার পাখী" আর তোরে বুকে রাখি;
তুই সে সোণার মেয়ে প্রিয় সরলার!

৬

দয়া মায়া স্নেহ যত, সকলি তাহার মত
শৈশবের শান্তিময়ী ছায়া তুই তার!
আসিস্ জলন্ত চিতে, স্বর্গীয় সান্ত্বনা দিতে
দ্বিতীয় প্রতিমা খানি প্রিয় সরলার!

আয় তোরে রেখে, বুকে চুম খাই চাঁদমুখে;
দর্পণে উঠানো তুই ছায়া খানি তার!
তোর এই রাঙ্গা ঠোঁটে, তারি মত মধু ওঠে,-
আয়রে সোণার মেয়ে প্রিয় সরলার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর। (২)

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল। বিদ্যা সুন্দরসমাগমে বড়ই আপ্যায়িতা হইলেন। সুন্দর কিছু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ; বিদ্যা কিন্তু তাহা নহে। যে পর্য্যন্ত সুন্দর সমাগম না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত বিদ্যার চরিত্রে স্ত্রীজনোচিত কিছু অধীরতা আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সুন্দরস-মাগমের পর আর সে অধীরতা নাই। বিদ্যাসুন্দরের সমস্ত ঘটনা প্রায় প্রত্যেকেই অবগত আছেন; সুতরাং তাহা তন্ন তন্ন করিয়া প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন।

দিবসে নিদ্রার ঘোরে, আলুথালু পেয়ে মোরে
এক‍র্ম্ম কেবল অপমান।

বিদ্যা যে সুন্দরের মত ইন্দ্রিয়-পরায়ণা নহেন, উপরি লিখিত বাক্যই তাহা প্রমাণ করিতেছে। বিদ্যা খুব পতিপরায়ণা। যে সুন্দরে সে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, সে সেই সুন্দরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। যখন কোটালেরা সুন্দরকে ধরিবার জন্য বিদ্যার মন্দিরে স্ত্রীবেশে অবস্থান করিতেছে, তখন বিদ্যার মনের ভাব দেখুন—

ওথায় ভাবেন বিদ্যা একি পরমাদ।
না জানিলা প্রাণনাথ এসব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥

তারপর যখন বিদ্যা শুনিল যে, চোর ধরা পড়িয়াছে, তখন বিদ্যার মনের ভাব কিরূপ এবং ভারতচন্দ্র তাহা কেমন স্বাভাবিক করিয়াছেন, তাহা দেখুন—

সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখি তোলে ধরাধরি করি।

সুন্দর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়াই বিদ্যার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, সে অমনি ধরাতলে পড়িয়া গেল। তারপর যখন তাহার চেতনা হইল, তখন সে সুন্দরের জন্য ভাবিয়া আকুল। ইহাতে বিদ্যার পতিপরায়ণতা খুব উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত করিয়াছে। বিদ্যার তখনকার মনের ভাব দেখুন;—

ইহা কব কার কাছে, এখনো পরাণ আছে,
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া।

পতিপ্রাণা না হইলে পতির কষ্টে কেহই জীবনকে কষ্টদায়ক বলিয়া মনে করে না। সুন্দরের সুখে যে বিদ্যা সুখী হইত, তাহার আরও একটী দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্র আমাদিগকে দিয়াছেন। যখন সুন্দর এ সকল আপদ অতিক্রম করিয়া বিদ্যা লাভ করিলেন, তখন তিনি সখ করিয়া একদিন সন্ন্যাসী সাজিলেন; বিদ্যাও সুন্দরের সুখে সুখী হইয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়া সুন্দরের বামে উপবেশন করিলেন।

সুন্দরের চরিত্র ২।১ কথায় বুঝান যাইতে পারে। সুন্দর দিব্য কান্তি, অনিন্দনীয় যুবা পুরুষ। প্রথমে ভাট মুখে বিদ্যার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার মন বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিদ্যার বিষয় চিন্তা করিলেন এবং সে চিন্তার এই ফল হইল যে, বিদ্যার মত রূপবতী গুণবতী ভার্য্যা যাহার ভাগ্যে ঘটে, তাহার প্রসন্ন কপাল। সুতরাং সুন্দর মনে মনে স্থির করিলেন যে, যে প্রকারে হউক বিদ্যালাভ করিতেই হইবে। বিদ্যার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার

বিদ্যালাভ-স্পৃহা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। তখন বিদ্যা তাঁহার সমস্ত হৃদয়টুকু দখল করিয়া বসিল ; তখন তাঁহার—

বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ তপ ॥

তাই তিনি বিদ্যালাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাই তিনি মনে মনে কহিলেন,

প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খোয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগরে ॥

যখন তাঁহার হৃদয়ের এই ভাব, তখন তিনি গোপনে অশ্বারোহণে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। গোপনে যাত্রা করাতে তাঁহার মন যে বিদ্যার প্রতি কত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি পিতাকে একথা বলিতে সাহসী হইলেন না ; পাছে তাঁহার পিতা এত দূরদেশে তাঁহাকে যাইতে না দেন। পিতা মাতা যে পুত্রের মন না বুঝিয়া কত কার্য্য করেন, এবং তাহার ফল যে কত অনিষ্টকর হয় তাহার দৃষ্টান্ত, বহুল পরিমাণে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সুন্দর একথা নিজ পিতাকে বলিতে সাহসী হইলেন না। বিদ্যার চরিত্রেও আমরা এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যখন বিদ্যা সুন্দরকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, তখন হীরা রাজাকে ও রাণীকে তাঁহাদের উভয়ের বিবাহ সংঘটন করিতে উপদেশ দিয়াছিল ; কিন্তু সে উপদেশ বিদ্যার নিকট উত্তম বলিয়া বোধ হইল না। বিদ্যা ভাবিল, গুণসিন্ধু রাজতনয় যে এরূপ একাকী আসিয়াছেন, একথা পিতার বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বাস না হইবার কারণও ছিল। যেহেতু তখন রাজারা অথবা রাজকুমারেরা অনেকানেক সৈন্য সামন্ত, লোকজন সঙ্গে না লইয়া কোথাও যাইতেন না। সুতরাং বিদ্যা ভাবিল, রাজা তাহা হইলে সুন্দরের সহিত বিদ্যার বিবাহ হইতে দিবেন না। তবে বিদ্যা প্রাণে বাঁচিবে না। কারণ তখন সে সুন্দরগতপ্রাণা হইয়াছে। তাই হীরাকে তাহার যুক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে মানা করিয়াছিল।

সুন্দর এইরূপে পিতামাতাকে কিছু না কহিয়া, বর্দ্ধমানে যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হইলে নগরে প্রবেশ করিতে কিছু গোলযোগ বাধিল। অন্য সময়ে হইলে অবশ্য সুন্দর রাজকুমারোচিত কার্য্যই করিতেন। তাহা হইলে কখনই নিজের সাজসজ্জা ও অস্ত্র সস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পড়ুয়ার বেশে নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেন না ; কিন্তু তখন বিদ্যালাভই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন—

হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব।

তাই তিনি সমস্ত ছাড়িয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরে মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মালিনীর প্রার্থনা মত তিনি তাহার বাড়ীতে বাসা করিলেন। মালিনীর মুখে বিদ্যার রূপ গুণের কথা শুনিয়া বিদ্যালাভ করিবার জন্য বড়ই আকুল হইলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় বিচারে তাঁহার জয় হইল। সুন্দর খুব সাহসী ছিলেন ; এবং অন্যান্য রাজ পুত্রদিগের ন্যায় অনর্থক কালক্ষয় না করিয়া শাস্ত্রালোচনায় বাল্যকাল কাটাইয়াছিলেন, তাই তিনি বিদ্যালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কবি, সুন্দরকে বড়ই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ করিয়াছেন। ইহাতে সুন্দরের চরিত্রে কালিমা পড়িয়াছে। সুন্দরের মত উপ-

যুক্ত রাজপুত্রের এই প্রকার ইন্দ্রিয় পরায়ণ হওয়া উচিত ছিলনা। ইহা তাৎকালিক কুরুচির ফল। কিন্তু যদিও কবি সুন্দরকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে লম্পট করেন নাই।

সুন্দর, বিদ্যা ছাড়া আর কাহাকেও জানিতেন না। বিদ্যাই তাঁহার সব ছিল। বিদ্যাকে তিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। যখন কোটালের হস্তে তিনি ধরা পড়িলেন, তখন যুগপৎ কত ভাবনাই তাঁহার মনে উদিত হইল। নিজের কুলের কথা, বংশ গৌরবের কথা, পিতামাতার কথা, এবং এক্ষণকার এইরূপ লজ্জাজনক অবস্থার কথা, তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে উদিত হইতে লাগিল। তিনি যে বিদেশে একাকী অপরিচিত লোকের মাঝ খানে, অপরাধী বেশে উপস্থিত হইয়াছেন; যাহার দিকে দৃষ্টি করেন সেই যে তাঁহার পর, কেহই যে তাঁহার হইয়া রাজাকে কিছু কহিবেনা; এ সমস্ত ভাবিয়া তিনি আকুল হইতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন—

"গেলে প্রাণ পাই ত্রাণ ভগবান জানে"

এই প্রকার দারুণ অবস্থাতে পড়িয়াও তিনি বিদ্যাকে ভুলিলেন না; তখনও তিনি বিদ্যার বিষয়ই ভাবিতেছেন।

যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায়।
এ সময় কথাকয় তবু ভয় যায়॥
তার সমা নিরুপমা প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল মনে রৈল যত কৈল সেবা॥
সে আমার আমি তার কেবা আর আছে
সেই সার কেবা আর যাব কার কাছে॥

সুন্দর বিদ্যাকে যে কত ভাল বাসিতেন, তাহা উপরোক্ত কথা দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে। তারপর রাজসভায় যখন সুন্দর চোর ভাবে নীত হইলেন এবং যখন রাজা চোরের প্রতি কুপিত হইয়া ভয় দেখাইবার জন্য ছলনা করিয়া চোরকে মশানে পাঠাইতে উদ্যত হইলেন, তখন সুন্দর বলিতেছেন,

বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল।

ইহাতেই সুন্দর যে বিদ্যাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

সুন্দর যে খুব জ্ঞানী পরম পণ্ডিত রাজপুত্র ছিলেন, এ কথা ভারতচন্দ্র উত্তম রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যখন বিদ্যার সহিত বিচার হয়, তখন সুন্দর যে সকল তর্ক করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে হিন্দুশাস্ত্র বিলক্ষণ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই। তার পর যখন সুন্দর রাজ সভায় চোর রূপে আনীত হইলেন, তখন রাজা বীরসিংহ তাঁহার পরিচয় পাইবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছেন। প্রথমে পারিষদগণ দ্বারা, অবশেষে স্বয়ং কতই যত্ন করিয়া নানা কথা কহিয়া সুন্দরের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সুন্দর কিছুতেই নিজের পরিচয় দিলেন না। বরং নানা কথা কহিয়া ছল ক্রমে সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। পরে রাজা বীর সিংহ ভয় দেখাইয়া সুন্দরের পরিচয় পাইতে চেষ্টা করিলেন। সুন্দর তাহাতে কিছু মাত্রও ভীত হইলেন না। এ সকল রাজ কুমারোচিত গুণ বটে। যে অবস্থায় সুন্দর রাজ দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার অবস্থায় কোন্ রাজপুত্র নিজের পরিচয় দিয়া থাকে? তার পর, সুন্দর বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়া যে সকল শ্লোক রাজ সভায় পাঠ করিয়া

ছিলেন, তাহা তদীয় বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সুন্দর এ দিকে যেমন গুণবান এবং জ্ঞানবান, অন্যপক্ষে তিনি অতুলনীয় রূপবান। তাঁহার মত রূপবান কেহ তৎকালে বর্দ্ধমানে ছিল না; কারণ তাহা হইলে সমস্ত বর্দ্ধমান-বাসী স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার জন্য এই প্রকার পাগল হইত না। বিশেষতঃ রাজা বীরসিংহ যখন সুন্দরকে দেখিলেন, তখন তাঁহার সেই উজ্জ্বল রূপরাশি দেখিয়া তিনি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অন্য কেহ হইলে, তিনি নিশ্চয়ই তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিতেন; সন্দেহ নাই; কিন্তু সুন্দরকে দেখিয়া তিনি মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। এমন রূপবান পুরুষকে দেখিয়া বিদ্যা যে তাহাতে সহজেই আত্মসমর্পণ করিবেন, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন্ স্ত্রীলোক সুন্দরের মত রূপবান গুণবান পতি লাভ করিতে ইচ্ছা না করে?

ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের রাণীর চিত্র কত উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রাণীকে তিনি কেমন স্বাভাবিক করিয়াছেন, তাহা রাণী চরিত্র একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। যখন বিদ্যার সখীগণ বেশ বুঝিতে পারিল যে, বিদ্যা নিশ্চয়ই গর্ভবতী হইয়াছেন; তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া রাণীকে এ সংবাদ অবগত করাইল। রাণী বিদ্যাসুন্দর ঘটিত কাণ্ডের কিছুই অবগত নহেন। আজও বিদ্যার বিবাহ হইল না বলিয়া রাণী বড়ই চিন্তিতা, এমন অবস্থায় সখী মুখে বিদ্যার গর্ভের কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি বড়ই চমৎকৃতা হইলেন; তাই তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বিদ্যার মহলে গিয়া উপস্থিত হইলেন

শুনি চমকিয়া   চলে শীহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত।
আকুল কুন্তলে,   বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাট রাণী।

কোন মাতা আপনার কুমারী কন্যার বিষয়ে এই কথা শুনিয়া এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত না হয়েন? ভারতের এই চিত্র খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। তারপর বিদ্যার কাছে গিয়া যখন সমস্ত নিজ চক্ষে দেখিলেন, এবং দেখিয়া সমস্তই ঠিক বলিয়া উপলব্ধি হইল, তখন যেন তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি গালে হাত দিয়া, মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বিদ্যার প্রতি বড়ই রাগ হইল এবং এই প্রকার রাগ হওয়াও খুব স্বাভাবিক। তাই তিনি বিদ্যাকে গালি দিতে লাগিলেন।

ওলো নিঃশঙ্কিনী   কুল কলঙ্কিনী
সাপিনী পাপ কারিণী।
শাখিনীর প্রায়   আনিলি কাহায়,
ডাকিয়া ডাক ডাকিনী॥
ডরে মোর ঘরে   বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায়   ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সেবা॥
না মিলিল দড়ী   না মিলিল কড়ী
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ   কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ   তাঁর দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি   কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥

রাণীর মনে কত কি ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। বিদ্যার এই প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা মনে করিয়া তাঁহার মনে কত দুঃখের কথা উদয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের সেই নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী পড়িল ভাবিয়া, তিনি বড়ই ব্যথিত হইতে লাগিলেন। এ সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বড়ই অভিমান উপস্থিত হইল। সে অভিমান, ঘৃণা মাখা, তাই তিনি বলিতে লাগিলেন—

আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপ গুণ যুত যোগ্য রাজ সুত
হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদ্যার দিস্॥

এ উক্তি কেমন স্বাভাবিক, কেমন স্ত্রীজনোচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তারপর বিদ্যার চাতুরী দেখিয়া ও মিথ্যা কথা শুনিয়া রাণী রাগে ও অভিমানে একেবারে অধীরা হইলেন। তাই তিনি ক্রোধভরে এ সকল সংবাদ রাজাকে কহিতে গেলেন। রাণীর সে গমন বর্ণনা অতি চমৎকার হইয়াছে। ফলতঃ মানুষ যখন রাগে অধীর হয়, তখন তাহার যে প্রকার ভাব হয়, তাহা ভারতচন্দ্র অতি সুন্দর রূপে রাণীর রাজার নিকট গমন বর্ণনা দ্বারা, প্রকাশ করিয়াছেন। রাণীর অবস্থা দেখিয়া রাজা ভীত হইলেন। কিন্তু রাজার নিকট গমন করিলে পর রাণীর আর সে ভাব নাই। রাণীর এক্ষণে স্বাভাবিকী মাতৃজনোচিত বাৎসল্য প্রবল হইয়াছে। তাই তিনি বিদ্যার দোষ ঢাকিয়া সমস্তই মহারাজের ঘাড়ে চাপাইতেছেন। তাই তিনি রাজাকে বলিতেছেন;—

"ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ
এড়াইলে বিবাহের দায়॥
কি কহিব হায় হায় জলন্ত আগুন প্রায়
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোক ধর্ম্ম কিসে রবে
বারেক দেখিতে হয় চেয়ে॥

ইহাতে রাণীর চরিত্র উত্তম রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক রাণীর হৃদয় যে কোমলতাময়, অথচ আবশ্যক হইলে কঠিনা হইতে পারেন; তাহার নিদর্শন আমরা দেখাইয়াছি। এই সকল গুণ না থাকিলে পাকা গৃহিণী হওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র রাণীর চরিত্র যে পাকা গৃহিণীর চরিত্র-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা রাণীর চরিত্রে পরদুঃখ কাতরতা ও কমনীয়তার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, এই চিত্র সমাপ্ত করিব। যখন চোর ধরা পড়িয়াছে এবং সেই সংবাদ অন্তঃপুরময় প্রচার হইয়াছে, তখন রাণীও অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় চোরকে দেখিতে গিয়াছেন এবং দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা দেখুন;—

[illegible]
[illegible] লইয়া [illegible]।
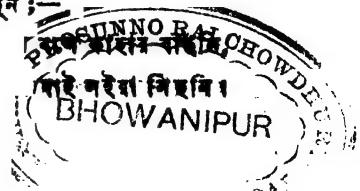
কিবা অপরূপ রূপ মদন মোহন কূপ
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল,
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে মোরে না কহিল মেয়ে
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
হায় হায় হায়রে গোঁসাই,
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

রাণীও এমন সুন্দর পুরুষ দেখিয়া বিদ্যার তৎ প্রতি আত্ম সমর্পণ করা খুব স্ত্রীজনোচিত হইয়াছে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং রাণী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি রাজা ইহাকে সংহার করেন, তাহা হইলে বিদ্যা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে।

তারপর মালিনীর চিত্র। সুন্দর বেলাবসান সময়ে বকুল তলায় বসিয়া কোথায় বাসা করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মালিনী আসিয়া উপস্থিত। আমরা ঐ স্থানে প্রথম মালিনীকে দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্র মালিনীর যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা দেখুন।

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি কড়ে রাড়ী কথা কয় ছলে ॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান শাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ি কাঁথে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কত গুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল বাজায়।
পড়সী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥

ইহা মালিনীর উপযুক্ত চিত্র বটে। এ চিত্র পাঠ করিলে মালিনী যে কি প্রকৃতির লোক, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। মালিনী সুন্দরকে দেখিয়া বড়ই খুসী হইল; এবং মনে মনে ভাবিল যে, এ বিদেশী যদি আমার বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকে, তবে ইহাকে যত্নের সহিত রাখি। তাই সে সুন্দরের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল। সুন্দর যখন কহিলেন যে,

ভরসা কালীর নাম বিদ্যা লাভ আশা।

তখন মালিনী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সুন্দর কোন্ বিদ্যা লাভ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু মালিনী বড় চতুরা, আপনি অগ্রসর হইয়া বিদ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলিল না। শুধু বলিল যে

নিয়মিত ফুল রাজবাটীতে যোগাই।
ভাল বাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই।

ইহাতে সুন্দর বুঝিতে পারিলেন যে, এই মালিনীর নিকট বিদ্যা সম্বন্ধে সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। তাই তিনি মালিনীর বাটীতে তাহার প্রার্থনামত বাসা করিলেন। কিন্তু ইহার আচার ব্যবহার দেখিয়া সুন্দর মনে মনে কিছু ভয় পাইলেন; পাছে মালিনী কোনরূপ অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাই তিনি ইহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মালিনী সুতরাং বুঝিতে পারিল যে সুন্দর তাহার জন্য নহে; অতএব সে কোনরূপ অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইল না।

সরস্বতী আবাহন

ফিরায়ে নে বীণা, মাগো, আর গায়িবনা।
যখনি ঝঙ্কারি তায়,
সে সুধু গায়িতে চায়,
মরণের শ্বাস ভরা বিষাদ—যাতনা।
ধূলি নিয়ে ঘরে ঘরে,
জগতের নারী নরে,
মিছে হেসে, মিছে কেঁদে, খেলিছে যা সবে;
তাহারি উন্মাদ গীতি
গায়িতে, নাহিক প্রীতি;
ফিরায়ে নে বীণা, এবে রহিব নীরবে।
এ বীণা মধুর রবে,
প্রেম গীতি গায় যবে,
অমৃতে কভুও মোর পোরেনা পরাণ।
সে যদি প্রণয় হবে,
কেন এত হিংসা তবে?
কেন বা নিরাশা এত, কেন অভিমান?
স্নেহে সুরঞ্জিত কায়া,
অনন্ত বিশ্বের ছায়া,
হৃদয়-মুকুরে আসি কেননা প্রকাশে?
কেন প্রাণ দিন দিন
সঙ্কীর্ণ, মলিন, ক্ষীণ?
কেন সুধু রূপ-তৃষা সদা বুকে ভাসে?
মৃদুল কম্পিত স্বর,
হাসি মাখা বিম্বাধর,
সলজ্জ আরক্ত গণ্ড, কটাক্ষ চঞ্চল,
বড়ই সুন্দর বটে;
যদি রহে হৃদিপটে
ইন্দ্রিয়ের রাগ শূন্য ছবি সুবিমল।
হয় সে লাবণ্য যদি,
সুধুই অমৃত নদী;—

যদি সে আকাশ গঙ্গা,—প্রেম-মন্দাকিনী,
অথবা আবেগময়
(কভু ভোগবতী নয়)
সুরধুনী,—বিশ্বপ্রেমে সদা উন্মাদিনী;—
লীলাময় সে তরঙ্গে,
তবে এ জীবন রঙ্গে,
অসীম বাসনা সঙ্গে, সুখে সমর্পিব;
নহিলে এ সুখহরা,
দাহময়, বিষভরা
অনলে, সলিল বলি কেন ঝাঁপ দিব?
তাই আজি বীণাপানি,
রাখিনু চরণে আনি
শোণিত শোষিণী বীণা; ভাঙ্গিনু এ খেলা!
এ গান গায়িতে ছাই;
বুঝি ভবে আসি নাই,
বুঝি মিছা কাটে দিন, মিছা যায় বেলা!
শত শত মহাপাপ,
জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ,
মানব অদৃষ্টাকাশে, আজিও সঞ্চরে;
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
স্নেহ নাই, প্রীতি নাই;
নবীন দম্পতি কাঁদে, সুখের বাসরে।
সুধুই মুখের কথা—
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,
কাঁপিছে অনন্ত বিশ্ব হিংসার পবনে;
দারুণ দারিদ্র্য ক্লেশে,
দীনহীন, ম্লান বেশে
ধনীর প্রাসাদ পাশে, মরে অনসনে!
যদি তবে বসুন্ধরা,
আজো যন্ত্রণায় ভরা;

দেও তবে সেই বীণা করি নিবেদন,
যে তন্ত্রী লইয়া করে,
শাক্যসিংহ, সপ্ত স্বরে
করেছিল বিমোহিত দেশ অগনন!
শিখাও নির্ব্বাণ গান,
প্রীতিময় আত্মদান,
অহিংসা পরমধর্ম্ম, মৈত্রী সুবিমল;
আত্ম সংযমের মন্ত্র,
পরসেবা মহা তন্ত্র,
বৈরাগ্য, সন্যাস, ভক্তি, স্নেহ অবিচল!
বৃথা মরণের গান,
গায়িতে চাহেনা প্রাণ;
এ বীণা ফিরায়ে লও, ভাঙিনু এ খেলা;
স্বর্গীয় সঙ্গীতে তোর,
কর মোর প্রাণ ভোর,
মিছা কেন কাটে দিন, মিছা যায় বেলা?

বিজয়চন্দ্র মজুমদার।
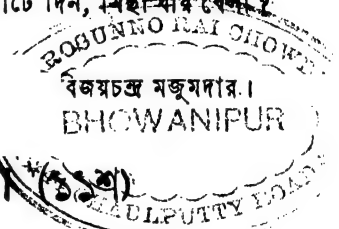
চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (১১শ)

কৈশোর লীলা—দিগ্বিজয়ী জয়।

যৌবনসমাগমে গৌরাঙ্গ সুন্দর, দিন দিন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতে লাগিলেন। একে তিনি পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন, যৌবনারম্ভে তাঁহার শ্রী যে শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন এক রকম লাবণ্যময় মাধুর্য্য মাখান ছিল যে, দর্শকের প্রাণ মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। এই সময়ের তাঁহার অঙ্গমাধুর্য্য ৺ লোচন দাস ঠাকুর, স্বীয় জগদ্বিখ্যাত কবিতায় এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

'অমিয়া মাখিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধুই সুলেহ।
অখণ্ড পীযুষ ধারা কেবা আউটায়া গো,
সোণার বরণ কৈল চিনি;
সে চিনি মাখিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো,
হেন বাঁসো গোরা অঙ্গ খানি।
বীজুরী বাঁটিয়া কেবা পা খানি মাজিল গো,
কত চাঁদে মাজিল মুখানি;
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা চিত্র নিরমিল গো,
অপরূপ বাহুর বলনী।
এমন বিনোদিয়া কোথাও না দেখি গো,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে;
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া বিকল গো,
রমণী কেমনে প্রাণ বান্ধে?
মদন বাঁটিয়া কেবা বদন মাজিল গো,
বিনি ভাবে মো মন কান্দিয়া;
ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো,
কেনা দিল চন্দনের রেখা।'

চৈতন্যমঙ্গল।

যৌবনের জোয়ার আসিয়া অল্পে অল্পে যেমন তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুষ্টি করিতে লাগিল, সেইরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সকল বিকশিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বের গর্ব্বিত ভাব, ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে মাধুর্য্যপূর্ণ বিনয় আত্মাকে অধিকার করিল; তিনি কথা কহিলে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যাইত। চিত্তবিনোদনকারী হাসি হাসিয়া যখন তিনি শাস্ত্র বিচার করিতেন, তখন বিপক্ষ পক্ষ, পরাজিত হইয়াও তাঁহার প্রতি কিছু মাত্র বিরক্ত

হইতেন না; বরং তাঁহার মধুর আলাপে ও ভদ্রতা-ব্যঞ্জক বিনয়ে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইয়া যাইতেন। এ সময়ের ভাব বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

'এই মত প্রভুর কোমল ব্যবসায়,
যাহারে জিনেন সেহ দুঃখ নাহি পায়।
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে,
জিনিয়া সবারে প্রভু তোবেন পাছে।

*

অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত,
সবার প্রভুরে অতি মনে বড় প্রীত।'

চৈঃ ভাঃ ১১ অধ্যায়।

এই কালে নবদ্বীপনগরে একজন মহা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক, ও হস্তী, অশ্ব, দোলা প্রভৃতি বহুতর যান থাকিত; যখন দলবল লইয়া তিনি গমন করিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত যেন একজন রাজা দেশ জয়ের জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। কথিত আছে যে, পণ্ডিতজী স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভাবলে দিল্লী, কাশি, গুজরাট, ত্রিহুত, লাহোর, কাঞ্চী, উৎকল, তৈলঙ্গ আদি দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র লইয়া নবদ্বীপ জয় করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মহা গর্ব্বিত; ঔদ্ধত্য সহকারে প্রচার করিয়া দিলেন যে, হয় তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করা হউক, নচেৎ সমস্ত নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলী পরাজয় স্বীকারকরিয়া সকলের স্বাক্ষর যুক্ত তাঁহাকে এক জয়পত্র দিউন। লোকে বলিত যে, দিগ্বিজয়ী, তপস্যাবলে বাগ্দেবীকে বশীভূত করিয়া, ঈদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। ফলে যাহাই হউক, তাঁহার বিদ্যার প্রভাবে কেহ তাঁহাকে বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

দিগ্বিজয়ীর আগমন বার্ত্তা নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রচার হইলে, মহা মহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সশঙ্কচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা হইল যে, কি জানি যদি তাঁহাদের পরাজিত হইতে হয়, তবে নবদ্বীপের চিরগৌরব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং সমস্ত বঙ্গদেশের মুখ হেঁট হইবে। এই ভয়ে কেহই দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হইতে চাহিলেন না।

'প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায়;
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায়।
সর্ব্ব রাজদেশ জিনি জয়পত্রী লই,
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী।
সরস্বতীর বরপুত্র শুনি সর্ব্বজনে,
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হৈল মনে।
জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান,
সবা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখান।
হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিয়া,
সংসারে প্রতিষ্ঠা হবে ঘুষিবে শুনিয়া।

* * *

সহস্র সহস্র মহা মহা ভট্টাচার্য্য,
সবে এই চিন্তেন ছাড়িয়া সর্ব্ব কার্য্য।"

চৈঃ ভাঃ ১১ অধ্যায়।

নিমাই পণ্ডিত নিজ টোলে, ছাত্রবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, এমত সময় তাঁহার কোন কোন শিষ্য আসিয়া দিগ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত অবগত করাইতেছেন :—

'এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ারগণে,
কহিলেন নিজ গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে।

এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি,
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়পত্রী ধরি।
হস্তী ঘোড়া লোক অনেক সংহতি ;
সম্প্রতি আসিয়া হৈল নবদ্বীপে স্থিতি।
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দী চায়,
নহে জয়পত্রী মাগে সকল সভায়।"চৈঃ ভাঃ

এই কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র মধুর হাসি হাসিয়া ভাব ব্যঞ্জক স্বরে ছাত্রদিগকে কি উত্তর দিতেছেন, দেখুন্ :—

'শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্ব কথা,
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা।
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার,
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন,
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ।
এতেকে তাঁহার যত বিদ্যা অহঙ্কার,
দেখিবে এথাই সব হইবে সংহার।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যা সময়ে সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে চলিলেন। সন্ধ্যা ভ্রমণ, তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। গঙ্গাকে প্রণাম ও গঙ্গা জল স্পর্শ করিয়া,শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্যামল দুর্ব্বাক্ষেত্রে মণ্ডলী করিয়া বসিলেন ; এবং শাস্ত্রালাপ ধর্ম্মকথা প্রভৃতি নানা প্রকার আলোচনায় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নির্ম্মল রজনীতে পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইয়া সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ; মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণ প্রবাহিত হইয়া নিদাঘের অঙ্গগ্লানি দূর করিতেছিল ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উত্থিত হইয়া ভাগীরথীর অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল, এবং চন্দ্র কিরণ সংযোগে গঙ্গাজলকণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ডের ন্যায় সমুজ্জল দেখাইতে ছিল। এমন সুখের সময়ে, গৌরচন্দ্র কত সুখেই শিষ্যগণ সঙ্গে আমোদ কৌতুক ও ঘনিষ্টতা করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রগণ যে প্রগাঢ়রূপে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? ফলত, গৌরাঙ্গ সুন্দরের মধ্যে কি এক আশ্চর্য্য দৈবভাব ছিল, জানিনা, যাহার বলে বাল্যকালে বাল্য ক্রীড়া কৌতুকে সহচর বালকগণকে ; মধ্যাবস্থায়, অধ্যাপনা সময়ে ছাত্রবৃন্দকে ; আর শেষ সময়ে, ধর্ম্মপ্রচার কালে ধর্ম্মবন্ধুদিগকে ; তিনি একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইতে জানিতেন। তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। এক্ষণে কালেজস্কুলে যেমন বিদ্যালয়ের বাহির হইলে আর গুরু-শিষ্যে সম্পর্ক থাকে না ; তখনকার নিয়ম সেরূপ ছিল না। শিষ্যগণ গুরু গৃহেই প্রায় বাস করিত ও সর্ব্বদা তাঁহার শাসনাধীনে থাকিত। গৌরাঙ্গের নিয়ম, প্রচলিত নিয়ম অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র ছিল। তিনি সখ্যভাবে শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হইতেন এবং তাহাদের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত বন্ধু ও গুরুর কার্য্য করিতেন, কাজেই ছাত্র সকল তাঁহার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিত না। যাহা হউক, এই সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে গৌরাঙ্গের সভা দেখিতে পাইলেন ; এবং অনুসন্ধানে নিমাই পণ্ডিতের সভা জানিয়া আস্তে আস্তে সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন ; এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দিগ্-বিজয়ী যে অবস্থায় গৌরকে সভাস্থলে আসীন দেখিলেন, তাহা বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—;

'শিষ্যসঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর ;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্ব মনোহর।
হাস্য যুক্ত শ্রীচন্দ্রবদন অনুক্ষণ ;
নিরন্তর দিব্য দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন।
মুক্তা জিনি শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্বকলেবর।
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ ;
সিংহ গ্রীব, গজস্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ।
সু প্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয় ;
যজ্ঞ সূত্র রূপে তঁহি আনন্দ বিজয়।
শ্রীললাটে উর্দ্ধ সুতিলক মনোহর ;
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর।
যোগপট্ট ছাঁদ বস্ত্র করিয়া বন্ধন ;
বাম উরুমাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ;
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান,
হয় নয় করে, নয় করেন প্রমাণ।
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ,
চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন।
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত ;
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই পণ্ডিত।'

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গৌরচন্দ্রের সভাতে উপবেশন করিলে, নিমাইপণ্ডিত অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ; এবং মধুর সম্ভাষণে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র ব্যাকরণের অধ্যাপনা করেন, ব্যাকরণ বালকের পাঠ্য শাস্ত্র, অথচ তিনি নিজে একজন সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ, ইহা স্মরণ করিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কিছু অবজ্ঞার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

দিগ্বিজয়ী বলিতে লাগিলেন—'তোমার নাম নিমাইপণ্ডিত, শুনিলাম ? তুমি ব্যাকরণ শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিয়া থাক। হাঁ বালশাস্ত্রে লোকে তোমার খুব প্রশংসা করিয়া থাকে।

গৌরচন্দ্র অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, ব্যাকরণ পড়াই বলিয়া অভিমান করি বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অতি অল্পই বুঝিতে পারি।

দিগ্বিজয়ী। না, না, তোমার শিষ্যদিগের ফাঁকি সিদ্ধান্ত আমি শুনিয়াছি, তাহারা অতি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছে। তুমি কিছু শাস্ত্রালাপ কর।

নিমাই। আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, আমি নবীন ছাত্র বইত নয় ; আপনার নিকট মুখ খুলি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই ; শুনিয়াছি, আপনি মহা কবি, আপনার পাণ্ডিত্য কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

দিগ্বিজয়ী—আচ্ছা, কোন্ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ করিব বল।

নিমাই। কৃপা করিয়া কিছু গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া উপস্থিত কবি দিগ্বিজয়ী সগর্ব্বে জাহ্নবী মাহাত্ম্য সূচক কবিতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন ; এবং এক ঘটিকার মধ্যে শিলাবৃষ্টির ন্যায় এক শত কবিতা আওড়াইয়া গেলেন। সভাস্থ শিষ্যমণ্ডলী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। গৌরচন্দ্র অশেষ প্রকারে কবিকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"আপনার প্রতিভাময় কবিত্ব ব্যাখ্যা করা আমাদের সাধ্য নহে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি ইহার দুই একটী কবিতার ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন"।

দিগ্বিজয়ী উত্তর করিলেন, "কোন্ শ্লোকটীর ব্যাখা শুনিতে চাও ?

তখন নিমাই পণ্ডিত অম্লান বদনে আওড়াতে লাগিলেন ;—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতিনিতরাং যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরচ্চ্য চরণা ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুত গুণা।"

অর্থ।

"গঙ্গার মহিমা সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে; কারণ ইনি বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা হেতু সুভগা; দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায়, সুর ও নরগণ ইহার চরণ পূজা করিয়া থাকে; এবং ইনি শিবের জটাজুটে বিহার করেন বলিয়া আশ্চর্য্যগুণশালিনী।

এবং বলিলেন যে, এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করুন্। দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক গুলি আওড়াইয়া গেলাম; ইহার মধ্যে তুমি কিরূপে তাহা কণ্ঠস্থ করিলে?

গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন যে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? কেহ বা দেবতা প্রসাদে প্রতিভাশালী কবি হয়; আর কেহ বা শ্রুতিধর হইয়া থাকে। তখন কবিবর প্রহৃষ্ট মনে কবিতাটী ব্যাখা করিলে গৌরচন্দ্র বলিলেন যে, "আচ্ছা বলুন দেখি, ইহাতে কোন দোষ গুণ আছে কি না?

দিগ্বিজয়ী বলিলেন যে, কবিতায় দোষ মাত্র নাই; উপমালঙ্কার ও কিছু অনুপ্রাস আছে।

নিমাই পণ্ডিত কহিলেন যে, যদি অসন্তুষ্ট না হন্ ও বাল্যচপলতা মার্জ্জনা করেন, তবে আপনার এই কবিতায় কি দোষ ও গুণ আছে তাহার সম্বন্ধে আমি কিছু বলি। আপনি প্রতিভা প্রভাবে এই কবিতা রচনা করিলেন, ইহার সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

গৌরের ঈদৃশ প্রগল্‌ভ বাক্যে, ব্রাহ্মণ ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, যা বলিলে তাই বেদ বাক্য আর কি? তুমি ব্যাকরণী পণ্ডিত হয়ে কবিতার অলঙ্কার বিচারে কি জন্য সাহস করিতেছ?

নিমাই। সেই জন্যইতো আপনাকে দোষগুণ বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলিতেছি; অলঙ্কার না পড়িয়া থাকিলেও অনেক শুনিয়াছি। তাহাতেই বলিতেছি যে, এ কবিতায় গুণ দোষ উভয়ই আছে।

দিগ্বিজয়ী। আচ্ছা বল দেখি, কি কি দোষ গুণ আছে?

নিমাই। আপনি রাগ করিবেন না। আমি বলিয়া যাই, শ্রবণ করুন্। এই কবিতার পাঁচ স্থানে পাঁচটী অলঙ্কার দোষ হইয়াছে; দুই স্থলে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ এক স্থানে বিরুদ্ধ মতি; ও দুই স্থানে ভগ্নক্রম দোষ লক্ষিত হইতেছে।

দিগ্বিজয়ী। (বিরক্তির সহিত) "দেখাইয়া দাও।"

নিমাই। দেখুন গঙ্গার মহত্ত্ব বর্ণনাই আপনার মূল বিধেয়; কিন্তু তাহার অনুবাদ ইদং শব্দ পরে দেওয়াতে অর্থ অপরিষ্কার হইয়াছে; ইদং মহত্ত্বং বলায় অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী। তারপর।

নিমাই। তারপর দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী প্রয়োগও ঐ রূপ। সমাসের মধ্যে শ্রী শব্দ দেওয়ায় অর্থ অস্পষ্ট হইয়াছে। ভবানী ভর্ত্তু প্রয়োগ বিরুদ্ধ মতি দোষ যুক্ত। ভবানী শব্দের অর্থই শিবপত্নী, তাঁহার ভর্ত্তা বলিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা বুঝাইতে পারে। ব্রাহ্মণ পত্নী ভর্ত্তা বলিলে যেরূপ জ্ঞান হয়, এও তদ্রূপ। আর বিভবতি ক্রিয়ার বাক্য সাঙ্গ হইলে তাহার পর অদ্ভুতগুণা বিশেষণ দেওয়ায় এবং

প্রথম পাদে 'ত', তৃতীয় পাদের 'র' চতুর্থ পাদে 'ভ' এর অনুপ্রাস আছে, অথচ দ্বিতীয় পাদে তদ্রূপ কিছুই নাই, ইহাতে ভগ্ন ক্রম দোষ হইয়াছে। এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে সত্য,কিন্তু শ্বিত্র রোগীর পরম সুন্দর শরীরও যেমন কুৎসিত হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ এই সব দোষে শ্লোকের সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

দিগ্বিজয়ী। পাঁচটী অলঙ্কার সম্বন্ধে কি বল?

নিমাই। অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটী শব্দালঙ্কার আর তিনটী অর্থালঙ্কার আছে। প্রথম চরণে পাঁচটী 'ত'কার, তৃতীয় চরণে পাঁচটী রকার ও চতুর্থ পাদে ৪টী ভকার থাকায় অনুপ্রাস আর একার্থবোধক শ্রী ও লক্ষ্মী শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় পুনরুক্তিবদাভাস, এই দুইটী শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কারের মধ্যে লক্ষ্মীরিব উপমা ও বিষ্ণুচরণোৎপত্তি হেতু গঙ্গার মহত্ত্ব বর্ণনায় অনুমান অলঙ্কার দেখা যায়। তদ্ভিন্ন আপনার কবিতায় আর একটী মহাচমৎকার অলঙ্কার আছে। জল হইতে কমলোৎপত্তিই প্রসিদ্ধ; কমল হইতে কখন জল জন্মে না। কিন্তু এখানে বিষ্ণুর চরণ কমল হইতে গঙ্গার জন্ম বলাতে বিরোধালঙ্কার হইয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে, সুতরাং আপাতত বিরোধের ন্যায় লক্ষিত হইলেও ইহাতে বিরোধ নাই। এই অলঙ্কারটী অতি সুন্দর হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রের এই সকল সারগর্ভ ব্যাখা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না এবং মাথা হেট করিয়া নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। গৌরের শিষ্য বৃন্দ হাসিয়া উঠাতে, গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বিনম্র ভাবে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়,আপনি অদ্বিতীয় কবি ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া এরূপ অপ্রতিভ হইতেছেন কেন? প্রতিভার কবিতায় কাহার না দোষ হইয়া থাকে? কালীদাস, জয়দেব, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিদিগের কবিতাতেও ভূরি ভূরি দোষ দেখা যায়। সে হিসাবে আপনার কবিতায় ত অতি অল্পই ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে। দোষগুণে কিছু আইসে না; আপনি যে বলিতে না বলিতে এত কবিতা রচনা করিতে পারেন, তাহাই অতীব প্রশংসনীয়। আমি বালক, আপনার পদধূলার সমান হইবারও যোগ্য নহি। আমার বালচাপল্য মার্জ্জনা করিবেন।

তখন দিগ্বিজয়ী কবি অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও অপমানিত হইয়া বলিলেন, ওহে নিমাই-পণ্ডিত, ধন্য তোমার বুদ্ধি; তুমি অলঙ্কার না পড়িয়াও কি প্রকারে এই সব অর্থ করিতে সক্ষম হইলে?

নিমাই পণ্ডিত একটু কৌতুক করিবার জন্য বলিলেন যে, মহাশয়, শাস্ত্রাদি কিছুই জানি না, মা সরস্বতী যাহা বলান তাহাই বলিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিতে লাগিলেন যে, তবে বুঝি সরস্বতী তাঁহাতে বিরূপ হইয়া নিমাইয়ের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন; যাহা হউক, আজ রাত্রে সকল কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কেন তিনি বালক দ্বারা আমার এত অপমান করিলেন? কথিত আছে যে, সেই রাত্রিতেই বীণাপাণি স্বপ্ন যোগে তাঁহাকে নিমাইয়ের ঈশ্বরত্বের বিবৃত্ত জ্ঞাপন করিলে, তিনি গৌরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।
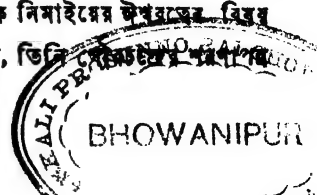
এই প্রবন্ধে যে অনেক অত্যুক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা একে বারে অমৌলিক নহে। কোন্ অংশ অত্যুক্তি দোষে দূষিত, তাহা আমরা বাছিয়া দিব না; সুচতুর পাঠক স্ব স্ব আলোকানুসারে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত
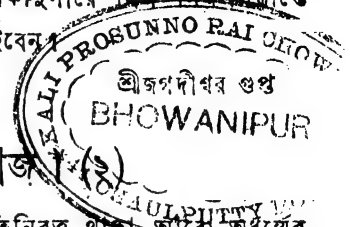
যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (২)

আমরা স্বামী ও স্ত্রী নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বিবাহপ্রথা সংস্কৃত না হইলে সমাজের মঙ্গল নাই। বিবাহপ্রথাকে সংস্কৃত করিতে হইলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হইবে, যথাসাধ্য ইহাও বলিয়াছি। এই বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিবার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে, আমরা কোন কোন সমাজের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিয়া গতবারে তাহা দেখাইয়াছি। এই গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আমাদের নিজের চরিত্রে অনেকবার আঘাত করিতে হইয়াছে। কোন গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে কেহ যদি কখনও কোন শ্মশানে আপন প্রাণপ্রতিম হৃদ্‌পিণ্ডকে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন, এই কঠিন কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আমাদের প্রাণে কেমন আঘাত লাগিয়াছে। সে সকল কথা লিখিয়া বুঝাইবার শক্তি নাই। অন্যান্য সমাজের উন্নতির সহিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হয়, ইহা আমাদের প্রাণগত কামনা। আমরা অন্যান্য সমাজের দোষের বিষয় উল্লেখ করিবার সময় যেরূপ ব্যথিত হই, এবার তদপেক্ষা কম ব্যথা পাই নাই। তাহার কারণ, আমাদের নিজের ত্রুটীতে যদি কোন অবৈধ ঘটনা ঘটে, তজ্জন্য আমরাই দায়ী। কিন্তু দুঃখ ও কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া বিবেক-বুদ্ধিতে যে কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা আরো অধর্ম্মের কাজ। অন্যের চরিত্রের দোষ বলিতে পারি, কিন্তু নিজের দোষ বলিতে পারি না;—অন্য সমাজের অবৈধ ঘটনার উল্লেখ করিতে দক্ষ, নিজ সমাজের বেলা দোষ চাপিতে প্রস্তুত;—এ অবস্থা আমাদের অসহ্য। আমরা যাহা, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ভালবাসিতে পার, বাসিও; না হয়, বাসিও না। ভুল বুঝাইয়া ভালবাসা আকর্ষণ করাকে আমরা পাপ মনে করি। সত্যের জন্যই সত্যের আদর করিব। উনি, তুমি, সে,—কাহারও মুখের দিকে চাহিব না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস;—সত্যের জন্যই সত্য জয়যুক্ত হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে তাহাতেই লোকের মন আকৃষ্ট হইবে,—সত্যের জন্যই সত্যের প্রতি লোকের আদর বাড়িবে। আমাদের বুদ্ধির ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কুটিল, একথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে আজও চিনিতে পারেন নাই। না পারুন, তাতেই বা ক্ষতি কি? মানুষের মুখ না চাহিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি।

আমরা গত বারে যৌবনবিবাহের কেবল অন্ধকারময় অংশ চিত্র করিয়াছি। ইহার উজ্জ্বলতম অংশ চিত্র করাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য, কারণ আমরা

যৌবন-বিবাহের পক্ষপাতী। গতবারে অন্ধকারময় অংশ অঙ্কিত করিবার সময় আমরা অনেক সমাজের অনেক কথা বলিয়াছি। প্রবন্ধের শিরোনামে ব্রাহ্মসমাজ নাম রহিয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, সমস্ত ঘটনাই ব্রাহ্মসমাজের। আমরা গত বারে দুই এক স্থানের ভাষাতে কিছু ত্রুটী করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের অন্ধকারময় অংশ অঙ্কিত করিতে যাইয়া দুই এক স্থলে উজ্জ্বলতম অংশে দারুণ আঘাত করিয়াছি। আমাদের সে অপরাধ অনিচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য অবশ্য ক্ষমা নাই। কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি ক্ষমা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের গৌরবই বৃদ্ধি পাইবে। দুই এক স্থলের দুই একটী কথায় বুঝা যায় যে, ব্রাহ্ম সমাজের সমস্ত বিবাহই ধর্ম্মভাব শূন্য, ইহাই যেন আমরা বলিতেছি। সে কথা বলিবার আমাদের কোন ইচ্ছা ছিল না, এবং তাহা আদবেই সত্য নয়। সমস্ত বিবাহেই যদি কুফল ফলিত, তাহা হইলে আর আজ আমরা প্রকাশ্য ভাবে যৌবন-বিবাহের পোষকতা করিতে সাহসী হইতাম না। আমরা স্থানে স্থানে ধর্ম্মভাব-শূন্য বিবাহ এবং অবৈধ আচরণ দেখিয়াছি, ইহাই আমাদের বলিবার কথা ছিল। আমাদের ভাষার ত্রুটীতে কোন ব্যক্তির মনে যদি আঘাত লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। যৌবন বিবাহে কোথাও কোন রূপ অমঙ্গল ঘটে নাই—আমরা ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া অযথা মিথ্যা কথা রটনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া দিতেছি,—এই সকল কথা বলিয়া যাঁহারা নানা উপায়ে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা আমাদিগকে শত্রু মনে করিলেও, আমরা যেন চিরকাল তাঁহাদিগকে বন্ধুর ন্যায় মনে করিতে পারি। একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য যখন—তখন আমাদের অন্য কামনা হইলে, তাহা অমার্জ্জনীয়। প্রণালী-গত বিভিন্নতাতে কিছু আসিয়া যায় না।

এখন আমাদের প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিবাহের লক্ষ্য যদি ধর্ম্ম সাধন বা মুক্তি না হয়, তবে বিবাহে সমাজের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটে। একথাতে অনেকের আপত্তি আছে, এবং থাকিতে পারে। প্রকাশ্যভাবে সে সকল আপত্তির কথা না শুনিয়া উত্তর দিতে চাই না। ধর্ম্মসাধন বিবাহের লক্ষ্য, এ কিরূপ কথা?—কেহ কেহ বলিতে পারেন। এ কথার যথা সাধ্য উত্তর দেওয়া উচিত, মনে করিতেছি।

মানুষ কতকগুলি কর্ত্তব্য পালনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ সেই কর্ত্তব্য পালনে তৎপর। ভাল করে, কি মন্দ করে, আমরা তাহা জানিনা; এই মাত্র জানি, মানুষ আপন কর্ত্তব্য পালনের জন্য সদাই ব্যস্ত, সদাই উৎকণ্ঠিত। এই কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর মন উন্নত হয়। শরীর মনের সহিত আত্মাও উন্নত হয়। উন্নতি হইতে উন্নতিতে যাওয়াই আত্মার মুক্তি। সুতরাং এই সংসার-সাধন—মুক্তিরই জন্য, উন্নতিরই জন্য। "কে স্ত্রী, কে পুত্র, কে পিতা, কে মাতা?"—মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের এই অপূর্ব্ব কা-

হিনী সহস্র বার শুনিয়াও মানুষ এসকলের মমতা ছাড়িতে পারে না;—সংসার ও প্রকৃতি মিলিত হইয়া ক্রমাগত মানুষকে মোহ হইতে মুক্তিতে, আসক্তি হইতে উন্নতিতে লইয়া যাইতেছে। কেহ তাহা বুঝে, আর কেহ তাহা বুঝে না। যে বুঝে, সে এই সকলের মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া বিস্ময়ে নিমগ্ন হইয়া যায়। পিতা মাতার গভীর প্রেম, আত্মীয় বন্ধুব মধুর ভালবাসা, এবং ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহের পার্শ্বে সে দেখে—স্বর্গ হইতে প্রেমের আর একটী অনাবিল পবিত্র প্রবাহ যেন ছুটিতেছে! পুরুষ তখন স্ত্রীতে মজে। সংসারের জন্য নয়, স্বর্গের জন্য। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বিবাহবন্ধনকে,এইজন্য,ধর্ম্মেরই একটী বন্ধন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তা ও বহুদর্শিতার ফলে পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুপত্নী এক সময়ে এক আশ্চর্য্য সামগ্রী ছিলেন। সমাজতত্বজ্ঞ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হিন্দুপত্নী এবং বিবাহের বয়স ইত্যাদি নামক প্রবন্ধ দুটিতে প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক সারগর্ভ মূল্যবান কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে সকল পাঠ করিলে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। দুই চারি স্থলে তাঁহার সহিত আমাদের কিছু মতের অনৈক্য হইয়াছে। ক্রমে তাহা ব্যক্ত করিতেছি।

চন্দ্রনাথ বাবু বিবাহের অতি উচ্চ আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এ কথাটী ভাবেন নাই যে, হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা স্বত্তেও হিন্দুপত্নীর বর্ত্তমান সময়ে এত দুরবস্থা কেন? একথার উত্তর না পাইয়া আমরা কিছু ব্যাকুলিত হইয়াছি। তিনি মনু হইতে শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, "৩০ বৎসর বয়সের পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে।" দেখাইয়াছেন যে, এই ত্রিশ বৎসর কাল পুরুষ জ্ঞানার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি বালিকার অল্পবয়সে বিবাহের প্রয়োজনীয়তার এইরূপ একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, 'হিন্দুপরিবার একান্নবর্ত্তী, হিন্দু পত্নী কেবল পতির জন্য নয়, কিন্তু পরিবারের জন্যও। পতির পরিবারের সকলের সহিত পত্নীর আত্মীয়তা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অধিক বয়সে তাহা হয় না।' এ কথাটা কি ঠিক? প্রথমত, পত্নী কেবল পরিবারের জন্যও ত নয়, কতক পতির জন্যও ত; সুতরাং স্ত্রী পতির ভালবাসার উপযোগিনী কি না, পতি স্ত্রীর ভালবাসার উপযুক্ত কি না, ইহা কেবল পরিবারের লোক বা অভিভাবক ভাবিয়া নির্দ্দেশ করিলেই ঠিক হয় না; ইহাতে বর কন্যারও কতক মতামত থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, অল্প বয়স্ক হইলে পত্নী পতির পরিবারকে ভালবাসিতে পারিবেন, এ কথাটাও ঠিক নয়। ভালবাসার শাস্ত্রই এরূপ নয়। আমাদের বিবেচনায়, স্বামীকে যখন পত্নী প্রকৃতরূপে ভালবাসিতে শিখে, তখনই স্বামীর প্রিয় বস্তু স্ত্রীর প্রাণের জিনিস হয়। অনেকদিন এক পরিবারে থাকিলেই সকলকে কিছু ভালবাসা যায় না। এক ঘরে থাকিয়াও লোক সাত সমুদ্র পারে, আর সাত সমুদ্র পারে থাকিয়াও প্রাণের ভিতরে থাকিতে পারে—কেবল ভালবাসার তারতম্যে। ভালবাসার শাস্ত্রই স্বতন্ত্র। ঈশ্বরপ্রদত্ত বিধানের মর্ম্মভেদ না করিতে পারিলে এ শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে না। পিতা

মাতাকে যে সূত্রে বালক বালিকা ভালবাসে, সে সূত্র ধরিয়া পাড়াপড়্সীর সকলকে কিছু ভালবাসিতে পারে না। সে সূত্র ভগবানের বিধান। সেই বিধানের স্রোতে পড়িয়াছি, এ জ্ঞান না জন্মিলে স্ত্রী ও স্বামীর পরিবারকে ভালবাসিতে পারে না। দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। বাল্যবিবাহ এদেশে আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু কই সেরূপ গভীর ভালবাসা কই?—সেরূপ আত্মীয়তা কই?—ঝগড়া কলহ বিবাদে অনেক হিন্দু পরিবারের আজ যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, চন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে তাহা বুঝিতেছেন না, আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। চন্দ্রনাথ বাবু যে ধর্ম্মবন্ধনের কথা বলিয়াছেন, আমরাও তাহাকেই বিবাহের লক্ষ্য মনে করি। হিন্দু শাস্ত্রকারগণের সহিত এ সম্বন্ধে আমাদের একটুও মতের অনৈক্য নাই। তবে আমরা মনে করি, বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহ হইলে তাহারা এই উচ্চতর লক্ষ্য কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের বিবাহের মন্ত্র পাঠ কথার কথার ন্যায়—জীবনে তাহার সুফল বড় ফলিতে দেখা যায় না।

বালিকার অল্পবয়সে বিবাহের দ্বিতীয় কারণ, চন্দ্র নাথ বাবু এই রূপ ব্যাখ্যা করেন—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য পতি পত্নীর একীকরণ, হিন্দুপত্নী পতির সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইবেন। বয়ঃস্থ পতি বিবাহের পর বালিকা পত্নীকে গড়াইয়া পিটাইয়া আপনাতে মিশাইয়া লইবেন। একথাটীরও অর্থ আমরা বুঝিলাম না। গড়াইয়া পিটাইয়া ভালবাসা বৃদ্ধি করা যায়, আমরা মনে করিতে পারি না। এত আর ধাতু নয় যে, চেষ্টা করিলেই মিশ্রিত করা যাইবে। পতি পত্নীর একাত্মক-ভাব সাধনের আমরা পক্ষপাতী, উভয়কে পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী নই। এস্থলে স্বাধীনতা ও সাম্যবাদে গরল উৎপন্ন হয়, ইহাও জানি। স্বাধীনতা ও সাম্যবাদে পাশ্চাত্য জগতে বিবাহের বন্ধন প্রথা যে কতক পরিমাণে শিথিল দশা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাতে আমাদের বড় সন্দেহ নাই। স্বাধীনতা ও সাম্যের বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তিতে সেখানে দারুণ কুফল ফলিতেছে। আমরা ঐরূপ স্বাধীনতাকে সর্ব্বান্তকরণে ঘৃণা করি। আমরা পতিপত্নীর পৃথক অস্তিত্ব দেখিতে চাই না। একমত, এক ভাব, এক প্রাণ, এক মন, এক ধ্যান পতি পত্নীর না হইলে সমাজের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। পতি পত্নীর কর্ত্তব্য এবং জীবনের লক্ষ্য একরূপ না হইলে পরিবারে শান্তি থাকে না। পতিত্ব স্ত্রীত্বে, স্ত্রীত্ব পতিত্বে মিশান চাই। উভয়ের মন উভয়কে দেওয়া চাই। কিন্তু অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকা কিরূপে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মিলাইয়া পতিত্বে মিশিবেন, আমরা বুঝিনা। অধিক বয়স না হইলে ভাবী প্রকৃতি নির্ণয় করাও কঠিন। বালিকা ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, ইহা বিজ্ঞ অভিভাবকেরও নির্দ্ধারণ করা কঠিন। বর কন্যার একীকরণের জন্যও, সুতরাং উভয়ের মতামত বড়ই দরকার। উভয়ের অধিক বয়স না হইলে পরস্পরকে হৃদয় ও মন দান করিতে পারা অসম্ভব। বালিকা-বিবাহ প্রচলিত থাকার জন্যই আজ কাল পতি পত্নীর বড় একটা মতের মিল দেখা যাইতেছে না। এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে, হিন্দু পতি পত্নীর মধুর সম্বন্ধ, অনেক স্থলে,

মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

পতি মনে করিলেন, স্ত্রী আমার, কেবল তাহাতেই হইল না; স্ত্রীও মনে করিবেন যে, পতি আমার। পতি মিলিবেন, পত্নীতে; পত্নী মিলিবেন, পতিতে। দুয়েরই অস্তিত্ব থাকিবে—অথচ দুই মিলিয়া এক। একের পিঠে এক যোগ করিয়া এগার হইবে। একের অস্তিত্ব অন্যে ডুবিয়া যাইলে প্রকৃতির শোভা থাকে না,—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পতি, পত্নীর মনে মিলিবেন; পত্নী পতির মনে মিলিবেন। অথবা উভয়ের মন মিলিয়া একটী স্বতন্ত্র মন হইবে। রাসায়নিক সংযোগে ধাতু পরস্পর মিলিয়া যেমন স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে, এখানেও তাহাই হইবে। হর-গৌরী মিলিয়া একাত্মক হইয়া যাইবেন। ইহাকেই পূর্ণ মানুষ হওয়া বলে। পুরুষ পূর্ব্বে যেমন ছিল, পত্নী লাভের পরও তেমনই রহিল, পত্নী কেবল তাহাতে যুক্ত হইয়া মিলিয়া রহিলেন, ইহাতে পূর্ণ মানবত্ব সাধিত হয় না। রাম যিনি, তিনি রাম। সীতা যিনি, তিনি সীতা। বিবাহের পর কথা হইল—"রাম সীতা।" এখানে বাল্মীকি উভয়ের অস্তিত্ব, উভয়ের প্রকৃতির কমনীয়তা, উভয়ের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। সীতা হইলেন রামপ্রাণা, রাম হইলেন সীতা-প্রাণ—বাল্মীকি এই রূপ কবিত্বময় আর্য্যবিবাহের কি এক আশ্চর্য্য ছবি জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন! বর কন্যা উভয় সমবয়স্ক না হইলে যে কেমনে এইরূপ মধুর মিলন হইতে পারে, আমরা বুঝি না। রাম সীতা উভয়ই অধিক বয়স্ক ছিলেন। পতির অধিক বয়স, এবং বালিকার অল্প বয়স হওয়া উচিত কেন?—এ কথার উত্তরে চন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। বর কন্যা উভয়ই অধিক বয়স্ক হইলে এইরূপ মিলন যে সুন্দর হয় না, একথা চন্দ্রনাথ বাবু কি প্রমাণ করিতে পারেন? ছোট শিশু ছোট শিশুকে চায়, বালক বালককে চায়, যুবক যুবককে চায়। বিধাতার নিয়মে—সম বয়স্কের প্রতি সমবয়স্কর একটা প্রাণের টান চিরকাল জগতে রহিয়াছে। বিশেষত, বিবাহের মিলন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত না হইলে মিলন কেমনে সুন্দর হইবে, বুঝিনা। ধর্ম্মবোধ না জন্মিলে ধর্ম্ম-মিলনই বা কেমনে হইবে? যৌবন নামে মানুষের যদি একটী বিশেষ অবস্থা না ঘটিত, তবে কি হইত, জানিনা। যৌবন, বিধাতার নিয়ম। এই সময়ে পুরুষ রমণীর প্রতি, এবং রমণী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইতে চায়। এই বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে মিলন কি সম্ভবপর? চন্দ্রনাথ বাবুর লেখায় কবিত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু যুক্তিতে কিছু একদেশদর্শিতার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, এসকল আর্য্য সতীর আদর্শ রমণীগণ যে যৌবন বিবাহের ফল, এ কথাটী তাঁহার মনে রাখা একান্ত উচিত ছিল।

বালিকা পত্নীকে যদি উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দিয়া নিজের ন্যায় করিতে পারা যায়, তবে চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশ্য কতক সাধিত হইতে পারে। এই শিক্ষার জন্যই তিনি বালিকা বিবাহের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ শিক্ষার এ দেশে প্রচলন নাই। থাকিলেও বালিকাকে শিখাইয়া ঠিক নিজের

ন্যায় করা যায় কি না, সন্দেহ। সুতরাং তাঁহার এ কথাটীও কিছু একাদশদর্শী। অন্য দিকে পত্নী পতিকে কতক শিখাইবেন, একথা হইল না কেন? অথবা পত্নী পতিকে আপনাতে মজাইবেন, এ কথাই বা হইল না কেন? পত্নীর এমন কিছু আছে, যাহা পতির নাই, চন্দ্রনাথ বাবু স্বীকার করিয়াছেন, সেই কিছু পতিকে দিবার জন্য পত্নী অধিকারী নন্ কেন? বালিকা বলিয়া নয় কি? এ স্থানেও আমরা তাঁহার যুক্তিতেই বলিতে পারি, উভয়ের অধিক বয়স হইলেই পরস্পরকে কতক নিজের উপযোগী করিবার শক্তি জন্মে। সুতরাং যৌবন-বিবাহই অধিক যুক্তিযুক্ত। পত্নীকে দেবতার ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াও চন্দ্র নাথ বাবু পতিকে শিখাইবার অধিকার পত্নীকে দিতে প্রস্তুত নন্। এইরূপ স্থানে সাম্যবাদের কথা তিনি কেন যে ভুলিয়া যান, বুঝিনা। এইরূপ একদেশদর্শিতায় পতিকুলের উপর পত্নীকুলের কোনই হাত থাকে না। ইহাতে সমাজে যে কি অবৈধ আচরণ চলিতেছে, তাহা না বলিলেও চলে। পতির সম্পত্তি স্ত্রী, কিন্তু স্ত্রীর সম্পত্তি পত্নী নহেন। বেশ কথা। উভয়ে প্রকৃতিগত অনেক বৈষম্য আছে, এটাও বেশ কথা। পত্নী যখন পতিতে মিলিবেন, তখন পতিত্বের উপযোগিতা পতিতে আছে কি না, ইহাও কি একবার দেখিবার উপযুক্ত পাত্রী পত্নী নন্। এই স্থানে আমরা তাঁহার সহিত মিলিতে পারি না। বিশেষত ধর্ম্ম ও মুক্তিই যখন হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য, পরোপকার সাধনই যখন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য—তখন পতি পত্নী উভয়েরই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। দায়িত্ব বুঝিয়া উভয়ের সে দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকে। দায়িত্ব না বুঝাতেই অসম-বয়স্ক হিন্দু বিবাহে অধিকাংশ স্থলে দারুণ গরল উৎপন্ন করিতেছে। পতি পত্নীতে বিরোধ,—স্ত্রী বিয়োগে পতির পুনর্ব্বার পত্নী গ্রহণ, পতি বিয়োগে বিধবার কুলধর্ম্ম ত্যাগ, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি, এ সকল অসম-বয়স্ক বিবাহ বা বাল্যবিবাহেরই শোচনীয় ফল। এ সকল যে সমাজের পক্ষে পরম অমঙ্গলকর, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আমাদের বিবেচনায়, মনুতে পুরুষের যেরূপ অধিক বয়সে বিবাহের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, চরক শুশ্রুতের নির্দ্দেশানুসারে কন্যারও সেইরূপ অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া একান্ত উচিত।

চন্দ্রনাথ বাবু আর একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—"শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা পত্নী তাহার জন্য নয়।" মূল মতের সহিত আমাদের অনৈক্য নাই। কেবল শারীরিক প্রয়োজনে বিবাহ হইলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না,এ কথা ঠিক। কিন্তু শারীরিক প্রয়োজনে যে পুরুষেরা আজকাল বিবাহ করিতেছে না, সে কথা কি চন্দ্রনাথ বাবু বলিতে পারেন? তবে আর ঐ প্রকার কাল্পনিক কথায় প্রয়োজন কি? বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার অন্যবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু বাল্যবিবাহ যে একটী কারণ নয়, একথা চন্দ্রনাথ বাবুই কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন? তারপর তিনি বলেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুরোধে অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। একথার উত্তর কতক পূর্ব্বে দিয়াছি। অবোধ বালিকাদিগকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী

পরিবারে আনয়ন করিয়া যে, ভালবাসা সূত্রে বাঁধা যাইতেছে না, এ দৃষ্টান্ত এদেশে আজ কাল বড় বিরল নয়। বালিকা বিবাহ প্রচলিত থাকা স্বত্বেও পরিবার-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে—একথাটী চন্দ্রনাথ বাবু একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা বলি, বালক বালিকারা দায়িত্ব বুঝিয়া যদি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যভার মস্তকে না লয়, তবে কখনই তাহাদের দ্বারা কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলামতে পালিত হইবে, আশা করা যায় না। বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য ধর্ম্ম এবং সমাজের উপকার সাধন। অতি গুরুতর কথা, অতি সুন্দর কথা। অন্যের সেবার জন্য এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যাঁহারা মিলিত হইতেছেন, তাহাদের মধ্যে একজন সে দায়িত্ব কিছুই বুঝিতেছেন না !! এই জন্যই, বোধ হয়, হিন্দু পত্নীর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে না। চন্দ্রনাথ বাবুকে একথাটী একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কিন্তু কেবল বয়স লক্ষ্য হইলেই চলিবে না, শরীরের সহিত মানসিক উন্নতি, ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্রের উন্নতি ও প্রকৃত জ্ঞানলাভ না হইলে বিবাহের প্রস্তাবই উঠিতে দেওয়া উচিত নয়। একবার বিবাহের পর আর বিবাহ হইবে না—এইরূপ নিয়ম পতি পত্নী উভয়ের সম্বন্ধে প্রচলিত হইলে, উভয়ে গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া একত্ব-সাধনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। বিলাতী বিবাহের মূল আত্ম-সুখান্বেষণ, চন্দ্রনাথ বাবু বলেন। সেই জন্য তিনি যৌবন-বিবাহকে ঘৃণা করেন। হিন্দুর বিবাহ উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্য কি বর কন্যার পরিণীত হইবার পূর্ব্ব উভয়েরই হৃদ্‌বোধ হওয়া উচিত নয়? দায়িত্ব না বুঝিয়া যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহার সে দায়িত্ব গ্রহণের কোন মূল্য নাই। দায়িত্ব বুঝাইবার জন্য, মহৎ উদ্দেশ্য হৃদ্‌বোধ করাইবার জন্য যৌবন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যৌবন কাল কেবল পুরুষের পক্ষে নয়, রমণীর পক্ষেও প্রয়োজনীয়।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অন্যান্য যে সকল যুক্তি আছে, তাহার অনেক আলোচনা পূর্ব্বে পূর্ব্বে হইয়াছে, সুতরাং সে সকলের আর আলোচনা করিতে চাহি না।

আমাদের বিবেচনায়, হিন্দু বিবাহে খুব সুফল ফলিত, মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত যদি তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। বালক বালিকার অপরিণত বয়সে বিবাহ হওয়ায় প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞান হয় না। ধর্ম্ম বিবাহের লক্ষ্য, একথা মনু বলিয়াছেন, শাস্ত্রকারেরা জানিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলে বর কন্যার সে সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্প। এই কারণে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মহৎ থাকা স্বত্বেও অসমবয়স্ক বা বাল্য বিবাহে আশানুরূপ মঙ্গল প্রসূত হইতেছে না। অনেক স্থলে পতি পত্নীর মধ্যে গাঢ় ভালবাসার অভাব দেখা যাইতেছে—এবং অনেক স্থলে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা অতি অশান্তির জিনিস হইয়া উঠিতেছে।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎসহ বিবাহ-সংস্কার-প্রশ্ন বা যৌবন-বিবাহের কথা উঠিয়াছে। যৌবন-বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে যাইয়া, এই হতভাগ্য দেশে, ব্রাহ্মসমাজকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে। বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে পদে পদে ভ্রূকুটী দেখাইতেছে। স্থানে স্থানে নানা-

প্রকার দুর্ঘটনাও ঘটিতেছে। কিন্তু তবু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রাহ্ম-সমাজ এই বিবাহ-সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইয়া দেশের ভবিষ্যতের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন। একদিনে কিছু অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, একদিনে কিছু দেশের আমূল সংস্কার হয় না। একদিনে কিছু লোকের ধর্ম্মে মতি হয় না। হাজার বার পতন হইলেও সেই পতনের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া বলিব যে, যৌবন-বিবাহ ভিন্ন আর কোন বিবাহে বিবাহের গুরুতর উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না,—হইবার নয়। যে সময় হইত, সে সময় চলিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে যৌবন বিবাহ প্রচলিত হওয়াতে স্থানে স্থানে যে অমঙ্গল ঘটি-তেছে, একথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলি-য়াছে। অন্তরায়ের কথা বলিয়াছি বলিয়া যে আশার কথা নাই, তাহা নয়। নিরা-শার কথা অপেক্ষা আশার কথা সহস্রগুণে অধিক। দুঃখের ধারেই সুখ, নিরাশার ধারেই আশা। আমরা বিবাহের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাই, তাহা না হইয়া থাকিলেও,যতদূর হইয়াছে, যে কোন সমাজ তাহাতে গৌরব করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে উচিত নয়। ব্রাহ্ম সমাজ কতক পরি-মাণে তাহাতেই সন্তুষ্ট। এটাকে ঠিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। কোন সমাজ-তত্বজ্ঞ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এই সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি এক প্রকার বিফল-মনোরথ হইয়া এক ধারে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বিবাহকে ধর্ম্মানুরঞ্জিত না করিলে আর উপায় নাই। এসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ যে কতক পরিমাণে উদাসীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সকল কথা এখানে থাকুক।

গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা ব্রাহ্ম সমাজের একটী প্রধান লক্ষ্য। পরিবার প্রতিপালন করিয়াও প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করা যায়, গত পঞ্চাশৎ বৎসর ব্রাহ্ম সমাজ ইহাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কি করিলে আদর্শ গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,—এক দিকে দৈনিক অতিথি সেবা, অন্য দিকে পরিবার প্রতিপালন;—এক দিকে জ্ঞান চর্চ্চা, অন্য দিকে পূজা অর্চ্চনারূপ ধর্ম্ম সাধন, এই সকল গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের পক্ষে গৃহকে কিরূপ সুশোভিত করা উচিত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ কিছু উদা-সীন। ধর্ম্মকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই রূপ ব্যাখ্যা করা যায়—"নামে রুচি ও জীবে দয়া।" এটী মহত্মা চৈতন্য দেবের কথা। নামে রুচির মূলে জ্ঞান ও প্রেম। জীবে দয়ার মূলে প্রেম ও কর্ম্ম। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মই—ধর্ম্মের মূল। জ্ঞান চর্চ্চার আয়োজন, প্রেম চর্চ্চার আয়োজন, এবং নানা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রতি গৃহস্থা-শ্রমের লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজ অনেক স্থলে কেবল বক্তৃতায় এই কথার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিতেছেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য সমাজের শিক্ষার সহিত স্বার্থ চিন্তা কতক পরিমাণে এই সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই স্বার্থের সহিত বিষম সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া যাওয়ায়, কার্য্যত, আশানুরূপ প্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে না, আমরা বুঝিতেছি।

বিশেষত, আত্মীয় পরিজনকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়া অনেকে প্রেমের মূলে কতক আঘাত করিয়াছেন। যাহাদিগের সহিত রক্তমাংসের সংশ্রব নাই, উচ্চ ধর্ম্ম জ্ঞান ভিন্ন তাহাদিগকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারা বড়ই কঠিন। সুতরাং, অনেক স্থলে পূর্ব্বে হিন্দু গৃহে অতিথি সেবার প্রতি যেরূপ একাগ্র অনুরাগ ছিল এবং এখনও যেরূপ আছে, ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ দেখা যায় না। ব্রাহ্ম পরিবার—পতি পত্নী হইতে আরম্ভ। পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্বদিগকে লইয়া অতি অল্প লোকেই ব্রাহ্ম হইয়াছেন। গৃহকে প্রেমালয় করিবার জন্য এখানে একরূপ দায়ী কেবল পতি ও পত্নী। গৃহকে প্রেমালয় করিতে হইলে, পতিপত্নীকে, বিশেষ ভাবে, এই জন্যই বলি, প্রস্তুত হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে, ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ শিক্ষা দিতেছেন না।

এই পৃথিবীতে টাকা কড়ি আমার কিছুই নয়—এ সকলই অন্যের সেবার জন্য—এই উচ্চ চিন্তা সকলের মধ্যে স্থান পাইবে, বড় আশা করা যায় না। গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যের সেবার জন্যও। আমরা বিবাহিত হইতেছি, কেবল নিজেদের সুখের জন্য নয়, কিন্তু সমাজের ও দেশের মঙ্গলের জন্যও;—প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রকারগণের এই গভীর ধর্ম্মভাব মূলক কথাগুলি আধুনিক সমাজ সমূহে উপহাস্য হইয়া উঠিয়াছে। যে কারণে গৃহস্থাশ্রমকে আর্য্য ঋষিগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সে গুলি এখন ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। নিজের বিলাস সুখ লইয়াই আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। যিনি মাসে ১০০০৲ উপার্জ্জন করেন, তিনিও নিজের সুখ সচ্ছন্দতা লইয়াই অধিক ব্যস্ত, যিনি মাসে ১০৲ টাকা পান, তিনিও তাহাই। বিলাস সুখের আশা মিটিবার নয়, তাহা মিটে না। সুতরাং আয় বৃদ্ধির সহিত বিলাস-সুখ-আশা মিটাইবার চেষ্টাই অধিক হয়। এ সকল যে ভয়ানক দোষের, আমরা অনেক সময়ে তাহাও বুঝি না। ইহার এক মাত্র কারণ, আমরা পূর্ব্ব হইতে সেরূপ শিক্ষিত নই। গৃহ প্রতিষ্ঠার সময় অর্থাৎ বিবাহের সময় বর কন্যা অতি অল্প স্থলেই সেরূপ ভাবে প্রস্তুত হন্। দেশের হিত সাধন বা প্রচার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিবাহিত হইলে যে আরো মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, এ চিন্তাটার আদর দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। বিবাহিত হইলে লোক আরো স্বার্থপর হইবে,—এই রূপ আশঙ্কাই অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। সমাজের চিন্তাই কিছু বিভিন্ন-পথগামী হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এটী একটী বিষম কুফল। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নিজ সুখ লইয়াই অনেকে ব্যস্ত। দয়ার কার্য্য সেখানে কমিটীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়; দৈনিক জীবনে ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প। আধুনিক বঙ্গ সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতি যেরূপ লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে, দৈনিক অতিথি-সৎকার প্রথার প্রতি যেরূপ ঘৃণা উৎপন্ন হইতেছে, ইহাতে প্রেম-সাধনের পক্ষে যে ভয়ানক অন্তরায় উপস্থিত হইবে, আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজেরই প্রতিকৃতি মাত্র। সুতরাং এই সমাজেও প্রেম সাধনের যে আশানুরূপ উপায় অবলম্বিত হয় নাই, ইহাতে দুঃখের কথা থাকিলেও, আশ্চর্য্যের কথা

নাই। ব্রাহ্মসমাজে ব্যক্তিগত স্বত্ব রক্ষা, মত রক্ষার জন্য যে দলাদলী বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, সাধারণত ব্রাহ্মগৃহে প্রেমের সাধন কিছু কম। ভগবানের প্রতি গভীর আস্থা না থাকিলে, রক্ত, মাংস-সংশ্রব-রহিত ভাই ভগিনীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায় না। সুতরাং সম্বন্ধ চিরকাল অটুট থাকে না।

ব্রাহ্ম পতি পত্নীর লক্ষ্য যে আধুনিক হিন্দু সমাজ হইতে কিছু স্বতন্ত্র, একথাটী বুঝাইবার জন্য সমাজ বড় একটা চেষ্টা করিতেছেন না। পরিণীত হইবার সময় হিন্দু সমাজের বালক বালিকারা আপনাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নিকট কিছুই আশা করা যায় না। যাহারা দায়িত্ব বুঝিয়া পরিণীত হন, তাহাদের লক্ষ্য কাজেই কিছু স্বতন্ত্র। দায়িত্ব-বোধ জন্মাইবার সময়, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের দায়িত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া সমাজের পক্ষে উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজ এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সে সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। অন্তত আমরা যে আদর্শ চাই, তাহার অনুরূপ করেন নাই। করিলে, এই যে দলাদলী, এই যে ভালবাসার অভাব, এ সকল থাকিত না;—ব্রাহ্ম পতি পত্নীর দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইত, ব্রাহ্ম সমাজ একটী প্রেমের সমাজ হইত;—মত লইয়া মারামারি, কাটাকাটী, হুটাহুটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিত না। ব্রাহ্মসমাজ ক্রমাগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে চলিয়াছে। একতা বা মিলন, সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। দলের পর ক্রমাগতই দল বৃদ্ধি পাইতেছে। মূল কাটিয়া মস্তকে জলসেচন করিলে কখনই সুফলের আশা করা যায় না। অনেক স্থলে ব্রাহ্মবিবাহ হইতেই যেন স্বাতন্ত্র্যের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। উঠিতে বসিতে, শুইতে যাইতে, আহারে বিহারে, গৃহে বাহিরে—সুখে দুঃখে পতি পত্নী একাত্মক। একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য—পতি পত্নীর হইবে। দুই মিলিয়া দেশের সহস্র জনকে মিলাইবে,—সহস্র জনের অশ্রু বুঝাইবে। এই আদর্শ আধুনিক বিবাহে সাধিত হইতেছে না। বাল্য বিবাহে তাহা সাধিত হইতেই পারে না। যৌবন বিবাহেই এক মাত্র তাহা সাধিত হইবার আশা আছে। কিন্তু নিজ সুখ-ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু যদি বিবাহের লক্ষ্য না হয়, তবে যৌবন বিবাহেও তাহা সাধিত হইবার নয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, প্রেম সাধনার একটী উৎকৃষ্ট উপায়। যৌবন বিবাহ ধর্ম্ম মুলক হইলে, এই প্রথার মূলে কখনই কুঠারাঘাত পড়িতে পারে না। রক্তমাংসের সম্বন্ধের অপেক্ষা, ধর্ম্ম বন্ধন, মিলনের অধিক উপযোগী। এক ধর্ম্মে দীক্ষিত—এক পিতা মাতা লক্ষ্য—একের চরণে সকলের মস্তক; সুতরাং এখানে প্রেম সাধনের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। কিন্তু স্থানে স্থানে এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষিত না হওয়ায়, এই প্রথার প্রতি কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। স্থানে স্থানে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলিতেছে। কিন্তু কুফল ফলিবার সম্ভবনা আছে বলিয়াই এরূপ একটী সুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা উচিত নয়। অগ্নিতে বার বার গৃহ দাহ হইতে পারে, তবুও অগ্নির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য্য নয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিরুদ্ধে সহস্র

আপত্তি থাকিলেও প্রেম শিক্ষার পক্ষে এটী যে একটী সুপ্রণালী, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এই প্রণালীটীকে ব্রাহ্ম সমাজের সযত্নে রক্ষা করা উচিত। পরস্পরের জন্য ভাবিতে ও খাটিতে শিখিলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা—বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিলে নয়।

আমরা বলিয়াছি, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই তিনের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করিতেছেন। বিবাহের পূর্ব্বে এটীকে বর কন্যার মনে অঙ্কিত করিতে না পারার দরুণ আশানুরূপ সুফল প্রসূত হইতেছে না, ইহাও বলিয়াছি। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে,—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই তিনের সমঞ্জসীভূত উন্নতি সাধনের জন্য বর্ত্তমান সময়ে যা কিছু চেষ্টা, ব্রাহ্ম সমাজই করিতেছেন। এই তিনের আংশিক উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হওয়াতেই ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে একটা মহাশক্তির ন্যায় হইয়া উঠিয়াছেন। জাতীয় ভাষার উন্নতি বল, সমাজ সংস্কার বল, রাজনীতির আন্দোলন বল, এ সকলের মূলে স্বতঃপরত এই ব্রাহ্মসমাজের শক্তি কার্য্য করিতেছে। ইহাও কিছুই নয়। ব্রাহ্ম সমাজের যে মহাশক্তির কথা বলিতেছিলাম—তাহা চরিত্রগত মহত্ত্ব। কতক পরিমাণে, নীতিতে ও ধর্ম্মেতে ভূষিত হইয়াই ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি বিকীর্ণ করিতেছেন। কতক পরিমাণে দেশের দূষিত দুর্নীতির বায়ুকে পরিশুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ দেশের মহা কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু প্রশংসার দিকে মন না দিয়া,দোষের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া আমরা তাহাই করিয়াছি। দোষ হইয়া থাকে, যে শাস্তি ইচ্ছা, দেও।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে বিবাহের ভিত্তি করিয়া রাখেন নাই বলিয়া দেশের অপকার হইয়াছে, আমরা বলিয়াছি। ব্রাহ্ম সমাজের এ বিষয়ে দোষ থাকিলেও, এই সমাজভুক্ত অনেক সাধু ব্যক্তি সে দোষে দোষী নন। আমরা জানি, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিবাহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিবাহ, যৌবনবিবাহের অমৃতময় ফল প্রসব করিয়াছে। সে সকল চিত্র দেখিলে প্রাণ আশাতে প্রদীপ্ত হয়—দেশের ভাবী উন্নতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অন্যান্য কথা ক্রমে ক্রমে লিখিব।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মদ্রচিত 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত' পুস্তকের দোষোল্লেখ করা হইয়াছে। এত দিন আমি ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ করি নাই। কেন না, উক্ত প্রস্তাবে আমার পুস্তকের কোন মতই প্রকৃত প্রস্তাবে খণ্ডিত হয় নাই। তত্ত্ববোধিনীর লেখা কোন কার্য্যকর হয় নাই। কারণ, ঐ লেখার পরেও, অক্ষয় বাবুর কৃত ব্রাহ্মসমাজের উপকার স্মরণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে এক প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন হয়।*

* ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নবেম্বর।

কেবল বলিবার ভঙ্গীতে ঘটনায় অনভিজ্ঞ লোকের নিকট উহা প্রতিবাদ-বৎ প্রতীয়মান হয়। কিছু দিন হইল, উক্ত পত্রিকা হইতে ঐ প্রস্তাব উদ্ধৃত করিয়া এক খানা ছোট পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। মূল পত্রিকা ও উদ্ধৃত হইয়া যে ছোট পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, এই দুয়ের নানা স্থানেই অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কেন যে ঐরূপ ঘটিল, তাহা জানি না। আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ, আমি উহার অসারতা প্রদর্শন করিয়া, প্রকৃত বৃত্তান্তে অনভিজ্ঞগণের সমক্ষে যথার্থ বিষয়ের গোচর করি। এই জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। এস্থলে বলা আবশ্যক, প্রবন্ধের অনেক অসার মতের আমি আদৌ উল্লেখ করিব না।

১। প্রস্তাব-লেখক বলিতেছেন, "আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যখন অক্ষয় বাবুর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তখন তাঁহার জীবনী আমরা পাইবার সম্পূর্ণ একটা আশা রাখি। না দিবার গূঢ় কারণ যাহাই হউক, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা তাঁহার জীবনচরিত দেখিলাম।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার পুস্তক না দিবার কারণ আছে। পত্রিকা, মৎপ্রণীত 'হানিমাণের জীবনী' পুস্তকের সমালোচনা করেন নাই। তজ্জন্য অক্ষয় বাবুর জীবনী পুস্তক আর তত্ত্ববোধিনীতে দিই নাই। কেবল যে তত্ত্ববোধিনী সম্বন্ধে ঐরূপ করিয়াছি, এমন নয়; অন্যান্য যে যে পত্রিকা হানিমাণের প্রাপ্তি স্বীকার মাত্র করিয়াছিলেন, সমালোচনা করেন নাই, এবারে সেই সেই পত্রেও অক্ষয় বাবুর জীবনী প্রদত্ত হয় নাই। ঘটনাক্রমে আমার পুস্তক দেখিয়াছেন বলিয়া প্রবন্ধলেখক যে একটা কথা লিখিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে একটা গূঢ় কথা আমি পাঠকদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি। যৎকালে অক্ষয় বাবুর মৃত্যু হয়, তখন বঙ্গদেশে হিন্দু, খ্রীষ্টান্ ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় দ্বারা সম্পাদিত তাবৎ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকায় কতই বিলাপজনক সংবাদ প্রকটিত হইল, আর যে তত্ত্ববোধিনীর জন্য তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই পত্রিকায় কিরূপ অকিঞ্চিৎকর লেখা টুকু মুদ্রিত হইয়াছিল! ইহার রহস্য কিছু আছে কি না, পাঠকেরাই বিচার করিয়া বুঝুন, "ঘটনা ক্রমে" জীবনচরিত খানি তত্ত্ববোধিনী-সংসৃষ্ট লোকদের নেত্রগোচর হয়, কি আষাঢ় মাসের পত্রিকায় অক্ষয়বাবুর জন্য কয়েক পঙ্ক্তি লিখিবার অনেক পূর্ব্বেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়?

২। বৈদান্তিক মত ও বেদশাস্ত্র ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র, এই বিষয় দেবেন্দ্র বাবু মানিতেন। অক্ষয় বাবু বহুকাল ব্যাপিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বারা ঐ দুই মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন, মদ্বিরচিত অক্ষয় বাবুর জীবনচরিতে ইহা সুস্পষ্ট লিখিত আছে। তত্ত্ববোধিনীর প্রস্তাবলেখক, দীর্ঘ ভূমিকার পরে লিখিয়াছেন, "এই বেদ ও বেদান্ত লইয়া, শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়। * * * এই বেদকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার (অক্ষয় বাবুর) ব্যাপক কাল তর্ক হয়। ফলত এই তর্ক দ্বারা নয়, কিন্তু নিজের আলোচনায় এবং বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞদিগের বেদব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুঝিলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় কাণ্ডাত্মক বেদের সমগ্র নয়, কেবল সত্য জ্ঞানই লোকের মুক্তির জন্য প্রচার করা আবশ্যক।"
— (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩৭ পৃষ্ঠা।)

প্রথমেই বলিয়া রাখি, প্রস্তাবলেখক এখানে স্বীকার করিলেন,—অক্ষয় বাবু, দেবেন্দ্র বাবুর সহিত "তুমুল তর্ক" "ব্যাপক কাল তর্ক" করেন। "তুমুল তর্ক" ও "ব্যাপক কাল তর্ক" দ্বারা বেদ-বেদান্ত-সম্পর্কীয় ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে কি না, পাঠক বিবেচনা করিবেন। এ সম্বন্ধে বহু পূর্ব্বে নানা পুস্তক ও পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে। স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করা হইল। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, অক্ষয় বাবুর কৃত তর্ক বিতর্কে দেবেন্দ্র বাবু মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাহার "সজীব প্রমাণ" আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু। লেখক এতদুপলক্ষে রাজনারায়ণ বাবুর যে লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার উপসংহার ভাগ এই—

"Now it was certainly not a heroic feat on the part of Akshya Babu to induce people whose opinions were so lax with respect to the authorities of the Vedas as a revelation to reject the doctrine of their infallibility."
[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৮ শক, কার্ত্তিক]

তত্ত্ববোধিনীর প্রস্তাব-রচয়িতার সাক্ষী রাজনারায়ণ বাবু যাহা স্বীকার করিলেন, প্রস্তাব-লেখক আবার এখানে তাহাও স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। কেন না, প্রস্তাব-লেখকের মতে রাজনারায়ণ বাবুর লেখা "দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইবে যে, অক্ষয় বাবু দ্বারা সমাজ হইতে বেদসংক্রান্ত ভ্রান্ত সংস্কার অপনীত হয় নাই।"* প্রমাণের সহিত প্রমেয় বিষয়ের কেমন অদ্ভুত সামঞ্জস্য! সে যাহা হউক, রাজনারায়ণ বাবু যে কথা বলিতেছেন, তাহাতে আমাদের পক্ষের সম্পূর্ণ না হউক, অনেক পোষকতা হইতেছে। এস্থলে অক্ষয় বাবুর জীবনী সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর পত্র ও তদুত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, বিগত ১২৯২ সালের ৮ই ও ২২শে আশ্বিনের সুরভি হইতে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

রাজনারায়ণ বাবুর পত্রের কতকাংশ;—"* * * গ্রন্থের কোন কোন স্থল অতি-রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ যে স্থলে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বেদের প্রত্যাদেশের মত পরিত্যাগের কথা আছে। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, অক্ষয় বাবু এই মত পরিত্যাগের প্রধান কারণ। কথা যথার্থ, কিন্তু তিনি ইহা যেরূপ গুরুতর কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ততটা গুরুতর নহে। * * * আমরা ঐ সময়ে বেদ কেবল সত্যের আকর বলিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাগত বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, অন্য কোন কারণ জন্য নহে। ইহা যথার্থ বটে যে সর্ব্ব প্রথমে বৈদিক প্রত্যাদেশ বিষয়ে আমাদিগের মত এইরূপ ছিল;—'পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিল, যাহাতে শ্রুতি নামে খ্যাত হইল।'

"কিন্তু এই মত কিছু দিন মাত্র ছিল, তাহা আদোবে ধর্ত্তব্য নহে। যে মত উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী বাক্য সকল দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সেই মতই অধিক দিন স্থায়ী ছিল। তৎপরে অক্ষয় বাবুর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক-দ্বারা তাহাও একেবারে অপনীত হয়।

* অন্যত্র তিনি স্বীকার করিয়াছেন, অক্ষয় বাবুর তর্ক বিতর্ক দ্বারা দেবেন্দ্র বাবু ভ্রান্ত মত ত্যাগ করেন। কি অসঙ্গত কথা।

"উপরে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যে মত প্রতিপন্ন হইতেছে,তাহাতে যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে বৈদিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগ করানো অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য; অতএব ঐরূপ পরিত্যাগ করানো প্রশংসনীয় কার্য্য হইলেও মহেন্দ্র বাবু যেরূপ উহাকে গুরুতর কার্য্য বলিয়া সাজাইয়াছেন, সেরূপ গুরুতর নহে।

"এক প্রকার ইহা বলা যাইতে পারে যে সে সময়ে আমাদিগের ঠিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস ছিল না। "Because the Vedas agree with nature, therefore they regard them as inspired." ইহাকে কি ঠিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস বলা যাইতে পারে?"

আমার উত্তরের কতকাংশ।

২। "তিনি যে বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমার পুস্তকের দোষোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অক্ষয়বাবু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদের তিরোধান বিষয়ক। রাজনারায়ণ বাবু দোষোদ্ঘাটনের প্রথমেই বলিয়াছেন, "গ্রন্থের কোন কোন স্থল অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ যে স্থলে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা বেদের প্রত্যাদেশ পরিত্যাগের কথা আছে। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, অক্ষয় বাবু এই মত পরিত্যাগের প্রধান কারণ। কথা যথার্থ। কিন্তু তিনি ইহা যেরূপ গুরুতর কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ততটা গুরুতর নহে।"

আমি ইহাকে যেরূপ গুরুতর বলিয়া বর্ণন করিয়াছি, উহা বাস্তবিক সেইরূপ গুরুতর বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে। আমার এই গ্রন্থ-প্রণয়নের বহু পূর্ব্বেই Leonard's History of the Brahma Samaj, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, Indian Mirror (15th July of 1868 & 1877) নববার্ষিকী কল্পদ্রুম, Religious Thought and life in india, ইত্যাদি নানা পুস্তক ও পত্রিকায়, অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদের তিরোধান হওয়ার বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইয়াছে।

৩। দেবেন্দ্রবাবু বেদকে ঈশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া প্রত্যয় করিতেন। অক্ষয়বাবু তাহাই খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে উঠাইয়া দেন, এই কথা উল্লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা সমূহে লিখিত আছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন,—"আমরা ঐ সময়ে বেদ কেবল সত্যের আকর বলিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, অন্য কোন কারণ জন্য নহে।" তৎপরে Vedantic Doctrines Vindicated, Rev. Muller's Vedantism, Brahmaism and Christianity, এবং Englishman হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—"ইহা যথার্থ বটে যে, সর্ব্ব প্রথমে বৈদিক প্রত্যাদেশ বিষয়ে আমাদিগের এইরূপ মত ছিল;—'পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা-প্রবাহিত হইয়া আসিল, যাহাতে শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ হইল' এই মত কিছুদিন মাত্র ছিল, তাহা আদোবে ধর্ত্তব্য নহে। যে মত ইংরেজী বাক্য সকল (অর্থাৎ ইংলিসম্যান প্রভৃতির উদ্ধৃতাংশ) দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সেই মতই অধিক দিন স্থায়ী ছিল। তৎপরে অক্ষয় বাবুর সহিত তর্কবিতর্কে তাহাও একেবারে অপনীত হয়।"

এখানে রাজনারায়ণ বাবুর কথানুসারে "আমাদিগের" এই শব্দে রাজনারায়ণ বাবু ও দেবেন্দ্রবাবুকে বুঝাইতেছে। কেননা, জগদ্বন্ধু পত্রিকার উত্তরে লিখিত "পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব" ইত্যাদি তাঁহাদের উভয়েরই লেখা। তিনি এস্থলে স্বীকার পাইয়াছেন, প্রথমে "বৈদিক প্রত্যাদেশে" তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বলিতেছেন, তাহা "কিছুদিন মাত্র ছিল।" তাঁহার মতে ইংলিসম্যান ও Vedantic doctrines Vindicated আদির লিখিত বিষয়ই অধিক দিন স্থায়ী ছিল। কিন্তু আমি দেখিতেছি, জগদ্বন্ধু পত্রিকার উত্তর স্বরূপে ১৭৬৮ শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ ঈশ্বর প্রণীত এই মতটী প্রকাশিত হয়। আর ইংলিশম্যানে লিখিত দেবেন্দ্র বাবুর পত্র, ঐ শকেরই অগ্রহায়ণ মাসে এবং Vedantic doctrines Vindicated প্রতিপাদ্য মত ১৭৬৭ শকের আশ্বিন মাসে প্রকটিত হয়। সুতরাং রাজনারায়ণ বাবু যে মতে ("পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব" ইত্যাদিতে)
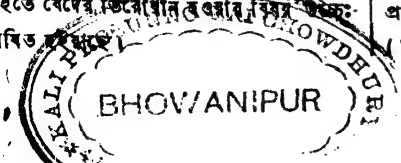
"সর্ব্ব প্রথমে" দেবেন্দ্র বাবু ও তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক্ নহে। ঐ মত ইংলিশম্যানে দেবেন্দ্র বাবুর পত্র প্রকাশিত হইবার পরের মত, "সর্ব্ব প্রথমের" নহে। অতএব "উহা আদোবে ধর্ত্তব্য" এবং "এই মত কিছুদিন মাত্র ছিল" কি না, পাঠক মহাশয়েরাই স্থির চিত্তে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

৪।—রাজনারায়ণ বাবু তদনন্তর কহিয়াছেন, "উপরে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যে মত প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাতে যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে বৈদিক প্রত্যাদেশে বিশ্বাস পরিত্যাগ করান অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য; অতএব ঐরূপ পরিত্যাগ করান প্রশংসনীয় কার্য্য হইলেও মহেন্দ্র বাবু যেরূপ উহাকে গুরুতর সাজাইয়াছেন, সেরূপ গুরুতর কার্য্য নহে।"

যে মতকে আশ্রয় করিয়া রাজনারায়ণ বাবু স্বীয় যুক্তি দ্বারা অক্ষয় বাবুর কৃত কার্য্যকে "অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য" বলিয়াছেন; ইতি পূর্ব্বেই সে মত খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তাহার আর বিশেষ প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে না। ফলতঃ ন্যূনাধিক ৭।৮ সাত আট বৎসর * ব্যাপিয়া অক্ষয় বাবু যে কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা যদি "গুরুতর" না হইল, তবে "গুরুতর" কাহাকে বলে? রাজনারায়ণ বাবু যখন অক্ষয় বাবু দ্বারা সমাজ হইতে বেদের তিরোধান হওয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আর তাঁহার বিতর্কবাদে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল দেখায় না।"

এ বিষয়ে আমাকে আর অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইবে না। কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীর ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, "ফলত এই তর্ক দ্বারা নয় কিন্তু নিজের আলোচনায় এবং বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞদিগের বেদব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝিলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় কাণ্ডাত্মক বেদের সমগ্র নয় কেবল সত্য জ্ঞানই লোকের মুক্তির জন্য প্রচার করা আবশ্যক।" পাঠক মহাশয় এস্থলেও এক কৌতুক দেখুন, উক্ত লেখা উদ্ধৃত হইয়া যে ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার ঐ অংশে কি লেখা আছে;—"ফলত এই তর্ক বিতর্ক দ্বারা এবং নিজের আলোচনায় এবং বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞদিগের বেদব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় কাণ্ডাত্মক বেদের সমগ্র হইতে কেবল পরমাত্ম-তত্ত্ব সত্যজ্ঞান উদ্ধৃত করিয়া তাহাই লোকের মুক্তির জন্য প্রচার করা আবশ্যক।"* মূল লেখার সহিত উদ্ধৃত ভাগের এরূপ অপূর্ব্ব সাদৃশ্য এবং এরূপ অদ্ভুত সত্যপরায়ণতা কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? কার্ত্তিক মাসে লেখক যে মত ঘোষণা করিয়াছেন, মাঘ মাসে তাহা পরিবর্ত্তন করিলেন। আবার আমার এই প্রতিবাদের পর হয় তো অন্য রূপ ঘটিবে।

অক্ষয় বাবুর তর্ক বিতর্কে দেবেন্দ্র বাবু, বেদবিষয়ক ভ্রম ত্যাগ করেন, মাঘ মাসের মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল। বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞগণের কলিকাতায় আগমনের বহু পূর্ব্বে যে অক্ষয় বাবু দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই,—

"And he (Babu Akshayakumar Datta) strenuously fought for about eight years with Babu Tagore (Babu Devendranath Tagore) to prove that his beliefs in the Vedas as an infallible revelation were erroneous. No one knows better than our Pradhan Acharyaya that Babu Akshayakumar tried his heart and sou' *before the arrival of four Pandits from Benares* whither they had been sent to be indoctrinated in the knowledge of the Vedas,—to erase out of his mind the be-

* Indian Mirror, July 15, 1868, কল্পদ্রুম ৪র্থ খণ্ড, নববার্ষিকী ইত্যাদি দেখুন।

* "ব্রাহ্ম সমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত" ১৮০৮ শক, ৮পৃষ্ঠা।

liefs in their infallible authority."—[*Indian Mirror*, July 15th, 1868.]

পাঠক মহাশয় এখন বুঝুন, "বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞদিগের বেদব্যাখ্যা" কোথায় রহিল!

৩। এক বার জগদ্বন্ধু পত্রিকায় বেদশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত নহে, এই মত লিখিত হয়। ইহার উত্তর-স্বরূপ তত্ত্ববোধিনীতে বেদ, ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই লেখাটী দেবেন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু দ্বারা লিখিত হয়। প্রস্তাব-লেখক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহা যে দেবেন্দ্র বাবুর লেখা, "এ কথার মূল কি?" তৎপরে নিজেই বলিতেছেন, "যদি তাহা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতেও বিশেষ দোষ দেখিতেছি না।"

দেবেন্দ্র বাবু তখন বেদকে ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন, সুতরাং তাহাতে দোষ কি? প্রস্তাব-লেখক যদি স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, জগদ্বন্ধু পত্রিকার উত্তরটী দেবেন্দ্র বাবু লেখেন নাই, তাহা হইলে আমি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকের লেখা হইতেই তাহার খণ্ডন করিতাম। জগদ্বন্ধু পত্রিকার উত্তর স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যাহা লিখিত হয়, তাহা অবিকল উদ্ধৃত না করিয়াই, প্রস্তাবলেখক অনর্থক অনেক আস্ফালন করিয়া লিখিয়াছেন, "চরিতাখ্যায়ক দেখুন, জগবন্ধু পত্রিকার প্রত্যুত্তরে কি বলা হইয়াছে।" অতঃপর নিজের মনঃকল্পিত কথায় উক্ত পত্রের "সার এই" বলিয়া কিছু লিখিয়া বলিয়াছেন,— "এখন চরিতাখ্যায়ক দেখুন, তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিতে চান, তাহার বল কত দূর।"

এ বিষয়ে বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। জগদ্বন্ধু পত্রিকার উত্তরের কিয়দংশ মূল তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত হইল,—

"এ প্রকার দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ট, পবিত্রচিত্ত সাধু যিনি ছিলেন, এবং যাঁহাকে বেদ প্রদান না করিলে, সমুদয় মনুষ্য কৃতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না, তাঁহার পরিশুদ্ধ চিত্ত ব্যতীত বেদ গ্রহণের উপযুক্ত আর কে হইতে পারে? অতএব জগদীশ্বর প্রথম মনুষ্যের চিত্তেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা সমুদায় যুক্তি ও পুরাবৃত্ত এবং স্বয়ং বেদের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। এই প্রকার পরমেশ্বরপ্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিল; যাহাতে শ্রুতি নামে খ্যাত হইল।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৮ শক, চৈত্র।]

এখানে বেদ পরমেশ্বরপ্রণীত, স্পষ্টই বলা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবুও সুরভিতে স্বীকার করিয়াছেন, "ইহা যথার্থ বটে সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক প্রত্যাদেশ বিষয়ে আমাদিগের এইরূপ মত ছিল;—'পরমেশ্বর-প্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিল, যাহাতে শ্রুতি নামে খ্যাত হইল।" (সুরভি, ১২৯২, ৮ই আশ্বিন।)

৪। মৎ-প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকে আমি বর্ণন করিয়াছি, "দেবেন্দ্র বাবু এই মত স্থির করেন ও প্রচার করিতে উদ্যত হন, স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, চন্দন, ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা

করিবে। এমন কি, তিনি এই প্রকার করাইতে প্রবৃত্তও হইয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়ার কোন বৈদ্য পরিবারে তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মমন্ত্র শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা উপদেশ করান।”—[মৎপ্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবনী ৯০ পৃষ্ঠা।]

কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনীতে লিখিত হইয়াছে, শ্রীধর ন্যায়রত্ন স্বয়ং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়া দেবেন্দ্র বাবুকে ঐ বিষয় বিজ্ঞাপন করেন। দেবেন্দ্র বাবুর উপদেশে উহা সম্পাদিত হয়, কি শ্রীধর ন্যায়রত্নের নিজের উদ্যোগে হয়, পাঠক দেখুন,—

"The old idea of administering mantras to individuals and families and to teach them to worship Brahma with offerings of flowers and viands caught hold of Babu Tagore's mind, so much so that, under *his* (*Devendra Babu's*) *instructions*, Pandit Shridhar Nyayaratna made the family of Jagatchandra Roy and Lokenath Roy of Kachrapara, his শিষ্য (disciples) by administering mantras to them from Mahanirvan Tantra. It was owing to the remonstrance of Babu Akshaykumar that this most ridiculous practice was given up and no more thought of."—[*Indian Mirror, 15th July*, 1868.]

অক্ষয়কুমার দত্তের যত্ন ও চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেদ-বেদান্ত-সংক্রান্ত ভ্রান্ত মত দূরীভূত হয়, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন কথা। বহুসংখ্যক পুস্তক ও পত্রিকার প্রমাণ ব্যতিরেকে এখনও যে সকল প্রাচীন লোক জীবিত আছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ জানেন। উদাহরণ-স্থলে তাহার একটা নমুনা দিতেছি। বাবু কানাইলাল পাইন এক জন প্রাচীন ও মাননীয় ব্রাহ্ম। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস-লেখক। আমার প্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত প্রচারের অনেক পরেও অক্ষয় বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে তিনি কি বলেন. পাঠকগণ দেখুন,——

"With the light of western literature and science and of his deep researches into the Hindu scriptures, he waged a continued war with the errors and prejudices of Babu Devendranath Thakur on the subject of Vedic infallibility for about eight years during which time, he succeeded in correcting and removing them one after another. Babu Devendranath was convinced that the Vedantic doctrines of Pantheism and annihilation of the soul were untenable, that the practice of administering *mantras* from the Aryan Scriptures to individuals and families while initiating them into Brahmoism was not in consonance with the spirit of that religion, that the offering of flowers and viands to the invisible and formless Diety, while engaged in adoring him, was inconsistent with the spiritual worship inculcated in the Brahma Dharma, that the belief of transmigration of soul as taught in the vedas, was perfectly opposed to the law of progress established by the Divine hand, and that his belief in the vedas as an infallible revelation was erroneous."
—[*Indian Messenger*, 13*th* June 1886.]

আমি প্রথম হইতে যে যে বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছি, এই উদ্ধৃতাংশ তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ করিতেছে।

৫। প্রস্তাব-রচয়িতা বলেন, অক্ষয় বাবু "বেদমন্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নির্জীব উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বহু আয়াসেও কৃতকার্য্য হন নাই।"

বাঙ্গালা ভাষায় ঈশ্বরের আরাধনা করা "নির্জীব" কি "সজীব", আদি ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন বঙ্গদেশের অন্যান্য সমাজের উপাসনা প্রণালী দেখিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৬। "অক্ষয় বাবুর যখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ, তখন হইতেই তাঁহার ভাবে ও কার্য্যে, তিনি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে সংশয়বাদী, তাহাই ছিলেন।"

এ কথার উত্তরেও রাজনারায়ণ বাবুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাব-লেখককে জিজ্ঞাসা করি,

যখন উপাসক-সম্প্রদায় রচিত হইয়াছে, তখনও কি অক্ষয় বাবুর "ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ ?"

উপসংহার কালে বক্তব্য, পাঠক মহাশয়েরা তত্ত্ববোধিনী ও মৎপ্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবনী, উভয় পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, অপ্রামাণিক কথা আমার পুস্তকে আছে কি না। তত্ত্ববোধিনীর লেখক একটী স্থলেও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। তিনি বিনা প্রমাণেই সমস্ত কথা বলেন। অক্ষয় বাবু যাহা নহেন, আপনাকে তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লিখিবার তাঁহার প্রমাণ কি, জানি না। তিনি নানা কথা কহিয়া পরিশেষে আমাকে পুস্তকের দোষ সংশোধন করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহা দ্বারা সত্যেরই সুমান রক্ষা করা হইবে! তিনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য!!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

গীতধ্বনি।

১২৯২ সালের ভাদ্রমাসে একদিন মেদনীপুর জেলার এক নদী বাহিয়া যাইতেছিলাম। তখন রজনীর দ্বিতীয় যাম অতীত প্রায়। শরতের সুনীল নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া, কলধৌত-জ্যোৎস্না-তরঙ্গে জগৎ প্লাবিত করিতেছিলেন। অলস অনিল সেই নিশীথ-কৌমুদী-দীপ্ত-নদী-জলে স্নান করিয়া, সদ্য-প্রস্ফুটিত, শিশির-স্নিগ্ধ সেফালিকার সৌরভ হরণ করিয়া, তীরস্থ তরু লতাগণকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছিল। স্রোতস্বতী স্বীয় বিশাল বক্ষে চন্দ্র-তারা-বিভূষিত স্বর্গের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া, কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছিল। ক্লান্ত জগৎ চন্দ্রের অজস্র সুধা পান করিয়া এক্ষণে শান্ত ও সুপ্ত। কেবলমাত্র আমার ক্ষুদ্র তরণী সেই উজ্জ্বল বারি-বিস্তারের উপর দিয়া তর্ তর্ করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। কেবলমাত্র নৌকা-
-ভঙ্গ-জনিত কল্লোল শ্রুত হইতে-

নিস্তব্ধ, মনোহর সময়ে, এই
নী তটিনীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে, আমার হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, আমারও চিত্ত সেই অনন্ত স্নিগ্ধ-গাম্ভীর্য্যময়-বিরাট পুরুষের অনুধ্যানে নিমগ্ন হইল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম—

'কোথা গেলে পাব আমি তাঁর দরশন,
হেরিতে যাঁহারে সাধ করে অনুক্ষণ।
অন্তরীক্ষে, জলে, স্থলে,
মহিমা যাঁহার জ্বলে;
ধরা-গর্ভে, রসাতলে নিবসে যে জন।
পূর্ণিমার শশধরে,
যাঁর শান্তি-সুধা ঝরে,
প্রফুল্ল কুসুম দলে যাঁহার হাস্য-বদন।
তপন মণ্ডলে যার
জ্যোতির জ্যোতি প্রচার,
অপার করুণা রূপে তটিনী সৃজন।
বিশাল বিমান পাতে,
তারকা বর্ণমালাতে,
লিখিত মধুর যার মহিমা স্তুতি-গায়ন।'

সহসা এক মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি আমার কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সেই চন্দ্রকর-

বিভাসিত অনন্ত নীলাকাশ প্লাবিত করিয়া সেই শান্ত প্রবাহিনী, উজ্জ্বল বীচি-মালিনী তরঙ্গিনি-হৃদয়উচ্ছ্বাসিত করিয়া গায়ক গাহিলেন,—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।
ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ জল-খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
গগণে গরজে ঘন,
বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।'

আমি নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে লাগিলাম,—

'মনে করি কূলে ফিরি,
বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।'

গায়ক পুনরায় গাহিলেন,—

যাহারে কাণ্ডারী করি,
সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে।'

রচয়িতা এই সঙ্গীতটী যে অর্থে প্রণয়ন করিয়া থাকুন না কেন, গায়ক ইহা যে ভাবে গাহিয়া থাকুন না কেন, কিন্তু আমার চিত্ত তখন ভগবানে অর্পিত ছিল। সুতরাং আমার মনে সঙ্গীতটীর পরমার্থ ভাব উদয় হইল। ...নের পূর্ব্বাপর ঘটনার সহিত এই গীতের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিলাম।

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে।

যৌবনের কুসুম কাননে প্রবেশ করিয়া আশার চন্দ্রালোকে যখন সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তখন হৃদয় কি এক অব্যক্ত মোহজালে অভিভূত ছিল। জগতের তাবত পদার্থ যেন সুন্দর ও প্রফুল্ল বোধ "হইতেছিল"। আমার মনে হইতেছিল, 'ইহাই প্রকৃত সুখ। কিন্তু তখন কে যেন আমার কাণে কাণে বলিল, 'ভ্রান্ত নর! তুমি চৈতন্য হারাইয়াছ, তুমি যাহাকে সুধা ভাবিয়া মহানন্দে পান করিয়া আপাতত আত্মাকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছ, বাস্তবিক তাহা সুধা নহে, অনন্ত-নিশ্বাস-নিঃসৃত, প্রাণান্তকর হলাহল মাত্র। তুমি যাহাকে সুখ ভাবিয়া পরম পরিতোষ সহকারে উপভোগ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মানিতেছ, বস্তুত উহা অত্যন্ত দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি নিত্য, পবিত্র সুখের অধিকারী হইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও,—তোমার সাধের জীবন-তরণী ধর্ম্মের তরঙ্গে ভাসাইয়া দেও।' আমি তাহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। তৎপরে আমার উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ত সাধের তরী ধর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দিলাম; কিন্তু ইহার কাণ্ডারী হইবেন কে? কাণ্ডারীবিহীন তরণী কতক্ষণ স্রোতোবেগে স্থির থাকিতে পারে? এখন, কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে?" তখন উত্তর হইল, "ধর্ম্মসাগরে ঈশ্বর ভিন্ন আর কে কাণ্ডারী হইতে পারেন?"

ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে।

ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ কি মধুময়! কি আনন্দপ্রদ! কেমন নবীন উৎসাহ! কেমন বিশ্বজনীন্ প্রেম! কি পবিত্র, সুধাময় ভাব! আহা ইহাদের তুলনা কোথায় মিলে? এ সকল যদি মানব-হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে কি আর কোন ভাবনা

থাকে? ধর্ম্মের পথ কেমন সরল ও বিঘ্ন-শূন্য বলিয়া তখন প্রতীয়মান হয়। এ সময় ধর্ম্ম কৃচ্ছ্র-সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। ক্রীড়া যেমন মনুষ্যের নিকট কখন কষ্টজনক বোধ হয় না, ইহাও সেই রূপ। ধর্ম্ম-তখন মানুষের নিকট জল খেলা মাত্র। সেই ধর্ম্ম-সলিলে ক্রীড়া করা কি সুখপ্রদ! তাহাতে কখন ডুবিতেছিলাম, কখন ভাসিতেছিলাম, কখন বা সাঁতার দিতেছিলাম। প্রাণ, মন স্নিগ্ধ হইতেছিল। এই সময় স্বতঃই মনে হইতেছিল, এরূপ অনুকূল অবস্থায়, প্রফুল্ল চিত্তে সেই দেব দেবের নিকট উপস্থিত হইব। কিন্তু হায় ধর্ম্ম-জীবন যদি এই রূপই হইত, তাহা হইলে সাধকেরা ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ বলিতেন না। এখন,

গগণে গরজে ঘন,
বহে খর সমীরণ,

নানাবর্ণের মেঘ যেমন সমুদ্রকে ঢাকিয়া রাখে, ধর্ম্মকেও সেইরূপ নানামতে ঢাকিয়া রাখিতে দেখা যায়। শিশু যেমন মেঘ-গর্জ্জনে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম-রাজ্যের শিশুগণ নানামতের সংঘর্ষণে সশঙ্কিত ও স্তম্ভিত হন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শাস্ত্রকারগণের বিচিত্র ব্যবস্থায় আমি ইতঃস্তত করিতেছি, আমার বিশ্বাস-মন্দিরের ভিত্তি ভূমি সততই আলোড়িত হইতেছে, প্রবৃত্তির দুরন্ত ঝটিকা হৃদয়াকাশে প্রধাবিত হইতেছে। অনেক দিনের সাধন ভজন ক্ষণকালের অবিমৃষ্যকারিতায় একেবারে নষ্ট হইতেছে। এত দিন ধরিয়া হৃদয়ে পবিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিতে-ছি, প্রবৃত্তিগণের আক্রমণে তাহাদের হইবার উপক্রম হইতেছে। এখন দেখিতেছি, মনঃসংযম কি কঠিন ব্যাপার! এখন বুঝিতে পারিতেছি, ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে ইন্দ্রিয়গণ যে নিতান্ত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা কেবল কিছুকাল বিশ্রাম লইবার জন্য। এখন তাহারা বিশ্রাম লইয়া বল সঞ্চয় করিয়াছে। নূতন বলে চারিদিক হইতে আমাকে আক্রমণ করিতেছে। যখন বলে পরাস্ত হয়, তখন কৌশল অবলম্বন করে। কখন কখন আমার বলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলে; আমিও সেই কথা শুনিয়া প্রলোভনকে আহ্বান করি, কিন্তু উহাদের এমনি মোহিনীশক্তি যে, দেখিয়া শুনিয়া রণে ভঙ্গ দিতে হয়! আর রণই বা করি কাহার সহিত? উহারা কখন রণ করে না; উহারা লোভ দেখায়— মিষ্ট কথায় বশ করে। এরূপ দেখিয়া শুনিয়া এখন মনে হইতেছে, "কুল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।" ধর্ম্ম জীবনের কঠোর ব্রত আমার পক্ষে এখন অসাধ্য সাধন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই এক বার ভাবি, সংসারের সুখের পথে ফিরিয়া যাইলে হয় না? আবার মনে উদয় হয়, সেখানে ফিরিয়া যাইয়া কি করিব? কিন্তু এখন চক্ষের ভ্রম ঘুচিয়াছে। সংসারোদ্যানে যে সকল বৃক্ষের ফল খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিব মনে করিতেছি, তাহাদিগকে কালভুজঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছে;—ব্যাধি ও দুঃখ যদি সংসার হইতে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে সংসারের সুখ মধুর ও উপাদেয় বোধ হইত। সেখানকার সকল সুখ স্বাস্থ্যের বিনিময়ে লাভ করিতে হয়। সুস্থতা না থাকিলে ভোগ কয় দিনের জন্য? তাই

মনে করি কুলে ফিরি,
বাহি তরী ধীরি ধীরি,

কিন্তু,—কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে,
হায়,—
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।

যুগে যুগে যাহার জন্য সকলে লালায়িত; সাধকগণ যাহার জন্য সকল ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক ধনমানে জলাঞ্জলি দিয়া বনে বনে ভ্রমণ করেন, কত কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, তিনি কোথায়? আমার প্রাণেশ্বর, তিনি কোথায়? এক দিন যাঁহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে 'আমার' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি; সহস্র সহস্র নাম স্বত্বেও আমি যাহাকে 'বিশ্বাস' অভিধানে অভিহিত করিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব সুখলাভ করিয়াছি, তিনি কোথায়? যিনি অদৃশ্য থাকিয়াও আমার সকল অভাব দূর করিতেছেন, যিনি অসহায়ের সহায়, দরিদ্রের ধন, পাপী ও মূঢ়ের অবলম্বন, পৃথিবীতে 'আমার' বলিবার যাহার কিছু নাই তাহারও যিনি সর্ব্বস্ব, যাঁহাকে স্মরণ করিলে আমার হৃদয়ে অজস্র বলের সঞ্চার হয়, যিনি নিরাশান্ধকারে আশার আলোক এবং দুস্তর ভবার্ণবের একমাত্র কাণ্ডারী, তিনি কোথায়? তাঁহাকে কি দেখিতে পাইব না? মনের তৃষ্ণা কি মিটিবে না? কৈ এখনও ত মিটিল না! কখনও মিটিবে কি না, তাহাও জানি না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজ।—শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৵১০ মাত্র। এই পুস্তিকায়, গ্রন্থকার, ব্যবস্থাপক সমাজের সর্ব্বপ্রথম বীজের রোপণ হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতি পর্য্যন্তের ইতিহাস,অতি সরল এবং পরিষ্কার ভাষায় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, সর্ব্ব প্রথমে যখন ব্যবস্থাপক সমাজ স্থাপিত হয়, তখন সেই সমাজ সমস্ত দেশের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পান নাই; ধীরে ধীরে এই ক্ষমতা উক্ত সমাজের হাতে অন্যায় রূপে আসিয়াছে। সে অন্যায় উপায়, তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা। লেখক বলেন যে, শতবর্ষ পূর্ব্বে, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, বঙ্গদেশকে একটী বৃহৎ ফেক্টরী মনে করিয়া বঙ্গবাসিদিগকে সেই বৃহৎ ফেক্টরীর কুলীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখন ইংরাজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। এখন আর ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বাণিজ্যালয় নহে; সুতরাং এখন ন্যায়ানুরোধে এবং ইংলণ্ডের কলঙ্ক নিবারণার্থ, ব্যবস্থাপক সমাজের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

২। দারুব্রহ্ম;—বা সংস্কৃত, উড়িয়া, ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত জগন্নাথদেবের বিবরণ। শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত—মূল্য ॥০ আনা। এই গ্রন্থে উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ দেবের ও জগন্নাথ মন্দিরের সর্ব্ব প্রকার ইতিহাস, প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকন্তু আনুষঙ্গিক ভাবে, উড়িষ্যার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা,এবং বৌদ্ধধর্ম্মেরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়; এই সকল ঐতিহাসিক কথা ছাড়াও ইহাতে জগন্নাথের যাত্রিদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। সে সকল কথা জানিলে, তাঁহারা অনেক প্রবঞ্চক পাণ্ডা-

দিগের নানা প্রকার ধূর্ত্ততা হইতে নিস্তার পাইতে পারিবেন।

৩। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী।—শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত। মূল্য।০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ৭২ পৃষ্ঠায়, সংক্ষেপে কেশব বাবুর জীবনচরিত যতদূর সম্ভব, দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলিয়া কোন প্রধান কথাই উল্লেখ করিতে গ্রন্থকার ভুলেন নাই। এখানি আবার শুধু জীবনচরিত নহে; জীবন সমালোচনাও বটে। কেশব বাবুর বিরোধী সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের অনেকে তাঁহার শেষ কার্য্যাদি অনেকটা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া মনে করেন; এ গ্রন্থকারও সেইরূপ দৃষ্টি রাখিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। এ কার্য্যটা ভাল হয় নাই।

৪। যুগলমিলন;—অর্থাৎ দাম্পত্য প্রেম নাটক। শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত; মূল্য।৵০ আনা। অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণানুসারে এখানা নাটক নহে; প্রহসন। আবার, প্রহসন না হইলেও,যখন অঙ্ক মোটে চারিটী, তখন ইহা নাটক নহে, নাটিকা। প্রাচীন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহারা মুখে খুব ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন, এবং একালের যুবকদিগকে দুর্নীতিপরায়ণ ভাবেন, অথচ নিজেরা ব্যবহারে অধার্ম্মিক এবং নৃশংসাচারী, তাঁহাদিগের প্রতি খুব বিদ্রূপ করা হইয়াছে; এবং একালের যুবক যুবতীদিগের চরিত্রে, লেখকের আদর্শ দাম্পত্য প্রণয় ও ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট করাইয়া, নায়ক নায়িকার মিলন করান হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারের হিসাবে ইহার যত হইয়াছে, নাটকের হিসাবে তত নয় বলিয়া মনে হইল।

...নায় ভারতী—(ভারতের পতন ...মূলক গাথা পঞ্চাশৎ) মূল্য ৵০ আনা। ভাষা ভাল; পদ্য রচনাও বেশ সচ্ছল। কিন্তু কবিত্ব কিছু নাই। পদ্যে ঐতিহাসিক কয়েকটী ঘটনা লইয়া বক্তৃতা করা হইয়াছে। কিন্তু সে ঘটনা গুলিও খুব সাধারণ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িলে একটা উত্তেজনাও হয় না। সুতরাং বক্তৃতার উদ্দেশ্যও নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়।

৬। মহাপ্রস্থান বা পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ।—(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য। পদ্যে কথোপকথন রচিত হওয়ায় কিছু লাভ হয়ই নাই বরং দোষ হইয়াছে। গদ্যে হইলে, যাহা হউক, একটু শুনিতে ভাল লাগিতে পারিত, কিন্তু গিরীশ বাবুর অনুকরণে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে পদ্য লিখিয়া, গ্রন্থকার,নাটিকা খানাকে নষ্ট করিয়াছেন।

৭। উপহার। (পদ্য)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। জীবন মরণ মরণই জীবন;—জীবন মরণ এক সাথে; যতটুকু আছ বেঁচে ততটুকু গেছ মরে, মরণেই নূতন জীবন; পড়িলেই রবীন্দ্র বাবুর অনন্ত মরণ মনে পড়ে। গ্রন্থখানা ছন্দে ও ভাষায় রবিচ্ছায়া। অনুকরণপ্রিয়তা পরিত্যাগ না করিলে গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল হইবে না।

৮। মায়াবিনী (পদ্য)।—শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু বিরচিত। আমরা স্ব চ্যুত; সংসার আমাদের বিদেশ। এখানে থাকিয়া সংসারে ডুবিয়া, আমরা প্রকৃত রাজ্যের কথা বিস্মৃত হই। এবং শোভাময় প্রকৃতির পূজা করিলে,অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত থাকে; ওয়ার্ডসোয়ার্থের এই ভাব লইয়া মায়াবিনী লিখিত। লেখা বেশ পরিপাটী। স্থান থাকিলে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতাম।

৯। বাল্যজীবন।—মূল্য ৵০ আনা। ধার্ম্মিক, ধর্ম্মসংস্কারক এবং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক

মহাত্মাগণের [illegible] লিখিত হইয়াছে, তাহাতে [illegible]বার বিষয় অধিক না থাকিলেও, এইরূপ পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা বড়ই [illegible] বালকদিগের জন্য পুস্তক লিখিতে হইলে, ভাষাটাকে খুব সরল করা উচিত। লেখকের বিষয়-নির্ব্বাচন অতি সুন্দর হইয়াছে।

১০। মহাপুরুষ জীবনী।—ইহাতে বুদ্ধদেব এবং ঈশার জীবনচরিতের অনেক কথা বেশ পরিষ্কার ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ ভাষা যাঁহাদের উপযোগী, তাঁহাদের পক্ষে এত ছোট গ্রন্থের ক্ষুদ্র বিবরণ যথেষ্ট কি? বোধ হয়, খুব সরল ভাষায় লিখিত হইলে, সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার এক খানি সুপাঠ্য পুস্তক হইত।

১১। মীমাংসা সূত্র।—প্রথমখণ্ড, মূল্য ॥৶০ আনা। শ্রীসুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মব্রত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এ খণ্ডে গ্রন্থকার ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আত্মা (মনুষ্যের) ভোগ কর্ত্তা মাত্র; তাহার একদিকে প্রলোভন, অন্যদিকে ভালমন্দ বিচারক ব্রহ্মবাণী বিবেক। কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই; সর্ব্বত্র, নিয়ন্তাশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আত্মা,জ্ঞানশক্তি ও বোধবৃত্তি দ্বারা আপনার প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম। কিন্তু মানবের মধ্যে যে সকল বৃত্তি আছে, তাহাদের আদিম পরিচালনা ভগবানের হস্তে। ভগবানের শক্তি-সঞ্চারিণী, প্রজা-সংরক্ষিণী ওপ্রজা-সৃষ্টিকারিণী শক্তিসংযোগে অহং জ্ঞানের উৎপত্তি। ভগবান এই অহং সংস্কার জন্মাইয়া মায়া জগৎ পরিচালনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অচিন্ত্য। মানব কেবল যাহা আছে, তাহাই দেখিয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়। আমাদের ভগবান [illegible] জন্মে। আবার [illegible] দয়া মায়াদি নাম [illegible] ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা [illegible]সংশয়। অন্ত-[illegible] দয়া ও নিষ্ঠুরতা একই [illegible]দের সিদ্ধান্ত করিবার প্রণালী একটু প্রাচীন রকমের। যত পারিয়াছেন, প্রাচীন দার্শনিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সেই কারণে তাঁহার লিখিত বিষয় অনেকে তেমন পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবে না। পদ্ধতিটা আর একটু সরল এবং চলিত-ভাষায় হইলে ভাল হইত।

১২। গৌরচাঁদ গোঁসাই।—মীমাংসা সূত্র ও গোরাচাঁদ গোঁসাই, উভয়ই এক গ্রন্থকার দ্বারা সম্পাদিত; এবং এই উভয় গ্রন্থই 'সাধনা গ্রন্থাবলীর' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়ের উদ্দেশ্যই ধর্ম্ম ও সদ্ভাব প্রচার। গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন যে, গৌরচাঁদ গোঁসাই উপন্যাস নহে; ইহাতে চরিত্রের বিকাশ নাই, আদর্শ জীবন নাই। ঘটনাবলী সজ্জিত হয় নাই। এক সহজ সূত্র (উপন্যাসরূপ) অবলম্বন করিয়া সাধারণের জীবনানুযায়ী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক কবিত্ব রসে নীচ অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হয় বলিয়া, গ্রন্থকার সে দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই,এইরূপ বলেন। আমরা এই শেষ কথাটার ভাব ও সারবত্তা মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, গ্রন্থে তাহা করেন নাই। লিপি-প্রণালীর দিকে অনেকটা দৃষ্টি রাখিয়াছেন, এবং তাহাতে ফলও ভাল হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থাৎ ঈশ্বর সেবাই জীবনের লক্ষ্য, গৌরচাঁদের পিতা এই শিক্ষায় পুত্রকে ধার্ম্মিক করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিজের জীবনও ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ভূমিকার প্রতিজ্ঞা

গ্রন্থে রক্ষিত হয় নাই বলিয়া, [illegible] পদেশময় উপন্যাসও অনেকের নিকট সুপাঠ্য বলিয়া বোধ হইবে।

১৩। হোমিওপ্যাথি মতে প্রমেহ ও শুক্রক্ষরণ রোগ চিকিৎসা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। লেখক প্রথমত রোগের লক্ষণাদির সরল ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি সরল ভাষায় অনেক অত্যা-বশ্যকীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এ পুস্তক খানিতে "প্রণীত" না লিখিয়া, "সঙ্ক-লিত" লিখিলেই ঠিক হইত; কারণ এ পুস্তক ইংরাজী গ্রন্থেরই অনুবাদ।

১৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সার—শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ সামন্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; মূল্য ।৵০; এ পুস্তকে কেবল রোগের নাম ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে। রোগের লক্ষণও নাই, অধি-কাংশ স্থলে ঔষধের ক্রম ও মাত্রাদিও নাই। যাঁহারা রোগ নির্ণয়ে অপটু, তাঁহারা এ পুস্ত-কের দ্বারা কোন সাহায্য পাইবেন বলিয়া বুঝিলাম না। চিকিৎসকদিগের জন্য এ পুস্তক লিখিত, তাঁহাদিগের উপকারে লা-গিবে কি না, আমরা জানি না।

১৫। Concord.—A monthly Review, Edited by Kali Charan Banurji. Annual subscription Rupees six—কেবল দুই সংখ্যা বাহির হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা ইত্যাদি অতি পরিপাটী হইতেছে। তৎসঙ্গে লেখাও অতি সুন্দর হইতেছে। এই দুই সংখ্যার অনেকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের প্রবন্ধ আছে। সকল গুলি প্রবন্ধই বেশ চিন্তাপূর্ণ।

[illegible] Third Annual Report of the [illegible] Reading Library;—এই পুস্তকালয়ের কার্য্যাদি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইতেছে দেখিয়া, আমরা সুখী হইলাম।

১৭। মহাত্মা সেণ্টপলের [illegible] শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] টাকা। এমনও কেহ কেহ বলেন [illegible] যদি সেণ্টপলের মত লোকের জন্ম না হইত, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচারিত হইত কিনা, সন্দেহ। বাস্তবিক পলের মত পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তির সাহায্য যে, খ্রীষ্টের মত প্রচারিত হইবার পক্ষে এক অতি প্রধান উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ মহাত্মার একখানি অতি সুন্দর জীবনী, সরল ও পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিপি-বদ্ধ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু একটী প্রশংস-নীয় কার্য্য করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু যদি জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে লিখিতে যেখানে সেখানে নিজের মতগুলি সন্নিবিষ্ট না করি-তেন, তাহা হইলে গ্রন্থখানি আরও সুপাঠ্য এবং সাধারণের প্রীতিকর হইত।

১৮। বিদ্যোদয়।—এখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা; পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হইয়া ভাটপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যার ন্যায় প্রবোধনী প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সাহিত্য দর্পণের ব্যাখ্যাটী আরও বিশদ হইলে ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজের মতের সমালোচনা করিতে পারিলে অলঙ্কার শিক্ষার পক্ষে আরও সুবিধা হয়।

সমাপ্ত।